প্রথম খণ্ড

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

"বিদেশের নিষিদ্ধ উপন্যাস" সিরিজের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। সকলে শংখধ্বনি করুন, নবজাতকের জন্ম-লগ্ন ঘোষণা করি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব ধ্রুপদী উপন্যাস বিভিন্ন কারণে নিষিদ্ধ হয়েও অসাধারণ সাহিত্যমূল্যে সমৃদ্ধ, মৃত্যুহীন মানবিক আবেদনে কালাতীত মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, বাংলা-ভাষাভাষী রসিক পাঠকের হাতে সেগুলি পৌঁছে দেবার বাসনাই এই বৃহদায়তন অনুবাদ-সাহিত্য-সিরিজ প্রকাশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা। রুশ সাহিত্যিক লিও তলস্তয়-এর Resurrection (নবজন্ম), ফরাসী সাহিত্যিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার-এর Madame Bovary ও বিপ্লবী চিন্তা-নায়ক ভল্‌তেয়ার-এর Candide—বিশ্ব-সাহিত্যের এই তিনখানি অমূল্য উপন্যাসের সরল, মূলানুগ বাংলা-ভাষান্তর প্রথম খণ্ডে সংযোজিত হল। এর প্রত্যেকটি উপন্যাস চিন্তার বৈপ্লবিক অগ্রগতিতে, বলিষ্ঠ কাহিনীর নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে এবং ভাব-প্রকাশের ঋজু বলিষ্ঠতায় পাঠকের মনকে সম্মোহিত ও সঞ্জীবিত করবে, সাহিত্য-রস-পিপাসু পাঠককে সে-সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্যমাত্র। তবু প্রকাশকের অনস্বীকার্য কর্তব্য হিসাবেই এই ভূমিকার অবতারণা।

তলস্তয় ও নবজন্ম

"Thank you for giving me the opportunity of reading Tolstoy's novel. What a great writer and psychologist he is··· . I found myself exclaiming with delight while I was reading it···It's extremely powerful! Extremely powerful indeed!"

—Gustave Flaubert (1880)

"Tolstoy sees the world like some one who has slipped behind the stage of social and political life, while most of us share the illusions of the spectators sitting in the stalls."

—Bernard Shaw (1898)

"We learn almost as much about Russian life from Tolstoy's writing alone as we gain from the rest of Russian literature in general···His books will live on through the centuries as a memorial to the persistent hard work of a genius."

—Maxim Gorky (1908)

"My attitude towards Lev Tolstoy is that of a devoted reader who is greatly indebted to him in life."

—Mahatma Gandhi (1921)

লিও তলস্তয়ের সাহিত্য-কৃতিপ্রসঙ্গে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ভারতবর্ষের চারজন মনীষীর এই উদ্ধৃতির উপর কোন রকম মন্তব্য অসঙ্গত স্পর্ধারই নামান্তর বিবেচনা করে সে বিষয়ের উপর ইতি টেনে তাঁর বর্তমান উপন্যাস প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা এখানে উপস্থিত করছি।

দুখানি এপিক উপন্যাস "সংগ্রাম ও শান্তি" (War and Peace) ও "আন্না কারেনিনা" সমাপ্ত করার পরে তলস্তয়ের জীবনে একটা কঠোর নৈতিক সংকট দেখা দেয়। সাহিত্য-কর্মকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি নীতি ও ধর্মমূলক রচনায়ই প্রধানত আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে বিশ্ব-সাহিত্যের এই অমর কথাকার আবার তাঁর স্বক্ষেত্রে ফিরে আসেন, আর তারই ফসল "নবজন্ম"। এই উপন্যাসে নির্মম সত্যানুসন্ধিৎসার সঙ্গে গভীর মানবিক মমতায় তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার শব-ব্যবচ্ছেদ করেছেন। অসিধার লেখনীর নিষ্ঠুর আঘাতে তৎকালীন রুশ সমাজ-ব্যবস্থার সার্বিক মুখোশকে তিনি ছিন্নভিন্ন করে রুশ আত্মার অন্তরলোককে আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করেছেন।

"নবজন্ম" রচনার একটি ইতিহাস আছে। একটি সত্য ঘটনা এই উপন্যাসের মূল ভিত্তি। সেণ্ট পিতার্সবার্গ জেলা আদালতের সরকারী উকিল ও প্রখ্যাত আইনজীবী বন্ধু এ. এফ. কনি ১৮৮৭ সালে ঘটনাটি তলস্তয়কে বলেন। একটি সম্ভ্রান্ত যুবক জুরি হিসাবে পিতার্সবার্গে আসে এবং কবির সঙ্গে দেখা করে। ঘটনাচক্রে দেখা যায়, চুরির অভিযোগ অভিযুক্ত যে রূপোপজীবিনীর বিচার করতে সে এসেছে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখেই যুবকটি চিনতে পারে; অতীতে একদা এই মেয়েটিকেই সে ভুলিয়ে পাপের পথে নিয়ে পরে তাকে পরিত্যাগ করেছিল। অতীত অপরাধের স্মৃতি যুবকটির বিবেককে দংশন করে। সে জেলখানায় মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে ও তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয় না, কারণ তার আগেই মেয়েটি পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

ঘটনাটি তলস্তয়ের দরদী মনের উপর গভীর রেখাপাত করলেও তখন তিনি জীবনের অন্য কর্মক্ষেত্রে আকণ্ঠ ডুবেছিলেন। তাই তিনি বন্ধু কনিকেই এ ঘটনা নিয়ে লিখতে অনুরোধ করেন। একটি বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু কনির দিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তখন তলস্তয় নিজেই ঐ ঘটনাকে নিয়ে উপন্যাস রচনার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আরও দেড় বছর পরে ১৮৮৯ সালে উপন্যাসের প্রথম মুসাবিদা সমাপ্ত করেন।

কিন্তু আমরা জানি, "নবজন্ম" রচনার ইতিহাস আরও অনেক দীর্ঘায়ত ও জটিল। ১৮৮৯ সালে যে ইতিহাসের শুরু তার সমাপ্তি ঘটে ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। অবশ্য তলস্তয়ের উপন্যাস-রচনায় এই বিলম্বিত রীতি বেনজির নয়। "সংগ্রাম ও শান্তি" রচনায় সময় লেগেছিল ছ'বছর, আর "আন্না কারেনিনা"য় তিন বছর। কিন্তু "নবজন্ম"-এর বেলায় এই বিলম্ব গিয়ে ঠেকেছিল

এগারো বছরে। ১৮৮৯-র শেষ দিকে ও ১৮৯০-এর প্রথম দিকে কিছুটা লিখবার পরে আবার লেখায় হাত দেন বেশ কয়েক মাস পরে। কিন্তু আবার বাধা—এবার বাধা দীর্ঘ পাঁচ বছরের। তার কারণও ছিল। ১৮৯১-৯৩-তে রাশিয়াতে যে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তার ত্রাণ-কার্যে তলস্তয় ভীষণ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া ছিল তৎসংক্রান্ত লেখালেখি এবং ধর্মগ্রন্থ "তোমার অন্তরেই ঈশ্বরের রাজ্য" (The Kingdom of God Is Within You) রচনার অনিবার্য তাগিদ। যাই হোক, ১৮৯৫-র গ্রীষ্মকালে আবার "নবজন্ম"-এ হাত দিলেন এবং প্রথম পাণ্ডুলিপি শেষ করলেন (যদিও তলস্তয়-সাহিত্যের সম্পাদনা যারা করেছেন তাঁরা "নবজন্ম"-এর ছটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপির সন্ধান পেয়েছেন)। কিন্তু ঐ বছরের শেষ দিকেই সে পাণ্ডুলিপি বাতিল করে তিনি আবার নতুন করে লিখতে শুরু করলেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পরেই আবার বাধা এল; অবশ্য সেই বাধাই প্রকারান্তরে এই দীর্ঘ-বিঘ্নিত উপন্যাস-রচনাকে শেষ পর্যন্ত সমাপ্তির তীরে পৌঁছে দিল।

বাধা এল তৎকালীন রাশিয়ার "দুখোভর" নামক একটি নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। "দুখোভর" এই রুশ কথাটির অর্থ "আত্মিক যোদ্ধা"। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা সন্ন্যাস-জীবন যাপন করত, খৃস্টীয় গীর্জার পরিবর্তে নিজেদের "আত্মিক আলো"-র দ্বারা পরিচালিত হত, মদ-মাংস খেত না, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে চলত এবং সর্বপ্রকার হিংসার (সৈনিক জীবনসহ) বিরোধিতা করত। কালক্রমে এই সম্প্রদায় একটি সরকারবিরোধী আধা-সামরিক বাহিনীতে পরিণত হল এবং সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত হল। "দুখোভর"দের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হতে লাগল; সরকারের পক্ষ থেকেও এল অত্যাচার ও নৃশংসতার জবাব; সমগ্র আন্দোলনটাই একটা ছোটখাট বিদ্রোহের রূপ নিল। তলস্তয়ের তৎকালীন জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার দরুণ স্বভাবতই তিনি "দুখোভর" আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন এবং এই ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে লেখালেখি চালাতে লাগলেন। ফলে তিনি নিজে রাজরোষ থেকে রেহাই পেলেও তাঁর দুই প্রধান শিষ্য চার্তকভ্ ও বিরয়ুকভ্‌কে ১৮৯৭ সালে রাশিয়া থেকে নির্বাসিত করা হল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ১৮৯৮ সালে রুশ সরকার এই একটি শর্তে "দুখোভর"দের রাশিয়া ছেড়ে চলে যেতে দিতে রাজী হল যে, তারা আর কখনও ফিরে আসবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং একজন কাউকে তাদের দায়িত্ব নিতে হবে। প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিল। স্থির হল, "দুখোভর"রা ককেসাস থেকে কানাডায় চলে যাবে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। কিন্তু প্রায় বারো হাজার লোককে এক দেশ থেকে তুলে নিয়ে আর একটি দেশে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তলস্তয় একান্ত নিষ্ঠায় সেই কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাশিয়ার এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি লিখলেন, বিদেশী সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করলেন। কিন্তু তার ফলে প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য অর্থই সংগৃহীত হল। আরও টাকা চাই। অনেক টাকা। এই অবস্থায় তলস্তয় স্থির করলেন, তাঁর একখানি উপন্যাস থেকে উপার্জিত উপস্বত্ব তিনি এই কাজে দান করবেন। তিনখানি অসমাপ্ত উপন্যাস তখন তাঁর হাতে—শয়তান (The Devil) পিতা সার্গিয়ুস (Father Sergius) এবং নবজন্ম (Resurrection)। তিনি "নবজন্ম"ই বেছে নিলেন। সচিত্র সাহিত্য-পত্রিকা "ফসলের ক্ষেত" (Niva)-র সম্পাদক A. F. Marx-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল—উপন্যাসটি তিনি ধারাবাহিকভাবে তার পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারবেন এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশের স্বত্বও তার থাকবে ; বিনিময়ে আনুমানিক ৩৫ হাজার শব্দ সম্বলিত প্রতিটি স্বাক্ষরিত লেখার কিস্তির জন্য লেখককে এক হাজার রুবল হিসাবে দিতে হবে। "দুখোভর"দের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলানের জন্য তিনি আরও ব্যবস্থা করলেন—ফ্রান্সে, জার্মেনীতে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতেও উপন্যাসটির ভাষান্তর-সংস্করণ একই সঙ্গে প্রকাশিত হবে এবং তার ফলে উপস্বত্ব হিসাবে অর্জিত অর্থের পরিমাণও হবে চতুর্গুণ।

তারপরেই দেখা দিল সেন্সর-এর সমস্যা। জার-শাসিত রাশিয়ায় "নবজন্ম"-এর মত এস্টাব্লিশমেণ্ট-বিরোধী উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের স্পর্ধা হবে কার ? তাই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছোঁবল বসালো সেন্সর-এর বিষদাঁত। আর তার ফলে মূল পাণ্ডুলিপি অনেক কাটা-ছেঁড়া হয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে লাগল "ফসলের ক্ষেত" পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে। যদিও গোড়াতেই ব্যবস্থা হয়েছিল যে, তলস্তয়ের লেখা মূল পাণ্ডুলিপিরই একটি অনুলিপি সোজা বিদেশের প্রকাশকদের কাছে পাঠানো হবে যাতে ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত রুশ সংস্করণে এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণগুলিতে উপন্যাসটির মূল চেহারা অক্ষুন্ন থাকে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মূল অনুলিপির সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী চোরা-পথে অনেক সেন্সর-কণ্টকিত সংস্করণও বিদেশের বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার উপরে বিদেশী ভাষান্তরিকগণও অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের সুবিধামত মূল রচনার উপর এমন ভাবে কাট-ছাট চালালেন যার ফলে কোন্‌টা যে মূল রচনা আর কোন্‌টা তার ছদ্মবেশ—সেটা বোঝাই দায় হয়ে উঠল। তার ফলে "নবজন্ম"-এর রুশ ভাষার সেন্সর-মুক্ত মূল সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ সালে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে আরও অনেক কাল পরে।

ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে "নবজন্ম" ইংলণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হবার পরেই সেখানে উপন্যাসটির বিরুদ্ধে দুর্নীতিমূলক রচনার অভিযোগ উঠল। ঋষিকল্প চরিত্রের মানুষ হিসাবে তলস্তয়ের তখন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাঁরই

লেখনী হতে এমন একখানি অসামাজিক, দুর্নীতিমূলক রচনার জন্ম হওয়ায় ইংলণ্ডের একশ্রেণীর লোক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। "সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস"-এর সদস্য জনৈক জন বেলোজ তলস্তয়ের এই উপন্যাস সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করবে এই অভিযোগ তুলে তাঁকে তিরস্কার করে সরাসরি একখানি চিঠি লেখেন। তলস্তয় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্তি ও স্থৈর্য অক্ষুণ্ণ রেখে স্বীয় প্রত্যয়ে অবিচলিত আস্থা ঘোষণা করে যে চিঠিখানি তাকে লিখেছিলেন তার ভাষান্তর এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

'প্রিয় বন্ধু,—আপনার পত্র পেয়েছি; সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গত দু'মাস যাবৎ আমি এত দুর্বল ছিলাম যে তা করে উঠতে পারি নি। সুতরাং আমার দীর্ঘ নীরবতার জন্য ক্ষমা করবেন।

'আপনার পত্রখানি দু'বার পড়েছি, সাধ্যমত বিচার-বিবেচনা করেও দেখেছি, কিন্তু সমস্যার কোন সুস্পষ্ট সমাধানে উপনীত হতে পারি নি। আপনার কথা ঠিক হতে পারে, কিন্তু এ বই যারা পড়বেন তাদের সকলে আপনার সঙ্গে একমত হবেন না। যাঁরা বইটা সম্পূর্ণ না পড়বেন এবং এর অর্থ অনুধাবন করতে না পারবেন তাঁদের উপর এ বইয়ের খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু এ বই ঠিক তার বিপরীৎ প্রভাবও বিস্তার করতে পারে—আর এ বইয়ের উদ্দেশ্যও তাই। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, আমি যখন কোন বই পড়ি তখন আমার প্রধান লক্ষ্যই থাকে লেখকের জীবন-বেদের প্রতি ঃ সে কি চায় আর কাকে ঘৃণা করে। আমি আশা করি, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যিনি আমার বই পড়বেন তিনিই বুঝতে পারবেন লেখক কি পছন্দ করে আর কি অপছন্দ করে এবং লেখকের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিতও হবেন। আমি বলতে চাই, এ বই লিখবার সময় সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি লালসাকে ঘৃণা করেছি এবং সেই ঘৃণাকে প্রকাশ করাই এই বইয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সে কাজে যদি আমি ব্যর্থ হয়ে থাকি, সেজন্য আমি দুঃখিত; আর আপনার চিঠি অনুসারে যে দৃশ্যে আপনার মনের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে বলে আপনি লিখেছেন সে দৃশ্য রচনায় যদি আমি এতদূর অবিবেচক হয়ে থাকি তাহলে সে অপরাধ আমি স্বীকার করছি।

আমি মনে করি, আমাদের বিবেক ও ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন আমাদের কাজের ফলাফল দিয়ে নয়, আমাদের অভিপ্রায় দিয়ে। এবং আমি আশা করি যে, আমার অভিপ্রায় খারাপ ছিল না।—একান্ত আপনার

লিও তলস্তয়।'

মহাকালের নিজের হাতে স্বাক্ষরিত রায় আজ সর্বজনবিদিত। ধূলোয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কত জন বেলোজের দল; লিও তলস্তয় ও তাঁর অমর

সাহিত্য আজও চিরভাস্বরতায় দীপ্তিমান : "নবজন্ম" সব বিতর্কের অতীত এক মহৎ সাহিত্যের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

লিও তলস্তয়ের তিনটি দীর্ঘ উপন্যাসের অন্যতম Resurrection প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, আর তার ঠিক আশী বছর পরে প্রকাশিত হল তার পূর্ণাঙ্গ বাংলা-ভাষান্তর "নবজন্ম"।

মাদাম বোভারী

মাদাম বোভারী যখন প্যারিসের 'রেভ্যু গু প্যারিস' পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয় তখন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী ভীত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবেন এই উপন্যাসের নায়িকা এম্মা বোভারীর একাধিক অবৈধ প্রণয়-কাহিনী যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র হোমার মুখ দিয়ে যাজক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করানো হয় তাতে সরকারী হস্তক্ষেপ নেমে আসবে অনিবার্যভাবে। সেই ভয়ে তাঁরা মূল রচনার কিছু কিছু অংশ কেটে বাদ দেন। তথাপি দেশের প্রচলিত নীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করা হয় ফ্লবেয়ারকে। এই বিচার প্রভূত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে সারা দেশের শিক্ষিত মহলে। বিচারকালে ফ্লবেয়ারের কৌঁসুলি ও সরকারী উকীল তর্কযুদ্ধে যে বাগ্মিতার পরিচয় দেন তাতে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

বিচার শেষে সমস্ত অভিযোগ হতে মুক্ত হন ফ্লবেয়ার। প্রকাশের ছাড়পত্র পায় তাঁর মাদাম বোভারী। অবশেষে ১৮৫৭ সালের ১৮ই এপ্রিল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মাদাম বোভারীর ফরাসী নাম ছিল Moeurs de Province.

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মাদাম বোভারী জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করলেও অনেকে এই সাফল্যকে অশ্লীল সাহিত্যের সাফল্য বলে কটাক্ষ করেন। বলেন Succ'ess de scandale. কিন্তু যে যাই বলুক, ফরাসী সমালোচক ও শিল্পী সাহিত্যিকরা একবাক্যে একথা স্বীকার করেন যে 'মাদাম বোভারী' একখানি সাধারণ বহুলবিক্রিত জনপ্রিয় উপন্যাস নয়। তাঁরা বুঝতে পারেন এ উপন্যাস এমনই একটি এপিক উপন্যাস যার মধ্যে জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রকৃত সাহিত্যমূল্যের এক অদ্ভুত সাযুজ্য ঘটেছে।

এই সময় সেকালের প্রখ্যাত ফরাসী কবি বদলেয়ার তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'ফ্লুয়ার দু ম্যান' লেখার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হন এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। বদলেয়ার 'মাদাম বোভারী'র যুগান্তকারী তাৎপর্য বুঝতে পেরে বলেন, Since Balzac the art of novel had been stagnant in France and despite various attempts to renovate it, general interest

had not been captured. Now Flaubert had come and opened a new horizon'। অর্থাৎ বালজাকের পর হতে ফরাসী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং মৃতপ্রায় ফরাসী উপন্যাসের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তা জনগণের দৃষ্টি বা আগ্রহ আকর্ষণ করতে পারেনি। ফ্লবেয়ার এই ফরাসী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকের ফরাসী মধ্যবিত্ত সমাজের পটভূমিকায় লেখা মাদাম বোভারী উপন্যাসটি আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে ফরাসী সমাজ ও কথাসাহিত্যকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় একই সঙ্গে।

ভল্‌তেয়ার ও কাঁদিদ

১৭১৫ খৃস্টাব্দ। চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর পরে ফ্রান্সের রাজদণ্ড তখন কার্যত রিজেণ্টের হাতে। রাজ-পরিবারের ব্যয়-হ্রাসের জন্য মাননীয় রিজেণ্ট রাজকীয় আস্তাবলের অর্ধেক ঘোড়া বেচে দিলেন। তা শুনে একুশ বছরের যুবক আরুয়ে মন্তব্য করলেন, তার চাইতে রাজ-দরবারের অর্ধেক গাধাকে বরখাস্ত করলে কি আরও ভাল হত না! তাছাড়া, তার দুটো অস্বাক্ষরিত কবিতায় অভিযোগ তোলা হয়েছিল, রিজেণ্ট স্বয়ং সিংহাসন বেদখলে অভিলাষী। রিজেণ্ট রাগে ফেটে পড়লেন। একদা পার্কে যুবক আরুয়ে-র সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে বললেন, "মঁসিয়ে আরুয়ে, আমি আপনাকে এমন জিনিস দেখাতে পারি যা আপনি এর আগে কখনও দেখেন নি।" "সেটা কি?" "বাস্তিল'-এর অভ্যন্তর।" পরদিন ১৭১৭ খৃস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল আরুয়েকে সত্যি সত্যি বাস্তিল কারাগারে পাঠানো হল। কি কারণে জানা যায় না, বাস্তিল কারাগারে থাকবার সময়ই ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে "ভল্‌তেয়ার" ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং সেই নামেই কবিতা লিখতে শুরু করেন।

ভল্‌তেয়ার অর্থাৎ ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে ১৬৯৪ খৃস্টাব্দে প্যারিসের একটি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাকে হারান। তখন সেই মাতৃহীন রুগ্ন শীর্ণ শিশুটিকে দেখে তার নার্স বলেছিল, তার পরমায়ু একদিনের বেশী হবে না। নার্সটির একটু ভুল হয়েছিল; তার পরমায়ু ছিল প্রায় চুরাশি বছর, যদিও একটি রোগ-জর্জর ভঙ্গুর দেহ সারাটা জীবন তাঁর অপরাজেয় প্রাণ-শক্তিকে বারে বারে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে।

ভল্‌তেয়ার শুধু দীর্ঘ জীবনেরই অধিকারী ছিলেন না, তাঁর সাহিত্য-কীর্তিও সুদূর প্রসারী—কি রচিত গ্রন্থের সংখ্যায়, কি সমসাময়িক চিন্তা ও জীবন-ধারণার উপর প্রভাবের বিচারে। তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা নিরানব্বুই, আর বিষয় বৈচিত্র্যে এন্‌সাইক্লোপিডিয়াস্বরূপ। ভিক্টর হুগো বলেছেন, "To name

Voltaire is to characterize the entire eighteenth century." ভল্‌তেয়ার একটি যুগ-প্রতিনিধি। জীবিতকালে অন্য কোন লেখক বোধ হয় সমসাময়িক জীবনের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করে নি। নির্বাসন ও কারাদণ্ড তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে, রাষ্ট্র ও গীর্জার হীন চাটুকারদের হাতে তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছে, তবু সত্যের সংগ্রামে তিনি ছিলেন অবিচল; তাঁর লেখনীর ভয়ে সিংহাসন থর্‌ থর্‌ করে কেঁপেছে; অর্ধেক পৃথিবী উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে তাঁব প্রতিটি কথা শুনবার জন্য।

বাস্তিলের কারাগারে এগারো মাস কাটাবার সময়ই তিনি দীর্ঘ কাব্য "আঁরিয়েদ" লেখেন। কিন্তু সেখান থেকে ছাড়া পেয়েই এক লাফে যেন কারাগার থেকে পৌঁছে গেলেন রঙ্গমঞ্চে। তাঁর বিয়োগান্ত নাটক "ঈদিপ্‌" ১৭১৮ সালে মঞ্চস্থ হয়ে একটানা পঁয়তাল্লিশ রজনী অভিনীত হয়ে প্যারিসের সব রেকর্ড ভঙ্গ করল। আর তাঁর পকেটে এল ৪০০০ ফ্রাঁ। কিন্তু পরবর্তী নাটক "আর্তেমিরে" একেবারেই চলল না। ব্যর্থতায় তাঁর মন ভেঙে পড়ল। দেহ আক্রান্ত হল কঠিন বসন্ত রোগে। কিন্তু সাপে বর হল। মৃত্যুর অন্ধকার গুহা পার হয়ে এসে তিনি দেখলেন "আঁরিয়েদ"-এর কবি হিসাবে তিনি বিখ্যাত হয়ে গেছেন। সমাজ দিল স্বীকৃতি, সর্বত্র চলল সম্বর্ধনার জোয়ার। আট বছর সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটল। আবার ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। ব্যক্তিগত রোষের শিকার হয়ে আবার তিনি গ্রেপ্তার হলেন। ঢুকলেন বাস্তিল-এ। ইংলণ্ডে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাবেন এই শর্তে মুক্তি পেলেন। ইংলণ্ডে চলে গেলেন। কিন্তু ডোভারে পৌঁছেই আবার লুকিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন। ফ্রান্সের মাটিতে তবু ঠাঁই হল না। তৃতীয় বার গ্রেপ্তার এড়াতে তিন বছরের জন্য ইংলণ্ডের জীবনকেই বেছে নিলেন।

Veni, Vidi, Vici, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। উক্তিটি জুলিয়াস সিজারের। কিন্তু বুঝিবা ভল্‌তেয়ারেরও। মাত্র দু'বছরের চেষ্টায় তিনি ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত হলেন; পরিচিত হলেন লর্ড বোলিংব্রোক, পোপ, এডিসন, সুইফ্‌ট্‌ প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সঙ্গে। আর কী আশ্চয দ্রুততায় তিনি আহরণ করলেন ইংলণ্ডের যত কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন—তার সাহিত্য, তার বিজ্ঞান, তার দর্শন। এই সময় তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Letters on the English. ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বই লিখলেন, কিন্তু ছাপাতে সাহস করলেন না, কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন, একজন ফরাসী নাগরিকের লেখনীতে ইংলণ্ডের এত প্রশংসা ফ্রান্সের রাজশক্তি কখনও সহ্য করবে না। হলও তাই। ১৭২৯ সালে রিজেণ্ট ভল্‌তেয়রকে ফ্রান্সে ফিরবার অনুমতি দিলেন। আর সেই সুযোগে জনৈক অসাধু প্রকাশক Letters on the English গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে লেখকের বিনা অনুমতিতেই সেটা ছেপে দিয়ে 'গরম পিঠে'র মত

বিক্রি করতে শুরু করল। সারা ফ্রান্স আঁতকে উঠল। প্যারিসের পার্লামেন্ট সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের সব সংখ্যা পুড়িয়ে ফেলবার আদেশ দিল। পাছে আবার বাস্তিল-এ ঢুকতে হয় এই আশংকায় ভল্‌তেয়ার ফ্রান্স থেকে পাততাড়ি গুটালেন। উপরি পাওনা হিসাবে এবার সঙ্গে নিয়ে গেলেন রিশেলু-পত্নী মার্কুয়েস্ দ্যু চাতেলে-কে। চাতেলে সুন্দরী, বিদুষী, বয়স আঠাশ বছর, আর ভল্‌তেয়ার তখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!

এই সময় ভল্‌তেয়ার লিখলেন তাঁর বিখ্যাত রোমোন্যাসগুলি—জাদিগ, কাঁদিদ, মাইক্রোমেগান, লাইঙ্গেমু, লে মদে ইত্যাদি। এগুলো ঠিক উপন্যাস নয়, humoresque-picaresque নভেলেট: নায়করা সব আদর্শের প্রতীক, খল-নায়করা কুসংস্কারের প্রতীক আর ঘটনা-প্রবাহ চিন্তার প্রতিফলন মাত্র। তবু কাঁদিদ ভল্‌তেয়ারের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনা। ইওরোপে তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Seven Years War) শুরু হয়েছে। ভল্‌তেয়ারের মানবদরদী স্বাধীন চিত্ত এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, এতো নিছক পাগলামি ও আত্মনাশ: সুদূর কানাডা-র কয়েক একর বরফ-ঢাকা জমির দখলের জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এ কী সর্বনাশা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। ঠিক সেই সময়েই তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত একটি কবিতার বক্তব্যের প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন ফ্রান্সের আর এক প্রতিভাধর চিন্তানায়ক রুশো। অগ্নিতে বুঝি ঘৃতাহুতি পড়ল। জ্বলে উঠলেন ভল্‌তেয়ার। মাত্র তিনদিনের মধ্যে ১৭৫৯ সালে লিখলেন "কাঁদিদ": ভল্‌তেয়ারের শানিত বিদ্রূপ; মানুষের হাতের লেখনী বুঝি আর কখনও এত ভয়ংকর ও তীক্ষ্ণমুখ হয়ে দেখা দেয়নি। সর্বগ্রাসী দুঃখবাদের সহজ সরল প্রকাশ! হাসতে হাসতে মানুষ অন্তরের অন্তস্তলে উপলব্ধি করল এক নতুন জীবন-বেদ: সর্বম্ দুঃখম্। অথচ এ গ্রন্থের শিল্প-কুশলতা কত অনাড়ম্বর, কত সহজ, সরল। একছত্র বর্ণনা নেই, শুধুমাত্র আখ্যান ও সংলাপের ভিতর দিয়ে রুদ্ধশ্বাস গতিতে বয়ে চলেছে ঘটনাপ্রবাহ। আনাতোল ফ্রান্স লিখেছেন, 'In Voltaire's fingers, the pen runs and laughs.' বিশ্ব-সাহিত্যের আকাশে কাঁদিদ একটি অনুপম ছোট-গল্পের হীরক-দীপ্তিতে ভাস্বর নক্ষত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলতেয়ারই সম্ভবত সেই লেখক যার সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। সর্বসাকুল্যে তাঁর ন'টি গ্রন্থ নানা কারণে নিষিদ্ধ হয়েছিল। কয়েকটি নিষিদ্ধ হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে. কয়েকটি ধর্মীয় ব্যাপারে, আর কিছু হয়েছিল নিছক অশ্লীলতার জন্যে। কাঁদিদ উপন্যাসটি নিষিদ্ধ হয়েছিল অশ্লীলতার জন্যে; তাও ফ্রান্সে নয়, অন্য দেশে। ১৯২৯ সালে যুক্ত রাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী সাহিত্যের ক্লাশে নিয়ে যাওয়ার সময় কোন একজন অধ্যাপক বইটিকে বাজেয়াপ্ত করেন। তারপরে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে গ্রন্থটি

সেখানে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু পরে এর যে একটি নতুন সংস্করণ বেরোয় সেটিকে নিষিদ্ধ করা হয়নি।

গ্রন্থটি রচিত হওয়ার একশ সত্তর বছর পরে কাস্টমস্ হঠাৎ অশ্লীল বলে কাঁদিদকে নিষিদ্ধ করে দেয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বত্রই বইটি পড়া এবং পড়ানো হতো একটি উন্নত ধরনের রচনা বলে। বইটির পক্ষে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন অধ্যাপক কর্তৃপক্ষ মহলের সঙ্গে বাদানুবাদেও নেমেছিলেন। ১৯৪৪ সালে নিউ ইয়র্কের Concord Books Inc. এক হাজার পুস্তকের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম ছিল ৪৯ সেণ্ট করে। কাঁদিদের নাম সেই তালিকায় ছিল। কিন্তু পোষ্ট অফিস কোম্পানীকে জানিয়ে দিল যে একটি অশ্লীল গ্রন্থ তালিকাভুক্ত হওয়ার ফলে সেটির নাম মুছে না দিলে বইগুলি ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব হবে না। শেষ পর্যন্ত তাই করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কাঁদিদের চাহিদা এত বেশী ছিল যে বইটি আমেরিকার বিভিন্ন প্রকাশকদের পুস্তক-তালিকায় স্থান পেয়েছিল এবং অনেক বছর ধরে বিদেশেও রপ্তানি হয়েছিল প্রচুর পরিমাণে।

সুখ-দুঃখে, পতনে-অভ্যুত্থানে বন্ধুর ভল্‌তেয়ারের যাযাবর জীবন। ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড, আবার ফ্রান্স, সিরে-র পল্লীভবনে মধুর দাম্পত্য জীবন, সেখান থেকে জার্মেনি। পনেরো বছর দাম্পত্য জীবন কাটাবার পর মাদময়জেল দ্য চাতেলে মার্কুইস দ্য সাঁত-লাম্বারকে ভালবেসে ভল্‌তেয়ারকে ছেড়ে গেলেন। দার্শনিক নিরাসক্ততায় তিনি শুধু বললেন, 'Such are women. I displaced Richelieu, Saint Lambert turns me out! That is the order of things; one nail drives out another; so goes the world." তৃতীয় পেরেকটিকে উদ্দেশ করে একটি কবিতাও লিখলেন :—

"বাগানে যত ফুল তোমারি হোক
সাঁৎ-লাম্বার।
গোলাপের যত কাঁটা আমারি থাক,
গোলাপ তোমার।"

জার্মেনিতেও মাথার উপর উদ্যত হল রাজরোষের খড়্গ। অনেক কষ্টে কারাবাস এড়িয়ে সীমান্ত পার হয়ে ফ্রান্সে প্রবেশের মুখে খবর পেলেন, ফ্রান্স থেকে তিনি আবার নির্বাসিত হয়েছেন। কোথায় যাবেন? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভার কাছাকাছি "লে ডেলিসেস" নামে একটি পুরনো বাড়ি কিনে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। কিন্তু সে বাসস্থানও স্থায়ী হল না। চৌষট্টি বছর বয়সে দীর্ঘ যাযাবর-জীবনের অবসান হল। সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী ফার্নে-তে গড়লেন স্থায়ী আবাস: শেষ জীবনের শান্তির নীড়। ফরাসী সরকারের ক্রুদ্ধ হাত সেখানে পৌঁছবে না; আবার সুইস সরকার ক্রুদ্ধ হলেও হাতের কাছেই রইল ফরাসী সরকারের আশ্রয়। এবার নিরাপদ।

বয়স হল তিরাশি বছর। মৃত্যুর আগে প্যারিসকে দেখবার সাধ জাগল মনে। স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করে ডাক্তাররা এত দীর্ঘ ভ্রমণে আপত্তি করলেন। কিন্তু কারও নিষেধ শুনবার পাত্র তিনি নন। কয়েকখানি হাড় মাত্র সম্বল করে প্যারিসে পৌঁছলেন। পরদিন তাঁর ঘর দর্শনার্থীদের ভিড়ে ভরে গেল। সকলের কাছে পেলেন রাজার সম্মান। সেই সময় তাঁর নাটক 'আইরিন' মঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে গেলেন নাটক দেখতে। রাত্রে ফিরে এসেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে এবার মৃত্যুর জয় হল। ১৭৭৮ সালের ৩০শে মে ভল্‌তেয়ারের বিচিত্র জীবনের অবসান হল। তার শবাধারবাহী গাড়িতে লেখা হয়েছিল: "মানুষের মনকে তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন; আমাদের তিনি মুক্তির জন্য প্রস্তুত করেছেন।" আর তার সমাধিতে লেখা হয়েছিল মাত্র তিনটি শব্দ: "এখানে ভলতেয়ার শায়িত"।

—কল্যাণব্রত দত্ত

নবজন্ম

RESURRECTION

'তখন পিটার এসে তাকে বলল, প্রভু, আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলেও আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত কি? যীশু তাকে বলল, আমি তোমাকে বলছি না, সাত বার পর্যন্ত : বরং সত্তর গুণিত সাতবার পর্যন্ত।'

—ম্যাথু। ১৮।২১-২২

'তোমার নিজের চোখে যে কড়ি-কাঠ রয়েছে সেটাকে না দেখে তোমার ভাইয়ের চোখের ধূলিকণার দিকে নজর দিচ্ছ কেন?—ম্যাথু।৭।৩

'তোমাদের মধ্যে যে নিষ্পাপ সেই সর্বপ্রথম মেয়েটির গায়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করুক'।—জন।৮।৭

'শিষ্য গুরু অপেক্ষা বড় নয় : কিন্তু প্রতিটি মানুষ পূর্ণতা অর্জন করলেই নিজের গুরু হয়ে উঠবে।'—লিউক।৬।৪০

প্রথম খণ্ড

অধ্যায়—১

হাজার হাজার মানুষ যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের উপর ভীড় করে আছে তাকেই বিকৃত করতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে : পাথর দিয়ে মাটিকে বেঁধেছে, প্রতিটি তৃণাঙ্কুরকে চেঁছে মুছে দিয়েছে; গাছের ডাল কেটেছে, পশু-পাখিদের তাড়িয়েছে, নাফ্‌থা ও কয়লার ধোঁয়ায় বাতাসকে ভরে তুলেছে,—তথাপি বসন্তকাল টিকে আছে, এমন কি শহরেও টিকে আছে।

সূর্য আতপ্ত কিরণ ছড়াচ্ছে, বাতাস সুরভিত, আর যেখানে একেবারে চেঁছে ফেলা হয় নি সেখানেই ঘাসেরা মাথা তুলেছে : পাথরের খাঁজে খাঁজে আর রাজপথের পাশের ছোট ছোট লনে। বার্চ, পপলার আর বুনো চেরি গাছ-গুলোতে চটচটে সুগন্ধি পাতা গজিয়েছে, লেবু গাছের ফুটন্ত কুঁড়িগুলো বাড়তে শুরু করেছে; কাক, চড়ুই আর কবুতরের দল বসন্তের আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বাসা বুনতে লেগে গেছে; সূর্যের কিরণে শরীর উষ্ণ হওয়ায় মৌমাছিরা দেয়াল

জুড়ে গুন গুন করে ফিরছে। সকলেই খুশি : গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, পোকা-মাকড়, মায় শিশুরা। কিন্তু মানুষরা, বয়স্ক নরনারীরা, নিজেদের ও পরস্পরকে ঠকানোর ও কষ্ট দেওয়ার স্বভাব ছাড়ে নি। বসন্তকালের এই সকাল বেলাটাকেও তারা পবিত্রভাবে গ্রহণ করতে পারে নি; সকল প্রাণীর আনন্দে নিবেদিত ঈশ্বরসৃষ্ট এই জগতের সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য মনকে শান্তি, মিলন ও প্রেমের পথে টেনে নেয়, তার কথা চিন্তা না করে মানুষরা ভাবে শুধু একে অপরকে মেরে উপরে উঠবার নিজ নিজ কৌশলের কথা।

এইভাবে জেলা-শহরের কারা-কার্যালয়েও নরনারী ও পশু-পাখিদের এই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বসন্তের রমণীয়তায় ও আনন্দে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়নি; বরং আগের দিন নম্বর-মারা ও কিছু বাড়তি মন্তব্যসম্বলিত যে বিজ্ঞপ্তিটা এসেছে তাতে বলা হয়েছে যে আজ ২৮শে এপ্রিল সকাল ৯টায় কারাগারে আটক তিনজন বন্দীকে—তাদের একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক (তাদের মধ্যে যে স্ত্রীলোকটি প্রধান আসামী তাকে আলাদা করে নেওয়া হবে)—আদালতে উপস্থিত করা হবে। তদনুসারে এখন ২৮শে এপ্রিল সকাল আট ঘটিকায় চিফ জেলার কারাগারের মেয়েদের অংশের অন্ধকার, দুর্গন্ধময় করিডরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ত্রীলোক সেখানে হাজির হল; তার মাথায় কোঁকড়ানো পাকা চুল, মুখে যন্ত্রণার ছাপ। তার পরিধানের জ্যাকেটের আস্তিনে সোনালি ফিতে বসানো, কোমরে একটি নীল পাড়-বসানো বন্ধনী আটা।

জেলার সশব্দে লোহার তালায় চাবি ঘুরিয়ে সেলের দরজাটা খুলে ফেলল। ভিতর থেকে যে বাতাসের ঝাপ্টাটা এল সেটা করিডরের বাতাসের চাইতেও দুর্গন্ধময়। 'মাসলভা! আদালতে চল!' বলে ডাক দিয়ে কারাধ্যক্ষ আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল।

কারাগারের প্রাঙ্গণের বাতাসে ভেসে আসছিল খোলা মাঠের তাজা সঞ্জীবনী হাওয়া। কিন্তু করিডরের বাতাসে বোঝাই হয়ে আছে টাইফয়েডের জীবাণু আর নর্দমা, মলমূত্র ও আলকাতরার গন্ধ। যে কেউ এখানে নতুন আসে সেই কষ্টে ভেঙে পড়ে। খারাপ বাতাসে অভ্যস্ত হলেও এই দুর্গন্ধ নারী-ওয়ার্ডারের নাকেও লাগল। এইমাত্র সে বাইরে থেকে এসেছে; করিডরে ঢুকতেই সে কেমন যেন শ্রান্ত ও ঘুম-ঘুম বোধ করল।

সেলের ভিতর থেকে খস্‌খস্ আওয়াজ, স্ত্রীলোকের কণ্ঠ ও মেঝেতে খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কারারক্ষী হাঁক দিল, 'কই রে, জলদি কর্!' দু'এক মিনিটের মধ্যেই একটি ছোটখাট সুদেহী তরুণী দ্রুতপায়ে দরজা পেরিয়ে জেলারের কাছে হাজির হল। তার পরণে সাদা জ্যাকেট ও পেটিকোটের উপর একটা ধূসর আলখাল্লা। পায়ে সুতির মোজা আর কয়েদীদের জুতো; মাথায় জড়ানো একখানি

সাদা রুমাল, আর তার নীচ দিয়ে কয়েক গুচ্ছ কালো চুল ইচ্ছাকৃতভাবেই কপালের উপর চেপে বসানো হয়েছে। স্ত্রীলোকটির মুখের রং সেই ধরনের সাদা যেটা দীর্ঘদিন আটক-থাকা মানুষের মুখে দেখা যায়, বা যা দেখলে মাটির নীচের ঘরে রাখা আলুর নবোদ্গত অঙ্কুরের কথা মনে আসে। তার ছোট চওড়া দু'খানি হাতে এবং আলখাল্লার চওড়া কলারের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসা গলায়ও সেই একই রং। দুটি কালো ঝকঝকে চোখ, একটা ঈষৎ টেরা, তার মুখের বিবর্ণ আভার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সে খুব সোজা হয়ে হাঁটে, ফলে তার পুরো বুকটাই ফুলে ওঠে।

মাথাটাকে সামান্য পিছনে হেলিয়ে জেলারের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সে করিডরে গিয়ে দাঁড়াল, যেন যে কোন আদেশ পালনে সে প্রস্তুত।

জেলার দরজায় তালা লাগাতে যাবে এমন সময় একটি কুঁচকানো-চামড়া কড়া চেহারার বৃদ্ধ স্ত্রীলোক সাদা মাথাটা বের করে মাসলভার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু দরজার ধাক্কায় বৃদ্ধার মাথাটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ষী দরজাটা বন্ধ করে দিল। সেলের ভিতরে নারী-কণ্ঠের হাসি শোনা গেল। সেলের দরজার ছোট গর্তটার দিকে ফিরে মাসলভাও হাসল। ও-পাশ থেকে গর্তটার উপর মুখটা চেপে ধরে বৃদ্ধা কর্কশ গলায় বলল :

'মনে রেখ, ওরা যখন জেরা শুরু করবে তখন একই কথা বার বার বলে যাবে ; বাজে কথা একটাও বলবে না।'

'কিন্তু যা হয়েছে তার চাইতে খারাপ আর তো কিছু হবে না : আমি চাই এসপার-ওসপার একটা কিছু হয়ে যাক।'

উপরওয়ালার আত্ম-নিশ্চিত ভঙ্গীতে চিফ জেলার বলল, 'এসপার-ওসপার একটা তো অবশ্য হবে। নাও, এখন চল!'

বৃদ্ধার চোখ দুটি গর্তের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর মাসলভাও করিডরে পা ফেলল। চিফ জেলারকে সামনে রেখে তারা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগল ; পুরুষ ওয়ার্ডের আরও দুর্গন্ধময় ও হৈ-চৈ-ভরা সেলগুলো পার হল ; দরজার প্রত্যেকটি গর্তে চোখ লাগিয়ে সকলে তাদের দেখতে লাগল ; শেষ পর্যন্ত তারা আপিসে পৌঁছল ; স্ত্রীলোকটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সেখানে দুটি সৈনিক অপেক্ষা করছিল। যে কেরাণীটি সেখানে বসেছিল সে তামাকের ধোঁয়ায় মলিন একটুকরো কাগজ একজন সৈনিকের হাতে দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে বলল, 'একে নিয়ে যাও।'

একটি সৈনিক নিঝ্‌নি নভ্‌গরদের এক চাষী। লাল মুখে বসন্তের দাগ। কোটের আস্তিনের ভিতর কাগজখানা গুঁজে রেখে কয়েদীর দিকে এক নজর তাকিয়ে সে তার সঙ্গী চওড়া-কাঁধ জনৈক চুবাসকে (রাশিয়ার অধীনস্থ এসিয়ার একটি জাতি) চোখ ঠারল। তারপর কয়েদী ও সৈনিকদ্বয় প্রধান

ফটক দিয়ে কারা-প্রাঙ্গণ পার হল এবং উঁচু-নীচু বাঁধানো পথের মাঝ বরাবর দিয়ে শহরের পথে এগিয়ে চলল।

কোচয়ান, ব্যবসায়ী, রাঁধুনি, মজুর ও সরকারী কেরাণীরা চলা থামিয়ে কৌতূহলের সঙ্গে কয়েদীকে দেখতে লাগল। কেউ কেউ মাথা নেড়ে ভাবল, 'এই হল পাপ কাজের—আমাদের থেকে ভিন্ন ধরনের কাজের—পরিণাম।' ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ থেমে শংকিত দৃষ্টি মেলে ডাকাতনির দিকে তাকিয়ে রইল; দুটি সৈন্য থাকায় সে আর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ভেবে তাদের ভয় অনেকটা দূর হল। জনৈক চাষী কাঠ-কয়লা বেচে শহরে চা-টা খেয়ে তাদের সামনে এসে হাজির হল। বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সে কয়েদীকে একটি কোপেক দান করল। কয়েদী লজ্জায় লাল হয়ে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলল। সবাই তাকে দেখছে বুঝতে পেরে কয়েদীটি মুখ না ফিরিয়েই আড়চোখে সকলকে দেখতে লাগল: সকলে তাকে দেখছে এ কথা ভেবে সে খুশিই হল। বাইরের খোলা হাওয়ায়ও তার মনটা ভাল লাগল, কিন্তু সে হাঁটতে অভ্যস্ত নয় বলে কারাগারের বাজে জুতো পরে উঁচু-নীচু পাথুরে পথে হাঁটতে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। একটি শস্য-ব্যবসায়ীর দোকানের সামনে কতকগুলি পায়রা নির্বিঘ্নে চড়ে বেড়াচ্ছিল। সেখান দিয়ে যাবার সময় একটা ধূসর নীল পায়রার গায়ে তার পা লেগে যেতেই পায়রাটা পাখা মেলে তার কানের কাছ দিয়ে উড়ে গেল। তার পাখার বাতাস লাগল তার চোখে-মুখে। সে হাসল, আর তারপরেই নিজের অবস্থার কথা মনে করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অধ্যায়—২

কয়েদী মাসলভার জীবনের কাহিনী খুবই সাধারণ।

মাসলভার মা ছিল জনৈকা গ্রাম্য স্ত্রীলোকের অবিবাহিতা কন্যা; সে কাজ করত জমির মালিক দুজন অবিবাহিতা মহিলার গোশালায়। ঐ অবিবাহিতা স্ত্রীলোকটি প্রতি বছর একটি করে সন্তান প্রসব করত, এবং গ্রামে সাধারণত যে রকম হয়ে থাকে, সযত্নে দীক্ষিত হবার পরেই প্রত্যেকটি অবাঞ্ছিত শিশুকে তার মা নিজের কাজের অসুবিধা ঘটায় বলে অনাদরে অনাহারে মেরে ফেলত। এই ভাবে পাঁচটি শিশু মারা গেল। তাদের সকলেরই খৃস্টধর্মে দীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই পেটভরে খেতে না দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হল। ষষ্ঠ সন্তানের বাবা ছিল একটা ভবঘুরে জিপসি। তারও ঐ একই পরিণতি হত। কিন্তু ঘটনাক্রমে গরুর গন্ধওয়ালা মাখন বাইরে পাঠানোর দরুন গোশালার চাকরাণিদের বকুনি দেবার জন্য মহিলাদের একজন গোলাবাড়িতে এসে উপস্থিত হল। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান নবজাত শিশুটিকে নিয়ে স্ত্রীলোকটি গোয়ালের এক কোণে শুয়ে ছিল।

সবেমাত্র প্রসব হবার পরেই মেয়েটাকে গোয়াল-ঘরে ফেলে রাখার জন্য চাকরাণিদের আর এক প্রস্থ বকুনি লাগিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটি চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ শিশুটিকে দেখে তার মন গলে গেল এবং ছোট্ট মেয়েটির ধর্ম-মা হবার প্রস্তাব করল। ধর্ম-মেয়ের প্রতি করুণাবশতঃ সে তার মাকে দুধ ও কিছু টাকা দিল যাতে সে শিশুটিকে খাওয়াতে-পরাতে পারে। আর এইভাবে শিশুটি বেঁচে গেল। বৃদ্ধা মহিলারা তাকে ডাকত 'বাচনি' বলে। শিশুটির যখন তিন বছর বয়স তখন তার মা অসুখে পড়ে মারা গেল। সে তখন বুড়ি দিদিমার বোঝা-স্বরূপ হয়ে পড়ায় দুই কুমারী মহিলা তার কাছ থেকে শিশুটিকে নিয়ে এল।

ছোট্ট কালো-চোখ মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠল। সে এতই প্রাণোচ্ছল যে মহিলা দুটিরও তাকে খুব ভাল লেগে গেল।

দুই বোনের মধ্যে সোফিয়া আইভানভ্না ছোট। সে-ই মেয়েটির ধর্ম-মা হয়েছিল। দুই বোনের মধ্যে তার মনটাও ছিল বেশী দয়ালু; বড় বোন মারি আইভানভ্না বরং একটু কঠোর প্রকৃতির। সোফিয়া আইভানভ্না মেয়েটিকে ভাল জামা-কাপড় পরাত ও লেখাপড়া শেখাত; সে তাকে একটি মহিলার মত শিক্ষিতা করে তুলতে চায়। মারি আইভানভ্না মনে করে, শিশুটিকে ভাল করে কাজ-কর্ম শেখানো দরকার। সে যাতে ভাল দাসী হতে পারে তেমনি শিক্ষা দেওয়া উচিত। সে মেয়েটির প্রতি কঠোর ব্যবহার করে, শাস্তি দেয়, এমন কি রেগে গেলে ছোট্ট মেয়েটাকে মারে পর্যন্ত। এই দুই বিপরীত প্রভাবের মধ্যে বড় হবার জন্য সে হয়ে উঠল অর্ধেক দাসী আর অর্ধেক এক তরুণী মহিলা। তারা তাকে কাতয়ুশা বলে ডাকে, সেটা শুনতে কাতেংকা অপেক্ষা অমার্জিত, কিন্তু কাত্‌কার মত অতি সাধারণ নয়। সে সেলাই করে, ঘর পরিষ্কার করে, খড়ি দিয়ে মূর্তির ধাতব আধারগুলি পালিশ করে, আরও ছোটখাট কাজ করে, এবং কখনও কখনও বসে বসে মহিলাদের পড়েও শোনায়।

একাধিক বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, কিন্তু সে বিয়ে করবে না। সহজ সুখের জীবন যাপন করে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে ভাবে, যে সব মজুর তাকে বিয়ে করতে চায় তাদের স্ত্রী হয়ে জীবন কাটানো তার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে।

তার ষোল বছর বয়স পর্যন্ত এইভাবে কাটল। এই সময় বৃদ্ধ মহিলাদের ভাই-পো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এক ধনী যুবক রাজকুমার পিসীদের বাড়িতে কিছুদিন কাটাতে এল; আর কাতয়ুশা কোন কিছু না বুঝেই তার প্রেমে পড়ে গেল।

দু'বছর পরে সেই ভাই-পোটি সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যাবার আগে পিসীদের সঙ্গে চারটি দিন কাটিয়ে গেল; যাবার আগের রাতে সে কাতয়ুশাকে ভুলিয়ে পাপের পথে নিয়ে গেল এবং তার হাতে একখানি একশ' রুবলের নোট

দিয়ে চলে গেল। পাঁচ মাস পরে মেয়েটি নিশ্চিত বুঝতে পারল যে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। তারপর থেকেই সে সব কিছুর উপর বিরক্ত হয়ে উঠল, কেমন করে আসন্ন লজ্জা থেকে মুক্তি পাবে সেটাই হল তার একমাত্র চিন্তা ; মহিলাদের সেবায় আর তেমন মন নেই, সব কিছুতেই অবহেলার ভাব ; একবার তো সে তাদের প্রতি রুষ্ট ব্যবহারই করে বসল ; অবশ্য এটা যে কেমন করে ঘটল তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি এবং পরে সে জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে তাকে ছেড়ে দিতে বলল। খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে মহিলারা তাকে ছেড়ে দিল। তারপর সে এক পুলিশ-অফিসারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ পেল, কিন্তু সেখানেও মাত্র তিনটি মাস কাটাতে পারল, কারণ পুলিশ-অফিসারটির বয়স পঞ্চাশ হলেও সে তাকে জ্বালাতন করতে শুরু করল, এবং একদিন সে যখন খুবই বাড়াবাড়ি করে বসল তখন মেয়েটিও ক্ষেপে গিয়ে 'বোকা' ও 'বুড়ো শয়তান' বলে গালাগালি দিয়ে এমন জোরে তাকে ধাক্কা দিল যে অফিসারটি মাটিতে পড়ে গেল। এই কঠোর আচরণের জন্য তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। আর চাকরির খোঁজ করা বৃথা, কারণ তার প্রসবের সময় আসন্ন ; কাজেই সে এক বেআইনী মদের কারবারী গ্রাম্য ধাত্রীর বাড়ি আশ্রয় নিল। ভালভাবেই প্রসব হয়ে গেল ; কিন্তু ধাত্রীর হাতে গ্রামের একটি জ্বরের রোগী ছিল ; ফলে তার ছোঁয়াচ লেগে কাতয়ুশা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং পুত্রসন্তানটিকে বেওয়ারিশ ছেলেমেয়েদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হল। যে বুড়িটা তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল সে এসে জানাল যে ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে। কাতয়ুশা যখন ধাত্রীর কাছে গিয়েছিল তখন তার কাছে ছিল মোট একশ' সাতাশ রুবল ; সে রোজগার করেছিল সাতাশটি আর যে তাকে ভুলিয়েছিল সে দিয়েছিল একশ'। কিন্তু সেখান থেকে চলে যাবার সময় তার কাছে ছিল মাত্র ছ' রুবল ; সে টাকা রাখতে জানত না ; নিজেও খরচ করেছে, আবার যে চেয়েছে তাকেও দিয়েছে। দু'মাসের খাওয়া-পরা ও পরিচর্যার জন্য ধাত্রী নিয়েছিল চল্লিশ রুবল, বাচ্চাটাকে বেওয়ারিশদের হাসপাতালে ভর্তি করতে গেল পঁচিশ, আর একটা গরু কিনবার জন্য ধাত্রী কর্জ নিয়েছিল চল্লিশ। কুড়ি রুবলের মত খরচ হল কাপড়-চোপড়, মিষ্টি ও অন্যান্য খাতে। বেঁচে থাকবার মত কিছুই যখন রইল না তখন কাতয়ুশা আবার চাকরির খোঁজ করতে লাগল এবং এক বনরক্ষকের বাড়ি কাজ পেয়ে গেল। বনরক্ষক বিবাহিত লোক, তবু সে প্রথম দিন থেকেই তার পিছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু করল। কাতয়ুশা তাকে অপছন্দ করত এবং এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত। কিন্তু লোকটা তার মনিব, কাজেই তাকে যেখানে খুশি পাঠাতে পারত। তাছাড়া সে ছিল অভিজ্ঞ ও ধূর্ত, কাজেই তাকে বলাৎকার করার ব্যবস্থা করে ফেলল। কিন্তু তার স্ত্রী ব্যাপারটা ধরে ফেলল এবং কাতয়ুশা ও তার স্বামীকে একই ঘরে এক সঙ্গে পেয়ে কাতয়ুশাকে পিটতে শুরু করল। কাতয়ুশাও নিজেকে বাঁচাবার

চেষ্টা করল, ফলে লড়াই বেঁধে গেল এবং মাইনে না দিয়েই তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তখন সে শহরে তার এক খুড়ির কাছে গিয়ে রইল। তার খুড়ো একজন বই বাঁধার দপ্তরি। এক সময় তার অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সব খদ্দেরপত্তর হারিয়ে সে মদ ধরেছে এবং হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে সবই মদের দোকানে উড়িয়েছে।

খুড়ি একটা ছোট ধোবিখানা চালিয়ে কোন মতে নিজের, ছেলেমেয়েদের ও দুর্ভাগা স্বামীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করত। সে কাতয়ুশাকে ধোবার কাজ করতে বলল; কিন্তু খুড়ির অন্য ধোবাদের দুঃখ ও কষ্টের জীবন নিজের চোখে দেখে সে ইতস্তত করতে লাগল এবং একটা রেজিস্ট্রি আপিসে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিল। যে মহিলার কাছে তার চাকরির ব্যবস্থা হল তার দুটি ছেলে ব্যায়ামাগারের ছাত্র। সে-বাড়িতে ঢুকবার সাতদিন পরেই গোঁফওয়ালা বাড়ন্ত গড়নের বড ছেলেটা পড়াশুনা শিকেয় তুলে সারাক্ষণ কাতয়ুশার পিছনেই ঘুর ঘুর করতে লাগল। মা সব দোষ কাতয়ুশার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে নোটিশ দিল।

এই ভাবে একটা চাকরি জোগাড় করবার চেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হয়ে আবার সে রেজিস্ট্রি আপিসেই হাজির হল, আর সেখানেই একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তার মোটাসোটা খোলা হাতে ব্রেসলেট পরানো, এবং প্রায় সবগুলো আঙুলে একটা করে আংটি। কাতয়ুশার একটা কাজের খুব প্রয়োজন শুনে সে তাকে নিজের ঠিকানা দিয়ে বাড়িতে দেখা করতে বলল। কাতয়ুশা গেল। স্ত্রীলোকটি তাকে সাদরে গ্রহণ করল, কেক ও মিষ্টি মদ সামনে ধরে দিল এবং একটা চিরকুট লিখে চাকরের হাত দিয়ে কাকে যেন পাঠিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলা একটি দীর্ঘকায় লোক ঘরে ঢুকল। লম্বা পাকা চুল, সাদা দাড়ি। কাতয়ুশার পাশে বসে সে হাসতে লাগল আর চকচকে চোখ মেলে তাকে দেখতে লাগল। তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টাও করল। গৃহকর্ত্রী তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলে কাতয়ুশা শুনতে পেল সে বলছে, 'গ্রাম থেকে আনকোরা আনা হয়েছে।' তখন গৃহকর্ত্রী কাতয়ুশাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলল, লোকটি একজন লেখক, তার অনেক টাকা, আর মনে ধরলে সে কাতয়ুশাকে সব কিছু দিতে পারে। তার মনে ঠিকই ধরেছে; তার হাতে পঁচিশ রুবল দিয়ে বলে গেল, মাঝে মাঝেই আসবে। পঁচিশ রুবল দেখতে দেখতে খরচ হয়ে গেল; কিছুটা দিল খুড়িকে থাকা-খাওয়া বাবদ, আর বাকিটা দিয়ে কিনল একটা পোষাক, টুপি আর ফিতে। কয়েকদিন পরে লেখক তাকে ডেকে পাঠাল। সে গেল। সে তাকে আরও পঁচিশ রুবল দিল এবং একটা আলাদা বাসার ব্যবস্থা করে দিল।

লেখক যে বাসাটা ভাড়া করে দিয়েছিল তার পাশেই একটি হাসিখুশি যুবক দোকান-কর্মচারি থাকত। শীঘ্রই কাতয়ুশা তার প্রেমে পড়ে গেল। সব কথা লেখককে বলে সে নিজের একটা ছোট বাসায় চলে গেল। দোকান-

কর্মচারিটি কথা দিয়েছিল তাকে বিয়ে করবে; কিন্তু তাকে কিছু না জানিয়েই সে কাজ উপলক্ষ্যে নিঝনি নভ্‌গরদ চলে গেল; স্পষ্টতই সে তাকে ত্যাগ করল, আর কাতয়ুশা আবার একলা হয়ে পড়ল। নিজের চেষ্টাতেই সে ঐ বাসায় থাকতে চাইল, কিন্তু পুলিশ জানাল যে সে ক্ষেত্রে তাকে হলুদ (পতিতাবৃত্তির) পাসপোর্ট জোগাড় করতে হবে এবং ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে। অগত্যা সে খুড়ির কাছে ফিরে গেল। তার ভাল পোষাক, টুপি আর আলখাল্লা দেখে খুড়ি এবার আর তাকে ধোবার কাজ করতে বলল না। সে বুঝতে পারল যে মেয়েটা সে কাজের উপরে উঠে গেছে। ধোবার কাজ করতে হবে কি হবে না সে প্রশ্ন কাতয়ুশার মনেও এল না। সে করুণার চোখে সেই সব শুকনো, কঠোর পরিশ্রমী ধোবানীদের দেখতে লাগল যাদের মধ্যে কেউ কেউ এরই মধ্যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়েছে; তারা সাবানের বাষ্পে-ভরা সর্বদা ভিজে থাকা ভয়ংকর গরম সামনের ঘরটায় সরু সরু হাত দিয়ে কাপড় ধোলাই করছে অথবা ইস্ত্রি চালাচ্ছে। তার কপালেও এই কাজ জুটতে পারত এ কথা ভাবতেই সে শিউরে উঠল।

ঠিক এই সময়ে যখন কাতয়ুশা খুবই মুশকিলে পড়েছে, যখন কোন 'রক্ষাকর্তা'-রই আবির্ভাব ঘটছে না, তখন জনৈকা কুটনি তাকে খুঁজে বের করল।

কিছুদিন থেকেই কাতয়ুশা ধূমপান করতে শুরু করেছে, আর দোকান-কর্মচারি ছোকরা তাকে ছেড়ে যাবার পর থেকে সে ক্রমেই বেশী করে মদ খেতেও শিখেছে। মদের স্বাদ যে তাকে টানত তা ঠিক নয়, তবে মদ খেলে সে নিজের দুঃখকে ভুলে থাকতে পারত, মদ তাকে আরও স্বাধীন, আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলত, যে অনুভূতি স্বাভাবিক অবস্থায় তার হত না: মদ না খেলে সে বিষণ্ণ ও লজ্জিত বোধ করত।

কুটনি ভাল ভাল খাবার এনে খুড়িকে দিল, আর কাতয়ুশাকে এনে দিল মদ। সে মদ খেতে লাগল, আর সেই ফাঁকে কুটনি প্রস্তাব করল যে সে তাকে শহরের একটা মস্ত বড় পতিতালয়ে কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। সেখানকার অনেক রকম সুখ-সুবিধার কথাও সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল। কাতয়ুশার সামনে তখন দুটো পথ খোলা—হয় চাকরি করতে গিয়ে অপমানিত হওয়া, পুরুষের অত্যধিক মনোযোগে বিব্রত হওয়া এবং মাঝে-মধ্যে গোপন যৌন মিলনে সঙ্গিনী হওয়া; অথবা আইনসম্মত, সহজ, নিরাপদ অবস্থাকে মেনে নিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে প্রকাশ্যে নিয়মিত যৌনমিলনকে স্বীকার করা;—সে পরেরটাই বেছে নিল। তাছাড়া, তার মনে হল যেন এই পথে গেলেই সে তার পতনের প্রথম সঙ্গী, আর সেই দোকান-কর্মচারি এবং যে যেখানে তার ক্ষতি করেছে তাদের প্রত্যেকের উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে। আরও একটা বিষয় তাকে প্রলুব্ধ করল, তার সিদ্ধান্তকে

প্রভাবিত করল ; কুটনি তাকে বলেছে যে, তার নিজের পোষাকের অর্ডার সে নিজেই দিতে পারবে : ভেলভেট, রেশম, শাটিন, নীচু-গলা নাচের পোষাক—যা তার ইচ্ছা। কালো ভেলভেটের পাড়-বসানো উজ্জ্বল হলুদ রেশমের নীচু-গলা ও ছোট আস্তিনের পোষাকে সুসজ্জিত নিজের ছবিটা মনের চোখে দেখে সে সব ভুলে গেল ; পাসপোর্টখানা দিয়ে দিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলায়ই কুটনি একখানি 'ইজভজচিক' গাড়ি নিয়ে এল এবং তাতে চড়িয়ে কাতয়ুশাকে নিয়ে গেল মাদাম কিতায়েভার কুখ্যাত ভবনে।

সেদিন থেকেই কাতয়ুশা মাসলভার পক্ষে শুরু হল মানুষের এবং ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট আইনের বিরোধী এক দীর্ঘ-প্রচলিত পাপের জীবন, হাজার হাজার নারী যে জীবন যাপন করে, মানুষের কল্যাণ-কামনায় উৎকণ্ঠ সরকার যে জীবনকে শুধু সহ্যই করে না, সমর্থনও করে, প্রতি দশটির মধ্যে ন'টি নারীর পক্ষেই যে জীবনের পরিণাম যন্ত্রণাদীর্ণ রোগ, অকাল বার্ধক্য ও মৃত্যু।

সারা রাতের সুখ-সম্ভোগের পরে বিকেল পর্যন্ত গভীর ঘুম। তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত চলে নোংরা বিছানা থেকে ক্লান্ত জাগরণ, সোডার জল, কফি, বেড-গাউন ও ড্রেসিং-জ্যাকেট পরে ঘরের মধ্যে উদাস পায়চারি, ঝোলানো পর্দার পিছন থেকে জানালা দিয়ে অলস দৃষ্টিপাত, নিজেদের মধ্যে অনর্থক ঝগড়াঝাটি ; তারপর হাত-মুখ ধোয়া, শরীর ও চুলকে সুগন্ধি করা, পোষাক পরা, তা নিয়ে আবার বাড়িউলির সঙ্গে ঝগড়া, আয়নায় নিজেকে দেখা, মুখে রং মাখা ও ভুরুতে টান দেওয়া ; ভাল ভাল দামী খাবার ; তারপর শরীরের অনেকখানি খোলা রেখে ঝকমকে রেশমের পোষাক পরে সুসজ্জিত ও উজ্জ্বল-আলোকিত ড্রয়িং-রুমে নেমে যাওয়া ; তারপর দর্শনার্থীর আগমন, গান, নাচ এবং বৃদ্ধ, যুবক ও মাঝবয়সী, ছোকরা ও অথর্ব বৃদ্ধ, অবিবাহিত, বিবাহিত, ব্যবসায়ী, কেরাণী, আর্মেনীয়, ইহুদি, তাতার ; ধনী ও দরিদ্র, রুগ্ন ও স্বাস্থ্যবান, মাতাল ও স্থিরবুদ্ধি, কর্কশ ও নরম, সামরিক ও অসামরিক, ছাত্র ও নেহাৎ স্কুলের ছেলে—সব শ্রেণীর. সব বয়সের, সব চরিত্রের পুরুষের সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া। চীৎকার-চেঁচামেচি ও হাসি-তামাসা, কোন্দল, আর গান, তামাক ও মদ এবং মদ, তামাক ও গান, সন্ধ্যা থেকে দিনের আলো পর্যন্ত, সকালের আগে বিশ্রাম নেই, আর তারপরে আবার গভীর ঘুম ; প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ—একই অবস্থা। তারপর সপ্তাহের শেষে যেতে হয় সরকার প্রতিষ্ঠিত থানায়, সেখানে ডাক্তাররা—তারাও সরকারী চাকুরে—কখনও কঠোরভাবে গুরুত্বের সঙ্গে, কখনও বা খেলা-খেলা হেলা ভরে, আত্মরক্ষার জন্য যে শ্লীলতায় শুধু মানুষের নয় পশুরও অধিকার আছে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এই সব মেয়েদের পরীক্ষা করে এবং যে পাপ তারা ও তাদের সহযোগীরা সপ্তাহভরে করেছে সেটাকে চালিয়ে যাবার লিখিত

অনুমতি দিয়ে দেয়। তারপর সেই একই ভাবের আর একটি সপ্তাহ কাটে : কি গ্রীষ্ম কি শীত, কাজের দিন কি ছুটির দিন, প্রতিটি রাতের একই রূপ।

আর এইভাবে কাতয়ুশা মাসলভার সাতটি বছর কেটে গেল। এর মধ্যে সে সামনে-পিছনে বার দুই বাড়ি বদল করেছে, ও একবার হাসপাতালে গেছে। পতিতালয়ের জীবনের সপ্তম বছরে, যখন তার বয়স ছাব্বিশ বছর, এমন কিছু ঘটল যার ফলে তাকে কারাগারে আটক করা হয় এবং তিন মাসাধিক কাল চোর ও খুনীদের সঙ্গে কারাগারের শ্বাসরোধকারী বাতাসে বন্দী থাকবার পর এখন তাকে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অধ্যায়—৩

দীর্ঘ পথ হেঁটে ক্লান্ত শরীরে মাসলভা যখন সৈনিক দুটির সঙ্গে বিচারালয়ে পৌছল, ওদিকে তখন প্রিন্স দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌লয়ুদভ, যে তাকে একদিন ভুলিয়েছিল, সুউচ্চ পালংকের স্প্রিংয়ের গদীর উপর পালকের শয্যায় পরিষ্কার ধবধবে ইস্ত্রি-করা সুতির নাইট-শার্ট পরে শুয়েছিল, আর একটা সিগারেটে টান দিতে দিতে ভাবছিল, আজ তাকে কি কি করতে হবে এবং গতকাল কি কি ঘটেছিল।

গত সন্ধ্যাটা সে বিত্তবান অভিজাত পরিবার কর্চাগিনদের সঙ্গে কাটিয়েছিল। সকলেই আশা করে যে তাদের মেয়েকেই সে বিয়ে করবে। এ কথা মনে পড়তেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল এবং সিগারেটের শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়ে রূপোর কেস থেকে আর একটা সিগারেট বের করতে গেল ; কিন্তু সে ইচ্ছা পরিবর্তন করে মসৃণ সাদা পা দুটি বিছানা থেকে নামিয়ে চটির ভিতর গলিয়ে দিল, মাংসল কাঁধের উপর রেশমের ড্রেসিং-গাউনটা চাপাল, এবং ভারী, দ্রুত পদক্ষেপে ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করল। ঘরটা ইউ ডি কোলোনের গন্ধে ভর্তি। সেখানে সে সযত্নে একটা বিশেষ দাঁতের মাজন দিয়ে দাঁতগুলি (তার অনেকগুলিই বন্ধ করা) পরিষ্কার করল এবং সুগন্ধি জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিল। তারপর সুগন্ধি সাবানে হাত দুটি ধুয়ে বিশেষ যত্নসহকারে লম্বা নখগুলি পরিষ্কার করল, শ্বেত পাথরের ওয়াশস্ট্যাণ্ডে মুখ ও শক্ত গলাটা ধুয়ে ফেলল, এবং যে তৃতীয় কক্ষে স্নানের ধারাযন্ত্রটি ছিল সেখানে গেল। স্নানের ফলে মোটাসোটা, সাদা, পেশীবহুল দেহটা ঝরঝরে হলে একটা খসখসে তোয়ালে দিয়ে জলটা মুছে নিয়ে সূক্ষ্ম তলবাস ও ঝকঝকে জুতো পরে নিল এবং ছোট কালো দাড়ি এবং কপালের কাছে পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়ানো চুলটা ব্রাশ করবার জন্য আয়নার সামনে গিয়ে বসল।

যা কিছু সে ব্যবহার করে, তার সব রকম প্রসাধন-দ্রব্য—তার কাপড়, জুতো, নেক-টাই, পিন, বোতাম—সবই সেরা জিনিস, খুব শান্ত, সরল, দীর্ঘস্থায়ী ও দামী।

নানা রকমের দশটা টাই ও পিনের মধ্য থেকে সে যেটার উপর প্রথম হাত পড়ল সেটাই তুলে নিল। এক সময় ছিল যখন এর সবগুলিই তার কাছে নতুন ও আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু এখন তার কাছে সবই সমান হয়ে উঠেছে।

যে পোষাকগুলি ব্রাশ করে চেয়ারের উপর রাখা ছিল নেখ্‌লয়ুদভ সেগুলিই পরল; তারপর খুব ঝরঝরে বোধ না করলেও পরিচ্ছন্ন ও সুরভিত হয়ে খাবার ঘরে গেল। সিংহের থাবার আকারে কুঁদে-তোলা চারটি পায়ার উপরে বসানো টেবিলটা দেখতে খুবই জমকালো। তার সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি একটা মস্তবড় পাশ-দেরাজও রয়েছে। গতকালই আয়তাকার ঘরের মেঝেটা তিনজন লোক পালিশ করে দিয়ে গেছে। একখানি সূক্ষ্ম ধপধপে-ধোয়া মনোগ্রাম-আঁকা চাদরে ঢাকা টেবিলটার উপরে সুগন্ধি কফিপূর্ণ রূপোর কফি-পাত্র, চিনির পাত্র, গরম মাখনভরা জগ, এবং তাজা রুটি, চাপাটি ও বিস্কুটে ভর্তি রুটির ঝুড়িটা সাজানো রয়েছে; আর প্লেটের পাশেই রয়েছে খবরের কাগজ Revue des Deux Mondes-এর সর্বশেষ সংখ্যাটি ও কিছু চিঠিপত্র।

নেখ্‌লয়ুদভ চিঠিগুলো খুলতে যাবে এমন সময় শোক-পোষাক পরিহিতা একটি শক্ত-সমর্থ মাঝবয়সী স্ত্রীলোক সিঁথির চুল-উঠে-যাওয়া অংশটাকে একটা লেসের টুপিতে ঢেকে যেন ঘরের ভিতর ভেসে এল। স্ত্রীলোকটি নেখ্‌লয়ুদভের মায়ের সখী আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না। সম্প্রতি এই বাড়িতেই তার কর্ত্রীঠাকরুণের মৃত্যু হওয়ায় সে ছেলের গৃহস্থালি দেখবার জন্য এখানেই রয়ে গেছে।

আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না বিভিন্ন সময়ে প্রায় দশটা বছর নেখ্‌লয়ুদভের মায়ের সঙ্গে বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। ফলে তার চেহারায় ও চাল-চলনে একটা মহিলাসুলভ ভঙ্গী এসেছে। শিশুকাল থেকেই সে নেখ্‌লয়ুদভদের পরিবারে আছে এবং দিমিত্রি আইভানভিচকে যখন মিতেংকা বলে ডাকা হত তখন থেকেই তাকে চেনে।

'শুভ সকাল, দিমিত্রি আইভানভিচ!'

'শুভ সকাল, আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না! ব্যাপার কি?' নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

'প্রিন্সেসের চিঠি—হয় মা লিখেছেন, নয় তো মেয়ে। কিছুক্ষণ আগে দাসী চিঠিটা নিয়ে এসেছে। সে এখন আমার ঘরেই অপেক্ষা করছে,' অর্থপূর্ণ হাসি হেসে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না জবাব দিল।

নেখ্‌লয়ুদভ চিঠিটা নিল; আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার হাসি দেখে ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঠিক আছে, এক সেকেণ্ড!'

সে হাসির অর্থ চিঠিটা লিখেছে তরুণী প্রিন্সেস কর্চাগিনা, আর আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার আশা তাকেই সে বিয়ে করবে। তার এই ধারণায় নেখ্‌লয়ুদভ বিব্রত বোধ করে।

'তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে বলি গে', এই কথা বলে রুটি-ব্রাশটাকে

ঠিক জায়গায় তুলে রেখে আগ্রাফেনা পেত্রভ্না যেন ভাসতে ভাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নেখ্লয়ুদভ সুগন্ধি চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

পুরু ধূসর কাগজে বেশ ফাঁক ফাঁক করে কোণাকুণিভাবে চিঠিটা লেখা। তাতে আছে:

'তোমার স্মৃতির দায়িত্বভার গ্রহণ করে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আজ এপ্রিলের ২৮ তারিখে তোমাকে জুরি হিসেবে আদালতে উপস্থিত থাকতে হবে; ফলে তোমার স্বভাবসিদ্ধ খামখেয়ালির বশে তুমি কাল কথা দিয়ে থাকলেও আজ কোন মতেই আমাদের এবং কলসভের সঙ্গে চিত্র প্রদর্শনীতে যেতে পারছ না; যথা সময়ে হাজির না হবার দরুণ a´ moins que vous ne soyez dispose´ a´ payer a´ la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous refusez pour votre cheval, (তুমি যদি জরিমানা স্বরূপ ৩০০ রুবল, যেটা যে ঘোড়াটা তুমি কিনতে পারনি তার দামের সমান, দায়রা আদালতকে দিতে রাজী থাক তো স্বতন্ত্র কথা)। কাল রাতে তুমি চলে যাবার পরে কথাটা মনে পড়ল, কাজেই ভুলো না যেন।—প্রিন্সেস এম. কর্চাগিনা।'

অপরদিকে পুনশ্চ দিয়ে লেখা:

'Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'a´ la nuit. Venez absolument a' quelle heure que cela soit. (মার কথামত জানাচ্ছি, রাত পর্যন্ত তোমার আসনটা তোমার জন্য রাখা থাকবে। যখনই হোক তুমি অবশ্য আসবে।)—এম. কে.

নেখ্লয়ুদভ মুখভঙ্গী করল। অদৃশ্য সুতোয় তাকে ক্রমাগত শক্ত করে বেঁধে ফেলবার জন্য প্রিন্সেস কর্চাগিনা দুটি মাস ধরে যে সুনিপুণ কৌশল-জাল বিস্তার করে চলেছে এই চিঠিটা তারই জের মাত্র। কিন্তু খুব বেশী প্রেমে না পড়লে যৌবনোত্তর পুরুষের পক্ষে বিয়ের ব্যাপারে যে স্বাভাবিক ইতস্তত ভাব থাকে তা ছাড়াও নেখ্লয়ুদভের দিক থেকে এমন কিছু কারণ ছিল যার জন্য বিয়েতে মনস্থির করে থাকলেও এই মুহূর্তে বিয়ের প্রস্তাব করতে সে পারছে না। দশ বছর আগে সে যে মাসলভাকে ফুসলিয়ে এনে তারপর পরিত্যাগ করেছিল সেটা কোন কারণই নয়; সে কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে। আর সেটাকে সে বিয়ে না করার কারণ বলেও মনে করত না। না! আসল কারণ হল একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল, এবং সে যদিও মনে করে যে সে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে, স্ত্রীলোকটি তা মনে করে না।

স্ত্রীলোকের ব্যাপারে নেখ্লয়ুদভ একটু লাজুক প্রকৃতির, আর তার এই লাজুকতাই নেখ্লয়ুদভের ভোট-কেন্দ্রের বিদেশী অভিজাত মার্শালের দুর্নীতিপরায়ণা বিবাহিত স্ত্রীর মনে তাকে পরাজিত করবার কামনা জাগিয়ে

তুলেছিল। এই নারী এমন ভাবে তাকে কাছে টানল যে ক্রমেই সে শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়তে লাগল, আর প্রতিটি দিনই তার পক্ষে অপ্রীতিকর হয়ে উঠল। লালসার কাছে হার মেনে নেখ্‌ল্যুদভের মনে অপরাধবোধ জাগল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির সম্মতি ছাড়া সে বন্ধন ছিন্ন করবার সাহস তার ছিল না। আর সেই কারণেই ইচ্ছা থাকলেও তরুণী প্রিন্সেস কর্চাগিনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবার স্বাধীনতা তার ছিল না।

টেবিলের উপরকার চিঠিগুলির মধ্যে একখানা ছিল ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীর। তার হাতের লেখা ও ডাকঘরের ছাপ দেখেই নেখ্‌ল্যুদভের মুখ লাল হয়ে উঠল, সে বুঝতে পারল তার ক্ষমতা জেগে উঠছে; কোন বিপদের সম্মুখীন হলেই এমনিভাবে তার ভিতর শক্তির জাগরণ ঘটে।

কিন্তু তার উত্তেজনা সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেল। যে অঞ্চলে তার সব চাইতে বড় সম্পত্তি রয়েছে সেখানকার ঐ মার্শালটি নেখ্‌ল্যুদভকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, মে মাসের শেষ নাগাদ একটা বিশেষ সভা হবে, এবং এখানে স্কুল ও রাস্তাঘাট সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হবে নেখ্‌ল্যুদভ যেন তাতে হাজির হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে না ভোলে, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল দলের পক্ষ থেকে জোরালো প্রতিবাদ হবে বলে আশংকা হচ্ছে।

মার্শাল নিজে উদারপন্থী; তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে যে প্রতিক্রিয়ার ধারা প্রবহমান কিছু স্বমতের লোকের সহায়তায় সে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। এই লড়াইয়ে সে এতই মেতে আছে যে নিজের পারিবারিক দুর্ভাগ্য সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

এই মানুষটার ব্যাপারে যে সব ভয়ংকর মুহূর্ত তাকে কাটাতে হয়েছে সব নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল: মনে পড়ল, একদিন তার মনে হয়েছিল যে স্বামীটি তাকে ধরে ফেলেছে এবং সেই মুহূর্তেই তাকে যুদ্ধে আহ্বান করবে, আর সেও মনস্থির করে ফেলেছিল যে বাতাসে 'ফাঁকা' আওয়াজ করবে; মনে পড়ল সেই ভয়ংকর দৃশ্য যেখানে স্ত্রীলোকটি হতাশায় ডুবে মরবার জন্য পার্কের দিকে ছুটে গিয়েছিল আর সেও ছুটে গিয়েছিল তাকে খুঁজতে।

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'ঠিক আছে, স্ত্রীলোকটি কিছু না জানানো পর্যন্ত আমি তো এখন যেতে পারি না, বা কিছু করতেও পারি না।' এক সপ্তাহ আগেই সে স্ত্রীলোকটিকে একখানি চূড়ান্ত চিঠি লিখে নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবার ইচ্ছাও জানিয়েছে; সেই সঙ্গে আরও জানিয়েছে যে 'তার ভালর জন্যই' তাদের সম্পর্কেরও ইতি হয়ে গেছে। সে চিঠির কোন জবাব এখনও সে পায় নি। এটা ভাল লক্ষণও হতে পারে, কারণ স্ত্রীলোকটি যদি সম্পর্কচ্ছেদ করতে সম্মত না হত তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিত, অথবা—যেমন এর আগে করেছে—নিজেই চলে আসত। নেখ্‌ল্যুদভ শুনেছে, জনৈক অফিসার এখন তার উপর বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে; এতে

তার মনে ঈর্ষার উদ্রেগ হয়ে সে কিছুটা যন্ত্রণা পেলেও যে মিথ্যাচারের জীবন সে যাপন করছিল তার কবল থেকে মুক্তিলাভের আশা তাকে উৎসাহিত করেছে।

"পরের চিঠিটা লিখেছে তার প্রধান সরকার। সরকার জানিয়েছে, দখল নেবার জন্য নেখ্‌ল্যুদভকে অবশ্যই জমিদারি পরিদর্শনে যেতে হবে; তাছাড়া তার মা বেঁচে থাকতে জমিজমার যে বিলি-ব্যবস্থা ছিল তাই ভবিষ্যতে চলবে, না যেমন সে (সরকার) পরলোকগতা প্রিন্সেসকে জানিয়েছে এবং এখনও প্রিন্সকে পরামর্শ দিচ্ছে যে বরং গো-মহিষাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করে যে সব জমি চাষীদের বিলি করা হয়েছে সে সবই প্রিন্স নিজে চাষবাস করুন, সে সম্পর্কেও একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সরকার লিখেছে, এই ব্যবস্থায় জমিজমা পরিচালনা অনেক বেশী লাভজনক হবে; সেই সঙ্গে ১লা তারিখে খাজনার যে তিন হাজার রুবল পাঠাবার কথা সেটা না পাঠাবার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাও করেছে। পরের ডাকেই টাকাটা পাঠানো হবে। চাষীরা এতটা অনির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে যে এ ব্যাপারে তাকে শাসন-কর্তৃপক্ষের শরণ নিতে হয়েছিল, আর সেই জন্য টাকাটা পেতে দেরী হওয়াই এই বিলম্বের হেতু। চিঠির খানিকটা খারাপ, খানিকটা ভাল। এত বিস্তর সম্পত্তির সে মালিক এ কথা ভাবতেও ভাল লাগে, আবার খারাপও লাগে, কারণ সে হার্বার্ট স্পেন্সারের একজন উৎসাহী সমর্থক। সে নিজের প্রকাণ্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; কাজেই 'সোস্যাল স্ট্যাটিক্‌স্‌' বইতে স্পেন্সার যখন প্রচার করে যে ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ তখন তার দ্বারা সে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় এবং সেই বয়সের একরোখা দৃঢ়তায় জমিকে যে কখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য করা চলে না এ কথা শুধু মুখে বলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, সেই দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজও করেছে; ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা অন্যায় বিবেচনা করে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ৫০০ একর জমি সে চাষীদের বিলিয়ে দিয়েছিল। এখন মায়ের প্রকাণ্ড সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার পরে দুটোর যে কোন একটা তাকে বেছে নিতে হবে: দশ বছর আগে যেমন বাবার জমি ছেড়ে দিয়েছিল সেই রকম এখনও সব জমি ছেড়ে দেওয়া, অথবা নিঃশব্দে স্বীকার করে নেওয়া যে তার আগেকার চিন্তা-ভাবনাগুলি ছিল ভ্রান্ত ও মিথ্যা।

প্রথমটা সে বেছে নিতে পারে না, কারণ ভূসম্পত্তি ছাড়া তার আর কোন আয়ের পথ নেই (সরকারী চাকরির কথা সে কখনও ভাবে নি); তার উপর যে বিলাসবহুল অভ্যাস সে গড়ে তুলেছে সেগুলো সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। তাছাড়া, সে সব প্রেরণাও আর নেই; দৃঢ় প্রত্যয়, যৌবনের স্থিরসংকল্প, আর অসাধারণ কিছু করবার উচ্চাকাংখা—সে সব বিদায় নিয়েছে। আর দ্বিতীয় পথ, অর্থাৎ স্পেন্সারের 'সোস্যাল স্ট্যাটিক্‌স্‌' বই থেকে জমিদারী

প্রথার ন্যায়হীনতার যে সব স্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত প্রমাণ সে আহরণ করেছিল, এবং পরবর্তীকালে হেনরি জর্জের লেখায় যার-সার্থক সমর্থন সে খুঁজে পেয়েছিল, সে সব কিছু থেকে চোখ বুঁজে থাকা—সে পথে চলাও তার পক্ষে অসম্ভব।

আর সেই জন্যই সরকারের চিঠি তার ভাল লাগে নি।

অধ্যায়—৪

কফি শেষ করে নেখ্‌লয়ুদভ সমনটায় একবার চোখ বুলিয়ে কখন তাকে আদালতে হাজির হতে হবে সেটা দেখে নিতে এবং প্রিন্সেসের চিঠির জবাব লিখতে পড়ার ঘরে চলে গেল। স্টুডিওর ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ইজেলের সামনে একখানা অসমাপ্ত ছবি এবং দেয়ালে ঝোলানো কয়েকটা রেখা-চিত্র দেখে শিল্প-সাধনায় এগিয়ে যাবার অক্ষমতা, শক্তির অভাবের একটা অনুভূতি তাকে ছেয়ে ফেলল। ইদানীংকালে এ ধরনের অনুভূতি তার প্রায়ই হয়, এবং সেটা তার সূক্ষ্ম উন্নত নান্দনিক রুচিবোধের জন্যই হয় বলে সে মনে করে। তথাপি অনুভূতিটা খুবই অস্বস্তিকর।

এর সাত বছর আগে সে সামরিক চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। তখন তার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে তার শিল্প-প্রতিভা আছে এবং সেই শৈল্পিক উচ্চতার আসন থেকে আর সব রকম কাজকে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে সে রকম করবার কোন অধিকার তার ছিল না; কাজেই যে সব জিনিস তাকে সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সে সবই তার কাছে অপ্রীতিকর। ভারাক্রান্ত মনে সে স্টুডিওর বিলাসবহুল সাজসরঞ্জামগুলো দেখতে লাগল। কাজেই আরাম, সুবিধা ও দৃষ্টি-সৌন্দর্যের দিকে চোখ রেখে গড়ে তোলা মস্ত বড় উঁচু সিলিং-এর স্টাডি-রুমে যখন সে ঢুকল তখনও তার মনের অবস্থা খুব সুখকর নয়।

মস্তবড় লেখার টেবিলের 'জরুরী' লেবেল-মারা খোপের মধ্যে সে সমনটা দেখতে পেল। বেলা এগারোটায় তাকে আদালতে হাজির হতে হবে।

নেখ্‌লয়ুদভ প্রিন্সেসের চিঠির জবাব লিখতে বসে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে খাবারের সময় উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করবে বলে জানিয়ে দিল। একটা চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলল, কারণ তার মনে হল চিঠিটায় বড় বেশী অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছে। আর একটা লিখল, কিন্তু মনে হল সেটা বড় বেশী নিস্পৃহ; তার ভয় হল এতে প্রিন্সেস অসন্তুষ্ট হতে পারে, কাজেই সেটাও ছিঁড়ে ফেলল। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটা টিপতেই একটি বয়স্ক বিষণ্ন-দর্শন লোক ঘরে ঢুকল; তার মুখে গোঁফ আছে, কিন্তু থুতনি ও ঠোঁট কামানো, পরণে একটা ধূসর রঙের সুতির এপ্রন।

'একটা ইজভজচিক ডাকুন তো...

'দিচ্ছি স্যার।'

'আর কর্চাগিনদের বাড়ির যে দাসীটি অপেক্ষা করছে তাকে বলে দিন, আমন্ত্রণের জন্য আমি বাধিত হয়েছি এবং সেখানে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'এটা ভদ্রতাসম্মত নয়, কিন্তু আমি লিপে জানাতে পারছি না। যেমন করেই হোক, আজ তার সঙ্গে দেখা করব,' এই কথা ভাবতে ভাবতে নেখ্‌ল্যুদভ ওভারকোটটা আনতে গেল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখল, তার পরিচিত রবার-টায়ার লাগানো একটা ইজভজচিক দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করছে। অর্ধেকটা ঘুরে লোকটা বলল, 'কাল আপনি প্রিন্স কর্চাগিনের বাড়ি থেকে চলে যাবার ঠিক পরমুহূর্তেই আমি সেখানে হাজির হয়েছিলাম; দরোয়ান বলল, এই মাত্র চলে গেলেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'দেখছি ইজভজচিকওয়ালারাও কর্চাগিনদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা জেনে গেছে।' সেই সঙ্গে প্রিন্সেস কর্চাগিনকে বিয়ে করবে কিনা সে প্রশ্নটা আবার তার মনে এল এবং তৎকালীন আরও অনেক প্রশ্নের মতই এটারও কোন নিষ্পত্তি করতে পারল না।

ঘর-গৃহস্থালির আরাম তো আছেই, তাছাড়াও বিয়ে করলে একটা সৎ জীবন যাপন করা সম্ভব হবে এবং সে আশা করে যে একটি পরিবার—তার ছেলেমেয়ে—সবাই তার বর্তমানের শূন্য জীবনে একটা দিশা এনে দেবে, সাধারণভাবে বিয়ের স্বপক্ষে এটাই বড় যুক্তি। আর সাধারণভাবে বিয়ের বিপক্ষে রয়েছে প্রথম যৌবনোত্তর অবিবাহিত-পুরুষদের মনের স্বাধীনতা হারাবার ভীতি এবং স্ত্রীলোক নাম্নী রহস্যময়ী জীবটি সম্পর্কে একটা অচেতন আতংক।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে, মিসি-কে (তার নাম মারিয়া, কিন্তু বিশেষ বিশেষ যুগলের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাকেও একটা ডাক-নাম দেওয়া হয়েছে) বিয়ে করার স্বপক্ষে আরও একটা যুক্তি আছে; সে ভাল বংশের মেয়ে, এবং চলন, বলন ও হাসির ভঙ্গী—সব ব্যাপারেই সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা (কোন অসাধারণ গুণের জন্য নয়, তার কারণ 'ভাল শিক্ষা-দীক্ষা'—এই গুণটার অন্য কোন নাম তার জানা নেই, যদিও এটাকে সে খুবই মূল্য দিয়ে থাকে); তাছাড়া মিসি অন্যের চেয়ে তার কথাই বেশী ভাবে, কাজেই তাকে ঠিক-ঠিক বোঝেও। এই যে তাকে ঠিক মত বোঝা, তার উচ্চতর মূল্যকে স্বীকার করা, নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এটাই তার শুভবুদ্ধি ও নির্ভুল বিচার-শক্তির প্রমাণ। বিশেষ করে মিসিকে বিয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি হল, তার চাইতে উচ্চতর গুণসম্পন্না কোন মেয়ে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; তার বয়স সাতাশ হয়ে গেছে, আর সম্ভবত সেই তার প্রথম প্রেমিক নয়। এই শেষ কথাটা তার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক। এমন কি অতীত জীবনেও সে অপর কাউকে ভালবেসেছে, এই চিন্তার সঙ্গে তার গর্ববোধকে সে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে

পারছে না। অবশ্য তার সঙ্গে মিসির হয় তো আর কোন দিন দেখা হবে না, কিন্তু সে যে আর কাউকে ভালবাসতে পারে এই চিন্তাই তার পক্ষে অসহ্য।

কাজেই বিয়ের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তার যুক্তির সংখ্যা সমান ; অন্ততঃ নেখ্‌ল্‌যুদভের কাছে দু'দিকই সমান ভারি ; তাই সে নিজেই নিজেকে ঠাট্টা করে বলে —উপকথার গাধা যে কোন্ খড়ের গাদায় মুখ দেবে তাই ঠিক করতে পারে না।

সে নিজে নিজেই বলতে লাগল, 'যাই হোক না কেন, মারিয়া ভাসিল্‌য়েভ্‌না (মার্সালের স্ত্রী)-র কাছ থেকে কোন চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত এবং তার পাট একেবারে চুকিয়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারি না। আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করতে সে পারে, এমন কি দেরী তাকে করতেই হবে, এই বিশ্বাস তাকে অনেকটা স্বস্তি এনে দিল।

'দেখা যাক, এ সবই পরে ভেবে দেখব', সে যখন নিজের মনে এই সব বলছে ততক্ষণে গাড়িটা অ্যাসফল্ট বাঁধানো পথ ধরে নিঃশব্দে চলতে চলতে আদালতের দরজায় হাজির হল।

'এবার আমি সুবিবেচনার সঙ্গে আমার কর্তব্য পালন করব ; সব সময়ই আমি তা করে থাকি, কারণ সেটাই উচিত বলে মনে করি।' দ্বার-রক্ষককে পার হয়ে সে আদালতের হলে প্রবেশ করল।

অধ্যায়—৫

আদালতের বারান্দাগুলি ইতিমধ্যেই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। পরিচারকরা হরেক রকম সংবাদ ও কাগজপত্র নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে সশব্দে আসা-যাওয়া করছে। হাজিরা-ঘোষণাকারী, অ্যাডভোকেট ও আইন-পরামর্শদাতারা ইতস্তত চলাফেরা করছে। ফরিয়াদীরা এবং হাজত-মুক্ত আসামীরা হয় বিষণ্ণ মনে হেঁটে বেড়াচ্ছে, নয়তো বসে বসে অপেক্ষা করছে।

নেখ্‌ল্‌যুদভ জনৈক পরিচালককে জিজ্ঞাসা করল, 'আদালত কক্ষটা কোন্ দিকে ?'

'কোন্‌টা ? দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুটো আদালত আছে।'

'আমি একজন জুরী।'

'তাহলে ফৌজদারী আদালত বলুন। ডানদিকে গিয়ে তারপর বাঁয়ে—দ্বিতীয় দরজা।'

নেখ্‌ল্‌যুদভ নির্দেশ মত এগিয়ে গেল।

উল্লেখিত দরজায় দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন লম্বা, মোটা, দয়ালু-হৃদয় এক ব্যবসায়ী, দেখলেই বোঝা যায় বেশ খানা-পিনা করে এসেছে, তাই মন-মেজাজ বেশ শরিফ। অপরজন ইহুদিবংশীয় একটি

দোকান-কর্মচারী। তারা তুলোর দাম নিয়ে আলোচনা করছিল, এমন সময় নেখ্‌ল্যুদভ সেখানে এসে জানতে চাইল সেটাই জুরীদের ঘর কি না।

'হ্যাঁ মশাই, এটাই। আপনিও আমাদেরই একজন তাহলে? জুরীতেই আছেন তো?' খুশিতে চোখ ঠেরে ব্যবসায়ীটি জিজ্ঞাসা করল।

নেখ্‌ল্যুদভ সম্মতিসূচক জবাব দিলে সে বলে উঠল, 'খুব ভাল, সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজ করা যাবে।' তারপর চওড়া নরম হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম বাকলাশভ, দ্বিতীয় গিল্ডের একজন ব্যবসায়ী। আমাদের সাধ্যমত কাজ করব!......তাহলে কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য আমার হল?'

নেখ্‌ল্যুদভ নিজের নামটা বলে জুরীদের ঘরে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে নানা ধরনের প্রায় দশ জন লোক ছিল। সকলে সবেমাত্র পৌঁচেছে; কেউ বসে আছে, কেউ পায়চারি করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছে, পরিচয়-বিনিময় করছে। একজন ইউনিফর্মধারী অবসারপ্রাপ্ত কর্ণেল, জনাকয়েকের পরনে ফ্রক-কোট, কারও বা মর্নিং-কোট, আর একজনের গায়ে চাষীর পোষাক।

একটা সরকারী কর্তব্য পালনের খুশির ভাব তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে; অবশ্য অনেককেই কাজকর্ম ফেলে আসতে হয়েছে এবং অনেকেই তা নিয়ে অভিযোগও করছে।

আবহাওয়ার কথা, প্রথম বসন্তের কথা, আর ব্যবসার ভাল-মন্দ নিয়েই জুরীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে: অনেকের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেছে, অনেকে আবার পরস্পরের পরিচয় নিয়ে মনে মনে চিন্তা করছে। নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই তারা তড়িঘড়ি পরিচয়টা সেরে নিল। কারণ তাদের কাছে এটা একটা মর্যাদার ব্যাপার; আর নেখ্‌ল্যুদভ এটাকে তার প্রাপ্য হিসাবেই গ্রহণ করল,—অপরিচিতদের মধ্যে এলে সে সব সময়ই তাই করে থাকে। অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে তুলনায় সে নিজেকে বড মনে করে কেন, এ প্রশ্ন করলে সে কোন জবাব দিতে পারবে না, কারণ তার জীবন বিশেষ প্রতিভার কোন স্বাক্ষর বহন করে না। সে ঠিক জায়গায় টান দিয়ে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষা বলতে পারে, এবং ব্যয়বহুল দোকান থেকে কেনা সবসেরা পোষাক-পরিচ্ছদ, টাই ও বোতাম ব্যবহার করে, কিন্তু এ সব কারণে সে যে নিজেকে বড় বলে দাবী করতে পারে না সেটা সে ভালই জানে। অথচ সে দাবী সে করে থাকে, কেউ সম্মান দেখালে সেটাকে প্রাপ্য বলেই মনে করে, আর সেটা না পেলে আঘাতও পায়। এই ঘরেই একজনের শ্রদ্ধাহীন ব্যবহার তাকে ব্যথিত করেছে। এই জুরীদের মধ্যে একজনকে সে আগেই চিনত, তার দিদির ছেলেমেয়েদের প্রাক্তণ গৃহ-শিক্ষক পিয়তর্‌ গেরাসিমভিচ। নেখ্‌ল্যুদভ তার পদবিটা জানে না। লোকটি এখন কোন সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তার সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়, তার আত্ম-তুষ্ট

উচ্চ হাসি—এক কথায় তার স্থূলতাকে নেখ্‌লয়ুদভ মোটে সহ্য করতে পারছিল না।

'আহা! আপনাকেও ফাঁদে জড়িয়েছে' হো-হো হাসির সঙ্গে এই কথাগুলি দিয়েই পিয়তর্ গেরাসিমভিচ নেখ্‌লয়ুদভকে সম্বর্ধনা জানাল। 'তাহলে আপনিও গলে বেরিয়ে যেতে পারেন নি?'

গম্ভীরভাবে কঠোর গলায় নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল, 'গলে বেরোবার চেষ্টা আমি কখনও করি নি।'

'বটে, আরে একেই তো বলে জন-সেবার মনোভাব। তবে একটু অপেক্ষা করুন, খিদে পাক বা ঘুম আসুক, তখন আপনিই অন্য সুরে কথা বলবেন।'

'এই পুরুতের বাচ্চা এরপর আমার পিঠ চাপড়াতে শুরু করবে', এই কথা ভেবে নেখ্‌লয়ুদভ এমন একটা দুঃখের ভাব সারা মুখে ছড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল যে দেখে মনে হল, যেন এই মাত্র সে তার সব আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পেয়েছে। একজন পরিস্কার করে দাড়ি-গোঁফ কামানো, দীর্ঘদেহ, মর্যাদাসম্পন্ন লোককে ঘিরে একদল লোক তার মুখ থেকে কি যেন শুনছিল। নেখ্‌লয়ুদভ সেখানে গিয়ে হাজির হল। লোকটির জানা যে মামলাটা তখন দেওয়ানী আদালতে চলছিল তার বিচারকদল ও একজন বিখ্যাত অ্যাডভোকেটের নাম বেশ রসিয়ে রসিয়ে উল্লেখ করে সে মামলাটার বিবরণ পেশ করছিল। সে বলছিল, উক্ত বিখ্যাত অ্যাডভোকেট সুকৌশলে সমস্ত ব্যাপারটায় এমনভাবে মোড় ঘুরিয়ে দিল যে ন্যায় তার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও এক বৃদ্ধ মহিলাকে যে ভাবে প্রচুর টাকা তার বিরোধী পক্ষকে দিতে হল সেটাই আশ্চর্য।

সে বলল, 'অ্যাডভোকেটটি প্রতিভাবান লোক।'

শ্রোতারা সশ্রদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে সব শুনছিল। দু'একজন কিছু বলতে চাইলেই সেই লোকটি তাতে এমনভাবে বাঁধা দিচ্ছিল যেন একমাত্র সেই সব কিছু জানে।

বেশ দেরী করে এলেও নেখ্‌লয়ুদভকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হল। আদালতের একজন সদস্য তখনও পৌছয়নি, কাজেই সকলকেই অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

অধ্যায়—৬

আদালতের প্রেসিডেন্ট অনেকক্ষণ এসেছে। লোকটি লম্বা, শক্তসমর্থ, মুখে লম্বা ধুসর গোঁফ। বিবাহিত হলেও সে উচ্ছৃংখল-চরিত্র, আর তার স্ত্রীও তাই, কাজেই কেউ কারও পথে বাধার সৃষ্টি করে না। আজ সকালেই একটি সুইস্

মেয়ের কাছ থেকে সে একখানা চিঠি পেয়েছে। মেয়েটি আগে তার বাড়িতে গভর্নেস ছিল, এখন সে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পিতাসবার্গ চলেছে। সে লিখেছে, হোতেল ইতালিয়াতে সে পাঁচটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করবে। কাজেই তার ইচ্ছা ছিল, সকাল-সকাল আদালতের কাজ শুরু করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে দেবে, যাতে ছ'টার আগেই সে লাল-চুল ছোট্ট ক্লারা ভাসিলয়েভ্‌নার সঙ্গে মিলতে পারে, কারণ গত গ্রীষ্মকালে একটা গ্রামে গিয়ে তার সঙ্গে একটা পূর্বরাগের সঞ্চার হয়েছে।

তার নিজস্ব ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল এঁটে দিল, তারপর ক্যাবার্ড থেকে এক জোড়া ডাম্বেল নিয়ে দুটো হাতকে বিশ বার উপরে, নীচে, সামনে ও পাশে ঘোরাল এবং ডাম্বেলজোড়াকে মাথার উপরে তুলে ধরে আস্তে আস্তে দুটো হাঁটুকে তিনবার ভাঙল।

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাইসেপটা চেপে ধরে বলল, 'সচল থাকবার পক্ষে ঠাণ্ডাজলে স্নান আর ব্যায়ামের মত কিছু নেই। তার বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সোনার আংটি পরানো। মুল্যা ব্যায়ামটা করা তখনও বাকি (কারণ আদালতের দীর্ঘ অধিবেশনের আগে সব সময় সে ঐ দুটো ব্যায়াম করে থাকে), এমন সময় কে যেন দরজায় টান দিল। সভাপতি তাড়াতাড়ি ডাম্বেল দুটো রেখে দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'আপনাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য আমি দুঃখিত।'

সোনার চশমা পরা, উঁচু-ঘাড়, খুঁৎখুঁতে চেহারার একজন আদালতের লোক ঘরে ঢুকল।

বিরক্ত গলায় সে বলল, 'মাৎভী নিকিতি আজও আসে নি।'

ইউনিফর্ম পরতে পরতে প্রেসিডেণ্ট বলল, 'এখনও আসে নি? সে সব সময়ই দেরী করে।'

বসে পড়ে একটা সিগারেট বের করে লোকটি সক্রোধে বলে উঠল, 'সে যে নিজের ব্যবহারে কি করে লজ্জাবোধ না করে পারে আমি তো ভেবে পাই না।'

এই ন্যায়নিষ্ঠ লোকটির সঙ্গে সেদিন সকালেই তার স্ত্রীর একটা অপ্রীতিকর সংঘর্ষ হয়ে গেছে। মাস শেষ হবার আগেই স্ত্রী তার মাসোহারার টাকা খরচ করে ফেলে আরও কিছু টাকা আগাম চেয়েছিল; কিন্তু সে তা দিতে রাজী না হওয়ায় ঝগড়া বেঁধে যায়। স্ত্রী সাফ বলে দিয়েছে, সে যদি এ রকম ব্যবহার করে তাহলে যেন খাবার আশা ছেড়ে দেয়, বাড়িতে তার খাবার জুটবে না। এই পর্যন্ত শুনে সে চলে এসেছে; তার ভয়, সে মুখে যা বলেছে কাজেও হয় তো তাই করবে, তার পক্ষে সবই সম্ভব।

কতকগুলি দলিলপত্র নিয়ে সেক্রেটারি হাজির হল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রেসিডেণ্ট বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। কোন্ মামলাটা প্রথম ধরা হবে?'

সেক্রেটারি উদাসীনভাবে জবাব দিল, 'আমি তো বলি, বিষ খাওয়ানোর মামলাটা।'

'ঠিক আছে, বিষ খাওয়ানোর মামলাই হোক,' সে মামলাটা চারটের মধ্যে শেষ করে চলে যাওয়া যাবে একথা ভেবেই প্রেসিডেন্ট কথাগুলি বলল। 'আর ম্যাৎভী নিকিতিচ ; সে কি এসেছে ?'

'এখনও আসে নি ?'

'আর ব্রেভে ?'

'তিনি এসেছেন,' সেক্রেটারি জবাব দিল।

'তাহলে তার সঙ্গে দেখা হলে বলে দেবেন যে আমরা বিষ খাওয়ানোর মামলাটা ধরেছি।'

ব্রেভে এই মামলার সরকারী উকিল।

বারান্দায়ই ব্রেভের সঙ্গে সেক্রেটারির দেখা হয়ে গেল। ঘাড় উঁচু করে এক বগলে একটা পোর্ট ফোলিয়ো নিয়ে অন্য হাতটা ঝোলাতে ঝোলাতে জুতোর ধাতব শব্দ তুলে সে বারান্দা দিয়ে সবেগে চলে যাচ্ছিল।

সেক্রেটারি প্রশ্ন করল, 'মিখাইল পেত্রভিচ জানতে চাইছেন, আপনি তৈরি তো ?'

সরকারী উকিল বলল, 'নিশ্চয়, আমি সব সময়ই তৈরি। কোন্ মামলাটা আগে উঠছে ?'

'বিষ খাওয়ানোর মামলা।'

'খুব ভাল কথা,' মুখে বলল বটে, কিন্তু মনে মনে তা মোটেই ভাবল না। এক বন্ধুর বিদায়-উৎসবে যোগ দিতে কাল সারা রাত সে একটা হোটেলে কাটিয়েছে। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তাস খেলেছে আর মদ খেয়েছে, কাজেই বিষ খাওয়ানোর মামলাটা দেখবার সময়ই পায় নি, হয় তো এইবার চোখ বুলিয়ে নেবে। সেক্রেটারি ব্যাপারটা জানত বলেই ঐ মামলাটা তুলতে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছে। মতাদর্শের দিক থেকে সেক্রেটারি উদারপন্থী, এমন কি তাকে চরমপন্থীও বলা যায়। ব্রেভে রক্ষণশীল দলের লোক এবং রাশিয়ার সব জার্মান বাসিন্দার মতই গোড়ামির ভক্ত। সেক্রেটারি তাকে অপছন্দ করে, পদমর্যাদার জন্য তাকে ঈর্ষা করে।

সেক্রেটারি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, স্কপৎসি (একটি ধর্মীয় গোষ্ঠি)-দের খবর কি ?'

'আমি তো বলে দিয়েছি, সাক্ষী না হলে আমি মামলা লড়তে পারব না। আদালতেও তাই বলব।'

'আরে মশাই, তাতে কি যায় আসে ?'

'আমি লড়তে পারব না', সজোরে হাত নাড়তে নাড়তে কথাগুলি বলে ব্রেভে সবেগে নিজের ঘরে চলে গেল।

একটি অতি সাধারণ সাক্ষীর অনুপস্থিতির দরুণ সে স্কপৎসিদের মামলাটা পিছিয়ে দিচ্ছিল, কারণ তার বিশ্বাস কোন শিক্ষিত জুরীর সামনে বিচার হলে তারা হয় তো খালাস পেয়ে যাবে। তাই প্রেসিডেন্টের সম্মতিক্রমেই স্থির হয়েছে যে কোন প্রাদেশিক শহরে আগামী অধিবেশনে ঐ মামলাটার বিচার হবে, সেখানে চাষীরা অনেক বেশী সংখ্যায় হাজির থাকবে, আর সেই হেতু শাস্তি হবার সম্ভাবনাও বেশী হবে।

বারান্দার হট্টগোল বাড়তে লাগল। আদালতের ব্যাপারে বহু-অভিজ্ঞ এই ভদ্রলোক কর্তৃক উল্লেখিত মামলাটা যে আদালতে চলছিল সেই দেওয়ানী আদালতের দরজার সামনেই লোকের ভীড় সব চাইতে বেশী।

আদালতের কাজের সাময়িক বিরতি হল। আদালত কক্ষ থেকে সেই বৃদ্ধা বেরিয়ে এল। তার সব সম্পত্তি অ্যাডভোকেটের কারসাজিতে তার সেই ব্যবসায়ী মক্কেলটি পেয়ে গেছে, অথচ তার কোন দাবীই ঐ সম্পত্তিতে থাকতে পারে না। কিন্তু মক্কেলটি যে তাকে দিয়েছে দশ হাজার রুবল, আর নিজে লাভ করল এক লাখ রুবল।

অধ্যায়—৭

অবশেষে মাৎভী নিকিতিচও হাজির হল, আর পরিচয়-ঘোষক কর্মচারীটিও জুরীদের ঘরে ঢুকল। কর্মচারীটির রোগা চেহারা, লম্বা গলা, কেমন একটু পাশ কাটিয়ে হাঁটে, নীচের ঠোঁটটা সব সময় একদিকে বেরিয়ে থাকে। লোকটি সৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত, কিন্তু মাতলামির জন্য কোন চাকরিই বেশী দিন রাখতে পারে না। তিন মাস আগে তার স্ত্রীর শুভার্থিনী জনৈকা কাউন্টেস তাকে এই চাকরিটি করে দিয়েছে, আর চাকরিটা এতদিন রাখতে পেরেছে বলে সে নিজেও খুব খুশি।

নাকের উপর পিঁস-নে চাপিয়ে চারদিক তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'শুনুন ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা সবাই হাজির তো?'

একটি স্ফূর্তিবাজ বণিক বলল, 'মনে হচ্ছে সবাই।'

'ঠিক আছে; এখনই দেখছি। পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে সে পরপর নামগুলি ডাকতে লাগল, আর কখনও পিঁস-নের ভিতর দিয়ে, কখনও বা তার উপর দিয়ে লোকগুলিকে দেখতে লাগল।

'কাউন্সিলর অব স্টেট আই. এম. নিকিফরভ?'

'আমি,' আদালতের ব্যাপারে বহু-অভিজ্ঞ সেই মর্যাদাসম্পন্ন-দেখতে লোকটি বলল।

'আইভান সেমিয়োনভিচ আইভানভ, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল!'

'এই যে!' ইউনিফর্মধারী অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সেই সরু লোকটি বলল।

'সেকেণ্ড গিল্ডের ব্যবসায়ী পিওতর্ বাকুলাশভ!'

মুখ-ভরা হাসি ছড়িয়ে আমুদে ব্যবসায়ীটি বলল, 'এখানেই আছি, হাজির!'

'রক্ষীবাহিনীর লেফ্‌টেন্যাণ্ট প্রিন্স দিমিত্রি নেখ্‌লুদভ!'

'আমি সেই লোক,' বলল নেখ্‌লুদভ।

যেন তাকে অন্য লোক থেকে আলাদা করবার জন্যই পরিচয়-ঘোষক পিস-নের উপর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে অভিবাদন জানাল।

'ক্যাপ্টেন য়ুরি দ্‌মিত্রিয়েভিচ দান্‌চেংকো; গ্রিগরি ইয়েফিমভিচ কুলেশভ, বণিক,' ইত্যাদি ইত্যাদি। দু'জন ছাড়া আর সকলেই উপস্থিত।

সাদরে হাত বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে পরিচয়-ঘোষক বলল, 'মশাইরা, এবার দয়া করে আদালতে চলুন।'

সকলেই দরজার দিকে এগোল, একে অন্যকে পথ করে দিল। বারান্দা পার হয়ে আদালতে প্রবেশ করল।

মস্ত লম্বা ঘরে আদালত বসে। একদিকে তিনটে সিঁড়ি বেয়ে উঠলে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম। তার উপর একটা টেবিল। গাঢ় সবুজ পাড় বসানো সবুজ কাপড়ে ঢাকা। টেবিলের পিছনে তিনটে হাতল-ওয়ালা চেয়ার, পিছনটায় কারুকার্যকরা ওক-কাঠ লাগানো। সে সবের পিছনের দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো সম্রাটের একখানি উজ্জ্বল রঙে আঁকা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি ঝুলছে; পরনে ইউনিফর্ম, একটা পা সামনের দিকে বাড়ানো, হাতে তরবারি। ডান দিকের কোণে কাঁটার মুকুট-পরা খৃস্টের একটা মূর্তি ঝোলানো রয়েছে, আর তারই নীচে একটি বক্তৃতা করার ছোট স্ট্যাণ্ড ও সরকারী উকিলের ডেস্ক। ডেস্কের বিপরীতে বাঁ দিকে রয়েছে সেক্রেটারির টেবিল; একেবারে জনতার দিকে আছে একটা ওক-কাঠের রেলিং আর তার পিছনের দিকে কয়েদীর কাঠগড়া। সেটা এখন খালি। প্ল্যাটফর্মের ডান দিকে রয়েছে জুরীদের উঁচু-পিঠওয়ালা একসারি চেয়ার, এবং নীচের মেঝেতে অ্যাডভোকেটদের টেবিল। এ সবই আদালতের সামনের দিকে অবস্থিত, একটা রেলিং দিয়ে পিছনের অংশ থেকে আলাদা করা।

পিছন দিকে উপর-নীচ করে সাজানো অনেকগুলি আসন। সামনের সারিতে চারজন স্ত্রীলোক—হয় দাসী নয়তো কারখানার মজুরণী এবং দুজন মজুর বসে আছে। ঘরের জাকজমক দেখে তারা সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে, ফলে কথাবার্তা বলছে ফিসফিস করে।

একটু পরেই জুরীরা ঢুকল। পরিচয়-ঘোষক তার সেই কাত-হওয়া ভঙ্গীতে ঢুকে সামনে এগিয়ে গেল এবং যেন উপস্থিত সকলকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই চড়া গলায় হাঁক দিল, 'আদালত আসছেন!'

সকলে উঠে দাঁড়াল। আদালতের সদস্যগণ সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেল। প্রথমে পেশীবহুল দেহ ও চমৎকার গোঁফ নিয়ে এল প্রেসিডেন্ট।

তারপর এল সেই বিষণ্ণ-বদন সদস্যটি যার স্ত্রী বাড়িতে খাবার জুটবে না বলে হুমকি দিয়েছে। সকলের শেষে এল আদালতের তৃতীয় সদস্য মাৎভী নিকিতিচ। সে তো সব সময়ই দেরী করে আসে। লোকটির মুখভরা দাড়ি, বড় বড় গোল গোল দুটি চোখে দয়ার আভাষ। লোকটি পাকস্থলীর ক্ষতে ভুগছে। চিকিৎসকের পরামর্শে আজ থেকেই তার একটা নতুন চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছে বলেই আজ তাকে অন্য দিনের তুলনায় আরও বেশীক্ষণ বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মের দিকে যেতে যেতে সে মনে মনে প্রশ্ন করল, নতুন চিকিৎসাটা তার পক্ষে উপকারী হবে কিনা এবং মনে মনেই স্থির করল যে, দরজা থেকে তার চেয়ার পর্যন্ত যেতে যতবার পা ফেলতে হবে সেটা যদি তিন দিয়ে বিভাজ্য হয় তাহলে নতুন চিকিৎসায় তার ক্ষত নিরাময় হবে। ছাব্বিশবার পা ফেলবার পরে চেয়ারের কাছে গিয়ে কোন রকমে সাতাশ বার পা ফেলবার ব্যবস্থা করেও নিল।

সোনালি জরির কাজ-করা কলার বসানো পোষাকে প্রেসিডেণ্ট ও অন্য সদস্যদের খুবই ভারিক্কী দেখাচ্ছিল। তারা ঝটপট যার যার আসনে বসে পড়ল। সামনের সবুজ কাপড়ে ঢাকা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে ঈগল-বসানো একটা ত্রিভুজাকৃতি বস্তু, দুটো কাঁচের পাত্র,—যে ধরনের পাত্রে মিষ্টির দোকানে মিষ্টান্নাদি রাখা হয়ে থাকে—একটা দোয়াত, কলম, সাদা কাগজ, আর নতুন করে কাটা রকমারি পেন্সিল।

অধ্যায়—৮

কাগজপত্র দেখে নিয়ে পরিচয়-ঘোষক ও সেক্রেটারিকে কতকগুলি প্রশ্ন করে সম্মতিসূচক জবাব পেয়ে প্রেসিডেণ্ট হুকুম দিল, কয়েদীদের আনা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে রেলিংয়ের পিছনকার দরজাটা খুলে গেল। মাথায় টুপি, হাতে তলোয়ার দুজন সৈনিক ঘরে ঢুকল; তাদের পিছনে কয়েদীরা: একটি লাল-চুল, রোদে-পোড়া পুরুষ ও দুটি স্ত্রীলোক। লোকটির পরণে কয়েদীদের ঢিলে আলখাল্লা। তার পক্ষে সেটা যেমন লম্বায় তেমনি চওড়ায় বড়। সে বুড়ো আঙুল দুটোকে বের করে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরেছে যাতে অত্যন্ত লম্বা আস্তিন দুটো তার হাতকে ঢেকে নীচে ঝুলে না পড়ে। বিচারকদের দিকে না তাকিয়ে সে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগল বেঞ্চটাকে, তারপর বেঞ্চের অপর কোণায় গিয়ে একেবারে পাশ ঘেঁসে এমনভাবে বসল যাতে অন্যদের বসবার মত যথেষ্ট জায়গা থাকে। এবার প্রেসিডেণ্টের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে তার গালের পেশীকে নাড়াতে লাগল, যেন ফিসফিস করে কিছু বলছে। তারপরে যে স্ত্রীলোকটি এল তারও পরণে কয়েদীর আলখাল্লা, আর মাথায় বাঁধা কয়েদীদের রুমাল। তার বয়স হয়েছে, মুখের রং পাঁশুটে, ভুরুতে বা চোখের পাতায় লোম

নেই, চোখ দুটো লাল। আলখাল্লাটা একটা কিছুতে আটকে গেলে সে তাড়াহুড়ো না করে সতর্কতার সঙ্গে সেটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসনে বসল।

তৃতীয় কয়েদীটিই মাসলভা।

সে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আদালতের সবগুলি চোখ তার দিকেই ঘুরে গেল; তার ফ্যাকাসে মুখ, উজ্জ্বল চকচকে একজোড়া কালো চোখ ও কয়েদীর আলখাল্লায় ঢাকা উদ্ধত বুকের উপর নিবদ্ধ হল সকলের চোখ। এমন কি যে সৈনিকটিকে পাশ কাটিয়ে সে তার আসনে গিয়ে বসল সেও একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর এক সময় কাজটা ঠিক হচ্ছে না বুঝতে পেরে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিল এবং সামনের জানালাটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কয়েদীরা আসন গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট চুপ করে রইল। মাসলভা আসনে বসলে সে সেক্রেটারির দিকে তাকাল।

তারপর যথারীতি কাজকর্ম শুরু হল: জুরিদের নাম ডাকা, যারা গর-হাজির তাদের সম্পর্কে মন্তব্য, তাদের কাছ থেকে কত জরিমানা আদায় করা হবে সেটা নির্দ্ধারণ, যারা জরিমানা মকুবের দাবী জানিয়েছে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত, এবং রিজার্ভ জুরি নিয়োগ।

কতকগুলি কাগজের টুকরোকে ভাঁজ করে সেগুলিকে কাঁচের পাত্রে ভরে প্রেসিডেণ্ট তার পোষাকের জরির কাজ-করা আস্তিন খানিকটা গুটিয়ে তার লোমশ কব্জি বের করে যাদুকরের ভঙ্গীতে এক একটি কাগজের টুকরো বের করে খুলে দেখতে লাগল। তারপর আস্তিন নামিয়ে দিয়ে জুরিদের শপথ গ্রহণ করাতে পুরোহিতকে অনুরোধ করল।

বৃদ্ধ পুরোহিত ফোলা-ফোলা, হলদেটে বিবর্ণ মুখ, বাদামী গাউন, সোনার ক্রুশ চিহ্ন ও ছোট মেডেল নিয়ে জোব্বায় ঢাকা অনড় পা দুটোকে অনেক কষ্টে টানতে টানতে যীশুর মূর্তির নীচেকার ডেস্কের কাছে হাজির হল। জুরিরাও উঠে দাঁড়িয়ে তার সামনে ভীড় করল।

মোটা হাত দিয়ে বুকের উপরকার ক্রুশ-চিহ্নটাকে টেনে ধরে পুরোহিত বলতে লাগল, "দয়া করে এগিয়ে আসুন।" সকলে না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে লাগল।

মঞ্চের সিঁড়ি বেয়ে সকলে উপরে উঠে আসবার পরে পুরোহিত তার টাক-পড়া মাথাটাকে আপাদলম্বিত আলখাল্লার তেলচিটে গলার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিল এবং মাথার বিরল সাদা চুলগুলোকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিয়ে আবার জুরিদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কোঁচকানো মোটা হাতখানা তুলে যেন আঙুলের ফাঁকে কিছু ধরে আছে এমনি ভাবে বৃদ্ধা ও অন্য দুটি আঙুলকে একত্র করে কাঁপা-কাঁপা বুড়োটে গলায় সে বলতে লাগল, "এবার এইভাবে আপনাদের ডান হাত তুলুন এবং এই রকম করে আঙুলগুলোকে এক সঙ্গে ধরুন। এবার

আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন, "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তাঁর পবিত্র কথামৃত, এবং জীবনদায়ক ক্রুশ-চিহ্নের নামে শপথ লইয়া আমি বলিতেছি যে এই কাজ যাহা"—"আহা, আপনার হাত নামাবেন না। এইভাবে তুলে রাখুন" জনৈক যুবক হাত নামিয়ে ফেলায় পুরোহিত এই মন্তব্য করে পুনরায় শপথ গ্রহণ করাতে গিয়ে বলতে লাগল, "যে এই কাজ যাহা..."

গোঁফওয়ালা সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকটি, কর্ণেল, ব্যবসায়ী, ও আরও কয়েকজন পুরোহিতের নির্দেশ মতই হাত ও আঙুল বেশ উঁচু করে সঠিক ভাবেই তুলে ধরে রাখল, যেন কাজটা তাদের বেশ পছন্দসই; অনেকে আবার কাজটা করল অনিচ্ছায় হেলাফেলাভাবে। অনেকে কথাগুলোকে এত জোরে, এমন উদ্ধত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করতে লাগল যেন তারা বলতে চায়, "যাই ঘটুক না কেন, আমি কথা বলবই।" অনেকে আবার খুব নীচু গলায় ধীরে ধীরে কথাগুলি বলতে বলতে যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে দ্রুতগতিতে পুরোহিতের সঙ্গে গলা মেলাতে চেষ্টা করতে লাগল। কেউ বা আঙুলগুলোকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে রইল, পাছে আঙুলের ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য কোন বস্তু গলে পড়ে যায়; আবার কেউ বা আঙুলগুলোকে একবার খুলছে, আবার একত্র করছে। একমাত্র বুড়ো পুরোহিত ছাড়া আর সকলের কাছেই ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল; পুরোহিত কিন্তু মনে করছে যে সে একটা খুব দরকারী ও গুরুত্বপূর্ণ কাজই করছে।

শপথ-গ্রহণ শেষ হলে প্রেসিডেণ্ট জুরিদের একজন 'ফোরম্যান' মনোনীত করতে বলল। অমনি জুরিরা দরজার দিকে ভীড় করে তাদের আলোচনার ঘরে চলে গেল এবং সেখানে প্রায় সকলেই সিগারেট খেতে শুরু করে দিল। তাদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকটিকেই ফোরম্যান হতে প্রস্তাব করল এবং সর্বসম্মতিক্রমে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। তখন জুরিরা সিগারেট নিভিয়ে ফেলে দিয়ে আদালতে ফিরে গেল। সম্ভ্রান্ত লোকটি প্রেসিডেণ্টকে জানাল যে সেই ফোরম্যান মনোনীত হয়েছে। তারপর সকলেই আবার উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসল।

সব কিছুই সুচারুরূপে, দ্রুতগতিতে ও আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হল। এতে যারা অংশ গ্রহণ করল তারা সকলেই বেশ খুশি। তাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে একটি গুরুতর মূল্যবান দায়িত্ব তারা পালন করছে। এ কথা নেখ্‌ল্যুদভেরও মনে হল।

জুরিরা আসন গ্রহণ করতেই প্রেসিডেণ্ট তাদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে একটি ভাষণ দিল। ভাষণ দেবার সময় সে অনবরতই তার শরীরের অবস্থানকে নানা ভাবে পরিবর্তিত করতে লাগল: কখনও ডাইনে ঝুঁকছে, কখনও বাঁয়ে, কখনও চেয়ারের পিঠটাকে চেপে ধরছে, কখনও ভর দিচ্ছে হাতলের উপর, কখনও কাগজখানা সোজাসুজি ধরছে, কখনও পেন্সিলটা নাড়াচাড়া করছে, আবার কখনও বা কাগজ-কাটা ছুরিটা।

প্রেসিডেন্ট তাদের জানাল, তার মারফতে কয়েদীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার, কাগজপত্র ব্যবহার করবার, এবং প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখবার অধিকার তাদের আছে। তাদের কর্তব্য ন্যায় বিচার করা, বিচারের ফাঁকি নয়। তাদের দায়িত্বের অর্থ হল, তাদের আলোচনার গোপনীয়তা যদি লঙ্ঘিত হয়, বাইরের লোক যদি সে সব জানতে পারে, তাহলে তারাও শাস্তিযোগ্য। সকলেই সশ্রদ্ধ মনোযোগের সঙ্গে কথাগুলি শুনতে লাগল। চারদিকে মদের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে এবং সশব্দ হিক্কাকে কোনভাবে সংযত রাখতে রাখতে ব্যবসায়ীটি প্রত্যেকটি বাক্যকেই মাথা নেড়ে সমর্থন জানাতে লাগল।

অধ্যায়—৯

ভাষণ শেষ করে প্রেসিডেন্ট কয়েদীদের দিকে তাকাল। "সাইমন কারতিংকিন, দাঁড়াও।"

সাইমন লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার ঠোঁটদুটি দ্রুত নড়ছে।

"তোমার নাম?"

"সাইমন পেত্রভিচ কারতিংকিন," চেরা গলায় হড়বড় করে বলল; স্পষ্টই বোঝা গেল জবাবটা বানানো।

"তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক?"

"চাষী।"

"কোন্ গুবারনিয়া, কোন্ জেলা, কোন্ অঞ্চল?"

"তুলা গুবারনিয়া, ক্রাপিভেন্স্কি জেলা, কুপিয়ানস্কি অঞ্চল, ও গ্রাম বর্কি।"

"তোমার বয়স কত?"

"তেত্রিশ; জন্ম এক হাজার আট—"

"ধর্ম কি?"

"রুশ ধর্ম, গোঁড়া।"

"বিবাহিত?"

"না, ইয়োর অনার।"

"পেশা কি?"

"হোতেল মরিতানিয়াতে খানসামা ছিলাম।"

"আগে কখনও তোমার বিচার হয়েছে?"

"আগে কখনও বিচার হয় নি, কারণ, যেহেতু আগে আমরা থাকতাম—"

"তাহলে আগে কখনও তোমার বিচার হয় নি?"

"ঈশ্বর না করুন। কখনও না।"

"অভিযোগের একটা কপি কি তুমি পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

"বস।"

দ্বিতীয় কয়েদীর দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বলল, "এভ্‌ফিমিয়া আইভান্‌ভনা বচ্‌কভা।"

কিন্তু সাইমন তখনও বচ্‌কভার সামনে দাঁড়িয়েই রয়েছে।

"কারতিংকিন, বসে পড়!"

কারতিংকিন দাঁড়িয়েই রইল।

"কারতিংকিন, বসে পড!"

কিন্তু পরিচয়-ঘোষক তার কাত-করা মাথা ও অদ্ভুত রকমের বড় বড় চোখ নিয়ে দৌড়ে গিয়ে রাগত কণ্ঠে ফিসফিস করে "বসে পড, বসে পড়!" বলতে তবেই কারতিংকিন বসল। যেমন তাড়াহুড়া করে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল তেমনি করেই বসে পড়ল, এবং আলখাল্লাটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে গাল নাড়াতে লাগল।

কয়েদীর দিকে না তাকিয়ে সামনের কাগজটার উপর চোখ রেখেই প্রেসিডেন্ট একটা শ্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম?" সভাপতি তার কাজে এতই অভ্যস্ত যে তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্য সে এক সঙ্গে দুটো কাজ করে থাকে।

বচ্‌কভার বয়স তেতাল্লিশ বছর, এসেছে কলমনা শহর থেকে। সেও হোতেল মরিতানিয়াতে কাজ করত।

"আমার আগে কখনও বিচার হয় নি, এবং অভিযোগের একটা কপি আমি পেয়েছি।" সাহসের সঙ্গে এমন স্বরে সে জবাব দিল যে মনে হয় বুঝি প্রতিটি জবাবের সঙ্গে সে বাড়তি কিছু বলতে চায়। "হ্যাঁ, এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা; আর অভিযোগপত্র পেয়েছি; আর কে কি জানে না জানে কেয়ার করি না, এবং বাজে কথার ধার ধারি না।"

শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়েই কারও কথার অপেক্ষা না করে সে বসে পড়ল।

বিশেষ শিষ্টাচারের সঙ্গে তৃতীয় কয়েদীর দিকে ফিরে নারী-দরদী প্রেসিডেন্ট বলল, "তোমার নাম?" মাসলভা তখনও বসে আছে দেখে সে শান্ত ভদ্র কণ্ঠে বলল, "তোমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে।"

মাসলভা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। স্মিত কালো চোখ দুটিতে প্রস্তুতির বিশেষ ভঙ্গী এনে বুক ফুলিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

"তোমার নাম কি?"

"ল্যুবভ," সে দ্রুত জবাব দিল।

কয়েদীদের প্রশ্ন করার সময় নেখ্‌ল্যুদভ চোখে পিঁস-নে লাগিয়েছিল। এবার কয়েদীর উপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে সে মনে মনে বলল, "না, এ অসম্ভব। "ল্যুবভ! তা কেমন করে হয়?" জবাব শুনে সে মনে মনে

বলল। প্রেসিডেন্ট আরও প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু চশমাধারী সদস্যটি বাধা দিল, রাগতঃ স্বরে কানে কানে কি যেন বলল। প্রেসিডেন্ট মাথা নেড়ে আবার কয়েদীর দিকে মুখ ফেরাল।

বলল, "এটা কি হল? তোমার নাম তো এখানে ল্যবভ বলে লেখা নেই।"

কয়েদী চুপ করে রইল।

"আমি তোমার আসল নাম জানতে চাই।"

ক্রুদ্ধ সদস্যটি প্রশ্ন করল, "তোমার দীক্ষান্ত নাম কি?"

"আগে আমাকে কাতেরিনা বলে ডাকত।"

"না, এ হতে পারে না," নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে বলল। এতক্ষণে সে নিশ্চিত বুঝেছে যে এই সেই, সেই মেয়েটি, আধা-সন্তান, আধা-দাসী, একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল, সত্যি ভালবেসেছিল, এবং এক উন্নত বাসনার মুহূর্তে তাকে ভুলিয়ে পাপের পথে এনে তারপর পরিত্যাগ করেছিল, আর কখনও তার কথা মনেও করে নি—কারণ সে স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক, সে স্মৃতি তাকে স্পষ্টতই দণ্ডিত করত, প্রমাণ করত যে নিজের চারিত্রিক সংহতি সম্পর্কে গর্ববোধ করা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটির প্রতি সে ন্যাক্কারজনক কুৎসিৎ আচরণ করেছে।

হ্যাঁ, এই সেই। তার মুখে স্পষ্টভাবে সেই আশ্চর্য অবর্ণনীয় ব্যক্তিত্বের আভাষ সে দেখতে পাচ্ছে যা প্রতিটি মুখকে অন্য সব মুখ থেকে আলাদা করে রাখে; এমন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ মুখের স্বাস্থ্যহীন বিবর্ণতা সত্ত্বেও সেই মধুর ব্যক্তিত্ব সেখানে ফুটে উঠেছে: ওই দুটি ঠোঁটে, চোখের ঈষৎ ভ্রূকুটিতে, কণ্ঠস্বরে, এবং বিশেষ করে তার মুখের সরল হাসিতে ও দেহের সদাপ্রস্তুত ভঙ্গিমায়।

প্রেসিডেন্ট পুনরায় নরম গলায় মন্তব্য করল, "সেটাই তোমার বলা উচিত ছিল। তোমার পৈত্রিক নাম?"

"আমি জারজ।"

"আচ্ছা, তোমাকে কি ধর্ম-পিতার নামে ডাকা হত না?"

"হত। মিখাইলভ্‌না।"

নেখ্‌ল্যুদভ সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। সে মনে মনে বলল, "কি দোষ সে করেছে?"

প্রেসিডেন্ট বলেই চলেছে, "তোমার পারিবারিক নাম—মানে তোমার উপাধির কথা বলছি।"

"সকলে আমাকে আমার মায়ের উপাধিতেই ডাকত।"

"কোন্ শ্রেণী?"

"মেশ্‌চাংকা (নিম্ন মধ্যবিত্ত নাগরিক)।"

"ধর্ম—গোঁড়া?"

"গোঁড়া।"

"পেশা? তোমার পেশা কি ছিল?"

মাসলভা চুপ করে রইল।

"তুমি কি কাজ করতে?"

"আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ছিলাম।"

চশমাধারী সদম্ভ কড়া গলায় প্রশ্ন করল, "কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?"

"আপনি নিজেই তো জানেন," বলেই সে হাসল। তারপর দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবার প্রেসিডেণ্টের দিকে চোখ ফেরাল।

তার মুখের ভঙ্গিতে এমন অসাধারণ কিছু ছিল, তার কথায়, তার হাসিতে ঘরের চতুর্দিকে দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালনে এমন একটা ভয়ংকর ও করুণ অর্থ ফুটে উঠেছিল যে প্রেসিডেণ্টও লজ্জাবোধ করল এবং আদালতে পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্য নেমে এল। সমবেত জনতার একজনের হাসিতে সে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হল। তখন একজন বলে উঠল, "স্‌শ্‌"! আর প্রেসিডেণ্ট চোখ তুলে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল:

"এর আগে কখনও তোমার বিচার হয়েছে?"

"কখনও না", নরম গলায় জবাব দিয়ে মাসলভা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"অভিযোগের একটা কপি কি তুমি পেয়েছ?"

"পেয়েছি", সে জবাব দিল।

"বস।"

একজন ভদ্রমহিলা যে ভাবে পোষাক সামলায় সেই ভাবে পিছনে একটু হেলে সে তার স্কার্টটা তুলে বসে পড়ল। প্রেসিডেণ্টের দিকে স্থিরদৃষ্টি রেখে আলখাল্লার আস্তিনের মধ্যে সাদা হাত দুখানি গুটিয়ে নিল।

সাক্ষীদের ডাকা হল। কেউ বা চলেই গেছে। যে ডাক্তারটি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করবে তাকে ঠিক করে আদালতে ডাকা হল।

তখন সেক্রেটারি উঠে অভিযোগপত্রটি পড়তে লাগল। সে বেশ স্পষ্ট করে জোর গলায় পড়ল (যদিও 'এল্‌' এবং 'আর' অক্ষর দুটিকে একইভাবে উচ্চারণ করল), কিন্তু খুব দ্রুত পড়ার জন্য একটি শব্দ আর একটি শব্দের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে যেতে লাগল যে সব মিলিয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন একঘেয়ে কলগুঞ্জনের সৃষ্টি হল।

বিচারকরা কখনও চেয়ারের এ-হাতলে কখনও ও-হাতলে ঝুঁকে বসল, কখনও বা টেবিলের উপর ঝুঁকল, কখনও বা সোজা হয়ে বসল, একবার চোখ বন্ধ করল। আবার চোখ বুজল, আর নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল। একজন রক্ষী-সৈনিক তো বার কয়েক একটা হাই চেপে রাখল।

কয়েদী কারতিংকা গাল নাড়ানো থামাল না। বচ্‌কভা চুপচাপ খাড়া হয়ে বসে রইল; শুধু মাঝে মাঝে রুমালের নীচ দিয়ে মাথাটা চুলকোতে লাগল।

পাঠকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাসলভা নিশ্চল হয়ে বসে রইল ; শুধু মাঝে মাঝে সামান্য নড়েচড়ে যেন কিছু বলতে চেয়েই লজ্জায় লাল হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ; তারপর হাত-দুটোর স্থান পরিবর্তন করে চারদিকে একবার তাকিয়ে আবার পাঠকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

প্রথম সারির শেষ থেকে দ্বিতীয় আসনে উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে নেখ্‌লুদভ পিঁস-নেহীন চোখে মাসলভার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল ; তার মনের মধ্যে তখন চলেছে জটিল এক বেদনার্ত সংগ্রাম।

অধ্যায়—১০

অভিযোগটি এই রকম :

"১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি সাইবেরিয়ার কুরগান শহর থেকে আগত ফেরাপন্ত স্মেলকভ নামক সেকেণ্ড গিল্ডের জনৈক বণিক হোতেল মরিতানিয়ায় হঠাৎ মারা যায়।

"চতুর্থ জেলার স্থানীয় পুলিশ-ডাক্তারের মতে অত্যধিক মদ্যপানের ফলে হৃদযন্ত্র ফেটে যাওয়ায় মৃত্যু ঘটেছে। উক্ত স্মেলকভের দেহ কবর দেওয়া হয়।

"কয়েকদিন পরে স্মেলকভের বন্ধু ও একই শহরবাসী সাইবেরিয়ার বণিক তিমোখিন পিতার্সবাগ-সফর শেষ করে ফিরে এসে স্মেলকভের মৃত্যুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা শুনে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, তার সঙ্গে যে টাকা ছিল সেটা চুরি করার উদ্দেশ্যে তাকে বিষ খাওয়ানো হয়েছে।

"যে প্রাথমিক তদন্তে তার এই সন্দেহ সমর্থিত হয় তার থেকে জানা গেছে :

"(১) যে মৃত্যুর ঠিক আগে স্মেলকভ তার ব্যাংক থেকে ৩,৮০০ রুবল তুলেছিল, কিন্তু মৃতের জিনিসপত্রের যে তালিকা করা হয়েছে তাতে মাত্র ৩১২ রুবল ১৬ কোপেকের উল্লেখ আছে।

"(২) যে মৃত্যুর পূর্বের সারাটা দিন ও রাত স্মেলকভ বেশ্যালয়ে এবং হোতেল মরিতানিয়াতে তার ঘরে ল্যুব্‌কা (কাতেরিনা মাসলভা) নাম্নী একটি বেশ্যার সঙ্গে কাটায় এবং তার অনুরোধে ও তার অনুপস্থিতিতে কাতেরিনা মাসলভা টাকা আনবার জন্য বেশ্যালয় থেকে ঐ ঘরে যায়। হোটেলের দুটি চাকর এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা এবং সাইমন কারতিংকিনের সামনেই মাসলভা স্মেলকভের নিজের দেওয়া চাবির সাহায্যে যে পোর্টম্যাণ্টোতে টাকা ছিল সেটার তালা খোলে এবং বন্ধ করে। বচ্‌কভা ও কারতিংকিন তাদের সাক্ষ্যে বলেছে যে পোর্টম্যাণ্টোটা খোলা হলে তারা তার মধ্যে তাড়া তাড়া একশ' রুবলের ব্যাংকনোট দেখেছে।

"(৩) যে স্মেলকভ বেশ্যা ল্যুব্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে বেশ্যালয় থেকে হোতেল মরিতানিয়াতে ফিরে গেলে ল্যুব্‌কা কারতিংকিনের পরামর্শ মত তারই দেওয়া

একটা সাদা গুঁড়ো এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডিতে ছড়িয়ে দেয় এবং সেটা স্মেলকভকে পান করতে দেওয়া হয়।

"(৪) যে পরদিন সকালে ল্যুব্‌কা (কাতেরিনা মাসলভা) তার বাড়িউলি (বেশ্যালয়ের মালকানি সাক্ষী কিতায়েভা)-কে একটা হীরের আংটি বিক্রি করে ; উক্ত মাসলভা দাবী করে যে আংটিটা স্মেলকভ তাকে উপহার দিয়েছিল।

"(৫) যে স্মেলকভের মৃত্যুর পর দিন হোটেলের প্রধান পরিচারিকা এভ্‌ফিমিয়া ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ১,৮০০ রুবল জমা দেয়।

"স্মেলকভের মৃতদেহের ডাক্তারি পরীক্ষা, শব ব্যবচ্ছেদ এবং স্মেলকভের পরিপাক-যন্ত্রে প্রাপ্ত পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণে বিষের উপস্থিতি প্রকাশ পায়, আর তার থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয় যে বিষ-প্রয়োগের ফলেই মৃত্যু হয়েছে।

"আসামী মাসলভা, বচ্‌কভা ও কারতিংকিন সকলেই নিজেকে নির্দোষ বলেছে। মাসলভা বলেছে, যে-বেশ্যালয়ে সে 'কাজ করে' (এই শব্দই সে ব্যবহার করেছে) বণিক স্মেলকভ যখন সেখানে ছিল তখন সেই তাকে টাকা আনতে হোতেল মরিতানিয়াতে পাঠায়, এবং বণিকের দেওয়া চাবি দিয়ে পোর্টম্যাণ্টোর তালা খুলে সে তার কথা মতই চল্লিশ রুবল বের করে নেয়, তার বেশী নয় ; সে আরও বলেছে যে বচ্‌কভা ও কারতিংকিন, যাদের সামনেই সে পোর্টম্যাণ্টোটা খুলেছিল ও বন্ধ করেছিল, তারাই তার কথার সত্যতা স্বীকার করবে।

"সে সাক্ষ্যে আরও বলেছে যে, দ্বিতীয়বার হোটেলে গিয়ে সে সাইমন কারতিংকিনের প্ররোচনায় এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে এক রকম গুঁড়ো মিশিয়ে স্মেলকভকে দেয় ; সে ভেবেছিল ওটা আফিমঘটিত কোন ওষুধ, আর তাই আশা করেছিল যে সে ওটা খেলেই ঘুমিয়ে পড়বে এবং সেও তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে। আংটি সম্পর্কে সে বলেছে, স্মেলকভ তাকে মারধোর করলে যখন সে কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবে বলে ভয় দেখায় তখন সে নিজেই ওটা তাকে দিয়ে দেয়।

"জেরার সময় আসামী এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা বলেছে যে খোয়া-যাওয়া টাকার কথা সে কিছুই জানে না, এমন কি সে স্মেলকভের ঘরেও যায়নি, বরং ল্যুব্‌কা একাই সেখানে খুব ব্যস্ত ছিল ; যদি কিছু চুরি গিয়ে থাকে তাহলে ল্যুব্‌কা যখন বণিকের চাবি নিয়ে টাকা নিতে এসেছিল তখন নির্ঘাৎ সেই ও কাজ করেছে।"

এই সময় মাসলভা চমকে উঠে মুখ খুলে বচ্‌কভার দিকে তাকাল।

সেক্রেটারি বলতে লাগল, "ব্যাংকের এক হাজার আটশ' রুবলের রসিদটা দেখিয়ে যখন বচ্‌কভাকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে এত টাকা পেল কোথায়, তখন সে জানায় ওটা তার বারো বছরের উপার্জিত টাকা এবং সাইমনের উপার্জিত টাকা ; তাদের দুজনের শিগগিরই বিয়ে হবে।

"প্রথম জেরার সময় আসামী কারতিংকিন স্বীকার করে যে মাসলভার

প্ররোচনায়—সেই বেশ্যালয় থেকে চাবিটা নিয়ে এসেছিল—বচ্‌কভা ও সে টাকাটা চুরি করে এবং মাসলভাসহ নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নেয়।"

এই সময় মাসলভা আবার চমকে ওঠে, এমন কি লজ্জায় লাল হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কিছু বলতে শুরু করে, কিন্তু পরিচয়-ঘোষক তাকে থামিয়ে দেয়।

"অবশেষে", সেক্রেটারি পড়েই চলেছে, "কারতিংকিন স্বীকার করে যে স্মেলকভকে ঘুম পাড়াবার জন্য সে-ই গুঁড়োটা সরবরাহ করেছিল। দ্বিতীয় দফা জেরার সময় সে টাকাচুরির ব্যাপারে বা মাসলভাকে গুড়োটা দেবার ব্যাপারে তার যোগসাজস সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং অভিযোগ করে যে মাসলভা একাই কাজটা করেছে। বচ্‌কভা কর্তৃক ব্যাংকে টাকা রাখার ব্যাপারে বচ্‌কভা যা বলেছে সেও তাই বলল—অর্থাৎ বার বছর ধরে হোটেলের বাসিন্দারা টিপ্‌স্‌ হিসাবে টাকাটা তাদের দিয়েছে।"

তারপর শুরু হল কয়েদীদের মুখোমুখি জেরার বিবরণ, সাক্ষীদের প্রতিবেদন এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অভিযোগপত্রের উপসংহারে বলা হয়েছে:

"উপরি-উক্ত বিবরণের ফলে রবকি গ্রামের তেত্রিশ বছর বয়স্ক চাষী সাইমন কারতিংকিন; তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা মেচশাংকা এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা; এবং সাতাশ বছর বয়স্কা মেচ্‌শাংকা কাতেরিনা মাসলভাকে এই বলে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে যে ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারা যুগ্মভাবে উক্ত বণিক স্মেলকভের টাকা ও দু হাজার পাঁচশ' রুবল মূল্যের হীরের আংটি চুরি করেছে, এবং তাদের অপরাধ গোপন করবার জন্য তার প্রাণনাশের উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত বণিক স্মেলকভকে বিষপান করতে দিয়েছে ও সেই ভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে।

"দণ্ডবিধির ১৪৫৩ ধারায় এই অপরাধের মোকাবিলার ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং ফৌজদারি আদালত বিধির ২০১ ধারা মতে চাষী সাইমন কারতিংকিন, মেচ্‌শাংকা এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা ও মেচ্‌শাংকা কাতেরিনা মাসলভাকে জেলা আদালতে জুরির বিচারার্থে সোপর্দ করা হল।"

এই ভাবে সেক্রেটারি দীর্ঘ অভিযোগপত্র শেষ করল এবং কাগজপত্র ভাঁজ করে নিয়ে হাত দিয়ে লম্বা চুলগুলি ঠিকঠাক করে আসন গ্রহণ করল। সকলে এই কথা ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যে এইবার তদন্ত শুরু হবে, এই সব গোলযোগ পরিস্কার হয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। একমাত্র নেখ্‌লুদ্‌ভের মনে একথা জাগল না; যে মাসলভাকে সে দশ বছর আগে একটি নিরীহ মিষ্টি মেয়ে বলে জানত সেই মাসলভা কী এমন করতে পারে, সেই চিন্তার আতংকই তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলল।

অধ্যায়—১১

অভিযোগপত্র পড়া শেষ হলে কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট এমনভাবে কারতিংকিনের দিকে তাকাল যেন পরিষ্কার বলছে, "এবার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ আমরা পুরো সত্যটাই আবিষ্কার করব।"

বাঁদিকে ঝুঁকে সে বলল, "চাষী সাইমন কারতিংকিন।"

সাইমন কারতিংকিন উঠে দাঁড়াল, হাত দুটো দু' পাশে ঝুলিয়ে দিল এবং গোটা শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রেখে নিঃশব্দে গাল নাড়তে লাগল।

ডান দিকে ঝুঁকে প্রেসিডেন্ট বলল, "তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তুমি এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা ও কাতেরিনা মাসলভার সঙ্গে যোগসাজসে বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যান্টো থেকে টাকা চুরি করেছ, এবং তারপর সেঁকো বিষ সংগ্রহ করে এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডির সঙ্গে সেটা বণিক স্মেলকভকে খাওয়াতে কাতেরিনা মাসলভাকে প্ররোচিত করেছ ও স্মেলকভের মৃত্যু ঘটিয়েছ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?"

"কখনও না, কারণ আমাদের কাজই হচ্ছে অতিথিদের সেবা করা এবং—"

"সে সব কথা পরে বলবে। তুমি কি অপরাধ স্বীকার করছ?" শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট শুধাল।

"এমন কাজ করতেই পারি না, কারণ তাহলে—"

পরিচয়-ঘোষক পুনরায় সাইমন কারতিংকিনের কাছে ছুটে গেল এবং গম্ভীরভাবে ফিসফিস করে তাকে থামিয়ে দিল।

যে হাতে কাগজখানা ছিল সেটা সরিয়ে প্রেসিডেন্ট কনুইটাকে এমন ভাবে রাখল যেন সে বলতে চায় যে "কাজ শেষ হয়েছে", এবং তারপরই এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভার দিকে মুখ ফেরাল।

"এভ্‌ফিমিয়া বচ্‌কভা, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৮৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তুমি সাইমন কারতিংকিন ও কাতেরিনা মাসলভার সঙ্গে যোগসাজসে হোতেল মরিতানিয়াতে বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যান্টো থেকে কিছু টাকা ও একটা আংটি চুরি করেছ, এবং টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়ে বণিক স্মেলকভকে বিষ খাইয়েছ এবং সেই ভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?"

কয়েদী সাহসের সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, "আমি কোন দোষে দোষী নই। আমি সে ঘরের কাছেও যাই নি, কিন্তু এই ফিচ্‌কে মেয়েটা যখন ঘরে ঢুকেছিল তখন সব কিছু তারই কর্ম।"

প্রেসিডেন্ট পুনরায় শান্ত ও দৃঢ়স্বরে বলল, "সে কথা পরে বলবে। তাহলে তুমি অপরাধ স্বীকার করছ না?"

"আমি টাকা নেই নি, পানীয় দেই নি, বা ঘরের ভিতরে যাই নি। যদি যেতাম তাহলে ওকে লাথি মেরে বের করে দিতাম।"

"তাহলে তুমি অপরাধ স্বীকার করছ না?"

"কখনও না।"

"ঠিক আছে।"

তৃতীয় কয়েদীর দিকে ফিরে প্রেসিডেন্ট শুরু করল, "কাতেরিনা মাসলভা, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, বণিক স্মেলকভের পোর্টম্যাণ্টোর চাবি নিয়ে বেশ্যালয় থেকে এসে তুমি তার পোর্টম্যাণ্টো থেকে কিছু টাকা ও একটা আংটি চুরি করেছ।" বাঁদিক থেকে একজন সদস্য তার কানে কানে বলল যে, জিনিসের তালিকায় উল্লেখিত একটা পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রেসিডেন্ট মুখস্থ-করা পড়ার মত কথাগুলি বলে যেতে লাগল। "তার পোর্টম্যাণ্টো থেকে কিছু টাকা ও একটা আংটি চুরি করেছ এবং ভাগাভাগি করে নিয়েছ। তারপর স্মেলকভের সঙ্গে হোটেলে ফিরে গিয়ে তার পানীয়ে বিষ মিশিয়ে খেতে দিয়েছ এবং এই ভাবে তার মৃত্যু ঘটিয়েছ। তুমি অপরাধ স্বীকার করছ?"

সে দ্রুত জবাব দিতে লাগল, "আমি কোন দোষে দোষী নই। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আমি নেই নি—আমি নেই নি—আমি কিছুই নেই নি—আর আংটিটা সে নিজেই আমাকে দিয়েছিল।"

প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করল, "দু হাজার পাঁচশ পাউণ্ড চুরির অপরাধ তুমি স্বীকার কর না?"

"বলেছি তো, চল্লিশ রুবলের বেশী কিছুই আমি নেই নি।"

"আচ্ছা, বণিক স্মেলকভের পানীয়ের সঙ্গে একটা গুঁড়ো মিশিয়ে দেবার অপরাধ কি তুমি স্বীকার করছ?"

"হ্যাঁ, তা আমি করেছি। তবে তাদের কথা আমি বিশ্বাস করেছি। তারা বলেছিল ওটা ঘুমের ওষুধ, ওতে কোন ক্ষতি হবে না। আমি কখনও ভাবি নি, কখনও চাই নি.........ঈশ্বর আমার সাক্ষী, এ আমি কখনও চাইনি," সে বলল।

সভাপতি বলল, "তাহলে বণিক স্মেলকভের টাকা ও আংটি চুরির অভিযোগ তুমি স্বীকার করছ না; কিন্তু তুমি যে তাকে গুঁড়োটা দিয়েছিলে তা স্বীকার করছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা স্বীকার করছি; কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ওটা ঘুমের ওষুধ। তাকে ঘুম পাড়াবার জন্যই ওটা দিয়েছিলাম; এ রকম খারাপ কিছু হোক আমি চাই নি, কখনও ভাবিও নি।"

"খুব ভাল কথা," ফলাফল যতটা পাওয়া গেল তাতে বেশ সন্তুষ্ট হয়েই প্রেসিডেন্ট বলল। "এবার বলতো কি ভাবে সব ঘটনাটা ঘটল।" প্রেসিডেন্ট চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটি টেবিলের উপর রাখল। "সব কথা খুলে বল। স্বাধীন ও পূর্ণ স্বীকারোক্তি দিলে তোমার সুবিধাই হবে।"

মাসলভা নীরবে প্রেসিডেন্টের দিকে সোজা তাকিয়ে রইল।

"আমাদের বল কি ভাবে সব ঘটল।"

হঠাৎ মাসলভা দ্রুত কথা বলতে শুরু করল, "কিভাবে ঘটল! আমি হোটেলে এলাম। ঘরটা দেখিয়ে দেওয়া হল। সে সেখানেই ছিল, মদে একেবারে চুর।" বিস্ফারিত দুই চোখে আতংক ফুটিয়ে মাসলভা "সে" কথাটা উচ্চারণ করল। "আমি চলে যেতে চাইলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়বে না।" সে থামল, মনে হল কথার সূত্র হারিয়ে ফেলেছে, বা অন্য কোন কথা মনে পড়েছে।

"আচ্ছা ; তারপর?"

"তারপর? কিছুক্ষণ থেকে আমি বাড়ি চলে গেলাম।"

এই সময়ে একটা কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে সরকারী উকিল নিজেকে একটুখানি তুলে ধরল।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি কোন প্রশ্ন করতে চান?" সম্মতি-সূচক জবাব পেয়ে সভাপতি ইঙ্গিতে সরকারী উকিলকে কিছু বলতে আহ্বান করল।

"আমি প্রশ্ন করতে চাই, কয়েদী কি আগে থেকেই সাইমন কারতিংকিনের সঙ্গে পরিচিত ছিল?" মাসলভার দিকে না তাকিয়েই সরকারী উকিল কথাগুলি বলল এবং প্রশ্ন শেষ করে ঠোঁট দুটি চেপে ধরে ভুরু কুঞ্চিত করল।

প্রেসিডেন্ট প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করল। মাসলভা ভীত দৃষ্টিতে সরকারী উকিলের দিকে তাকাল।

"সাইমনের সঙ্গে? হ্যাঁ," সে বলল।

"আমি জানতে চাই, কারতিংকিনের সঙ্গে কয়েদীর কি ধরনের পরিচয় ছিল? তাদের কি প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হত?"

"কি ধরনের?......অতিথিদের জন্য সে আমাকে ডেকে আনত ; আসলে সেটা কোন পরিচয়ই নয়," চোখের দৃষ্টিটা উদ্বেগের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট থেকে সরকারী উকিলের দিকে এবং আবার প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরিয়ে মাসলভা জবাব দিল।

চোখ দুটো অর্ধেক বুজে, একটা ধূর্ত মেফিস্টোফেলিস-সুলভ হাসি হেসে সরকারী উকিল বলল, "আমি জানতে চাই, কারতিংকিন অন্য কোন মেয়েকে না ডেকে শুধু মাসলভাকেই বা ডাকত কেন?"

চারদিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো নেখ্‌লুদভের উপর নিবদ্ধ করে মাসলভা বলল, "আমি জানি না। কেমন করে জানব? তার যাকে খুশি তাকেই ডাকত।"

"এ কি সম্ভব যে ও আমাকে চিনতে পেরেছে?" এ কথা ভাবতেই সব রক্ত নেখ্‌লুদভের মুখে ছুটে এল। কিন্তু তাকে অন্য সকলের থেকে পৃথক না করে মাসলভা ঘুরে আবার সরকারী উকিলের দিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

"অতএব কারতিংকিনের সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা কয়েদী অস্বীকার করছে। খুব ভাল। আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই।"

তখন প্রেসিডেন্ট আবার কথা বলল, "আচ্ছা, তারপর কি হল?"

প্রেসিডেন্টের দিকে অধিকতর সাহসের সঙ্গে তাকিয়ে মাসলভা বলল, "আমি বাসায় ফিরে এলাম এবং বাড়িউলিকে টাকাটা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সবে ঘুম এসেছে এমন সময় বার্থা বলে একটি মেয়ে আমাকে ডেকে তুলল। "যাও, তোমার সেই বণিক আবার এসেছে।" আমি যেতে চাই নি, কিন্তু মাদাম আমাকে যেতে বলল। সে"—আবারও বেশ ভীতির সঙ্গেই "সে" শব্দটা উচ্চারণ করল—"সে মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি চালাতে লাগল এবং আরও মদ আনতে বলল; কিন্তু তখন তার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে, আর মাদামও তাকে বিশ্বাস করে না, কাজেই সে আমাকে আস্তানায় পাঠাল, আর বলে দিল কোথায় টাকা আছে এবং কত টাকা আনতে হবে। কাজেই আমিও গেলাম।"

প্রেসিডেন্ট বাঁ দিকের সদস্যের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিল, কিন্তু যাতে সকলে বুঝতে পারে যে সব কথাই সে শুনছে তাই সে শেষের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল।

"তাহলে তুমি গেলে। বেশ, তারপর কি হল?"

"আমি গিয়ে তার কথামত কাজ করলাম; তার ঘরে গেলাম। আমি একা যাই নি, সাইমন কারতিংকিন ও ওকেও ডেকে নিলাম," সে বচ্‌কভাকে দেখিয়ে বলল।

"মিথ্যে কথা, আমি কখনও ঘরে ঢুকি নি," বচ্‌কভা বলতে শুরু করতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হল।

ভুরু কুঁচকে বচ্‌কভার দিকে না তাকিয়ে মাসলভা বলতে লাগল, "ওদের সামনেই চারখানা দশ-রুবলের নোট বের করলাম।"

উকিল আবার প্রশ্ন করল, "ঠিক কথা, কিন্তু চল্লিশ রুবল বের করার সময় কয়েদী কি লক্ষ্য করেছিল সেখানে কত টাকা ছিল?"

যখনই উকিল তাকে কিছু বলে তখনই মাসলভা কেঁপে ওঠে; কেন এ রকম হয় সে জানে না, কিন্তু এটা বুঝতে পারে যে সে তার ক্ষতি করতে চাইছে।

"আমি গুণে দেখি নি, শুধু কতকগুলি একশ' রুবলের নোট দেখেছিলাম।"

"আহা। কয়েদী একশ' রুবলের নোটগুলি দেখেছিল। ঠিক আছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বলল, "তাহলে তুমি টাকাটা নিয়ে এলে।"

"নিয়ে এলাম।"

"আচ্ছা, তারপর?"

"তখন সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল," মাসলভা বলল।

"আচ্ছা, গুঁড়োটা তাকে কি ভাবে দিলে? পানীয়ের সঙ্গে?"

"কি ভাবে দিলাম? মিশিয়ে দিয়ে দিলাম।"

"কেন দিলে ?"

সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলল, "সে আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না, আর আমিও খুবই ক্লান্ত, তাই দালানে গিয়ে সাইমনকে বললাম : 'সে যদি আমাকে ছেড়ে দিত, আমি বড়ই ক্লান্ত।' তখন সে বলল, 'ওকে নিয়ে আমরাও আর পারছি না ; ওকে একটা ঘুমের ওষুধ দেবার কথা ভাবছি ; তাহলেই ও ঘুমিয়ে পড়বে আর তুমিও চলে যেতে পারবে।' তখন আমি বললাম, 'ঠিক আছে।' আমি ভাবলাম ওতে কোন ক্ষতি হবে না, আর সে-ই আমাকে প্যাকেটটা দিল। আমি ভিতরে গেলাম। সে বেড়ার ও-পাশে শুয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গেই ব্র্যাণ্ডি চাইল। টেবিল থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতলটা নিয়ে দুটো গ্লাসে ঢাললাম ; একটা তার জন্য আর একটা আমার ; তার গ্লাসে গুঁড়োটা ঢেলে দিয়ে তাকে দিলাম। আগে জানলে কি তাকে সেটা দিতে পারতাম ?"

"আচ্ছা, আংটিটা তোমার হাতে এল কি করে ?" প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করল।

"সে নিজেই আমাকে দিয়েছিল।"

"কখন দিয়েছিল ?"

"যখন তার আস্তানায় ফিরে গেলাম তখন। আমি চলে যেতে চাইলে সে আমার মাথায় আঘাত করে চিরুনিটা ভেঙে দিল। আমি রেগে গিয়ে বললাম যে চলে যাব, সে তখন আঙুল থেকে আংটিটা খুলে আমাকে দিল যাতে আমি না যাই," মাসলভা বলল।

সরকারী উকিল নিজেকে একটুখানি তুলে ধরে বলল, "আমি জানতে চাই, বণিক স্মেলকভের ঘরে কয়েদী কতক্ষণ ছিল ?"

মাসলভা আবার ভয় পেল ; উৎকণ্ঠিত ভাবে সরকারী উকিলের উপর থেকে প্রেসিডেন্টের উপর দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত বলে উঠল :

"কতক্ষণ ছিলাম আমার মনে নেই।"

"বটে, কিন্তু কয়েদীর কি মনে পড়ে স্মেলকভের ঘর থেকে বেরিয়ে সে হোটেলের অন্য কোথাও গিয়েছিল কি না ?"

মাসলভা এক মুহূর্ত ভাবল। "হ্যাঁ, পাশের একটা খালি ঘরে গিয়েছিলাম।"

সরকারী উকিল নিজের কথা ভুলে মাসলভাকে সরাসরি প্রশ্ন করল, "ঠিক, কিন্তু সেখানে গিয়েছিলে কেন ?"

"একটু বিশ্রাম নিতে এবং একটা ইজভজচিক ডেকে আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম।"

"আর সে ঘরে কারতিংকিন কয়েদীর সঙ্গে ছিল কি না ?"

"সে এসেছিল।"

"কেন এসেছিল ?"

"বণিকের ব্র্যাণ্ডি কিছুটা বেচে গিয়েছিল, দুজনে সেটা শেষ করেছিলাম।"

"ওহো, দুজনে একত্রে শেষ করেছিলে! খুব ভাল!! আর কয়েদী কি কারতিংকিনের সঙ্গে কথা বলেছিল, এবং বলে থাকলে কি বিষয়ে কথা বলেছিল?"

মাসলভা হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল, তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল; সে দ্রুত বলে উঠল:

"কি বিষয়ে? কোন বিষয়েই আমি কথা বলি নি; বাস্, আমি এইটুকুই জানি। আপনার যা খুশি করতে পারেন; আমি নির্দোষ, বাস্।

"আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই," এই কথা বলে একটু অস্বাভাবিক ভাবে কাঁধ দুটোকে উঁচু করে সে তার বক্তৃতার নোটের মধ্যে লিখল, কয়েদীর নিজের সাক্ষ্যমোতাবেকই জানা যায় যে কারতিংকিনের সঙ্গে সে খালি ঘরটায় গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

"তোমার আর কিছু বলবার নেই?"

"সব কথাই বলেছি," দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাগুলি বলে সে বসে পড়ল।

তখন প্রেসিডেণ্ট কি যেন নোট করল, এবং বাঁ দিককার সদস্যটি তার কানে কানে কি যেন বলায় দশ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করে দ্রুত উঠে আদালত-কক্ষ ত্যাগ করল। সদয় চোখ দাড়িওয়ালা দীর্ঘকায় সদস্যটি তাকে জানিয়েছে যে হজমের গোলমালের জন্য তার কিছুটা 'ম্যাসাজ' করা ও ওষুধ খাওয়া দরকার। আর সেই জন্যই আদালতের কাজের বিরতি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিচারকরা উঠে দাঁড়ালে অ্যাডভোকেট, জুরি ও সাক্ষীরাও উঠে দাঁড়াল, এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটা অংশ শেষ হয়েছে এই খুশির মনোভাব নিয়ে যে যার জায়গায় চলে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ জুরিদের ঘরে গিয়ে জানালার পাশে বসল।

অধ্যায়—১২

"হ্যাঁ, এই সেই কাতয়ুশা!"

নেখ্‌ল্যুদভ ও কাতয়ুশার সম্পর্কটা এই ভাবে গড়ে উঠেছিল:

নেখ্‌ল্যুদভ যখন প্রথম কাতয়ুশাকে দেখে তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র; গ্রীষ্মের ছুটিটা পিসীদের কাছে কাটাতে এসে ভূমি-স্বত্বের উপর একটা প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত। এর আগে পর্যন্ত সে সব সময়ই গ্রীষ্মকালটা কাটিয়েছে তার মা ও দিদির সঙ্গে, মায়ের মস্কোর নিকটবর্তী মস্ত বড় জমিদারিতে। কিন্তু সে বছর তার দিদির বিয়ে হয়ে গেল, আর মাও চলে গেল বাইরে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানের জায়গায়, কাজেই সে স্থির করল, প্রবন্ধটা

লিখবার জন্য গ্রীষ্মকালটা পিসীদের বাড়িতেই কাটাবে। জায়গাটা খুবই চুপচাপ, আর তার মনোযোগ আকর্ষণ করার মতও কিছু সেখানে নেই ; পিসীরা এই ভাই-পো এবং উত্তরাধিকারীটিকে খুবই ভালবাসে, আর সেও তাদের দুজনকে এবং তাদের সরল সেকেলে জীবনযাত্রাকে পছন্দ করে।

পিসীদের বাড়িতে সে তার জীবনযাত্রাকে এই ভাবে ছকে নিল। খুব সকালে—অনেক দিন তিনটের সময়—ঘুম থেকে উঠে সূর্যোদয়ের আগেই ভোরের কুয়াসার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের নীচেকার নদীতে স্নান করতে চলে যেত। যখন ফিরত তখনও ঘাসের উপরে ও ফুলের বুকে শিশির-বিন্দু চিকচিক করত। কখনও কফি খেয়ে প্রবন্ধটা লেখার জন্য বই ও কাগজপত্র নিয়ে বসত ; কিন্তু প্রায়ই লেখাপড়ার বদলে বাড়ি ছেড়ে মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। খাবার আগে বাগানেই কোন জায়গায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। খাবার সময় পিসীদের সঙ্গে খুব হাসি-ঠাট্টা করত, তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে পড়ত, নয়তো নদীতে যেত নৌকো চালাতে। আর সন্ধ্যায় কখনও পড়তে বসত, আবার কখনও বা পিসীদের সঙ্গে "পেশেন্স" খেলত।

অনেক রাতে, বিশেষ করে চাঁদনি রাতে, জীবনের আনন্দের আবেগে তার মন এমনভাবে ভরে উঠত যে সে ঘুমুতে পারত না ; না ঘুমিয়ে নিজের স্বপ্নে ও চিন্তায় বিভোর হয়ে সে বাগানে ঘুরে বেড়াত, কখনও কখনও রাত ভোর হয়ে যেত।

এইভাবে সুখে ও শান্তিতে পিসীদের বাড়িতে একটা মাস কেটে গেল। পিসীদের আধা-সন্তান আধা-দাসী কৃষ্ণাঙ্গী, দ্রুত-সঞ্চারিণী কাতয়ুশার দিকে তার কোন রকম নজরই পড়ল না। মায়ের পক্ষছায়ায় বড় হবার দরুন সেই সময় (উনিশ বছর বয়স) পর্যন্ত নেখ্‌ল্যুদভ ছিল একান্তভাবে পবিত্র। কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বপ্নেও দেখা দিত তবে পত্নীরূপেই দেখা দিত। অন্য সব স্ত্রীলোক, যাদের সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না, তারা তার কাছে স্ত্রীলোক নয়, মনুষ্যমাত্র।

কিন্তু সেই গ্রীষ্মকালের "পুনরুত্থান দিবসে" পিসীদের এক প্রতিবেশী সপরিবারে—দুটি তরুণী কন্যা ও একটি স্কুলে-পড়া পুত্রসহ—এবং তাদের সঙ্গে অবস্থানকারী চাষী পরিবারের এক তরুণ শিল্পীকে নিয়ে ঐ দিনটি তাদের বাড়িতে কাটাতে এল। চায়ের পরে সকলে বাড়ির সামনেকার সদ্য ঘাস-কাটা মাঠটায় খেলতে গেল। সেখানে তারা খেলা শুরু করল এবং কাতয়ুশাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ছুটতে ছুটতে ও বার কয়েক খেলার সঙ্গী বদল করতে করতে একবার নেখ্‌ল্যুদভ কাতয়ুশাকে ধরে ফেলল এবং সে তার সঙ্গী হল। এতদিন পর্যন্ত কাতয়ুশার চোখের দৃষ্টি তার ভাল লাগত, কিন্তু তার সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সম্ভাবনা কখনও তার মনে আসে নি।

তখন স্ফূর্তিবাজ তরুণ শিল্পীটির ধরবার পালা। ছোট, বাঁকা, কিন্তু শক্তিশালী

চাষীসুলভ পা দুটির জন্য সে খুব দ্রুত দৌড়তেও পারে। তবু সে বলে উঠল, "ওরা হোঁচট খেয়ে না পড়লে ও জুটিকে ধরা অসম্ভব।"

"তুমি!......আমাদের ধরতে পারছ না?" কাতয়ুশা বলল।

"এক, দুই, তিন," শিল্পী হাততালি দিল।

কাতয়ুশা হাসতে হাসতেই শিল্পীর পিছনে গিয়ে নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করে নিল এবং নিজের ছোট খসখসে হাত দিয়ে তার বড়সড় হাতটা চেপে ধরে মাড়-দেওয়া পেটিকোটের খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে বাঁ দিকে দৌড়ে গেল।

শিল্পীর নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টায় নেখ্‌লয়ুদভ ছুট দিল ডান দিকে; কিন্তু পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল, শিল্পী কাতয়ুশার পিছনে ছুটছে, যদিও সে খুব জোর ছুটতে পারে বলে কাতয়ুশা বেশ কিছুটা এগিয়েই আছে। তাদের সামনে একটা লিলাক ফুলের ঝোঁপ ছিল। কাতয়ুশা মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল, নেখ্‌লয়ুদভ যেন ঐ ঝোঁপের পিছনে তার সঙ্গে মিলিত হয়; কারণ আবার যদি তারা হাতে হাত ধরতে পারে তাহলেই তারা নিরাপদ—এটাই হল খেলার নিয়ম। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সে ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে দৌড় দিল; কিন্তু সে জানত না যে বিচুটির গাছে ভরা একটা ছোট খানা সেখানে ছিল, তাই সে হোঁচট খেয়ে শিশির-ভেজা বিচুটির জঙ্গলের মধ্যে পড়ে গেল; তার হাত চুলকোতে লাগল; তবু সে তৎক্ষণাৎ হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

কাতয়ুশাও কালো চোখ নাচিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে তার দিকে ছুটে গেল এবং দুজন দুজনের হাত চেপে ধরল।

অন্য হাত দিয়ে চুল ঠিক করতে করতে স্মিত হাসিতে তার দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস টানতে টানতে কাতয়ুশা বলল, "নির্ঘাৎ তোমার হাত চুলকোচ্ছে?"

কাতয়ুশার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে সেও হাসতে হাসতে বলল, "আমি জানতাম না যে ওখানে একটা খানা আছে।" মেয়েটি আরও কাছে এগিয়ে এল, আর ছেলেটিও কিসে কি হল না বুঝেই তার দিকে মাথা নীচু করল। মেয়েটি সরে গেল না, আর ছেলেটি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে চুম্বন করল।

"আরে! কী করলে!" বলেই তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে মেয়েটি ছেলেটির কাছ থেকে দৌড়ে চলে গেল।

দুটো ফুল-ঝরা লিলাকের ডাল ভেঙে নিয়ে মেয়েটি তার উত্তপ্ত মুখের উপর হাওয়া করতে লাগল; তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে দুটি হাত দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল এবং অন্য খেলুড়েদের দলে মিশে গেল।

এর পর থেকেই নেখ্‌লয়ুদভ ও কাতয়ুশার মধ্যে সেই অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠল যা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট দুটি পবিত্র তরুণ-তরুণীর মধ্যে প্রায়ই গড়ে ওঠে।

কাতয়ুশা যখন ঘরে আসে, অথবা তার সাদা এপ্রনটা যখন দূর থেকে দেখা

যায়, তখনই নেখ্‌লয়ুদভের চোখে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ; ঠিক যেমন সূর্য উঠলে সব কিছুই আকর্ষণীয় ও খুশিতে ভরা বলে মনে হয়। সমস্ত জীবনটাই যেন খুশিতে ভরে উঠল। কাতয়ুশার মনেও সেই একই ভাব। কিন্তু শুধু যে কাতয়ুশার উপস্থিতিতেই নেখ্‌লয়ুদভের মনে এ রকম ভাবান্তর দেখা দেয় তা নয়। কাতয়ুশা আছে এই চিন্তাই (ওদিকে কাতয়ুশার কাছেও নেখ্‌লয়ুদভ আছে এই চিন্তাই) মনে ওই ভাবান্তর এনে দেয়।

মায়ের কাছ থেকে কোন অপ্রীতিকর চিঠিই আসুক, আর প্রবন্ধ রচনায় বাধাই আসুক, অথবা যৌবনের অকারণ বিষণ্ণতা তার মনকেই ঘিরে ধরুক, তার একমাত্র স্বপ্ন কাতয়ুশা, একমাত্র কাজ তার দর্শন, আর সবই মিথ্যা মনে হয়।

কাতয়ুশাকে বাড়ির অনেক কাজ করতে হত, তবু সে পড়াশুনার জন্য একটু সময় করে নিত ; নেখ্‌লয়ুদভ তাকে দস্তয়েভ্‌স্কি ও তুর্গেনিভ পড়তে দিয়েছে (বইগুলি সেও সবেমাত্র পড়েছে)। তার সব চাইতে ভাল লাগে তুর্গেনিভের A Quiet Nook (একটি শান্ত নীড়)। দালানে বা বারান্দায় বা উঠোনে, বিশেষ করে পিসীদের বুড়ি দাসী মাতরিয়না পাভ্‌লভ্‌নার ঘরে, যেখানে যখনই তাদের দেখা হয়ে যায়, তখনই তারা কিছুটা কথাবার্তা বলে নেয়। মাতরিয়না পাভ্‌লভ্‌নার সামনে যে সব কথা হয় সেগুলিই তাদের সব চাইতে ভাল লাগে। যখন তারা একা থাকে তখনই ব্যাপারটা কেমন যেন বাঁকা পথ ধরে। তারা মুখে যা বলে থাকে, চোখে চোখে তখন যেন তার থেকে আলাদা রকমের গুরুতর কিছু কথা ফুটে ওঠে। তখন তাদের ঠোঁট বেঁকে যায় এবং এমন একটা ভয়ের কিছু তাদের মনে উঁকি দেয় যে দ্রুতগতিতে তারা দু'দিকে চলে যায়।

প্রথমবার এসে পিসীদের কাছে বাকি যে ক'টা দিন সে ছিল তখন নেখ্‌লয়ুদভ ও কাতয়ুশার মধ্যে এই ধরনের মেলামেশাই চলতে লাগল। পিসীরা সব দেখে শুনে ভয় পেয়ে গেল, এমন কি তার মা প্রিন্সেস ইয়েলেনা আইভানভনাকে সে কথা লিখেও জানাল। পিসী মারিয়া আইভানভনার ভয় ছিল যে, দিমিত্রি হয়তো কাতয়ুশার সঙ্গে একটা অবৈধ ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়ে বসবে ; কিন্তু তার এই ভয় ছিল ভিত্তিহীন, কারণ নিজে সচেতনভাবে না বুঝেই নেখ্‌লয়ুদভ কাতয়ুশাকে ভালবাসত, এমন ভালবাসত যা একমাত্র যারা পবিত্র-হৃদয় তারাই বাসতে পারে, আর সেখানেই ছিল তাদের দুজনের নিরাপত্তা। শুধু যে তার দেহকে ভোগ করবার কোন বাসনা তার ছিল না তাই নয়, সে কথা চিন্তা করলেই তার মন আতংকে ভরে উঠত। বরং কাব্যময়ী সোফিয়া আইভানভনা যে ভয় করেছিল যে দিমিত্রি যে-রকম পুরোপুরি দৃঢ় চরিত্রের ছেলে তাতে একটি মেয়েকে ভালবাসলে সে হয়তো তার কুল, শীল ও মর্যাদার কথা না ভেবেই তাকে বিয়ে করে ফেলতে পারে, সেই ভয়টাই দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কিন্তু এ সব কথা পিসীরা কেউই নেখ্‌লয়ুদভকে বলে নি, ফলে সে যখন সেখান থেকে চলে গেল তখনও কাতয়ুশার প্রতি তার ভালবাসা তার কাছে অজানাই রয়ে গেল।

সে ঠিক জানত, যে জীবনানন্দ তার সমগ্র সত্তাকে পূর্ণ করেছে কাতয়ুশার প্রতি তার মনোভাব তারই একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র; আর এই মিষ্টি খুশি-খুশি মেয়েটিও তার সেই আনন্দের অংশীদার। তথাপি তার চলে যাবার সময় যখন পিসিদের সঙ্গে কাতয়ুশাও ফটকে এসে দাঁড়াল, যখন সে ঈষৎ টেরা জলভরা কালো চোখে তাকে দেখতে লাগল, তখন নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল, এমন সুন্দর ও মূল্যবান কিছু সে পিছনে ফেলে যাচ্ছে যা আর কোনদিন তার জীবনে ফিরে আসবে না। ফলে তার মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে সোফিয়া আইভান্‌ভনার টুপির ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সে বলল, "বিদায় কাতয়ুশা, সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

চোখের জল চেপে রেখে মধুর নরম গলায় মেয়েটি বলল, "বিদায় দিমিত্রি আইভানচিভ"; পরক্ষণেই সে ছুটে হলে চলে গেল; সেখানে সে শান্তিতে কাঁদতে পারবে।

অধ্যায়—১৩

তারপর তিনটি বছর নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে কাতয়ুশার দেখা হয় নি। আবার যখন দেখা হল তখন সবেমাত্র অফিসার হিসাবে কমিশন পেয়ে সে রেজিমেণ্টে যোগ দিতে চলেছে। যাবার পথে কয়েকটা দিন পিসীদের সঙ্গে কাটাতে এসেছে। কিন্তু তিন বছর আগে যে যুবক গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটিয়েছিল এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন সে ছিল সৎ, নিঃস্বার্থ একটি ছেলে, যে কোন ভাল কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত; এখন সে ভ্রষ্টচরিত্র, আত্মপরায়ণ, নিজের ভোগই তার একমাত্র চিন্তা। তখন ঈশ্বরের পৃথিবী ছিল একটা রহস্য, আর একান্ত উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে সে রহস্য-সমাধানের চেষ্টা সে করত; এখন জীবনের সব কিছুই স্পষ্ট ও সরল, তার নিজের জীবনযাত্রার অবস্থার দ্বারা বিধিবদ্ধ। তখন নিজের আত্মাকেই সে তার প্রকৃত আমি বলে মনে করত; এখন তার স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ বলবান জান্তব আমিকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে।

তার মধ্যে এই ভয়ংকর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল কারণ তখন সে নিজেকে বিশ্বাস না করে অপরকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আর তাও করেছে কারণ নিজেকে বিশ্বাস করে বেঁচে থাকা বড় শক্ত; নিজেকে বিশ্বাস করলে নিজেকেই সব প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়, আর সে মীমাংসা আবার নিজের

জান্তব আমির স্বপক্ষে না গিয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তার বিপক্ষেই যায়। আর অন্যকে বিশ্বাস করলে, নিজের মীমাংসা করবার কিছুই থাকে না; সব কিছুর মীমাংসা তো আগে থেকেই হয়ে আছে, হয়ে আছে আত্মার বিপক্ষে এবং জান্তব আমির স্বপক্ষে। শুধু তাই নয়। নিজেকে বিশ্বাস করলেই চারদিক থেকে আগত নিন্দার সম্মুখীন হতে হবে; আর অন্যকে বিশ্বাস করলেই মিলবে সকলের সমর্থন।

প্রথম প্রথম নেক্‌ল্‌যুদভ লড়াই করেছে: নিজের উপরে বিশ্বাস রেখে যা কিছু সে ভাল মনে করেছে তাকেই সকলে বলেছে মন্দ, আর যাকে সে মনে করেছে পাপ আশেপাশের সকলেই তাকেই বলেছে ভাল। ক্রমে সংগ্রাম তীব্রতর হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নেখ্‌ল্‌যুদভ হাল ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ নিজেকে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিয়ে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। প্রথম দিকে নিজের উপর বিশ্বাস হারানোটা খুবই খারাপ লেগেছে, কিন্তু ক্রমে সে ভাব কেটে গেছে। সেই সময়ে সে ধূমপান ও মদ্যপানের অভ্যাস করে ফেলেছে; ফলে শীঘ্রই মনের ভাবটা কাটিয়ে উঠে পরম স্বস্তিবোধ করতেও শিখেছে।

নেখ্‌ল্যুদভের প্রকৃতিই আবেগপ্রধান। ফলে পারিপার্শ্বিক সকলের দ্বারা সমর্থিত নতুন জীবনযাত্রার কাছে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিল, আর অন্তরের যে বাণী পৃথক কিছুর দাবী জানায় তার কণ্ঠকে সম্পূর্ণভাবে রোধ করে দিল। পিতার্সবার্গ যাবার পর থেকেই এটা আরম্ভ হয়, আর চরমে ওঠে যখন সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়।

সামরিক জীবন সাধারণতই মানুষকে ভ্রষ্টচরিত্র করে থাকে। সে জীবন মানুষকে ঠেলে দেয় পরিপূর্ণ আলস্যের মধ্যে, অর্থাৎ সে জীবনে বুদ্ধিসঙ্গত উপকারধর্মী কোন কাজ থাকে না; সাধারণ মানবিক কর্তব্য থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় রেজিমেন্টের প্রতি, ইউনিফর্মের প্রতি, পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একান্ত গতানুগতিক কর্তব্যভার; এবং একদিকে যেমন অপরের প্রতি প্রভুত্ব করবার নিরংকুশ ক্ষমতা তাদের হাতে তুলে দেয়, অন্যদিকে আবার উর্ধ্বতর মর্যাদায় আসীনদের প্রতি দাসসুলভ বশ্যতায় তাদের বেঁধে ফেলে।

সামরিক চাকরির এই সাধারণ চারিত্রিক ভ্রষ্টতার সঙ্গে যখন যুক্ত হয় প্রচুর অর্থ ও রাজপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশাজনিত চরিত্রভ্রষ্টতা, তখন সে চরিত্রভ্রষ্টতা রূপান্তরিত হয় আত্মকেন্দ্রিকতার এক বল্গাহীন নেশায়। যে মুহূর্তে নেখ্‌ল্যুদভ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করল এবং সঙ্গী-সাথীদের মত জীবনযাত্রা শুরু করল, তখন থেকেই এই আত্মকেন্দ্রিকতার নেশা তাকেও পেয়ে বসল। অপরের দ্বারা চমৎকারভাবে তৈরি ও সুন্দরভাবে ব্রাশ করা ইউনিফর্মে এবং অপরের দ্বারা তৈরি, পরিষ্কার করা ও হাতে তুলে দেওয়া অস্ত্রে নিজেকে সুসজ্জিত করা, আর অপরের দ্বারা লালিত-পালিত, পোষ মানানো

ঘোড়ায় পিঠে চড়ে প্যারেড করা—এ ছাড়া আর কোন কাজ তার ছিল না। সেখানে তার মতই অন্য আরও অনেকের সঙ্গে তাকে তলোয়ার ঘোরাতে হত, বন্দুক ছুঁড়তে হত, এবং অন্যকেও সেই সব কাজ শেখাতে হত। আর কোন কাজ তার ছিল না। উচ্চপদস্থ যুবক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিরা, স্বয়ং জার ও তার আশেপাশের লোকরা শুধু যে এ সব কাজকে মঞ্জুর করেছে তাই নয়, এ জন্য তাকে প্রশংসা করেছে, ধন্যবাদ দিয়েছে।

এ ছাড়া আর যে সব কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হত, ভাল বলা হত, সেগুলো হল, অদৃশ্য সূত্র থেকে পাওয়া প্রচুর টাকা উড়িয়ে অফিসারদের ক্লাবে এবং সেরা রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া করা, বিশেষ করে মদ্যপান করা ; তারপর থিয়েটার, বলনাচ, মেয়েমানুষ ; তারপর আবার ঘোড়ায় চড়া, তলোয়ার ঘোরানো, লাফঝাঁপ করা এবং আবার টাকা ওড়ানো—মদ, তাস, আর মেয়েমানুষ।

একজন সামরিক কর্মচারী এই ধরনের জীবন নিয়ে গর্ববোধ করে থাকে, বিশেষ করে যখন যুদ্ধ চলতে থাকে। নেখ্‌লুদভও সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণার ঠিক পরেই। "যুদ্ধে জীবন বলি দিতে আমরা প্রস্তুত, আর সেই জন্য স্ফূর্তিবাজ উচ্ছৃংখল জীবন শুধু ক্ষমার্হই নয়, আমাদের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন—আর তাই সেই জীবনই আমরা যাপন করি।"

জীবনের ঐ অধ্যায়ে নেখ্‌লুদভের মনেও এই ধরনের এলোমেলো চিন্তাই কাজ করছিল ; এবং নৈতিক সংযমের যে আদর্শকে সে এক সময় গ্রহণ করেছিল তা থেকে মুক্তি পেয়ে পরম আনন্দে মশগুল হয়েই ছিল। আত্ম-কেন্দ্রিকতার এক সার্বিক নেশায় সেও তখন মজেছিল।

মনের এই অবস্থা নিয়েই প্রায় তিন বছর পরে আবার সে পিসীদের সঙ্গে দেখা করতে এল।

অধ্যায়—১৪

নেখ্‌লুদভ পিসীদের সঙ্গে দেখা করতে গেল, কারণ যে রাস্তা ধরে তাকে রেজিমেন্টে যোগ দিতে যেতে হবে (রেজিমেন্ট ইতিমধ্যেই সীমান্তে চলে গেছে) তার কাছেই পিসীদের বাড়ি ও জমিদারি, কারণ পিসীরা খুবই আদর করে তাকে যেতে লিখেছে, এবং বিশেষ কারণ কাতয়ুশার সঙ্গে দেখা করতে তার মন চেয়েছে। হয়তো তার বর্তমান অসংযত জান্তব সত্তার নির্দেশমত কাতয়ুশার বিরুদ্ধে একটা শয়তানী মতলব সে মনের অতলে ইতিমধ্যেই গড়ে তুলেছিল ; অবশ্য সচেতনভাবে সে সব কথা সে ভাবে নি ; সে শুধু চেয়েছিল সেই জায়গাটা আবার দেখতে যেখানে একদিন সে সুখে কাটিয়েছে, চেয়েছিল

তার স্নেহশীলা পিসীদের দেখতে যারা তাকে ভালবাসা ও প্রশংসা দিয়ে ঘিরে রেখেছে, এবং চেয়েছিল সেই মিষ্টি কাতয়ুশাকে দেখতে যার মধুর স্মৃতি তার মনকে ছেয়ে আছে।

মার্চ মাসের শেষের দিকে গুডফ্রাইডের দিন সে পৌঁছল। তখন বরফ গলতে শুরু করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। জামা-কাপড় সব ভিজে গেছে। বেশ শীতও করছে, তবু তার মন উৎসাহ ও উত্তেজনায় ভরপুর। নীচু ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বরফে-ঢাকা সেই চেনা সেকেলে ধরনের আঙিনায় ঢুকতে ঢুকতে সে ভাবল, "সে এখনও এখানে আছে তো?"

সে আশা করেছিল স্লেজের ঘণ্টা শুনেই কাতয়ুশা বাইরে আসবে, কিন্তু সে এল না। যে দুটি মেয়েমানুষ এতক্ষণ মেঝে পরিষ্কার করছিল তারাই খালি পায়ে বালতি হাতে স্কার্ট গুঁজে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। সদর দরজায়ও তাকে দেখা গেল না; শুধু চাকর তিখন ঝাড়পোছ ফেলে রেখে এপ্রনটা চাপিয়েই ফটকের সামনে হাজির হল। পাশের ঘরে পিসী সোফিয়া আইভানভনা একাই তার সঙ্গে দেখা করল; তার পরণে রেশমের পোষাক ও টুপি।

সোফিয়া আইভানভনা তাকে চুমো খেয়ে বলল, "আরে, কী ভাগ্যি তুমি এসেছ। মারিয়ার শরীরটা ভাল নয়; গীর্জায় খুব ক্লান্ত বোধ করছিল; আমরা দীক্ষা নিতে গিয়েছিলাম।"

সোফিয়া আইভানভনার হস্ত চুম্বন করে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "তোমাকে অভিনন্দন জানাই সোফিয়া পিসী। (যারা দীক্ষা গ্রহণ করে তাদের অভিনন্দন জানানো একটা রুশ প্রথা)। আহা, তোমাকে যে ভিজিয়ে দিলাম; আমাকে ক্ষমা কর।"

"আরে, তুমি যে ভিজে জল হয়ে গেছ। শিগ্‌গির তোমার ঘরে যাও। আরে বাস, তোমার দেখছি গোঁফ গজিয়েছে?······কাতয়ুশা! কাতয়ুশা! ওকে কফি দাও; জলদি।"

"এক মিনিটের মধ্যে", দালান থেকে ভেসে এল সুপরিচিত মধুর কণ্ঠ; নেখ্‌লয়ুদভের অন্তর যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ঐ তো সে।" মনে হল, মেঘের আড়াল থেকে যেন সূর্য দেখা দিয়েছে।

তিখনের পিছনে পেছনে নেখ্‌লয়ুদভ পোষাক বদলাবার জন্য খুশি মনে তার পুরনো ঘরে ঢুকল। তিখনকে কাতয়ুশার কথা জিজ্ঞাসা করতে খুবই ইচ্ছা করছিল; সে কেমন আছে, কি করছে, তার কি শিগ্‌গিরই বিয়ে হবে? কিন্তু তিখন যেমন অনুগত তেমনি কড়া, তাছাড়া এমন মনোযোগ দিয়ে জগ থেকে তাকে জল ঢেলে দিতে লাগল যে নেখ্‌লয়ুদভ কাতয়ুশার কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসাই পেল না, বরং তিখনের নাতিদের কথা, বুড়ো ঘোরাটার কথা, আর কুকুর পল্‌কানের কথা জিজ্ঞাসা করল। তারা সকলেই বেঁচে আছে, শুধু পল্‌কান গত গ্রীষ্মকালে পাগল হয়ে গেছে।

নেখ্‌লয়ুদভ ভিজে পোষাক ছেড়ে সবে নতুন করে পোষাক পরতে শুরু করেছে এমন সময় দ্রুত পায়ের শব্দ ও দরজায় টোকা শুনতে পেল। সে পায়ের শব্দ ও টোকার আওয়াজ সে চেনে। একমাত্র সেই ও ভাবে হাঁটে, ও ভাবে দরজায় টোকা দেয়।

ভিজে গ্রেটকোটটা কাঁধের উপর ফেলে সে দরজা খুলে দিল।

"ভিতরে এস।" এই তো সে, সেই কাতয়ুশা, আগের থেকেও মিষ্টি দেখতে। ঈষৎ টেরা সরল কালো চোখ তুলে সেই চেনা ভঙ্গীতে সে তাকাল। তখনকার মতই পরণে একটা সাদা এপ্রন। পিসীদের দেওয়া সদ্য মোড়ক-খোলা একখণ্ড সুগন্ধি সাবান, আর দুখানা তোয়ালে সে নিয়ে এসেছে; একখানাতে রুশ কারুকার্য করা, অপরখানা স্নানের তোয়ালে। ছাপ-সমেত না-ব্যবহার-করা সাবান, তোয়ালে, আর মেয়েটি—সবই সমান পরিচ্ছন্ন, তাজা, অকলংক ও মধুর। তাকে দেখামাত্রই অপ্রতিরোধ্য আনন্দের হাসিতে মেয়েটির মিষ্টি দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দুখানি আগেকার মতই একটু বেঁকে গেল।

মেয়েটির মুখ লজ্জায় গোলাপ-রাঙা হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে সে বলল, "কেমন আছেন দিমিত্রি আইভানভিচ?"

ছেলেটিও আরক্তমুখে বলল, "গুড্‌মর্নিং, তুমি কেমন আছ? বেশ ভাল আছ তো?"

সাবানটা টেবিলে রেখে আর তোয়ালে দুখানা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে মেয়েটি বলল, "প্রভুর কৃপায় ভালই আছি। এই আপনার প্রিয় গোলাপি সাবান আর তোয়ালে; পিসীরা পাঠিয়েছেন।"

নেখ্‌লয়ুদভের ড্রেসিং-কেসটা খোলাই ছিল। তার মধ্যে ব্রাশ, আতর, চুলের ক্রিম, রূপোর ঢাকনাওলা অনেকগুলো বোতল এবং আরও নানা রকম প্রসাধন-দ্রব্যে সেটা ভরা ছিল। সেটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে অতিথির আত্ম-নির্ভরতার সপক্ষে তিখন বলে উঠল, "এখানে ও সব কিছুই রয়েছে।"

আগেকার মতই কোমলতায় ভরা অন্তরে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "দয়া করে আমার পিসিদের ধন্যবাদ দিও। আহা, এখানে এসে কী ভালই যে লাগছে।"

কথাগুলোর জবাবে মেয়েটি শুধু হাসল, তারপর চলে গেল।

পিসীরা আগাগোড়াই নেখ্‌লয়ুদভকে ভালবাসত; কিন্তু এবার তারা আরও বেশী সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা করল। দিমিত্রি যুদ্ধে যাচ্ছে, সেখানে সে আহত হতে পারে, মারাও যেতে পারে, তাতেই দুই বৃদ্ধার মন গলেছে।

ঠিক ছিল শুধু একদিন ও একরাত নেখ্‌লয়ুদভ পিসীদের কাছে থাকবে, কিন্তু কাতয়ুশাকে দেখে সে পুরো ইস্টারটাই কাটিয়ে যেতে রাজী হল, শেন্‌বক নামক যে বন্ধুর সঙ্গে তার ওডেসায় মিলিত হবার কথা তাকে টেলিগ্রাম করে দিল, সে যেন এসে পিসীদের বাড়িতে তার সঙ্গেই দেখা করে।

কাতয়ুশাকে দেখামাত্রই তার প্রতি আগেকার ভাব নেখ্‌ল্যুদভের মনে জেগে উঠল। আগের মতই তার সাদা এপ্রনটা দেখলেই তার মনে ভাবের উদয় হয়; তার পায়ের শব্দ, তার কণ্ঠস্বর, তার হাসি শুনলেই তার মন আনন্দে ভরে ওঠে; তার দুটি কালো চোখ দেখলেই, বিশেষ করে সে চোখে যখন হাসি ঝিলিক দেয়, তার মনে মায়া জাগে; আর সব চাইতে বড় কথা, যখনই তাদের দেখা হয় তখনই মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, এটা লক্ষ্য করে সেও বিচলিত বোধ না করে পারে না। সে বুঝতে পেরেছে, সে ভালবেসেছে; কিন্তু এ ভালবাসা ঠিক আগের মত নয়। তখন ভালবাসা ছিল রহস্যময়, সে নিজেও সে সম্পর্কে সচেতন ছিল না। তখন সে জানত, মানুষ একবারই ভালবাসতে পারে। কিন্তু এখন সে ভালবেসে সুখবোধ করছে, আর নিজের কাছে গোপন রাখতে চাইলেও অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে এ ভালবাসার অর্থ কি এবং এর পরিণতি কি হতে পারে।

অন্তরের গভীরে সে বুঝতে পারছে যে তার চলে যাওয়া উচিত, পিসীদের বাড়িতে আর তার থাকবার কোন সঙ্গত কারণ নেই, তার ফল ভাল হবে না; তবু ব্যাপারটা এত মধুর, এত আনন্দময় যে সব কিছু অস্বীকার করে সে থেকেই গেল।

ইস্টারের সন্ধ্যায় প্রার্থনা-অনুষ্ঠানে এসে পুরোহিত ও যাজক জানাল যে গীর্জা থেকে এই বাড়ি পর্যন্ত তিন মাইলের বেশী কর্দমাক্ত মাটির রাস্তা স্লেজগাড়িতে আসতে তাদের খুবই কষ্ট হয়েছে। পিসী ও বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভও অনুষ্ঠানে যোগ দিল। সেখানে কাতয়ুশা পুরোহিতদের জন্য ধুনোচি এনে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সারাক্ষণ নেখ্‌ল্যুদভ তার দিকেই তাকিয়ে রইল।

অনেক রাতে শুতে যাবার আগে সে যখন শুনতে পেল, বুড়ি দাসী মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না ইস্টারের পিঠে ও মিষ্টান্ন ভোগ পাবার জন্য গীর্জায় যাচ্ছে, তখন তার মনে হল, "আমিও যাব।"

গীর্জায় যাবার রাস্তাটা এতই খারাপ যে স্লেজগাড়িতে বা অন্য কোন গাড়িতে যাওয়া সম্ভব না। তাই সে বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে জিন পরাতে হুকুম দিল। তারপর বিছানায় না গিয়ে তার ইউনিফর্ম, আঁটো-সাঁটো রাইডিং-ব্রীচেস ও ওভারকোটটা পরে সেই বুড়ো, মোট্‌কা, ভারি ঘোড়াটায় চেপে কাদা ও বরফ ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে গীর্জার দিকে যাত্রা করল।

অধ্যায়—১৫

সেদিনের সেই প্রার্থনা-সভা চিরদিনের মত নেখ্‌ল্যুদভের মনে তার জীবনের উজ্জ্বলতম ও সুস্পষ্টতম স্মৃতি হয়ে রইল।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাদা বরফের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন সে অন্ধকার

পার হয়ে সারি সারি বাতির আলোক-মালায় সজ্জিত গীর্জার আঙিনায় পৌঁছল তখন প্রার্থনা-সভা শুরু হয়ে গেছে।

মারিয়া আইভানোভ্‌নার ভাই-পোকে চিনতে পেরে চাষীরা ঘোড়াটাকে ধরে তার নামবার স্থবিধার জন্য একটা শুকনো জায়গায় দাঁড় করাল, তার হয়ে ঘোড়াটাকে যথাস্থানে রেখে দিল এবং পথ দেখিয়ে তাকে গীর্জার ভিতরে নিয়ে গেল। গীর্জা তখন লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ।

ডানদিকে দাঁড়িয়েছে চাষীরা: বুড়োরা পরেছে ঘরে-কাটা স্থতির কোট, পায়ে জড়িয়েছে পরিস্কার সাদা স্থতির পট্টি; যুবকরা পড়েছে নতুন স্থতির কোট, কোমরে জড়িয়েছে উজ্জ্বল রঙের বেল্ট, পায়ে পরেছে টপ-বুট।

বাঁ দিকে দাঁড়িয়েছে তরুণীরা, মাথায় লাল রেশমের রুমাল, কালো ভেলভেটিনের হাত-কাটা জ্যাকেট, উজ্জ্বল লাল রঙের আস্তিনওয়ালা শার্ট, সবুজ, নীল, লাল—নানা রঙের স্কার্ট, আর লোহা-পরানো চামড়ার জুতো। বৃদ্ধারা আরও সাদাসিদে পোষাক পরে দাঁড়িয়েছে তাদের পিছনে; তাদের মাথায় সাদা রুমাল, গায়ে ঘরে-বোনা কোট ও পুরনো ধাঁচের স্কার্ট, পায়ে জুতো। ঝকঝকে পোষাক পরে মাথায় ভাল করে তেল মাখানো ছেলে-মেয়েরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নেখ্‌লুদভ সকলের ভিতর দিয়ে একেবারে সামনে চলে গেল। গীর্জার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রজনরা: জনৈক জমিদার, তার স্ত্রী ও পুত্র (পুত্রের পরনে নাবিকের পোষাক), একজন পুলিশ অফিসার, টেলিগ্রাফের কেরাণী, টপ-বুট পরা জনৈক ব্যবসায়ী, আর বুকে মেডেল ঝোলানো গ্রাম্য প্রধান; বেদির ডান দিকে জমিদার-গৃহিণীর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছে মাত্রিয়না পাভলভ্‌না, পরনে লাইলাক রঙের পোষাক ও পাড়-বসানো শাল; আর তার পাশেই কাতয়ুশা, পরনে চুনট-করা সাদা বডিস ও নীল ওড়না, কালো চুলে একটা লাল বো-বাঁধা।

চারিদিকে উৎসবের আমেজ—গম্ভীর, উজ্জ্বল, স্থন্দর: সোনার ক্রুশ-শোভিত রূপোলি জড়ির কাজ-করা জামা গায়ে পুরোহিত; ডিয়েকন; রূপোলি ও সোনালি জোব্বা-পরা কেরাণী ও মন্ত্র-পড়িয়েরা; ভাল পোষাক পরা, তেল-কুচকুচে মাথা শিক্ষানবীশ গায়কের দল; নাচের বাজনার মত শুনতে ছুটির দিনের চটুল যন্ত্র-সঙ্গীত, আর পুরোহিতের অবিরাম আশীর্বাদ বর্ষণ; ফুল দিয়ে সাজানো একটা মোটা মোমবাতি হাতে নিয়ে পুরোহিত বার বার উচ্চকণ্ঠে বলছে 'খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে! খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে।' সব কিছুই স্থন্দর; কিন্তু সব চাইতে স্থন্দর কাতয়ুশা—পরণে সাদা পোষাক, নীল ওড়না, কালো চুলে লাল বো, আর দুটি চোখ আনন্দে উজ্জ্বল।

নেখ্‌লুদভ জানত, তার দিকে না চাইলেও কাতয়ুশা তার উপস্থিতি টের পেয়েছে। তার পাশ দিয়ে বেদির দিকে এগিয়ে যাবার সময় এটা সে লক্ষ্য

করেছে। তাকে বলবার মত কোন কথাই ছিল না, তবু বলার মত একটা কিছু তৈরি করে নিয়ে পাশ কাটাবার সময় সে চুপি চুপি বলল, 'পিসী বলেছে প্রার্থনা-সভার পরে অনশন ভঙ্গ করবে।'

কাতয়ুশার মিষ্টি মুখে যৌবনের রক্ত উঠে এল; নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকালেই এ রকমটা হয়। পরিপূর্ণ আনন্দে হাস্যময় দুটি কালো চোখ তুলে সে সরলভাবে তাকাল; নেখ্‌ল্যুদভের মুখের উপর সে দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল।

সে হেসে বলল, 'আমি জানি।'

অনুষ্ঠানের বিরতির সময় নেখ্‌ল্যুদভ গীর্জা থেকে বেরিয়ে এল। সকলে এক পাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল ও অভিবাদন জানাল। অনেকেই তাকে চিনত: বাকিরা জানতে চাইল সে কে।

সে সিঁড়িতে দাঁড়াল। উপস্থিত ভিখারীরা তাকে ঘিরে হৈ-চৈ শুরু করে দিল; থলিতে খুচরো টাকা-পয়সা যা ছিল সব তাদের দিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

উষা সমাগত; তখনও সূর্য ওঠে নি। লোকজনরা দলে দলে গীর্জার ভিতরকার কবর-স্থানে জটলা করছে। কাতয়ুশা তখনও ভিতরেই আছে। নেখ্‌ল্যুদভ তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

উৎসবের প্রথামত একটি চাষী যখন নেখ্‌ল্যুদভকে চুম্বন করে একটি বাদামী রং-করা ডিম তাকে উপহার দিচ্ছিল, সেই সময় মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌নার লাইলাক-পোষাক এবং লাল বো-পরা প্রিয় কালো মাথাটি হাজির হল।

যারা সামনে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মাথার উপর দিয়ে কাতয়ুশা তাকে দেখতে পেল, আর দেখেই তার মুখখানি যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সেটাও নেখ্‌ল্যুদভের নজর এড়াল না।

মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে ফটকের কাছে পৌছে কাতয়ুশা ভিখারিদের ভিক্ষা দিতে লাগল। নাকের জায়গায় একটা লাল চামড়ি বসানো একটি ভিক্ষুক তার দিকে এগিয়ে এল। সে তাকেও কিছু দিল। তার দিকে এগিয়ে গেল, এবং কোন রকম বিরক্তির ভাব না দেখিয়ে আনন্দে উজ্জ্বল চোখে তাকে তিনবার চুম্বন করল। আর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন সে জিজ্ঞাসা করছে, 'কাজটা ঠিক করছি তো?' 'হ্যাঁ প্রিয়া, ঠিকই করছ; সব কিছুই ঠিক, সব কিছুই সুন্দর। আমি তোমাকে ভালবাসি!'

তারা ফটকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, আর সে সিঁড়ি বেয়ে তাদের কাছে উঠে গেল। সে কাতয়ুশাকে ইস্টারের চুম্বন দিতে চায় নি, শুধু চেয়েছিল তার কাছে যেতে।

মাত্রিয়না পাভ্‌লভ্‌না মাথা নীচু করে হেসে বলল, 'খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে।' কিন্তু তার গলার স্বর বলল, 'আজ আমরা সকলেই সমান।' রুমালটাকে দলা পাকিয়ে তা দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে সে তার ঠোঁট দুটি নেখ্‌ল্যুদভের দিকে

বাড়িয়ে দিল।

নেখ্‌লয়ুদভও তাকে চুম্বন করেজবাব দিল, 'সত্যি খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে।' তারপর সে কাতয়ুশার দিকে তাকাল; লজ্জায় লাল হয়ে সে কাছে এগিয়ে গেল। 'খৃস্টের অভ্যুত্থান হয়েছে দিমিত্রি আইভানভিচ'। নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল, 'সত্যি তাঁর অভ্যুত্থান হয়েছে'। দু'বার তারা চুম্বন করল, তৃতীয় চুম্বন দরকার কি না ভাববার জন্য একটুখানি থামল, তারপর সেটার প্রয়োজন আছে স্থির করে তৃতীয় বার চুম্বন করে দুজনেই হাসল।

নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি পুরোহিতের কাছে যাবে না?'

'না দিমিত্রি আইভানভিচ', আমরা এখানে কিছুক্ষণ বসব', যেন একটা খুশির কাজ করে ফেলেছে এমনি ভাব দেখিয়ে অনেক কষ্টে কাতয়ুশা বলল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে তার বুকটা ফুলে উঠল; ঈষৎ টেঁরা চোখে অনুরাগ, কুমারী পবিত্রতা ও ভালবাসা ফুটিয়ে সে সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকাল।

পুরুষ ও নারীর ভালবাসায় এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন সে ভালবাসা চরমে ওঠে—যখন সে ভালবাসা হয়ে ওঠে চেতনাহীন, বিবেচনাহীন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্পর্শহীন। সেই ঈস্টারের রাতে সেই মুহূর্তটি এসেছে নেখ্‌লয়ুদভের জীবনে। কাতয়ুশার কথা মনে হওয়া মাত্রই সব কিছু যেন ঢাকা পড়ে যায়: চকচকে কালো মাথাটি, সুন্দর কুমারী দেহকে ঘিরে থাকা চুনট-করা সাদা আটোসাটো পোষাকটি, তার অনুন্নত বুক, লজ্জারুণ গাল দুটি, নরম উজ্জ্বলতা-মাখা দুটি কালো চোখ, এবং তার সমস্ত সত্তাকে জুড়ে থাকা দুটি বিশেষ গুণ, পবিত্রতা ও অকলংক ভালবাসা—যে ভালবাসা শুধু তার জন্য নয় (তা সে জানে), সকলের জন্য এবং সব কিছুর জন্য, শুধু ভালর জন্য নয়, সংসারে যা কিছু আছে সকলেরই জন্য, এমন কি যে ভিক্ষুকটিকে সে এই মাত্র চুম্বন করেছে তার জন্যও।

সে জানত, কাতয়ুশার মধ্যে সে ভালবাসা আছে, কারণ সেই রাতে ও ভোরে সে নিজের মধ্যেই সেটা উপলব্ধি করেছে; আরও উপলব্ধি করেছে যে সেই ভালবাসায় সে কাতয়ুশার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

হায়! সব কিছু যদি সেখানেই থেমে যেত, ঠিক যেখানে সে রাতে পৌঁচেছিল। 'হ্যাঁ, সেই ঈস্টারের রাতেও সেই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটে নি!' জুরিদের ঘরের জানালার পাশে বসে এই কথাগুলিই সে ভাবতে লাগল।

অধ্যায়—১৬

গীর্জা থেকে ফিরে নেখ্‌লয়ুদভ পিসীদের সঙ্গেই অনশন ভঙ্গ করল এবং কিছুটা মদও খেল। রেজিমেন্টে থাকার সময় থেকেই তার মদ খাবার অভ্যাস হয়েছে। তারপর ঘরে ঢুকে যে পোষাকে ছিল সেই পোষাকেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দরজায় টোকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সে জানত কাতয়ুশাই টোকা দিয়েছে। বিছানায় বসে চোখ মুছতে মুছতে আড়মোড়া ভাঙল।

বলল, 'কাতয়ুশা, তুমি? ভিতরে এস।'

কাতয়ুশা দরজা খুলল।

বলল, 'খাবার প্রস্তুত।' পরনে সেই সাদা পোষাক, শুধু চুলের 'বো'টা নেই। সে এমন ভাবে হেসে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকাল যেন একটা খুব ভাল সংবাদ তাকে জানিয়েছে।

বিছানা থেকে উঠে চুলটা ঠিক করবার জন্য চিরুনিটা হাতে নিয়ে সে বলল, 'আমি আসছি।'

কাতয়ুশা এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সেটা লক্ষ্য করে নেখ্‌লয়ুদভ চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার দিকে এক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে মেয়েটি সহসা মুখ ঘুরিয়ে লঘু পদক্ষেপে দ্রুত গতিতে দালানের কার্পেটের উপর দিয়ে চলে গেল।

'হায় রে, আমি কি বোকা,' নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল। 'ওকে কেন যেতে দিলাম?' আর তখনই তাকে ধরবার জন্য ছুটে গেল।

তাকে যে কি জন্য দরকার তা সে নিজেই জানত না, কিন্তু তার কেবলই মনে হতে লাগল যে সে যখন ঘরের ভিতর এসেছিল তখন একটা কিছু করা উচিত ছিল, এমন একটা কিছু যা এ রকম অবস্থায় সাধারণত করা হয়ে থাকে, কিন্তু সে করতে পারে নি।

'কাতয়ুশা, দাঁড়াও,' সে বলল।

মেয়েটি থেমে গিয়ে বলল, 'আপনি কি চান?'

'কিছু না, শুধু—' তার অবস্থায় মানুষ সাধারণত কি করে থাকে সে কথা মনে পড়ায় সে হাত বাড়িয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

মেয়েটি চুপচাপ তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর দুই চোখ জলে ভরে শক্ত কঠিন হাতে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না, না, দিমিত্রি আইভানভিচ, এ রকম করবেন না।'

নেখ্‌লয়ুদভ তাকে ছেড়ে দিল। মুহূর্তের জন্য সে যে শুধু বিচলিত ও লজ্জিত বোধ করল তাই নয়, নিজের উপরেই বিরক্ত হল। সে ভাবল, এটা তার বোকামি; এ অবস্থায় অন্য সকলে যা করে থাকে তারও তাই করা উচিত। সে এগিয়ে গিয়ে আবার তাকে ধরে ফেলল এবং তার গলার উপর চুমু খেল।

লাইলাক ঝোপের আড়ালের প্রথম আকস্মিক চুম্বন এবং আজ সকালে গীর্জার প্রাঙ্গণের চুম্বন থেকে এ চুম্বন একেবারেই আলাদা। এ চুম্বন ভয়ংকর, আর মেয়েটিও তা বুঝতে পারল।

যেন অমূল্য কোন বস্তুকে সে ভেঙে খানখান করে ফেলেছে এমনি স্বরে সে চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ, আপনি কি করছেন?' তারপরই ছুটে চলে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ খাবার ঘরে গেল। সুসজ্জিত পিসীরা, পারিবারিক ডাক্তার ও জনৈক প্রতিবেশী সেখানে ছিল। সবই বেশ স্বাভাবিক, কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভের মনে তখন ঝড় বইছে। অন্যদের কথাবার্তা সে কিছুই বুঝতে পারছিল না, মাঝে মাঝে দু'একটা জবাব দিচ্ছিলমাত্র। তার মনে সারাক্ষণ শুধু কাতয়ুশার চিন্তা। দালানের মাঝখানে তাকে যে তৃতীয় চুম্বনটি করেছিল তার কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল, আর কোন কথা নয়। কাতয়ুশা যখন ঘরে ঢুকল, তার দিকে না তাকিয়েই সে সমগ্র সত্তা দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করল, তার দিকে না তাকিয়ে বসে থাকতে তাকে অনেক চেষ্টা করতে হল।

খাওয়া সেরেই সে নিজের ঘরে চলে গেল। ভীষণ উত্তেজিত ভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করল; বাড়ির প্রতিটি শব্দ উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে প্রতি মুহূর্তে তার পদশব্দের আশায় কান পেতে রইল। ভিতরকার পশুটা তখন শুধু মাথাই তোলে নি, প্রথম দেখার দিনগুলিতে, এমন কি সেদিন সকালেও তার মধ্যে যে দেব-মানব ছিল তাকে সম্পূর্ণভাবে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে। ভিতরকার সেই পশু-মানবই এখন সর্বময় কর্তা।

সারাদিন অপেক্ষা করেও কাতয়ুশার সঙ্গে একাকি দেখা করবার সুযোগ সে পেল না। হয় তো মেয়েটি তাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় সে পাশের ঘরে যেতে বাধ্য হল। ডাক্তারকে রাতটা থেকে যেতে বলা হয়েছে, আর তার বিছানা তাকেই করে দিতে হবে। কাতয়ুশার ঘরে ঢুকবার শব্দ শুনেই নেখ্‌ল্যুদভ তাকে অনুসরণ করল। যেন একটা অপরাধ করতে যাচ্ছে এমনিভাবে পা টিপে টিপে রুদ্ধশ্বাসে ঘরে ঢুকল।

বালিশের ওড়ের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তার দুটো কোণ ধরে সে তখন বালিশের একটা ধোয়া ওড় পরাচ্ছিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল; আগেকার মত খুশির, আনন্দের হাসি নয়, একটা ভীত, করুণ হাসি। সে হাসি যেন বলছে, তুমি যা করেছ সেটা খারাপ। নেখ্‌ল্যুদভ এক মুহূর্ত দাঁড়াল। তখনও সংগ্রাম চলেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও মেয়েটির প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসা তখনও তাকে শোনাচ্ছে তারই কথা, তার মন ও তার জীবনের কথা। আর একটি কণ্ঠ বলছে, 'সাবধান! নিজের সুখ, নিজের সম্ভোগের এ সুযোগ ছেড়ে দিও না!' আর সেই দ্বিতীয় কণ্ঠ প্রথম কণ্ঠকে গলা টিপে মেরে ফেলল। দৃঢ় সংকল্পে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল; একটা ভয়ংকর অসংযত পাশবিক আবেগ তখন তাকে গ্রাস করেছে।

দুটি হাতে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে সে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিল; তার মনে হল আরও কিছু করবার আছে; তাই সেও তার পাশে বসল।

করুণ গলায় মেয়েটি বলল, 'দিমিত্রি আইভানভিচ, প্রিয়! দয়া করে আমাকে যেতে দিন।' নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সে কেঁদে বলল, 'মাত্রিয়না পাভলভনা আসছে।' কে যেন সেই দিকেই আসছে।

নেখ্‌ল্যুদভ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'তাহলে, তাহলে আমি কবে তোমার কাছে আসব ; তখন একা থাকবে তো ?'

সে বললে, 'আপনি কি বলছেন ? কিছুতেই না। না, না!' কিন্তু সে শুধু মুখের কথা, তার সমগ্র সত্তার কম্পিত আবেগ বলছে অন্য কথা।

মাত্রিয়না পাভলভনা ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা কম্বল। তিরস্কারের দৃষ্টিতে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে ভুল কম্বল নিয়ে আসার জন্য কাতয়ুশাকে বকতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ নীরবে ঘর থেকে চলে গেল, কিন্তু একটুও লজ্জিত বোধ করল না। মাত্রিয়না পাভলভনার মুখ দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে সে তাকেই দোষী ভেবেছে ; সে জানে তাকে দোষী ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে ; সে বোঝে সে অন্যায় করছে ; কিন্তু এই নতুন, নীচ, জান্তব উত্তেজনা কাতয়ুশার প্রতি তার প্রকৃত ভালবাসার সেই পুরনো আবেগ থেকে মুক্তিলাভ করে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছে ; সেখানে আর কোন কিছুর স্থান নেই। সে এখন শুধু জানে, এই কামনাকে পূর্ণ করতে কি করা দরকার ; তাই সে শুধু ভাবছে, কেমন করে সে কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে।

সারা সন্ধ্যা সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল ; কখনও পিসীদের ঘরে, আবার নিজের ঘরে, আবার পরক্ষণেই বারান্দায়। সারাক্ষণ শুধু একই চিন্তা —কেমন করে তাকে একা পাবে ; কিন্তু মেয়েটি তাকে এড়িয়েই চলল ; আর মাত্রিয়না পাভলভনা মেয়েটির উপর কড়া নজর রাখল।

অধ্যায়—১৭

সন্ধ্যা কেটে গেল। রাত হল। ডাক্তার শুয়ে পড়ল। পিসীরাও তাদের ঘরে চলে গেছে। নেখ্‌ল্যুদভ জানে, মাত্রিয়না পাভলভনা তখন তাদের কাছে শোবার ঘরেই আছে ; কাজেই কাতয়ুশা নিশ্চয় দাসীদের বসবার ঘরে একলা আছে। সে আবার বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বাইরেটা অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, গরম। বসন্তকালের যে সাদা কুয়াশা শেষ বরফকে গলিয়ে দেয়, অথবা শেষ বরফ গলে যাওয়ার ফলে যে সাদা কুয়াশা সৃষ্টি হয়, তাতেই বাতাস আচ্ছন্ন। সদর দরজা থেকে একশো পা দূরের পাহাড়টার নীচেকার নদী থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ আসছে। বরফ ভাঙার শব্দ।

নেখ্‌ল্যুদভ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল ; চকচকে বরফের উপর পা ফেলে ফেলে দাসীদের ঘরের জানালার কাছে গেল। বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা এমন ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ শব্দ করছে যেন সে শুনতে পাচ্ছে ; সে বেশ কষ্ট করে টেনে টেনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল। দাসীদের ঘরে একটা ছোট বাতি জ্বলছে ; টেবিলের পাশে কাতয়ুশা চিন্তিত মনে সামনের দিকে তাকিয়ে একলা বসে আছে।

নেখ্‌লুয়ুদভ অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল; দেখতে লাগল, তাকে যে কেউ দেখছে সেটা না জেনে কাতয়ুশা কি করে। দু'এক মিনিট সেও চুপচাপ; তারপর চোখ তুলে হাসল, যেন নিজেকেই তিরস্কার করছে এমনিভাবে মাথা নাড়ল। পরক্ষণেই আবার দুটি হাত টেবিলের উপর রেখে সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌লুয়ুদভ সেখানেই দাঁড়িয়ে কাতয়ুশার গম্ভীর যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখখানা দেখতে লাগল; সে মুখে তার আত্মার সংগ্রামের আভাষ প্রত্যক্ষ করে তার হৃদয় করুণায় ভরে গেল; কিন্তু কী আশ্চর্য, সে করুণা তার কামনাকেই বাড়িয়ে তুলল।

কামনা তখন তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

সে জানালায় টোকা দিল। মেয়েটি যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল, তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল, মুখে ফুটে উঠল ত্রাসের ছায়া। তারপরই এক লাফে জানালার কাছে গিয়ে সে মুখটাকে কাঁচের সঙ্গে লাগিয়ে দাঁড়াল। দুটি হাতকে গোল করে চোখের সামনে ধরে কাঁচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি ফেলে নেখ্‌লুয়ুদভকে চিনতে পেরেও ত্রাসের ছায়া তার মুখ থেকে গেল না। তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর; এমনটি সে কখনও দেখে নি। ছেলেটির হাসির জবাবে মেয়েটিও হাসল, কিন্তু সে হাসি সমর্পণের হাসি; তার আত্মায় ছিল না কোন হাসি, ছিল শুধু ভয়। ছেলেটি হাতের ইসারায় তাকে আঙিনায় নেমে আসতে বলল। কিন্তু মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেটি কাঁচের কাছে মুখ নিয়ে তাকে ডাকতে যাবে এমন সময় মেয়েটি দরজার কাছে গেল। নিশ্চয় ভিতর থেকে কেউ তাকে ডেকেছে। নেখ্‌লুয়ুদভ জানালা থেকে সরে গেল। কুয়াশা এত ঘন যে বাড়ির পাঁচ পা দূর থেকেও জানালাগুলো দেখা যায় না; কিন্তু সেই একাকার কালো অন্ধকারে বাতির লাল আলোটা জ্বল্ জ্বল্ করছে। নদীর বুকে সেই অদ্ভুত শব্দই হচ্ছে,—ফোঁপাচ্ছে, খসখস করছে, ঝনঝন করছে, ঝুরঝুর করছে। কাছেই কুয়াশার মধ্যে একটা কাক ডাকল; আর একটা কাক তাতে সাড়া দিল; তারপর দূরের গ্রাম থেকে অন্য সব কাক ডাকতে লাগল; ক্রমে সব কাকের ডাক একটা ধ্বনিতে মিলে গেল। একমাত্র নদীটি ছাড়া চারধারে আর সব নীরব। সে রাতে এই দ্বিতীয়বার কাক ডাকল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বাড়ির এক কোণে পায়চারি করতে লাগল। দু'একবার জলের মধ্যেও পা ফেলল। তারপর আবার জানালার কাছে গেল। আলোটা তখনও জ্বলছে; সে তখনও টেবিলের পাশে একা বসে আছে, যেন কি করবে বুঝতে পারছে না। ছেলেটি জানালার কাছে যেতেই সে চোখ তুলে তাকাল। সে টোকা দিল। কে টোকা দিল না দেখেই মেয়েটি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; খট্ করে বাইরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। নেখ্‌লুয়ুদভ পাশের বারান্দায় অপেক্ষা করছিল, কোন কথা না বলে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল।

মেয়েটিও তাকে জড়িয়ে ধরে মুখ তুলল, তার দুই ঠোঁটে চুম্বন নেমে এল। বারান্দার এককোণে যেখানে তারা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানকার সব বরফই গলে গিয়েছিল। কিন্তু তার সমস্ত দেহ-মন তখন অপূর্ণ কামনার যন্ত্রণায় জর্জরিত। এমন সময় ঠিক একই রকম ঠক্ করে শব্দ করে দরজাটা আবার খুলে গেল, আর মাত্রিয়না পাভলভনা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকল, 'কাতয়ুশা।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি দাসীদের ঘরে গেল। ক্লিক করে ছিটকিনির শব্দ হল। তারপর সব চুপচাপ। লাল আলোটা নিভে গেল। শুধু কুয়াশা চারদিক ঘিরে রইল। নদীর বুকের শব্দ তেমনি শোনা যেতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভ জানালার কাছে গেল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। দরজায় টোকা দিল, কোন সাড়া নেই। সদর দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতর ফিরে গেল, কিন্তু ঘুম এল না। বিছানা ছেড়ে উঠে সে খালি পায়ে দালান পার হয়ে মাত্রিয়না পাভলভনার ঘরের পার্শ্ববর্তী কাতয়ুশার দরজার দিকে যেতে লাগল। মাত্রিয়না পাভলভনার নাক ডাকছে শুনতে পেয়ে এগিয়ে যাবে এমন সময় সে কেশে উঠে সশব্দে পাশ ফিরতেই নেখ্‌লয়ুদভের হৃদপিণ্ড যেন থেমে গেল; পাঁচ মিনিট সময় সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে আবার সব চুপচাপ হয়ে এল। সেও শান্তিতে নাক ডাকাতে লাগল। পাছে কোন রকম শব্দ হয় তাই অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলতে ফেলতে নেখ্‌লয়ুদভ কাতয়ুশার দরজার কাছে হাজির হল। কোন সাড়া শব্দ নেই। কাতয়ুশা হয়তো জেগেই আছে, নইলে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে 'কাতয়ুশা!' বলে ডাকতেই সে লাফ দিয়ে উঠল এবং যেন রাগ করেই তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করতে লাগল।

'এ সবের মানে কি? আপনি কি করছেন? আপনার পিসীরা শুনতে পাবেন যে।' মুখে সে এই কথাগুলি বললেও তার সমস্ত সত্তা তখন বলছে, 'আমার সব কিছুই তোমার।' আর নেখ্‌লয়ুদভও তাই বুঝল।

'দরজা খোল! এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ঘরে ঢুকতে দাও! তোমাকে মিনতি করছি!' সে যে কি বলছে তাও সে জানে না।

মেয়েটি চুপ। তারপর ছেলেটি শুনতে পেল, সে ছিটকিনিতে হাত দিয়েছে। ছিটকিনি খোলার শব্দ হল, আর সেও ঘরের ভিতর ঢুকল। মেয়েটি যে অবস্থায় ছিল—পরনে মোটা শক্ত শেমিজ, হাত দুটো খোলা—সেই অবস্থায়ই তাকে তুলে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটি ফিসফিস করে বলল, 'কি করছ প্রিয়তম?' কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে ছেলেটি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

তাকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বলল, 'না, না, এ কাজ করো না; আমাকে যেতে দাও!'

* * * *

ছেলেটির কথার কোন জবাব না দিয়ে মেয়েটি যখন নিঃশব্দে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল, তখন ছেলেটি আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, যা ঘটে গেল আপন মনেই তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল।

আঁধার ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে। নীচের নদীর বুক থেকে বরফ গলার ধ্বস্ ধ্বস্, ঝুরঝুর ও খসখস আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে; একটা কুলুকুলু ধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। কুয়াশা কাটতে শুরু করেছে, আর তার উপর দিয়ে বাঁকা চাঁদের অস্পষ্ট আলো এসে চারিদিকে ভৌতিক পরিবেশকে ঈষৎ আলোকিত করে তুলেছে।

সে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, 'এ সবের অর্থ কি? আমার জীবনে এ কি কোন বিরাট আনন্দ, না বিরাট দুর্ভাগ্য?'

'সকলের জীবনেই এটা ঘটে—সকলেই এ কাজ করে', নিজেকে এই কথা শুনিয়ে সে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—১৮

পরের দিন স্ফূর্তিবাজ, সুদর্শন ও খ্যাতিমান শেন্‌বক পিসীদের বাড়িতে এসে নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে মিলিত হল। তার রুচিসম্পন্ন সহৃদয় ব্যবহার, আমুদে স্বভাব, উদারতা ও দিমিত্রির প্রতি ভালবাসার দ্বারা সে সকলেরই মন জয় করে নিল।

পিসীরা কিন্তু তার উদারতার প্রশংসা করলেও কিছুটা বিরক্ত বোধ করল। কারণ তার আচরণে কিছুটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেতে লাগল। সদর দরজায় একটা অন্ধ ভিখারিকে সে এক রুবল দান করল, চাকরদের প্রত্যেককে পনেরো রুবল করে বকশিস দিল, আর সোফিয়া আইভানভনার পোষা কুকুরের পায়ের পাতা কেটে রক্ত বেরুলে সে তার হেম-করা ক্যাম্বিকের রুমালখানাকে (সোফিয়া আইভানভনা জানে সে রুমালের দাম প্রতি ডজন অন্তত পনেরো রুবল) দু'ফালি করে ছিঁড়ে তাই দিয়ে কুকুরের পা ব্যাণ্ডেজ করে দিল। বৃদ্ধা দুটি এ ধরনের লোক এর আগে দেখে নি; তারা জানে না যে শেন্‌বকের দু'লাখ রুবল ধার আছে, সে ধার শোধ দেবার কোন গরজ তার নেই, আর তাই পঁচিশ রুবল বা তার বেশী অর্থ তার কাছে কিছুই নয়।

পিসীদের সঙ্গে কাটানো শেষ রাতটিতে—যখন আগের রাতের স্মৃতি তার মনে খুবই সতেজ—নেখ্‌ল্যুদভের মনের মধ্যে দুটি ভাবের দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। এক দিকে পাশবিক ভালবাসার জ্বলন্ত ইন্দ্রিয় সুখের স্মৃতি (যদিও তার প্রত্যাশা তাতে পূর্ণ হয় নি) ও তার সঙ্গে মিশ্রিত এই আত্মতুষ্টি যে তার ইচ্ছাটা পূর্ণ হয়েছে; অন্য দিকে সে যে একটা অন্যায় কাজ করেছে এবং মেয়েটির জন্য নয়, বরং তার নিজের জন্যই সে অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া দরকার সেই চেতনা।

নেখ্‌ল্যুদভের আত্মসুখের নেশা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁচেছে যে নিজের

কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। ভাবছিল, ধরা পড়লেও তার কাজকে কতটা নিন্দা করা হবে, বা মোটেও নিন্দা করা হবে কি না ; কিন্তু সে একবারও ভাবল না তখন কাতয়ুশার মনের অবস্থা কি রকম হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার কি হবে।

সে বুঝতে পারল যে শেন্‌বক কাতয়ুশার সঙ্গে তার সম্পর্কটা বুঝতে পেরেছে এবং তা নিয়ে বেশ গর্ববোধ হল।

কাতয়ুশাকে দেখে শেন্‌বক বলল, 'আহা, পিসীর বাড়িতে হঠাৎ প্রায় পুরো সপ্তাহ কেন কাটালে এখন সেটা বুঝতে পারছি। অবশ্য এতে আমি আশ্চর্য হই নি—আমি হলেও তাই করতাম। সে সত্যি মনোরমা।'

নেখ্‌লয়ুদভও ভাবছিল, মনের কামনা ভালভাবে পূর্ণ না হতেই এখান থেকে চলে যাওয়াটা দুঃখের হলেও এই অনিবার্য বিচ্ছেদের একটা সুবিধাও আছে, কারণ যে সম্পর্ক বজায় রেখে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হত এর ফলে তাতে আপনা থেকেই ছেদ পড়ে যাবে। তারপরই তার মনে হল, কাতয়ুশাকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত ; তার জন্য নয় বা তার দরকার হতে পারে সেজন্যও নয়, টাকাটা দেওয়া তার কর্তব্য, কারণ তাকে ভোগ করবার পরে কিছু না দেওয়াটা তার নিজের পক্ষেই অসম্মানজনক হবে। কাজেই তার এবং কাতয়ুশার মর্যাদার কথা চিন্তা করে সে তাকে একটা মোটা টাকাই দিল।

যাত্রার দিন আহারাদির পরে নেখ্‌লয়ুদভ বাইরে গিয়ে পাশের দরজায় মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তাকে দেখেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল ; দাসীদের ঘরের খোলা দরজার দিকে চোখের ইঙ্গিতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় মেয়েটি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল, কিন্তু ছেলেটি তাকে বাধা দিল।

তার হাতে একশ' রুবলের নোট-ভরা একখানা খাম গুঁজে দিয়ে সে বলল, 'তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। আর এতে—'

তার বক্তব্য অনুমান করেই মেয়েটির ভুরু কুঁচকে উঠল ; মাথা নেড়ে সে তার হাতটা সরিয়ে দিল।

'এটা নাও, তোমাকে নিতেই হবে।' থেমে থেকে কথাগুলো বলে এপ্রণের ফাঁকের মধ্যে খামটা গুঁজে দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ যেন নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে এমনি ভাবে গোঙাতে গোঙাতে ছুটে নিজের ঘরে চলে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল ; আর এই শেষ দৃশ্যটির কথা মনে হতেই সজোরে আর্তনাদ করে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল।

'কিন্তু এ ছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম? সকলেই কি এ কাজ করে নি? শেন্‌বক বলেছে, গভর্ণেসের সঙ্গে সে এ কাজ করেছে ; খুড়ো গ্রীশা করেছে ; এমন কি আমার বাবা যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলেন তখন একটি চাষী মেয়ের গর্ভে মিতেংকা নামে তার যে জারজ ছেলে জন্মেছিল সে তো এখনও

বেঁচে আছে। আর সকলেই যখন এই একই কাজ করে তখন তো বোঝাই যায় যে এছাড়া পথ নেই।' এই সব ভেবে বৃথাই সে মনের শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে লাগল। অতীতের স্মৃতি তার বিবেককে দংশন করতে লাগল।

অবশ্য ক্রমে সে বুঝতে পারল যে এ সমস্যার একটি মাত্র সমাধান আছে—সেটা হল এ নিয়ে মাথা না ঘামানো। তাই সে করল।

যে জীবনে সে পদার্পণ করতে চলেছে, তার নতুন পরিবেশ, নতুন বন্ধুবান্ধব, যুদ্ধ—সবই অতীতকে ভুলে থাকতে তাকে সাহায্য করল। যতই দিন যেতে লাগল ততই সে সব কিছু ভুলতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভুলে গেল।

শুধু একবার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সে যখন কাতয়ুশাকে দেখবার আশায় পিসীদের বাড়ি গিয়েছিল, তখন শুনেছিল যে শেষ বার সে যখন সেখানে গিয়েছিল তার পরেই কাতয়ুশা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে; পিসীরা শুনেছে সে নাকি কোথায় না কোথায় একটি সন্তান প্রসব করেছে এবং একেবারেই উচ্ছন্নে গেছে। কথাটা শুনে তার বুক ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। যে সময়ে সে সন্তান প্রসব করেছে তাতে সে সন্তান তার হতেও পারে, নাও হতে পারে। পিসীরা অবশ্য মেয়েটিকেই দোষী করে বলেছিল যে, সেও তার মায়ের বদস্বভাবই পেয়েছে। এতে সে একটু খুশিই হয়েছিল। মনে হল, সে যেন মুক্তি পেয়েছে। প্রথমে ভাবল, তাকে ও তার সন্তানকে খুঁজতে চেষ্টা করবে, কিন্তু তার কথা মনে হতেই অন্তরের অন্তঃস্থলে সে এতই লজ্জা ও বেদনা বোধ করতে লাগল যে তাকে খুঁজে বের করবার মত কোন চেষ্টাই সে করল না, বরং তার চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলে আবার তাকে ভুলতে চেষ্টা করল।

এতদিন পরে এই আশ্চর্য যোগাযোগের ফলে সব কিছু নতুন করে তার মনে পড়ে গেল। যে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর কাপুরুষতার ফলে এতবড় একটা পাপকে স্বীয় বিবেকের উপর চাপিয়ে নিয়ে এই দশটি বছর বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, আজ বুঝি তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু তাতে সে কিছুতেই রাজী নয়; তার একমাত্র ভয়—মেয়েটি বা তার অ্যাডভোকেট হয়তো সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের সম্মুখে তাকে লজ্জায় ফেলতে পারে।

অধ্যায়—১৯

এই রকম মনের অবস্থা নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ আদালত কক্ষ ছেড়ে জুরিদের ঘরে গেল। জানালার পাশে বসে চারদিকের কথাবার্তা শুনতে শুনতে ধূমপান করতে লাগল।

পরিচয়-ঘোষণাকারী যখন সেই একই ভাবে কাৎ হয়ে ঘরে ঢুকে জুরিদের আদালতে ফিরে যেতে ডাকল তখন নেখ্‌লয়ুদভ খুব ভয় পেয়ে গেল, যেন

বিচারক হওয়ার পরিবর্তে তারই বিচার হতে চলেছে। অন্তরের অন্তঃস্থলে সে অনুভব করছিল যে সে একটি বদমাশ, লোকের মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে তার লজ্জিত হওয়া উচিত। তথাপি অভ্যাস বশতই সে তার আত্মম্ভরী ভাবেই মঞ্চের উপরে উঠে ফোরম্যানের ঠিক পাশে পায়ের উপর পা তুলে বসে পিঁস-নেটা নিয়ে খেলা করতে লাগল।

কয়েদীদেরও বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আবার তাদের ফিরিয়ে আনা হল।

আদালতে কিছু নতুন মুখ—সাক্ষীদের—দেখা গেল। নেখ্‌ল্যুদভ লক্ষ্য করল, মাসলভা এক দৃষ্টিতে রেলিং-এর সামনের সারিতে উপবিষ্ট একটি স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে আছে। স্ত্রীলোকটির পরনে ঝকঝকে রেশম ও ভেলভেটের পোষাক, মাথায় মস্ত বড় বো-বাঁধা উঁচু-টুপি, এবং কনুই পর্যন্ত খোলা হাতে ঝোলানো একটি ছোট সুদৃশ্য থলি। সে পরে জানতে পেরেছিল সে একটি সাক্ষী, মাসলভা যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারই মালকানি।

একে একে সাক্ষীদের শপথ-বাক্য পাঠ করাবার পরে শুধুমাত্র বেশ্যালয়ের রক্ষিকা কিতায়েভা ছাড়া আর সকলকে আবার বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এ ব্যাপারে সে কি জানে, প্রতিটি কথার পরে সে একবার করে মাথা ও টুপিটা নাড়তে লাগল এবং নকল হাসি হাসতে হাসতে কথার মধ্যে কড়া জার্মান টান দিয়ে একটি বিস্তারিত ও বুদ্ধিদীপ্ত বিবরণ পেশ করল।

প্রথমে তার পরিচিত হোটেলের চাকর সাইমন তার বাড়ি এল একজন ধনী সাইবেরীয় বণিকের জন্য একটি মেয়ে জোগার করতে। সে লিউবভকে পাঠাল। কিছু সময় পরে বণিককে সঙ্গে নিয়ে লিউবভ ফিরে এল। বণিকটির তখনই একটু 'মৌতাত' হয়েছে—কথাটা বলে সে একটুখানি হাসল—তবু সে যেমন মদ চালাতে লাগল তেমনি মেয়েদের নিয়েও মেতে উঠল। টাকা ফুরিয়ে যেতে ঐ লিউবভকেই তার আস্তানায় পাঠিয়ে দিল। মেয়েটাকে দেখে সে 'মজে' গিয়েছিল। একথা বলবার সময় সে কয়েদীর দিকে তাকাল।

নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, এই সময়ে সে যেন মাসলভাকে হাসতে দেখল। এ তার খুব খারাপ লাগল।

বিচারক-পদপ্রার্থী মাসলভার পক্ষ সমর্থনকারী অ্যাডভোকেটটি সলজ্জ বিচলিত ভঙ্গীতে প্রশ্ন করল, 'মাসলভা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ছিল?'

কিতায়েভা জবাব দিল, 'ও তো খুব ভাল মাইয়া। ও লেখাপড়া জানে, দেমাক আছে। খুব বড় ঘরে মানুষ হইছে, ফরাসি ভাষা পইড়তে পারে। যহন-তহন কাঁদে, কুনো মতেই ভুলতে পারে না। খুবই ভাল মাইয়া।'

কাতয়ুশা স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ জুরিদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ গম্ভীর ও

কঠিন হয়ে উঠল। একটা চোখ ঈষৎ কুঁচকে গেল, আর দুটি বিচিত্র চোখ অনেকক্ষণ নেখ্‌লুদ্‌ভের দিকে তাকিয়ে রইল। ভয় তাকে যতই পেয়ে বসুক তবুও ঐ দুটি টেঁরা উজ্জ্বল চোখের উপর থেকে নেখ্‌লুদ্‌ভ তার দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে পারল না।

সেই ভয়ংকর রাত, তার কুয়াসা, নীচের নদীতে বরফ ভাঙার শব্দ, বিশেষ করে শেষ রাতের দিকে ওঠা উপরের দিকে দুটো শিং তোলা বাঁকা চাঁদ—সব তার মনে পড়ে গেল। তার প্রতি নিবদ্ধ ওই দুটি কালো চোখ দেখে তার মনে পড়ে গেল সেদিনের চাঁদের আলোয় ধূসর হয়ে ওঠা চারদিকের কালো ভৌতিক অন্ধকার।

'ও আমাকে চিনতে পেরেছে', এ কথা ভাবতেই নেখ্‌লুদ্‌ভ কুঁকড়ে পিছনে সরে গেল, যেন কেউ তাকে আঘাত করতে এসেছে। কিন্তু কাতয়ুশা তাকে চিনতে পারে নি। সে নিঃশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল। নেখ্‌লুদ্‌ভও নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, 'আঃ, তাড়াতাড়ি যদি কাজটা শেষ হয়ে যেত।'

শিকারে বেরিয়ে একটা আহত পাখিকে যখন মেরে ফেলতে হয় তখন তার মনে যে বিরক্তি ও করুণা দেখা দেয়, সেই একই মনোভাব তাকে পেয়ে বসল। আহত পাখিটা থলের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। তা দেখে বিরক্তিও জাগে, আবার করুণাও হয়। যত তাড়াতাড়ি সেটাকে মেরে ফেলে সবকিছু ভুলে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

বুকের মধ্যে এই মিশ্র অনুভূতি নিয়ে নেখ্‌লুদ্‌ভ বসে বসে সাক্ষীদের জেরা শুনতে লাগল।

অধ্যায়—২০

কিন্তু বুঝিবা তাকে কষ্ট দেবার জন্যই মামলাটা অনেক সময় ধরে চলতে লাগল। প্রতিটি সাক্ষীকে আলাদা করে জেরা করা হল, সকলের শেষে জেরা করা হল বিশেষজ্ঞকে; সরকারী উকিল এবং উভয় পক্ষের অ্যাডভোকেটরা যথারীতি গাম্ভীর্যের সঙ্গে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারপর যে সমস্ত জিনিস সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছিল সেগুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্য প্রেসিডেন্ট জুরিদের আহ্বান করল। তার মধ্যে ছিল হীরের গোলাপ বসানো মস্ত বড় একটা আংটি; যতদূর মনে হয় সেটা তর্জনীতেই পরা হত; আর একটা টেস্ট টিউব যাতে বিষটা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এগুলির গায়ে লেবেল আঁটা ও সিলমোহর করা ছিল।

জুরিরা জিনিসগুলি দেখতে যাবে এমন সময় সরকারী উকিল উঠে দাঁড়িয়ে জানাল যে, তার আগে মৃতদেহের ডাক্তারী পরীক্ষার বিবরণটা পাঠ করা

উচিত।

প্রেসিডেণ্ট চাইছিল তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে, যাতে সে তার সেই সুইশ মেয়েটির কাছে চলে যেতে পারে; তাছাড়া সে জানত যে, এ কাগজটা পড়ার ফলে শুধু ক্লান্তি বাড়বে, খাবার সময়টা পিছিয়ে যাবে, আর কোন ফলই হবে না; আর সরকারী উকিলও সেটা পড়তে চাইছে তার একমাত্র কারণ সেটা পড়ার অধিকার তার আছে; তবু সম্মতি দেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

সেক্রেটারি ডাক্তারী রিপোর্টটা বের করে তার একঘেয়ে গলায় r এবং t-র মধ্যে কোন পার্থক্য না করে সেটা পড়তে শুরু করল।

বাহ্যিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে:

(১) ফেরাপন্ত স্মেলকভের উচ্চতা ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি।

বণিকটি সাগ্রহে নেখ্‌লুয়ুদভের কানে কানে বলল, 'খুব খারাপ নয়। আকৃতি মোটামুটি ভালই।'

(২) তাকে দেখে মনে হয় বয়স চল্লিশ বছর।

(৩) শরীরটা ফুলো-ফুলো দেখতে।

(৪) মাংসের রং সবুজ, কয়েক জায়গায় কালো দাগ রয়েছে।

(৫) চামড়ায় নানা মাপের ফোস্কা পড়েছে এবং অনেক জায়গায় বড় বড় চামড়া উঠে গেছে।

(৬) চুল বাদামী; ঘন এবং হাত লাগালেই চামড়া থেকে উঠে আসছে।

(৭) চোখের তারা দুটো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে, আর মণিটা আবছা হয়ে গেছে।

(৮) নাক, কান ও মুখ দিয়ে কিছু তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়েছে; মুখটা অর্ধেক খোলা।

(৯) মুখ এবং বুক ফুলে ওঠায় গলাটা প্রায় ঢেকে গেছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রিপোর্ট পড়া শেষ হলে ব্যাপারটা শেষ হয়েছে মনে করে প্রেসিডেণ্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে মাথাটা তুলল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেক্রেটারি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিবরণে চলে গেল।

প্রেসিডেণ্ট আবার হাতের উপর মাথা রেখে চোখ বুজল। নেখ্‌লুয়ুদভের পার্শ্ববর্তী বণিক ঘুমে ঢুলে পড়ায় তার শরীরটা সামনে-পিছনে দুলতে লাগল। কয়েদী ও প্রহরীরা চুপচাপ বসে রইল।

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় দেখা গেছে যে:

(১) খুলির হাড় থেকে চামড়াটা সহজেই খুলে যাচ্ছে, এবং জমাট রক্ত পাওয়া যায় নি।

(২) খুলির হাড়ের ঘনত্ব স্বাভাবিক এবং অবিকৃত অবস্থায় ছিল।

(৩) মস্তিষ্কের রং সাদা হলেও তার ঝিল্লিতে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা দুটো বিবর্ণ দাগ পাওয়া গেছে।

এবং আরও তেরোটি অনুচ্ছেদব্যাপী এই রকম বিবরণ।

এই রিপোর্ট পড়তেই পাক্কা এক ঘণ্টা সময় লাগল ; কিন্তু সরকারী উকিল তাতেও সন্তুষ্ট নয়, কারণ পড়া শেষ হলে প্রেসিডেন্ট যখন তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ পাঠ করার কি কোন দরকার আছে ?' তখন সে সভাপতির দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, 'আমি চাই সেটাও পড়া হোক।'

পুনরায় রিপোর্ট পড়া শুরু হল :

সেক্রেটারি পুনরায় শুরু করল। উপস্থিত সকলের চোখে যে ঘুম নেমে এসেছিল বুঝি বা তাকে তাড়াতেই তার গলার স্বর বেশ চড়ে গেল। '১৮৮— সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী সরকারী চিকিৎসা বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সহকারী মেডিক্যাল ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে ৬৩৮ নং পরীক্ষা কার্যে নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করি :

(১) দক্ষিণ ফুসফুস ও হৃদ্‌পিণ্ড (একটি ৬ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে রক্ষিত)।

(২) পাকস্থলীতে প্রাপ্ত পদার্থ (৬ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে)।

(৩) পাকস্থলীটা (৬ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে)।

(৪) যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রাশয় (৯ পাউণ্ড কাঁচের পাত্রে)।

(৫) অন্ত্রসমূহ (৬ পাউণ্ড মাটির পাত্রে)।

এখানে প্রেসিডেন্ট একজন সদস্যের কানে কানে কি যেন বলল, তারপর আর একজনের দিকে ঝুঁকল, এবং তাদের সম্মতি পেয়ে বলে উঠল, 'আদালত মনে করে যে এই রিপোর্ট পড়া অবান্তর।'

সেক্রেটারি পড়া বন্ধ করে কাগজখানা ভাঁজ করে ফেলল, আর সরকারী উকিল রেগেমেগে কি যেন লিখতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট বলল, 'জুরিমহোদয়গণ এবার প্রদর্শিত বস্তুগুলি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।' ফোরম্যান ও অপর কয়েকজন উঠে টেবিলের কাছে গেল। তারা আংটি, কাঁচের পাত্র ও টেস্ট টিউবটা দেখল। বণিকটি তো আংটিটা পরবার চেষ্টাও করল।

সেটাকে যথাস্থানে রেখে সে বলল, 'আঃ, একখানা আঙুল বটে, একটা কাঁকুড়ের মত।' মনে মনে নিহত বণিকের বিরাট দেহটা কল্পনা করে সে বেশ খুশি হয়ে উঠল।

অধ্যায়—২১

প্রদর্শিত জিনিসগুলি দেখা শেষ হয়ে গেলে প্রেসিডেণ্ট সওয়ালের জন্য সরকারী উকিলকে ডাকল। তার আশা ছিল যে সরকারী উকিলও তো মানুষ, কাজেই তারও ধূমপানের বা আহারের গরজ থাকতে পারে এবং অপরের প্রতি কিছুটা করুণাও দেখাতে পারে। কিন্তু সরকারী উকিল কি নিজের কি অপরের কারও প্রতিই করুণা দেখাল না। সে স্বভাবতই অত্যন্ত অবিবেচক; তাছাড়া স্কুলের শেষ পরীক্ষায় একটা সোনার মেডেল পাওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রোম্যান আইন পড়বার সময় 'ক্রীতদাসপ্রথার' উপর একটা প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পাওয়ায় তার আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-তুষ্টি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল (মেয়েদের ব্যাপারে সাফল্যও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে) এবং তারই ফলে তার অবিবেচনা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। প্রেসিডেণ্টের ডাকে সাড়া দিয়ে সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, যাতে কারুকার্যকরা পরিচ্ছদে শোভিত তার সুঠাম দেহ সকলে ভালভাবে দেখতে পায়। ডেস্কের উপর হাত দুটি রেখে মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে সে ঘরের চারদিকে তাকাল এবং কয়েদীদের দৃষ্টি এড়িয়ে রিপোর্ট পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি করা বক্তৃতাটা শুরু করল।

'জুরিমহোদয়গণ! আপনাদের সামনে যে মামলাটা উঠেছে, আমার ভাষায় সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য।'

তার মতে সরকারী উকিলের বক্তব্যের সব সময়ই একটা নাগরিক গুরুত্ব থাকা উচিত, প্রথিতযশা অ্যাডভোকেটদের সব বিখ্যাত বক্তৃতাগুলির যেমন থাকে। এ কথা ঠিক যে সেখানে শ্রোতা মাত্র তিনটি স্ত্রীলোক—একটি দরজি, একটি রাঁধুনি ও সাইমনের বোন—এবং একটি কোচয়ান; কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিখ্যাত লোকরাও গোড়ায় এইভাবেই শুরু করেছিল।

'জুরিমহোদয়গণ, আপনাদের সম্মুখে যে অপরাধটি উপস্থিত করা হয়েছে সেটি —আমার ভাষায়—বর্তমান শতাব্দীর শেষ পাদের লক্ষণাক্রান্ত; এতে সেই বেদনাদায়ক ঘটনা, সেই নীতিহীনতার লক্ষণগুলি রয়েছে আমাদের বর্তমান সমাজের এই সব মানুষরা যার শিকার হয়েছে।'

সরকারী উকিল সবিস্তারে এমনভাবে বলতে লাগল যাতে মনে মনে ঠিক করে রাখা কোন উল্লেখযোগ্য শব্দ বাদ না পড়ে এবং এইভাবে কোথাও না থেমে একটানা এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট বক্তৃতা চালিয়ে গেল।

শুধু একটিবার সে থেমেছিল যখন তার মুখে খানিকটা থুথু জমেছিল, কিন্তু অচিরেই সেটা গিলে ফেলে নতুন উদ্যমে আরও জোর গলায় বক্তৃতা শুরু করে দিল।

তার মতে, বণিক স্মেলকভ সেই শক্তিমান সরল রুশদের একজন যে একেবারে অতলে নেমে-যাওয়া মানুষদের হাতে পড়ে তার উদার, বিশ্বাসপ্রবণ

প্রকৃতির ফলে বিনষ্ট হয়েছে।

সাইমন কার্তিংকিন দাসত্বপ্রথার কুসন্তান, একটি নির্বোধ, অজ্ঞান, নীতি-বিহীন মানুষ যার কোন ধর্মবোধ পর্যন্ত নেই। এভ্‌ফিমিয়া তারই মনিব, বংশধারার শিকার; অধঃপতনের সব লক্ষণই তার মধ্যে পরিস্ফুট। এ ব্যাপারে প্রধান কলকাঠি-নাড়া মানুষ হল মাসলভা, এই অধঃপতিত যুগের সর্বনিম্ন স্তরের জীব সে।

তার দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, 'এই আদালতে তার মালকিনের কাছ থেকে আজ আমরা শুনেছি যে এই স্ত্রীলোকটি লেখাপড়া শিখেছে, শুধু যে লিখতে-পড়তে জানে তাই নয়, ফরাসীও জানে। সে মাতৃপিতৃহীন, ফলে অপরাধের বীজাণু তার মধ্যেই রয়েছে। একটি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে সে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিল, কাজেই সৎ পথে থেকে সে জীবন কাটাতে পারত; কিন্তু উপকারীদের আশ্রয় ছেড়ে এসে সে উচ্ছৃংখলতার পথে নেমে গেল, এমন কি বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য বেশ্যালয়ে ঢুকল; আর সেখানে স্বীয় শিক্ষার গুণে এবং—জুরিমহোদয়গণ, তার মালকিনের কাছ থেকে আপনারাও শুনেছেন—যে রহস্যময় ক্ষমতার কথা বর্তমান বিজ্ঞান বিশেষ চারকটপন্থীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে এবং সম্মোহনী প্রভাব বলে অভিহিত করেছে সেই ক্ষমতার দ্বারা সমাগত অতিথিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেকে অন্য সকলের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই ভাবেই সে এই রুশ ভদ্রলোককে, এই দয়ালু-হৃদয় ধনী বণিক সাদকো-কে (নভ্‌গরদ অঞ্চলের প্রাচীন রুশ উপকথার নায়ক) নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে এবং সেই বিশ্বাসের সুযোগে প্রথমে তার সর্বস্ব হরণ করে এবং তারপর তাকে নির্দয়ভাবে খুন করে।'

গম্ভীর সদস্যটির দিকে ঝুঁকে প্রেসিডেন্ট হেসে বলল, 'খুব চাপান দিচ্ছে, কি বলেন?'

সদস্যটি জবাব দিল, 'মারাত্মক বোকা লোকটা!'

ওদিকে সরকারী উকিল বক্তৃতা চালিয়েই যাচ্ছে।

শরীরটাকে সুন্দরভাবে দুলিয়ে বলল, 'জুরিমহোদয়গণ, আপনাদের হাতে শুধু যে এই সব লোকের ভাগ্য ন্যস্ত রয়েছে তাই নয়, কতকাংশে ন্যস্ত রয়েছে সমাজেরও ভাগ্য, কারণ আপনাদের রায় সমাজকেও প্রভাবিত করবে। এই অপরাধের সম্পূর্ণ অর্থ আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন। মাসলভার মত যাদের আমরা রোগাক্রান্ত বলে আখ্যা দিতে পারি তারা যে সমাজের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক সেটাও আপনারা ভাল করে ভাবুন। সমাজকে এই সংক্রামক রোগীদের হাত থেকে রক্ষা করুন; সমাজের নির্দোষ ও শক্তিশালী অংশকে সংক্রমণ, এমন কি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।'

প্রত্যাশিত রায়ের গুরুত্বে অভিভূত হয়ে সরকারী উকিল নিজের বক্তৃতায় নিজেই খুশি হয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল।

তারপর অ্যাডভোকেটদের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল একজন মাঝ-বয়সী লোক। পরণে চাতক পাখির লেজের মত কোট ও নীচু-কাটের ওয়েস্ট-কোট যার নীচে অর্ধবৃত্তাকার একটা ধপধপে ধোয়া শার্ট দেখা যাচ্ছে। লোকটি কারতিংকিন ও বচকভার পক্ষ সমর্থন করে বক্তৃতা করল। তিন শ' রুবল দিয়ে তাকে এ কাজে লাগানো হয়েছে। সে এদের দুজনকেই নির্দোষ ঘোষণা করে সব দোষ মাসলভার উপর চাপিয়ে দিল।

সে যখন টাকাটা নেয় তখন বচকভা ও কারতিংকিন তার সঙ্গে ছিল বলে মাসলভা যে বিবৃতি দিয়েছে তার সত্যতা অস্বীকার করে অ্যাডভোকেটটি জোর দিয়ে বলে যে, যেহেতু তার বিরুদ্ধে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে সেই হেতু তার সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা যায় না। সে আরও বলে, দুটি সৎ পরিশ্রমী মানুষ যারা হোটেলের অধিবাসীদের কাছ থেকে দৈনিক তিন থেকে পাঁচ রুবল বকশিস পেয়ে থাকে, তারা সহজেই এক হাজার আটশ' রুবল সঞ্চয় করতে পারে। বণিকের টাকাটা মাসলভাই চুরি করে এবং অন্য কাউকে চালান করে দেয়, অথবা হারিয়েই ফেলে, কারণ সে তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। মাসলভা একাই বিষ-প্রয়োগ করে।

সুতরাং জুরিদের কাছে তার প্রার্থনা, কারতিংকিন ও বচকভাকে চুরির দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হোক; অথবা তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত এটা স্বীকার করে নেওয়া হোক যে বিষ-প্রয়োগের সঙ্গে কোনভাবে জড়িত না থেকেই চুরিটা করা হয়েছিল।

শেষ করবার আগে সরকারী উকিলকে ঠেস দিয়ে অ্যাডভোকেটটি বলল, আমার পণ্ডিত বন্ধুটি বংশগত ধারা সম্পর্কে যে চমৎকার উক্তি করেছেন তাতে বংশগত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলেও এক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য নয়, কারণ বচকভার পিতৃমাতৃ-পরিচয় অজ্ঞাত।

সরকারী উকিল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন নোট করল এবং ঘৃণিত বিস্ময়ে কাঁধ দুটিতে ঝাঁকুনি দিল।

উঠে দাঁড়াল মাসলভার অ্যাডভোকেট। মাসলভার পক্ষ সমর্থন করে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে তার বক্তব্য বলতে লাগল। সে যে চুরিতে অংশ গ্রহণ করেছিল সেটা অস্বীকার না করে সে জোর দিয়ে বলল যে, স্মেলকভকে বিষ দেবার কোন ইচ্ছা তার ছিল না, তাকে ঘুম পাড়াবার জন্যই গুঁড়োটা তাকে দিয়েছিল। তারপর একটুখানি বাগ্মিতা প্রদর্শনের চেষ্টায় কেমন করে যে লোকটির দ্বারা মাসলভা এই পাপ-জীবনে প্রথম নামতে বাধ্য হয়েছিল, সে আজও বিনা শাস্তিতেই বেঁচে আছে, আর অধঃপতনের সবটা বোঝা এই মেয়েটি একাকি বহন করছে তারই বিবরণ তুলে ধরল। কিন্তু মনস্তত্ত্বের রাজ্যে তার এই অনুপ্রবেশ এতই ব্যর্থ হয়ে গেল যে সকলেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। যখন সে পুরুষের নিষ্ঠুরতা ও নারীর অসহায়তা নিয়ে মন্তব্য করতে গেল তখন

প্রেসিডেন্ট মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কথা বলতে অনুরোধ জানিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল।

তার বক্তব্য শেষ হলে সরকারী উকিল পাল্টা জবাব দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। প্রথম অ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে নিজের পক্ষ সমর্থন করে সে বলল, বচকভার বাপ-মার পরিচয় অজ্ঞাত থাকলেও তাতে বংশগতির নিয়ম মিথ্যা প্রমাণিত হয় না, কারণ বিজ্ঞান বংশগতির নিয়মকে এতদূর প্রমাণ করেছে যে আমরা শুধু যে বংশগতি থেকে অপরাধকে অনুমান করতে পারি তাই নয়, অপরাধ থেকেও বংশগতিকে প্রমাণ করতে পারি। আবার মাসলভার পক্ষ সমর্থনে যখন বলা হয়েছে যে জনৈক কাল্পনিক (সরকারী উকিল বিশেষ করে "কাল্পনিক" কথাটার উপর প্রচণ্ড জোর দিয়ে কথা বলল) প্রলোভনকারী তাকে ভ্রষ্টচরিত্রা করেছে, সে প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে আমাদের সামনে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে তাতে মনে হয় যে এই নারীই আরও অনেক অনেক পুরুষকে হাতের মুঠোয় এনে পাপের পথে টেনে নামাবার কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই কথাগুলো বলে সে বিজয়ীর ভঙ্গীতে বসে পড়ল।

তখন কয়েদীদের যার যার পক্ষ সমর্থনে কথা বলবার অনুমতি দেওয়া হল।

এভফিমিয়া পুনরায় একই কথা বলল যে, এ ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। এবং কোন কিছু করেও নি। সব দোষ সে মাসলভার উপর চাপিয়ে দিল। সাইমন কারতিংকিন বার কয়েক একই কথা বলল, 'এ সব আপনাদের ব্যাপার, কিন্তু আমি নির্দোষ ; এটা অন্যায়।'

মাসলভা আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই বলল না। প্রেসিডেন্ট যখন তাকে কিছু বলতে বলল, তখন সে শুধু তার দিকে চোখ তুলে তাকাল, শিকারীতাড়িত জন্তুর মত ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ফেরাল, আর তারপরই মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নেখ্‌লুদভের মুখ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বের হওয়ায় বণিক প্রশ্ন করল, 'ব্যাপার কি ?' ওটা জোর করে একটা কান্নাকে চেপে রাখার শব্দ।

তার তৎকালীন পরিস্থিতির তাৎপর্য নেখ্‌লুদভ তখন পর্যন্তও বুঝে উঠতে পারে নি। যে কান্নাকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না, যে অশ্রু তার দুই চোখ ছাপিয়ে উঠেছে, সে সবই তার দুর্বল স্নায়ুর লক্ষণ বলে সে ভেবে নিল। চোখের জল ঢাকবার জন্য সে পিঁস-নেটা চোখে পড়ল, আর রুমাল বের করে নাক ঝাড়তে শুরু করল।

আদালতের সবাই তার অতীত কীর্তি জানতে পারলে যে অসম্মান তাকে ঘিরে ধরবে তারই ভয় তার আত্মার কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিল। তখনকার মত এই ভয়ই সব চাইতে বড় হয়ে তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

অধ্যায়—২২

কয়েদীদের শেষ কথা শোনবার পরে প্রশ্নগুলি জুরিদের কাছে কোন্ আকারে রাখা হবে সেটা স্থির হল, আর তাতেও কিছু সময় গেল। অবশেষে প্রশ্নগুলি সংকলিত হল এবং প্রেসিডেণ্ট সব কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করতে লাগল।

মামলাটা জুরিদের কাছে উপস্থিত করবার আগে প্রেসিডেণ্ট কিছু সময় ধরে তার মনোরম ঘরোয়া ভাষণে তাদের বোঝাতে লাগল যে, যেটা ছিঁচকে চুরি সেটা ছিঁচকে চুরিই, আর যেটা চুরি সেটা চুরিই; তালা-চাবিবন্ধ কোন জায়গা থেকে চুরি করাটা তালা-চাবিবন্ধ জায়গা থেকে চুরি করাই। আবার তালা-চাবি না দেওয়া জায়গা থেকে চুরি করাটা তালা-চাবি না দেওয়া জায়গা থেকে চুরি করাই। এই কথাগুলি ব্যাখ্যা করবার সময় বার বার সে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন তার মনের আশা যে নেখ্‌লুয়ুদভ এ সব গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলি স্বয়ং উপলব্ধি করে সহকর্মী জুরিদের সেগুলো বোঝাতে পারবে। যখন সে মনে করল যে জুরিরা এ সব সত্যই যথেষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে তখন সে আর একটি সত্যকে ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হল—অর্থাৎ হত্যা এমন একটি কাজ যার ফলে একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে; সুতরাং বিষ-প্রয়োগকেও হত্যা বলা যেতে পারে। তার যখন মনে হল যে জুরিরা সে সত্যকেও বুঝতে পেরেছে তখন সে বোঝাতে শুরু করল যে, চুরি এবং হত্যা যদি একই সঙ্গে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে দুটি অপরাধের মিলিত ফল হবে হত্যাসহ চুরি।

যদিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করতে সে নিজেই ব্যগ্র, যদিও সে জানে যে সুইশ মেয়েটি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, তবু নিজের কর্তব্যে সে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে একবার কথা বলতে আরম্ভ করলে আর সে থামতে পারে না; কাজেই সে বিস্তারিতভাবে জুরিদের বোঝাতে লাগল যে, যদি তারা বুঝতে পারে যে কয়েদীরা দোষী, তাহলে দোষী রায় দেবার অধিকার তাদের আছে; যদি তারা বোঝে তারা দোষী নয়, তাহলে নির্দোষ রায় দেবার অধিকারও তাদের আছে; আবার যদি তারা বোঝে যে কয়েদীরা এক অপরাধে দোষী, কিন্তু অন্য অপরাধের বেলায় নয়, তাহলে এক অপরাধের ক্ষেত্রে দোষী এবং অন্য অপধাধের ক্ষেত্রে নির্দোষ রায়ও তারা দিতে পারে। সে আরও ব্যাখ্যা করে বলল যে, এই সব অধিকার তাদের দেওয়া থাকলেও সে অধিকারকে যুক্তি সহকারে প্রয়োগ করাই তাদের কর্তব্য। সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘড়ির উপর চোখ পড়ায় যখন দেখল যে তিনটে বাজতে মাত্র তিন মিনিট বাকি, তখন আর বিলম্ব না করে মামলার বিবরণ শেষ করাই স্থির করল।

'এই মামলার বিবরণ নিম্নরূপ', এই ভাবে শুরু করে প্রেসিডেণ্ট সেই সব

কথারই পুনরাবৃত্তি করল যেগুলি ইতিপূর্বেই অ্যাডভোকেটরা, সরকারী উকিল ও সাক্ষীরা বার কয়েক বলেছে।

প্রেসিডেন্ট বলে চলল, আর পার্শ্ববর্তী সদস্যরা মুখের উপর গভীর মনো-যোগের ভাব ফুটিয়ে শুনলেও মাঝে মাঝেই ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগল, কারণ তাদের মনে হতে লাগল যে বক্তৃতাটি খুব ভাল—অর্থাৎ যে রকমটা হওয়া উচিত —হলেও বড় বেশী দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সরকারী উকিল, অন্য উকিলরা, আসলে আদালতের সকলের মনেই ওই এক কথা। অবশেষে প্রেসিডেন্ট মামলার বিবরণ শেষ করল।

যখন থেকে প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতা শুরু করেছে তখন থেকেই মাসলভা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তার মনে ভয় পাছে কোন একটা শব্দ সে শুনতে না পায়। ফলে তার সঙ্গে চোখে-চোখে হবার ভয় না থাকায় নেখ্‌ল্যুদভও সারাক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। আর তার মন অতীতের অনেকগুলো অধ্যায়কে পরিক্রমা করে এল।

হ্যাঁ, ঠিক সেই। পরনে কয়েদীর আলখাল্লা, চেহারা অনেক বড় হয়েছে, বুক ও মুখের নীচটা অনেক বেশী ভরাট হয়েছে, কপালে ও মুখে বেশ কিছু ভাঁজ পড়েছে, চোখ দুটো ফুলেছে, তথাপি এ নিশ্চয় সেই কাত্যুশা যে একদা এক ঈস্টারের রাতে কত সরল ভাবে ভালবেসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর তার দুটি হাসি-ভরা চোখ জীবনের আনন্দে ভরে উঠেছিল।

'কী আশ্চর্য যোগাযোগ যে এতগুলো বছর আমি তাকে একবারও না দেখলেও এই মামলায় আজ আমি বসেছি জুরির আসনে, আর তাকে দেখছি কয়েদীর কাঠগড়ায়! জানি না কোথায় এর পরিণতি! আঃ, ওরা যদি আরও দ্রুত সব কাজ শেষ করতে পারত!'

তথাপি যে অনুশোচনা তার ভিতর থেকে মাথা তুলতে চাইছে তার কাছে সে কিছুতেই নত হবে না। সে ভাবতে চেষ্টা করল যে এ সবই আকস্মিক ব্যাপার, তার প্রচলিত জীবনযাত্রায় কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই মিলিয়ে যাবে। তার মনে হল সে যেন একটা পোষা কুকুর; গলায় বাঁধা শেকল রয়েছে মনিবের হাতে, আর কুকুরটা নিজের ময়লার মধ্যেই নাক ঘসছে। কখনও ঘেউ ঘেউ করছে, কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা ময়লার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাইছে, কিন্তু নির্দয় মনিব যেতে দিচ্ছে না।

নেখ্‌ল্যুদভও নিজের কাজে নিজেই বিরক্তিবোধ করলেও সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর শক্তিমান হাতের টানও বোধ করছে; কিন্তু নিজের কাজের তাৎপর্য সে এখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি, আর তাই প্রভুর হাতের টানকেও বুঝতে চাইছে না। তাই এখনও সে সাহসে ভর করে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পায়ের উপর পা রেখে সামনের সারিতে চেয়ারে বসে পিঁস্‌-নে নিয়ে খেলা করছে। তথাপি সর্বক্ষণই অন্তরের অন্তঃস্তলে শুধু মাত্র এই বিশেষ কাজটিই নয়, তার সমগ্র

স্বেচ্ছাচারী, অসংযত, নিষ্ঠুর, অলস জীবনযাত্রার নিষ্ঠুরতা, কাপুরুষতা ও নীচতাকে সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। আর যে ভয়ংকর যবনিকা একটা দুর্বোধ্য উপায়ে তার এই পাপকে, পরবর্তী দশ বছরব্যাপী সমগ্র জীবনকে তার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিল, আজ যেন সে যবনিকা কাঁপতে শুরু করেছে, আর তার আড়ালে এতদিন যা কিছু ঢাকা ছিল সব যেন সে দেখতে পাচ্ছে।

অধ্যায়—২৩

অবশেষে প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শেষ হল। হাতের মনোরম ভঙ্গীতে প্রশ্নমালাকে তুলে নিয়ে সে ফোরম্যানের হাতে দিল। ফোরম্যান এগিয়ে এসে হাত পেতে সেটা নিল। এতক্ষণে নিজেদের আলোচনা-কক্ষে ফিরে যেতে পারায় খুশি হয়ে জুরিরা একে একে আদালত থেকে চলে গেল। তাদের পিছনে দরজটা বন্ধ হওয়া মাত্রই একটি রক্ষীসৈনিক এগিয়ে এসে খাপ থেকে তলোয়ার খুলে সেটাকে কাঁধের উপর উঁচু করে ধরে দরজার পাশে দাঁড়াল। বিচারকেরা উঠে বেরিয়ে গেল। কয়েদীদেরও বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

আলোচনা-কক্ষে গিয়ে জুরিদের প্রথম কাজই হল আগেকার মত সিগারেট বের করে ধূমপান শুরু করা। এতক্ষণ আদালতে বসে থেকে সকলেই অল্প-বিস্তর নিজেদের কাজের অস্বাভাবিকতা ও অসারতা বোধ করছিল; আলোচনা-কক্ষে এসে ধূমপান করতে করতে সে মনোভাব দূর হয়ে গেল। একটা স্বস্তিবোধ করে সকলেই গুছিয়ে বসল এবং উত্তপ্ত আলোচনা শুরু করে দিল।

দয়ালু বণিক বলল, 'মেয়েটির দোষ নেই। সেই ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়েছিল। আমরা চাইব যে তাকে করুণা প্রদর্শন করা হোক।'

ফোরম্যান বলল, 'সেটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে। ব্যক্তিগত ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা চলতে পারি না।'

কর্ণেল মন্তব্য করল, 'প্রেসিডেন্টের সংক্ষিপ্ত-সারটি বেশ ভাল হয়েছিল।'

'ভাল? সেকি, আমার তো প্রায় ঘুম পেয়ে গিয়েছিল।'

ইহুদি-বংশোদ্ভূত কেরাণীটি বলল, 'আসল কথাই হল, মাসলভা তাদের সঙ্গে জড়িত না থাকলে চাকররা টাকার কথা জানতেই পারত না।'

একজন জুরি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আপনারা কি মনে করেন মেয়েটিই চুরি করেছিল?'

দয়ালু বণিকটি চেঁচিয়ে বলল, 'সে কথা আমি কখনও বিশ্বাস করব না। সব ঐ লাল চোখ ডাইনিটার কাজ।'

কর্ণেল বলল, 'তারা সকলেই ভাল মানুষ।'

'কিন্তু সে তো বলছে ঘরের মধ্যে যায়ই নি।'

'আঃ! তাহলে তার কথাই বিশ্বাস করে বসে থাকুন।'

'পৃথিবীর সকলে বললেও আমি ওই ভ্রষ্টা নারীর কথা বিশ্বাস করব না।'

কেরাণী বলল, 'আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন তাতে তো ব্যাপারটার মীমাংসা হবে না।'

কর্ণেল বলল, 'মেয়েটির কাছেই চাবি ছিল।'

বণিক পাল্টা প্রশ্ন করল, 'ছিল তো কি হয়েছে?'

'আর আংটিটা?'

বণিক আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'সে সম্পর্কে সব কিছু সে কি বলে নি? লোকটা মেজাজে ছিল, তার উপর পেটেও বেশ কিছু পড়েছিল, আর মেয়েটিকে আঘাতও করেছিল; এর চাইতে সহজ আর কি হতে পারে? তারপরই সে দুঃখিত বোধ করল—খুবই স্বাভাবিক। বলল, "কিছু মনে করো না। এটা নাও।" ওরা বলছিল, তার উচ্চতা ছ'ফুট পাঁচ ইঞ্চি; আমার তো মনে হয় তার ওজন হবে বিশ স্টোন।'

পিয়তর গেরাসিমভিচ বলল, 'সেটা তো কথা নয়। প্রশ্ন হল, সমস্ত ব্যাপারটা কার মাথায় এসেছিল, আর কেই বা প্রেরণা জুগিয়েছিল, মেয়েটা, না চাকররা?'

'চাকরদের নিজেদের পক্ষে এটা করা সম্ভবই ছিল না, কারণ চাবি ছিল মেয়েটির কাছে।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই রকম ইতস্তত আলোচনা চলতে লাগল।

শেষটায় ফোরম্যান বলল, 'মাফ করবেন মশাইরা, এক সঙ্গে বসে ব্যাপারটা আলোচনা করা ঠিক নয় কি? আসুন বসা যাক।' বলেই সে একটা চেয়ারে বসল।

কেরাণী বলল, 'কিন্তু এ সব মেয়েরা সব পারে।' তার মতে মাসলভাই প্রধান অপরাধী, আর সে মতের সমর্থনে সে একটা ঘটনা বলল, কেমন করে একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক রাজপথ থেকে তার এক সহকর্মীর ঘড়ি চুরি করেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে কর্ণেল আরও উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনার কথা জানাল; একটা রূপোর সামোভার চুরির ঘটনা।

পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকে ফোরম্যান বলল, 'মশাইরা, দয়া করে প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করুন।'

প্রশ্নগুলি এইভাবে লেখা হয়েছিল:

(১) ১৮৮—সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে—শহরের আরও কিছু লোকের সঙ্গে সহযোগিতায় বণিক স্মেলকভের জিনিসপত্র ও টাকা-কড়ি অপহরণের উদ্দেশ্যে তার প্রাণনাশের চেষ্টায় বিষমিশ্রিত ব্র্যাণ্ডি খেতে দিয়ে তার মৃত্যু ঘটাবার, এবং তার কাছ থেকে নগদ ছ'হাজার পাঁচশ' রুবল ও একটি হীরের আংটি চুরির অপরাধে গ্রাম বরকি, জেলা ক্রাপি ভেনস্কির অধিবাসী তেইশ

বছর বয়স্ক চাষী সাইমন পেত্রভিচ কারতিংকিন কি অপরাধী ?

(২) উপরে বর্ণিত অপরাধে তেতাল্লিশ বছরের এভফিমিয়া আইভান্‌ভনা বচকভা কি অপরাধী ?

(৩) প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে সাতাশ বছরের কাতেরিনা মিখাইলভ্‌না মাসলভা কি অপরাধী ?

(৪) কয়েদী এভফিমিয়া বচকভা যদি প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত অপরাধে অপরাধী না হয়ে থাকে, তাহলে ১৮৮—সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে হোতেল মরিতানিয়াতে কর্মনিযুক্ত অবস্থায় ঐ হোটেলের অধিবাসী বণিক স্মেলকভের ঘর থেকে তার তালাবদ্ধ পোর্টম্যাণ্টো থেকে দু হাজার পাঁচশ' রুবল চুরি করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে একটা চাবি নিয়ে এসে তালায় লাগিয়ে পোর্টম্যাণ্টোটা খোলার অপরাধে সে কি অপরাধী ?"

ফোরম্যান প্রথম প্রশ্নটি পড়ল।

'বলুন মশাইরা, আপনারা কি মনে করেন ?'

প্রশ্নের জবাব তাড়াতাড়িই পাওয়া গেল। সকলেই একমত হয়ে বলল 'দোষী' এবং বিষপ্রয়োগ ও লুঠ উভয় ব্যাপারেই কারতিংকিন জড়িত। একজন বৃদ্ধ 'আর্টেল্‌শ্‌চিক (শ্রমিক সংগঠনের সদস্য) একমাত্র ব্যতিক্রম, কারণ সে মুক্তির স্বপক্ষে মত প্রকাশ করল।

ফোরম্যান ভাবল সে হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি, তাই তাকে বোঝাতে চাইল যে সব কিছুই কারতিংকিনের অপরাধই প্রমাণ করছে। বৃদ্ধ জবাবে বলল যে সে সবই বুঝেছে, তবু সে এখনও মনে করে যে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করাই ভাল, কারণ 'আমরা নিজেরাও কিছু সাধুসন্ত নই।'

বচকভা-সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে অনেক বিতর্ক ও চেঁচামেচির পরে এক বাক্যে বলা হল 'নির্দোষ', কারণ বিষপ্রয়োগে যে তার হাত ছিল সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

মাসলভাকে খালাস দেবার আগ্রহে বণিক বার বার বলতে লাগল যে, এ সব কিছুর প্রধান উদ্যোক্তাই বচকভা। জুরিদের অনেকেই এই মত সমর্থন করলেও আইনের পথে ঠিক ঠিক চলবার বাসনায় ফোরম্যান ঘোষণা করল যে, বচকভাকে বিষ প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত করবার মত কোন প্রমাণ তাদের হাতে নেই। অনেক বিতর্কের পরে ফোরম্যানের মতই বহাল থাকল।

বচকভা সম্পর্কিত চতুর্থ প্রশ্নের জবাব হল 'দোষী'। কিন্তু আর্টেল্‌শ্‌চিকের পীড়াপীড়িতে তাকে করুণা প্রদর্শনের সুপারিশ করা হল।

মাসলভা-সম্পর্কিত তৃতীয় প্রশ্নে বিতর্কের তুমুল ঝড় উঠল। ফোরম্যানের মতে, বিষপ্রয়োগ ও চুরি—উভয় অপরাধেই সে অপরাধী, কিন্তু বণিক তাতে একমত নয়। কর্নেল, কেরাণী ও বৃদ্ধ আর্টেল্‌শ্‌চিক-বণিকের পক্ষ সমর্থন করল, বাকিরা দোদুল্যমান, এবং ক্রমে ফোরম্যানের অভিমতই বলবৎ হয়ে

উঠল, কারণ জুরিরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আর তাই যে মতটা গ্রহণ করলে তারা তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসতে পারবে এবং এখান থেকে মুক্তি পাবে সেটাকে মেনে নেওয়াই তারা শ্রেয় বলে মনে করল।

যা কিছু ঘটেছে তা থেকে এবং মাসলভা সম্পর্কে তার পূর্ব-জ্ঞান থেকে নেখ্‌ল্যুদভ এ বিষয়ে নিশ্চিত যে চুরি ও বিষ প্রয়োগ এই দুই ব্যাপারেই সে নির্দোষ; তাই সে নিশ্চিত জানত যে অন্য সকলেই সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। কিন্তু যখন সে দেখল যে, বণিকের অদ্ভুত যুক্তি (মাসলভার দেহের প্রশংসাই যার ভিত্তি), ফোরম্যানের পীড়াপীড়ি, এবং বিশেষ করে সকলের ক্লান্তি—সব কিছুই তাকে দণ্ডিত করার দিকেই এগিয়ে চলেছে, তখন তার নিজের ইচ্ছাটা প্রকাশ করবার বাসনা হল,' কিন্তু পাছে মাসলভার সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাই সে ভয় পেল। তথাপি তার মনে হল, সব কিছুকে এ পথে চলতে দিতে সে পারে না, এবং পুনরায় লজ্জায় লাল হয়ে বিবর্ণ মুখে সে কিছু বলতে যাবে এমন সময় ফোরম্যানের হামবড়াই আচরণে বিরক্ত পিয়তর্ গেরাসিমভিচ তার আপত্তি জানাতে শুরু করল এবং যে কথা নেখ্‌ল্যুদভ বলতে যাচ্ছিল ঠিক সেই কথাগুলিই বলল।

সে বলল, 'আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আপনি মনে করছেন যে, মেয়েটির কাছে চাবি থাকাই প্রমাণ করে যে সেই চুরির অপরাধে অপরাধী; কিন্তু সে চলে যাবার পরে চাকররা একটা নকল চাবি দিয়ে পোর্টম্যাণ্টো খুলেছে—এর চাইতে সহজ আর কি হতে পারে?'

বণিক বলল, 'অবশ্য, অবশ্য।'

'সে টাকাটা নিতেই পারে না, কারণ তার তখন যা অবস্থা তাতে টাকা নিয়ে সে কি করবে তাই তার পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন।'

বণিক মন্তব্য করল, 'আমিও ঠিক তাই বলি।'

'কিন্তু এটা তো খুবই সম্ভব যে তার ফিরে আসাতেই চাকরদের মাথায় মতলবটা ঢোকে এবং তারই সুযোগ নিয়ে সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়।'

পিয়তর্ গেরাসিমভিচ্ এমন বিরক্তির সঙ্গে কথাগুলি বলল যে ফোরম্যানও বিরক্ত হয়ে উঠল এবং একগুঁয়ে ভাবে বিপরীত মতটাই সমর্থন করতে লাগল। কিন্তু পিয়তর্ গেরাসিমভিচ এমন জোরের সঙ্গে তার বক্তব্য রাখল যে অধিকাংশ সদস্য তার সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে টাকা চুরির ব্যাপারে মাসলভা নির্দোষ আর আংটিটা তাকে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যখন বিষ প্রয়োগের কথা উঠল তখন তার উগ্র সমর্থক বণিক বলল যে এ অভিযোগ থেকেও তাকে মুক্তি দিতে হবে কারণ বিষপ্রয়োগের কোন উদ্দেশ্যই তার থাকতে পারে না। অবশ্য ফোরম্যান বলল যে তাকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব যেহেতু সে স্বীকার করেছে যে গুঁড়োটো সেই দিয়েছিল।

'তা ঠিক, তবে আফিং মনে করে দিয়েছিল,' বণিক বলল।

বিষয়ান্তরে যেতে ভালবাসে বলে কর্নেল বলল, 'আফিং খেয়েও মানুষের জীবন যেতে পারে।' তার পরই কেমন করে হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে বেশী মাত্রায় আফিং খাওয়ার ফলে তার শ্যালকের স্ত্রী মারাই যেত সেই গল্প ফেঁদে বসল। এতই আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে ও মর্যাদার সঙ্গে কর্নেল তার গল্প বলতে লাগল যে কারও বাধা দেবার সাহস হল না। শুধু কেরাণীটি তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আর একটা গল্প শুরু করে দিল: 'অনেকে আফিং-এ এতই অভ্যস্ত হয়ে যায় যে চল্লিশ ফোঁটাও খেতে পারে। আমার এক আত্মীয় আছে—' কিন্তু কর্নেল তার নিজের গল্পের মধ্যে এই বাধা অস্বীকার করে তার শ্যালকের স্ত্রীর গল্পটাই বলতে শুরু করল।

জনৈক জুরি বলে উঠল, 'কিন্তু মশাইরা, আপনারা কি জানেন যে পাঁচটা বাজতে চলেছে?'

ফোরম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা তাহলে কি বলব বলুন তো? বলব কি যে চুরির অভিপ্রায় না থাকলেও মেয়েটি দোষী? এবং কোন কিছু চুরি না করেও? তাতে কি চলবে?'

নিজের জয়লাভে খুশি হয়ে পিয়তর্ গেরাসিমভিচ সম্মতি জানাল।

বণিক বলল, 'তাকে যাতে করুণা করা হয় তার জন্য সুপারিশ করতে হবে।'

সকলে একমত হল; শুধু বৃদ্ধ আর্টেল্‌শ্‌চিক বলল যে তাকে 'নির্দোষ' ঘোষণা করা উচিত।

ফোরম্যান বুঝিয়ে বলল, 'ও একই কথা; চুরির অভিপ্রায় ছিল না, এবং কোন কিছু চুরি করেও নি। সুতরাং নির্দোষ—সেটা তো খুবই স্পষ্ট।'

বণিক সানন্দে বলে উঠল, 'ঠিক আছে; ওতেই হবে। আমরা সুপারিশ করছি, তার প্রতি করুণা করা হোক।'

তখন সকলে এতই ক্লান্ত, দীর্ঘ আলোচনায় এতই বিচলিত যে, জীবননাশের অভিপ্রায় না থাকলেও কাতয়ুশা গুঁড়োটা দেবার অপরাধে অপরাধী—এই কথাগুলো যোগ করার কথা কারও মনে হল না।

নেখ্‌লুদভ তখন এতই উত্তেজিত যে এই বাদ পড়াটা তারও নজরে পড়ল না। কাজেই সকলের সম্মতিমতই জবাবগুলো লিখে কাগজখানা আদালতে নিয়ে যাওয়া হল।

র‍্যাবেলেস এমন একজন উকিলের গল্প করেছে যে একটা মামলা পরিচালনার কালে সব রকম আইনের উদ্ধৃতি দিয়েছে, অর্থহীন লাতিন ভাষায় কুড়ি পাতা ভর্তি আইনের কথা পড়েছে, এবং তারপর বিচারকদের কাছে প্রস্তাব রেখেছে যে পাশার দান ফেলা হোক, যদি বিজোড় সংখ্যা হয় তাহলে আসামীর কথা ঠিক, আর জোড় সংখ্যা হলে ফরিয়াদির কথা ঠিক।

এ ক্ষেত্রে ও অবস্থায় প্রায় সেই রকমই হল।

জুরিরা ঘণ্টা বাজাল। যে সৈনিকটি খোলা তলোয়ার হাতে দরজায়

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে তলোয়ার খাপে ভরে সরে দাঁড়াল। বিচারকরা আসন গ্রহণ করল, এবং জুরিরা একে একে বেরিয়ে এল।

ফোরম্যান গম্ভীরভাবে কাগজখানা নিয়ে প্রেসিডেণ্টের হাতে দিল। প্রেসিডেণ্ট তার উপর চোখ বুলিয়ে সবিস্ময়ে দুই হাত ছড়িয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। তার বিস্ময়ের কারণ, জুরিরা একটি উপবিধি—অপহরণের অভিপ্রায় না থাকলেও—যোগ করলেও দ্বিতীয় উপবিধি—প্রাণনাশের অভিপ্রায় না থাকলেও—যোগ করে নি। জুরিদের সিদ্ধান্তের ফল তাহলে এই দাঁড়ায় যে মাসলভা চুরিও করে নি, অপহরণও করে নি, অথচ কোন রকম আপাত কারণ ছাড়াই একটি মানুষকে বিষ খাইয়েছে।

সে বাঁ দিকের সদস্যের কানে কানে বলল, 'দেখুন কী অবাস্তব সিদ্ধান্তে তারা এসেছেন। এর অর্থ সাইবেরিয়ায় দণ্ডভোগ, অথচ সে নির্দোষ।'

সদস্যটি জবাব দিল, 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে সে নির্দোষ?'

'হ্যাঁ, সে নিশ্চয় নির্দোষ। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে ৮১৭ ধারাকে কার্যকর করতে হবে।' (৮১৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদালত যদি জুরির সিদ্ধান্তকে ন্যায়বিরোধী বলে মনে করে তাহলে তাকে বাতিল করে দিতে পারে।)

অপর সদস্যের দিকে ঘুরে প্রেসিডেণ্ট বলল, 'আপনি কি মনে করেন?'

দয়ালু সদস্যটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। সামনে রাখা কাগজের উপর লেখা সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে সেগুলিকে যোগ করল; যোগফল তিন দিয়ে বিভাজ্য হল না। সে মনে মনে স্থির করেছিল, মোট সংখ্যাটা তিন দিয়ে বিভাজ্য হলে সে প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানাবে; কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও দয়াপরবশ হয়ে সে সম্মতিই জানাল।

বলল, 'আমিও মনে করি, তাই করা উচিত।'

গম্ভীর সদস্যের দিকে ফিরে প্রেসিডেণ্ট প্রশ্ন করল, 'আর আপনি?'

সে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'কিছুতেই না। যা দেখা যাচ্ছে, কয়েদীদের খালাস দেওয়ায় দলিলপত্র জুরিদেরই অভিযুক্ত করছে। বিচারকরাও সে কাজ করলে লোকে কি বলবে? আমি কিছুতেই তাতে মত দেব না।'

প্রেসিডেণ্ট ঘড়ি দেখল। 'খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু কি করা যাবে?' প্রশ্নগুলো পড়ে শোনাবার জন্য সে ফোরম্যানকে দিল।

সকলে উঠে দাঁড়াল। ফোরম্যান এক পা এক পা করে এগিয়ে একবার কেশে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো পড়ল। সারা আদালত—সেক্রেটারি, অ্যাডভোকেট, এমন কি সরকারী উকিল—সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল।

কয়েদীরা শান্ত হয়ে বসে রইল। প্রশ্নোত্তরের অর্থ তারা কিছুই বুঝল না। আবার সকলে বসে পড়ল। প্রেসিডেণ্ট সরকারী উকিলকে জিজ্ঞাসা করল, কয়েদীদের কি শাস্তি দেওয়া যায়।

মাসলভার শাস্তি হওয়ায় তার অপ্রত্যাশিত সাফল্যে সরকারী উকিল খুব

খুশি। সে ভাবল এ সবই তার বক্তৃতার ফল। প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দেখে নিয়ে সে বলল :

'আমার মতে সাইমন কারতিংকিনের দণ্ড হওয়া উচিত ১৪৫২ ধারা এবং ১৪৫৩ ধারার অনুচ্ছেদ ৪ অনুসারে, ইউফিমিয়া বচকভার ১৬৫৯ধারা মতে, আর কাতেরিনা মাসলভার ১৪৫৪ ধারা মতে।'

তিনটি ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট উঠতে উঠতে বলল, 'শাস্তি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য আদালত মুলতুবি রাখা হল।'

তার পিছনে পিছনে সকলেই উঠে পড়ল, এবং সুষ্ঠুভাবে কর্তব্যপালনের খুশিতে ভরা মন নিয়ে কেউ বেরিয়ে গেল, কেউ বা ঘরের মধ্যেই চলাফেরা করতে লাগল।

ফোরম্যান নেখ্‌ল্যুদভকে কি যেন বলছিল, এমন সময় পিয়তর্ গেরাসিমভিচ এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা কি জানেন মশাইরা যে আমরা সব ব্যাপারটাকে জগা-খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছি? আরে, আমরা যে মেয়েটাকে সাইবেরিয়াতে ঠেলে দিয়েছি।'

নেখ্‌ল্যুদভ চেঁচিয়ে উঠল, 'কি বলছেন?'

'কেন! আমাদের জবাবে আমরা যে 'প্রাণনাশের অভিপ্রায় না থাকলেও দোষী' এই কথাগুলো লিখি নি। সেক্রেটারি এইমাত্র আমাকে বলছিলেন যে সরকারী উকিল মেয়েটিকে পনেরো বছরের জন্য দণ্ডিত করার পক্ষপাতী।'

ফোরম্যান বলল, 'দেখুন, সিদ্ধান্তটা তো সেই রকমই নেওয়া হয়েছে।'

পিয়তর্ গেরাসিমভিচ আপত্তি জানিয়ে বলল, 'যেহেতু সে টাকাটা নেয় নি তার থেকেই তো বোঝা যায় যে হত্যার কোন অভিপ্রায়ই তার থাকতে পারে না।'

ফোরম্যান নিজেকে সমর্থন করে বলল, 'কিন্তু বেরিয়ে যাবার আগে জবাবটা আমি পড়ে শুনিয়েছিলাম, তখন তো কেউ আপত্তি করেন নি।'

পিয়তর্ গেরাসিমভিচ নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ঘুরে বলল, 'ঠিক তখনই আমি বাইরে গিয়েছিলাম, আর আপনিও বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন বলে খেয়ালই করেন নি।'

'আমি কখনও ভাবি নি—' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'ওঃ, আপনি ভাবেন নি?'

'কিন্তু এখন তো ভুলটা সংশোধন করতে পারি,' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'না, না; ও পাট চুকে গেছে।'

নেখ্‌ল্যুদভ কয়েদীদের দিকে তাকাল। ওদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল, আর ওরা এখনও রেলিংয়ের পিছনে সৈন্যদের সামনে চুপচাপ বসে আছে। মাসলভা হাসছে। একটা পাপ-বোধ নেখ্‌ল্যুদভের আত্মাকে আলোড়িত করে

তুলল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে আশা করেছিল যে মাসলভা মুক্তি পাবে, হয়তো এই শহরেই থাকবে, তাই তার প্রতি কি রকম ব্যবহার করবে সেটা বুঝে উঠতে পারে নি। তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা কত কঠিন। কিন্তু সাইবেরিয়া এবং দণ্ডাদেশ মিলে তার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের সম্ভাবনাকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শিকারের ব্যাগে আহত পাখিটা আর ছটফট করবে না, আর কোনদিন তার অস্তিত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না।

অধ্যায়—২৪

পিয়তর্ গেরাসিমভিচের ধারণাই সত্য হল।

প্রেসিডেন্ট পরামর্শ-কক্ষ থেকে একখানা কাগজ নিয়ে এসে পড়তে লাগল :—

'মহামান্য সম্রাটের অনুজ্ঞায় এবং জুরিদের সিদ্ধান্তের বলে ফৌজদারী আদালত দণ্ডবিধির ৭৭১ ধারার ৩ উপধারা এবং ৭৭৬ ও ৭৭৭ ধারার ৩ উপধারা মতে ফৌজদারি আদালত ১৮৮ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে এই রায় ঘোষণা করছে যে, তেত্রিশ বছর বয়স্ক চাষী সাইমন কারতিংকিন এবং সাতাশ বছর বয়স্কা মেশ্‌চাংকা কাতেরিনা মাসলভাকে সব রকম সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং ক্রীতদাসের জীবনযাপনের দণ্ডভোগ করতে কারতিংকিনকে আট বছরের জন্য এবং মাসলভাকে চার বছরের জন্য সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হবে; সেই সঙ্গে দণ্ডবিধির ২৮ ধারায় বর্ণিত ফলাফলও প্রযুক্ত হবে। তেতাল্লিশ বছর বয়স্কা মেশ্‌চাংকা বচকভাকে সব রকম বিশেষ ব্যক্তিগত ও অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং দণ্ডবিধির ৪৯ ধারায় বর্ণিত ফলাফলসহ তিন বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এই মামলার ব্যয় কয়েদীরা সমান অংশে বহন করবে; যদি তাদের যথেষ্ট সম্পত্তি না থাকে তা হলে মামলার ব্যয় রাজকোষের উপর বর্তাবে। সাক্ষ্য হিসাবে প্রদর্শিত জিনিসগুলি বিক্রি করা হবে, আংটিটা ফেরৎ দেওয়া হবে, কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙে ফেলা হবে।'

কারতিংকিন হাত দুটো দুই পাশে চেপে ধরে ঠোঁট নাড়তে লাগল। বচকভা সম্পূর্ণ চুপচাপ। দণ্ডাদেশ শুনে মাসলভার মুখ লাল হয়ে গেল, হঠাৎ সে 'আমি দোষী নই, আমি দোষী নই!' বলে এমনভাবে চীৎকার করে উঠল যে সমস্ত ঘরটায় তার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। 'এটা পাপ! আমি দোষী নই! আমি কখনও চাই নি—কখনও ভাবি নি! যা সত্য তাই বলছি—যা সত্য।' বেঞ্চিতে বসে পড়ে সে সজোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কারতিংকিন ও বচকভা বাইরে চলে গেল। সে তখনও বসে বসে কাঁদছে। একজন সৈনিক এসে তার আলখাল্লার আস্তিন ধরল।

নিজের পাপ-চিন্তা ভুলে নেখ্‌লয়ুদভ মনে মনে ভাবল, 'না, এভাবে ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব।' দ্রুতপায়ে তার খোঁজে সে দালানে চলে গেল। অকারণেই তাকে আর একবার দেখার ইচ্ছা হল। দরজায় বেশ ভীড় জমেছে। কাজ শেষ হওয়ায় অ্যাডভোকেট ও জুরিরা খুশি মনে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাজেই তাকে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করতে হল। যখন সে দালানে পৌঁছল মাসলভা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সকলে যে তাকে দেখছে সেটা উপেক্ষা করেই সে দালান ধরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল, ও তাকে পার হয়ে থেমে দাঁড়াল। তার কান্না থেমেছে, কিন্তু তখনও ফোঁপাচ্ছে, রক্তিম মুখটা বার বার রুমালে মুচছে। তাকে লক্ষ্য না করেই মাসলভা এগিয়ে গেল। তখন নেখ্‌লয়ুদভ ফিরে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রেসিডেন্ট তখন আদালত ত্যাগ করে লবিতে চলে গেছে। নেখ্‌লয়ুদভ যখন তার কাছে উপস্থিত হল তখন সে সবেমাত্র হাল্কা ধূসর রঙের ওভারকোটটা পরে চাকরের কাছ থেকে রূপো-বাঁধানো লাঠিটা হাতে নিয়েছে।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'স্যার, যে মামলাটার এইমাত্র বিচার হয়ে গেল সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি একজন জুরি।'

প্রেসিডেন্ট নেখ্‌লয়ুদভের হাতটা চেপে ধরল; যে সন্ধ্যায় তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল এবং উপস্থিত সব যুবকদের চাইতে সে ভাল নেচেছিল, আনন্দের সঙ্গে সেই কথা স্মরণ করে বলে উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয় প্রিন্স নেখ্‌লয়ুদভ। এ তো আনন্দের কথা। মনে হচ্ছে এর আগেও আমাদের দেখা হয়েছে। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ ভঙ্গীতে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'মাসলভা-সংক্রান্ত জবাবে একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। বিষপ্রয়োগের দোষে সে দোষী নয়, অথচ তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

সামনের ফটকের দিকে এগোতে এগোতে প্রেসিডেন্ট বলল, 'আপনারা যে জবাব দিয়েছেন তদনুসারেই আদালত দণ্ডাদেশ দিয়েছে; যদিও আপনাদের জবাবগুলো সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।'

'তা ঠিক, কিন্তু সে ভুল কি সংশোধন করা যেত না?'

টুপিটাকে একদিকে একটু নামিয়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতেই প্রেসিডেন্ট বলল, 'আপিলের উপযুক্ত কারণ সব সময়ই খুঁজলে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আপনাকে কোন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'কিন্তু এ যে ভয়ংকর।'

নেখ্‌লয়ুদভের প্রতি যথাসম্ভব বিনয় প্রকাশ করে প্রেসিডেন্ট বলল, 'দেখুন, মাসলভার সামনে দুটো পথই খোলা ছিল।' তারপর গোঁফ জোড়াকে পরিপাটি করে নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভের কনুইয়ের নীচে আলতোভাবে হাতটা রেখে সামনের ফটকের দিকে এগোতে এগোতেই বলল, 'আপনিও যাচ্ছেন তো?'

তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে চড়িয়ে তার পিছনে হাঁটতে হাঁটতে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ।'

তারা বাইরের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল। পথে গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দের জন্য তারা উঁচু গলায় কথা বলতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট বলল, 'দেখুন, পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত। মাসলভার সামনে জুটোর একটা পথ খোলা ছিল: হয় প্রায় খালাস এবং খুব অল্প সময়ের কারাদণ্ড, অথবা সাইবেরিয়া। মাঝামাঝি কিছু নেই। আপনারা যদি 'হত্যার অভিপ্রায় ছিল না' এই কথাগুলি যোগ করতেন তাহলে খালাস পেয়ে যেত।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'ঠিক, ওটা বাদ দেওয়া আমার পক্ষে অমার্জনীয় ত্রুটি।'

'সমস্ত ব্যাপারটাই তার উপর নির্ভর করছে,' প্রেসিডেন্ট হেসে কথাগুলি বলে ঘড়ির দিকে তাকাল।

ক্লারার সঙ্গে দেখা করার সময় পার হতে আর মাত্র পৌনে এক ঘণ্টা বাকি আছে।

'কাজেই আপনি ইচ্ছা করলে একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপিলের স্বপক্ষে একটা যুক্তি আপনাকে বের করতে হবে; তবে সেটা অনায়াসেই পাওয়া যাবে।' তারপর একটা ইজভজচিকের দিকে ঘুরে হেঁকে বলল, 'দ্‌ভরিয়ানস্কায়া-য় চল। তিরিশ কোপেক পাবে। তার বেশী আমি কখনও দেই না।'

'তাই হবে হুজুর; চলুন, নিয়ে যাচ্ছি।'

'শুভ অপরাহ্ন। যদি কখনও দরকার হয়, আমার ঠিকানা দ্‌ভরিয়ানস্কায়াতে দ্‌ভরনিকভ হাউস; মনে রাখা খুবই সহজ।' বন্ধুত্বপূর্ণভাবে অভিবাদন জানিয়ে সে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

অধ্যায়—২৫

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাবার্তায় ও বাইরের খোলা বাতাসে নেখ্‌ল্যুদভের মন কিছুটা শান্ত হল। এবার তার মনে হল, সারাটা সকাল যে অস্বাভাবিক পরিবেশে কেটেছে তার ফলেই তার মানসিক চাঞ্চল্য এতটা বেড়েছিল।

দু'জন খ্যাতনামা অ্যাডভোকেটের নাম মনে পড়তে সে ভাবল, 'অবশ্য এ যোগাযোগ খুবই বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য। তার ভাগ্যকে লাঘব করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন, আর সেটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি করতে হবে। হ্যাঁ, এক্ষণি! এই আদালতেই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে ফানারিন বা মিকিশিন কোথায় থাকে।'

আদালতে ফিরে গিয়ে কোটটা রেখে সে দোতলায় উঠে গেল। প্রথমেই দেখা হয়ে গেল ফানারিনের সঙ্গে। তাকে থামিয়ে বলল, বিশেষ কাজে সে

তাকেই খুঁজতে যাচ্ছিল।

ফানারিন নেখ্‌ল্যুদভের নাম শুনেছে, তাকে চোখেও দেখেছে। সে বলল, তার কোন কাজে লাগতে পারলে সে খুশি হবে। নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে সে একটা ঘরে ঢুকল। ঘরটা সম্ভবত কোন বিচারকের। দুজনে টেবিলে গিয়ে বসল।

'বলুন, কি ব্যাপার?'

'প্রথমত, আমি চাই ব্যাপারটা আপনি গোপন রাখবেন। এ ব্যাপারে আমি যে আগ্রহ দেখাচ্ছি সেটা কাউকে জানতে দিতে চাই না।'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! তারপর?'

'আজ আমি জুরি ছিলাম, এবং একটি নির্দোষ স্ত্রীলোককে কঠোর শাস্তি দিয়েছি। এতে আমি খুব কষ্ট বোধ করছি।'

নিজেই লজ্জিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছে দেখে নেখ্‌ল্যুদভ বিস্মিত হল। ফানারিন দ্রুত একবার তার দিকে তাকিয়ে পুনরায় চোখ নামিয়ে শুনতে লাগল।

বলল, 'তারপর?'

'একটি নির্দোষ স্ত্রীলোককে আমরা শাস্তি দিয়েছি, তাই আমি উচ্চতর আদালতে আপিল করতে চাই।'

ফানারিন শুধরে দিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় সিনেট-এর কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা আপনি মামলাটা হাতে নিন।'

সব চাইতে শক্ত কথাটা শেষ করে ফেলবার জন্য নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এ মামলায় যতই খরচ হোক সব আমি বহন করব।'

এ সব ব্যাপারে নেখ্‌ল্যুদভের অনভিজ্ঞতায় একটুখানি হেসে অ্যাডভোকেট বলল, 'ওসব পরে ঠিক করা যাবে।'

'মামলাটা কি?'

নেখ্‌ল্যুদভ সব ঘটনা খুলে বলল।

'ঠিক আছে। আগামীকাল কাজ শুরু করে মামলাটা আগাগোড়া বুঝে নেব। অতএব আপনি তার পরের দিন—না—বরং বৃহস্পতিবারে আসুন। ছ'টার পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তখন কথা হবে। আচ্ছা, এখন তাহলে চলি; কিছু খোঁজ-খবর নেবার আছে।'

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আলোচনা এবং সে যে মাসলভার জন্য কিছু করেছে তার ফলে তার মন আরও শান্ত হয়েছে। সে রাজপথে নামল। চমৎকার আবহাওয়া। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অনেকখানি বসন্ত-বাতাস টেনে নিয়ে তার খুব ভাল লাগল। অনেকগুলো ইজভজচিক তাকে ঘিরে ধরল, কিন্তু সে হেঁটেই চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কাতয়ুশার নানা ছবি ও স্মৃতি এবং তার প্রতি তার নিজের আচরণ ঝাঁক বেঁধে তার মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করল; আর অমনি

তার মন খারাপ হয়ে গেল, চারদিকের সব কিছু বিষণ্ণ মনে হতে লাগল। মনে মনে বলল, 'না, এসব কথা পরে ভাবব; আপাতত এসব অবাঞ্ছিত ধারণার হাত থেকে মুক্তি চাই।'

করচাগিনদের নৈশভোজের নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়তেই সে ঘড়ি দেখল। এখনও সময় আছে। একটা ট্রামগাড়ির চলার শব্দ শুনে সে দৌড়ে সেটা ধরে লাফিয়ে উঠল। বাজারের কাছে পৌছে আবার লাফিয়ে নেমে একটা ভাল ইজভজচিক ধরে দশ মিনিট পরেই করচাগিনদের বিরাট বাড়িটার ফটকে উপস্থিত হল।

অধ্যায়—২৬

ইংরেজি কব্জা লাগানো দরজাটাকে নিঃশব্দে খুলে দিয়ে করচাগিনদের বিরাট বাড়ির মোটাসোটা দ্বার-রক্ষী সাদরে বলল, 'দয়া করে ভিতরে আসুন হুজুর; সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা আহারে বসে গেছেন, তবে আমার উপর আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাবার হুকুম আছে।'

দ্বার-রক্ষী সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজাল।

ওভারকোটটা খুলে নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'নবাগত কেউ আছেন কি?'

'পরিবারের লোকজন ছাড়া শুধু এম, কলসভ ও মিখাইল সেরগেভিচ।'

চাতক পাখির লেজের মত কোট ও সাদা দস্তানা পরা অত্যন্ত সুদর্শন পোষাকধারী সিঁড়ির উপর থেকেই নীচে তাকাল।

বলল, 'দয়া করে উঠে আসুন হুজুর, সকলেই আপনাকে আশা করছেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ উপরে উঠে গেলে এবং সুপরিচিত মস্ত বড় চমৎকার নাচ-ঘরের ভিতর দিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। করচাগিন পরিবারের সকলেই টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসেছে। শুধু মা সোফিয়া ভাসিল্যয়েভনা নেই, সে কখনও শোবার ঘর থেকে বের হয় না। টেবিলের মাথায় বসেছে বুড়ো করচাগিন, তার বাঁয়ে ডাক্তার, আর তার ডাইনে প্রাক্তণ মার্শাল ও বর্তমানে ব্যাংক-ডিরেক্টর অতিথি আইতান আইভানভিচ কলসভ। বাঁ দিকে তার পরে বসেছে মিসির ছোট বোনের শিক্ষয়িত্রী মিস রেদার ও চার বছরের মেয়েটি স্বয়ং। তাদের উল্টো দিকে বসেছে করচাগিনদের একমাত্র ছেলে মিসির ভাই পেতয়া সে জিমনাসিয়ামে ষষ্ঠ মানের ছাত্র। তার পরীক্ষার জন্যই সমস্ত পরিবারটি এখন শহরে আছে। তার পাশেই বসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্র। সেই তাকে পড়ায়, তার পাশে মিসির জ্ঞাতি-ভাই মিখাইল সেরগেভিচ তেলেগিন, ডাক নাম মিশা; তার উল্টো দিকে চল্লিশ বছর বয়স্কা কুমারী কাতেরিনা এলেকস্য়েভনা; আর টেবিলের পায়ের কাছে বসেছে মিসি নিজে, তার পাশে একটা আসন খালি পড়ে আছে।

'আরে! ঠিক আছে! বসে পড়। আমরা সবে মাছ ধরেছি।' নকল দাঁত দিয়ে সযত্নে চিবুতে চিবুতে রক্ত-রাঙা চোখ দুটি (সে চোখের পাতা দেখা যায় না) তুলে বুড়ো করচাগিন অনেক কষ্টে কথাগুলি বলল।

'স্তে পান', বুড়ো করচাগিন খাবার-ভর্তি মুখে শক্ত-সমর্থ মর্যাদাসম্পন্ন চেহারার খানসামাটিকে ডেকে শূন্য আসনটি দেখিয়ে দিল।

নেখ্‌লয়ুদভ করচাগিনকে ভালই চেনে, অনেকবারই নৈশ ভোজনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু আজ তার লাল মুখ, সশব্দ কামুক ঠোঁট, ওয়েস্ট-কোটের ভিতর গুঁজে-দেওয়া তোয়ালের উপরকার মোটা গলা, আর অতি-ভোজনে বাড়ন্ত সামরিক চেহারা—সব কিছুই তার কাছে বড় খারাপ লাগল। এই মানুষটার নিষ্ঠুরতা, সেনাপতি থাকাকালে লোককে কারণে-অকারণে চাবুক মারা, এমন কি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া—অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে সব তার মনে পড়ে গেল।

'এক্ষুণি হুজুর,' বলে স্তে পান সাইড বোর্ড থেকে অনেকগুলো রূপোর বাটি সাজানো একটি বড় পাত্র তুলে নিল এবং পোষাকধারী চাকরটিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করতেই সে ছুরি, কাঁটা, তোয়ালে সব কিছু মিসির পাশের খালি জায়গাটায় সাজিয়ে রাখতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভ ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে কর-মর্দন করল। বুড়ো করচাগিন ও মহিলারা ছাড়া আর সকলেই একে একে উঠে দাঁড়াল। সকলের কাছে—বিশেষ করে যাদের সঙ্গে কোনদিন একটা কথাও বলে নি—ঘুরে ঘুরে, এইভাবে করমর্দন করতে তার খুবই বাজে লাগছিল। দেরীতে আসার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে সে মিসি ও কাতেরিনা এলেকস্‌য়েভনার মাঝখানে বসতে যাবে এমন সময় বুড়ো করচাগিন বার বার বলতে লাগল যে, সে যদি এক গ্লাস ভদকা পান নাও করে অন্তত টেবিলের কিছু খাদ্য গ্রহণ করে তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেই হবে। টেবিলে ছোট ছোট ডিসে সাজানো ছিল চিংড়ি, হরিণের মাংস, পনির ও নোনা হেংরি। খেতে আরম্ভ করার আগে নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতেই পারে নি সে কতখানি ক্ষুধার্ত হয়েছিল। এখন কিছুটা রুটি ও পনির খাওয়া সেরেই সে উৎসাহের সঙ্গে খেতে শুরু করে দিল।

জুরির দ্বারা বিচার-পদ্ধতিকে আক্রমণ করে একখানি প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদ-পত্রে যে মন্তব্য করা হয়েছে ঠাট্টা করে সেটা উদ্ধৃত করে কলসভ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, সমাজের ভিতটা কি কাঁপিয়ে দিতে পেরেছেন? অপরাধীদের খালাস আর নির্দোষদের সাজা, কি বলেন?'

'সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দিতে—সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দিতে,'—প্রিন্স করচাগিন হাসতে হাসতে বার বার কথাগুলি বলতে লাগল।

কিছুটা রূঢ় দেখালেও নেখ্‌লয়ুদভ কলসভের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না, ধূমায়মান সুপের বাটিটা টেনে নিয়ে খেয়েই চলল।

মিসি হেসে বলল, 'ওকে খেতে দিন তো।' নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই সে সর্বনামটা ব্যবহার করল। তারপর নেখ্‌ল্যুদভ মুখের খাবারটা গিলে ফেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বলল, 'তুমি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত।'

'খুব বেশী না। আর তুমি? ছবি দেখতে গিয়েছিলে কি?' সে প্রশ্ন করল।

'না, সেটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। সালামাতভদের ওখানে টেনিস খেলছিলাম। সত্যি, মিঃ ক্রুকস চমৎকার খেলেন।'

তারপর আরম্ভ হল আলোচনা। শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রটি ও ছেলেমেয়েরা ছাড়া মিখাইল সেরগেভিচ, কাতেরিনা ও অন্য সকলেই তাতে যোগ দিল।

'আঃ, সেই অন্তবিহীন তর্ক!' বলে হাসতে হাসতে বুড়ো করচাগিন ওয়েস্ট-কোটের ভিতর থেকে তোয়ালেটা টেনে বার করে চেয়ারটাকে সশব্দে পিছনে ঠেলে দিয়ে (চাকরটা সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে নিল) টেবিল থেকে উঠে পড়ল।

অন্য সকলেও উঠে পড়ল এবং অন্য একটা টেবিলের সামনে গেল। সেখানে গ্লাসে গ্লাসে সুগন্ধি গরম জল সাজানো ছিল। সকলে মুখ ধুয়ে নিল; তারপর আবার আলোচনা শুরু হল, অথচ কারওই তাতে কোন আগ্রহ নেই।

নেখ্‌ল্যুদভের চোখে-মুখে দুশ্চিন্তা ও বিরক্তির ছাপ দেখে মিসি তার কারণ জানতে চাইল।

নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল, 'সত্যি আমি বলতে পারছি না; কখনও ভেবে দেখি নি।'

মিসি প্রশ্ন করল, 'মার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' এমনভাবে কথাটা বলল যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল যে তার যাবার ইচ্ছা নেই। সে একটা সিগারেট বের করল।

মিসি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। তাতে নেখ্‌ল্যুদভ ভারি লজ্জা পেল। কোন রকমে জানাল যে, প্রিন্সেস যদি দেখা করতে চান সে সানন্দে তার কাছে যাবে।

'নিশ্চয়! মা খুব খুশি হবে। তুমি সেখানেই সিগারেট খেতে পারবে। আইভান আইভানোভিচও সেখানে আছে।'

বাড়ির কর্ত্রী প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলয়েভনা প্রায় শয্যাশায়ী। আজ আট বছর হল লেস ও ফিতে লাগানো পোষাক পরে, ভেলভেট, হাতির দাঁত, কাঁসা, গালা ও ফুলে পরিবৃত হয়ে সে শয্যায় শুয়ে আছে। কখনও বাইরে যায় না, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবী যারা দেখা করতে আসে সেখানেই তাদের অভ্যর্থনা করে।

সেই বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে নেখ্‌ল্যুদভও একজন, কারণ সে খুব চটপটে, তার মা ছিল এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এবং তার সঙ্গে মিসির বিয়ে হোক এটা

সকলেই চায়।

মিসি বলল, 'মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে; তোমার কি হয়েছে আমাকে বল।'

আদালতের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল। তার ভুরু কুঁচকে উঠল, মুখ লজ্জায় লাল হল।

সত্য কথা বলার ইচ্ছায় সে বলল, 'হ্যাঁ, একটা কিছু হয়েছে; একটা খুবই অসাধারণ ও গুরুতর ঘটনা।'

'সেটা কি? আমাকেও কি বলতে পার না?'

'এখন নয়। দয়া করে জানতে চেয়ো না। এখনও সব কিছু ভেবে দেখবার সময় পাই নি।' তার মুখ আরও লাল হয়ে উঠল।

'তার মানে আমাকে বলবে না?' তার মুখের মাংসপেশী সংকুচিত হয়ে উঠল। যে চেয়ারটা ধরে ছিল সেটাকে পিছনে ঠেলে দিল।

'না, বলতে পারি না,' সে জবাব দিল।

'ঠিক আছে, তাহলে এস!'

যেন অযথা চিন্তাকে সরিয়ে দেবার জন্যই সে মাথাটা নাড়ল। তারপর বড় বড় পা ফেলে তার আগে আগে চলতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, চোখের জল আটকাবার জন্য মিসি তার মুখটাকে অস্বাভাবিক ভাবে চেপে রেখেছে। তাকে আঘাত দিয়েছে বলে তার লজ্জা হল, কিন্তু সে তো জানে, তখন সামান্যমাত্র দুর্বলতাও তার পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ সেই দুর্বলতাই তাকে মিসির সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে ফেলবে। আর আজ সেটাকেই সে সব চাইতে বেশী ভয় করে। নিঃশব্দে মিসিকে অনুসরণ করে সে প্রিন্সেসের শোবার ঘরের দিকে গেল।

অধ্যায়—২৭

মিসির মা প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলয়েভনা তার নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্যের নৈশভোজন সবে শেষ করেছে। (যাতে এই অকাব্যিক কাজটা আর কেউ দেখতে না পায় সেজন্য এটা সে একাকীই সমাধা করে থাকে।) তার কোচের পাশে ছোট টেবিলে কফি রাখা আছে, আর সেই অবস্থায়ই তার ধূমপান চলছে। পিন্সেস সোফিয়া ভাসিলয়েভ্‌না দীঘল ও কৃষতনু, কালো চুল, বড় বড় কালো চোখ, লম্বা দাঁত, এই বয়সেও যুবতী থাকার চেষ্টা সুস্পষ্ট।

ডাক্তারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা শোনা যায়। নেখ্‌ল্যুদভ কিছুদিন থেকেই সেটা জানে; কিন্তু আজ দেখল ডাক্তার তার কোচের পাশেই বসে আছে; তার তৈল-নিষিক্ত চকচকে দাড়ি দুই ভাগ করে আঁচড়ানো; তখন সেই সব গুজবের কথাই শুধু মনে পড়ল না, সে অত্যন্ত বিরক্তিও বোধ করল।

টেবিলের পাশে একটা নীচু, নরম আরাম কেদারায় বসে কলসভ তার কফিটা নাড়তে লাগল। টেবিলের উপর এক গ্লাস মদও রাখা ছিল।

নেখ্‌লয়ুদভকে নিয়ে মিসি ঘরে ঢুকল, কিন্তু থাকল না।

কলসভ ও নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ফিরে বলল, 'মা যখন ক্লান্ত হয়ে তোমাদের তাড়িয়ে দেবে, তখন আমার কাছে এস।' তারপরই সানন্দে হাসতে হাসতে পুরু কার্পেটের উপর নিঃশব্দে পা ফেলে চলে গেল।

প্রিন্সেস সোফিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না হাসল। সে হাসি দেখতে কৃত্রিম ও কপট কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক। হাসলেই তার সুন্দর লম্বা দাঁতগুলো দেখা যায়—যে দাঁত তার একদা নিজের দাঁতের অবিকল নকল। হাসতে হাসতে সে বলল, 'কেমন আছ প্রিয় বন্ধু? বস, কথা বল। শুনলাম আদালত থেকে খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসেছ। আমি মনে করি যার হৃদয় আছে এ সব কাজ তার পক্ষে খুবই কষ্টকর।' শেষের কথাগুলি সে ফরাসিতে বলল।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এতে অনেক সময়ই নিজের দোষ মনে হয় বুঝি বিচার করবার কোন অধিকারই তার নেই।'

'Comme c'est Vrai', নেখ্‌লয়ুদভের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে কৌশলে তার স্তাবকতা করা তার স্বভাব।

মহিলাটি বলল, 'ভাল কথা, তোমার ছবির খবর কি? তোমার ছবিতে আমার খুব আগ্রহ। আমি যদি এ রকম পঙ্গু না হতাম তাহলে অনেক আগেই তোমার ছবি দেখতে যেতাম।'

নেখ্‌লয়ুদভ শুকনো গলায় বলল, 'ও সব আমি প্রায় ছেড়ে দিয়েছি।'

'সে কি! কী দুঃখের কথা!...জান, শিল্পের ক্ষেত্রে ও একজন প্রকৃত প্রতিভার অধিকারী। রেপিন নিজের মুখে আমাকে এ কথা বলেছে,' শেষের কথাগুলি সে কলসভের দিকে ফিরে বলল।

নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল, 'এ ধরনের মিথ্যা বলতেও কি মহিলার লজ্জা করে না?'

সে লক্ষ্য করল, মহিলাটি বার বার অস্বস্তির সঙ্গে জানালাটার দিকে তাকাচ্ছে। জানালা-পথে সূর্যের একটা তির্যক রশ্মি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে রশ্মির আলোয় তার কালজীর্ণ মুখ বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

মহিলা কোচের পাশের বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামে হাত রাখল।

ঘণ্টার শব্দ শুনে সুদর্শন চাকরটি ঘরে ঢুকলে সে জানালাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ফিলিপ, দয়া করে পর্দাগুলো নামিয়ে দাও।'

ইতিমধ্যে ডাক্তার ঘর থেকে চলে গিয়েছে। মহিলা ও কলসব একটা নাটকের আলোচনায় মেতে উঠেছে।

'না, তুমি যাই বল, তার মধ্যে কিছুটা ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি আছে। কারণ

ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ছাড়া কাব্য হয় না,' কথাগুলি বলবার সময় তার একটি কালো চোখ ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে চাকরটির গতিবিধি অনুসরণ করছিল।

'কাব্য ছাড়া ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি কুসংস্কার মাত্র; আবার ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি ছাড়া কাব্য—গদ্যমাত্র,' মুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়ে মহিলা কথাগুলি বলল, কিন্তু সারাক্ষণ তার দৃষ্টি রইল চাকর ও পর্দার উপরে।

'ফিলিপ, ও পর্দাটা নয়, বড় জানালার ঐ পর্দাটা,' মহিলা বেদনার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। এই কথাগুলি বলতে হচ্ছে বলে সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনা নিজেই নিজেকে করুণা করছিল যেন। সেই মনোভাবকে প্রশমিত করতে সে রত্ন-খচিত আঙুল দিয়ে একটা সুগন্ধি সিগারেট ঠোঁটে তুলে নিল।

প্রশস্ত বক্ষ, পেশীবহুল, সুঠাম ফিলিপ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু নোয়াল। কার্পেটের উপর দিয়ে চওড়া ডিম সমন্বিত শক্ত পা ফেলে সে বিশ্বস্ত-ভাবে নীরবে অপর জানালাটার কাছে চলে গেল, এবং প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে পর্দাটা ফেলবার ব্যবস্থা করল যাতে একটা রশ্মিও তার মুখে পড়তে না পারে। কিন্তু মহিলাটি তাতেও তুষ্ট হল না, আবার সে ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে নির্যাতিতের ভঙ্গীতে নির্বোধ ফিলিপের কাজের ভুল সংশোধন করতে সচেষ্ট হল। মুহূর্তের জন্য ফিলিপের চোখে একটা আলোর ঝলকানি খেলে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। তার মনে হল ফিলিপ বলতে চাইছে 'শয়তান তোমাকে ভর করেছে! তুমি কি চাও?' কিন্তু শক্তিমান সুঠাম ফিলিপ তৎক্ষণাৎ তার অধৈর্যকে মনের মধ্যে চেপে রেখে নীরবে জীর্ণ, দুর্বল, কপট সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনার আদেশ পালন করতে লেগে গেল।

নীচু চেয়ারটায় দোল খেতে খেতে ঘুম-ঘুম চোখে সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনার দিকে তাকিয়ে কলসভ বলল, 'ডারুইনের বক্তব্যের মধ্যে অনেকটা সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তিনি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

নেখ্‌লয়ুদভকে চুপ করে থাকতে দেখে তার দিকে ফিরে সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনা বলল, 'আর তুমি? তুমি কি বংশগতিতে বিশ্বাস কর?'

'বংশগতিতে? না, করি না।' সেই মুহূর্তে তার কল্পনায় কোন অনির্দেশ্য কারণে যে সব বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল তাই নিয়েই তার সারা মন ভরে ছিল। তার মনে হল, এই মুহূর্তে শিল্পীর মডেলের মত শক্তিমান, সুদর্শন ফিলিপের পাশে সে যেন কলসভের উলঙ্গ মূর্তি দেখতে পাচ্ছে: তার পেট ফুটির মত, মাথা জোড়া টাক, হাত দুটো মুষলের মত পেশীহীন। সেই একই অস্পষ্টভাবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আপাতত রেশম ও ভেলভেটে ঢাকা সোফিয়া ভাসিল্‌য়েভনার আসল কাঁধ দুটি। কিন্তু সে সব মানস ছবি বড়ই ভয়ংকর, তাই সেগুলোকে মন থেকে তাড়াতে সে সচেষ্ট হয়ে

সোফিয়া ভাসিল্যেভনার চোখ তাকে ভাল করে মেপে মেপে দেখল।

তারপর বলল, 'আরে, তুমি তো জান মিসি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাও, তার খোঁজ কর। শুমান-এর একটা নতুন গৎ বাজিয়ে সে তোমাকে শোনাতে চেয়েছে; গৎটি খুব ভাল।'

মহিলাটির স্বচ্ছ হাড়-বের করা আংটি-পরা হাতের উপর চাপ দিয়ে উঠতে উঠতে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'সে কিছুই বাজাতে চায় নি; যে কারণেই হোক, মহিলাটি স্রেফ মিথ্যা বলছে।'

ড্রয়িং-রুমে মিসির সঙ্গে দেখা হলে তার বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার এই ওজুহাতে সে বিদায় নিতে চাইল।

মিসি বলল, 'মনে রেখ, তোমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তোমার বন্ধুদের কাছেও সেটা গুরুত্বপূর্ণ। কাল আসছ তো?'

'সম্ভবত না,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল। তারপর মিসির জন্য কি নিজের জন্য সেটা না বুঝেই সে লজ্জিত বোধ করল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল। পরক্ষণেই সে চলে গেল।

মিসি ভাবতে লাগল, 'এ কি সম্ভব যে সেও আমাকে প্রতারণা করবে?'

তাদের মধ্যে কখনও কোন স্পষ্ট কথা হয় নি—শুধুই দৃষ্টি-বিনিময়, শুধু হাসি আর ইঙ্গিত। তথাপি মিসি তাকে আপনজন মনে করে; তাকে হারানো তার পক্ষে বড় কঠিন।

অধ্যায়—২৮

পরিচিত রাজপথ ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরবার সময় নেখ্‌ল্যুদভ বার বার নিজেই নিজেকে বলতে লাগল, 'লজ্জাকর ও ভয়ংকর, ভয়ংকর ও লজ্জাকর।' মিসির সঙ্গে কথা বলবার সময় যে অবসাদ তাকে ঘিরে ধরেছিল তা কিছুতেই যাচ্ছে না। সে জানে, বাইরে থেকে দেখলে সে ঠিকই করেছে, কারণ আজ পর্যন্ত তাকে সে এমন কিছু বলে নি যাকে কথা দেওয়া বলা যেতে পারে, কখনও বিয়ের প্রস্তাবও করে নি; কিন্তু সে এও জানে যে আসলে তার সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়েছে, তার মনে আশার সঞ্চার করেছে। তথাপি আজ সমস্ত সত্তা দিয়ে সে বুঝতে পারছে যে, তাকে সে বিয়ে করতে পারে না।

'লজ্জাকর ও ভয়ংকর, ভয়ংকর ও লজ্জাকর! শুধু মিসির সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারই নয়, সব কিছু সম্পর্কেই সে বার বার ঐ একই কথা বলতে লাগল। বাড়ির ফটকে পা দিয়েও সে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, 'সব কিছুই ভয়ংকর ও লজ্জাকর।'

খাবার ঘরে নৈশাহার ও চায়ের জন্য চাদর পাতাই ছিল। চাকর করনেই সে ঘরে ঢুকতেই নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'রাতের খাবার চাই না। তুমি যেতে পার।'

'যাচ্ছি স্যার,' মুখে বলল বটে, কিন্তু করনেই গেল না, টেবিলের উপর থেকে খাবার জিনিসপত্র তুলে রাখতে লাগল। নেখ্‌লয়ুদভ অসন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে তাকাল। সে একটু একা থাকতে চায়, কিন্তু সবাই যেন তাকে কষ্ট দিতেই চাইছে। করনেই জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেলে নেখ্‌লয়ুদভ সামোভারের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু চা করতে যাবে এমন সময় আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার পায়ের শব্দ শুনে পাছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে ছুটে ড্রয়িং-রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। তিন মাস আগে এই ঘরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ঘরের মধ্যে রিফ্লেক্টরসহ দুটো বাতি জ্বলছিল ; একটা আলো পড়েছে তার বাবার ছবির উপর, অন্যটার আলো পড়েছে মায়ের ছবির উপর। ঘরে ঢুকতেই মায়ের সঙ্গে বাবার শেষ সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা তার মনে পড়ে গেল। দুজনকেই অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর বলে মনে হল। তাদের সম্পর্কটাও লজ্জাকর ও ভয়ংকর। তার মনে পড়ে গেল, অসুখের শেষের দিকে বাবা চাইত যে মায়ের মৃত্যু হোক। বাবা বলত, মা যাতে এই কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পায় সেই জন্যই তার ভালর জন্যই সে মায়ের মৃত্যু কামনা করত। কিন্তু আসলে বাবা তার নিজের জন্যই এটা চাইত, মায়ের যন্ত্রণা চোখে দেখার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই চাইত।

মায়ের মধুর স্মৃতিকে স্মরণ করবার চেষ্টায় সে তার ছবির দিকে এগিয়ে গেল। পাঁচ হাজার রুবল ব্যয়ে একজন বিখ্যাত শিল্পীকে দিয়ে ছবিখানি আঁকানো হয়েছিল। নীচু-গলা কাল ভেলভেটের পোষাকে তাকে আঁকা হয়েছে। শিল্পী বিশেষ যত্ন করে দুটি স্তন, তাদের ভিতরকার ফাঁকটা এবং উজ্জ্বল সুন্দর কাঁধ ও গলা এঁকেছে। ছবিটা পুরোপুরি রুচিবিগর্হিত ও ভয়ংকর। তার মাকে যে অর্ধ-নগ্ন সুন্দরীরূপে আঁকা হয়েছে সেটা যেমন রুচিবিগর্হিত তেমনি নিন্দনীয়। এটা আরও বেশী বিরক্তিকর কারণ তিন মাস আগে ঠিক এই ঘরে ঠিক এই নারীই শুকিয়ে মমি হয়ে বিছানায় পড়েছিল, অথচ শুধু এই ঘরটাই নয়, সারা বাড়িটাই এমন একটা অসহ্য বদ গন্ধে ভরে তুলেছিল যা কিছুতেই দূর করা যায় নি। তার মনে হল, যেন এখনও সে গন্ধ তার নাকে লাগছে। তার আরও মনে পড়ল, মৃত্যুর কয়েকদিন আগে হাড় বের-হওয়া বিবর্ণ আঙুলগুলো দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে মা বলেছিল, 'মিত্‌য়া. আমার যা করা উচিত ছিল তা যদি না করে থাকি, সে জন্য আমাকে দোষী করো না,' আর তার পরেই তার দুটি যন্ত্রণা-মলিন চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছিল।

'আঃ, কী ভয়ংকর!' ঐ অর্ধ-নগ্ন নারী, তার শ্বেতপাথরের মত কাঁধ ও গলা, ঠোঁটের উপরকার বিজয়িনীর হাসি,—সব কিছুর দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই সে কথাগুলি বলল। ঐ ছবির আধ-খোলা বুক আরেকটি যুবতীর কথা তাকে মনে করিয়ে দিল,—কয়েকদিন আগে ঐ একই ভাবে বুক-খোলা অবস্থায় সে

তাকে দেখেছে। সে মিসি। বল-নাচে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিজেকে ঐ বল-নাচের সাজে দেখাবার জন্যই একটা মিথ্যা অজুহাতে সে তাকে তারই ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল। বিরক্তির সঙ্গেই তার সুন্দর কাঁধ ও বাহুর কথা সে স্মরণ করল। 'তার ঐ স্থূল জন্তুসদৃশ বাবা ও তার সন্দেহজনক অতীত এবং নিষ্ঠুরতা, আর তার প্রতিভাময়ী মা ও তার কুখ্যাতি!' সে সবই তার বিরক্তির কারণ, লজ্জার কারণ। 'লজ্জাকর ও ভয়ংকর; ভয়ংকর ও লজ্জাকর!'

সে ভাবল, 'না, না, মুক্তি আমার চাই: করচাগিনদের সঙ্গে ও মারিয়া ভাসিলয়েভনার সঙ্গে মিথ্যা সম্পর্ক থেকে মুক্তি, উত্তরাধিকার থেকে মুক্তি, সব কিছু থেকে মুক্তি। আঃ, স্বাধীনধাবে নিঃশ্বাস নিতে চাই।—বহু দূরে, রোমে, আবার আমার ছবি আঁকার কাজে ফিরে যেতে চাই।' নিজের শিল্প-প্রতিভা সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ জাগল। 'বেশ, তাহলে—স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে চাই। প্রথমে কনস্তান্তিনোপল, তারপর রোম। তার আগে এই জুরির ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাই, অ্যাডভোকেটের সঙ্গে সব বিলি-ব্যবস্থা করতে চাই।'

তখন সহসা তার মনের সামনে ভেসে উঠল সেই কয়েদীটির একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছবি যার কালো চোখ ঈষৎ টেঁরা আর শেষ কথাগুলি বলবার সময় যে কেঁদে উঠেছিল; সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা নিভিয়ে ছাই-দানিতে চেপে রেখে সে আর একটা সিগারেট ধরাল এবং ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তার সঙ্গে অতীতে যে জীবন সে কাটিয়েছে একের পর এক তারই সব ছবি তার মনে ফুটে উঠল। মনে পড়ল, তার সঙ্গে শেষ দেখার ক্ষণটি, যে পাশবিক বাসনা তাকে পেয়ে বসেছিল তার কথা, আর সে বাসনা চরিতার্থ করবার পরে তার মনে যে নৈরাশ্য নেমে এসেছিল তার কথা। মনে পড়ল সাদা পোষাক আর 'নীল ওড়না, ও ভোরের উপাসনার কথা। 'আমি তো তাকে ভালবাসতাম, সে রাতে একটি সৎ, পবিত্র ভালবাসা দিয়ে তো সত্যি তাকে ভালবেসেছিলাম; তার আগেও তাকে ভালবেসেছি; হ্যাঁ, প্রথমবার যখন পিসীদের বাড়ি গিয়েছিলাম, যখন আমার প্রবন্ধটা লিখছিলাম, তখনও তাকে ভালবেসেছি।' তখন সে কি ছিল তাও মনে পড়ল। সেই জীবনের সরলতা, যৌবন ও পূর্ণতার হাওয়া তাকে যেন স্পর্শ করল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা যন্ত্রণাকাতর দুঃখ তাকে ঘিরে ধরল।

সে তখন যা ছিল আর আজ যা হয়েছে, এ দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সে রাতে গীর্জায় গিয়েছিল যে কাতয়ুশা, আর যে স্বৈরিণী বণিকের সঙ্গে প্রমোদে মত্ত হয়েছিল, আজই সকালে যাকে দণ্ডিত করা হয়েছে—এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তার নিজের দুটি সত্তার ব্যবধান বুঝি তার চাইতেও বেশী। তখন সে ছিল মুক্ত, নির্ভীক, অসংখ্য পথ খোলা ছিল তার সামনে; আজ এমন একটা অর্থশূন্য, ফাঁকা, মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর জীবনের জালে সে জড়িয়ে পড়েছে শত

চেষ্টায়ও যার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার কোন পথই সে দেখতে পাচ্ছে না। যতদূর দৃষ্টি চলে, এই মিথ্যা জীবন থেকে মুক্তির কোন উপায় চোখে পড়ে না। সে আজ কাদায় ডুবে গেছে, তাতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাতেই গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কাতয়ুশার প্রতি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে কেমন করে? একদিন যাকে ভালবেসেছিল তাকে তো পরিত্যাগ করতে পারে না। সাইবেরিয়ায় কঠোর পরিশ্রমের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য অ্যাডভোকেটের হাতে কিছু অর্থ গুঁজে দিয়েই তো সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার তো কঠোর দণ্ডভোগ করবার কথা নয়। টাকা দিয়ে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? যখন তাকে টাকা দিয়েছিল তখন সে কি ভাবে নি যে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে?

সেই মুহূর্তটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তার মনে ফুটে উঠল যখন দালানের মাঝখানে তাকে থামিয়ে তার এপ্রণের তোয়ালের মধ্যে টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল। 'হায়, সেই টাকা!' ভীতি ও বিরক্তির সঙ্গে সে ভাবল। সেই সময়ের মতই উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'হায় প্রিয়! হায় প্রিয়! কী বিরক্তিকর। এ কাজ তো শুধু ইতর, পাষণ্ডরাই করতে পারে। আর আমি—আমি সেই পাষণ্ড, সেই ইতর! কিন্তু'—সে চুপ করে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল—'কিন্তু এও কি সম্ভব যে আমি সত্যি একটি ইতর?—নিশ্চয়, আমি ছাড়া আর কে?' নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল। তারপর নিজেকে পরপর অভিযুক্ত করতে লাগল। 'আর, এই কি সব? মারিয়া ভাসিল্য়েভনা ও তার স্বামীর প্রতি আমার আচরণও কি নীচ ও বিরক্তিকর নয়? আর টাকা-কড়ির ব্যাপারে আমার মনোভাব? মা আমাকে দিয়েছে এই অজুহাতে সেই সব বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করা যাকে আমি বে-আইনী বলে মনে করি? আর আমার সমস্ত অলস, ঘৃণ্য জীবন? আর সকলের উপরে কাতয়ুশার প্রতি আমার আচরণ? একটা ইতর, একটা পাষণ্ড! তারা আমাকে যা খুশি ভাবুক, আমি তাদের ঠকাতে পারি, কিন্তু নিজেকে তো ঠকাতে পারি না।'

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভঙ্গীতে সে বলে উঠল, 'যেমন করে হোক এই মিথ্যার বাঁধন আমাকে ছিঁড়তেই হবে; যা সত্য সকলকে তা খুলে বলব, সত্য পথে চলব। মিসিকেও সত্য কথা বলব; তাকে বলব, আমি একটি লম্পট, তাই তাকে বিয়ে করতে পারি না, আর অকারণেই তাকে বিচলিত করেছি। মারিয়া ভাসিল্য়েভনাকেও বলব···হায়, তাকে তো বলার কিছু নেই। তার স্বামীকে বলব, আমি একটা পাষণ্ড, তাই তাকে ঠকিয়েছি। সব সম্পত্তির এমন ব্যবস্থা করব যাতে প্রকৃত সত্য স্বীকৃতিলাভ করে। কাতয়ুশাকে বলব, আমি একটা পাষণ্ড, তার প্রতি অন্যায় করেছি, তার ভাগ্যের উন্নতি বিধানের জন্য সাধ্যমত সব কিছু করব। হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে দেখা করব, আমাকে ক্ষমা করতে বলব···।

'হ্যাঁ, শিশুরা যেমন করে তেমনি ভাবে তার কাছে ক্ষমা চাইব।'···সে একটু থামল—'দরকার হলে তাকে বিয়ে করব।'

আবার থামল। ছোটবেলায় যেমন করত তেমনি ভাবে দুটি হাত বুকের কাছে জোর করে চোখ তুলে তাকাল এবং কাকে যেন আহ্বান করে বলল: 'প্রভু, আমার সহায় হও, আমাকে শিক্ষা দাও; এস, আমার অন্তরে প্রবেশ কর, এই ঘৃণ্য অবস্থা থেকে মুক্ত করে আমাকে পবিত্র কর।'

সে প্রার্থনা করল, ঈশ্বরকে বলল তাকে সাহায্য করতে, তার মধ্যে প্রবেশ করতে, তার সব ময়লা পরিস্কার করতে। যা সে প্রার্থনা করল তাতো ইতিমধ্যেই ঘটেছে; তার অন্তরশায়ী ঈশ্বর জেগেছে তার চৈতন্যের মধ্যে। নিজেকে তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধ করল, সুতরাং শুধু মুক্তি, পূর্ণতা ও জীবনের আনন্দই নয়, সত্যের সমস্ত শক্তিকে সে নিজের মধ্যে অনুভব করল। তার মনে হল, যত কিছু শ্রেষ্ঠ কাজ মানুষ করতে পারে সে সব করতে সে সক্ষম।

নিজেকে এই সব কথা বলতে বলতে তার দুই চোখ জলে ভরে উঠল; ভাল ও মন্দ দুটি অশ্রু: ভাল যেহেতু যে আত্মিক সত্তা এতগুলি বছর ধরে তার মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল তার জাগরণের জন্যই এই আনন্দের অশ্রু; আর মন্দ যেহেতু নিজের সততার জন্য নিজের প্রতি করুণায় এই অশ্রু বর্ষণ।

তার খুব গরম লাগতে লাগল। জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিল। জানালার নীচেই বাগান। চন্দ্রালোকিত শান্ত, নতুন রাত। কি যেন শব্দ করে চলে গেল। তারপর সব নিস্তব্ধ। জানালার উল্টো দিকের মাঠে একটা লম্বা পপলার গাছের ছায়া পড়েছে; পরিস্কার ঝাঁট-দেওয়া কাঁকর-বিছানো পথের উপর তার ছড়ানো ডালপালা যেন একটি অতি সূক্ষ্ম আলপনা এঁকে দিয়েছে। বাঁ-দিকে একটা বাড়ির ছাদে চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে—সম্মুখে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাগানের দেয়ালের কালো ছায়াটা দেখা যাচ্ছে। সেই ছাদ, সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বাগান, আর পপলার গাছের ছায়ার দিকে নেখ্‌ল্যুদভ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; বাইরের তাজা প্রাণশক্তিতে ভরা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল।

'কী আনন্দময়, কী আনন্দময়; হে ঈশ্বর, কী আনন্দময়!' নিজের মনের ভাবনাকেই যেন সে কথায় প্রকাশ করল।

অধ্যায়—২৯

সেদিন পাথরের রাস্তা ধরে দশ মাইল হেঁটে সন্ধ্যা ছ'টায় মাসলভা জেলখানায় পৌঁছিল। এতটা পথ হাঁটতে সে অভ্যস্ত নয়; তাই তার পা কেটে গেছে, শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন। তার উপর অপ্রত্যাশিত কঠোর দণ্ডে সে একেবারেই ভেঙে পড়েছে; ক্ষুধার যন্ত্রণাও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বিচারের প্রথম বিরতির সময় সৈন্যরা যখন তার পাশে বসে রুটি ও সিদ্ধ-ডিম খাচ্ছিল, তখন তার মুখে জল এসেছিল, সে খিদে বোধ করেছিল। কিন্তু তাদের কাছে খাবার ভিক্ষা করতে তার মর্যাদায় বাধল। তিন ঘণ্টা পরে কিন্তু তার খাবার ইচ্ছাটা চলে গেল। শুধু একটা দুর্বলতা বোধ করতে লাগল। সেই সময়ই দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা হল। প্রথমে ভাবল, সে ভুল শুনেছে: সাইবেরিয়ার কয়েদীরূপে নিজেকে সে ভাবতেই পারল না; যা শুনেছে সেটা বিশ্বাস করতে পারল না। কিন্তু বিচারক ও জুরিদের শান্ত নির্বিকার মুখ দেখে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, সমস্ত আদালতের কাছে সজোরে ঘোষণা করল যে সে দোষী নয়। কিন্তু যখন দেখল যে তার সে আর্তনাদকেও সকলে স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত বলেই ধরে নিল, সুতরাং তার ফলে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না, তখন সে হতাশ হয়ে কাঁদতে লাগল, ধরেই নিল যে তার প্রতি নিষ্ঠুর বিস্ময়কর অন্যায় করা হয়েছে তাকে মেনে নিতেই হবে। কিছুক্ষণ কাঁদবার পরে সে অভিভূতের মত চুপচাপ কয়েদীদের ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন মাত্র একটি জিনিসই তার চাই—ধূমপান। তার মনের যখন এই অবস্থা তখন বচকভা ও কারতিংকিনকেও সেই ঘরেই ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বচকভা সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 'কয়েদী' বলে বকতে শুরু করে দিল।

'হল তো! বলি লাভটা কি হল? নিজেকে বাঁচাতে পারলি? নোংরা মাগি! যেমন কর্ম, তেমনি ফল। ভয় নেই, সাইবেরিয়ায় গেলে গয়না-গাটি সবই যাবে!'

আস্তিনের মধ্যে দুই হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে সামনের নোংরা দরজাটার দিকে তাকিয়ে মাসলভা চুপচাপ বসে রইল। শুধু বলল, 'আমি তোমাদের ঘাটাতে যাই নি, তোমরাও আমাকে ঘাটিও না..... আমি কি তোমাদের ঘাটিয়েছি?' বার কয়েক কথাগুলি বলে সে চুপ করল। পরে যখন বচকভা ও কারতিংকিনকে সেখান থেকে নিয়ে গেল, আর একটা লোক এসে তাকে তিনটে রুবল দিল তখন তার মুখ একটুখানি উজ্জ্বল হল।

'তুমি কি মাসলভা,' সে জিজ্ঞাসা করল; তারপর রুবলগুলি দিয়ে বলল, 'এই নাও, একটি মহিলা তোমাকে দিয়েছেন।'

'মহিলা—কে মহিলা?'

'এটা নাও, বাস। তোমার সঙ্গে বকতে পারব না।'

টাকাটা পাঠিয়েছে বেশ্যালয়ের বাড়িউলি কিতায়েভা। আদালত থেকে যাবার আগে সে পরিচয়-ঘোষণাকারীর কাছে জানতে চেয়েছিল, মাসলভাকে কিছু টাকা দিতে পারে কি না। ঘোষণাকারী জানাল, পারে। অনুমতি পেয়ে সে তার মোটা মোটা সাদা হাত থেকে সোয়েডের চামড়ার তিন-বোতামওয়ালা দস্তানাটা খুলে রেশমের স্কার্টের ভাঁজের ভিতর থেকে একটা সুদৃশ্য থলি বের করল, তার ভিতর থেকে এক গোছা সুদি-কাগজের কুপন

বের করে তুই রুবল পঞ্চাশ কোপেনের একখানা কুপন বেছে নিল এবং তার সঙ্গে তুটো কুড়ি কোপেকের ও একটা দশ কোপেকের মুদ্রা যোগ করে সবটাই ঘোষণাকারীর হাতে দিল। সেও একজন চাকরকে ডেকে কিতায়েভের সামনেই টাকাটা তার হাতে দিল।

কারোলিনা আলবার্তভ্না কিতায়েভা বলল, 'ঠিক মানুষটাকেই দিওগো বাপু।'

তার এই অবিশ্বাসে চাকরটা ক্ষুব্ধ হল আর সেই জন্যই মাসলভার সঙ্গে ও রকম কর্কশ ব্যবহার করেছিল।

টাকাটা পেয়ে মাসলভা খুশি হল, কারণ এরদ্বারা তার একমাত্র অভিপ্রেত জিনিসটা সে পেতে পারবে।

নিজের মনেই বলে উঠল, 'একটা সিগারেটে যদি টান দিতে পারতাম!' তার সকল চিন্তা যেন এই একটি ইচ্ছাকেই ঘিরে ধরল। তার ধূমপানের ইচ্ছাটা এতই প্রবল হয়ে উঠল যে করিডরের দিকে খোলা অন্য একটা ঘরের দরজা দিয়ে তামাকের ধোঁয়া যখন তার ঘরে ঢুকল তখন সে লোভীর মত সেই বাতাসটাকেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে টানতে লাগল। কিন্তু তাকে অনেকক্ষণ সেখানেই অপেক্ষা করতে হল, কারণ যে সেক্রেটারি যাবার আদেশ দেবে কয়েকটি নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে জনৈক অ্যাডভোকেটের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে করতে কয়েদীদের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

অবশেষে পাঁচটা নাগাদ তার যাবার অনুমতি হল। নিঝ্নি নভ্গরদবাসী রক্ষী ও চুভাশ তাকে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে নিয়ে চলল। আদালতের ভিতরে থাকতেই সে তাদের কুড়ি কোপেক দিয়ে তুখানা রুটি ও সিগারেট এনে দিতে বলল। চুভাশ হেসে টাকাটা নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এনে দিচ্ছি।' সত্যি জিনিসগুলো সে এনে দিল এবং ঠিক ঠিক ভাঙানিও ফেরৎ দিল।

কিন্তু পথের মধ্যে তাকে ধূমপান করতে দেওয়া হল না। মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রেখে সে কারাগারের পথে হাঁটতে লাগল। যখন তারা কারাগারের দরজায় পৌঁছল, তখন ট্রেনে-চেপে আসা একশো কয়েদীকে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে।

নানা ধরনের কয়েদী—দাড়িওয়ালা, দাড়ি-কামানো, বৃদ্ধ, যুবক, রুশ, অ-রুশ, কারও বা মাথা কামানো, সকলেরই পায়ের শিকল ঝন্ঝন্ করে বাজছে। তাদের উপস্থিতিতে সমস্ত ঘরটা ধুলো, হট্টগোল আর ঘামের গন্ধে ভরে উঠেছে। মাসলভার পাশ দিয়ে যাবার সময় সবাই তার দিকে তাকাতে লাগল; কেউ কেউ আবার তার গা ঘেঁসেই চলে গেল।

একজন বলল, 'এই, একটা মেয়ে রে—খাসা দেখতে।'

তার দিকে চোখ ঠেরে আর একজন বলল, 'গড় করি মিস্।'

একটি গোঁফওয়ালা কালো লোকের মুখের বাকি অংশ ঘাড় পর্যন্ত কামানো। শিকলের উপর পা রেখে লাফিয়ে উঠে সে মাসলভাকে জড়িয়ে ধরল।

'সে কি! তোমার স্যাঙাৎকে চিনতে পারছ না? এস, এস, বাতেলা করো না মাইরি,' লোকটা দাঁত বের করে বলে উঠল। মাসলভা যখন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তখন তার চোখ চকচক করতে লাগল।

পিছন থেকে ছুটে এসে ইন্সপেক্টরের সহকারী চেঁচিয়ে বলল, 'এই রাস্কেল! এটা কি হচ্ছে?'

কয়েদীটা লাফ দিয়ে সরে গেল। সহকারী মাসলভার কাছে গেল।

'তুমি এখানে কেন?'

মাসলভা বলতে যাচ্ছিল তাকে আদালত থেকে আনা হয়েছে, কিন্তু সে তখন এতই শ্রান্ত যে কথা বলতেও তার ইচ্ছা হল না।

একটি সৈনিক এগিয়ে এসে টুপিতে আঙুল রেখে বলল, 'ও আদালত থেকে ফেরৎ এসেছে স্যার।'

'ওকে প্রধান কারারক্ষীর হেপাজতে তুলে দাও। এ সব মাল আমি নেব না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

সহকারী ইন্সপেক্টর চেঁচিয়ে বলল, 'সকলভ, একে ভিতরে নিয়ে যাও!'

প্রধান কারারক্ষী এগিয়ে এসে রেগেমেগে মাসলভার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করতে বলে মাসলভাকে মেয়েদের ওয়ার্ডের দালানের দিকে নিয়ে চলল। সেখানে তাকে তল্লাসি করা হল; কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু কিছু না পাওয়ায় (সিগারেটের বাক্সটা সে একটা রুটির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল) তাকে সেই একই সেলে নিয়ে যাওয়া হল যেখান থেকে সকালে সে আদালতে গিয়েছিল।

অধ্যায়—৩০

যে সেলে মাসলভাকে রাখা হল সে ঘরটা বেশ লম্বা—একুশ ফুট লম্বা ও ষোল ফুট চওড়া; ঘরে দুটো জানালা ও একটা ভাঙা স্টোভ। ঘরের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে একটার উপরে একটা করে সাজানো কাঠের বিছানা। কাঠগুলো বেঁকে দুমড়ে গেছে। দরজার উল্টো দিকে একটা কালো রঙের মূর্তি, তাতে মোমবাতি বসানো, আর একঝাড় শুকনো ফুল ঝোলানো। বাঁ দিকে দরজার পিছনে কালো মেঝের উপর একটা নোংরা পিপে। তল্লাসী শেষ হয়ে গেলে সকলকে রাতের মত তালাবন্ধ করে রাখা হল।

ঘরে পনেরো জন বাসিন্দা, তার মধ্যে তিনটি শিশু।

তখনও বেশ আলো ছিল। শুধু দুটি স্ত্রীলোক বিছানা নিয়েছে: চুরির

দায়ে দণ্ডিত একটা ক্ষয়কাশের রোগিনী, অপরটি জড়বুদ্ধি, পাসপোর্ট না থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

কয়েদীদের প্রায় সকলেরই পরনে একটিমাত্র মোটা ধূসর রঙের শেমিজ। অনেকেই জানালা দিয়ে উঠোনের কয়েদীদের দেখছিল। তিনজন বসে সেলাই করছিল। তাদের মধ্যে একজন হল কোরাব্‌ল্যভা, যে সকালে মাসলভাকে বিদায় দিয়েছিল। সে সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। কারণ তার মেয়ের কাছে কুপ্রস্তাব করার জন্য সে তার স্বামীকে কুড়ুল দিয়ে খুন করেছিল। সেলের মধ্যে সে প্রধান কয়েদী, সেখানে মদের কারবারও করে। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি রেলের পাহারাদারের বউ; ট্রেন যাবার সময় ফ্ল্যাগ নিয়ে ঠিক মত উপস্থিত না থাকায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল বলে তার তিন বছর কারা-দণ্ড হয়েছে। তৃতীয় স্ত্রীলোকটির নাম ফেদসিয়া। অল্পবয়সী মেয়ে, গোলাপি রং, ভারি সুন্দর দেখতে, শিশুর মত উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর লম্বা চুল। স্বামীকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টার অপরাধে তার কারাদণ্ড হয়েছে। বিয়ের ঠিক পরেই এই কাণ্ডটি সে করেছিল (ষোল বছর বয়সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল), কিন্তু যে আট মাস সে জামিনে খালাস ছিল তার মধ্যেই সে যে তার স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে তাই নয়, তাকে ও ভালবেসেও ফেলেছে; ফলে যখন মামলা উঠল তখন তাদের মধ্যে একেবারে প্রাণে-প্রাণে ভাব। তার স্বামী, শশুর এবং বিশেষ করে শাশুড়ি তাকে খালাস করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার সাইবেরিয়ায় সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। অপর দুজন কাঠের বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। একজনের কোলে শিশু। তার অপরাধ, সৈন্যদলভুক্ত একটি ছেলেকে যখন (চাষীদের মতে) বে-আইনীভাবে তাদের গ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং গ্রামের লোক পুলিশ-অফিসারকে বাধা দিয়ে ছেলেটাকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল তখন সেই (ছেলেটার কাকি) প্রথম ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরেছিল। অপর স্ত্রীলোকটি বুড়ি, মাথায় পাকা চুল, পিঠ বেঁকে গেছে। সে তার চার বছরের মোটাসোটা ছেলেটার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। তাদের বিরুদ্ধে অগ্নিকাণ্ডের অভিযোগ। তার কারাদণ্ডকে সে হাসিমুখেই গ্রহণ করেছে; তার যত চিন্তা ছেলেকে নিয়ে, আর বিশেষ করে তার 'বুড়োলোকটাকে' নিয়ে।

এই সাতটি স্ত্রীলোক ছাড়া আরও চারজন একটা খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে লোহার শিক ধরে উঠোনের কয়েদীদের দেখে নানা রকম ইঙ্গিত ও চেঁচামেচি করছিল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রয়েছে তার ছোট ছেলে ও সাত বছরের মেয়ে। মায়ের সঙ্গে তারাও কারাগারে এসেছে কারণ বাড়িতে এমন কেউ নেই যাদের কাছে তাদের রেখে আসা যায়। এদের সকলেরই বিরুদ্ধে হয় চুরি, নয় আগুন-লাগানো, আর না হয় তো মদ-বিক্রির অভিযোগ। দ্বাদশ কয়েদী জনৈক পুরোহিতের মেয়ে। বেশ দীঘল ও সুদর্শনা। অবৈধ

সন্তানকে সে কুয়োর মধ্যে ডুবিয়ে মেরেছে। একটি মাত্র ময়লা শেমিজ পরে সে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও দিকে তার নজর নেই; সেলের খালি জায়গায় সে একবার এদিকে একবার ওদিকে পায়চারি করছে, আর প্রতিবারই দেয়ালের কাছে পৌঁছেই হঠাৎ ঘুরে যাচ্ছে।

অধ্যায়—৩১

তালাটা সশব্দে খোলা হল। খোলা দরজা দিয়ে সেলে ঢুকল মাসলভা। সকলেই তার দিকে চোখ ফেরাল। এমন কি পুরোহিতের মেয়েটিও মুহূর্তের জন্য থেমে ভুরু তুলে মাসলভার দিকে তাকাল; কিন্তু একটি কথাও না বলে আবার তার চলা শুরু করে দিল।

করাব্‌ল্যভা হাতের সুঁচটা রেখে চশমার ভিতর দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাসলভার দিকে তাকাল।

প্রায় পুরুষের মত মোটা গলায় বলে উঠল, 'হা ভগবান! ফিরে এসেছ? আমি আরও ভেবেছিলাম তোমাকে ছেড়ে দেবে। সাজা তাহলে হল?'

রেলের পাহারাদারের স্ত্রী বলল, 'আর এখানে বুড়ো খুড়ি আর আমি বলাবলি করছিলাম, "এমনও হতে পারে যে ওকে এখুনি ছেড়ে দেবে"। সে রকমও তো ঘটে শুনেছি। এমন কি কেউ আবার এক কাড়ি টাকাও পায়। সবই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। এর বেলায়ই দেখ না। আমাদের সব ধারণাই ভুল হয়ে গেল। প্রভুর ইচ্ছাই যে অন্য রকম।'

ঈষৎ নীল শিশুর মত চোখ মেলে মাসলভার দিকে তাকিয়ে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ফেদসিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'এও কি সম্ভব? ওরা তোমাকে শাস্তি দিয়েছে?'

মাসলভা জবাব দিল না; তার শেষ থেকে দ্বিতীয় জায়গাটায় গিয়ে করাব্‌ল্যভার পাশে বসে পড়ল।

মাসলভার কাছে গিয়ে ফেদসিয়া বলল, 'কিছু খেয়েছ কি?'

সে কোন জবাব দিল না। কাগজটা বিছানার উপর রেখে ধুলোভরা আলখাল্লাটা খুলে ফেলল, কোঁকড়া কালো চুল থেকে রুমালটাও খুলল।

যে বুড়িটা ছেলের সঙ্গে খেলা করছিল সেও এসে মাসলভার সামনে দাঁড়িয়ে করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ঠোঁট দিয়ে 'চুক, চুক, চুক,' শব্দ করল। ছেলেটাও এসে সেখানে দাঁড়াল এবং উপরের ঠোঁটটা তুলে মাসলভার রুটির দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

সারা দিনের ঘটনার পর এই সব সহানুভূতি-ভরা মুখগুলি দেখে মাসলভার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, তার কান্না পেয়ে গেল। নিজেকে সংযত রাখবার অনেক চেষ্টা করেও পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

করাব্‌ল্য়ভা বলল, 'একজন ভাল অ্যাডভোকেট দিতে বলেছিলাম না? তা-কি হল? নির্বাসন?'

মাসলভা জবাব দিতে পারল না। কাগজের ভিতর থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের করে করাব্‌ল্য়ভার দিকে এগিয়ে দিল। এ ধরনের বাজে খরচ পছন্দ না করলেও সে একটা সিগারেট নিয়ে বাতির আলোয় ধরিয়ে একটা সুখটান দিল, তারপর সিগারেটটা মাসলভাকে ফিরিয়ে দিল। মাসলভা তখনও কাঁদছে। সেই অবস্থায়ই লোভার মত তামাকের ধোঁয়া টানতে লাগল।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আর কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, 'সশ্রম কারাদণ্ড।'

করাব্‌ল্য়ভা বলে উঠল, 'অভিশপ্ত খুনীর দল, ওরা কি প্রভুকে ভয় করে না? মেয়েটাকে বিনা দোষে সাজা দিল। তা—ক' বছর?'

'চার,' মাসলভা বলল। তার গাল বেয়ে চোখের জল এমনভাবে ঝরতে লাগল যে এক—ফোঁটা সিগারেটের উপরেও পড়ল। রেগে সেটাকে দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়ে আর একটা সিগারেট নিল।

পাহারাদারের স্ত্রী ধূমপান করে না, তবু ফেলে-দেওয়া সিগারেটটা তুলে নিয়ে সেটাকে সোজা করতে করতে অনবরত বকতে লাগল।

শুনতে শুনতে মাসলভার তেষ্টা পেয়ে গেল।

আস্তিনে চোখ মুছে অল্প-অল্প ফোঁপাতে ফোঁপাতে করাব্‌ল্য়ভাকে বলল, 'একটু ভদকা পেলে বাঁচতাম।'

করাব্‌ল্য়ভা বলল, 'ঠিক আছে, কিছু ছাড়।'

অধ্যায়—৩২

মাসলভা রুটির ভিতর লুকিয়ে রাখা টাকা বের করে একটা কুপন করাব্‌ল্য়ভাকে দিল। করাব্‌ল্য়ভা ভেন্টিলেটারে উঠে সেখানে লুকিয়ে-রাখা ছোট এক বোতল ভদকা পেড়ে আনল। তা দেখে দূরের মেয়েরা যে যার জায়গায় চলে গেল। ইতিমধ্যে আলখাল্লা ও রুমাল থেকে ধুলো ঝেড়ে মাসলভা বিছানায় উঠে একটা রুটি খেতে শুরু করল।

তাকের উপর থেকে কম্বলে জড়ানো একটা মগ ও টিনের টি-পট নামিয়ে এনে ফেদসিয়া বলল, 'তোমার জন্য চা রেখেছিলাম, কিন্তু সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বলে ভয় হচ্ছে।'

চাটা সত্যি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আর তাতে চা অপেক্ষা টিনের স্বাদই বেশী, তবু মাসলভা মগটা ভরে নিয়ে রুটির সঙ্গে চাটাও খেতে লাগল।

ছেলেটা তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে তাকে দিয়ে সে বলল, 'ফিনাস্‌কা, এই নে।' এদিকে করাব্‌ল্য়ভা ভদকার বোতল ও মগটা মাসলভাকে দিল। সে আবার তার থেকে কিছুটা

করাব্‌ল্যুভাকে এবং কিছুটা খরশাভ্‌কাকে দিল। সেলের মধ্যে এই তিনজন কয়েদীকে অভিজাত বলে মনে করা হত, কারণ তাদের হাতে কিছু টাকা থাকত, এবং সব কিছুই তারা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেত।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাসলভা চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং আদালতে যা যা ঘটেছিল সব হুবহু বর্ণনা করতে লাগল। সরকারী উকিলের হাবভাব নকল করে দেখাল, আর সব পুরুষ মানুষই যে তার পিছনে পিছনে ঘুরেছে সে কথাও বলল। আদালতে সকলেই তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আর যতক্ষণ সে কয়েদীদের ঘরে ছিল ততক্ষণই তারা সেখানে ঘুর ঘুর করছিল।

'একজন রক্ষী তো বলেই ফেলল, "তোমাকে দেখতেই ওরা আসে।" কেউ হয় তো ঘরে ঢুকেই বলল, "সে কাগজটা কোথায় গেল?" বা ঐ রকম আর কিছু, কিন্তু কাগজের দিকে তার মোটেই নজর ছিল না, দুই চোখ দিয়ে সে যেন আমাকেই গিলে খাচ্ছিল। ঠিক যেন পাকা শিল্পী।'

পাহারাদারের বউ বলল, 'যা বলেছ। তারা সব যেন চিনির খোঁজে মাছির ঝাঁক। আর কিছু না হলেও তাদের চলে, রুটি ছাড়া হয় তো ওরা বাঁচতে পারে, কিন্তু এ সব সুযোগ কোন মতেই ছাড়তে পারে না।'

মাসলভা তার কথার মধ্যেই বলে উঠল, 'আর এখানেও দেখ, সেই একই অবস্থা। ওরা আমাকে নিয়ে সবে পৌঁচেছে, এমন সময় রেলগাড়ি করে একদল এসে হাজির। তারা আমাকে এমন ভাবে ঘিরে ধরল যে পালাবার পথ পাই না। সরকারী ইন্সপেক্টরকে ধন্যবাদ—সেই সবাইকে তাড়িয়ে দিল। একজন তো এমন কাণ্ড করল যে কোনক্রমে নিজেকে বাঁচালাম।'

'লোকটা দেখতে কেমন?' খরশাভ্‌কা জিজ্ঞাসা করল।

'ময়লা; গোঁফ আছে।'

'তাহলে নির্ঘাৎ সে।'

'সে—কে?'

'কেন, শেগ্‌লভ।'

'শেগ্‌লভ কে?'

খরশাভ্‌কা বলল, 'সে কি, শেগ্‌লভকে জান না! সেই তো দুবার সাইবেরিয়া থেকে পালিয়েছে। এবার তাকে ধরেছে, কিন্তু আবার হাওয়া হবে। রক্ষীরা পর্যন্ত তাকে ভয় করে। পালিয়ে সে যাবেই, সোজা কথা।'

মাসলভার দিকে ফিরে করাব্‌ল্যভা বলল, 'আরে, সে পালালে আমাদের তো আর সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ও কথা থাক। তুমি বরং বল, আপিল করার ব্যাপারে অ্যাডভোকেট কি বলেছে। সেটা তো এখনি করা দরকার।'

মাসলভা জবাবে বলল, সে বিষয়ে কিছুই সে জানে না।

ক্রমে চারদিক শান্ত হয়ে এল। প্রায় সকলেই শুয়ে পড়ল। কেউ কেউ

নাক ডাকাতে লাগল। শুধু বুড়িটা মূর্তির সামনে বার বার মাথা নীচু করতে থাকল, আর পুরোহিতের মেয়েটি ঘরময় হেঁটে বেড়াতে লাগল।

মাসলভা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, কঠোর সশ্রম দণ্ডে সে দণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

পাশের বিছানায় করাব্‌ল্যভা পাশ ফিরল।

মাসলভা নীচু গলায় বলল, 'এ কথা কে ভেবেছিল? অথচ অন্যরা কত কিছু করেও শাস্তি পায় না।'

করাব্‌ল্যভা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কিছু ভেব না মেয়ে। সাইবেরিয়াতেও মানুষ বেঁচে থাকে। তুমিও সেখানে গিয়ে মরে যাবে না।'

'মরে যাব না তা জানি; কিন্তু সে বাঁচা বড় কষ্টের। এমন কপাল তো আমি চাই না—আমি যে অনেক আরামে বাঁচতে অভ্যস্ত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে করাব্‌ল্যভা বলল, 'হায় রে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তো কেউ যেতে পারে না। কেউ পারে না মা।'

'আমি জানি গো। তবু, এ যে বড় কষ্ট।'

তারপর দুজনই চুপচাপ।

অধ্যায়—৩৩

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, তার একটা কিছু ঘটেছে; সেটা যে কি তা মনে করবার আগেই সে বুঝতে পারল, একটা গুরুতর ও ভাল কিছুই ঘটেছে।

'কাতয়ুশা—বিচার!' হ্যাঁ, আর মিথ্যা নয়, এবার তাকে সত্য কথাই বলতে হবে।

আশ্চর্য এক যোগাযোগে ঠিক সেদিন সকালেই মার্শালের স্ত্রী মারিয়া ভাসিল্যেভনার কাছ থেকে দীর্ঘ প্রত্যাশিত চিঠিখানা সে পেয়েছে—ঐ চিঠিটার তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, এবং তার অভিপ্রেত বিয়েতে শুভ কামনা জানিয়েছে।

'বিয়ে!' বিদ্রূপের সঙ্গে সে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'বর্তমানে সে সব থেকে আমি কত দূরে।'

একদিন আগে সে যা মনস্থ করেছিল সেটা মনে পড়ে গেল: স্বামীকে সব কথা বলবে, খোলাখুলি সব কিছু স্বীকার করবে, তাকে জানাবে যে তার মনস্তুষ্টির জন্য সব কিছু করতে সে প্রস্তুত। আজ কিন্তু সে সব আগের দিনের মত ততটা সহজ মনে হচ্ছে না। তাছাড়া, যা সে জানে না সে কথা বলে একটা লোককে অসুখী করবেই বা কেন? হ্যাঁ, সে যদি নিজে এসে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে সবই তাকে বলবে, কিন্তু নিজের থেকে গিয়ে বলা—না! তার

কোন দরকার নেই।

মিসিকে সব কথা বলাও আজ সকালে বেশ কঠিন মনে হচ্ছে। বলতে গেলেই তো মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। আসলে সংসারের আরও অনেক ব্যাপারেই কিছু না কিছু গোপন রাখতেই হয়। শুধু একটা বিষয়ে সে দৃঢ়-সংকল্প : সেখানে যাবে না, এবং জানতে চাইলে সত্য কথাই বলবে।

কিন্তু কাত্যুশার ব্যাপারে কিছুই গোপন রাখা চলবে না।

'আমি কারাগারে যাব, তাকে সব কথা জানাব, তার কাছে ক্ষমা চাইব। আর দরকার হলে···হ্যাঁ, দরকার হলে তাকে বিয়ে করব,' এই কথাই সে ভাবতে লাগল।

নীতিগত কারণেই সে যে সব কিছু ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত এই চিন্তায়ই কাত্যুশার প্রতি সহানুভূতিতে আবার তার মন ভরে উঠল।

অনেক দিন পরে তার মন যেন নতুন শক্তিতে জেগে উঠেছে। আগ্রাফেনা পেত্রভনা এলে তাকে সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই জানিয়েছিল যে, এ বাড়ির এবং পেত্রভনার সেবার তার কোন প্রয়োজন নেই। এটা প্রায় সকলেই জানত যে সে বিয়ের কথা ভাবছে বলেই এত বড় ও ব্যয়বহুল একটা বাড়ি সে নিয়েছে। কাজেই বাড়ি ছেড়ে দেবার একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। আগ্রাফেনা পেত্রভনা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

'তুমি আমার যে যত্ন নিয়েছ সেজন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আগ্রাফেনা পেত্রভনা, কিন্তু এত বড বাড়ি ও এত কাজের লোকের আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তাহলে মায়ের আমলে যে রকম ছিল জিনিসপত্রের সেই রকম বিলি-ব্যবস্থা কর। তারপর নাতাশা এসে সব ঠিক করবে।' নাতাশা নেখ্‌ল্যুদভের বোন।

আগ্রাফেনা পেত্রভনা মাথা নাড়ল। বলল, 'জিনিসপত্রের বিলি-ব্যবস্থা? সে কি? ওগুলো তো আবার লাগবে।'

তার মাথা নাড়ার জবাবেই নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'না, লাগবে না আগ্রাফেনা পেত্রভনা; আমি বলছি, ওগুলো লাগবে না। দয়া করে করনেইকেও বলে দিয়ো যে তাকে দু মাসের মাইনে দিয়ে দেব, কিন্তু তাকে আমার আর দরকার হবে না।'

সে বলল, 'দিমিত্রি আইভানোভিচ, বড়ই দুঃখের কথা যে এসব তুমি ভাবছ। তুমি যদি বিদেশেই যাও, তাহলেও তো আবার তোমার একটা বাসস্থান লাগবে।'

'তোমার চিন্তাটাই ভুল আগ্রাফেনা পেত্রভনা; আমি বিদেশে যাচ্ছি না। যদি কোথাও যাই তবে সেটা সম্পূর্ণ অন্য পথে।' হঠাৎ সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, 'হ্যাঁ তাকে বলতেই হবে। কোন লুকোচুরি নয়; প্রত্যেককে বলতে হবে।'

'গতকাল একটা খুব আশ্চর্য ও গুরুতর ঘটনা ঘটেছে। পিসী মারিয়া আইভানভনার ধর্ম-মেয়ে কাতয়ুশাকে তোমার মনে পড়ে?'

'নিশ্চয়। আমিই তো তাকে সেলাই শিখিয়েছিলাম।'

'দেখ, গতকাল আদালতে সেই কাতয়ুশার বিচার হয়েছে, আর আমিই ছিলাম জুরিদের একজন।'

'হে প্রভু! কী দুঃখের কথা!' আগ্রাফেনা পেত্রভনা চেঁচিয়ে উঠল। 'কি জন্য তার বিচার হচ্ছিল?'

'খুনের জন্য; আর এ সবই আমার কাজ।'

আগ্রাফেনা পেত্রভনার বার্ধ্যকজীর্ণ চোখ দুটি ঝকমক করে উঠল। বলল, 'খুব আশ্চর্য তো; সব তোমার কাজ কেমন করে হতে পারে?'

কাতয়ুশার সঙ্গে তার ব্যাপারটা সে জানত।

'হ্যাঁ, এ সব কিছুর কারণ আমি; আর এর ফলেই আমার সব কিছু পাল্টে গেছে।'

একটা হাসি চেপে আগ্রাফেনা পেত্রভনা বলল, 'এতে তোমার কি যায় আসে?'

'এই যায় আসে যে, তার এ পথে যাবার কারণ যখন আমি, তখন তাকে সাহায্য করতে আমার সাধ্যমত সব কিছু করা উচিত।'

আগ্রাফেনা পেত্রভনা কঠোর ভাষায় বলে উঠল, 'তোমার যা খুশি তা তুমি অবশ্য করতে পার। তবে এ ব্যাপারে তোমার তো বিশেষভাবে কোন দোষ নেই। এ রকম তো প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে। আর বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যায়, লোকে সব ভুলেও যায়। তুমি কেন সব বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবে? তার তো কোন প্রয়োজন নেই। শুনেছিলাম, সে নিজেই সৎপথ থেকে সরে গিয়েছিল। তাহলে সেটা কার দোষ?'

'আমার! দোষ আমার বলেই আমি তার প্রতিকার করতে চাই।'

'প্রতিকার করা শক্ত।'

'সেটা আমার ব্যাপার। তোমার নিজের কথা যদি বল, তাহলে বলব— যেহেতু আমার মার ইচ্ছা ছিল—'

'নিজের কথা আমি ভাবছি না। তোমার মা আমাকে এত কিছু দিয়েছেন যে আমি আর কিছুই চাই না। লিজাংকা (তার বিবাহিতা বোন-ঝি) তো আমাকে ডাকছে, এখানে দরকার না থাকলেই আমি তার কাছে চলে যাব। শুধু এটাই দুঃখের যে এ ব্যাপারটাকে তুমি এতটা বড় করে দেখছ। এ রকম তো প্রত্যেকেরই হয়ে থাকে।'

'কিন্তু আমি তা মনে করি না। আবারও বলছি, এই বাড়ি ভাড়া দিয়ে সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে তুমি আমাকে সাহায্য কর। আর দয়া করে আমার উপর রাগ করো না। আমার জন্য যা করেছ সে জন্য তোমার কাছে

আমি খুব কৃতজ্ঞ।'

বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, যে মুহূর্তে নেখ্‌লুয়ুদভ বুঝতে পারল যে সে নিজেই খারাপ, নিজেই বিরক্তিকর, তখন থেকেই অন্য কাউকে আর সে বিরক্তিকর বলে মনে করত না; বরং আগ্রাফেনা পেত্রভনা ও করনেইর জন্য তার মনে শ্রদ্ধা জাগল।

সে হয় তো নিজেই গিয়ে করনেইকেও সব কথা বলত, কিন্তু করনেইর আচরণ এতদূর বিনম্র ভক্তিতে আপ্লুত যে সেটা করা কিছুতেই সম্ভব হল না।

আদালতে যাবার পথে আগের দিনের মত সেই একই রাস্তা দিয়ে একই ইজভজচিকে চড়ে যেতে যেতে নিজের পরিবর্তন উপলব্ধি করে সে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল।

মিসির সঙ্গে যে বিয়ে গতকালও ছিল সম্ভাবনার পর্যায়ে আজ সেটা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। গতকালও সে ভাবত যে তার উপরই সব কিছু নির্ভর করছে এবং তাকে বিয়ে করে মিসি যে সুখী হবে সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না; কিন্তু আজ সে বুঝতে পারছে, সে যে তাকে বিয়ে করবার পক্ষে অনুপযুক্ত তাই নয়, তার সঙ্গে কোন রকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখারও সে অনুপযুক্ত। 'আমি যে কি তা যদি মিসি জানতে পারে তাহলে কোন প্রলোভনেই সে আমাকে গ্রহণ করবে না। অথচ গতকালই সেই লোকটার সঙ্গে মেলামেশার জন্য আমি তার দোষ ধরেছিলাম। কিন্তু না, সে যদি আমাকে গ্রহণ করেও, তবু আর একটা মানুষ রয়েছে কারাগারে এবং আজ হোক কাল হোক তাকে পাঠানো হবে সাইবেরিয়ায়, এ কথা জেনেও কেমন করে আমি শান্তিতে কাটাব, সুখের কথা তো ওঠেই না। যে মেয়েটিকে আমিই নষ্ট করেছি সে যাবে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে, আর আমি কুড়িয়ে বেড়াব অভিনন্দন, স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে, অথবা স্থানীয় স্কুলের তদন্ত প্রভৃতি প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সব ভোট পড়বে, মার্শালের সঙ্গে একত্রে (যাকে আমি লজ্জাজনকভাবে ঠকিয়েছি) সেগুলি গণনা করব এবং তারপরই লুকিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব (জঘন্য চিন্তা!); অথবা আমার ছবি আঁকার কাজে হাত দেব, অথচ যে ছবি কোন দিন শেষ হবে না, কারণ ঐ সব কাজে সময় নষ্ট করা আমার পোষাবে না। এখন এ সবের কোনটাই আমি করতে পারি না,' নিজের মধ্যে এই পরিবর্তনের ফলে উৎফুল্ল হয়ে সে এসব ভাবতে লাগল।

'এখন প্রথম কাজই হচ্ছে অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করে তার সিদ্ধান্ত জানা, এবং তারপর……তারপর গতকালের কয়েদীর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব কথা বলা।'

কেমন করে তার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলবে, তার প্রতি নিজের পাপকে স্বীকার করবে, কেমন করে তাকে জানাবে যে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে

সে সাধ্যায়ত্ত সব কিছু করবে. এমন কি তাকে বিয়ে করবে,—নিজের মনে সেই সব ছবি কল্পনা করতে করতে তার ভিতরে একটা বিশেষ আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল ; তার দুই চোখে নেমে এল জলের ধারা।

অধ্যায়—৩৪

আদালতে পৌছে নেখ্‌ল্যুদভ দালানেই গতকালের ঘোষণাকারীর সঙ্গে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসা করল, দণ্ডিত দয়েদীদের কোথায় রাখা হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতির জন্য কার কাছে আবেদন করতে হবে। ঘোষক জানাল, দণ্ডিত কয়েদীদের নানা জায়গায় রাখা হয়েছে ; যতক্ষণ তাদের দণ্ডাদেশ চূড়ান্তভাবে স্থির না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ন্যায়াধীশের উপর নির্ভর করে।

বিচার শেষ হবার পরে আমি নিজে এসে আপনাকে ন্যায়াধীশের কাছে নিয়ে যাব। এখনও তিনি আসেন নি। বিচারের পরে। এখন ভিতরে চলুন ; আমরা এখনই শুরু করব।'

নেখ্‌ল্যুদভ ঘোষককে তার সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে জুরিদের ঘরে চলে গেল।

সে যখন ঘরে ঢুকছে অন্য জুরিরা তখন ঘর থেকে আদালতে যাচ্ছে। বণিকটি কিছু জলখাবার খেয়ে আগের দিনের মতই খোশমেজাজে আছে ; পুরনো বন্ধুর মতই সে নেখ্‌ল্যুদভকে স্বাগত জানাল। পিয়তর্‌ গেরাসিমভিচ কিন্তু তার ঘনিষ্ঠতা ও উচ্চ হাসি সত্ত্বেও আজ আর নেখ্‌ল্যুদভের মনে কোন অপ্রীতিকর ভাব জাগাল না।

নেখ্‌ল্যুদভের ইচ্ছা ছিল, কালকের কয়েদীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জুরিদের বলবে। সে ভাবল, 'গতকালই উঠে দাঁড়িয়ে নিজের দোষ খুলে বলা আমার উচিত ছিল।' কিন্তু অন্য জুরিদের সঙ্গে আদালতে ঢুকে সে যখন কালকের মত সেই একই ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হতে দেখল—আবারও ঘোষণা করা হল 'আদালত আসছেন', কারুকার্যকরা কলার পরিহিত তিনজন লোক পুনরায় মঞ্চে আরোহণ করল, সেই একই জুরি উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসল। সেই একই রক্ষী, একই ছবি, একই পুরোহিত—তখন নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল যে তার পক্ষে উচিত যাই হোক না কেন, কালকের মত আজও এই সব গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সে অক্ষম।

আদালতের সামনে আজ ছিল একটা চুরির মামলা। খোলা তলোয়ার হাতে দুজন সৈনিকের প্রহরাধীন কয়েদী কুড়ি বছরের একটি সরু-বুকওয়ালা ছেলে। তার মুখটা রক্তহীন ফ্যাকাসে, পরনে একটা ধূসর আলখাল্লা। একাকী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যারাই আদালতে ঢুকছিল তাদেরই সে ভুরু নামিয়ে

হাঁ করে দেখছিল। ছেলেটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, একজন সঙ্গীর যোগসাজসে একটি চালাঘরের তালা ভেঙে তিন রুবল সাতষট্টি কোপেক মূল্যের কয়েকটা পুরনো মাদুর সে চুরি করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সঙ্গীর সঙ্গে পথ দিয়ে যাবার সময় পুলিশ ছেলেটিকে থামায়। তার সঙ্গীর মাথায় মাদুরগুলো ছিল। দুজনই সঙ্গে সঙ্গে দোষ স্বীকার করে এবং দুজনকেই হাজতে পাঠানো হয়। সঙ্গী তালা মেরামতকারীটি কারাগারে মারা যায়, কাজেই শুধু ছেলেটিরই বিচার চলে। ঘটনার সাক্ষীস্বরূপ পুরনো মাদুরগুলি টেবিলের উপরেই পড়ে ছিল।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, এই ছেলেটির বাবা তাকে একটা তামাকের কারখানায় শিক্ষানবিশ করে পাঠায় এবং সেখানেই পাঁচ বছর থাকে। এ বছর একটা ধর্মঘটের পরে মালিক তাকে ছাঁটাই করে; চাকরি হারিয়ে সে শহরের পথে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং যৎসামান্য সঞ্চয় যা ছিল মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয়। সেই সময় একটা হোটেলে তার মতই আর একটা ছেলের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে পেশায় তালা-মিস্ত্রি, মাতাল। তারও অনেক আগেই চাকরি গিয়েছিল। একদিন রাতে দুজনই মাতাল অবস্থায় একটা চালাঘরের তালা ভাঙে এবং হাতের কাছে যা পায় তাই নিয়ে সরে পড়ে। তারা সব কথা খুলে বললেও তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। বিচারাধীন অবস্থায়ই তালা-মিস্ত্রিটা মারা যায়। একটা বিপজ্জনক জীব হিসাবে এখন ছেলেটির বিচার চলছে; তার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই হবে।

সব কিছু শুনে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'কালকের অপরাধীর মতই সমান বিপজ্জনক জীব। ওরা বিপজ্জনক; আর আমরা যারা ওদের বিচার করি তারা বিপজ্জনক নয়? আমি—একটা লম্পট, প্রতারক—আর আমরা, সেই সব লোক যারা আমার স্বরূপ জানে অথচ আমাকে ঘৃণা তো করেই না বরং শ্রদ্ধা করে, তারা কি? এই ঘরে যারা জমায়েত হয়েছে তাদের সকলের চাইতে ঐ ছেলেটি যদি সমাজের পক্ষে বেশী বিপজ্জনক হয়েই থাকে, তাহলে ছেলেটি ধরা পড়লে সাধারণ বুদ্ধিমতে তাকে কি করা উচিত?

'পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সে কোন অসাধারণ অন্যায়কারী নয়—একটি অতি সাধারণ ছেলে—সেটা তো সকলেই বোঝে—আর সে যে আজ এই অবস্থায় পৌঁচেছে তার একমাত্র কারণ যে পরিবেশে এই ধরনের চরিত্র গড়ে ওঠে সেও ঘটনাচক্রে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং এ সব ছেলেকে যদি অন্যায়ের হাত থেকে বাঁচাতে হয় তাহলে যে পরিবেশ এই সব হতভাগ্যদের সৃষ্টি করে তাকে দূর করতে হবে।

'কিন্তু আমরা কি করি? ওর মত আরও হাজার হাজার জীব বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনেও এই একটি ছেলে ভাগ্যদোষে আমাদের হাতে ধরা পড়েছে বলে আমরা তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাকে জেলে পাঠাই, সেখানে হয়

সে সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা বনে যায়, নয় তো ওরই মত দুর্বল, অধঃপতিত লোকদের সঙ্গে কতকগুলি অদরকারী ও অস্বাস্থ্যকর কাজ করে; তারপর একদিন সরকারী খরচে তাকে ফেরৎ পাঠাই এবং আবার সে মস্কো থেকে ইরখুতস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ভ্রষ্টচরিত্রদের দলে মিশে যায়।

'আর আমরা যে অবস্থায় এই সব লোকের সৃষ্টি হয় তাকে দূর করতে কিছু তো করিই না, উপরন্তু এই অবস্থা যারা তৈরি করে সেই সব প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দিয়ে থাকি। সে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের খুবই পরিচিত: সেগুলি হল শিল্প-কেন্দ্র, দোকানপাট, কারখানা, মদের দোকান, হোটেল ও বেশ্যালয়। এ সব প্রতিষ্ঠানকে আমরা বহাল তবিয়তে থাকতে তো দেইই, এমন কি অনিবার্য বিবেচনায় তাদের উৎসাহিত করি, নিয়ন্ত্রিত করি।

'এই ভাবে আমরা শুধু একটি নয়, এ রকম লক্ষ লক্ষ লোকের জন্ম দেই এবং তারপর তাদের একজনকে পাকড়াও করে মনে করি যে খুব কাজ করলাম, আমাদের আর কিছু করবার নেই। আর এই ফাঁকিবাজীকে জিইয়ে রাখতে কী প্রচণ্ড প্রচেষ্টাই না আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।' কথাগুলি ভাবতে ভাবতে নেখ্‌লুদভ চারদিকে তাকিয়ে সব কিছু দেখতে লাগল: প্রকাণ্ড ঘর, ছবি, বাতি, চেয়ার, সাজ-পোষাক, পুরু দেয়াল, জানালা; সঙ্গে সঙ্গে তার আরও মনে পড়ে গেল এই মস্ত বড় বাড়ি ও ততোধিক বড় বিচার-ব্যবস্থার কথা: একদল পদস্থ কর্মচারি, করণিক, পাহারাদার, সংবাদ-আদান-প্রদানকারী, —শুধু এখানে নয়, সারা রুশিয়া জুড়ে; আর মোটা মাইনের বিনিময়ে তারা এমন একটা প্রহসনের নানা চরিত্রে অভিনয় করে যার দ্বারা কারও তিলমাত্র কল্যাণ সাধিত হয় না। সে মনে মনে বলল, 'এতে যে প্রচেষ্টার অপব্যয় হচ্ছে তার একশ' ভাগের এক ভাগও যদি এই সব সমাজ-পরিত্যক্ত মানুষগুলির জন্য ব্যয় করা হত, তাহলে কী না হতে পারত?'

ছেলেটির রুগ্ন ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে আরও ভাবতে লাগল, 'দারিদ্র্যের চাপে ছেলেটিকে যখন শহরে পাঠানো হয়েছিল তখন যদি কেউ করুণাপরবশ হয়ে তাকে কিছুটা সাহায্য করত, হয় তো তাহলেই যথেষ্ট করা হত। অথবা আরও পরবর্তীকালে কারখানায় বারো ঘণ্টা কাজের পরে সে যখন বড়দের দলে ভীড়ে গিয়ে মদের দোকানের পথ ধরত, তখন যদি কেউ এসে বলত, 'যেয়ো না সোনা; এটা ঠিক নয়', তাহলে হয় তো সে যেত না, পথভ্রষ্ট হত না, এবং খারাপ কাজ করত না।

'কিন্তু না; এই শিক্ষানবিশ ছেলেটি যখন বছরের পর বছর একটা অসহায় জন্তুর মত শহরে বাস করেছে, উকুন হবার ভয়ে ছোট করে চুল ছেঁটেছে, মজুরদের খবরাখবর পৌঁছে দিয়েছে, তখন করুণার হাত বাড়িয়ে কেউ তার কাছে আসে নি। উপরন্তু শহরে আসার পর থেকে বয়স্ক মজুর ও সঙ্গীদের কাছ থেকে শুধু একটা কথাই শুনেছে, এই জিনিসিই দেখেছে যে, যে ঠকায়,

মদ খায়, গালাগালি করে, অন্যকে ধোলাই দেয়, বিপথে চলে, সেই ভাল মানুষ।

'অস্বাস্থ্যকর পরিশ্রম, মদ্যপান ও লাম্পট্যের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে ছেলেটি স্বপ্নের মত বিমূঢ় অবস্থায় শহরের পথে পথে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন একটা চালামত ঘরে ঢুকে পড়ে এবং কারও কোন কাজে লাগবে না এ রকম কয়েকটা পুরনো মাদুর হাতিয়ে নেয়; আর এখানে আমরা, সম্পদশালী শিক্ষিত মানুষরা, যে সব কারণে ছেলেটি আজ এই অবস্থায় পৌচেছে তার প্রতিকারের কথা চিন্তা না করে ভাবছি যে তাকে শাস্তি দিলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

'ভয়ংকর! কে বলতে পারে এখানে কোন্‌টা বড়—নিষ্ঠুরতা না নির্বুদ্ধিতা। মনে হচ্ছে, এ দুটোই সবচেয়ে উঁচুতে মাথা তুলেছে।'

অন্য কিছুতে মনোযোগ না দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ এই সবই ভাবতে লাগল। সত্যকে প্রকাশিত হতে দেখে সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। সে বুঝতেই পারল না, এসব এতদিন তার চোখে পড়ে নি কেন, আর অন্য সকলেই বা এসব দেখতে পায় নি কেন।

অধ্যায়—৩৫

আদালতের বিরতিব সময় নেখ্‌ল্যুদভ বাইরে চলে গেল। আর ফিরবার ইচ্ছা নেই। ওদের যা ইচ্ছা করুক, এই ভয়ংকর বোকা-কাজের মধ্যে সে আর নেই।

ন্যায়াধীশের আপিসের খোঁজ করে সে সোজা তার কাছে চলে গেল। ন্যায়াধীশ ব্যস্ত আছেন এই ওজুহাতে চাকর তাকে ঢুকতে দিতে চাইল না। কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ তার কথায় কান না দিয়ে দরজার কাছে যেতেই একজন কর্মচারির সঙ্গে দেখা হল। সে একজন জুরি এবং তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে তার জরুরী কথা আছে এই বলে সে তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

তার পদবী ও ভাল পোষাক তার সহায়ক হোল। কর্মচারিটি তাকে তত্ত্বাবধায়কের কাছে নিয়ে গেল। নেখ্‌ল্যুদভ যে ভাবে ভিতরে ঢুকবার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল তাতে বিরক্ত হয়ে তত্ত্বাবধায়ক দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

ন্যায়াধীশ কড়া গলায় বলল, 'আপনি কি চান?'

'আমি একজন জুরি, আমার নাম নেখ্‌ল্যুভ; কয়েদী মাসলভার সঙ্গে দেখা করা আমার একান্ত দরকার।' নেখ্‌ল্যুদভ দৃঢ়তার সঙ্গে দ্রুতগতিতে কথাগুলি বলল। তার মনে হল, এমন একটা পথে সে পা ফেলতে যাচ্ছে যা তার সমস্ত জীবনের উপর চরম প্রভাব বিস্তার করবে।

ন্যায়াধীশ লোকটি ছোটখাট, রং ময়লা, ছোট কোঁকড়ানো চুল, উজ্জ্বল চোখ, বেরিয়ে আসা নীচের চোয়ালের উপর ঘন ছাঁটা দাড়ি।

সে শান্ত গলায় বলল, 'মাসলভা? হ্যাঁ, মনে পড়ছে। বিষপ্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু তাকে আপনি দেখতে চান কেন?' পরে প্রশ্নটাকে একটু নরম করবার জন্য বলল, 'আপনার কি দরকার সেটা না জেনে তো অনুমতি দিতে পারি না।'

নেখ্‌ল্যুদভ সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, 'একটা বিশেষ গুরুতর কারণে তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

চোখ তুলে নেখ্‌ল্যুদভকে ভাল করে দেখে নিয়ে ন্যায়াধীশ বলল, 'বটে?' তার মামলার শুনানী কি হয়ে গেছে?'

'গতকাল তার বিচার হয়ে গেছে, অন্যায়ভাবে সে চার মাস কঠোর সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। সে নির্দোষ।'

মাসলভার নির্দোষিতা সম্পর্কে নেখ্‌ল্যুদভের বক্তব্যে কান না দিয়েই ন্যায়াধীশ বলে উঠল, 'বটে? যদি কালই তার শাস্তি হয়ে থাকে, তাহলে তো সে কারাগারের প্রাথমিক হাজতে আছে—শাস্তি চূড়ান্তভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতে হবে। মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনেই সেখানে দেখা করতে দেওয়া হয়। আপনি বরং সেখানে খোঁজ করুন।

'কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে', কথা বলবার সময় নেখ্‌ল্যুদভের চোয়াল কাঁপতে লাগল; সে বুঝতে পারল, চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে।

কিছুটা অধৈর্য হয়ে ন্যায়াধীশ ভুরু তুলে বলল, 'করতেই হবে কেন?'

'কারণ সে নির্দোষ হলেও তাকে কঠোর দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে, আর সে দোষ আমার।' নেখ্‌ল্যুদভের গলার স্বর কাঁপতে লাগল; সে বুঝল, সে যা বলছে তা তার বলা ঠিক নয়।

'কেমন করে?' ন্যায়াধীশ প্রশ্ন করল।

'আমিই তাকে ভুলিয়ে পাপের পথে নামিয়ে তার আজকের এই দশা করেছি। আমারই জন্য সে যা হয়েছে তা না হলে আজ তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসত না।'

'সে যাই হোক, তার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের কি সম্পর্ক আমি তো বুঝতে পারছি না।'

'সম্পর্ক এই: আমি তার সঙ্গে যেতে চাই, এবং······তাকে বিয়ে করতে চাই', নেখ্‌ল্যুদভ কোন রকমে জবাব দিল; তার চোখে তখন জল এসে গিয়েছে।

'সত্যি! বলেন কি মশাই!' ন্যায়াধীশ বলে উঠল। 'এ তো এক বিচিত্র মামলা। আচ্ছা, আপনি তো ক্রাস্নপারস্ক পল্লী পরিচালন সংস্থার একজন সদস্য?' নেখ্‌ল্যুদভের নাম আগেও শুনেছে স্মরণ হওয়ায় ন্যায়াধীশ প্রশ্ন করল।

রাগে লাল হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ জবাবে বলল, 'মাপ করবেন, তার সঙ্গে আমার অনুরোধের কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না।'

প্রায়-অদৃশ্য একটুখানি মুচকি হেসে সপ্রতিভভাবেই ন্যায়াধীশ বলল, 'নিশ্চয় না। শুধু আপনার ইচ্ছাটা খুবই অসাধারণ, আর তাই সচরাচর দেখাও যায় না।'

'দেখুন, আমি অনুমতিটা পেতে পারি কি ?'

'অনুমতি ? হ্যাঁ, এখনই আপনাকে একখানা প্রবেশ-পত্র দিচ্ছি। আপনি বসুন।'

সে উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে একখানা চিঠি লিখতে বসল। 'দয়া করে বসুন।'

নেখ্‌ল্যুদভ দাঁড়িয়েই রইল।

প্রবেশের অনুমতি-পত্র লিখে নেখ্‌ল্যুদভের হাতে দিয়ে ন্যায়াধীশ সকৌতূহলে তার দিকে তাকাল।

'আমি আরও জানাচ্ছি, দায়রার বিচারে আমি আর অংশ গ্রহণ করতে পারব না।'

'সেক্ষেত্রে, আপনি তো জানেন, আদালতকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে।'

'আমার কারণ হল, সব বিচারকেই আমি শুধু অদরকারীই মনে করি না, নীতিবির্গর্হিত বলেও মনে করি।'

'হ্যাঁ', ন্যায়াধীশ বলল; তার মুখে সেই একই প্রায়-অদৃশ্য হাসি; সে হাসি যেন বলতে চায়, এ ধরনের ঘোষণা অনেক শুনেছি, এতে আমি মজাই পেয়ে থাকি। 'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, ন্যায়াধীশ হিসাবে এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না। সুতরাং আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আদালতে আবেদন করুন; সে আবেদন সঙ্গত কি অসঙ্গত তা আদালতই স্থির করবে, আর যদি অসঙ্গত বিবেচিত হয় তাহলে একটা জরিমানা ধার্য হবে। কাজেই আদালতে আবেদন করুন।'

নেখ্‌ল্যুদভ রেগে বলল, 'আমার ঘোষণা আমি করেছি, আর কোথাও আবেদন করব না।'

'ঠিক আছে। তাহলে শুভ অপরাহ্ণ', যেন এই বিচিত্র আগন্তুকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই ন্যায়াধীশ মাথা নেড়ে কথাগুলি বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই আদালতের জনৈক সদস্য ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ঘরে কে এসেছিল ?'

'নেখ্‌ল্যুদভ; আপনি তো জানেন, সেই যে লোকটা ক্রাস্‌নপারস্ক পল্লী সভাতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বলত, ভাবুন ব্যাপারটা! সে একজন জুরি, আর কয়েদীদের মধ্যে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত একটি স্ত্রীলোক বা মেয়ে আছে যাকে সে নাকি ফুসলিয়ে ঘর থেকে বের করেছিল, আবার এখন তাকেই

বিয়ে করতে চায়।'

'কী যে বলেন!'

'সে তো সেই কথাই বলে গেল। আর সে কী উত্তেজনা তার।'

'আজকালকার যুবকদের মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে।'

'আরে, সে তো আর সে রকম যুবক নয়।'

'তা নয়। কিন্তু আপনাদের সেই বিখ্যাত ইভাশেংকভ কি রকম ক্লান্তিকর ছিল ভাবুন। লোককে পরিশ্রান্ত করেই সে জিতে যেত। অনবরত বকর বকরের যেন আর শেষ নেই।'

'আঃ, এ ধরনের লোকের মুখ বন্ধ করা উচিত, নইলে তারা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে।'

অধ্যায়—৩৬

ন্যায়াধীশের কাছ থেকে নেখ্‌ল্যুদভ সোজা চলে গেল প্রাথমিক হাজতে। কিন্তু সেখানে মাসলভা বলে কেউ নেই। ইন্সপেক্টর জানাল, পুরনো অস্থায়ী কারাগারে থাকতে পারে। কাজেই নেখ্‌ল্যুদভ সেখানেই চলল। দুটো কারাগারের মাঝখানে দূরত্ব অনেকটা। পুরনো কারাগারে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিষাদ-ঢাকা প্রকাণ্ড বাড়িটার দরজায় পৌঁছতেই শাস্ত্রী বাধা দিয়ে ঘণ্টা বাজাল। জেলর বেরিয়ে এলে নেখ্‌ল্যুদভ অনুমতি-পত্রটা তাকে দেখাল। কিন্তু সে বলল, ইন্সপেক্টরের অনুমতি ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হবে না। নেখ্‌ল্যুদভ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেল, অনেকটা দূরে কে যেন পিয়ানোতে একটা জটিল সুর জোর করে বাজাচ্ছে। চোখে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটা দো-আসলা চাকরানি দরজাটা খুলতেই শব্দটা হারিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার কানে বাজতে লাগল। লিস্‌জ্‌তের একটা সুর; শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে; তবে কিছুটা দূর পর্যন্ত বেশ ভালই বাজাচ্ছে। সে পর্যন্ত গিয়েই আবার গোড়া থেকে শুরু করছে। নেখ্‌ল্যুদভ জানতে চাইল, ইন্সপেক্টর আছে কি না। চাকরানি জানাল, নেই।

'কখন ফিরবেন?'

বাজনাটা থেমে গিয়ে আবার শুরু হল; এবার আরও জোরে, আর বেশ ভাল হলেও সেই একই জায়গা পর্যন্ত।

'আমি জিজ্ঞেস করে আসছি,' মেয়েটা চলে গেল।

পুরোদমে চলতে চলতে বাজনাটা হঠাৎ থেমে গেল; তার বদলে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল:

'বলে দাও, বাপি বাড়ি নেই, আজ ফিরবে না; বাইরে গেছে। কেন যে সব আসে?' দরজার ওপাশ থেকে মেয়েলি গলা শোনা গেল। আবার

বাজনাটা সশব্দে থেমে গেল। চেয়ারটা ঠেলে পিছনে সরিয়ে দেবার শব্দ শোনা গেল। স্পষ্টই বোঝা গেল, বিরক্ত পিয়ানো-বাদিকা অসময়ের অতিথিকে বকুনি দিতেই আসছে।

'বাপি বাড়ি নেই,' ঘরে ঢুকে কড়া গলায় কথা বলল একটি ফ্যাকাসে রোগীর মত দেখতে মেয়ে। পরিপাটি করে চুল বাঁধা, চোখের নীচে কালির ছাপ। কিন্তু একটি সুসজ্জিত যুবককে দেখে সুর নরম করল।

'দয়া করে ভিতরে আসুন।......আপনার কি দরকার?'

'এই কারাগারের একজন কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক বন্দী?'

'না, তা নয়। আমার সঙ্গে ন্যায়াধীশের অনুমতি-পত্র আছে।'

'দেখুন, আমি তো জানি না; আর বাপিও বাড়ি নেই। কিন্তু আপনি ভিতরে আসুন, অথবা সহকারীর সঙ্গে কথা বলুন। তিনি এখন আপিসেই আছেন। সেখানে দরখাস্ত করতে পারেন। আপনার নাম?'

'ধন্যবাদ,' প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু এই কথাটি বলেই নেখ্‌লয়ুদভ চলে গেল।

দরজা বন্ধ হতে না হতেই সেই একই সজীব সুর আবার বেজে উঠল; স্থান এবং পাত্র—দুয়ের পক্ষেই সুরটা বেমানান।

উঠোনেই কুঁচির মত গোঁফওয়ালা একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা হতে সে সহকারী ইন্সপেক্টরের খোঁজ করল। লোকটিই সহকারী। অনুমতি-পত্রটা দেখে সে জানাল, প্রাথমিক কারাগারের অনুমতি-পত্র বলে সে তাকে ঢুকতে দিতে পারবে না। তাছাড়া, তখন অনেক দেরীও হয়ে গেছে।

'দয়া করে কাল আবার আসুন। কাল দশটায় সকলকেই ঢুকতে দেওয়া হবে। তখন আসুন। ইন্সপেক্টরও থাকবেন। তখন সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট ঘরেও দেখা করতে পারেন। অথবা ইন্সপেক্টর অনুমতি দিলে আপিসেও দেখা করতে পারেন।'

কাজেই সেদিন দেখা না করেই নেখ্‌লয়ুদভ বাড়ি ফিরে গেল। মাসলভার সঙ্গে সাক্ষাতের আশায় সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আদালতের কথা একবারও তার মনে হল না, ন্যায়াধীশের সঙ্গে ও সহকারী ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যে কথাগুলি হয়েছিল তাই বার বার মনে পড়তে লাগল।

সে যে মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছে, ন্যায়াধীশকে সব কথা খুলে বলেছে, তাকে দেখতে দুটো কারাগারে গেছে, এই চিন্তা তাকে এতই উত্তেজিত করে তুলেছিল যে শান্ত হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল। বাড়ি পৌঁছে সে তৎক্ষণাৎ দিন-পঞ্জীটা বের করল। সেটা অনেকদিন ছোঁয়া হয় নি। কয়েকটি পংক্তি পড়ে সে লিখতে শুরু করল:

'দু বছর আমি দিন-পঞ্জীতে কিছু লিখি নি; ভেবেছিলাম এ ছেলেমানুষি আর কখনও করব না। কিন্তু এ তো ছেলেমানুষি নয়, এ হল নিজের সঙ্গে কথা বলা, প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে প্রকৃত দেবসত্তা থাকে তার সঙ্গে কথা বলা। এতদিন সে সত্তা ঘুমিয়ে ছিল, তাই কথা বলারও কেউ ছিল না। আদালতে জুরি হয়ে উপস্থিত হবার পর ২৮শে এপ্রিলের একটি অসাধারণ ঘটনা আমাকে জাগিয়ে তুলেছে। কয়েদীর কাঠগড়ায় তাকে দেখলাম, যে কাতয়ুশাকে আমি পাপের পথে নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে দেখলাম কয়েদীর পোষাকে। একটা অদ্ভুত ভুলে এবং আমার নিজের দোষে তার কঠোর দণ্ডের বিধান হয়েছে। এই মাত্র ন্যায়াধীশের কাছে এবং কারাগারে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঢুকতে পারি নি। কিন্তু আমি সংকল্প করেছি, তার সঙ্গে দেখা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব, তার কাছে সব কথা খুলে বলব, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব—দরকার হলে তাকে বিয়ে করব। ঈশ্বর আমার সহায় হোন। আমার আত্মা শান্তিলাভ করেছে; আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে।'

অধ্যায়—৩৭

সেদিন রাতে মাসলভা খোলা চোখে অনেকক্ষণ জেগে রইল। পুরোহিতের মেয়েটি দরজার কাছে পায়চারি করে চলেছে। সেদিকে তাকিয়ে মাসলভা গভীর চিন্তায় ডুবে গেল।

সে ভাবতে লাগল, সাখালিনে গিয়ে কোন মতেই কোন কয়েদীকে সে বিয়ে করবে না, বরং কারা-অফিসার, বা করণিক, বা রক্ষী, এমন কি তার কোন সহকারীর সঙ্গে যেমন করেই হোক একটা ব্যবস্থা করে নেবে। 'সকলেই কি সে রকম করে না? শুধু শুকিয়ে গেলে চলবে না, তাহলেই মরণ।'

অনেকের কথাই তার মনে পড়ল। অ্যাডভোকেট, প্রেসিডেণ্ট, আরও যাদের যাদের সঙ্গে আদালতে তার দেখা হয়েছিল সকলকেই মনে পড়ল। সঙ্গিনী বার্থা কারাগারে দেখা করতে এসে সেই ছাত্রটির কথা বলে গেছে যে কিতায়েভার কাছে থাকার সময় তাকে 'ভালবাসত'; সে নাকি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছে। কত দুঃখ করেছে। অনেকের কথাই তার মনে পড়ল, শুধু মনে পড়ল না নেখ্‌ল্যুদভের কথা। শৈশব ও যৌবনের কথা, নেখল্যুদভের জন্য ভালবাসার কথা—সে সব কিছুই সে আর মনে করতে চায় না। সে স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক। সে স্মৃতি রয়েছে তার অন্তরের গভীরে, সব ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাকে সে ভুলে গেছে, কখনও তাকে স্মরণ করে না, স্বপ্নেও দেখে না। আজ আদালতেও সে তাকে চিনতে পারে নি; যখন তাকে শেষবারের মত দেখেছিল তখন তার পরনে ছিল সামরিক পোষাক, দাড়ি ছিল না, একটি ছোট গোঁফ ছিল শুধু, মাথার চুল ছিল ঘন, কোঁকড়ানো, ছোট করে ছাঁটা; আর

এখন তার অনেক বয়স বেড়েছে, মুখে দাড়ি গজিয়েছে। কিন্তু চিনতে না পারার আসল কারণ সে কখনও তার কথা ভাবে না। যে ভয়ংকর কালো রাতে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে যাবার পথে এই রেলপথ দিয়ে গেলেও সে পিসীদের সঙ্গে দেখা করতে আসে নি, সেই রাতেই তার স্মৃতিকে সে কবরে ঢেকে দিয়েছে।

তখন কাতয়ুশা জানত সে অন্তঃস্বত্তা। যতদিন তার আশা ছিল নেখ্‌ল্যুদভ ফিরে আসবে ততদিন গর্ভের সন্তানকে তার বোঝা মনে হয় নি, বরং সে যখন তার ভিতরে নড়াচড়া করত তখন সে বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়ত। কিন্তু সেই রাতে সব কিছু বদলে গেল; শিশুটি হয়ে উঠল শুধুই বোঝা।

পিসীরা আশা করেছিল নেখ্‌ল্যুদভ আসবে। ফিরে যাবার পথে সে যেন তাদের দেখে যায় সে কথাও জানিয়েছিল; কিন্তু সে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিল যে একটা নির্দিষ্ট দিনে পিতাসবার্গে উপস্থিত থাকতে হবে বলে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ খবর শুনে কাতয়ুশা স্থির করল, স্টেশনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। রাত দু'টোয় ট্রেনটা যাবে। দুই বৃদ্ধাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে রাঁধুনির ছোট মেয়ে মাশ্‌কাকে তার সঙ্গে যেতে রাজী করিয়ে একজোড়া পুরনো বুট পরে, মাথায় একটা শাল জড়িয়ে কোনমতে পোষাক পরে স্টেশনে ছুটল।

হেমন্তের অন্ধকার বৃষ্টি-ঝরা ঝড়ো রাত। একবার বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে, আবার থেমে যাচ্ছে। মাঠের ভিতরকার পথ তবু নজরে আসে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকার। রাস্তাটা কাতয়ুশার পরিচিত, তবু সে পথ হারিয়ে ফেলল। ট্রেনটা স্টেশনে তিন মিনিট থামে। সে আশা করেছিল তার আগেই স্টেশনে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু যখন সে স্টেশনে পৌঁছল তখন গাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টাও বেজে গেছে। ছুটতে ছুটতে প্লাটফর্মে ঢুকে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরার জানালা দিয়ে কাতয়ুশা তাকে দেখতে পেল। কামরাটা বেশ আলোকিত। ভেলভেট-মোড়া আসনে মুখোমুখি বসে দুজন অফিসার তাস খেলছে, মাঝখানের টেবিলে দুটো মোমবাতি জ্বলছে। আটো ব্রীচেস ও সাদা শার্ট গায়ে একটা আসনের হাতলের উপর হেলান দিয়ে বসে কি নিয়ে যেন সে হাসাহাসি করছে। তাকে চিনতে পেরেই কাতয়ুশা তার অবশ হাত দিয়ে কামরার জানালায় টোকা দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তৃতীয় ঘণ্টা বেজে উঠল; পিছন দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে কামরাগুলো একের পর এক সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। একজন খেলুড়ে তাস হাতে নিয়ে উঠে বাইরে তাকাল। কাতয়ুশা আবার টোকা দিয়ে জানালার গায়ে মুখটা চেপে ধরল। গাড়িটা তখন চলছে, সেও ভিতরে চোখ রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। অফিসারটি জানালাটা নামিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নেখ্‌ল্যুদভ তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেটা নামাতে

লাগল। ট্রেনের গতি বাড়তে থাকায় সেও দ্রুত হাঁটতে লাগল। ট্রেনের গতি আরও বাড়ল, জানালাটাও নামানো হল, আর সেই মুহূর্তে গার্ড তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠল। কাতয়ুশা প্লাটফর্মের ভিজে তক্তার উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্লাটফর্মের শেষ প্রান্তে এসে সিঁড়িতে পা লাগতেই পড়ে গেল। আবার উঠেই ছুটতে লাগল। প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলো তাকে পেরিয়ে গেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোও দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোও দ্রুততর গতিতে পার হয়ে গেল। সে তবু ছুটছে। পিছনে আলো লাগানো শেষ কামরাটাও যখন তাকে পেরিয়ে গেল তখন সে ইঞ্জিনের জল-নেবার জলাধারটার কাছে পৌঁছে গেছে। প্রকাণ্ড খোলা হাওয়ায় তার শালটা উড়ছে, স্কার্টটা পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এক সময়ে শালটা মাথা থেকে উড়ে গেল, কিন্তু সে তবু ছুটতে লাগল।

পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে ছোট মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, 'কাতেরিনা মিখাইলভ্‌না তোমার শাল উড়ে গেল!'

কাতয়ুশা থামল, পিছন ফিরে দুই হাত দিয়ে শালটাকে চেপে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

'চলে গেল!' সে আর্তনাদ করে উঠল।

'ভেলভেটের হাতল-লাগানো চেয়ারে আলোয় উদ্ভাসিত কামরার মধ্যে বসে সে হাসি-ঠাট্টা করছে আর মদ খাচ্ছে, আর আমি এখানে কাদায়, অন্ধকারে, বাতাসে, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। নিজের মনেই সে কথাগুলি বলল। তারপর মাটিতে বসে পড়ে এমন ভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল যে মেয়েটা ভয় পেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাড়ি চল'।

তার কথায় কান না দিয়ে কাতয়ুশা নিজের ভাবনাই ভাবতে লাগল; 'ট্রেন যখন চলে তখন তার নীচে—তাহলেই তো সব শেষ।'

ঐ পথই বেছে নেবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে এমন সময়—চরম উত্তেজনার পরে শান্ত হয়ে এলে সচরাচর যেমন ঘটে থাকে—সে, তার ভিতরকার সন্তান—তার নিজের সন্তান কাঁপতে কাঁপতে একটু ঠেলা দিল, ধীরে ধীরে হাত-পা ছড়ালো, তারপর আবার যেন সরু, নরম, ধারালো কিছু দিয়ে তাকে ঠেলা দিল। অকস্মাৎ একমুহূর্ত আগে যে যন্ত্রণায় বেঁচে থাকাটাই তার কাছে অসম্ভব মনে হয়েছিল, নেখ্‌ল্যুদভের প্রতি যত কিছু তিক্ততা, আর মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনা—সব চলে গেল। সে ধীরে ধীরে শান্ত হল, উঠে দাঁড়াল, শালটা মাথায় জড়িয়ে বাড়ির পথ ধরল।

জলে ভিজে, কাদা মেখে, পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরল। যে পরিবর্তন তাকে আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছে তার মনের মধ্যে সেদিন থেকেই তা কাজ করতে শুরু করল। সেই ভয়ংকর রাত থেকেই সে সৎ বৃত্তিতে বিশ্বাস

হারাল। এত দিন সে তো সৎ বৃত্তিতে বিশ্বাস করত আর ভাবত যে অন্যরাও তাতে বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই রাতের পর থেকে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে কেউ বিশ্বাস করে না, ঈশ্বর ও তাঁর বিধান সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে সব ফাঁকি, সব অসত্য। যাকে সে ভালবাসত আর যে তাকেও ভালবাসত—হ্যাঁ, সে তা জানত—সে আজ তাকে ভোগ করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তার ভালবাসাকে অসম্মান করেছে। অথচ যত লোককে সে চিনত তাদের মধ্যে সেই ছিল শ্রেষ্ঠ। আর সবাই তো তার চেয়েও খারাপ। তার পর থেকে যা কিছু ঘটল প্রতিটি পদক্ষেপে তাতে তার এই বিশ্বাসই দৃঢ়তর হতে থাকল। তার পিসীদের, সেই ধর্মাত্মা বৃদ্ধ মহিলাদের সে যখন আর আগের মত সেবাযত্ন করতে পারত না তখন তারা তাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর থেকে যাদের সঙ্গেই তার দেখা হয়েছে তার মধ্যে স্ত্রীলোকরা তাকে ব্যবহার করেছে উপার্জনের যন্ত্র হিসাবে, আর বৃদ্ধ পুলিশ-অফিসার হতে শুরু করে কারাগারের রক্ষী পর্যন্ত সব পুরুষই তাকে ভোগের সামগ্রি বলে মনে করেছে। পৃথিবীতে কেউই সুখ ছাড়া আর কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না। যে বৃদ্ধ লেখকের সঙ্গে সে স্বাধীন জীবনের দ্বিতীয় বছরটা কাটিয়েছিল সেই তার এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছে। সে তাকে সরাসরিই বলেছে যে এতেই জীবনের সুখ; একেই সে বলেছে কাব্য ও নন্দনতত্ত্ব।

প্রত্যেকেই নিজের জন্য, নিজের সুখের জন্য বেঁচে থাকে; ঈশ্বর ও সততা নিয়ে যত কথা সব ফাঁকি। মাঝে মাঝে যখনই তার মনে সন্দেহ জেগেছে, যখনই সে অবাক হয়ে ভেবেছে যে পৃথিবীটা এত খারাপভাবে সৃষ্টি হয়েছে কেন—যেখানে সকলেই পরস্পরকে আঘাত করে এবং দুঃখ দেয়, তখনই তার মনে হয়েছে এসব কথা না ভাবাই ভাল। মন খারাপ হলেই সে ধূমপান করতে বা মদ খেতে পারে, বা কোন পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা জমাতে পারে, বাস, তাহলেই সে ভাব কেটে যাবে।

অধ্যায়—৩৮

রবিবার ভোর পাঁচটায় কারাগারের মেয়েদের ওয়ার্ডের করিডরে হুইস্‌ল বেজে উঠল। করাব্‌ল্যভা আগেই জেগেছিল। মাসলভাকেও ডেকে তুলল।

দালানে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন কয়েদী ঘরে ঢুকল। তাদের পরণে কুর্তা ও ধূসর ট্রাউজার। তাও গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছে নি। বেজার মুখে তারা দুটো দুর্গন্ধভরা পিপে তুলে সেলের বাইরে নিয়ে গেল। মেয়েরা সব করিডরের কলে হাত-মুখ ধুতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হৈ-হল্লা, চেঁচামেচি, গালিগালাজ শুরু হয়ে গেল।

একটা মেয়ের পিঠে থাপ্পড় কসিয়ে বুড়ো কারারক্ষী চেঁচিয়ে বলল, 'তোরা

কি সব নির্জন সেলে যেতে চাস? নে, তাড়াতাড়ি কর্। প্রার্থনা-সভায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে নে।'

মাসলভা কোন রকমে চুল বেঁধে পোষাক পরতেই ইন্সপেক্টর তার সহকারীদের নিয়ে ঘরে ঢুকল।

একজন কারারক্ষী চেঁচিয়ে বলল, 'সবাই পরিদর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়।'

সব কয়েদীরা সেল থেকে বেরিয়ে এসে দুই সারিতে করিডরে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই তার সামনের কয়েদীর কাঁধে হাত রাখল। সবাইকে গুণতি করা হল।

পরিদর্শনের পরে নারী-রক্ষী কয়েদীদের গীর্জায় নিয়ে চলল। বিভিন্ন সেল থেকে আসা শতাধিক কয়েদীর এক সারির মাঝামাঝি জায়গায় ছিল মাসলভা ও ফেদসিয়া। সকলেরই পরনে সাদা স্কার্ট, সাদা কুর্তা, মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। শুধু কয়েকজনের পরনে তাদের নিজেদের রঙিন পোষাক। যে সব কয়েদী সাইবেরিয়ায় দণ্ডাদেশ ভোগ করতে যাচ্ছে এরা হল তাদেরই স্ত্রী; ছেলেমেয়েদের নিয়ে এরাও স্বামীর সঙ্গে যাবে। সিঁড়ির সবগুলো ধাপ জুড়ে চলেছে কয়েদীদের শোভাযাত্রা। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ মোড় ঘুরে মাসলভা দেখতে পেল, তার শত্রু বচকভা তারই সামনে চলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মেয়েরা কথা বলা বন্ধ করল। ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মাথা নুইয়ে তারা ফাঁকা গীর্জাটায় প্রবেশ করল। সোনালি রং করা গীর্জাটা ঝকঝক করছে। তাদের জায়গা ডান দিকে। পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে ওরা ভীড় করে ভিতরে ঢুকল।

মেয়েদের পরে এল ধূসর আলখাল্লা পরা পুরুষরা: যারা সাইবেরিয়া নির্বাসন দণ্ডের অপেক্ষায় আছে, যারা কারাগারে বন্দী-জীবন কাটাচ্ছে, আর যারা কম্যুন থেকে নির্বাসিত হয়েছে। তারা ভীড় করল গীর্জার বাঁ দিকে ও মাঝখানে।

যারা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে তাদের আগেই গীর্জায় আনা হয়েছিল। তারা দাঁড়িয়ে আছে উপরের গ্যালারির এক পাশে। প্রত্যেকেরই অর্ধেকটা মাথা কামানো। পায়ের শিকলের ঝন্ঝন্ শব্দই তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। প্রাথমিক হাজতে যারা রয়েছে তারা দাঁড়িয়ে আছে গ্যালারির অপর পাশে। তাদের পায়ে শিকল নেই, মাথাও কামানো নয়।

জনৈক ধনী ব্যবসায়ী কয়েক লক্ষ রুবল খরচ করে কারাগারের গীর্জাটাকে নতুন করে তৈরি করিয়ে দিয়েছে, নানাভাবে সুসজ্জিত করেছে। উজ্জ্বল রঙে ও সোনালি কারুকার্যে গীর্জাটা ঝলমল করছে।

অধ্যায়—৩৯

প্রার্থনা-সভা শুরু হল।

সভার কর্ম-পদ্ধতি নিম্নরূপ। সোনালি কাপড়ের বিচিত্র এক অস্বস্তিকর জোব্বা পরে পুরোহিত একখণ্ড রুটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা পাত্রে সাজিয়ে রাখে এবং নানা রকম নাম ও প্রার্থনা উচ্চারণ করতে করতে সেগুলোকে এক পেয়ালা মদে ডুবিয়ে দেয়।

এই অনুষ্ঠানের মূল কথাটি হল: পুরোহিত যে রুটির টুকরোগুলোকে কেটে মদে ডুবিয়ে রাখে, একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রার্থনা ও ব্যবস্থাপনার ফলে সেগুলি ঈশ্বরের মাংস ও রক্তে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনাটা আবার অনেকটা এই রকম: সোনালি কাপড়ের জোব্বা পরিহিত পুরোহিত নিয়মিতভাবে তার দুটি হাত উর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং হাটু ভেঙে বসে টেবিলটাকে ও তার উপরে যা আছে সব কিছুকে চুম্বন করবে; কিন্তু তার প্রধান কাজ হল, একখণ্ড কাপড়ের দুটো কোণ ধরে সেটাকে রূপোর পাত্র ও সোনার পেয়ালার উপর ধীরে ধীরে ছন্দময় ভঙ্গীতে দোলাতে থাকবে। সকলেই বিশ্বাস করে, এই অবস্থায় রুটি ও মদ মাংসও রক্তে পরিণত হয়ে যায়; কাজেই অনুষ্ঠানের এই অংশটাকেই যথাসাধ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালন করা হয়।

একটা সোনালি পর্দা দিয়ে গীর্জার এক অংশকে বাকি জায়গা থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। এবার পুরোহিত পর্দার অন্তরাল থেকে চীৎকার করে বলল, 'এবার ভাগ্যবতী, অতি পবিত্র, পরমারাধ্যা ঈশ্বর-জননীর স্তব-গান।' অমনি সমবেত গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হল, যিনি কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে খৃস্টকে জন্ম দিয়েছেন, আর সেই হেতু যিনি বিদ্যাধরদের চাইতে অধিক সম্মান এবং দেবদূতদের চাইতে অধিক গৌরবের অধিকারিণী, সেই কুমারী মেরির জয় হোক। তার পরেই রূপান্তর-পর্ব সমাধা হল বলে ধরে নেওয়া হল এবং পুরোহিত পাত্রের উপর থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে নিয়ে মাঝখানের রুটির টুকরোটাকে চার ভাগে কেটে সেটাকে প্রথমে মদের মধ্যে এবং পরে নিজের মুখে ফেলে দিল। ধরে নেওয়া হল যে, সে ঈশ্বরের মাংসের একটি টুকরো খেল এবং তাঁর রক্তের খানিকটা পান করল। তারপর সে পর্দার মাঝখানের দরজাটা খুলে সোনার পেয়ালাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল এবং যারা যারা ঈশ্বরের মাংস ও রক্তের স্বাদ পেতে চায় তাদের আমন্ত্রণ জানাল।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে সে ইচ্ছা প্রকাশ করল।

তাদের নাম জিজ্ঞাসা করবার পরে পুরোহিত একখানি চামচের সাহায্যে খুব সাবধানে এক টুকরো মদে ভেজানো রুটি পেয়ালা থেকে বের করে একটা ছেলের মুখের ভিতর পুরে দিল। একে একে সব শিশুর বেলায়ই তাই করল,

আর ডিয়েকন নিজে শিশুদের মুখ মুছিয়ে দিয়ে এই মর্মে গান করতে লাগল যে শিশুরা ঈশ্বরের মাংস খেয়েছে এবং রক্ত পান করেছে। তারপর পুরোহিত পেয়ালাটা নিয়ে পুনরায় পর্দার আড়ালে চলে গেল। সেখানে বাকি সবটা রক্ত পান করে এবং ঈশ্বরের মাংসের বাকি টুকরোগুলি খেয়ে জিভ দিয়ে সযত্নে গোঁফটা চেটে, মুখ ও পেয়ালাটা ধুয়ে খুশি মনে বাছুরের চামড়ার জুতোর তলায় শব্দ তুলে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

খৃস্টীয় অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ এখানেই শেষ হল; কিন্তু হতভাগ্য কয়েদীদের কল্যাণ কামনায় পুরোহিতের সঙ্গে আরও একটু যোগ করল। যে ঈশ্বরকে সে এইমাত্র ভক্ষণ করেছে তারই প্রতীকস্বরূপ, এক ডজন মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত একটি খোদাই-করা সোনালি মূর্তির (তার মুখ ও হাত কৃষ্ণবর্ণ) সামনে উপস্থিত হয়ে পুরোহিত বিচিত্র বেসুরো গলায় নিম্নলিখিত কথাগুলি আবৃত্তি করতে বা গাইতে লাগল:

'মধুরতম যীশু, শহীদদের দ্বারা বন্দিত যীশু, সর্বশক্তিমান সম্রাট: হে আমার পরিত্রাতা যীশু, আমাকে রক্ষা কর। সর্বসুন্দর যীশু, যে তোমাকে পরিত্রাতা যীশু বলে ডাকে তার প্রতি করুণা কর। মানবদরদী যীশু, সব সন্তদের, সব ভক্তদের তুমি রক্ষা কর, তাদের স্বর্গের আনন্দ-আস্বাদনের উপযুক্ত করে তোল।'

তারপর সে থামল, নিঃশ্বাস টেনে নিল, বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, এবং ভূমি প্রণত হল, অমনি সকলেই—ইন্সপেক্টর, কারারক্ষীরা এবং কয়েদীরা—তাই করল; উপর থেকে তাদের শিকলের ঝনঝন শব্দ অবিরাম ধ্বনিত হতে লাগল।

যে ভাইরা বিপথগামী হয়েছে তাদের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের জন্য আয়োজিত খৃস্টীয় অনুষ্ঠান এইভাবে শেষ হল।

অধ্যায়—৪০

পুরোহিত ও ইন্সপেক্টর থেকে আরম্ভ করে মাসলভা পর্যন্ত কেউই কিন্তু এই সত্যটা উপলব্ধি করল না যে, যে যীশুর নাম পুরোহিত আজ বহুবার উচ্চারণ করল, এই সব বিচিত্র ভাষায় যার প্রশংসা সে করল, সেই যীশু যে সব কাজকে নিষিদ্ধ করে গেছে, এখানে আজ তাই করা হল: এই অর্থহীন বাগাড়ম্বর, রুটি ও মদকে কেন্দ্র করে এই নিন্দনীয় মন্ত্রোচ্চারণ—এসব যীশু যে শুধু নিষেধ করে গেছেন তাই নয়, যীশু স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, কোন মানুষ অন্য মানুষকে প্রভু বলে মানবে না, বা গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করবে না; যীশু সকলকে বলেছেন নির্জনে প্রার্থনা করতে; মন্দির নির্মাণ করতে নিষেধ করে বলেছেন যে মন্দির ধ্বংস করতেই তাঁর আবির্ভাব; মানুষ প্রার্থনা করবে মন্দিরে নয়, অন্তরের মধ্যে,

আর সবচেয়ে বড় কথা, যীশু যে শুধু মানুষকে বিচার করতে, কারারুদ্ধ করতে, যন্ত্রণা দিতে, দণ্ড দিতে নিষেধ করেছেন তাই নয়, সর্বপ্রকার হিংসাকে নিষিদ্ধ করে যীশু বলেছেন যে, বন্দীদের মুক্তি বিধান করতেই তাঁর আগমন।

অধিকাংশ কয়েদী বিশ্বাস করে, এই সব সোনালি মূর্তি, এই সব জামা, মোমবাতি, পেয়ালা, ক্রুশ-চিহ্ন, 'মধুরতম যীশু' ও 'করুণা কর' প্রভৃতি দুর্বোধ্য শব্দের পুনরাবৃত্তি—এদের মধ্যে এমন একটা রহস্যময় শক্তি আছে যার সাহায্যে এ জন্মে এবং পরজন্মে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। এই বিশ্বাসকে যারা আঁকড়ে ধরে আছে তাদের প্রতি কতদূর প্রতারণা করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে খুবই অল্প কয়েকটি লোক, আর বুঝতে পারে বলেই তারা প্রাণ খুলে হাসে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই প্রার্থনা, জমায়েত ও মোমবাতির সাহায্যে বাঞ্ছিত ফল লাভের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলে প্রত্যেকেই মনে করে যে তার অসাফল্য একান্তই আকস্মিক, শিক্ষিত লোক ও আর্কবিশপদের দ্বারা সমর্থিত এই সংগঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়—এ জীবনের জন্য যদি নাও হয়, পরবর্তী জীবনের জন্যও বটে।

মাসলভাও তাই বিশ্বাস করে। অন্য সকলের মতই তার মনে জাগে অনুরাগ ও অস্পষ্টতার একটা মিশ্র অনুভূতি। প্রথমে সে রেলিংকয়ের পিছনে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। পরে সে ও ফেদসিয়া সামনের দিকে এগিয়ে গেলে তারা ইন্সপেক্টরের পিছনে রক্ষীদের মাঝখানে একটি ছোটখাট চাষীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার মুখে হাল্কা দাড়ি, মাথায় বেশ চুল। সে ফেদসিয়ার স্বামী, একদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে ছিল। অনুষ্ঠানের সময় মাসলভা তাকেই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল, আর ফেদসিয়ার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে লাগল। অন্য সবাই যখন মাথা নুইয়ে ক্রুশ-চিহ্ন করল, একমাত্র তখনই সেও মাথা নুইয়ে ক্রুশ-চিহ্ন করতে লাগল।

অধ্যায়—৪১

নেখ্‌লুয়্‌দভ খুব ভোরে বাড়ি থেকে বের হল। গ্রাম থেকে একটি চাষী পাশের পথ দিয়ে যেতে যেতে তার ব্যবসায়সুলভ ভঙ্গীতে হাঁক দিচ্ছিল—'দুধ! দুধ! দুধ!'

আগের দিন বসন্তের প্রথম বৃষ্টি পড়েছিল; তাই যেখানে রাস্তা বাঁধানো নয়—সেখানেই সবুজ ঘাস গজিয়েছে। বাগানের বার্চ গাছগুলিকে সবুজ তুলোয় ছাওয়া বলে মনে হচ্ছে, বার্চ-চেরি ও পপলার গাছগুলি লম্বা সুগন্ধি পাতা মেলেছে, আর দোকান-ঘর এবং বাসভবনের জানালার ডবল পাল্লাগুলো সরিয়ে ঝাড়পোছ করা হচ্ছে।

দিনটা রবিবার। কল-কারখানার ছুটি। তাই নানা ধরনের লোকজন

নানারকম পোষাক পরে পথে বেরিয়ে পড়েছে। পথে গাড়ি, ঘোড়া, ট্রাম গাড়ির চলাচলের বিরাম নেই। গীর্জায় ঘণ্টা বাজছে। লোকজন সব ভাল পোষাক পরে বিভিন্ন গীর্জার দিকে চলেছে।

ইজভজচিকখানা নেখ্‌ল্যুদভকে কারাগার পর্যন্ত পৌঁছে দিল না; কারাগারে যাবার শেষ মোড়টায় নামিয়ে দিল।

কারাগার থেকে প্রায় একশ' পা দূরের এই মোড়েই স্ত্রী-পুরুষ মিলে অনেক লোক ছোট ছোট পুটলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাউকেই কারাগারের কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সামনে একটি শান্ত্রী এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই সে চেঁচিয়ে উঠছে।

মস্ত বড় ইটের বাড়িটাই কারাগার। শান্ত্রীর উল্টো দিকে ডান পাশের কাঠের বাড়িগুলোর দরজায় বেঞ্চির উপর একজন কারারক্ষী বসে আছে। তার পরনে সোনালি দড়ি লাগানো পোষাক, হাতে নোটবই। সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তার কাছে গিয়ে যার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাদের নাম বলছে, আর সে টুকে নিচ্ছে। নেখ্‌ল্যুদভ এগিয়ে গিয়ে কাতেরিনা মাসলভার নাম বলল। কারারক্ষী নামটা লিখে নিল।

'আমাদের ঢুকতে দিচ্ছে না কেন?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'প্রার্থনা-অনুষ্ঠান চলছে। সেটা শেষ হলেই ঢুকতে দেওয়া হবে।'

নেখ্‌ল্যুদভ অপেক্ষমান জনতাব দিকে ফিরে তাকাল। একটি লোক—তার খালি পা, ছেঁড়া পোষাক, তুমডানো টুপি; সারা মুখে লাল দাগ—ভীড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে কারাগারের দিকে এগিয়ে গেল।

রাইফেলধারী শান্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, কোথায় যাচ্ছ?'

ভবঘুরে লোকটি শান্ত্রীর কথায় মো'টেই ঘাবড়ালো না, তবু একটু পিছনে সরে জবাব দিল, 'তুমি চুপ কর তো বাপু। বেশ তো, যেতে না দাও যাব না। তাই বলে অমন চেঁচাচ্ছ কেন? ঠিক যেন এক সেনাপতিমশায়।'

জনতা হো-হো করে হেসে উঠল।

এমন সময় জানালাযুক্ত বড় লোহার দরজাটা খুলে গেল। সরকারী পোষাকে সজ্জিত একজন অফিসার অপর একজন কারারক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল। নোটবই হাতে কারারক্ষীটি ঘোষণা করল যে এবার সাক্ষাৎকার শুরু হবে। শান্ত্রী একপাশে সরে দাঁড়াল এবং পাছে দেরী হয়ে যায় এই আশংকায় সাক্ষাৎপ্রার্থীরা সকলেই দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন কারারক্ষী দরজার মুখে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎপ্রার্থীরা যেমন যেমন ঢুকছে তেমন তেমন তাদের উচ্চৈস্বরে গুণতে লাগল—ষোল, সতেরো, ইত্যাদি। আর একজন কারারক্ষী ভিতরে দাঁড়িয়ে তারা যেই দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ঢুকছে অমনি হাত বাড়িয়ে প্রত্যেককে স্পর্শ করছে; ফলে যখন তারা আবার ফিরে যাবে তখন একটিও দর্শনার্থী ভিতরে থাকবে না এবং একটিও কয়েদী বাইরে

যেতে পারবে না। কার গায়ে হাত লাগাচ্ছে না দেখেই কারারক্ষী নেখ্‌ল্যুদভের পিঠে একটা চড় কসিয়ে বসল। নেখ্‌ল্যুদভ তার হাতের ছোঁয়ায় ক্ষুব্ধ হলেও যে কাজে সে এসেছে সেটা স্মরণ করে তার এই বিরক্তি ও ক্ষোভের জন্য লজ্জিত হল।

ঢুকবার দরজার পরেই একটা বড় ঘর; তার ছোট ছোট জানালায় লোহার শিক বসানো। সেটা সভা-কক্ষ। সেই ঘরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর একখানা বড় ছবি দেখে নেখ্‌ল্যুদভ চমকে উঠল।

'এ ছবি এখানে কেন?' সে ভাবল; আপনা থেকেই তার মনে হল, এ ছবি তো মুক্তির প্রতীক, বন্দীদশার নয়।

দ্রুত ধাবমান দর্শনার্থীদের পথ ছেড়ে দিয়ে নেখল্‌যুদভ ধীরে ধীরে এগোতে লাগল এবং সকলের শেষে দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ শতকণ্ঠের কর্নপটাহ ভেদকারী চীৎকারে সে যেন হকচকিয়ে গেল। প্রথমে এই গর্জনের কারণও বুঝতে পারল না। কিন্তু লোকগুলির আরও কাছে গিয়ে দেখল, চিনির উপর ঝাঁক-বেঁধে বসা মাছির মত তারা সকলেই যে তারের জালের উপর চেপে দাঁড়িয়েছে সেই জাল দিয়ে ঘরটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর অর্থও সে বুঝতে পারল। ঘরের দুটো অংশকে আলাদা করা হয়েছে, একটি জাল দিয়ে নয়, মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু সাত ফুট অন্তর অন্তর দুটো তারের জাল দিয়ে, আর সেই দুটো জালের মাঝখানের স্থানটুকুতে কারারক্ষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জালের শেষ প্রান্তে রয়েছে কয়েদীরা, আর নিকট প্রান্তে রয়েছে দর্শনার্থীরা। তাদের মাঝখানে রয়েছে দুটো তারের জাল আর সাত ফুট জায়গা; ফলে হাত বাড়িয়ে কেউ কাউকে কিছু দিতে পারবে না, এবং কেউ যদি ক্ষীণ-দৃষ্টি হয় তাহলে অপর প্রান্তের লোকের মুখ দেখে চিনতেও পারবে না। কথা বলাও শক্ত; কথা শোনাতে হলেই চেঁচাতে হবে।

দুই প্রান্তেই অনেক মুখ জালের উপর চেপে বসেছে—স্ত্রী, স্বামী, বাবা, মা, সন্তানদের মুখ; সকলেই চেষ্টা করছে বাঞ্ছিত জনকে দেখতে এবং সে যাতে শুনতে পায় এমন ভাবে কথা বলতে।

একজন যেমন তার কথা শোনাতে চেষ্টা করছে, তার পার্শ্ববর্তীও সেই একই চেষ্টা করছে; ফলে একে অন্যের কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করছে, আর তার ফলে যে সম্মিলিত হৈ-হট্টগোল শুরু হয়েছে, নেখ্‌ল্যুদভ প্রথম ঘরে ঢুকে সেই শব্দ শুনেই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু শোনা অসম্ভব। শুধু মুখ দেখেই বুঝতে হবে কে কি বলছে, বা এক জনের সঙ্গে অপর জনের সম্পর্ক কি।

নেখ্‌ল্যুদভ যখন বুঝতে পারল তাকেও এই অবস্থাতেই কথা বলতে হবে, তখনই যারা এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে, মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের

বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভের অনুভূতি তার মনে জাগল। এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে পড়েও মানুষের হৃদয়-বৃত্তির উপর এই অত্যাচারে কেউ ক্ষুব্ধ হচ্ছে না দেখে তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এমন কি সৈন্যরা, ইন্সপেক্টর এবং কয়েদীরাও এমন ব্যবহার করছে যেন এটাকেই তারা প্রয়োজন বলে স্বীকার করে নিয়েছে।

মিনিটি পাঁচেক সময় নেখ্‌ল্যুদভ সে ঘরে অপেক্ষা করল। সে যে কত অসহায়, এই পৃথিবী হতে সে কত বিচ্ছিন্ন এ কথা ভেবে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল। সমুদ্র-পীড়ার সঙ্গে তুলনীয় এক বিচিত্র নৈতিক বিবমিষা যেন তাকে আক্রমণ করেছে।

অধ্যায়—৪২

সাহস অর্জনের চেষ্টায় সে নিজেকেই বলল, 'কিন্তু যে জন্য এখানে এসেছি তা তো করতেই হবে। এখন কি করি?'

একজন সরকারী কর্মচারির খোঁজে সে চারদিক তাকাল। সরকারী পোষাক পরিহিত একজন অফিসারকে ভীড়ের পিছনে পায়চারি করতে দেখে সে তার দিকে এগিয়ে গেল।

জোর করে ভদ্রতার ভাব এনে সে বলল, 'আপনি কি বলতে পারেন কোথায় মেয়েদের রাখা হয় এবং কোথায় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়?'

'আপনি কি মেয়েদের বিভাগে যেতে চান?'

সেই একই বিনয়ের সঙ্গে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি একটি মেয়ে-কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'হলে থাকতেই আপনার সে কথা বলা উচিত ছিল। আচ্ছা, আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'আমি দেখা করতে চাই কাতেরিনা মাসলভা নাম্নী একটি কয়েদীর সঙ্গে।'

'তিনি কি রাজনৈতিক বন্দী?'

'না, সে সাধারণ অপরাধ—'

'ওঃ, তার কি দণ্ডাদেশ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, গতকালের আগের দিনই তার দণ্ডাদেশ হয়েছে।' ইন্সপেক্টরটি ভাল মেজাজে আছে; পাছে তার মেজাজ বিগড়ে যায় সেই ভয়ে নেখ্‌ল্যুদভ নরম গলায় জবাব দিল।

চেহারা দেখেই অফিসারটি বুঝতে পেরেছে তার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাই সে বলল, 'মেয়েদের বিভাগে যদি যেতে চান, তাহলে দয়া করে এই দিকে যান।' বুকে মেডেল ঝোলানো একজন গোঁফওয়ালা

কর্পোরাল্যালের দিকে ঘুরে বলল, 'সিদরভ, ভদ্রলোককে মেয়েদের বিভাগে নিয়ে যাও।'

ঠিক সেই মুহূর্তে জালের কাছ থেকে কার যেন হৃদয়-বিদারক কান্না ভেসে এল।

নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এখানকার সব কিছুই বিস্ময়কর; কিন্তু এটাই সব চাইতে বিস্ময়কর যে, তাকে এই ইন্সপেক্টর ও প্রধান কারারক্ষীদের ধন্যবাদ দিতে হবে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করতে হবে—অথচ এরাই সেই মানুষের দল যারা এই অট্টালিকার ঘরে ঘরে এই সব নিষ্ঠুর কাজ করে চলেছে।

কর্পোর‍্যাল নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা করিডরে পড়ল এবং সেটা পার হয়ে বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে সোজা ঢুকে গেল মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে।

পুরুষদের ঘরের মতই এ ঘরটাও দুটো তারের জাল দিয়ে ভাগ করা; তবে ঘরটা আরও ছোট। এখানে দর্শনার্থীর সংখ্যাও কম, কয়েদীর সংখ্যাও কম, কিন্তু হৈ-চৈ হট্টগোল একই রকম। সেই একই ভাবে দুই জালের মাঝখান দিয়ে কর্তৃপক্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবে এখানে কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি একজন কারারক্ষিনী; তার পরিধানে নীল পাড়ের জ্যাকেট, আস্তিনে সোনালি দড়ি বসানো, কোমড়ে নীল বন্ধনী। পুরুষদের ঘরের মতই এখানেও দুই দিকের তারের জালের উপরেই মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে: এ পাশে নানা সাজে সজ্জিত শহরের লোক, আর ওপাশে কয়েদীরা,—তাদের কারও পরনে কারাগারের সাদা পোষাক, কারও বা নিজেদের রঙিন পোষাক। সারা জালটা জুড়েই মানুষের ভীড়। কেউ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে অন্যের মাথার উপর দিয়ে কথা বলছে, কেউ বা বলছে মেঝের উপর বসে।

কয়েদীদের পিছনে জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। নেখ্‌ল্যুদভ তাকে চিনল। তার হৃদপিণ্ড দ্রুতগতি হল, তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। জালের কাছে গিয়ে সে তাকে ভাল করে দেখল। নীল-নয়না ফেদসিয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে সে তার কথা শুনে হাসছে। এখন তার গায়ে কারাগারের আলখাল্লা নেই, একটা সাদা পোষাক পরেছে। রুমালের ফাঁক দিয়ে কয়েক গুচ্ছ কালো কোঁকড়ানো চুল দেখা যাচ্ছে, ঠিক আদালতে যেমনটি ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'আর একটি মুহূর্তের মধ্যেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। ওকে কি ডাকব? না কি ও নিজেই আসবে?'

মাসলভা ক্লারাকে আশা করছিল; এই লোকটি যে তাকে দেখতে এসেছে এটা তার মাথায়ই আসে নি।

যে কারারক্ষিনী তারের জালের মাঝখানে হাঁটছিল সে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি কাকে চান?'

'কাতেরিনা মাসলভা,' নেখ্‌লয়ুদভ অতি কষ্টে উচ্চারণ করল।

রক্ষিনী চেঁচিয়ে বলল, 'মাসলভা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।'

অধ্যায়—৪৩

মাসলভা চারদিক তাকাল। মাথাটা পিছনে ঠেলে দিয়ে বুক ফুলিয়ে সদা-প্রস্তুত ভঙ্গীতে জালের কাছে এগিয়ে এল। এ ভঙ্গী নেখ্‌লয়ুদভের চেনা। দুজন কয়েদীকে সরিয়ে সে বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকাল।

কিন্তু পোষাক দেখে তাকে ধনী লোক মনে করে একটু হাসল।

চোখ দুটি ঈষৎ টেঁরা। হাসি মুখটা জালের আরও কাছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি আমাকে খুঁজছেন?'

'আমি……আমি……আমি দেখা করতে চাই·· ·· আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করতে চাই…আমি…।' সে স্বাভাবিক স্বরেই কথাগুলি বলল।

নেখ্‌লয়ুদভের কথাগুলি মাসলভা শুনতে পেল না, কিন্তু কথা বলার সময় তার মুখে যে ভাব ফুটে উঠছে তাতে তার এমন কিছু মনে পড়ল যা সে মনে করতে চায় না।

ভুরু কুঁচকে কপালে অনেকগুলো রেখা ফুটিয়ে জোর গলায় বলল, 'আপনার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না।'

'আমি এসেছি…' নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

মনে মনে ভাবল, 'আমার কর্তব্য আমি করছি,—সব দোষ স্বীকার করছি; এ কথা ভাবতেই তার চোখে জল এসে গেল, তার মনে হল গলাটা আটকে যাবে; দুই হাতে জালটা চেপে ধরে উদ্‌গত চোখের জল চাপতে চেষ্টা করল।

তার উত্তেজিত অবস্থা দেখে মালসভা তাকে চিনতে পারল।

'আপনি যেন…কিন্তু না, আমার মনে নেই,' তার দিকে না তাকিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল; তার লজ্জারক্তিম মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে উঠল।

পড়া মুখস্থ বলার মত করে জোরালো অথচ একঘেয়ে গলায় নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'আমি এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে।'

এই কথা বলে খুবই বিচলিত হয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, সে যদি লজ্জা পেয়ে থাকে সে তো ভালই—এ লজ্জা তাকে সইতে হবে; তখন আরও জোরালো গলায় বলল:

'আমাকে ক্ষমা কর; তোমাব প্রতি আমি ভয়ঙ্কর অন্যায় করেছি।'

তার উপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে মাসলভা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

নেখ্‌লয়ুদভ আর কথা বলতে পারল না। জাল থেকে সরে এসে কান্না

চাপবার চেষ্টা করতে লাগল।

যে ইন্সপেক্টর আগ্রহ সহকারে তাকে মেয়েদের বিভাগে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সে ঘরে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভকে জালের কাছে না দেখে জানতে চাইল, যে মেয়েটির সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে কথা বলছে না কেন। নেখ্‌ল্যুদভ নাকটা ঝাড়ল, শরীরটাকে একটু নাড়া দিল, তারপর বলল: 'এই জালের ভিতর দিয়ে কথা বলা ভারি অসুবিধা; কিছুই শোনা যায় না।'

ইন্সপেক্টর এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। 'ওঃ, আচ্ছা, তাকে কিছু সময়ের জন্য এখানে আনা যেতে পারে।' তারপর কারারক্ষিনীকে বলল, 'মারিয়া কারলভনা, মাসলভাকে বাইরে নিয়ে এস।'

এক মিনিট পরে পাশের দরজা দিয়ে মাসলভা বেরিয়ে এল। ধীর পায়ে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এগিয়ে গিয়ে থামল। তারপর চোখ তুলে তাকাল। দুদিন আগে যেমন ছিল, মাথার কালো চুল তেমনি কপালের উপর এসে পড়েছে; মুখটা রোগা ও ফুলো-ফুলো দেখালেও বেশ আকর্ষণীয় ও শান্ত; কিন্তু চকচকে দুটি কালো চোখ ফোলা পাতার নীচ থেকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে।

'আপনারা এখানে কথা বলুন,' এই কথা বলে ইন্সপেক্টর সরে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ দেয়ালের পাশে একটা আসনের দিকে এগিয়ে গেল।

মাসলভা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল, তারপর বিস্ময়ে কাঁধ দুটিকে ঝাঁকুনি দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের পিছন পিছন বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল এবং স্কার্টটা ঠিক করে তার পাশে বসল।

'আমি জানি আমাকে ক্ষমা করা তোমার পক্ষে কঠিন', কথা বলতে শুরু করেই সে থেমে গেল। চোখের জলে গলা আটকে আসছে। 'অতীতকে মুছে ফেলতে আমি পারব না, কিন্তু এখন আমার যা সাধ্য সব করব। আমাকে বল—'

মাসলভা টেঁরা চোখ দুটি তার উপর থেকে সরিয়েও নিল না, আবার ঠিক তার দিকে রাখলও না। তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলল, 'আমাকে খুঁজে পেলেন কেমন করে?'

তার মুখটা বদলে গেল। খুশির ভাবটা কেটে গেল। তা দেখে নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে বলল, 'হে ঈশ্বর, আমার সহায় হও! বলে দাও আমি কি করব।'

মুখে বলল, 'গত পরশু আমি জুরিতে ছিলাম। তুমি আমাকে চিনতে পার নি?'

'না, পারি নি; চেনার সময় ছিল না। আমি চোখ তুলে তাকাইও নি', সে বলল।

'একটি শিশুও তো ছিল, নয় কি?' কথাটা বলে সেও লজ্জিত বোধ করল।

তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঘৃণার সঙ্গে সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।'

'কি বলছ তুমি? কেন?'

চোখ না তুলেই সে বলল, 'আমি নিজেই তখন খুব অসুস্থ, প্রায় মরতে বসেছিলাম।'

'পিসীরা তোমাকে ছেড়ে দিল কেমন করে?'

'কোলে সন্তান থাকলে সে দাসীকে কে রাখে? টের পেয়েই তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে কথা বলে কি লাভ? আমার কিছুই মনে নেই। ও পাট একেবারেই চুকে গেছে।'

'না, চুকে যায় নি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব।'

'প্রায়শ্চিত্ত করবার তো কিছু নেই। সে সব তো অতীতের কথা,' মাসলভা বলল। তারপর যা নেখ্‌ল্যুদভ কখনও আশা করে নি, সে তার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিকর প্রলোভনের ভঙ্গীতে অথচ করুণ ভাবে হাসল।

তাকে আবার দেখতে পাবে, এ আশা মাসলভা তখনও করে নি, বিশেষ করে এখানে, এই সময়ে তো নয়ই। তাই প্রথম যখন তাকে চিনল তখন সেই সব স্মৃতি তার মনের মধ্যে ফিরে এল যাকে সে কোন দিন মনে করতে চায় নি। প্রথম মুহূর্তেই এলোমেলোভাবে তার মনে পড়ল অনুভব ও চিন্তার সেই আশ্চর্য নতুন জগতকে যে জগতের দুয়ার তার সামনে খুলে দিয়েছিল এই মনোহর যুবক, যে তাকে ভালবাসত আর যাকে সেও ভালবাসত। আর তারপরেই মনে পড়ল তার দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতার কথা; মনে পড়ল সেই যাদুভরা আনন্দের পরবর্তীকালের সব অসম্মান ও দুঃখভোগের বিচিত্র কাহিনী। অন্তরটা ব্যথায় টনটনিয়ে উঠল। কিন্তু সেটা বুঝতে না পেরে সে এমন একটা কাজ করে বসল যা সে সাধারণত করে থাকে; একটা ঘৃণিত জীবনের কুয়াশা দিয়ে সে এই সব স্মৃতিকে ঢেকে দিতে চাইল। প্রথম মুহূর্তে তার পাশে বসা এই লোকটির মধ্যে সে দেখতে পেল সেই ছেলেটিকে যাকে সে ভালবেসেছিল; কিন্তু সে চিন্তায় দুঃখ পেয়ে সে আবার তাকে দূরে সরিয়ে দিল। মুখে সুগন্ধি দাড়ি এই সুসজ্জিত সুবেশ ভদ্রলোক আজ আর সে নেখ্‌ল্যুদভ নয় যাকে সে ভালবাসত, এ তো সেই সব মানুষেরই একজন যারা তার মত জীবকে প্রয়োজন মত কাজে লাগায়, আর সুযোগ এলে তাদেরও লাভজনকভাবে কাজে লাগানোই তার মত জীবদেরও উচিত। আর সেই জন্যই সে এখন তার দিকে চেয়ে প্রলোভনের ভঙ্গীতে হাসল। নীরবে সে ভাবতে লাগল, কেমন করে তাকে নিজের সুবিধার জন্য কাজে লাগাবে।

বলল, 'সে সব শেষ হয়ে গেছে। আমি এখন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত।' এই ভয়ংকর কথাগুলি বলতে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'আমি জানতাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম, তুমি দোষী নও', নেখ্‌ল্যুদভ

বলল।

দোষী! নিশ্চয় নই। আমি কি চোর, না ডাকাত! ওরা তো বলে এখানে সব কিছুই নির্ভর করে অ্যাডভোকেটের উপর।' সে আরও বলল, 'একটা আপিল করা উচিত, তবে সেটা ব্যয়সাপেক্ষ।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। ইতিমধ্যেই অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'টাকার জন্য ভাবলে চলবে না; ভাল অ্যাডভোকেট হওয়া চাই।'

'সম্ভবপর সবকিছু করব।'

দুজনই চুপ। একটু পরে সে আবার সেই হাসি হাসল।

'আর আপনার কাছে হাত পাততে চাই…যদি পারেন কিছু টাকা…বেশী নয়…দশ রুবল,' হঠাৎ সে বলে ফেলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বিচলিতভাবে কথাগুলি বলে নেখ্‌ল্যুদভ ব্যাগে হাত দিল। ইন্সপেক্টর ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছিল। মাসলভা চকিতে তার দিকে তাকাল।

'ওর সামনে দেবেন না; সব নিয়ে নেবে।'

ইন্সপেক্টর পিছন ফিরতেই নেখ্‌ল্যুদভ ব্যাগটা বের করল, কিন্তু নোটটা মাসলভার হাতে দেবার আগেই সে আবার মুখ ফেরাল; কাজেই সে নোটটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে দলা পাকিয়ে নিল।

যে মুখ একদা সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন কলংকিত ও স্ফীত হয়ে গেছে, দুটি কালো টেঁরা চোখের অশুভ ঝলকানিতে যে মুখ এখন আলোকিত, সেই মুখের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'এ নারী তো মৃত।' মাসলভার চোখ দুটি তখনও একবার তাকাচ্ছে নোটশুদ্ধ হাতের দিকে, একবার তাকাচ্ছে ইন্সপেক্টরের চলাফেরার দিকে। মুহূর্তের জন্য নেখ্‌ল্যুদভ ইতস্তত করল।

তার ভিতর থেকে কে যেন চুপি চুপি বলে উঠল, 'এই নারী তোমার কোন কাজেই লাগবে না। এ তো তোমার গলায় একটা পাথর হয়ে ঝুলে থাকবে, তোমাকে ডুবিয়ে মারবে, তোমার দ্বারা অপর কারও কোন উপকার হবে না। তার চাইতে তোমার যত টাকা আছে সব তাকে দিয়ে দাও, তাকে বিদায় করে দাও, তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরদিনের মত শেষ কর। সেটাই কি ভাল নয়? তবু সে বুঝতে পারল, এখন, ঠিক এই মুহূর্তে, তার মনের মধ্যে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটছে—যেন তার অন্তরাত্মা তুলাদণ্ডে দুলছে, ফলে সামান্যমাত্র চেষ্টাতেই যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়বে। আগের দিন নিজের অন্তরের মধ্যে যে ঈশ্বরের উপস্থিতি সে অনুভব করেছে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করে সেই চেষ্টাই সে করল। স্থির করল, এখন এই মুহূর্তেই তাকে সব কিছু খুলে বলবে।

'কাতয়ুশা, তোমার ক্ষমা চাইতে আমি এসেছি, কিন্তু তুমি কোন জবাব দাও নি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ? কোন দিন ক্ষমা করবে?' সে প্রশ্ন

করল।

মাসলভা তার কথায় কান দিল না; তার হাতের দিকে ও ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাতে লাগল। ইন্সপেক্টর মুখ ফেরাতেই সে হাত বাড়িয়ে নোটটা নিয়ে কোমড়-বন্ধনীর নীচে লুকিয়ে ফেলল।

মুখে ঘৃণার হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আপনি যা বলছেন সব বাজে কথা।'

নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল, মাসলভার অন্তরের মধ্যে এমন একজন আছে যে তার প্রতি বিরূপ, যে আজকের মাসলভাকে সমর্থন করছে, মাসলভার অন্তরে প্রবেশ করতে তাকে বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য সে বোধ তাকে দূরে সরিয়ে না দিয়ে বরং এক আশ্চর্য নতুন শক্তিতে তাকে মাসলভার আরও কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে বুঝল, মাসলভার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে; কাজটা ভীষণ কঠিন, তবু সেই ভীষণতাই তাকে আকর্ষণ করতে লাগল। মাসলভার প্রতি আজ তার যে অনুভূতি এমনটি সে আগে কখনও তার প্রতি বা অন্য কারও প্রতি বোধ করে নি। তার মনোবৃত্তিতে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কোন স্পর্শ নেই—তার কাছে নিজের জন্য সে কিছুই চায় না—সে শুধু চায় মাসলভা যেন এই অবস্থার মধ্যে আর পড়ে না থাকে, সে যেন আবার জেগে ওঠে, এবং একদিন যা ছিল তাই হতে পারে।

'কাতয়ুশা, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? আমি তোমাকে জানি; তোমার সব কথা—পানোভো-র সেই পুরনো দিনগুলির কথা—সব আমার মনে আছে।'

সে শুকনো গলায় বলল, 'যা অতীত তাকে মনে রেখে লাভ কি?'

'মনে রেখেছি সব অন্যায় দূর করবার জন্য, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য; কাতয়ুশা,—' সে বলতে যাচ্ছিল সে তাকে বিয়ে করবে, কিন্তু তার চোখে চোখ পড়তে নেখ্‌ল্যুদভ সেখানে এমন ভয়ংকর, রূঢ়, বিরূপ কিছু দেখতে পেল যে সে কথা আর বলা হল না।

এই সময়ে দর্শনার্থীরা যেতে শুরু করল। ইন্সপেক্টর নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গিয়ে জানাল যে সময় হয়ে গেছে। ছাড়া পাবার অপেক্ষায় মাসলভা উঠে দাঁড়াল।

'বিদায়; তোমাকে অনেক কথা আমার বলার আছে; কিন্তু বুঝতেই পারছ এখনই তা সম্ভব হচ্ছে না।' এই কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি আবার আসব।'

'আমার তো মনে হয়, আপনি সব কথাই বলেছেন।'

মাসলভা তার বাড়ানো হাতখানা ধরল, কিন্তু চাপ দিল না।

'না; এমন কোন জায়গায় তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চেষ্টা করব যেখানে দুজনে কথা বলতে পারব; আমার যা বলার আছে তখন তোমাকে

বলব—খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা।'

'ঠিক আছে, তাহলে আসুন ; কি বলেন ?' মাসলভা সেই হাসি হাসল যা দিয়ে সে মানুষকে খুশি করে থাকে।

'তুমি আমার কাছে বোনের চেয়েও বড়', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'বাজে কথা', মাসলভা আবারও বলল ; তারপর মাথা নেড়ে জালের পিছনে চলে গেল।

অধ্যায়—৪৪

দেখা হবার আগে নেখ্‌ল্যুদভ ভেবেছিল, কাতয়ুশা যখন দেখবে সে কতদূর অনুতপ্ত হয়েছে এবং সব রকমে তার সেবা করতে ইচ্ছুক, তখন সে খুশি হবে, অভিভূত হবে এবং আবার কাতয়ুশা হয়ে উঠবে ; কিন্তু এখন সে এই জেনে আতংকিত হয়েছে যে কাতয়ুশার কোন অস্তিত্বই নেই, তার স্থান দখল করেছে মাসলভা। এতে তার বিস্ময় ও আতংকের শেষ নেই।

তাকে সব চাইতে বিস্মিত করেছে এই সত্য যে, কয়েদী হওয়া নয় (সে জন্য সে লজ্জিত), কিন্তু বেশ্যা হওয়ার জন্য সে মোটেই লজ্জিত নয়, বরং সে-অবস্থা নিয়ে সে সন্তুষ্ট, এমন কি গর্বিত। হয় তো সেটাই স্বাভাবিক। কাজ করতে হলে প্রত্যেককেই নিজ নিজ জীবিকাকে গুরুত্বপূর্ণ ও ভাল বলে মনে করতে হয়। তাই মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক তাকে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে এমন একটা ধারণা অবশ্য করে নিতে হবে যাতে তার নিজস্ব জীবনযাত্রাকে গুরুত্বপূর্ণ ও ভাল বলে মনে হয়।

সাধারণতই ধরে নেওয়া হয় যে, একটি চোর, খুনী, গুপ্তচর, বা বেশ্যা সকলেই নিজ নিজ জীবিকাকে খারাপ মনে করে বলেই লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু তার উল্টোটাই সত্যি। নিয়তি ও পাপের ভুল যখন মানুষকে একটা বিশেষ অবস্থায় নিয়ে যায়, তখন সে অবস্থাটা যতই নীচ ও মেকি হোক না কেন, সেই মানুষ সাধারণ ভাবে জীবন সম্পর্কে এমন একটা ধারণা গড়ে তোলে যাতে তার নিজের অবস্থাটাকে ভাল ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। জীবন সম্পর্কে এই ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য এই সব লোক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির তাড়ণাতেই সমধর্মী মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করে, চলাফেরা করে। তাই যখন দেখি চোর তার কর্মকুশলতা নিয়ে গর্বপ্রকাশ করছে, বেশ্যা তার অধঃপতিত জীবনের জৌলুষ দেখাচ্ছে, খুনী তার নিষ্ঠুরতা নিয়ে দম্ভ প্রকাশ করছে, তখন আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু আমাদের এই বিস্ময়ের আসল কারণ, যে সমাজে, যে পরিবেশে এই সব লোক বাস করে সেটা খুবই সীমিত এবং আমরা তার বাইরে বাস করি। কিন্তু ওই একই ঘটনা কি আমরা দেখতে পাই না, যখন ধনীরা তাদের সম্পদ নিয়ে—অর্থাৎ তাদের দস্যুতা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে ; যখন সেনাবাহিনীর

অধিনায়করা তাদের বিজয়—অর্থাৎ হত্যা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে; এবং উচ্চপদে যারা অধিষ্ঠিত তারা যখন তাদের ক্ষমতা—অর্থাৎ হিংসার জৌলুস লোককে দেখায়? এই সব লোকের বিকৃত জীবন-ধারণা আমাদের চোখে পড়ে না কারণ এদের সমাজ অনেক বড়, আর আমরা নিজেরাও সেই সমাজেরই লোক।

মাসলভাও এইভাবেই তার জীবন-ধারণা ও অবস্থার মূল্যায়ন করে নিয়েছে। সে একটি বেশ্যা, কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত; তথাপি তার জীবন-ধারণাই তাকে নিজেকে নিয়ে খুশি থাকতে এবং স্বীয় অবস্থা নিয়ে গর্ববোধ করতে শিখিয়েছে।

তার ধারণা অনুসারে সব মানুষের—বৃদ্ধ, যুবক, ছাত্র, সেনাপতি. শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সব মানুষেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শ মনোরমা নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা: সুতরাং সব মানুষই বাইরে অন্য কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকার ভান করলেও আসলে আর কিছুই চায় না। সে একজন মনোরমা নারী, এই কামনা চরিতার্থ করা না করা তার ইচ্ছাধীন, আর সেই জন্যই সে সমাজে একজন গুরুত্বপূর্ণ বাঞ্ছিত ব্যক্তি। তার সমস্ত অতীত ও বর্তমান জীবনই এই ধারণার সাক্ষী।

জীবনের বিগত দশটি বছর ধরে সে যেখানে গিয়েছে সেখানেই দেখেছে, নেখ্‌ল্যুদভ ও বৃদ্ধ পুলিশ-অফিসার থেকে কারাগারের রক্ষী পর্যন্ত সব পুরুষই তাকে চায়; যে সব পুরুষের তাকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই তাদের সে কখনও লক্ষ্যও করে নি, তাদের কোন হিসাবও রাখে নি। সুতরাং তার মনে হয়েছে যে সমগ্র পৃথিবীটাই কামনাতাড়িত মানুষে ভর্তি। প্রতারণা, গায়ের জোর, টাকার জোর, বা চালাকি,—যে কোন উপায়ে তাকে লাভ করতে সকলেই সচেষ্ট।

মাসলভা জীবনটাকে এইভাবেই বুঝেছে; আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সে নীচ তো নয়ই বরং বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মাসলভা এই দৃষ্টিকোণকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করে; মনে না করে উপায় নেই, কারণ এ জীবন-ধারণা হারিয়ে ফেললে তার নিজের গুরুত্বও হারিয়ে যাবে। তার নিজের জীবনের অর্থ যাতে হারিয়ে না যায়, সেই জন্য আর যারা তার মত দৃষ্টি দিয়েই জীবনটাকে দেখে স্বভাবতই সে তাদের দলেই ভিড়ে গেছে। নেখ্‌ল্যুদভ তাকে অন্য এক জগতে নিয়ে যেতে চাইছে, সেখানে গেলে বর্তমান জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আসন থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়বে, এই আশংকায়ই সে নেখ্‌ল্যুডকে বাধা দিয়েছে। সেই একই কারণে প্রথম যৌবনের স্মৃতিকে নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্মৃতিকে সে মুছে ফেলেছে। ঐ সব স্মৃতি তার বর্তমান জীবন-ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না, তাই তাকে সে স্মৃতির পাতা থেকে সম্পূর্ণ কেটে দিয়েছে; অথবা হয় তো কোথাও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চাপা দেওয়া রয়েছে। আর যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে সেজন্য পলস্তরা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক মৌমাছিরা যে ভাবে তাদের পরিশ্রমের

ফসলকে রক্ষা করবার জন্য মোমে-গড়া মৌচাককে পলস্তরা দিয়ে ঢেকে রাখে। কাজেই আজকের নেখ্‌লয়ুদভ সেই লোক নয় যাকে সে একদিন পবিত্র প্রেমে ভালবেসেছিল; আজ সে একজন ধনী ভদ্রলোকমাত্র; তাকে সে নিজের প্রয়োজনমত কাজে লাগাবে এবং সাধারণভাবে পুরুষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তার সঙ্গেও সেই সম্পর্ক বজায় রেখে চলবে।

অন্য দর্শনার্থীদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে যেতে নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল, 'না, প্রধান কথাটাই তাকে বলা হল না; বলা হল না যে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই; তাকে সে কথা বলি নি, কিন্তু আমাকে বলতেই হবে।'

দরজায় দুজন রক্ষী দর্শনার্থীরা বেরিয়ে যাবার সময় আবার তাদের গুণতে লাগল এবং প্রত্যেকের গায়ে একবার করে হাত লাগাল যাতে বাড়তি কোন লোক বাইরে যেতে না পারে বা ভিতরে না থাকতে পারে। কাঁধের উপর থাপ্পড় পড়লেও এবার কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভের রাগ হল না; ব্যাপারটা সে খেয়ালই করল না।

অধ্যায়—৪৫

নেখ্‌লয়ুদভ চেয়েছিল তার বাহ্যিক জীবনের সব ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজাতে: চাকরদের ছাড়িয়ে দেবে, বড় বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দেবে এবং একটা বাসা-বাড়িতে চলে যাবে; কিন্তু আগ্রাফেনা পেত্রভনা জানাল, শীতকালের আগে এসব পরিবর্তনের কোন অর্থ হয় না। গ্রীষ্মকালে শহরের বাড়ি কেউ ভাড়া নেবে না; তাছাড়া তাকেও তো বাস করতে হবে, জিনিসপত্র রাখতে হবে। কাজেই জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সব চেষ্টাই (সে চেয়েছিল ছাত্রদের মত আরও সাদাসিদে ভাবে থাকতে) বিফল হল। শুধু যে যেমনটি ছিল তেমনই রইল তাই নয়, বরং সারা বাড়িটা যেন হঠাৎ নতুন কাজকর্মে ভরে উঠল। পশম ও ফারের তৈরি যা কিছু ছিল সব বাইরে বাতাসে দিয়ে পেটাই করা হল। দরোয়ান, ছোকরা-চাকর, রাঁধুনি, এমন কি করনেই পর্যন্ত তাতে যোগ দিল। নানা রকম অব্যবহৃত অদ্ভুত ফারের পোষাক আর নানা রকম সরকারী পোষাক বের করে সার বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল; কার্পেট ও আসবাবপত্র বের করা হল; দরোয়ান ও ছোকরা-চাকরটা তাদের পেশীবহুল হাতের আস্তিন গুটিয়ে তালে তালে সেগুলিকে পিটতে লাগল; আর সমস্ত ঘর ন্যাপথালিনের গন্ধে ভরে উঠল।

নেখ্‌লয়ুদভ যখনই উঠোন পার হচ্ছে বা জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে, তখনই এই সব কাণ্ডকারখানা তার চোখে পড়ছে। আর এত সব অদরকারী জিনিস বাড়িতে আছে দেখে বিস্মিত হচ্ছে। তার মনে হল, আগ্রাফেনা পেত্রভনা, করনেই, দরোয়ান, ছোকরা-চাকর ও রাঁধুনিকে শরীর চালনার সুযোগ করে

দেওয়াই বুঝি এ সব জিনিসের একমাত্র কাজ।

নির্দিষ্ট দিনে নেখ্‌ল্যুদভ অ্যাডভোকেট ফানারিনের মস্তবড় বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। বাড়িটা বড় বড় পাম ও অন্যান্য গাছ দিয়ে সাজানো; চমৎকার সব পর্দা ঝুলছে: অর্থাৎ সেই সব ব্যয়বহুল জাকজমক দিয়ে সাজানো যা অনেক সঞ্চিত অর্থের সাক্ষ্য বহন করে (বিনা শ্রমে অর্জিত অর্থ) এবং যে ধরনের জাকজমক শুধু হঠাৎ-বড়লোকরাই দেখিয়ে থাকে। ডাক্তারদের বসবার ঘরে যেমন থাকে, এখানেও তেমনি বসবার ঘরে অনেক মন-মরা লোক টেবিলটা ঘিরে বসে আছে। তাদের খুশি করবার জন্য টেবিলের উপর অনেকগুলি সচিত্র পত্রিকা রাখা হয়েছে। কখন তাদের অ্যাডভোকেটের ঘরে ডাক পড়বে তারই অপেক্ষায় সকলে বসে আছে। অ্যাডভোকেটের সহকারী একটা উঁচু ডেস্কে বসেছিল। নেখ্‌ল্যুদভকে চিনতে পেরে সে এগিয়ে এসে বলল, এখনই তার নাম ডাকা হবে। সহকারী দরজা পর্যন্ত যাবার আগেই দরজা খুলে অ্যাডভোকেট বেরিয়ে এল।

'আরে, প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভ! দয়া করে ভিতরে আসুন', তাকে চিনতে পেরে এই কথাগুলি বলে ফানারিন তাকে নিয়ে নিজের সেরেস্তায় ঢুকল।

নেখ্‌ল্যুদভের বিপরীত দিকে বসে অ্যাডভোকেট বলল, 'ধূমপান করুন না?'

'ধন্যবাদ; আমি মাসলভার কেসের ব্যাপারে এসেছি।'

'দেখুন, কেসটা আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি এবং তুর্গেনিভের ভাষায় বলি, "তার বক্তব্য আমি সমর্থন করি না।" আমি বলতে চাই, কাঁচা অ্যাডভোকেটটি আপিল করার কোন সঙ্গত যুক্তিই রাখেনি।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'এক মিনিট।' সহকারীটি এইমাত্র ঘরে ঢুকলে তার দিকে ফিরে বলল, 'ওকে বলে দাও, আমি যা বলেছি তাই হবে। যদি সে দিতে পারে, ভাল কথা; যদি না পারে, কোন কথা নেই।'

'কিন্তু সে রাজী হবে না।'

'বেশ তো, কোন কথা নেই।' তার প্রশান্ত ফূর্তিবাজ মুখখানি হঠাৎ গম্ভীর ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

'এই দেখুন!—ওদিকে সবাই বলে আমরা অ্যাডভোকেটরা না খেটে পয়সা নেই,' একটু পরে মুখের ভাবে পূর্বেকার প্রসন্নতা ফিরিয়ে এনে সে বলতে লাগল। 'একজন দেউলে লোককে মিথ্যা মামলা থেকে খালাস করার পর থেকেই সবাই আমার কাছে এসে ভীড় করছে। অথচ এ ধরনের প্রতিটি মামলায় কত খাটুনি খাটতে হয়। কে একজন লেখক বলেন নি যে, আমরাও "দোয়াত-দানিতে মাংস দিয়ে থাকি!"

'হ্যাঁ, আপনার কেসের কথা, মানে যে কেসটাতে আপনি আগ্রহী। মামলাটা অত্যন্ত বাজে ভাবে করা হয়েছে। আপিলের কোন সঙ্গত কারণই

নেই। তবুও দণ্ডাদেশ বাতিলের চেষ্টা আমরা অবশ্য করতে পারি। সেই কথাই আমি নোটে লিখেছি।'

লেখায় ভর্তি কয়েক তা কাগজ তুলে নিয়ে সে দ্রুত পড়তে লাগল। পড়ার সময় একঘেয়ে আইনের শব্দগুলো বাদ দিয়ে কতকগুলো দণ্ডাদেশের উপরেই বিশেষ জোর দিল।

'আপিল আদালত, ফৌজদারি বিভাগ সমীপেষু, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত অনুসারে ইত্যাদি, ইত্যাদি, রায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে বিষ-প্রয়োগের দ্বারা বণিক স্মেলকভের মৃত্যু ঘটাবার দায়ে মাসলভাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং দণ্ডবিধির ১৪৫৪ ধারা মতে তাহাকে সশ্রম নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

সে পড়া বন্ধ করল। শুনতে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এখন নিজের সৃষ্টি এই সব দলিল শুনে এখনও সে আনন্দ পায়।

বেশ জোরের সঙ্গে সে আবার পড়তে শুরু করল। 'অত্যন্ত স্পষ্ট বিচার-বিভাগীয় ত্রুটি ও ভ্রান্তির প্রত্যক্ষ ফল এই দণ্ডাদেশ এবং এ আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, স্মেলকভের অস্ত্র-পরীক্ষার ডাক্তারি প্রতিবেদন পাঠের গোড়াতেই প্রেসিডেণ্ট বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই হল পয়লা নম্বর পয়েণ্ট।'

নেখ্‌লয়ুদভ সবিস্ময়ে বলল, 'কিন্তু সরকার পক্ষই তো প্রতিবেদন পাঠের দাবি জানিয়েছিল।'

'তাতে কিছু যায় আসে না। আসামী পক্ষ থেকেও এ দাবী জানাবার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারত।'

'আহা, তার তো কোন কারণই থাকতে পারে না।'

'তবু আপিলের স্বপক্ষে এটা একটা কারণ। তারপর, সে আবার পড়তে শুরু করল, "দ্বিতীয়তঃ মাসলভার অ্যাডভোকেট যখন আসামী পক্ষের সমর্থনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাসলভার ব্যক্তিত্বকে বৈশিষ্টপূর্ণ করিয়া তুলিবার আশায় তাহার পতনের কারণ উল্লেখ করিতেছিলেন, তখনও প্রেসিডেণ্ট মূল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইবার অভিযোগে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথচ সেনেট বার বার বলিয়াছিলেন যে, ফৌজদারি মামলায় অপরাধীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" এই হল দু'নম্বর পয়েণ্ট।' এ কথা বলে সে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকাল।

নেখ্‌লয়ুদভ অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'কিন্তু তার ভাষণ এতই খারাপ হয়েছিল যে তার মাথামুণ্ডু কেউ কিছু বুঝতেই পারে নি।'

ফানারিন হেসে বলল, 'লোকটা খুবই বোকা আছে, তাই এর চাইতে অর্থ-পূর্ণ কথা তার কাছে আশাও করা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, আপিলের যুক্তি হিসাবে বেশ চলে যাবে। "তৃতীয়তঃ, সমাপ্তি-ভাষণের সময় ফৌজদারি

দণ্ডবিধির ৮০১ ধারার ১নং উপধারার প্রত্যক্ষ অর্থকে উপেক্ষা করিয়া প্রেসিডেণ্ট এই অপরাধের আইনগত পয়েণ্টগুলি জুরিকে জানাইতেই ভুলিয়া গেলেন; এবং একথাও উল্লেখ করিলেন না যে, মাসলভা যে স্মেলকভকে বিষ খাইতে দিয়াছে সে কথা স্বীকার করিয়াও তাহার উপর খুনের অপরাধ না চাপাইবার অধিকার জুরির ছিল, কারণ ইচ্ছাকৃত ভাবে স্মেলকভের জীবননাশের কোন প্রমাণই ছিল না; জুরির এ কথা ঘোষণা করিবার অধিকার ছিল যে বণিকের মৃত্যু ঘটাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার অপরাধ এই যে তাহার অসাবধানতার জন্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে।" এটাই আসল পয়েণ্ট।'

'তা ঠিক; কিন্তু একথা তো আমাদেরই জানা উচিত ছিল। এটা তো আমাদেরই ভুল।'

অ্যাডভোকেট থামল না। 'এবার চতুর্থ পয়েণ্ট। "যে আকারে জুরি তাহাদের রায় দিয়াছে তাহা আত্মবিরোধী। অর্থলোভের তাড়নায় ইচ্ছাকৃত ভাবে স্মেলকভকে বিষপ্রয়োগের অভিযোগে মাসলভাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে; খুনের ব্যাপারে সেইটেই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। জুরিরা তাহাদের রায়ে টাকা চুরির ইচ্ছা বা মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরির সঙ্গে যুক্ত থাকিবার দায় হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিয়াছে; ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে খুনের দায় হইতেও তাহাকে অব্যাহতি দেওয়ার ইচ্ছা তাহাদের ছিল, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের সমাপ্তি-ভাষণের অসম্পূর্ণতার দরুণ ভুল বোঝাবুঝির ফলে জুরি তাহাদের রায়ে এই কথাটি যথাযথভাবে উল্লেখ করে নাই। সুতরাং জুরির এই ধরনের রায়ের ফলে ফৌজদারি আদালত কর্মবিধির ৮১৬ এবং ৮০৮ ধারার প্রয়োগ অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক জুরির কাছে তাহাদের ভুলের কৈফিয়ৎ দাবী এবং বন্দিনীর অপরাধের প্রশ্নে নূতন করিয়া বিতর্ক ও রায় ঘোষণার দাবী অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে।"

'তাহলে প্রেসিডেণ্ট তা করলেন না কেন?'

ফানারিন হাসতে হাসতে বলল, 'আমিও তো তাই জানতে চাই, কেন।'

'তাহলে সেনেট নিশ্চয় তার ভুল সংশোধন করবে?'

'সেটা নির্ভর করছে তখনকার সভায় কে সভাপতিত্ব করবেন তার উপর।' বলেই সে আবার দ্রুতগতিতে পড়তে শুরু করল। "এই ধরনের রায়ের বলে মাসলভাকে অপরাধী হিসাবে শাস্তি দিবার এবং তার ক্ষেত্রে ফৌজদারি আদালত কর্মবিধির ৭৭১ ধারার ৩নং উপধারা প্রয়োগ করিবার কোন অধিকার আদালতের নাই। ইহাতে আমাদের ফৌজদারি আইনের মৌলিক নীতি-সমূহকে চূড়ান্ত ভাবে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে মহামান্য ইত্যাদি, ইত্যাদি-র নিকট আমি আবেদন করিতেছি যে ফৌজদারি আদালত কর্মবিধির ৯০৯, ৯১০, ৯১২ ধারা এবং ২নং ও ৯২৮ নং উপধারা মতে উক্ত রায় বাতিল করা হউক ইত্যাদি, ইত্যাদি···এবং আরও শুনানীর জন্য ঐ

একই আদালতের অন্য কোন বিভাগে মামলাটি প্রত্যর্পণ করা হউক।" হল তো! যা কিছু করা সম্ভব তা করা হল, কিন্তু খোলাখুলিই বলছি, সাফল্য সম্পর্কে আমার আশা খুব কম, অবশ্য সবই নির্ভর করে সেনেটের উপস্থিত সদস্যদের উপর। সেখানে যদি কোন প্রতিপত্তি থাকে তো চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'কাউকে কাউকে আমি জানি।'

'ঠিক আছে; তবে খুব তাড়াতাড়ি করবেন। নইলে সবাই হয়তো অর্ধ সারাতে চলে যাবে, তখন কিন্তু তাদের ফিরে আসার জন্য তিনটি মাস অপেক্ষা করতে হবে। তারপরেও যদি হার হয়, বেশ তো, মহামান্য জারের কাছে আবেদন করা যাবে। সেখানেও পর্দার আড়ালে কিছু ঘোরাঘুরি চালাতে হবে। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও আপনার সেবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি—মানে আবেদনটা মুসাবিদা করে দেব, তবে আড়ালের ব্যাপারে আমি নেই।'

'ধন্যবাদ। আপনার ফি কত?'

'আমার সহকারী আপনাকে দরখাস্তটা দেবার সময়ই বলে দেবে।'

'আর একটা কথা। এই কয়েদির সঙ্গে কারাগারে দেখা করার জন্য ন্যায়াধীশ আমাকে একখানি অনুমতি-পত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওরা বলছে, অন্য কোন সময়ে এবং অন্য কোন ঘরে দেখা করতে হলে গভর্ণরের অনুমতি নিতে হবে। সেটা কি সত্যি দরকার?'

'হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু এখন তো গভর্ণর বাইরে আছেন; তার জায়গায় একজন ভাইস-গভর্ণর আছেন। কিন্তু লোকটি এমনই আকাট বোকা যে তাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না।'

'লোকটি কি মাস্‌লেনিকভ?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তাকে চিনি,' বলে নেখ্‌ল্যুদভ উঠে দাঁড়াল।

বাইরের ঘরে সহকারী তার হাতে লিখিত দরখাস্তখানা দিয়ে বলল যে তার ফি এক হাজার রুবল। সে আরও জানাল, মিঃ ফানারিন সাধারণত এসব কাজ করেন না, শুধু নেখ্‌ল্যুদভের খাতিরেই করেছেন।

'এ দরখাস্তটা কে সই করবে?'

'কয়েদী নিজেই করতে পারে, অথবা তাতে অসুবিধা থাকলে মিঃ ফানারিনও করতে পারেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'না, না, আমিই দরখাস্তটা তার কাছে নিয়ে যাব, সেই সই করে দেবে।' নির্দিষ্ট দিনের আগেই মাসলভার সঙ্গে দেখা করবার একটা ছুতো পেয়ে সে খুশি হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৪৬

যথাসময়ে কারারক্ষীর বাঁশি কারাগারের করিডরে-করিডরে ধ্বনিত হল, সেলের লোহার দরজাগুলি সশব্দে খুলে গেল। অনেক খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল, অনেক গোড়ালির খটখট শব্দ উঠল, আর যে সব কয়েদী ঝাড়ুদারের কাজ করে তারা দুর্গন্ধে বাতাস ভারি করে করিডর দিয়ে চলে গেল। কয়েদীরা হাতমুখ ধুয়ে পোষাক পরে, পরিদর্শকের জন্য বাইরে এসে দাঁড়াল এবং তারপর চায়ের জন্য গরম জল আনতে গেল।

প্রাতরাশের সময় প্রতিটি সেল আলোচনায় সরগরম হয়ে উঠল। সেদিন যে দুজন কয়েদীকে চাবুক মারা হবে তাদের নিয়েই আলোচনা। তাদের একজন ভাসিল্যেভ। লেখাপড়া জানা যুবক, করণিক, ঈর্ষার বশে প্রণয়িণীকে খুন করেছে। অন্য সব কয়েদী তাকে খুব পছন্দ করে, কারণ সে হাসিখুশি ও উদার, এবং কারা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারে খুব শক্ত। সে আইন-কানুন জানে এবং সেগুলো যাতে পালিত হয় তাই চায়। সুতরাং কারা-কর্তৃপক্ষ তাকে পছন্দ করে না।

তিন সপ্তাহ আগে একটা ঝাড়ুদার তার নতুন পোষাকে খানিকটা ঝোল ঢেলে ফেলেছিল বলে কারারক্ষী তাকে মেরেছিল। ভাসিল্যেভ ঝাড়ুদারের পক্ষ নিয়ে বলেছিল, একজন কয়েদীকে মারধোর করা বেআইনী।

'তোকে আইন শিখিয়ে দেব,' বলে কারারক্ষী রেগে ভাসিল্যেভকে গালাগালি করে। ভাসিল্যেভও সমানে জবাব দেয়। ফলে কারারক্ষী তাকে মারতে উঠলে ভাসিল্যেভ সজোরে তার হাত চেপে ধরে দু'তিন মিনিট পরে তাকে ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। কারারক্ষী ইন্সপেক্টরের কাছে নালিশ করলে ভাসিল্যেভকে নির্জন সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নির্জন সেল হচ্ছে বাইরে থেকে তালাবন্ধ এক সার অন্ধকার খুপড়ি। তাতে খাটিয়া নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই ; কাজেই বাসিন্দাদের শুতে-বসতে হয় নোংড়া মেঝেতে, আর সেলের প্রচুরসংখ্যক ইঁদুর তাদের গায়ের উপর দিয়েই চলাফেরা করে। ইঁদুরগুলি এতদূর সাহসী যে কয়েদীদের রুটি চুরি করে নেয় এবং তারা চুপচাপ থাকলেই আক্রমণ করেও থাকে। ভাসিল্যেভ বলল, সে কোন অন্যায় করে নি, কাজেই নির্জন সেলে যাবে না। কিন্তু তারা গায়ের জোর খাটাতে লাগল। সেও বাধা দিল, আর দুজন কয়েদী তাকে রক্ষীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল। রক্ষীরা সব ছুটে এল। তাদের মধ্যে একজন ছিল খুব শক্তিশালী। তার নাম পেত্রভ্। কয়েদীদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে নির্জন সেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরকে খবর পাঠানো হল যে, বিদ্রোহের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেছে ; সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর হুকুম পাঠাল, দুজন প্রধান অপরাধী ভাসিল্যেভ ও ভবঘুরে নেপমনায়াস্কিকে

বার্চ কাঠের লাঠি দিয়ে ত্রিশ ঘা করে মারা হোক।

এই মারধোরের ব্যাপারটা হবে মেয়েদের ভিজিটিং-রুমে।

রাত থেকেই কারাগারের সর্বত্র কথাটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল; প্রতিটি সেলে সাড়ম্বরে সেই আলোচনাই চলছিল।

কোরাব্‌ল্যুভা, খরশাভকা, ফেদসিয়া ও মাসলভা এক কোণে বসে চা খাচ্ছিল। ভদকা খেয়ে সকলেই বেশ চুর হয়ে আছে। মাসলভা ইদানিং প্রচুর ভদকা আনাচ্ছে আর সঙ্গিনীদের বিনা পয়সায় খাওয়াচ্ছে।

এমন সময় একটি কারারক্ষিণী এসে জানাল, একজন লোক মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

মাসলভা চোখ টিপে বলল, 'আর এক ফোঁটা পেলে হত, মনটাকে চাঙ্গা করতে হবে তো।' করাব্‌ল্যুভা আধ কাপ ভদকা ঢেলে দিল, মাসলভা খেয়ে নিল। তারপর মুখ মুছে 'মনটাকে চাঙ্গা করতে হবে তো' বলতে বলতে মাথাটা দুলিয়ে হাসতে হাসতে রক্ষিণীর পিছন পিছন করিডর দিয়ে চলে গেল।

অধ্যায়—৪৭

নেখ্‌ল্যুদভ অনেকক্ষণ যাবৎ হলে অপেক্ষা করছিল। কারাগারে পৌঁছেই সে প্রধান ফটকের ঘণ্টা বাজায় এবং কর্তব্যরত কারারক্ষীকে ন্যায়াধীশের দেওয়া অনুমতি-পত্রটা দেখায়।

'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'কয়েদী মাসলভা।'

'এখন তো হবে না; ইন্সপেক্টর ব্যস্ত আছেন।'

'তিনি কি আপিসে আছেন?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

রক্ষী একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলল, 'না, এই ভিজিটিং-রুমেই আছেন।'

'সে কি? আজ কি সাক্ষাৎকারের দিন?'

'না, তবে একটা বিশেষ কাজ আছে।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। কি করতে হবে?' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এলে তাকে বলবেন—একটু অপেক্ষা করুন' রক্ষী বলল।

ঠিক সেই সময় একজন সার্জেণ্ট-মেজর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। তার পরিচ্ছন্ন চকচকে মুখে তামাকের ধোঁয়ায় বিবর্ণ একজোড়া গোঁফ; তার পোষাকের সোনালি দড়ি ঝকঝক করছে। কড়া গলায় সে রক্ষীকে বলল, 'যাকে-তাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছ কেন? আপিসে—'

সার্জেণ্ট-মেজরের আচরণে একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করে নেখ্‌ল্যুদভ বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি শুনলাম যে ইন্সপেক্টর এখানেই আছেন।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভিতরের দরজাটা খুলে গেল, আর উত্তপ্ত ঘর্মাক্ত দেহে বেরিয়ে এল পেত্রভ।

সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ফিরে সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'মনে রাখবেন।'

সার্জেন্ট-মেজর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। পেত্রভ ভুরু কুঁচকে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ ভাবতে লাগল, 'কে মনে রাখবে? সবাইকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন? সার্জেন্ট-মেজর তার দিকেই বা তাকাল কেন?'

সার্জেন্ট-মেজর নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, 'এখানে তো দেখা হবে না; দয়া করে আপিসে চলুন।'

এমন সময় পিছনের দরজা দিয়ে ইন্সপেক্টর বেরিয়ে এল। সে অনবরত নিঃশ্বাস টানছে। অধীনস্থ লোকদের চাইতেও তাকে বেশী বিচলিত দেখাচ্ছে। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সে রক্ষীর দিকে তাকাল।

'ফেদতভ, মেয়েদের ওয়ার্ডের ৫নং সেলের মাসলভাকে আপিসে পাঠিয়ে দাও।'

তারপর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে বলল, 'অনুগ্রহ করে এদিকে আসবেন কি?' একটা খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে তারা একটা ছোট ঘরে ঢুকল। ঘরে একটিমাত্র জানালা। ইন্সপেক্টর বসল।

একটা সিগারেট বের করে বলল, 'ভারী শক্ত কাজ করতে হয়।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে, আপনি খুব ক্লান্ত।'

'এ চাকরিটাই ক্লান্তিকর—কাজও খুব কঠিন। ওদের যতই ভাল করতে চেষ্টা করা যায় ততই আরও খারাপ হয়। আমার একমাত্র চিন্তা কেমন করে এখান থেকে চলে যাব। বেশী কাজ, বড় বেশী কাজ।'

ইন্সপেক্টরের বিশেষ কষ্টটা যে কি নেখ্‌ল্যুদভ তা জানে না। কিন্তু আজ সে এতই বিষণ্ণ ও অসহায় অবস্থায় আছে যে দেখলে করুণা হয়।

বলল, 'হ্যাঁ, কাজটা কঠিন বলেই মনে হয়। তাহলে এ কাজ করছেন কেন?'

'পরিবার আছে, কিন্তু সঙ্গতি নেই।'

'কিন্তু কাজটা যদি এতই শক্ত হয়—'

'দেখুন, যতই হোক, কিছুটা কাজ তো করা যায়; যতটা পারি নরম ব্যবহার করতেই চেষ্টা করি। আমার জায়গায় অন্য কেউ এলে অবস্থাটা অন্য রকম দাঁড়াত। এখানে দু' হাজারেরও বেশী লোক আছে। আর সে যে কী সব লোক! কিন্তু তাদের নিয়েই চলতে হবে। যতই হোক, তারাও তো মানুষ; তাদের করুণা না করে কি পারা যায়। আবার তাদের হাতের মুঠোয়ও রাখা চাই।'

সম্প্রতি যে কয়েদীদের মধ্যে লড়াই বেধে গিয়েছিল এবং তাতে একজন

মারা গিয়েছিল, ইন্সপেক্টর সেই গল্প বলতে আরম্ভ করল।

একজন রক্ষীসহ মাসলভা ঘরে ঢোকায় গল্পে বাধা পড়ল।

মাসলভা ইন্সপেক্টরকে দেখবার আগেই নেখ্‌ল্যুদভ দরজায় তাকে দেখতে পেয়েছিল। তার চোখ-মুখ লাল, টলতে টলতে হাঁটছে, মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে। ইন্সপেক্টরকে দেখেই সে বদলে গেল, ভয়ার্ত চোখে তার দিকে তাকাল; কিন্তু সে ভাব কাটিয়ে খুশি মনে সাহসের সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে কথা বলল।

একটুখানি হেসে তার হাত ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে টেনে বলল, 'কেমন আছেন?'

যে রকম সাহসের সঙ্গে মাসলভা আজ তাকে সম্ভাষণ জানাল তাতে বিস্মিত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'একটা দরখাস্ত এনেছি, তোমাকে সই করতে হবে। অ্যাডভোকেট দরখাস্তটা লিখে দিয়েছে। তুমি সই করবে, তারপর সেটাকে পিতার্সবার্গে পাঠিয়ে দেব।'

চোখটা টিপে সে হেসে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। আপনার যেমন খুশি।'

পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে নেখ্‌ল্যুদভ টেবিলের কাছে গেল।

ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে এসে সইটা করতে পারে কি?'

ইন্সপেক্টর বলল, 'হ্যাঁ, এখানে বস। কলম নাও। তুমি লিখতে পার তো?'

'এক কালে পারতাম', সে বলল; স্কার্ট ও জ্যাকেটের আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে সে হেসে টেবিলের পাশে গিয়ে বসল, ছোট হাতটা বাড়িয়ে অদ্ভুতভাবে কলমটা নিল, তারপর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

কোথায় সই করতে হবে নেখ্‌ল্যুদভ দেখিয়ে দিল।

মাসলভা দোয়াতে কলম ডুবিয়ে সযত্নে কয়েক ফোঁটা কালি ঝেড়ে ফেলে নিজের নামটা লিখল।

প্রথমে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে এবং তারপরে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে, কলমটা একবার দোয়াত-দানিতে, একবার কাগজের উপর রাখতে রাখতে প্রশ্ন করল, 'সব হল তো?'

তার হাত থেকে কলমটা নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার আছে।'

সে বলল, 'ঠিক আছে; বলুন।' তারপরই হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় অথবা ঘুম পাওয়ায় সে খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

ইন্সপেক্টর উঠে ঘর থেকে চলে গেল। রইল শুধু নেখ্‌ল্যুদভ ও মাসলভা।

অধ্যায়—৪৮

যে রক্ষী মাসলভাকে নিয়ে এসেছিল সে তাদের থেকে কিছুটা দূরে জানালার বাজুতে বসে ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভের সামনে চরম মুহূর্ত সমাগত। প্রথম সাক্ষাতেই আসল কথাটা না বলার জন্য সে অনবরত নিজেকেই দোষ দিচ্ছিল, তাই সে যে তাকে বিয়ে করতে চায় সে কথা বলতে আজ সে দৃঢ়সংকল্প। টেবিলের এক কোণে মাসলভা বসে আছে। তার উল্টো দিকে বসেছে নেখ্‌ল্যুদভ। ঘরে বেশ আলো আছে। নেখ্‌ল্যুদভ এই প্রথম খুব কাছে থেকে তার মুখ দেখতে পেল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল, মাসলভার চোখের নীচে কালি পড়েছে, মুখখানা বলি-রেখায় ভর্তি, চোখের পাতা ফুলো-ফুলো। তার মন করুণায় ভরে উঠল।

ধূসর গোঁফওয়ালা ইহুদী জাতীয় রক্ষীটি যাতে শুনতে না পায় সেজন্য টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল :

'এ দরখাস্তে যদি ফল না হয় আমরা সম্রাটের কাছে আবেদন জানাব। যা কিছু সম্ভব সবই করা হবে।'

মাসলভা বাধা দিল, 'তবেই দেখুন, প্রথম থেকেই যদি একজন ভাল অ্যাডভোকেট থাকত। আমার কৌশুলিটা তো একেবারেই বোকা। সে আমার প্রশংসা করা ছাড়া আর কিছুই করল না,' এই কথা বলে সে হাসতে লাগল। 'তখন যদি জানতাম যে আমি আপনার পরিচিত তাহলে তো ব্যাপারটা অন্যরকম হত। তারা তো মনে করে সকলেই চোর।'

'আজ সে কত বদলে গেছে,' এই কথা ভেবে নেখ্‌ল্যুদভ তার মনের কথা বলতে শুরু করল, 'আগের বারে তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে?'

মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে দোলাতে হেসে হেসে সে বলল, 'সেদিন তো আপনি অনেক কথাই বলেছেন। কি বলেছিলেন বলুন তো?'

'বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

'তাতে কি লাভ? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, তাতে হবেটা কি? বরং ভাল হত যদি—'

'শুধু কথা নয়, কাজের ভিতর দিয়ে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি স্থির করেছি, তোমাকে বিয়ে করব।'

হঠাৎ তার সারা মুখে আতংক ফুটে উঠল। তার টেঁরা চোখ দুটি তার উপরেই স্থিরনিবদ্ধ হয়ে রইল, অথচ মনে হল, সে যেন তাকে দেখছে না।

সক্রোধে ভ্রূকুটি করে সে বলে উঠল, 'তাতে কি হবে?'

'আমি মনে করি, একাজ করা ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্তব্য।'

'এতদিনে কোন্ ঈশ্বরকে খুঁজে পেলেন? আপনার কথাগুলি অর্থহীন।

ঈশ্বরই বটে! কোন্ ঈশ্বর? ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত ছিল সেদিন,' কথাগুলি শেষ করেও মাসলভা হাঁ করে রইল।

এতক্ষণে নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল যে তার নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে; মাসলভার উত্তেজনার কারণ সে বুঝতে পারল।

'শান্ত হতে চেষ্টা কর,' সে বলল।

'কেন শান্ত হব? ভাবছেন মাতাল হয়েছি? হ্যাঁ। আমি মাতাল, কিন্তু আমি কি বলছি তা জানি!' অতি দ্রুত সে কথাগুলি বলতে লাগল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'আমি কয়েদী, আমি বেশ্যা, আর আপনি ভদ্রলোক, আপনি প্রিন্স। আমাকে ছুঁয়ে আপনাকে নোংরা হতে হবে না। আপনার রাজকুমারীর কাছে চলে যান, আমার দাম তো একখানা দশ রুবলের নোট।'

'যতই নিষ্ঠুরভাবে কথা বল, আমার মনের ভাব তুমি প্রকাশ করতে পারবে না।' কথা বলবার সময় তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। 'তোমার প্রতি অন্যায় করেছি এ বোধ যে আমার মনে কত গভীর তা তুমি কল্পনাও করতে পার না।'

নেখ্‌লয়ুদভের কথার নকল করে মাসলভা রেগে বলল, 'কত অন্যায় করেছেন! সেদিন তো তা মনে করেন নি, বরং আমাকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন একশ' রুবল। সেটাই তো···আপনার দাম!'

'আমি জানি, আমি জানি; কিন্তু এখন কি কর্তব্য? আমি স্থির করেছি, তোমাকে ছেড়ে যাব না, যা বললাম তাই করব।'

'আর আমি বলি, তা করবেন না', বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

'কাতয়ুশা!' তার হাতখানি ধরে সে ডাকল।

'আপনি চলে যান। আমি কয়েদী আর আপনি প্রিন্স। এখানে আপনার কিছুই করবার নেই।' সে চীৎকার করে বলল। ক্রোধে তার সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেছে। হাতটাও সে টেনে নিল।

কি মনে করে সে আবার বলে উঠল, 'আমাকে দিয়ে আপনি নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন। এ জন্মে আমাকে দিয়ে মজা লুটেছেন, আর পরজন্মে আমাকে দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন। আপনাকে আমি ঘৃণা করি—আপনার চশমা, আপনার ঐ নোংরা মুখ, সব কিছু। চলে যান, চলে যান।' আর্তনাদ করে সে উঠে দাঁড়াল।

রক্ষী এগিয়ে এল।

'কী হৈ চৈ শুরু করেছেন আপনারা? এ চলবে না—'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'ওর কথায় কান দিও না।'

রক্ষী বলল, 'তাই বলে নিজেকে ভুললে তো চলবে না।'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'আর একটু অপেক্ষা কর ভাই।' রক্ষী আবার জানালায় ফিরে গেল।

'মাসলভা আবার বসে পড়ল। চোখ নামিয়ে দুখানি ছোট ছোট হাত আঁকড়ে ধরল। কি করবে বুঝতে না পেরে নেখ্‌ল্যুদভ তার উপরে ঝুঁকে দাঁড়াল।

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

'আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান এই কথা? সে কোন দিন হবে না। তার আগে আমি ফাঁসিতে ঝুলব। চলে যান।'

'যাই বল, আমি তোমাকে সেবা করেই যাব।'

'সেটা আপনার ব্যাপার, কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই চাই না। এই হল খাঁটি কথা।'

'হায়, তখন কেন আমার মৃত্যু হল না,' একটু পরেই এই কথা বলে মাসলভা করুণভাবে কাঁদতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ কোন কথা বলতে পারল না। ওর চোখের জল তাকে বিহ্বল করেছে।

মাসলভা চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকে দেখতে লাগল। হাতের রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

রক্ষী আবার এগিয়ে এসে জানাল, সময় হয়ে গেছে। মাসলভা উঠে দাঁড়াল।

'তুমি আজ খুব উত্তেজিত। সম্ভব হলে আমি কাল আবার আসব—কথাটা ভেবে দেখ,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

মাসলভা কোন জবাব দিল না। চোখ না তুলেই রক্ষীর পিছন পিছন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেলে ফিরে সে সঙ্গিনীদের কোন কথার জবাব দিল না। তক্তার উপর শুয়ে ট্যারা চোখ দুটিকে ঘরের এক কোণে নিবদ্ধ রেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে দিল।

তার মনের মধ্যে একটি বেদনার্ত সংগ্রাম চলেছে। নেখ্‌ল্যুদভের কথায় সেই জগতের কথা তার মনে পড়ে গেল যেখানে অনেক যন্ত্রণা সে সহ্য করেছে, যে জগৎকে সে ঘৃণায় ত্যাগ করে এসেছে। যে মোহগ্রস্ত অবস্থার মধ্যে এতদিন সে বেঁচেছিল, আজ সে মোহ ভেঙে সে জেগে উঠেছে। কিন্তু সে স্মৃতিকে মনের মধ্যে পুষে রেখে বেঁচে থাকাও যে অসম্ভব। সে যে বড় কষ্টের কাজ। তাই রাত হতেই সে আরও খানিকটা ভদকা কিনে এনে সঙ্গিনীদের সঙ্গে খেতে বসে গেল।

অধ্যায়—৪৯

কারাগার থেকে যেতে যেতে নেখ্‌লয়ুদভ ভাবতে লাগল, 'এই তাহলে এর অর্থ—এই।' যেন এতদিনে নিজের অপরাধের গুরুত্ব সে বুঝতে পেরেছে। প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা না করলে নিজের দোষের গুরুত্ব সে কোন দিনই বুঝতে পারত না। শুধু তাই নয়, মাসলভাও বুঝতে পারত না তার প্রতি কী অন্যায় করা হয়েছে। সে অন্যায় যেন এতদিনে তার সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতদিনে নেখ্‌লয়ুদভ যেমন বুঝতে পেরেছে এই নারীর আত্মার প্রতি কী অপরাধ সে করেছে, তেমনি মাসলভাও বুঝতে পেরেছে কতখানি অন্যায় তার প্রতি করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত নেখ্‌লয়ুদভ এক রকম আত্ম-স্তুতিতে মগ্ন ছিল, খুশি ছিল নিজের বিষাদকে নিয়ে; কিন্তু এখন তার সারা মন আতংকে ভরে উঠেছে। সে জানে, মাসলভাকে আর সে ত্যাগ করতে পারে না, অথচ তাদের সম্পর্কের পরিণতি যে কি তাও সে কল্পনা করতে পারে না।

ঠিক বের হবার মুখে বুকের উপর ক্রশ ও মেডেল ঝোলানো একটি কারারক্ষী রহস্যের মত এসে হাজির হয়ে তার হাতে একটা চিরকুট দিল।

খামটা নেখ্‌লয়ুদভের হাতে দিয়ে বলল, 'মাননীয় মহাশয়, একজন লোক এই চিঠিটা দিয়েছে।'

'কে লোক?'

'পড়লেই জানতে পারবেন। একজন রাজনৈতিক বন্দী। আমি সেই ওয়ার্ডে আছি, তাই আমাকেই দিতে বললেন; যদিও এটা আইনবিরুদ্ধ, তবু মানবতার খাতিরে ·' কারারক্ষী অস্বাভাবিক ভাবে কথাগুলি বলল।

রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডের কোন রক্ষী কারা-প্রাচীরের ভিতরেই চিঠি চালাচালি করছে, আর তাও সকলের প্রায় চোখের সামনে, এতে নেখ্‌লয়ুদভ বিস্মিত হল। সে তখন জানত না যে লোকটি রক্ষী এবং গুপ্তচর দুই-ই। যা হোক, চিরকুটটা হাতে নিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে সেটা সে পড়ল।

মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে: 'আপনি এ কারাগারে আসেন এবং কোন ফৌজদারী আসামীর ব্যাপারে আপনি আগ্রহী, এ কথা জেনে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা আমার মনে জেগেছে। আমার সঙ্গে দেখা করার একটা অনুমতি-পত্রের জন্য আবেদন করুন। অনুমতি আপনি পাবেন। আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির তথা আমাদের দলের সম্পর্কে আপনার প্রয়োজনীয় অনেক কথাই আমি বলতে পারি।—আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাসহ ভেরা দুখোভা।'

ভেরা দুখোভা ছিল নভগরদ জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের একজন স্কুল-

শিক্ষয়িত্রী। এক সময় নেখ্‌ল্যুদভ ও তার কয়েকজন বন্ধু ভালুক-শিকার উপলক্ষ্যে সেই গ্রামে কিছুদিন ছিল, সেই সময় একটা পাঠ-ক্রমে যোগ দেবার জন্য মেয়েটি নেখ্‌ল্যুদভের কাছে কিছু অর্থ চেয়েছিল। টাকাটা সে দিয়েছিল এবং তারপর সে কথা ভুলেও গিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই মেয়েটি এই কারাগারেই একজন রাজনৈতিক বন্দী এবং তাকে সাহায্য করতে আগ্রহী।

তখন সব কিছুই কেমন সহজ ও সরল ছিল, আর আজ সব কিছুই কেমন কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছে।

সেই দিনগুলির কথা, দুখোভার সঙ্গে তার পরিচয়ের কথা খুব স্পষ্টভাবেই নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল। স্থানটা ছিল লেণ্ট-এর কাছে রেলস্টেশন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। শিকার বেশ ভালই হয়েছিল—দুটো ভালুক মারা হয়েছিল আর ফিরতি যাত্রার প্রাক্কালে তারা সদলে খাবার খাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির মালিক এসে জানাল, পুরোহিতের মেয়ে প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।

কে একজন বলে উঠল, 'দেখতে সুন্দরী তো?'

'দয়া করে ও সব কথা বলো না,' এই কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ গম্ভীর মুখে উঠে গেল। মুখটা ধুয়ে পুরোহিতের মেয়ের তার কাছে কি দরকার থাকতে পারে ভাবতে ভাবতে বাড়ির মালিকের অংশে গিয়ে হাজির হল।

সেখানে পশমি টুপি ও গরম জোব্বা পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেল। পেশীবহুল কুৎসিত চেহারা; শুধু বাঁকা ভুরুসমন্বিত চোখ দুটি সুন্দর।

মালিকের বৃদ্ধা স্ত্রী বলল, 'এই যে মেয়ে, কথা বল; ইনিই প্রিন্স। আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'আমি কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

খুবই অপ্রস্তুত হয়ে মেয়েটি বলল, 'আমি···আমি···আমি দেখছি আপনি খুব ধনী; এই সব বাজে কাজ—শিকারের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেন। আমি জানি···একটি মাত্র জিনিস আমি চাই··যাতে আমি লোকের কোন কাজে লাগতে পারি; আমি তো কিছুই জানি না, তাই কিছু করতেও পারি না।'

তার চোখ দুটি এত সহজ, এত করুণ, তার মুখের দৃঢ় অথচ লাজুক ভঙ্গী এতই মনোরম যে নেখ্‌ল্যুদভ যেন হঠাৎ নিজেকে তার জায়গায় বসিয়ে তাকে বুঝতে পারল, তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল।

'আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি একজন শিক্ষিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার আমার খুব ইচ্ছা, কিন্তু পড়তে পারছি না। মানে, আমার পড়ায় কেউ বাধা দিচ্ছে তা নয়; অনুমতি ওরা দেবে, কিন্তু আমার সামর্থ্য নেই। আপনি আমাকে সেই টাকাটা দিন,

পাঠক্রম শেষ করে সে টাকা আমি শোধ করে দেব। আমি ভাবছিলাম, ধনীরা ভালুক মারে, চাষীদের মদ খাওয়ায়, এ সবই তো বাজে কাজ। কেন তারা ভাল কাজ করবে না? আমি আপনার কাছে আশি রুবল মাত্র চাই ...অবশ্য যদি আপনি দিতে না চান তো কোন কথা নেই,' শেষের কথাগুলি সে হঠাৎ বলে ফেলল।

'ঠিক উল্টো; এই সুযোগটা দেবার জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখনই টাকাটা এনে দিচ্ছি,' বলল নেখ্‌লুদভ।

বাইরে বেরিয়ে দালানেই জনৈক সঙ্গীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তার কোন কথায় কান না দিয়ে নেখ্‌লুদভ টাকাটা বের করে নিয়ে মেয়েটিকে দিল।

বলল, 'না, না, ধন্যবাদ দেবেন না। আমারই উচিত আপনাকে ধন্যবাদ জানানো।'

সেদিনের কথা মনে করে আজ কী ভালই লাগছে। মনে পড়ছে, একজন অফিসার এই নিয়ে আপত্তিকর ঠাট্টা করাতে তার সঙ্গে প্রায় ঝগড়াই হয়ে গিয়েছিল; আবার এ ব্যাপারে অপর এক বন্ধু তার পক্ষ সমর্থন করায় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। সেবারকার শিকার-অভিযান কী সফলই না হয়েছিল! সে রাতে রেলওয়ে স্টেশনে ফিরবার পথে সে কী সুখীই বোধ করেছিল।...

দুই ঘোড়ায় টানা স্লেজগুলি সংকীর্ণ বনের পথ ধরে সার বেঁধে দ্রুত ছুটে চলেছে, কখনও বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে, কখনও বা শাখায় শাখায় জমে থাকা বড় বড় বরফের চাঁইয়ের চাপে নুয়ে পড়া নীচু ফার গাছের ভিতর দিয়ে। অন্ধকারে হঠাৎ একটা লাল আলো ঝলসে উঠছে; কে যেন একটা সুগন্ধি সিগারেট ধরাল। ভালুক-চালক অসিফ এক হাঁটু বরফ ভেঙে একটা স্লেজ থেকে আর একটা স্লেজ-এ যাচ্ছে; সব ঠিকঠাক করে দিয়ে কখনও হরিণের গল্প বলছে, পুরু বরফের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তারা অ্যাসপেন গাছের বাকলে গা ঘসছে; কখনও বা ভালুকের গল্প বলছে: লুকনো গাছের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে আছে, গর্তের ফাঁক দিয়ে তাদের গরম নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে।

সব কথাই নেখ্‌লুদভের মনে পড়ছে, বিশেষ করে মনে পড়ছে স্বাস্থ্য, শক্তি ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের আনন্দের কথা। বরফ-গলা বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে; গাছের নীচু ডাল থেকে ছোট ছোট বরফের টুকরো মুখের উপর ঝরে পড়ছে; তার শরীর উষ্ণ, মুখ সতেজ, তার আত্মা দুশ্চিন্তা, অনুশোচনা, ভয় বা বাসনা থেকে মুক্ত...কী সুন্দর সে দিনগুলি। আর এখন, হে ঈশ্বর! কী যন্ত্রণা, কী কষ্ট!

বোঝাই যাচ্ছে, ভেরা দুখোভা একজন বিপ্লবী, আর সেই জন্যই বন্দী

হয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে, বিশেষ করে সে যখন মাসলভার ব্যাপারে পরামর্শ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

অধ্যায়—৫০

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আগের দিন সে কি কি করেছে সে কথা মনে পড়তেই নেখ্‌ল্যুদভ ভীত হয়ে পড়ল।

কিন্তু সে ভয় সত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে কাজ শুরু করেছে তাকে শেষ করবেই।

কর্তব্যবুদ্ধিতে সচেতন হয়ে সে মাসলেনিকভের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তার কাছ থেকে মাসলভার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া, দুখোভার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতিও সে চাইবে, কারণ মাসলভার ব্যাপারে তার কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে।

মাসলেনিকভের সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের পরিচয় অনেক দিনের। সেনাবাহিনীতে দুজন এক সঙ্গেই ছিল। সে সময় মাসলেনিকভ ছিল সেনাদলের বেতন দেবার কর্তা। সে ছিল দয়ালু-হৃদয় উচ্চাকাংখী অফিসার, সেনাবাহিনী ও রাজ-পরিবারের বাইরে সে কিছুই জানত না, জানতে চাইতও না। এখন সে সেনাবাহিনী থেকে শাসন বিভাগে চলে এসেছে। সে একটি ধনী উদ্যমশীলা মহিলাকে বিয়ে করেছে, আর সেই তাকে জোর করে এ বিভাগে আনিয়েছে।

নেখ্‌ল্যুদভকে দেখেই মাসলেনিকভের সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লোকটি এক রকমই আছে। সেই চর্বি, সেই লাল মুখ, আর সামরিক দিনগুলির মতই স্থূলকায় ও পরিপাটি পোষাক। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও (মাসলেনিকভের বয়স ছিল চল্লিশ) দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

'হ্যাল্লো বন্ধু! কী সৌভাগ্য তুমি এসেছ! চল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। সভা আরম্ভ হবার আগে দশ মিনিট সময় আমার হাতে আছে। জান, আমার উপরওয়ালা এখন বাইরে, কাজেই আমিই এখন জেলার শাসন বিভাগের প্রধান', সে এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন নিজের খুশিটাকে চেপে রাখতেই পারছে না।

'আমি একটা কাজে এসেছি।'

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেল মাসলেনিকভ, একটু কড়া গলায় প্রশ্ন করল, 'কি কাজ?'

'আমি বিশেষভাবে জড়িত এমন একজন কারাগারে রয়েছে ('কারাগার' শব্দটা শুনেই মাসলেনিকভের মুখ আরও শক্ত হয়ে উঠল); তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, সাধারণ ভিজিটিং-রুমে নয়, আপিসে, আর নির্দিষ্ট দিনেও নয়। আমি শুনেছি, ব্যাপারটা তোমার উপর নির্ভর করে।'

'নিশ্চয় প্রিয় বন্ধু, তোমার জন্য আমি সব করব,' নেখ্‌লয়ুদভের হাঁটুর উপর দুটো হাত রেখে মাসলেনিকভ বলল, 'কিন্তু মনে রেখ, আমি এক ঘণ্টার বাদশা।'

'তাহলে এমন একটা আদেশ-নামা আমাকে দাও যাতে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি।'

'কোন স্ত্রীলোক কি?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে এসেছে কেন?'

'বিষ খাওয়ানোর অভিযোগে, কিন্তু তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।'

'ঠিক, ঠিকই ধরেছ, এই তো তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠ জুরি প্রথা, ils n'en font point d'autres (তারা অন্য কিছু করতে পারে না)' কোন অজ্ঞাত কারণে সে ফরাসিতে কথাগুলি বলল। 'আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে না, কিন্তু কোন উপায় নেই, c'est mon opinion bien arretee (এটা আমার একান্ত স্থির বিশ্বাস),' সে আরও বলল। গত বারো মাস যাবৎ একটা প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল সংবাদপত্রে যে মতবাদটা সে পড়ে আসছে তারই পুনরাবৃত্তি সে করল। 'আমি জানি তুমি একজন উদারপন্থী।'

নেখ্‌ল্যুদভ হেসে বলল, 'আমি উদারপন্থী কি না জানি না।' সে বিশ্বাস করে যে, বিচারের আগে প্রত্যেকটি লোককে তার কথা বলতে দেওয়া উচিত; দণ্ডদানের আগে পর্যন্ত আইনের চোখে সব মানুষই সমান; কোন মানুষের সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করা বা তাকে মারধোর করা উচিত নয়, বিশেষ করে যারা এখনও দণ্ডিত হয় নি। যখনই সে মুখে এই সব কথা বলেছে তখনই তাকে একটি রাজনৈতিক দলভুক্ত করে তাকে উদারপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়েছে দেখে নেখ্‌ল্যুদভ বরাবরই বিস্ময় বোধ করেছে। 'আমি উদারপন্থী কি না জানি না; তবে এটা জানি যে বর্তমান ব্যবস্থা যত খারাপই হোক, এটা পুরনো ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল।'

'অ্যাডভোকেট হিসাবে কাকে ধরেছ?'

'ফানারিনের সঙ্গে কথা বলেছি।'

'হায়রে, ফানারিন!' মুখ বেঁকিয়ে মাসলেনিকভ বলে উঠল। তার মনে পড়ল, বছরখানেক আগে একটা মামলার সাক্ষী হিসাবে জেরা করার সময় প্রায় আধঘণ্টা ধরে খুবই ভদ্রভাবে সে তাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল।

'আমার পরামর্শ হল, তার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ রাখবেন না। ফানারিন est sin homme tare' (লোকটা অত্যন্ত খারাপ)।'

সে কথার জবাব না দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমার আর একটা অনুরোধ

আছে। একটি তরুণীকে আমি অনেকদিন আগে চিনতাম, একটি শিক্ষিকা—বেচারির জন্য দুঃখ হয়—এখন সেও বন্দী। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তার জন্যও একটা অনুমতি-পত্র কি দিতে পারবে?'

মাসলেনিকভ ঘাড়টা একদিকে কাত করে একটু ভাবল।

'রাজনৈতিক বন্দী কি?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই শুনেছি।'

'দেখ, শুধু আত্মীয়-স্বজনদেরই রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়। তবু আমি তোমাকে খোলা হুকুমনামা দেব। Je sais que vous n' abusere z pas (আমি জানি, তুমি এটার অপব্যহার করবে না)। তোমার অনুগৃহিতার নাম কি? দুখোভা? Elle est jolie (সে খুব ভাল মেয়ে)।'

মাসলেনিকভ ঘাড় নাড়তে নাড়তে টেবিলের কাছে গেল এবং একটা ছাপানো চিঠির কাগজে লিখল:

'এই পত্রবাহক প্রিন্স দিমিত্রি-আইভানভিচ নেখ্‌লুয়ুদভকে কয়েদী মাসলভা এবং সহকারী চিকিৎসক দুখোভার সঙ্গে কারা-আপিসে দেখা করতে দেওয়া হোক।' যথারীতি শব্দ-সম্ভার যোগ করে চিঠিখানি শেষ করল।

'এবার নিজের চোখেই দেখতে পাবে সেখানে আমরা কী রকম শৃংখলা বজায় রেখেছি। সেখানে এত লোকের ভীড় যে শৃংখলা রক্ষা করা খুবই শক্ত, বিশেষ করে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিতদের নিয়েই সমস্যা। কিন্তু আমি খুব কড়া নজর রাখি, আর কাজটাকে ভালও বাসি। গেলেই দেখতে পাবে, তারা কেমন আরামে আছে, সুখে আছে। আসলে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানা চাই। এই তো কয়েকদিন আগেই একটা ছোটখাট গোলমাল হয়েছিল—অবাধ্যতার ব্যাপার আর কি; অন্য কেউ হলে একেই বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করে অনেকেরই কষ্টের একশেষ করে ছাড়ত, কিন্তু আমরা সব কিছুই শান্তভাবে মিটিয়ে দিলাম। একদিকে যেমন চাই ক্ষমা, অপর দিকে তেমনি চাই দৃঢ়তা ও শক্তি। সোনার বোতাম লাগানো কড়া ইস্তিরির আস্তিনের ভিতর থেকে সে তার হাত স্থূল, সাদা, পীরোজা-বসানো আংটিওয়ালা আঙুলগুলির মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা বের করল। 'ক্ষমা আর দৃঢ় ক্ষমতা।'

নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, 'আমি অবশ্য এ বিষয়ে কিছুই জানি না। তবে দুদিন সেখানে গিয়েছি, আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

যাহোক, আর কথা না বাড়িয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ প্রাক্তণ সহকর্মীর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

'কিন্তু ভিতরে গিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে না?'

'ক্ষমা কর; এখন একেবারেই সময় নেই।'

'আরে বাবা, সে যে আমাকে মেরে ফেলবে,' বলতে বলতে মাসলেনিকভ

পুরনো বন্ধুর সঙ্গে প্রথম ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত নেমে গেল ; প্রথম সারির নয় অথচ দ্বিতীয় সারির লোক যারা—নেখ্‌লয়ুদভকে সে এই শ্রেণীতেই ফেলেছে—তাদের বেলায় সে এতটা নামতেই অভ্যস্ত। সে আবার বলল, 'একটুখানির জন্য হলেও একবার ভিতরে চল না।'

কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ অবিচলিত। পিওন ও দরোয়ান তার লাঠি ও ওভারকোট নিতে ছুটে এসে দরজা খুলে দিল। দরজার বাইরে একজন পুলিশও দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ পুনরায় জানাল যে সে আর অপেক্ষা করতে পারবে না।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই মাসলেনিকভ বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে বৃহস্পতিবারে এস। সেদিন ওর একটা পার্টি আছে। আমি ওকে বলব যে তুমি আসছ।'

অধ্যায়—৫১

মাসলেনিকভের আপিস থেকে নেখ্‌লয়ুদভ সোজা চলে গেল কারাগারে এবং পূর্ব-পরিচিত ইন্সপেক্টরের বাসভবনে হাজির হল। আবারও তার কানে এল নীচু মানের পিয়ানোর বাজনা ; অবশ্য এবারে কোন অসংলগ্ন বাজনা নয়, পূর্বেকার মত সেই একই উদ্দীপনা, পরিচ্ছন্নতা ও দ্রুতলয়ের সঙ্গে ক্লিমেন্তির গৎগুলি বাজানো হচ্ছিল। চোখ-বাঁধা চাকর এসে জানাল ইন্সপেক্টর বাড়িতেই আছে এবং নেখ্‌লয়ুদভকে একটা ছোট ড্রয়িং-রুমে নিয়ে বসাল। ঘরে একটা সোফা, তার সামনে একটা টেবিল, ক্রোচেটের কাজ-করা ঢাকনার উপরে একটা বড় বাতি, তার লালচে রঙের কাগজের আবরণের একটা পাশ পুড়ে গেছে। যথারীতি সেই একই বিষণ্ণ শ্রান্ত মুখে ইন্সপেক্টর ঘরে ঢুকল।

ইউনিফর্মের মাঝের বোতামটা আঁটতে আঁটতে সে বলল, 'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি এই মাত্র ভাইস-গভর্ণরের কাছে গিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে এই অনুমতি-পত্র এনেছি। বন্দী মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

পিয়ানোর শব্দের জন্য স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করল, 'মারকভা?'

'মাসলভা!'

'ও, আচ্ছা।' ইন্সপেক্টর উঠে দরজার কাছে গেল। সেই ঘর থেকেই ক্লিমেন্তির গৎ ভেসে আসছিল।

'মারিয়া, তুমি কি এক মিনিটের জন্যও বাজনা থামাতে পার না?' সে এমন ভাবে কথাগুলি বলল যেন এই বাজনাই তার জীবনের কাল হয়েছে। 'একটা কথাও যদি শোনা যায়।'

পিয়ানো থামল। ভেসে এল অনিচ্ছুক পায়ের শব্দ। কে যেন দরজায়

উঁকি দিল।

বাজনা থেমে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করে ইন্সপেক্টর নরম তামাকের একটা মোটা সিগারেট ধরাল এবং নেখ্‌ল্যুদভকে একটা দিতে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ নিল না।

'আমি মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'মাসলভা! আজ তো মাসলভার সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হবে না,' ইন্সপেক্টর বলল।

'কেন বলুন তো?'

একটু হেসে ইন্সপেক্টর বলল, 'দেখুন, সেটা আপনারই ত্রুটি। প্রিন্স, তার হাতে টাকা পয়সা দেবেন না। যদি দিতেই হয়, আমাকে দেবেন। আমি তার জন্য রেখে দেব। দেখুন, মনে হচ্ছে গতকাল আপনি তাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন; তাই দিয়ে সে মদ আনিয়েছিল (এ আপদ আমরা কিছুতেই দূর করতে পারছি না), আর তাই খেয়ে সে আজ মাতাল, এমন কি উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে।'

'এও কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ, তাই হয়েছে। আমিও কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছি, তাকে একটা আলাদা সেল-এ রাখা হয়েছে। এমনিতে সে বেশ শান্ত মেয়ে। তাই দয়া করে তাকে টাকা দেবেন না। এই সব মানুষ...'

গতকালের সব কথা নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল। একটা আতংকে তাকে ঘিরে ধরল।

'আর দুখোভা, একটি রাজনৈতিক বন্দিনী; তার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?'

'হ্যাঁ, তা পারেন' ইন্সপেক্টর বলল। 'আরে, তুমি কি চাও?' পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তার উপর চোখ রেখে বাবার দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতেই একটা কম্বলে তার পা আটকে গেল। তাই দেখে ইন্সপেক্টর হেসে বলল, 'আরে, পড়ে যাবে যে।'

'দেখুন, যদি অনুমতি করেন তো আমি যেতে পারি।'

'তা পারেন।'

মেয়েটি তখনও একদৃষ্টিতে নেখ্‌ল্যুভকে দেখছে। ইন্সপেক্টর মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল এবং তাকে ইঙ্গিতে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল।

পরিচারিকার সাহায্যে সবে সে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজার কাছে এসেছে অমনি আবার ক্লিমেন্তি-র গৎ ভেসে এল।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইন্সপেক্টর বলল, 'ও কনজার ভেতয়ের-এ ছিল, কিন্তু সেখানে এমন যোগাযোগ যে কী বলব। মেয়েটার অনেক গুণ

আছে। ওর ইচ্ছা কনসার্টে বাজাবে।'

ইন্সপেক্টর ও নেখ্‌ল্যুদভ কারাগারে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। রক্ষীরা টুপি পর্যন্ত আঙুল তুলে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে রইল। আধ-কামানো-মাথা চারটে লোক নোংরা-ভর্তি বালতি নিয়ে যাবার সময় তাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন সক্রোধে চোখ কোঁচকাল, তার কালো চোখের দৃষ্টিতে আগুন।

কয়েদীদের প্রতি কোন রকম নজর না দিয়ে ইন্সপেক্টর তার নিজের কথাই বলতে লাগল, 'অবশ্য এ ধরনের প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় তাই করা উচিত, একে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, এ ধরনের ছোট বাড়িতে এ সব বড়ই ক্লান্তিকর লাগে।'

শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে সে নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে হলঘরে পৌঁছল।

'কার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

'দুখোভা।'

'ও হো, সে তো টাওয়ার-এ আছে। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে,' সে বলল।

'ততক্ষণ আমি কি মা ও ছেলে এই দুটি মেনশভ কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে পারি? তাদের বিরুদ্ধে ঘরে আগুন লাগাবার অভিযোগ আছে।'

'হ্যাঁ, তা পারেন। ২১ নং সেল। তাদের ডেকে পাঠাতে পারি।'

'কিন্তু তাদের সেল-এ গিয়ে কি দেখা করতে পারি না?'

'মিটিং-রুম কিন্তু অনেক বেশী আরামদায়ক।'

'না। আমি সেলেই দেখা করতে চাই। সেটা অনেক বেশী ইন্টারেস্টিং।'

'যা হোক, আপনি তাহলে সেখানেও মনের মত কিছু পেয়েছেন।'

এই সময় একটি সুসজ্জিত সহকারী অফিসার পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল।

ইন্সপেক্টর তাকে বলল, 'শোন, প্রিন্সকে মেনশভদের ২১নং সেল-এ নিয়ে যাও। তারপর আপিসে নিয়ে এস। আর আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আনছি—হ্যাঁ, কি যেন নামটা?'

'ভেরা দুখোভা।'

ইন্সপেক্টরের সহকারী একটি সুদর্শন যুবক, মোমে-পাকানো গোঁফ, গায়ে ইউ ডি কোলোনের সুগন্ধ।

স্মিতহাস্যে সে নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, 'এদিক দিয়ে আসুন। আমাদের ব্যবস্থাদি তাহলে আপনার ভাল লেগেছে?'

'তা লেগেছে। তাছাড়া, আমি যতদূর জেনেছি, একটি নির্দোষ লোক এখানে বন্দী হয়ে আছে; তাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।'

সহকারীটি কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

নোংরা করিডরে অতিথিকে প্রথম ঢুকতে দেবার জন্য সসম্ভ্রমে নিজে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে সে শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তাও ঘটে। তবে তারাও যে মিথ্যা কথা বলে এমনও ঘটে। দয়া করে এদিকে আসুন।'

সেলের দরজাগুলো সব খুলে গেছে। কিছু কিছু কয়েদী করিডরে জমা হয়েছে। সরকারী রক্ষীদের দিকে ঈষৎ ঘাড় কাত করল, বাঁকা চোখে কয়েদীদের দিকে তাকাল। এতক্ষণ তারা সৈন্যদের মত দুই পাশে হাত ঝুলিয়ে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সরকারী কর্মচারিটিকে দেখছিল। এবার তারা গুঁড়ি মেরে সেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। করিডর ধরে এগিয়ে সহকারী নেখ্‌ল্যুদভকে বাঁদিকের আর একটা করিডরে নিয়ে গেল। এ করিডরটা লোহার দরজা দিয়ে প্রথমটা থেকে আলাদা করা।

করিডরটা আরও সংকীর্ণ, আরও অন্ধকার, প্রথমটার চাইতেও দুর্গন্ধময়। করিডরের দু'দিকেই দরজা, তাতে এক ইঞ্চি পরিধির ছোট ছোট গর্ত। সেখানে একটিমাত্র বুড়ো রক্ষী পাহারায় আছে; তার মুখ বিষণ্ণ, বলিরেখাংকিত।

ইন্সপেক্টরের সহকারী জিজ্ঞাসা করল, 'মেনশভ কোথায় আছে?'

'বাঁদিকের অষ্টম সেল।'

অধ্যায়—৫২

'ভিতরে গিয়ে দেখতে পারি?' নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' সহকারীটি হেসে জবাব দিয়ে রক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

২১ নং সেলের সামনে গিয়ে রক্ষী তালায় চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দিল। একটি যুবক তাড়াতাড়ি জোব্বাটা পরে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সন্ত্রস্ত মুখে নবাগতদের দেখতে লাগল। তার গলাটা লম্বা, দেহ পেশীবহুল, সামান্য গোঁফের রেখা, আর সুন্দর দুটি গোল গোল চোখ। ভীত সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে সে পর পর নেখ্‌ল্যুদভ, রক্ষী ও সহকারীকে দেখতে লাগল। নেখ্‌ল্যুদভের বিশেষ করে ভাল লাগল যুবকের সুন্দর দুটি গোল চোখ।

'তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিতে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।'

'আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।'

সেলটা পার হয়ে গরাদ-দেওয়া নোংরা জানালার কাছে গিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথা আমি শুনেছি। তবু তোমার মুখ থেকেই আমি সব শুনতে চাই।'

মেনশভও দরজার কাছে এগিয়ে গেল এবং তার কাহিনী বলতে শুরু করল। ইন্সপেক্টরের সহকারী উপস্থিত থাকায় প্রথম দিকে সে কিছুটা লজ্জিত বোধ করছিল। কিন্তু ক্রমেই তার সাহস বাড়তে লাগল। একটি সাধারণ সৎ চাষীর

ছেলের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সে তার কাহিনী বলতে লাগল। কারাগারের ভিতরে বাজে পোষাকপরিহিত একটি কয়েদীর মুখ থেকে সে কাহিনী শুনতে নেখ্‌ল্যুদভের খুবই আশ্চর্য লাগছিল। মনোযোগ দিয়ে শোনার ফাঁকে ফাঁকে নেখ্‌ল্যুদভ চারদিকে চোখ ফেলে সব কিছু দেখতে লাগল: খড়ের গদিওয়ালা নীচু তক্তপোষ, পুরু লোহার জাল-লাগানো জানালা, নোংরা স্যাঁতসেঁতে দেয়াল, আর কারাগারের জোব্বা ও জুতো পরা এই সব হতভাগ্য বিকৃত-মূর্তি চাষীদের করুণ মুখ ও আকৃতি; যত দেখে ততই তার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; এই সরল প্রকৃতির যুবকটি যা বলছে তা বিশ্বাস না করতে পারলেই যেন সে খুশি হত। সে নিজেও আঘাত পেয়েছে শুধুমাত্র এই কারণেই একটি লোককে কয়েদীর পোষাক পরিয়ে এমন একটা ভয়ংকর জায়গায় আটকে রাখা যায়, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। অথচ এই আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে প্রতিভাত যে কাহিনীটিকে এমন স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলা হয়েছে তাকে কল্পনাপ্রসূত ও মিথ্যা বলে ভাবা যে ততোধিক বেদনাদায়ক। গল্পটা এই রকম। বিয়ের পরেই গ্রামের সরাইওয়ালা এই যুবকটির স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। সুবিচারের আশায় সে সব জায়গায় ঘুরেছে. কিন্তু সর্বত্রই সরাইওয়ালা ঘুষের জোরে খালাস পেয়েছে। একদিন সে জোর করে স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরদিনই সে পালিয়ে চলে যায়। তখন সে তাকে ফিরিয়ে আনতে আবার সরাইওয়ালার বাড়ি যায়; স্ত্রীকে সেখানে দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও সরাইওয়ালা জানায় যে সে সেখানে নেই এবং যুবকটিকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে। সেও কিছুতেই যাবে না। তখন সরাইওয়ালা ও তার চাকর মিলে যুবকটিকে মেরে রক্ত বের করে দেয়। পরদিন সরাইখানায় আগুন লাগে এবং যুবক ও তার মায়ের বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ করা হয়। সে ঘরে আগুন দেয় নি, বরং সেই সময় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

'এটা কি সত্য যে তুমি আগুন লাগাও নি?'

'না স্যার, এ কাজ করার কথা কখনও আমার মাথায়ই আসে নি। নিশ্চয় আমার শত্রু নিজেই এ কাজ করেছে। শুনেছি, অগ্নিকাণ্ডের ঠিক আগেই সে ওটা বীমা করেছিল। তারা বলছে, মা ও আমি এ কাজ করেছি, এবং তাদের আমরা শাসিয়েও ছিলাম। এটা ঠিক যে একদিন আমি তার কাছে গিয়েছিলাম—আমার মন এ কষ্ট আর সইতে পারছিল না—কিন্তু ঘরে আগুন আমি লাগাই নি। সে নিজেই ঘরে আগুন দিয়ে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। আগুন যখন লাগে তখন আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু সে এমনভাবে সব কিছু ব্যবস্থা করেছিল যাতে মনে হয় যে মা ও আমি সেখানে যাবার পরেই ব্যাপারটা ঘটে।'

'একি সত্য?'

'ঈশ্বর সাক্ষী এটা সত্যি। স্যার, দয়া করুন…' সে তার পায়ের উপর

উপুর হয়ে পড়তে যাচ্ছিল, নেখ্‌ল্যুদভ অনেক কষ্টে তাকে বাধা দিল। 'দয়া করুন···দেখতেই তো পাচ্ছেন, বিনা দোষে আমি মারা যাচ্ছি।'

হঠাৎ তার মুখটা কাঁপতে লাগল। জোব্বার আস্তিন গুটিয়ে সে কাঁদতে লাগল আর নোংরা শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

'আপনার কাজ হল?' সহকারী প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।···দেখ, মনে সাহস আন। যতদূর যা পারি আমরা করব.' এই কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ চলে গেল। মেনশভ দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। রক্ষী দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সে দরজার গর্তের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায়—৫৩

চওড়া করিডর দিয়ে ফিরবার সময় দুপাশের যে সব হাল্কা হলুদ রঙের আলখাল্লা, ছোট ঢোলা ট্রাউজার ও কারা-জুতো পরা লোক সাগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে ছিল (তখন খাবার সময় বলে সেলের দরজাগুলো খোলা ছিল) তাদের দেখে নেখ্‌ল্যুদভ যুগপৎ তাদের প্রতি সহানুভূতি এবং যারা তাদের এখানে এইভাবে আটকে রেখেছে তাদের আচরণে আতংকিত ও বিচলিত বোধ করতে লাগল; তাছাড়া, কারণ না জানলেও এরকম ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু পরিদর্শন করতে পারায় সে নিজেও লজ্জিত বোধ করল।

একটা করিডরে কে যেন জুতোর খট্‌খট্ শব্দ করে সেলের দরজার কাছে দৌড়ে এল। আরও কিছু লোক সেল থেকে বেরিয়ে এসে নেখ্‌ল্যুদভকে অভিবাদন জানিয়ে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

'দয়া করুন, মহামান্য—আপনাকে কি বলে সম্বোধন করব জানি না—যেমন করে হোক আমাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।'

'আমি সরকারের লোক নই। এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।'

'তা হোক, আপনি তো বাইরে থেকে এসেছেন, যাকে হোক বলুন—দরকার হলে কর্তৃপক্ষস্থানীয় কাউকে। বিনা দোষে দু'মাস যাবৎ আমরা এখানে কষ্টভোগ করছি।'

'কি বলছ তুমি?' কেন?' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'কেন? আমরা নিজেরাই জানিনা কেন; প্রায় দু'মাস হল আমাদের এখানে তালাবন্ধ করে রাখা হয়েছে।'

সহকারীটি বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। পাশপোর্ট না থাকায় এই লোকগুলোকে আটক করা হয়েছিল; এতদিনে তাদের যার যার দেশে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু সেখানকার কারাগারটি আগুনে পুড়ে গেছে, আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের লিখে জানিয়েছে, এদের

যেন ফেরৎ পাঠানো না হয়। কাজেই পাসপোর্টবিহীন অন্য সবাইকে যার যার দেশে পাঠিয়ে দিলেও এদের আটকে রেখেছি।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নেখ্‌লয়ুদভ চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কি? শুধু এই কারণে?'

কারাগারের পোষাক-পরা প্রায় জনাচল্লিশেক লোক তাকে ও সহকারীকে ঘিরে ধরে সকলেই কিছু না কিছু বলতে লাগল। সহকারী তাদের থামিয়ে দিল।

'যে কোন একজন কথা বল।'

তাদের ভিতর থেকে বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি লম্বা সম্ভ্রান্ত গোছের চেহারার লোক এগিয়ে এল। নিজেদের অবস্থার মোটামুটি একটা বিবরণ দিয়ে সে বলল, 'আমরা সবাই পাথরের মিস্ত্রি, একই সমবায় সমিতির লোক। আমাদের বলা হচ্ছে, আমাদের দেশের কারাগার পুড়ে গেছে। কিন্তু সেটা তো আমাদের দোষ নয়। আমাদের সাহায্য করুন।'

সহকারীর দিকে ফিরে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'এরা কি বলছে? শুধু এই কারণে কি এরকমটা হতে পারে?'

সহকারী শান্ত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তাদের দেশে ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এদের কথা বুঝি তারা ভুলেই গেছে।'

করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সেটা পার হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'এও কি সম্ভব যে কতকগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ লোককে এখানে আটকে রাখা হয়েছে?'

ইন্সপেক্টরের সহকারী বলল, 'আপনি আমাদের কি করতে বলেন? ওরা ওরকম অনেক মিথ্যে কথা বলে। অবশ্য এমনটাও ঘটে যে অকারণেই কিছু লোককে বন্দী করা হয়।'

'কিন্তু এরা তো কিছুই করে নি।'

'হ্যাঁ, তা স্বীকার করি। তবে লোকগুলো সব জাহান্নামে গেছে। এমন অনেক বেপরোয়া লোক আছে যাদের উপর কড়া নজর রাখতে হয়। এই তো গতকালই সে রকম দুজনকে শাস্তি দিতে হয়েছে।'

'শাস্তি? কেমন করে?'

'উপরওয়ালার আদেশে বার্চের লাঠি দিয়ে পেটানো হয়েছে।'

'কিন্তু দৈহিক নির্যাতন তো তুলে দেওয়া হয়েছে।'

'কিন্তু যারা অধিকারবঞ্চিত তাদের জন্য তুলে দেওয়া হয় নি। এখনও ওটা তাদের অবশ্য প্রাপ্য।'

গতকাল হলে অপেক্ষা করার সময় সে যা দেখেছিল সেটা মনে পড়তেই নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল যে, সেই সময়ই শাস্তিটা দেওয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল অবসাদ, বিচলিত-বোধ ও নৈতিক বিবমিষা শারীরিক বিবমিষায় রূপান্তরিত হয়ে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ইন্সপেক্টরের সহকারীর কোন কথায় কান না দিয়ে, কোন দিকে না তাকিয়ে দ্রুত করিডর পার হয়ে সে সোজা আপিসে গিয়ে হাজির হল। ইন্সপেক্টর আপিসেই ছিল। কিন্তু অন্য কাজের চাপে দুখোভাকে ডেকে পাঠাতে ভুলে গিয়েছিল। নেখ্‌ল্যুদভ ঘরে ঢুকতেই কথাটা তার মনে পড়ল।

বলল, 'দয়া করে বসুন। আমি এখনই তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি।'

অধ্যায়—৫২

দু'খানা ঘর নিয়ে আপিস। প্রথম ঘরে একটা বড় ভাঙা স্টোভ, দুটো নোংরা জানালা, এক কোণে কয়েদীদের উচ্চতা মাপবার একটা কালো দণ্ড, অপর কোণে খৃস্টের একখানা বড় ছবি। বুঝিবা খৃস্টের বাণীকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই যেখানে মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়া হয় সেখানেই তাঁর একখানা ছবি রাখাই রীতি। ঘরে কয়েকটি রক্ষীও দাঁড়িয়ে ছিল। পাশের ঘরে জনকুড়ি স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে, জোড়ায় জোড়ায় নীচু গলায় কথাবার্তা বলছিল। জানালার পাশে একটা লেখার টেবিল।

ইন্সপেক্টার সেই টেবিলেই বসেছিল। পাশের চেয়ারটায় নেখ্‌ল্যুদভকে বসতে বলল। নেখ্‌ল্যুদভ বসে পড়ে চারদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা একটি ছোট্ট ছেলে তার কাছে এসে সরু গলায় বলল, 'আপনি কার জন্য অপেক্ষা করছেন?'

প্রশ্ন শুনে নেখ্‌ল্যুদভ বিস্মিত হল। কিন্তু ছেলেটিকে দেখে, তার ছোট্ট গম্ভীর মুখ ও দুটি উজ্জ্বল মনোযোগী চোখ দেখে সে জানাল যে, পরিচিত একটি স্ত্রীলোকের জন্য সে অপেক্ষা করছে।

ছেলেটি প্রশ্ন করল, 'তিনি কি আপনার বোন?'

নেখ্‌ল্যুদভ সবিস্ময়ে জবাব দিল, 'না, আমার বোন নয়। কিন্তু তুমি, তুমি এখানে কার কাছে থাক?'

সে জবাব দিল, 'আমি? মার কাছে থাকি; মা একজন রাজনৈতিক বন্দী।'

ছেলেটির সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের কথাবার্তা বলা এখানকার নিয়মবিরুদ্ধ। তাই ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'মারিয়া পাভলভ্‌না, কল্যাকে নিয়ে যাও।'

লোকজনের ভিতর থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। প্রায় পুরুষের মত দৃঢ় পদক্ষেপে নেখ্‌ল্যুভ ও ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

'ও আপনাকে কি বলছিল—আপনি কে?' ভাসা-ভাসা চোখে নেখ্‌ল্যুদভের মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসির সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল। তার চোখের চাউনি এমনই সরল যে সকল পুরুষের সঙ্গেই যে তার ভাই-বোনের সম্পর্ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

'ও সব কিছু জানতে চায়,' কথাগুলি বলবার সময় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে

সে এমন মিষ্টি করে হাসল যে ছেলেটি ও নেখ্‌ল্যুদভ দুজনেই হেসে ফেলল।

'ও আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, আমি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

এমন সময় ইন্সপেক্টর বলে উঠল, 'মারিয়াপাভ্‌লভ্‌না, এখানে অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলা আইনবিরুদ্ধ। তুমি তো তা জান।'

'ঠিক আছে,' বলে কল্যার ছোট্ট হাতখানি ধরে সে চলে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ছোট ছেলেটি কে?'

'ওর মা একজন রাজনৈতিক বন্দী, আর এই কারাগারেই ও জন্মেছে।' খুশির সুরে ইন্সপেক্টর কথাগুলি বলল। যেন তার প্রশাসন কতদূর অসাধারণ জানাতে পেরে সে খুবই খুশি হয়েছে।

'তাও কি সম্ভব?'

'হ্যাঁ। এখন ছেলেটি মায়ের সঙ্গেই সাইবেরিয়াতে যাচ্ছে। আরে, ঐ তো দুখোভা এসে গেছে।'

অধ্যায়—৫৫

পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ভেরা দুখোভা। একটু এঁকে-বেঁকে চলে, সরু হল্‌দেটে চেহারা, চোখ দুটি বড় বড়।

নেখ্‌ল্যুদভের হাত চেপে ধরে সে বলল, 'আপনি যে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আমার কথা তাহলে আপনার মনে আছে? আসুন। বসা যাক।'

'তোমাকে এভাবে দেখব আশা করি নি।'

'আমি তো সুখেই আছি। এত সুখে আছি যে আর কিছুই চাই না।' বড় বড় গোল-গোল চোখ দুটিকে নেখ্‌ল্যুদভের উপর নিবদ্ধ রেখে বডিসের ময়লা, কোঁচকানো, নোংরা কলারে ঘেরা সরু পেশীবহুল ঘাড়টাকে ভীষণভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে ভেরা দুখোভা কথাগুলি বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ জানতে চাইল, সে কেমন করে কারাগারে এসেছে।

জবাবে মহা উৎসাহে সে তার সব কথা বলতে শুরু করল। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রচার, সংগঠনের অভাব, গোষ্ঠি, দল, উপদল, প্রভৃতি এমন সব বিশেষ বিশেষ শব্দ সে ব্যবহার করতে লাগল যা সকলেই বোঝে বলেই তার ধারণা থাকলেও নেখ্‌ল্যুদভ কখনও শোনে নি।

'Narodovolstvo (আক্ষরিক অর্থ 'গণ-কামনা', গত শতাব্দীর আশির দশকের একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন)-এর সব কথা সে তাকে বলল। দুখোভার বিশ্বাস, সে সব শুনে নেখ্‌ল্যুদভ খুশিই হবে। তার সরু ছোট গলা, তার উঠে-যাওয়া যৎসামান্য এলোমেলো চুলের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এ সব কাজ সে কেন করেছে, আর কেনই বা তাকে সে সব কথা বলছে। তার মনে করুণা হল। বিনা দোষে দুর্গন্ধময় কারাগারে আটকে রাখবার জন্য

চাষী মেনশভ-এর প্রতি যে ধরনের করুণা হয়েছিল এ সে রকম করুণা নয়। তার মনের অস্পষ্টতার জন্যই সে করুণার পাত্র। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আদর্শকে সফল করতে নিজের জীবন দান করতে প্রস্তুত একজন বীরাঙ্গনা বলে সে আজ নিজেকে মনে করে, অথচ সে আদর্শ যে কি বা কি ভাবে তা সফল হবে তা সে জানে না।

যে কাজের জন্য ভেরা দুখোভা নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল তা এই: শুস্তভালামে তার একটি বান্ধবীকে প্রায় পাঁচ মাস আগে তারই সঙ্গে গ্রেপ্তার করে 'পিতার ও পল দুর্গে' বন্দী করে রাখা হয়েছে, অথচ মেয়েটি তাদের 'উপদল'-এর সঙ্গে পর্যন্ত জড়িত নয়; তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কিছু নিষিদ্ধ বই ও কাগজপত্র (অন্যকে দেবার জন্য তার কাছে ছিল) তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল। বান্ধবীর গ্রেপ্তারের জন্য ভেরা দুখোভা নিজেকে কিছুটা দায়ী মনে করে বলেই নেখ্‌লয়ুদভের কাছে তার অনুরোধ, তার তো উপরের মহলে অনেক জানাশোনা আছে, তাই তিনি যেন তার বান্ধবীর মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

তাছাড়া, সে আরও অনুরোধ করল, গুর্কেভিচ নামে তার আর একটি বন্ধুও 'পিতার ও পল- দুর্গে' বন্দী হয়ে আছে; সে যাতে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারে, এবং পড়াশুনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বই পেতে পারে তার জন্য যেন তিনি চেষ্টা করেন।

নেখ্‌লয়ুদভ কথা দিল, পিতার্সবার্গ গেলে সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

এবার দুখোভার নিজের কথা, মানে সে যা বলেছে। ধাত্রীবিদ্যার পাঠ শেষ করে সে 'নারদভলস্ত্‌ভো'র একটি গোষ্ঠির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। প্রথম দিকে কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই চলতে লাগল। তারা প্রচার-পত্র লেখে, কারখানাগুলোতে প্রচার-কার্য করে; তারপর গোষ্ঠির একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য গ্রেপ্তার হওয়ায় সব কাগজপত্র ধরা পড়ে এবং গোষ্ঠির সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

'আমিও গ্রেপ্তার হলাম; শীঘ্রই নির্বাসনে যাব। কিন্তু তাতে কি হল? আমি খুব সুখী।' কারণ হাসির সঙ্গে সে তার গল্প শেষ করল।

ভেরা দুখোভার তিন নম্বর কাজ মাসলভাকে নিয়ে। মাসলভার জীবনের কথা, তার সঙ্গে নেখ্‌লয়ুদভের যোগাযোগের কথা সে জানে,—কারাগারে এ ধরনের খবর সকলেই রাখে। সে পরামর্শ দিল, এমন ব্যবস্থা করুন যাতে হয় তাকে রাজনৈতিক বন্দীদের ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হোক, আর না হয় তো নার্সের কাজ দিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠানো হোক; হাসপাতালে তখন অনেক রোগী, কাজেই বাড়তি নার্সের খুবই দরকার।

এই পরামর্শের জন্য নেখ্‌লয়ুদভ তাকে ধন্যবাদ দিল এবং তদনুসারে কাজ করতে চেষ্টা করবে বলে জানাল।

অধ্যায়—৫৬

তাদের আলোচনায় বাধা পড়ল। ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, সময় হয়ে গেছে, এবার কয়েদীদের কাছ থেকে সবাইকে চলে যেতে হবে। নেখ্‌ল্যুদভ ভেরা দুখোভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি দেখবার জন্য হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

ইন্সপেক্টর কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বসে হাঁকতে লাগল, 'মশাইরা, সময় হয়ে গেছে, সময় হয়ে গেছে।'

ইন্সপেক্টরের কথায় ঘরের কয়েদীদের মধ্যে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেল, কেউ ঘর ছেড়ে গেল না। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প করতে লাগল, কেউ বা যেমন ছিল তেমনই গল্প করে চলল। কেউ বা কাঁদতে কাঁদতে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। এক জোড়া তরুণ-তরুণী—তারা প্রেমিক-প্রেমিকা—হাতে হাত ধরে পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌ল্যুদভের পাশেই দাঁড়িয়েছিল একটি যুবক। তাদের দুজনকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'এখানে একমাত্র ওরাই খুশিতে মশগুল। এই কারাগারেই আজ রাতে ওদের বিয়ে হবে, আর মেয়েটিও ছেলেটির সঙ্গে সাইবেরিয়ায় চলে যাবে।'

'আসলে সে কি?'

'একজন আসামী, নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত। ওরা অন্তত একটু হাসিখুশি থাকুক; নইলে আর সব কিছুই তো অত্যন্ত বেদনাদায়ক।' যুবকটি বলল।

'এবার, ভালমানুষরা সব! দয়া করে আমাকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবেন না।' কথাগুলি ইন্সপেক্টর বার বার বলতে লাগল। 'দয়া করে চলে যান। অনেকক্ষণ সময় হয়ে গেছে। আপনারা ভেবেছেন কি? এ ভাবে চলতে পারে না।……এই শেষ বারের মত আপনাদের বলছি,' শান্ত গলায় বার বার কথাগুলি বলে ইন্সপেক্টর একটা সিগারেট বের করে ধরাল।

অবশেষে কয়েদী ও দর্শনার্থীরা বিদায় নিতে শুরু করল—কতক বাইরের দরজা দিয়ে। আর কতক ভিতরের দরজা দিয়ে।

নেখ্‌ল্যুদভও সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলে পৌঁছল। শ্রান্ত পদক্ষেপে ইন্সপেক্টরও সেখানে হাজির হল।

নেখ্‌ল্যুদভের প্রতি বিনীত ভাব দেখিয়ে বলল, 'যদি মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে দয়া করে কাল আসুন।'

'তাই হবে', বলে নেখ্‌ল্যুদভ দ্রুতপায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

'এ সব কিছুর অর্থ কি? এতে কি লাভ হবে?' নেখ্‌ল্যুদভ নিজেকেই প্রশ্ন করল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তার মনের সেই নৈতিক বিবমিষা শারীরিক বিবমিষায় পরিণত হল। যখনই সে কারাগারে আসে তখনই তার এই অবস্থা হয়। কিন্তু তার প্রশ্নের কোন জবাব মেলে না।

অধ্যায়—৫৭

পরদিন নেখ্‌লয়ুদভ অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করে মেনশভের ব্যাপারটা তাকে বলল ; তাকে অনুরোধ জানাল মামলাটা নিতে। অ্যাডভোকেট কথা দিল, মামলাটা সম্পর্কে সে খোঁজ-খবর করবে এবং নেখ্‌লয়ুদভ যা বলেছে তাই যদি ঠিক হয়—হবে বলেই মনে হয়—তাহলে সে বিনা ফি-তে তার পক্ষ সমর্থন করবে। তখন নেখ্‌লয়ুদভ সেই একশ' ত্রিশ জন লোকের কথা বলল যাদের একটা ভুলের জন্য কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। 'ওটা কাদের কাজ ? দোষটা কার ?'

সম্ভবত সঠিক উত্তরটা ভেবে নেবার জন্য অ্যাডভোকেট এক মুহূর্ত চুপ করে রইল।

তারপর অসংকোচে বলল, 'কার দোষ ? কারও না। ন্যায়াধীশকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলবেন গভর্ণরের দোষ, আবার গভর্ণরকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি বলবেন ন্যায়াধীশের দোষ। দোষ কারও না।'

'আমি ভাইস-গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তাকে সব কথা বলব।'

অ্যাডভোকেট হেসে বলল, 'ও হো ! তাতে কোন কাজ হবে না। লোকটা —সে আপনার আত্মীয় বা বন্ধু নয় তো ?—যেমন মাথামোটা, তেমনই ধূর্ত একটি জীব !'

এই অ্যাডভোকেটটি সম্পর্কে মাসলেনিকভ কি বলেছিল সে কথা নেখ্‌লয়ুদভের মনে পড়ে গেল। কোন কথা না বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে মাসলেনিকভের উদ্দেশে যাত্রা করল।

তাকে দুটো কথা বলবার আছে: মাসলভাকে কারা-হাসপাতালে পাঠাবার কথা, আর একশ' ত্রিশজন পাসপোর্টবিহীন লোকের কথা যারা নির্দোষ হয়েও বন্দী হয়ে আছে। যাকে সে শ্রদ্ধা করে না তার কাছে কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করা খুবই শক্ত কাজ ; কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির সেই তো একমাত্র উপায় আর সে উপায় তাকে গ্রহণ করতেই হবে।

মাসলেনিকভের বাড়ির সামনে পৌঁছে নেখ্‌লয়ুদভ দেখল, সদর দরজার সামনে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে পড়ল, ভাইস-গভর্ণরের স্ত্রী আজ একটা মিলন-সভার আয়োজন করেছে আর তাতে সেও আমন্ত্রিত। গাড়িগুলির মধ্যে একখানি ঢাকা-দেওয়া ল্যাণ্ডো-গাড়িও আছে। সে জানে, গাড়িটা করচাগিনদের। তাদের পাকা-চুল, লাল-মুখ কোচয়ান টুপিটা খুলে নেখ্‌লয়ুদভকে সশ্রদ্ধ অথচ বন্ধুর মত অভিবাদন করল। এমন সময় একজন মহামান্য অতিথিকে বিদায় দিতে তাকে সঙ্গে নিয়ে কার্পেট-পাতা সিঁড়ি বেয়ে মাসলেনিকভ নীচে নেমে এল,—শুধু প্রথম ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত নয়, সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপ পর্যন্ত।

সামরিক বিভাগের এই মহামান্য অতিথিটি নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সাদরে বলে উঠল, 'আরে নেখ্‌ল্যুদভ যে! কেমন আছ? আজকাল তোমার দেখাই পাওয়া যায় না কেন? Allez presenter vos devoirs a Madame (ভিতরে গিয়ে মাদামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এস)। করচাগিনরা এবং নাদিন বুকশেভদেনরাও ভিতরে আছে। Toutes les jolies femmes de la ville (শহরের সব সুন্দরীরাই জমা হয়েছে)। Au revoir, mon cher (বিদায়, প্রিয় বন্ধু)', মাসলেনিকভের হাতটা চেপে ধরে সে বিদায় নিল।

তারপর মাসলেনিকভ নেখ্‌ল্যুদভের হাত ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত-ভাবে বলল, 'এস, উপরে এস; ভারি খুশি হয়েছি।' মোটা শরীর নিয়েও সে দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

নাচ-ঘরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে সে বলল, 'কাজের কথা পরে হবে। তুমি যা চাও সব করে দেব।' একজন পিওনকে আসতে দেখে না থেমেই বলল, 'ঘোষণা করে দাও, প্রিয় নেখ্‌ল্যুদভ এসেছেন।'

'Vous n'avez qua ordonner (বল কি আদেশ)। কিন্তু প্রথমেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে চল। তার সঙ্গে দেখা না করেই আগের বার তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্য আমাকে কথা শুনতে হয়েছে।'

তারা ড্রয়িং-রুমে পৌছবার আগেই পরিচারক নেখ্‌ল্যুদভের আগমন ঘোষণা করে দিল এবং নানান টুপি ও মাথার ফাঁক দিয়ে ভাইস-গভর্ণরের স্ত্রী আন্না ইগনাত্‌য়েভ্‌নার স্মিত হাসিভরা মুখ নেখ্‌ল্যুদভের উপর পড়ল।

'Enfin (এক কথায় বলি)! আমরা তো ভেবেছিলাম, আপনি আমাদের ভুলেই গেছেন। আমরা কি অপরাধ করেছি?'

এই কথা বলে আন্না ইগনাত্‌য়েভ্‌না নবাগতকে স্বাগত জানাল। কথাগুলির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতার আমেজ আছে তা কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে কোন কালেই ছিল না।

মিসিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার মাথায় টুপি, গাঢ় ডোরা-টানা এমন একটা পোষাক সে পরেছে যেটা চামড়ার মতই তার শরীরের সঙ্গে মিশে গেছে। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সে রক্তিম হয়ে উঠল।

বলল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ।'

'আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। কাজের জন্যই আমি শহরে আটকে আছি, আর কাজের তাগিদেই এখানেও এসেছি।'

'তুমি কি মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে আসবে না? তোমাকে দেখলে সে খুশি হবে।' সে জানে এ কথাগুলি সত্য নয়, আর নেখ্‌ল্যুদভও তা জানে; তাই তার মুখটা লজ্জায় আরও লাল হয়ে উঠল।

যেন তার লজ্জারুণ ভাবটা সে লক্ষ্যই করে নি এমন ভাব দেখিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ গম্ভীরভাবে বলল, 'আশংকা করছি, সময় করেই উঠতে পারব না।'

মিসি রেগে গিয়ে চোখ পাকিয়ে তাকাল, কাঁধ দুটি ঝাঁকুনি দিল, তারপর একজন সুসজ্জিত অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসারটিও তার হাত থেকে চায়ের শূন্য কাপটা দুদিকের চেয়ারে কোমড়ের তলোয়ার-খানা ঠুকতে ঠুকতে অন্য একটা টেবিলে রেখে দিল।

নেখ্‌ল্যুদভ উঠে মাসলেনিকভের কাছে গেল।

'তুমি কি আমাকে মিনিট কয়েক সময় দিতে পারবে?'

'ওঃ, নিশ্চয়। বল, বল কি ব্যাপার? চল, ও ঘরে যাই।'

তারা একটা ছোট জাপানী বসবার ঘরে ঢুকে জানালাটার নীচে গিয়ে বসল।

অধ্যায়—৫৮

ধূমপান করবে কি? একটু অপেক্ষা কর; এ জায়গাটাকে নোংরা করলে চলবে না,' এই কথা বলে মাসলেনিকভ একটা ছাই-দানি নিয়ে এল। 'তারপর।'

'তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই।'

'বল ভাই।'

'সেই স্ত্রীলোকটির ব্যাপারেই আমি আবার এসেছি। নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'হ্যাঁ আমি জানি। সেই যে নির্দোষ হয়েও যার শাস্তি হয়েছে।'

'আমি চাই তাকে কারা-হাসপাতালে নার্সের কাজে লাগানো হোক। আমি শুনেছি যে এরকম ব্যবস্থা করা যায়।'

মাসলেনিকভ ঠোঁট চাটতে চাটতে কথাটা ভাবতে লাগল।

বলল, 'সেটা বোধ হয় সম্ভব হবে না। যা হোক, আমি দেখব কি করা যায়, আর কালই সে কথা তার করে তোমাকে জানিয়ে দেব।'

'আমি শুনেছি সেখানে অনেক রোগী আছে, আর তাদের পরিচর্যার জন্য লোকও দরকার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। যাই হোক আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।'

'দয়া করে কাজটা করে দিও। দ্বিতীয় কথা তোমাকে বলতে চাই যে, পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার দরুণ একশ' ত্রিশ জনকে এক মাসের উপর হল কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে।'

সব ঘটনাটা সে খুলে বলল।

মাসলেনিকভ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, অসন্তুষ্টও হল। বলল, 'তুমি এ কথা জানলে কেমন করে?'

'একটি কয়েদীর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তখন এই লোক-

গুলো করিডরের মধ্যে আমাকে ঘিরে ধরে বলে যে—'

'তুমি কোন্ কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে ?'

'একটি চাষী যাকে বিনা দোষে আটকে রাখা হয়েছে। তার ব্যাপারটা আমি একজন উকিলের হাতে তুলে দিয়েছি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। যে সব লোক কোন অপরাধ করে নি, শুধুমাত্র পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে বলেই কি তাদের কয়েদ করা যায় ? আর—'

মাসলেনিকভ সক্রোধে বাধা দিল, 'ওটা···ন্যায়াধীশের এক্তিয়ার। কি জান, তোমরা যাকে দ্রুত ন্যায়বিচার বল, এটা তারই ফল। কারাগার পরিদর্শন করা এবং কয়েদীদের আইনানুসারে কয়েদ করা হয়েছে কিনা এ সব দেখার ভার সরকারী উকিলের উপর। কিন্তু তারা তো শুধু তাস খেলেন, আর কিছুই করেন না।'

'তাহলে কি আমি এই বুঝব যে তুমি কিছুই করতে পারবে না ?' হতাশ হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ কথাগুলি বলল। তার মনে পড়ল, অ্যাডভোকেট আগেই বলেছিল যে ভাইস-গভর্ণর ন্যায়াধীশের ঘাড়ে দোষটা চাপাবে।

'হ্যা, নিশ্চয় করতে পারি। আমি এখনই দেখছি। ঠিক আছে, তুমি যা যা বললে সবই করে দেব।' কথাগুলি বলে মাসলেনিকভ তার আংটি-পরা আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলল। 'এবার চল, মহিলাদের ওখানে যাই।'

তাকে ড্রয়িং-রুমের দরজার কাছে বাধা দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এক মিনিট। শুনলাম, কাল নাকি কারাগারের মধ্যে কয়েকজনকে দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে। কথাটা কি সত্যি ?'

মাসলেনিকভের মুখ লাল হয়ে উঠল।

'ওঃ, সেই কথা! না, প্রিয় বন্ধু, সেখানেও তোমার মাথা গলানো চলবে না। তুমি যে সব ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে চাও। চল—চল, আন্না আমাদের ডাকছে,' বলে সে নেখ্‌ল্যুদভকে হাত ধরে টানল।

নেখ্‌ল্যুদভ হাতটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে একটি কথাও না বলে বিষণ্ণ চোখে ড্রয়িং-রুম পার হয়ে হলটা অতিক্রম করে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

মাসলেনিকভের সঙ্গে দেখা করার পরদিনই নেখ্‌ল্যুদভ তার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেল। মোটা চকচকে কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা, গালা দিয়ে সিল করা। মাসলেনিকভ জানিয়েছে, মাসলভাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যাপারটা সে ডাক্তারকে লিখেছে এবং আশা করছে এ ব্যাপারে নেখ্‌ল্যুদভ যা চাইছে সেটা মনোযোগের সঙ্গেই বিবেচিত হবে। চিঠিতে স্বাক্ষরের আগে লেখা আছে 'তোমার স্নেহশীল বড় কমরেড' আর স্বাক্ষরের শেষে আছে একটি

শিল্পকর্মের নিদর্শন। 'গাধা!' নেখ্‌লয়ুদভ কথাটা উচ্চারণ না করে পারল না, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে 'কমরেড' কথাটার ভিতর দিয়ে মাসলেনিকভ তাকে করুণা করতে চেয়েছে, অর্থাৎ সে বুঝতে পেরেছে যে নৈতিক বিচারে এমন একটা নোংরা লজ্জাজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মাসলেনিকভ নিজেকে একজন গণ্যমান্য লোক বলে মনে করে এবং নেখ্‌লয়ুদভকে ঠিক খোসামোদ করতে না চাইলেও দেখাতে চায় যে তাকে কমরেড বলে না ডাকবার মত ততটা গর্বিত সে নয়।

অধ্যায়—৫৯

এটা একটা অতিপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা যে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশেষ গুণ থাকে; কেউ দয়ালু, কেউ নিষ্ঠুর, আবার কেউ বা জ্ঞানী, বা নির্বোধ, বা উৎসাহী বা উদাসীন। কিন্তু মানুষ ঠিক সে রকম হয় না। বরং একটা মানুষ সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, সে যতটা নিষ্ঠুর তার চাইতে বেশী দয়ালু, যতটা নির্বোধ তার চাইতে বেশী জ্ঞানী, যতটা উদাসীন তার চাইতে বেশী উৎসাহী; অথবা তার বিপরীৎক্রমও হতে পারে। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না যে একটা লোক দয়ালু ও জ্ঞানী, এবং আর একটা লোক খারাপ ও বোকা। অথচ আমরা সব সময় মানুষকে এই ভাবেই ভাগ করে থাকি। কিন্তু এটা ভুল। মানুষ হল নদীর মত: সব নদীতে একই জল কিন্তু প্রতিটি নদীই এখানে সরু, ওখানে অধিক দ্রুতগতি, এখানে ধীর গতি, ওখানে চওড়া, কখনও স্বচ্ছ, কখনও ঘোলা, কখনও ঠাণ্ডা, কখনও গরম। মানুষের বেলায়ও তাই। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই প্রত্যেকটি মানবিক গুণের বীজ নিহিত রয়েছে; তবে কখনও একটা গুণ প্রকাশ পায়, কখনও অন্য গুণ; ফলে অনেক সময়ই একটা মানুষ অন্য রকম হয়ে ওঠে, যদিও তখনও সে সেই একই মানুষই থাকে।

কোন কোন মানুষের মধ্যে এই পরিবর্তন খুব চূড়ান্ত রূপ নেয়, আর নেখ্‌লয়ুদভ সেই রকম একটি মানুষ। দৈহিক এবং আত্মিক দুই রকম কারণেই তার মধ্যে এই পরিবর্তন এসেছিল। এখনও তার মধ্যে সেই পরিবর্তনই ঘটেছে।

বিচারের পরে এবং কাতয়ুশার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরে নবজন্ম লাভের জয় ও আনন্দের যে অনুভূতি তার হয়েছিল, সেটা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর শেষ সাক্ষাতের পরে সে আনন্দের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে আতংক ও বিকর্ষণ। সে সংকল্প নিয়েছিল তাকে পরিত্যাগ করবে না, সে চাইলে তাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করবে না; কিন্তু সে কাজ এখন বড় কঠিন, বড় যন্ত্রণাদায়ক মনে হচ্ছে।

মাসলেনিকভের সঙ্গে দেখা করার একদিন পরেই আবার সে কারাগারে

মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ইন্সপেক্টর সাক্ষাতের অনুমতি দিল, আপিসে নয়, অ্যাডভোকেটের ঘরে নয়, একেবারে মেয়েদের ভিজিটিং-রুমে।

ব্যবহারে সদয় হলেও ইন্সপেক্টরকে নেখ্‌লয়ুদভ সম্পর্কে আগের চাইতে একটু বেশী গম্ভীর বলে মনে হল। মাসলেনিকভের সঙ্গে তার কথাবার্তার ফলে নিশ্চয় অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনের কোন নির্দেশ এসেছে।

ইন্সপেক্টর বলল, 'আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। কিন্তু দয়া করে টাকা-পয়সা সম্পর্কে যা বলেছি সেটা মনে রাখবেন। আর তাকে হাসপাতালে পাঠানো সম্পর্কে মহামান্য ভাইস-গভর্ণর আমাকে যা লিখেছেন সেটা করা যাবে; ডাক্তার সম্মত হবেন বলেই মনে হয়। কিন্তু সে নিজে সেটা চাইছে না। সে বলছে; "দাদ-কাউরের রোগী ওই সব ভিক্ষুকদের নোংরা জল আমাকে কি অবশ্য বইতে হবে!" দেখুন প্রিন্স, এই সব লোকদের আপনি চেনেন না।"

নেখ্‌লয়ুদভ কোন জবাব দিল না, শুধু দেখা করতে চাইল। ইন্সপেক্টর একটি রক্ষীকে ডাকল; তার সঙ্গে নেখ্‌লয়ুদভ মেয়েদের ভিজিটিং-রুমে গেল; সেখানে মাসলভা একা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তারের জালের পিছন থেকে শান্ত ত্রস্ত ভাবে বেরিয়ে তার খুব কাছে এসে চোখ না তুলেই বলল:

'আমাকে ক্ষমা করুন দিমিত্রি আইভানভিচ, গত পরশু আমি অনেক কিছুই ভুল বলেছিলাম।'

'আমার তো ক্ষমা করার কথা নয়', নেখ্‌লয়ুদভ বলতে শুরু করল।

'সে যাই হোক, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন,' মাসলভা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল। যে রকম ভয়ঙ্কর বাঁকা চোখে সে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকাল তাতে সে যেন পূর্বেকার সেই বিরক্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিই দেখতে পেল।

'কেন তোমাকে ছেড়ে দেব?'

'ছাড়তেই হবে।'

'কিন্তু কেন?'

তার মনে হল সেই একই ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাসলভা তার দিকে আবার তাকাল।

বলল, 'দেখুন, তাই হবে। আমাকে ছাড়তেই হবে। আমি যা বলছি ঠিকই বলছি—আমি আর পারছি না। এ সব আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে।' তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। এক মুহূর্ত সে চুপ করে রইল। 'সত্যি বলছি। আমি বরং ফাঁসিতে ঝুলব।'

নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল, এই অস্বীকৃতির মূলে ঘৃণা ও ক্ষমাহীন ক্ষোভ থাকলেও ভাল কিছুও আছে। সে যে রকম শান্তভাবে তার আগেকার অস্বীকৃতিকে নতুন করে ঘোষণা করছে তাতে নেখ্‌লয়ুদভের মনের সব সন্দেহ

দূর হয়ে গেল, কাতয়ুশার সম্পর্কে যে ভয়ের অনুভূতি তার মনে ছিল সেটা আবার জেগে উঠল।

সে গম্ভীর ভাবে বলল, 'কাতয়ুশা, আমি যা বলেছি সেটাই আবার বলছি। আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে কর। যদি বিয়ে করতে না চাও, তাহলে যতদিন তুমি বিয়ে করতে না চাইবে ততদিন আমি তোমাকেই অনুসরণ করে চলব, তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব।'

'সেটা আপনার ব্যাপার, আমি আর কিছু বলব না।' আবার কাতয়ুশার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভও চুপ করে রইল। তার মুখে কোন ভাষা জোগাল না।

একটু শান্ত হয়ে আবার বলল, 'এখন আমি গ্রামে ফিরে যাব; সেখান থেকে পিতার্সবার্গ যাব। যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার……মানে আমাদের মামলাটা যাতে পুনর্বিবেচিত হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় শাস্তিটা রদ হয়েও যেতে পারে।'

'যদি রদ নাই হয় তাতেই বা কি। এ মামলায় না হোক, আরও নানা কারণেই তো এ শাস্তি আমার প্রাপ্য,' মাসলভা বলল। নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, কত কষ্টে সে তার চোখের জল আটকে রেখেছে।

নিজের আবেগকে চাপা দেবার জন্য মাসলভা সহসা বলে উঠল, 'আচ্ছা, আপনি কি মেনশভের সঙ্গে দেখা করেছেন? তারা সত্যি নির্দোষ, নয় কি?'

'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।'

'বৃদ্ধাটি আশ্চর্য মানুষ,' মাসলভা বলল।

মেনশভদের ব্যাপার সবই খুলে বলে সে জানতে চাইল, মাসলভার আর কিছু চাই কি না।

মাসলভা জবাব দিল, তার কিছু চাই না।

তারপর দুজনই চুপ।

টেঁরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে মাসলভা হঠাৎ বলল, 'দেখুন, হাসপাতালের ব্যাপারে আপনি যদি চান তো আমি যাব, এবং কখনও মদ খাব না'।

নেখলয়ুভ তার চোখের দিকে তাকাল। দুটি চোখই হাসছে।

'খুব ভাল কথা', শুধু এইটুকু বলেই সে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে,' নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল। আগেকার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল, আর তার মনে জাগল একটা অপূর্ব অনুভূতি যা এর আগে সে কখনও উপলব্ধি করে নি—সে নিশ্চিত জানল যে প্রেম অপরাজেয়।

সাক্ষাতের পরে হট্টগোল-ভরা সেলে ফিরে গিয়ে মাসলভা আলখাল্লাটা ছেড়ে ফেলল; তারপর হাত দুটি কোলের উপর ভাঁজ করে তার নিজের তক্তার উপর বসল। সেলের মধ্যে তখন ছিল শুধু একটি যক্ষ্মারোগগ্রস্তা

স্ত্রীলোক ও তার শিশু, যেনশভের বুড়ি মা, আর পাহারাদারের স্ত্রী। পুরোহিতের মেয়েটির মাথা খারাপ হওয়ায় আগের দিন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য সব মেয়েরা হাত-মুখ ধুতে বাইরে গেছে।

একে একে সেলের বাসিন্দারা ঘরে ঢুকল। তাদের পায়ে কারা-জুতো, কিন্তু মোজা নেই। প্রত্যেকের হাতে একটা করে রুটি, কারও বা দুটো।

ফেদসিয়া মাসলভার কাছে এগিয়ে গেল।

পরিস্কার দুটি নীল চোখে মাসলভার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'ব্যাপার কি? কোন খারাপ খবর কি?' রুটিগুলো তাকের উপর রেখে বলল, 'এগুলো আমাদের চায়ের জন্য।'

কোরাব্‌ল্যভা বলল, 'কি হল? নিশ্চয় সে বিয়ের মতলব পাল্টায় নি?'

মাসলভা বলল, 'না, তিনি পাল্টান নি, কিন্তু আমি তা চাই না, আর সে কথা তাকে বলে দিয়েছি।'

গম্ভীর গলায় কোরাব্‌ল্যভা বলল, 'তুমি বোকার হদ্দ!'

ফেদসিয়া বলল, 'এক সঙ্গে যদি না থাকতে পারে, তাহলে বিয়ে করে লাভ কি?'

পাহারাদারের স্ত্রী বলল, 'তোমারও তো স্বামী আছে—সে তো তোমার সঙ্গেই যাচ্ছে।'

ফেদসিয়া বলল, 'কিন্তু আমাদের বিয়ে তো আগেই হয়ে গেছে। কিন্তু সে যদি মাসলভার সঙ্গে থাকতেই না পারে তাহলে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে যাবে কেন?'

'কেন যাবে! বোকার মত কথা বলো না। তুমি তো জান সে যদি ওকে বিয়ে করে তাহলে তো ও টাকার মধ্যে গড়াগড়ি দেবে।'

মাসলভা বলল, 'তিনি বলেছেন, "তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব।" যদি যান, ভাল কথা; যদি না যান, সেও ভাল। আমি তাকে কিছু বলব না। সমস্ত ব্যাপারটার ফয়সালা করতে এখন তিনি পিতার্সবার্গ যাবেন। সেখানে সব মন্ত্রীর সঙ্গে তার জানাশোনা আছে। কিন্তু সে যাই হোক, তাকে দিয়ে আমার কোন দরকার নেই।'

থলির ভিতর কি আছে দেখতে দেখতে কোরাব্‌ল্যভা অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল, 'তা তো নেইই। ঠিক আছে। এক ফোঁটা হবে নাকি?'

মাসলভা জবাব দিল, 'তোমরা খাও। আমি খাব না।'

দ্বিতীয় খণ্ড

অধ্যায়—১

একপক্ষকালের মধ্যেই সেনেটে মাসলভার শুনানী শুরু হবার কথা। নেখ্‌লুয়ুদভের ইচ্ছা সেই সময় পিতার্সবার্গে উপস্থিত থাকবে এবং সেনেট যদি আপীল অগ্রাহ্য করে তাহলে (যে অ্যাডভোকেট আপীলের খসড়া তৈরি করেছিল তার পরামর্শ মত) সম্রাটের কাছে আবেদন করবে। সে ক্ষেত্রে—এবং অ্যাডভোকেটের অভিমত, যেহেতু আপীলের কারণ খুবই তুচ্ছ সেই হেতু সম্রাটের কাছে আবেদন করার জন্য তৈরি থাকাই ভাল—যে কয়েদী-দলের মধ্যে মাসলভা রয়েছে তারা হয় তো জুন মাসের গোড়ায়ই রওনা হবে; স্থতরাং তার সঙ্গে সাইবেরিয়ায় যেতে হলে, আর যেতে সে সংকল্পবদ্ধ, বিভিন্ন জমিদারিতে গিয়ে সেখানকার বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা নেখ্‌লুয়ুদভের পক্ষে একান্ত দরকার।

সে প্রথমেই গেল সব চাইতে কাছের জমিদারি কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে। কালো মাটির দেশের ঐ জমিদারি থেকেই তার মোটা টাকা আসে।

শৈশবে ও যৌবনে নেখ্‌লুয়ুদভ অনেকবার সে জমিদারি দেখতে গেছে। তারপরেও দু'বার গেছে। প্রথমবার মায়ের অনুরোধে একজন জার্মান সরকারকে সঙ্গে নিয়েছিল; সেই সঙ্গে থেকে সব হিসাবপত্র পরীক্ষা করেছিল। কাজেই সেখানকার অবস্থা এবং কৃষকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ মালিকের) সম্পর্কটা সে অনেকদিন থেকেই জানে। মালিকের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্কটা ছিল—মোলায়েম করে বলতে গেলে কৃষকরা ছিল কর্তৃপক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। আর সোজাসুজি বলতে গেলে তারা ছিল কর্তৃপক্ষের ক্রীতদাস স্বরূপ। ১৮৬১ সালে যে ক্রীতদাসপ্রথা রদ করা হয়েছে, যেটা ছিল মনিবের কাছে ব্যক্তিবিশেষের ক্রীতদাসত্ব, এটা সে ধরনের ক্রীতদাসত্ব নয়; এটা হল যে কৃষক-সমাজের কোন জমি নেই বা যাদের জমির পরিমাণ নগণ্য তাদের সামগ্রিক ক্রীতদাসত্ব সমগ্র বৃহৎ জমিদার শ্রেণীর কাছে, অথবা যে সব বড় জমিদারদের মধ্যে তারা বাস করে তাদের কাছে। নেখ্‌লুয়ুদভ সে কথা জানে; আসলে না জেনে উপায় নেই, কারণ এই ধরনের ক্রীতদাস-ব্যবস্থার উপরেই তার জমিদারি নির্ভর করে, এবং জমিদারি পরিচালনার এই ব্যবস্থাকে সে নিজেও সমর্থন করে। শুধু তাই নয়, সে আরও জানে যে, এ ব্যবস্থা নিষ্ঠুর ও অন্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা কালে সে যখন হেনরি জর্জের মতবাদে বিশ্বাস করত ও সেই মতবাদ প্রচার করত, যার ভিত্তিতে সে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া সব

জমি কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিল, তখন থেকেই সে এসব জানত। একথা সত্য যে, সেনাবাহিনীতে কাজ করবার পরে যখন সে বাৎসরিক বিশ হাজার রুবল খরচ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, তখন থেকে এই পূর্বতন মতবাদকে সে আর অবশ্যপালনীয় বলে মনে করে না, এমন কি সে সব কথা ভুলেও গিয়েছে। তার মায়ের দরুণ যে টাকাটা সে পায় সেটা কোথা থেকে আসে সে কথা চিন্তা করাও সে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যু, সম্পত্তি হাতে আসা এবং তার পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা—এই সব মিলে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটি নতুন করে তার সামনে দেখা দিল। এক মাস আগে হলে নেখ্‌লুয়ুদভ জবাব দিত যে প্রচলিত ব্যবস্থা রদ করার শক্তি তার নেই, আর সে নিজে জমিদারি পরিচালনাও করে না; যেমন করেই হোক, জমিদারি থেকে অনেকদূরে বাস করে এবং সেখান থেকে পাঠানো টাকাটা নিয়েই সে বিবেকের তাড়ণা থেকে মুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু এখন সে স্থির করেছে, যদিও কারা-জগৎ সংক্রান্ত এইসব জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলির জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন এবং সাইবেরিয়াতে যাবার একটা সম্ভাবনাও তার সামনে রয়েছে, তবু এভাবে আর চলতে পারে না এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে এমন ভাবে বদলাতে হবে যাতে তার ক্ষতিই হবে। সুতরাং সে স্থির করেছে, জমি নিজে চাষ না করে অল্প খাজনায় কৃষকদের হাতে দিয়ে দেবে যাতে তারা জমিদারের উপর নির্ভর না করে নিজেরাই সে জমি চাষ করতে পারে। একজন জমিদারের সঙ্গে একজন ভূমিদাস-মালিকের অবস্থার তুলনাপ্রসঙ্গে নেখ্‌লুয়ুদভ একাধিকবার ভাড়াটে শ্রমিক দিয়ে জমি চাষ করার পরিবর্তে জমিটা কৃষককে খাজনা-বিলি করার সঙ্গে পুরনো কালে ভূমিদাস-মালিকরা যেভাবে শ্রমের বিনিময়ে ভূমিদাসদের কাছ থেকে টাকা আদায় করত সেই ব্যবস্থার তুলনা করেছে। সেটা সমস্যার কোন সমাধান নয়, তবে সমাধানের পথে একটা ধাপ বটে; অপেক্ষাকৃত অল্প কঠোর একটা দাসত্বের দিকে কিছুটা অগ্রগতি মাত্র। আর সেই পথেই সে অগ্রসর হতে চাইছে।

দুপুর নাগাদ সে কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে পৌছল। জীবনকে সব দিক থেকেই সরল করবার উদ্দেশ্যে আসার আগে সে টেলিগ্রাম করে নি; স্টেশন থেকেই একটা দুই-ঘোড়ার চাষীদের গাড়ি ভাড়া করল। যুবক কোচয়ানের পরণে একটা সুতীর কোট, বেল্টটা কোমরের অনেকটা নীচে আটকানো। দুজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল।

সে যে 'মনিব'কেই গাড়িতে নিয়ে চলেছে সেটা না বুঝে কোচয়ান সরকার-মশাই সম্পর্কে অনেক কথা বলতে লাগল। নেখ্‌লুয়ুদভ ইচ্ছা করেই নিজের পরিচয় দেয় নি।

কোচয়ানটি এক সময়ে শহরে ছিল এবং কিছু কিছু উপন্যাস পড়েছে। গাড়ির 'বক্স-এ' বসে তার লম্বা চাবুকটার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত হাত

চালিয়ে নিজের কায়দা-কৌশল দেখাতে দেখাতে সে বলতে লাগল, 'ওই জমকালো জার্মান ভদ্রলোক তিনটে হালকা হলুদ রঙের ঘোড়া কিনেছে, আর সে যখন তার বৌকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়—আরে বাস! বড়দিনের সময় বড় বাড়িতে সে একটা খৃস্টমাস-গাছও বানিয়েছিল। বেশ কয়েকজন অতিথিকে তো আমিই গাড়ি করে পৌছে দিয়েছিলাম। বাড়িতে বিজলি আলোও আছে। সারা জেলায় আর কোথাও আপনি এ রকমটা পাবেন না। সে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছে। আর জমাবেই বা না কেন? তাকে বাধা দেবার তো কেউ নেই! শুনেছি সে নাকি একটা ভাল জমিদারিও কিনেছে।'

নেখ্‌ল্যুদভ জানে, সরকার কি ভাবে জমিদারি চালায় তার কোন খবরই সে রাখে না বলে সরকার অনেক কিছু সুখ-সুবিধা ভোগ করে থাকে। তবু লম্বা কোমরওয়ালা কোচয়ানের কথাগুলি শুনে তার ভাল লাগল না।

দিনটা ভারি সুন্দর! ঘন কালো মেঘ মাঝে মাঝেই সূর্যকে ঢেকে ফেলছে; মাঠে মাঠে চাষীরা কোদাল দিয়ে যইশস্য বুনছে; গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতা গজিয়েছে; প্রান্তর জুড়ে গরু-মোষ চরে বেড়াচ্ছে; দূরে দূরে সব মাঠে চাষ হচ্ছে—কিন্তু মাঝে মাঝেই একটা খারাপ কিছু তার মনে পড়ছে। যখন সে নিজেকেই প্রশ্ন করল সেটা কি, তখনই তার মনে পড়ে গেল কোচয়ানের মুখে শোনা কুজমিন্‌স্কোয়ে-র জার্মান সরকারের কীর্তিকলাপের কথা।

জমিদারিতে পৌছে কাজকর্মে হাত দেবার পরে অবশ্য মনের এ অস্বস্তি কেটে গেল।

খাতাপত্র সব দেখা হল। কথাপ্রসঙ্গে সরকার পরিষ্কার জানাল যে, চাষীদের হাতে সামান্যই জমি আছে, আর যেটুকু বা আছে তাও সবই মালিকের জমির মধ্যেই অবস্থিত, কাজেই খুব সহজেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নেখ্‌ল্যুদভ কিন্তু মনে মনে স্থির করল, চাষবাস তুলে দিয়ে সব জমি চাষীদের ইজারা দিয়ে দেবে।

আপিসের খাতাপত্র থেকে এবং সরকারের সঙ্গে কথা বলে নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল, সব চাইতে ভাল চাষের জমির তিন ভাগের দুভাগ চাষ করা হচ্ছে নির্দিষ্ট মাইনেতে নিযুক্ত মজুরদের দিয়ে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে, আর বাকি এক অংশ চাষ করছে চাষীরা দেসাতিনা (পৌনে তিন একরের মত) প্রতি পাঁচ রুবল মজুরিতে। অর্থাৎ চাষীরা প্রতি 'দেসাতিনা' জমিতে তিনবার লাঙল দেবে, তিনবার মই দেবে, ফসল বুনবে ও কাটবে, এবং আঁটি বেঁধে খামারে পৌছে দেবে, আর তার বিনিময়ে পাবে পাঁচ রুবল, অথচ মাইনে-করা লোকরা সেই একই কাজ করে পাবে ন্যূনতম দশ রুবল। জমিদারি থেকে চাষীরা যা কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে তার জন্যও তাদের চড়া দাম দিতে হয়। তারা পতিত জমি ব্যবহার করে, জঙ্গলের কাঠ কাটে, বা আলুর মাথাগুলো নেয়; কিন্তু তার জন্য তাদের দাম দিতে হয়। ফলে তাদের

প্রায় সকলেরই কাছারিতে অনেক ঋণ। এইভাবে চাষের জমির বাইরে দূরে দূরে যে সব জমি চাষীরা ইজারা নিয়েছে তার জন্য শতকরা পাঁচ ভাগ হিসাবে লগ্নি করলে ঐ জমি থেকে যা পাওয়া যেত চাষীদের দিতে হয় তার চার গুণ।

এসব কথা নেখ্‌ল্যুদভ আগেও জানত। কিন্তু এখন সে নতুন আলোয় সব কিছু দেখতে পেল, আর এই ভেবে বিস্ময় বোধ করতে লাগল যে এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক অবস্থাকে সে বা তার সমপর্যায়ের অন্য লোকরা এতদিন দেখতে পায় নি কেন। সরকার যুক্তি দেখাল যে, সব জমি যদি চাষীদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে চাষের যন্ত্রপাতি থেকে প্রায় কিছুই আয় হবে না, সেগুলোর যা দাম তার সিকিও তাদের কাছ থেকে আদায় হবে না, চাষীরা জমিগুলো নষ্ট কবে ফেলবে এবং নেখ্‌ল্যুদভের ভয়ানক ক্ষতি হবে। কিন্তু ফল হল বিপবীত। নেখ্‌ল্যুদভের মনে আরও বদ্ধমূল ধারণা হল যে, চাষীদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজেকে আয়ের একটা বড় অংশ থেকে বঞ্চিত কবে সে ভাল কাজই করতে যাচ্ছে। তাই সে স্থির করল, সেখানে থাকতে থাকতেই সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলবে। ফসল কাটা ও বিক্রি করা. চাষের যন্ত্রপাতি ও অকেজো বাড়িঘরগুলো বেচে দেওয়ার কাজ সরকার নিজেই যথাসময়ে করতে পারবে। সে সরকারকে বলল, কুজমিন্‌স্কোয়ে জমিদারির তিনটি কাছাকাছি গ্রামের চাষীদেব যেন একটা সভায় আসতে বলা হয়। তার নিজের অভিপ্রায় এবং কি কি শর্তে তাদের মধ্যে জমি বিলি করা হবে, সবই সেই সভায় জানিয়ে দেওয়া হবে।

সরকারের সঙ্গে বিতর্কে মনের যে দৃঢ়তা সে দেখিয়েছে এবং এত বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করতে যে সে প্রস্তুত হয়েছে, তার ফলে মনে একটা খুশির ভাব নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ কাছারি থেকে বেড়িয়ে গেল। আসন্ন কাজের কথা ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির চারধাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পরিচর্যাহীন ফুলের বাগানের —সরকারের বাড়ির সামনে এ বছরই ফুলের গাছগুলি লাগান হয়েছিল—ভিতর দিয়ে, চিকোরি-গাছে ভর্তি টেনিস-মাঠের উপব দিয়ে, যে লেবু-বীথিতে সে সিগারেট খেতে যেত এবং যেখানে সে তাব মায়ের অতিথি সুন্দরী কিরিমভার সঙ্গে প্রেম করত, সেই সব জায়গায় সে ঘুরতে লাগল। চাষীদের কাছে যে ভাষণটি দেবে মনে মনে সেটাকে ঠিক করে সে আর একবার সরকার মশায়ের সঙ্গে আলোচনা করল এবং চা খাবার পরে মস্ত বড় বাড়িটার মধ্যে তার জন্য সাজানো ঘরটাতে চলে গেল। আগেকার দিনে সেটাকে বাড়তি শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হত।

সেই ছোট পরিচ্ছন্ন ঘরটার দেয়ালে ভেনিসের ছবি ঝুলছে, দুটো জানালার মাঝখানে রয়েছে একটা আয়না, স্প্রিং-এর গদি-আঁটা একটা পরিষ্কার বিছানা, তার পাশে একটা ছোট টেবিলের উপর জলের পাত্র, দেশলাই, এবং একটা বাতি-নেভানোর যন্ত্র। আয়নার পাশে আর একটা টেবিলে রাখা হয়েছে তার

খোলা পোর্টম্যাণ্টোটা, তার মধ্যে রয়েছে তার ড্রেসিং-কেস ও কয়েকখানা বই; একখানা রুশ ভাষার বই, An Investigation of the Laws of Criminality (ফৌজদারি আইন সমীক্ষা), এবং ঐ একই বিষয়ের উপর লেখা একখানি জার্মান ও একখানি ইংরেজি ভাষার বই; গ্রামে বেড়াতে এসে বইগুলো পড়ে ফেলবে ভেবে সঙ্গে এনেছে। আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে; চাষীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈরি হতে যাতে সকালে উঠতে পারে সে জন্য সে তাড়াতাড়ি শুতে গেল।

ঘরের এক কোণে সাবেকি ফ্যাশনের কারুকাজকরা মেহগেনি কাঠের একখানা হাতল-কেদারা পাতা রয়েছে। নেখ্‌লয়ুদভের মনে পড়ল, এই কেদারাটা তার মায়ের শোবার ঘরে থাকত। তাই সেখানা দেখামাত্রই হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত অনুভূতি জেগে উঠল। এই বাড়ি ভেঙে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, এই বাগান আগাছায় ভরে যাবে, জঙ্গল কেটে ফেলা হবে, আর ওই খামার-বাড়ি, আস্তাবল, চালা, যন্ত্রপাতি, ঘোড়া, গরু— সে তো জানে, এসব সঞ্চয় করতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে কত মানুষের কত শ্রম ব্যয় হয়েছে—সব কিছু চলে যাবে। আগে মনে হয়েছিল, এ সব কিছু ছেড়ে যাওয়া খুবই সহজ, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে কাজটা কত কঠিন; শুধু ছেড়ে যাওয়া নয়, সব জমি বন্দোবস্ত করে দিয়ে অর্ধেক আয় হারানোও কত কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এইভাবে সব জমি চাষীদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের সম্পত্তিকে নষ্ট করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

'সম্পত্তি দখলে রাখা উচিত নয়। কিন্তু সম্পত্তি যদি না রাখতে পারি, তাহলে তো এই বাড়ি ও খামারও রাখা চলে না।···কিন্তু আমি তো তখন সাইবেরিয়ায় চলে যাব, কাজেই বাড়ি বা জমিদারি কোনটারই আমার দরকার থাকবে না,' এই হল একটি কণ্ঠস্বর। অপর কণ্ঠস্বর বলল, 'সবই ঠিক, কিন্তু তুমি তো সারাটা জীবন সাইবেরিয়াতে কাটাচ্ছ না। একদিন তুমি বিয়ে করবে, ছেলেমেয়ে হবে, আর যে অবস্থায় এই বিষয়-সম্পত্তি তুমি পেয়েছিলে সেই অবস্থায়ই সেটা তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। জমির প্রতিও তো একটা কর্তব্য আছে। সেটাকে বিলিয়ে দিয়ে সব কিছু নষ্ট করা খুবই সহজ; কিন্তু অর্জন করা বড়ই শক্ত। সর্বোপরি, তোমার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ভাবতে হবে, আর তদনুসারেই তোমার বিষয়-সম্পত্তির বন্দোবস্ত করতে হবে। তারপর, তুমি কি সত্যসত্যই তোমার বিবেকের নির্দেশে কাজ করছ, না কি এ সবই লোক-দেখানো ব্যাপার। নেখ্‌লয়ুদভ নিজেকে এই সব প্রশ্ন করতে লাগল; সে স্বীকার করল, তার সম্পর্কে লোকে কি ভাববে এই চিন্তার দ্বারাই সে প্রভাবিত হয়েছে। যতই ভাবতে থাকে ততই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়, আর ততই সেগুলিকে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়।

ঘুমের আশ্রয় নিয়ে এই সব চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এবং

সকালে তাজা মন নিয়ে সমস্যার সমাধানের আশায় সে পরিষ্কার বিছানায় শুয়ে পড়ল। খোলা হাওয়া ও চাঁদের আলোয় ব্যাঙের ডাক কানে আসছে। তার সঙ্গে মিশেছে পার্কের একজোড়া নাইটিঙ্গেল পাখি ও জানালার নীচে ফুটন্ত লিলাক-ঝোপের একটি নাইটিঙ্গেল পাখির ডাক। পাখি ও ব্যাঙের ডাক শুনতে শুনতে নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল ইন্সপেক্টরের মেয়ের বাজনা ও ইন্সপেক্টরের কথা। সেই সঙ্গে মাসলভাকে মনে পড়ে গেল : 'এ সব আপনাকে ছেড়ে দিতেই হবে,' এই কথাগুলি বলবার সময় তার কণ্ঠস্বরও ব্যাঙের ডাকের মতই কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। তখন জার্মান সরকারমশায় ব্যাঙের কাছে যেতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া হল ; কিন্তু সে নেমে তো গেলই, উপরন্তু মাসলভায় রূপান্তরিত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভকে ভর্ৎসনা করে বলে উঠল, 'আপনি প্রিন্স, আর আমি কয়েদী।' 'না, আমি হার মানব না,' নেখ্‌ল্যুদভ মনে মনে ভাবল ; তারপর নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, আমি কি ন্যায় করছি, না অন্যায় করছি? আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমার কাছে সবই সমান : আমাকে ঘুমুতেই হবে।' তারপর সরকার মশায় ও মাসলভাকে যেখানে নেমে যেতে দেখেছিল সে নিজেও সেখানেই নেমে যেতে লাগল, আর সেখানেই সব শেষ হয়ে গেল।

অধ্যায়—২

সকাল ন'টায় নেখ্‌ল্যুদভের ঘুম ভাঙল। তার উঠবার শব্দ শুনেই কাছারির মহুরিটি চকচকে পালিশ করা জুতো জোড়া এনে দিল, ঝর্ণার পরিস্কার ঠাণ্ডা জল এনে দিল, আর জানাল যে চাষীরা জমায়েত হতে আরম্ভ করেছে। নেখ্‌ল্যুদভ লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠল, তার সব কথা মনে পড়ল। সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করে সেটাকে নষ্ট করার জন্য যে অনুশোচনা কাল মনের মধ্যে জেগেছিল, আজ তার চিহ্নমাত্রও নেই। বরং সে কথা মনে হতে সে বিস্মিত বোধ করল, এবং আসন্ন কর্তব্য পালনের সম্ভাবনায় খুশি হয়ে উঠল, বুঝি বা নিজের অজান্তে গর্ববোধও করল।

জানালা দিয়ে দেখতে পেল, চিকোরি-লতায় ঢাকা পুরনো টেনিস-মাঠে চাষীরা জমা হতে শুরু করেছে। গত রাতে ব্যাঙগুলো বৃথাই ডাকে নি ; দিনটা মেঘলা। বাতাস নেই ; সকালবেলা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে ; বৃষ্টির ফোঁটা-গুলো এখনও গাছের শাখায়, পাতায় ও ঘাসের ডগায় ঝুলছে। তাজা গাছ-গাছালির গন্ধ ছাড়াও আরও বৃষ্টির প্রার্থনায় মাটির একটা সোঁদা গন্ধও জানালা-পথে ভেসে আসছে।

পোষাক পরতে পরতে নেখ্‌ল্যুদভ বার বার টেনিস-মাঠে সমবেত চাষীদের দেখতে লাগল। তারা একে একে আসছে, টুপি খুলছে, পরস্পরকে অভিবাদন

করছে, এবং লাঠিতে ভর দিয়ে গোল হয়ে বসে কথাবার্তা বলছে। সবুজ খাড়া কলার ও অজস্র বোতাম লাগানো নাবিকদের মত আটো কুর্তা পরিহিত পেশী-বহুল দেহ, শক্ত-সমর্থ সরকারমশায় এসে খবর দিল, সকলেই হাজির হয়েছে। তবে নেখ্‌ল্যুদভের প্রাতরাশ—চা বা কফি যা তার ইচ্ছে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করবে।

চাষীদের সঙ্গে একটু পরেই যে সব কথা হবে তা ভেবে একটা অপ্রত্যাশিত লাজুকতা ও অপমান বোধ করে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'না, আমার মনে হয় এখনই তাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত।'

চাষীদের যে কামনা সে পূর্ণ করতে চলেছে সেটা চাষীরা আশা করতেও সাহস পায় নি; অল্প মূল্যে তাদের জমি দেওয়া হবে—অর্থাৎ একটা মস্ত বড় দান করা হবে। অথচ তার মনে কিসের যেন একটা লজ্জাকর অনুভূতি। সে যখন চাষীদের সামনে হাজির হল, তখন কালো চুল, কোঁকড়া চুল, টাক মাথা, পাকা চুলে ভর্তি মাথা, সবাই টুপি খুলে তার সামনে দাঁড়াল। তাদের দেখে সে এতই বিচলিত হয়ে পড়ল যে কোন কথাই বলতে পারল না। ছোট ছোট ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, লোকগুলোর চুলে, দাড়িতে, মোটা কোটের ভাঁজে জমতে লাগল। সকলেই 'মনিব'-এর কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, কিন্তু লজ্জায় সে মুখ খুলতেই পারল না। গম্ভীর আত্ম-বিশ্বাসী জার্মান সরকারমশায় নিজেকে একজন রুশ চাষী-বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে। রুশ ভাষাও সে বেশ ভাল বলতে পারে। সেই প্রথম এই অস্বস্তিকর নৈঃশব্দকে ভঙ্গ করল।

সে বলল, 'প্রিন্স তোমাদের একটা উপকার করতে চান—তিনি তোমাদের কাছে জমি ইজারা দেবেন; অবশ্য তোমরা তার উপযুক্ত নও।'

একটি লাল-চুল, বক্‌বক্‌-স্বভাবের চাষী বলে উঠল, 'আমরা কেন উপযুক্ত নই ভাসিলি কারলভিচ? আমরা কি আপনার জন্য কাজ করি না? স্বর্গতা কর্ত্রী—ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন!—আমাদের খুব ভালবাসতেন, প্রিন্স নিশ্চয় আমাদের ত্যাগ করবেন না। তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।'

'হ্যাঁ, সেই জন্যই তোমাদের সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমরা চাইলে সব জমি তোমাদের বন্দোবস্ত করে দেব।'

চাষীরা কিছুই বলল না: হয় তারা বুঝতে পারল না, নয়তো কথাগুলি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

একজন মাঝ-বয়সী লোক জিজ্ঞাসা করল, 'একটু বুঝতে দিন। আমাদের জমি দেবেন? আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'তোমাদের বন্দোবস্ত করে দেব, যাতে কম খাজনায় তোমরা জমি ব্যবহার করতে পার।'

একজন বৃদ্ধ বলল, 'খুব ভাল কথা।'

আরেক জন বলল, 'অবশ্য খাজনাটা যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয়।'

'খাজনায় জমি না নেবার তো কোন কারণ নেই।'

'জমি চাষ করে বেঁচে থাকতেই আমরা অভ্যস্ত।'

'আর সেটা আপনার পক্ষেও ভাল। শুধু খাজনা নেওয়া ছাড়া আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না। ভাবুন তো, এখন কত অন্যায়, কত দুশ্চিন্তা করতে হয়।'

জনা কয়েক একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

জার্মান লোকটি মন্তব্য করল, 'সব অন্যায় তো তোমাদের। তোমরা যদি ঠিক মত কাজ করতে, নিয়ম-কানুন মেনে চলতে—'

উঁচু নাকওয়ালা একজন বুড়ো বলে উঠল, 'আমাদের মত লোকের পক্ষে সেটা অসম্ভব। আপনি বলবেন, "ঘোড়াটাকে ফসলের মাঠে ঢুকতে দিলি কেন?" যেন আমিই ঘোড়াটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আরে মশায়, সারাদিন কাস্তে চালিয়েছি বা ওই রকমই কিছু করেছি, শেষ পর্যন্ত একটা দিনকে মনে হয়েছে যেন একটা বছর; তারপর রাতের বেলায় ঘোড়ার পালের উপর নজর রাখতে রাখতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি, আর সেই ফাঁকে ঘোড়াটা মাঠের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে; আর সেজন্য এখন আপনি আমার চামড়া তুলতে চাইছেন।'

'কিন্তু নিয়ম তো মানতে হবে।'

'আপনার পক্ষে নিয়মের কথা বলা সোজা, কিন্তু আমাদের শক্তিতে না কুলোলে কি করা যাবে।'

'একটা বেড়া দিতে বলেছিলাম না?'

সাদাসিদে চেহারার একজন ছোটখাট লোক বলল, 'তাহলে বেড়া দেবার মত কাঠ দিন। গত বছর বেড়া দেবার জন্য একটা ছোট গাছ কেটেছিলাম, আর অমনি আপনি আমাকে তিন মাসের জন্য কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। বেড়ার সেখানেই ইতি হয়ে গেল।'

সরকার মশায়ের দিকে ঘুরে নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটি কি বলছে?'

সরকার মশায় জার্মান ভাষায় জবাব দিল, 'Der erste Dieb im Dorfe (লোকটা এ গাঁয়ের সেরা চোর)। প্রত্যেক বছরই ওকে জঙ্গল থেকে কাঠ চুরির অপরাধে ধরা হয়।' তারপর চাষীর দিকে ফিরে বলল, 'তোমাকে তো অন্যের সম্পত্তি মেনে চলতে হবে।'

বৃদ্ধ লোকটি বলল, 'দেখুন, আপনাকে কি আমরা মেনে চলি না? আপনাকে মেনে চলতে তো আমরা বাধ্য। আরে, আপনি তো আমাদের পাকিয়ে দড়ি বানাতে পারেন; আমরা তো আপনার হাতের মুঠোয়।'

জার্মানটি বলল, 'ওঃ, বন্ধু, তোমাদের কিছু করা তো অসম্ভব। তোমরাই

বরং আমাদের শিক্ষা দিতে পার।'

'আপনাদের শিক্ষা দেব, সত্যি! আপনি কি আমার চোয়ালটা ভেঙে দেন নি, অথচ তার বদলে আমি কিছু পেলাম কি? জানেনই তো, ধনী লোকের সঙ্গে মামলা করে কোন লাভ নেই।'

'নিজেরা তো আইন মেনে চলবে।'

বাক-বিতণ্ডা চলতেই লাগল; অথচ এর কারণ কেউই জানে না। তবে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, এক পক্ষে রয়েছে ভয়ে সংযত তিক্ততা, আর অন্য পক্ষে রয়েছে গুরুত্ব ও ক্ষমতার সচেতনতা। এসব কথা শুনতে নেখ্‌লয়ুদভের খুবই খারাপ লাগছিল, তাই সে খাজনার পরিমাণ ও শর্তাবলী নির্ধারণের প্রশ্ন উত্থাপন করল।

'এবার বল, জমির ব্যাপারে কি হবে? তোমরা কি নিতে ইচ্ছুক? আর আমি যদি সব জমি তোমাদের দেই তাহলেই বা তোমরা কি দাম দেবে?'

'সম্পত্তি আপনার; আপনিই দাম স্থির করুন।'

নেখ্‌লয়ুদভ একটা অংক বলল। আশেপাশে চলতি খাজনা থেকে সেটা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী চাষীরা সেটাকে অনেক চড়া দাম মনে করে দর-কষাকষি শুরু করে দিল। নেখ্‌লয়ুদভ ভেবেছিল, তার প্রস্তাবকে ওরা খুশিমনে মেনে নেবে, কিন্তু খুশির চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

নেখ্‌লয়ুদভ শুধু একটা জিনিস বুঝল যে, তার প্রস্তাবে চাষীদের সুবিধাই হবে। প্রশ্ন তোলা হল: কে জমিটা নেবে—সমগ্র কম্যুন, না কোন বিশেষ সমিতি, ফলে দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল: একদল যারা চাইল সেই সব দুর্বল চাষীদের বাদ দিতে যারা নিয়মিত খাজনা নিতে পারবে না, আর একদল যারা এর ফলে বাদ পড়বে। অবশেষে সরকার মশায়ের চেষ্টায় খাজনার পরিমাণ ও শর্তাবলী স্থির হল, চাষীরাও সশব্দে কথা বলতে বলতে পাহাড় বেয়ে তাদের গ্রামে ফিরে গেল; আর নেখ্‌লয়ুদভ ও সরকারমশায় কাছারিতে ঢুকল চুক্তি-নামার মুসবিদা করবার জন্য।

নেখ্‌লয়ুদভ যেমনটি চেয়েছিল ও আশা করেছিল সেই রকম ব্যবস্থাই হল। জেলার অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় শতকরা ত্রিশ ভাগ সস্তায় চাষীরা জমি পেল। জমির খাজনা অর্ধেক করে দেওয়া হল, তবু নেখ্‌লয়ুদভের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, বিশেষ করে সে যখন জঙ্গল বিক্রির টাকাটাও পেয়ে যাচ্ছে, এবং চাষের যন্ত্রপাতি বেচেও বেশ কিছু টাকা পাবে। সব কিছুরই সুব্যবস্থা হয়ে গেল, তবু কিসের একটা লজ্জা তাকে পেয়ে বসল। সে বুঝতে পারল, ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেও চাষীরা খুশি হয় নি, তারা বুঝি আরও বেশী আশা করেছিল। তাহলে ফল এই দাঁড়াল যে, সে অনেক কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল, অথচ চাষীদের আশাকে পূর্ণ করতে পারল না।

পরদিন চুক্তিনামায় সই-সাবুদ হয়ে গেল; চাষীদের প্রতিনিধিস্থানীয়

কয়েকজন বুড়ো চাষীকে সঙ্গে নিয়ে অনেক কিছু করা হল না এমন একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ কাছারি থেকে সরকারমশায়ের সুদৃশ্য গাড়িতে (যার কথা স্টেশন থেকে আসবার সময় কোচয়ান বলেছিল) চেপে বসল। যে সব চাষী অসন্তোষ ও হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ছিল তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে স্টেশনের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। নেখ্‌ল্যুদভ নিজেও নিজের কাছে অখুশি ; কারণ না জেনেও সারাক্ষণ সে কেন যেন বিষণ্ণ ও লজ্জিত বোধ করতে লাগল।

অধ্যায়—৩

কুজমিন্‌স্কোয়ে থেকে নেখ্‌ল্যুদভ পিসীদের কাছ থেকে পাওয়া জমিদারিতে গেল। সেখানেই কাতয়ুশার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল, কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে যেমন করেছে সেখানকার জমিরও সেই একই ব্যবস্থা করবে। তাছাড়াও তার ইচ্ছা ছিল, কাতয়ুশার সম্পর্কে এবং তাদের দুজনের সন্তানের সম্পর্কে যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করবে ; সে সন্তান সত্যি মারা গেছে কিনা এবং গিয়ে থাকলে কি ভাবে মারা গেছে সে সবই জানতে চেষ্টা করবে।

খুব সকালে সে পানোভা পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছেই যেটা তার প্রথম চোখে পড়ল তা হল বাড়ি-ঘরের বিশেষ করে বসত-বাড়ির ভগ্নদশা। লোহার সবুজ ছাদটা অনেকদিন রং না করার ফলে মরচে ধরে লাল হয়ে গেছে ; লোহার কয়েকটা পাত সম্ভবত ঝড়ের ধাক্কায় বেঁকে উল্টে গেছে। বাড়ির কাঠের বেড়া অনেক জায়গায়ই ভেঙে গেছে ; টানলেই সেগুলি মরচে-ধরা লোহা থেকে অনায়াসেই খুলে আসবে। দুটো ফটকই, বিশেষ করে পাশের যে ফটকটার কথা তার ভালই মনে আছে, ভেঙে পড়েছে ; শুধু বরগাগুলি আছে। কতকগুলি জানালা আটকে দেওয়া হয়েছে। যে বাড়িটায় গোমস্তা থাকে, রান্নাঘর, আস্তাবল—সব হলদেটে বিবর্ণ হয়ে ভগ্নপ্রায় হয়ে রয়েছে। শুধু নষ্ট হয় নি বাগানটা, বরং আরও ঘন হয়েছে, অনেক ফুল ফুটেছে ; চেরি, আপেল ও কুলগাছগুলি ফুলে ফুলে সাদা মেঘের মত দেখাচ্ছে। যে লিলাকের ঝোপ দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছিল তাতেও ফুল ফুটেছে ; বারো বছর আগে যখন ষোড়শী কাতয়ুশার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে গিয়ে ওরই একটা লিলাক ঝোপের পিছনে পড়ে গিয়ে তার হাতে বিছুটি লেগেছিল, ঠিক তখনকার মতই ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে গাছগুলি। বাড়ির কাছে সোফিয়া পিসীর লাগানো ঝাউ-গাছগুলি তখন এক-একটা ছোট লাঠির মত ছিল ; এখন সেগুলি বেড়ে এক একটা মস্ত বড় গাছ হয়েছে ; তার ডাল দিয়ে বাড়ির কড়ি-বরগা তৈরি হতে পারে ; তার শাখা-প্রশাখা হলদে-সবুজ রঙের ফুলে ছেয়ে আছে। কারখানার বাঁধের উপর দিয়ে নদীর জলধারা সশব্দে ছুটে চলেছে। মাঠের বুকে চাষীদের

গরু-মোষ চরে বেড়াচ্ছে।

গোমস্তাটি একটি ছাত্র। পড়া শেষ না করেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে এসেছে। হাসিমুখে সে নেখ্‌ল্যুদভকে অভ্যর্থনা করল। তেমনি হাসিমুখেই তাকে কাছারিতে ঢুকতে বলে সে বেড়ার ও-পাশে চলে গেল। সামান্য কিছু ফিস ফিস কথাবার্তা শোনা গেল, আর তারপরেই যে ইজভজচিকখানা নেখ্‌ল্যুদভকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল কিছু বকশিস পেয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে সেখানাও চলে গেল। তারপর চারদিকে সব চুপচাপ। তখন কাজ-করা চাষীদের ব্লাউজপরা, কানে রেশমের ঝোপ্পা ঝোলানো একটি মেয়ে খালি পায়ে জানালার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল, আর নাল-লাগানো বুটের শব্দ করতে করতে একটা লোকও হেঁটে চলে গেল।

ছোট জানালাটার পাশে বসে বাগানের দিকে চেয়ে সে কান পেতে রইল। একটা মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস নতুন কাটা মাটির গন্ধ নিয়ে জানালা দিয়ে এসে তার ভিজে কপালের চুলগুলিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল আর ছুরি দিয়ে কেটে জানালার গোবরাটে রাখা কাগজগুলিকে উড়িয়ে দিতে লাগল।

'থপ্‌-আ-থপ্‌, থপ্‌-আ-থপ্‌'—নদী থেকে একটা শব্দ আসছে। নদীতে কাপড় কাঁচতে গিয়ে মেয়েরা কাঠের মুগুর দিয়ে তালে তালে কাপড়কে ধোলাই করছে। সে শব্দ কলের পুকুরের ঝিলমিল জলের উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; কলের উপচে-পরা জল বাজনার তালে তালে বয়ে চলেছে; আর একটা ভয়ার্ত মাছি হঠাৎ সশব্দে গুনগুন করতে করতে তার কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল।

'আপনি কখন কিছু মুখে দিতে চান?' হাসিমুখে গোমস্তাটি জিজ্ঞাসা করল।

'তোমার যখন ইচ্ছা; আমি ক্ষুধার্ত নই। প্রথমে গ্রামের মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসব।'

'আপনি কি বাড়ির ভিতরে যাবেন না? ভিতরে সব কিছুই সাজানো আছে। দয়া করে একবার ভিতরে চলুন, বাইরেটা যদিও…'

'ধন্যবাদ। এখন নয়, পরে যাব। আচ্ছা, বলতে পার, মাত্রিয়না খারিনা (কাতয়ুশার পিসীর নাম) নামে কোন স্ত্রীলোক কি এখানে থাকে?'

'হ্যাঁ, থাকে। গ্রামের মধ্যে। সে গোপনে একটা শুঁড়িখানা চালায়। আমি জানি, এ কাজ সে করে, আর এ জন্য তাকে অনেক বকুনিও দিয়েছি। কিন্তু এ জন্য তাকে যদি আটক করা হয় তাহলে বড়ই দুঃখের ব্যাপার হবে। কি জানেন, বুড়ি মানুষ, অনেকগুলি নাতি-নাতনি আছে,' গোমস্তাটি সেই একইভাবে হাসতে হাসতে বলল। তার সে হাসিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠছে 'মনিব'কে খুশি করার ইচ্ছা এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ সব কাজকে সে যে চোখে দেখে নেখ্‌ল্যুদভও সেই চোখেই দেখে।

'সে কোথায় থাকে? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে; শেষ থেকে তৃতীয় কুড়ে। বাঁ দিকে একটা ইটের বাড়ি আছে, তার ঠিক পরেই বুড়ির ঘর। বরং আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই,' গোমস্তা মিষ্টি হেসে বলল।

'না, ধন্যবাদ, আমি ঠিক খুঁজে নিতে পারব। তুমি বরং দয়া করে চাষীদের একটা জমায়েতে ডাকার ব্যবস্থা কর; তাদের বলে দাও যে জমির ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে চাষীদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে এখানকার চাষীদের সঙ্গেও সেই একই চুক্তি করবার আশায় এবং সম্ভব হলে সেদিন রাতেই সেটা পাকা করে ফেলবার আশায়ই নেখ্‌লয়ুদভ কথাগুলি বলল।

অধ্যায়—৪

গেট থেকে বেরিয়েই নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে সেই কানে রেশমি ঝোপ্পা পরা মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আগাছা ও কলাগাছে ভর্তি গোচারণ মাঠের ভিতরকার পায়ে-চলা পথ ধরে সে ফিরছিল। তার পরনে উজ্জ্বল রঙের একটা লম্বা এপ্রন। মোটা খালি পা ফেলে লাফাতে লাফাতে সে তার বাঁ হাতটা অনবরত সামনের দিকে দোলাচ্ছিল। ডান হাত দিয়ে একটা মুরগিকে কোলের মধ্যে ধরে রেখেছে। মুরগিটা লাল ঝুঁটি নাড়তে নাড়তে চুপচাপ আছে। শুধু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, আর একটা কালো ঠ্যাং বের করে নখ দিয়ে মেয়েটির এপ্রনটা চেপে ধরেছে। 'মনিব'-এর কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি ধীরে চলতে চলতে এক সময় প্রায় হাঁটতে শুরু করল। তার একেবারে সামনে এসে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল এবং মাথাটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। তারপর তাকে পার হয়েই আবার বাড়ির দিকে ছুট দিল। কুয়োর কাছে পৌঁছে নেখ্‌লয়ুদভ সুতীর নোংরা ব্লাউজ-পরা একটি বুড়িকে দেখতে পেল। একটা বাঁকে করে দু বালতি জল নিয়ে সে চলেছে। বুড়ি খুব সতর্ক-ভাবে বালতি দুটো নামিয়ে মাথাটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল।

কুয়ো পার হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ গ্রামের মধ্যে ঢুকল। দিনটা ঝকঝকে ও গরম। বেলা দশটা বাজতেই রোদের তাপ বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝেই সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে। গোবরের দুর্গন্ধে রাস্তার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যে সব গাড়ি পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে দুর্গন্ধটা সেদিক থেকে এলেও প্রধানত আসছে বাড়িগুলোর উঠোনে জমা-করা গোবরের গাদা থেকে। সেই সব বাড়ির খোলা দরজার পাশ দিয়েই তাকে চলতে হচ্ছে। গোবরের দাগে নোংরা মাটি ও ট্রাউজার পরা খালি পা চাষীরা এই দীর্ঘকায় মজবুত চেহারার ভদ্রলোকটিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছে। তার টুপিতে চকচকে রেশমের ফিতে বাঁধা; হাতের ঝকঝকে বাঁধানো লাঠিটা

মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে সে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

চতুর্থ দরজাটা পার হবার পরে একটি বুড়ো এগিয়ে এসে অভিবাদন করল।

'আপনি আমাদের কর্ত্রী ঠাকরুণদের ভাই-পো, নয় কি?'

'হ্যাঁ, আমি তাদের ভাই-পো।'

বুড়োটার বেশী কথা বলা স্বভাব। সে বলল, 'আপনি আমাদের দেখাশুনা করতে এসেছেন, নয়?'

'হ্যাঁ, তাই। আচ্ছা, তোমরা সব কেমন আছ?' কি বলবে বুঝতে না পেরে নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল।

'কেমন আছি? খুব খারাপ আছি।'

দরজা পেরিয়ে ভিতরে পা দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল, 'খুব খারাপ কেন?'

উঠোনের একটা চালার নীচে গিয়ে বুড়ো বলল, 'আমাদের কাছে বাঁচা মানেই তো অত্যন্ত দুঃখে বাঁচা। এই তো—সবশুদ্ধু আমরা বারোটি মনিষ্যি। মাস গেলেই আমাকে ছ 'পুড' (১ পুড=৩৬ পাউণ্ড) গম কিনতে হয়। কোথেকে সে টাকাটা আসে বলুন তো?'

'যথেষ্ট যব কি তোমার নিজের জমিতে হয় না?'

অবজ্ঞার হাসি হেসে বুড়ো বলল, 'আমার জমি? জমি তো আছে মোটে তিনজনের মত। গত বছর যা ফসল পেয়েছিলাম তাতে বড়দিন পর্যন্তও চলে নি।'

'তাহলে কি করে চালাও?'

'কি করে চালাই? কেন, একটা ছেলেকে মজুরি খাটতে পাঠালাম, আর আপনার কাছারি থেকে নিজে কিছু ধার করেছিলাম। কিন্তু লেণ্ট-উৎসবের আগেই সব খরচ হয়ে গেল, খাজনা আর দেওয়া হল না।'

'কত খাজনা দিতে হয়?'

'কেন? আমার পরিবারকে দিতে হয় সতেরো রুবল করে বছরে তিনবার। হায় ঈশ্বর, এই তো জীবন! কি ভাবে যে বেঁচে আছি তা নিজেই জানি না।'

গোবর-নিকনো উঠোন পার হতে হতে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'তোমার ঘরের ভিতরে যেতে পারি কি?'

'কেন পারবেন না? আসুন—আসুন!' বলতে বলতে বুড়ো খালি পায়ে গোবরের উপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল; তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গোবর উপচে বেরুতে লাগল। নেখ্‌ল্যুদভকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সে ঘরের দরজা খুলে দিল।

শুধুমাত্র মোটা সেমিজ-পরা দুটি মেয়ে ছুটে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। টুপি খুলে নীচু দরজার কাছে মাথা নুইয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ভিতরে ঢুকল। ভিতর থেকে বাসি ভাতের গন্ধ আসছে। দুটো তাঁত ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। কুড়ের মধ্যে স্টোভের ধারে একটি বুড়ি দাঁড়িয়েছিল। তার সরু

পেশী-বের-করা বাদামী হাতের আস্তিন গোটানো।

বুড়ো বলল, 'এই আমাদের মালিক এসেছেন আমাদের দেখতে।'

আস্তিন খুলতে খুলতে বুড়ি সদয় গলায় বলল, 'কী সৌভাগ্য আমাদের!'

'তোমরা সব কেমন আছ তাই দেখতে এলাম।'

'কেমন আছি সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কুড়েটা ভেঙে পড়ছে, যে কোনদিন একজন খুন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বুড়ো বলে, এই তো বেশ আছে। কাজেই আমরা তো রাজার হালে আছি। আমিই রান্নাবান্না করি, মজুরদের খাওয়াই।'

'আজ কি কি খাবার আছে?'

'আমাদের খাবার? সে খুব চমৎকার। প্রথম পদ, রুটি ও কৃবাস (গম থেকে তৈরি একরকম টক পানীয় যাতে নেশা হয় না); দ্বিতীয় পদ, কৃবাস ও রুটি,' আধ-খাওয়া দাঁত বের করে বুড়ি জবাব দিল।

'না, না, সত্যি বলছি, তোমরা কি খাও আমি দেখব।'

বুড়ো হেসে বলল, 'কি খাব? খুব মজাদার খাবার নয়। বৌ, ওকে দেখাও।'

বুড়ি মাথা নাড়ল।

'চাষীদের খাবার দেখতে চান? এতক্ষণে বুঝেছি, আপনি সব কিছু জানতে এসেছেন। রুটি আর কৃবাসের কথা আগেই বলেছি না? তার সঙ্গে স্যুপও থাকবে। একটি মেয়ে কিছু মাছ এনেছিল, তাই দিয়ে 'স্যুপ' করা হয়েছে; আর তারপরে আছে আলু।'

'আর কিছুই না?'

দরজার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বুড়ি বলল, 'আর বেশী কি চান? একটু দুধও পাব।'

দরজাটা খোলা, বাইরের দালানে একগাদা লোক—ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীলোক, শিশু—জমা হয়েছে, চাষীদের খাওয়া দেখতে আসা এই বিচিত্র ভদ্রলোকটিকে তারা দেখতে চায়। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারায় বুড়িকে খুব খুশি মনে হল।

বুড়ো বলল, 'হ্যাগো, আমাদের জীবন বড়ই কষ্টের; সে কথা তো বলাই বাহুল্য।' যারা দালানে জড় হয়েছিল তাদের দিকে চেঁচিয়ে বলল, 'হেই, তোরা ওখানে কি করছিস?'

নেখ্‌লয়ুদভ কেমন যেন লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, তাহলে চলি।'

বুড়ো বলল, 'দয়া করে আমাদের দেখতে এসেছেন বলে ধন্যবাদ।'

দালানের ছেলেমেয়েরা এক পাশে সরে গিয়ে নেখ্‌লয়ুদভকে পথ করে দিল। সেই বাইরে বেরিয়ে পথ ধরে হাঁটতে লাগল। খালি পায়ে ছুটো ছেলে তার

পিছু নিল—বড়টির একটা শার্ট গায়ে, তার রং এক সময় সাদা ছিল, আর ছোটটির ছেঁড়া মলিন লাল রঙের জামা। নেখ্‌লয়ুদভ তাদের দিকে ফিরে তাকাল।

'আপনি এখন কোথায় যাবেন?' সাদা শার্ট পরা ছেলেটি প্রশ্ন করল।

নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল, 'মাত্রিয়না খারিনার বাড়ি। তোমরা চেন?'

কি ভেবে লাল শার্ট পরা ছেলেটি হেসে উঠল। কিন্তু বড়টি গম্ভীর গলায় জবাব দিল।

'কোন্ মাত্রিয়নার কথা বলছেন? সে কি বুড়ি?'

'হ্যাঁ, সে বুড়ি।'

'ও হো,' ছেলেটি সোৎসাহে বলে উঠল, 'সেই। সে তো থাকে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। আমরাই দেখিয়ে দিচ্ছি। চল্‌রে ফেদ্‌কা, ওর সঙ্গে যাই।'

'চল্, কিন্তু ঘোড়াগুলো?'

'ওরা ঠিক থাকবে, আমি বলছি।'

ফেদ্‌কা রাজী হল। তিনজন পথ দিয়ে এগিয়ে চলল।

অধ্যায়—৫

বড়দের অপেক্ষা ছোটদের কাছে নেখ্‌লয়ুদভ বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করে। খেতে যেতেই সে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। লাল শার্ট-পরা ছোট ছেলেটি আর হাসছে না; সেও বড়টির মতই গম্ভীরভাবে ঠিক ঠিক কথা বলতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'বলতে পার, তোমাদের মধ্যে সব চাইতে গরীব কে?'

'সব চাইতে গরীব? মিখাইল গরীব, সেম্যন মাখারভ আর মারফা—মারফা খুব গরীব।'

ছোট ফেদ্‌কা বলল, 'আর এনিসিয়া, সে তো আরও গরীব; একটা গরু পর্যন্ত নেই। ওরা তো ভিক্ষে করে খায়।'

বড় ছেলেটি বাধা দিয়ে বলল, 'তার গরু নেই বটে, কিন্তু তারা লোক মাত্র তিনজন, আর মারফারা পাঁচজন।'

এনিসিয়ার পক্ষ নিয়ে লাল-কোর্তা ছেলেটি বলল, 'কিন্তু ও তো বিধবা।'

বড়টি বলল, 'তুই বলছিস্ এনিসিয়া বিধবা, কিন্তু মারফাও তো বিধবার মতই—তারও তো স্বামী নেই।'

'তার স্বামী কোথায় গেছে?' নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

'কারাগারে বাস খাচ্ছে,' চাষীদের প্রচলিত কথাগুলিই সে ব্যবহার করল।

লাল-কোর্তা ছেলেটি তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'এক বছর আগে

সে জমিদারের জঙ্গল থেকে দুটো বার্চ গাছ কেটেছিল; তাই তার কয়েদ হয়ে গেল। ছ'মাস হল সে সেখানে আছে আর বৌটা ভিক্ষে করছে। বাড়িতে তিনটে ছেলেমেয়ে আর তাদের রুগ্ন ঠাকমা।'

'সে কোথায় থাকে?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'এই তো, এই বাড়িতে,' সামনের কুড়েটা দেখিয়ে সে বলল। কুড়ের সামনে একটা শুঁটকো ছেলে তার কাঠির মত পায়ের উপর অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মাথায় শোনের নুড়ির মত চুল।

'ভাস্কা। বিচ্ছুটা কোথায় যে যায়?' বলতে বলতে নোংরা ব্লাউজ পড়া একটি স্ত্রীলোক ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নেখ্‌ল্যুদভ পৌঁছবার আগেই সে ভীত চোখে ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিল; মনে হল তার ভয় হয়েছে পাছে নেখ্‌ল্যুদভ ছেলেটাকে মেরে বসে।

এই স্ত্রীলোকটির স্বামীকেই নেখ্‌ল্যুদভের বার্চ-গাছ কাটার অপরাধে কয়েদ করা হয়েছে।

মাত্রিয়নার বাড়ির সামনে পৌঁছে নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই মাত্রিয়না, এও কি গরীব?'

লিকলিকে লাল-কোর্তা ছেলেটি জবাব দিল, 'সে গরীব? না। কেন, সে ত মদ বেচে।'

ছেলে দুটোকে বাইরে রেখে নেখ্‌ল্যুদভ দালান পার হয়ে কুড়েতে ঢুকল। ঘরটা চোদ্দ ফুট লম্বা। স্টোভের পিছনে যে বিছানাটা রয়েছে তাতে একজন লম্বা লোক পা ছড়িয়ে শুতে পারে না। নেখ্‌ল্যুদভ ভাবল, 'ঠিক এই বিছানাতেই কাতয়ুশা সন্তান প্রসব করেছিল এবং রুগ্ন অবস্থায় শুত।' ঘরের বেশীর ভাগ জায়গাই দখল করে আছে এক তাঁত। বড় নাতনিকে নিয়ে বুড়ি তাঁতের টানাটা বসাচ্ছিল। ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে নীচু দরজায় নেখ্‌ল্যুদভের মাথা ঠুকে গেল। আরও দুটি নাতি-নাতনি নেখ্‌ল্যুদভের পিছন পিছন ছুটে এসে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

'আপনি কাকে চান?' বুড়ি বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল। টানাটা ঠিক মত হচ্ছিল না বলে বুড়ির মেজাজটা ভাল ছিল না। তাছাড়া মদের চোরাই কারবার করে বলে যে কোন নতুন লোক দেখলেই তার ভয় হয়।

'এই জমিদারির আমি মালিক। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

বুড়ি চুপ করে গেল। ভাল ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বুড়ির মুখটা হঠাৎ বদলে গেল।

'আরে বাস! তাই তো, এ যে আপনি, আমার বাছাধন! আর এমনি বোকা আমি, ভাবলাম বুঝি কোন পথের লোক। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করুন,' গলায় নরম স্বর এনে বুড়ি বলে উঠল।

'আমি তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই,' দরজার দিকে তাকিয়ে

নেখ্‌লুদভ বলল। সেখানে ছেলেমেয়েগুলোর পিছনে একটি স্ত্রীলোক হাড়জিরজিরে একটা শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

'তোরা সব হাঁ করে কি দেখছিস? দেব রে দেব। এখন আমার লাঠিটা দে তো।' দরজায় যারা ভীড় করেছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ি চেঁচিয়ে বলল। 'দরজাটা বন্ধ করে দে না।'

ছেলেমেয়েগুলো চলে গেল। সন্তান কোলে মেয়েটি দরজা টেনে দিল।

বুড়ি বলতে লাগল, 'আমি ভাবছি, কে না কে এল? আর এ কি না স্বয়ং মনিব আমার সোনা-মানিক। আর নিজে এখানে এসেছেন।' এপ্রন দিয়ে আসনটা মুছে দিয়ে বুড়ি আবার বলতে লাগল, 'এখানে বসুন, বাবা আমার। আমি আরও ভাবছি, কোন্‌ শয়তান আবার হাজির হলেন? আর এ কি না স্বয়ং মনিব, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমি বুড়ো মানুষ, ভাল চোখে দেখি না, আমাকে ক্ষমা করুন।'

নেখ্‌লুদভ বসল। বাঁ হাতে ডান হাতের কনুইটা তুলে ধরে ডান হাতের উপর গালটা রেখে বুড়ি তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

সুরেলা গলায় বলল:

'বাবা আমার, কত বড়টি হয়েছেন। আগে তো ডেইজি ফুলটির মত ছিলেন। আর এখন! অবশ্য চিন্তা-ভাবনা তো আছেই, কি বলেন?'

'সেই জন্যই আমি এসেছি। কাতয়ুশা মাসলভার কথা তোমার মনে আছে?'

'কাতেরিনা। সে তো আমার ভাই-ঝি। তাকে কি ভুলতে পারি? তার জন্য কত চোখের জল ফেলেছি। আমি সব জানি। দেখুন স্যার, ঈশ্বরের কাছে কে অপরাধী নয়? জারের কাছে কে অপরাধী নয়? যৌবন যে কি জিনিস তা তো জানি। দুজন এক সঙ্গে চা-কফি খেতেন, আর সেই সুযোগে শয়তান ঘাড়ে চাপল। অনেক সময়ই তার সঙ্গে এটে ওঠা যায় না। কি আর করা যাবে? আপনি যদি তাকে ত্যাগ করতেন, কিন্তু না, আপনি তো তাকে পুরস্কারই দিয়েছিলেন, একশ' রুবল দিয়েছিলেন। আর সে? সে কি করল? কোন কথা শুনল না। আমার কথা শুনলে ভালভাবেই থাকতে পারত। আমার ভাই-ঝি হলেও হক কথাই বলব; মেয়েটা ভাল না। কেমন ভাল কাজ জুটিয়ে দিলাম! কিন্তু সে কাউকে মানবে না, উল্টে মনিবকেই বকাবকি। ভদ্রলোকদের গালাগালি করা কি আমাদের সাজে? সেখান থেকে চলে গেল। গেল একজন বনবিভাগের বাবুর বাড়ি। সেখানেও থাকতে পারত, কিন্তু টিকল না।'

'আমি তার সন্তানের কথা জানতে চাই। তোমার বাড়িতেই তার প্রসব হয়েছিল, তাই নয় কি? সে সন্তান কোথায়?'

'সন্তানের ব্যাপারে তখন অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হয়েছিল। মেয়েটার

তখন এমন অবস্থা যে আবার যে উঠে দাঁড়াতে পারবে তা ভাবি নি। দেখুন, যথারীতি শিশুর জাত-কর্ম সেরে তাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিলাম। প্রসূতি যেখানে মরবার মুখে সেখানে একটা নিষ্পাপ শিশুকে কে রাখে? অন্যরা কি করে? তারা শিশুটিকে ফেলে রাখে, খেতে দেয় না, সেটা শুকিয়ে মরে যায়। কিন্তু আমি ভাবলাম, না, বরং কষ্ট করে ওকে অনাথ-আশ্রমেই পাঠিয়ে দিই। হাতে টাকাও ছিল, দিলাম পাঠিয়ে।'

'অনাথ হাসপাতাল থেকে একটা নথি-ভুক্তি সংখ্যা কি পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম; কিন্তু বাচ্চাটা মারা গেল। মেয়েমানুষটা তাকে সেখানে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।'

'কে মেয়েমানুষ?'

'সেই যে মেয়েমানুষটা স্করদন্-এ থাকত। তার তো এটাই ছিল ব্যবসা। নাম মালানিয়া। মরে গেছে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে কি করত জানেন? কেউ কোন বাচ্চাকে তার কাছে নিয়ে গেলেই সে তাকে রাখত, খাওয়াত, তার পর বেশ তিন-চারটি বাচ্চা জমলে সব ক'টাকে অনাথ-আশ্রমে নিয়ে যেত। তার ব্যবস্থাও ছিল খুব ভাল: একটা বড় দোলনা—ডবল দোলনা—ছিল, তাতেই সব ক'টাকে শুইয়ে রাখত। পায়ে-পায়ে লাগিয়ে মাথাগুলো দূরে রেখে বাচ্চাগুলোকে এমনভাবে রাখত যাতে ঠোকাঠুকি না হয়। তারপর চারটেকেই এক সঙ্গে নিয়ে যেত। সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দিত, বাস, বাচ্চাগুলো বেড়াল ছানার মত চুপচাপ থাকত।'

'তারপর, বলে যাও।'

'এক পক্ষকাল কাছে রেখে সে কাতেরিনার বাচ্চাকেও সেখানে দিয়ে এল। তার বাড়িতেই বাচ্চাটা অসুখে পড়ে।'

'বাচ্চাটা দেখতে সুন্দর হয়েছিল?' নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'কী সুন্দর, তার চাইতে সুন্দর বাচ্চা আপনি খুঁজেও পাবেন না। ঠিক আপনার মত দেখতে,' বুড়ি চোখ কুঁচকে বলল।

'রোগে পড়ল কেন? খারাপ খাবারের জন্য?'

'খারাপ আবার কোথায়? ও তো লোক-দেখানো কাজ। নিজের বাচ্চা না হলে যা হয় আর কি। কোন রকমে জানে বাঁচিয়ে রাখা। সে বলেছিল, কোন রকমে মস্কো পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, তারপরই মারা যায়। সে একটা সার্টিফিকেটও নিয়ে এসেছিল—সব ব্যবস্থা পাকা। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী।'

তার সন্তান সম্পর্কে এইটুকু খবরই নেখ্‌লয়ুদভ যোগাড় করতে পারল।

অধ্যায়—৬

দুটো দরজায় দু'বার মাথা ঠুকে নেখ্‌লুয়ুদভ বাইরে এসে পথে নামল। সাদা ও লাল-কোর্তা ছেলে দুটি তখনও অপেক্ষা করে আছে। কয়েকজন নবাগতও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বাচ্চা-কোলে কয়েকটি স্ত্রীলোকও ছিল। একটা বাচ্চার একেবারেই রক্তশূন্য চেহারা। ছোট কোঁচকানো মুখে একটা অদ্ভুত হাসি। বাঁকা বুড়ো আঙুলটা অনবরত নাড়ছে।

নেখ্‌লুয়ুদভ জানত, এ হাসি যন্ত্রণার হাসি। সে মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইল।

বড় ছেলেটি জানাল, 'এই সেই এনিসিয়া যার কথা আপনাকে বলছিলাম।'

নেখ্‌লুয়ুদভ এনিসিয়ার দিকে ঘুরে বলল, 'তুমি কি কর? খাওয়া-পরার জন্য কি কাজ কর?'

'কি করি, ভিক্ষে করি,' বলে এনিসিয়া কাঁদতে লাগল।

বাচ্চাটার কুঞ্চিত মুখে আবার হাসি দেখা দিল, ফড়িংএর মত সরু ঠ্যাং দুটো নাড়তে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ টাকার থলি বের করে তাকে একটা দশ-রুবলের নোট দিল। দুই পা এগোবার আগেই বাচ্চা-কোলে আরেকটি স্ত্রীলোক তাকে ধরল, তারপর একটি বুড়ি, তারপর একটি যুবতী। সবাই দারিদ্র্যের কথা জানিয়ে সাহায্য চাইতে লাগল। ছোট নোটে যে ষাট রুবল তার কাছে ছিল সব সে বিলিয়ে দিল। তারপর বিষণ্ণ চিত্তে গোমস্তার বাড়ির পথ ধরল।

গোমস্তাটি হাসিমুখে নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গে দেখা করে জানাল, চাষীরা সন্ধ্যার পরে জমায়েত হবে। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ একটু বেড়াবার জন্য সোজা বাগানে চলে গেল। পথের দুধারে আগাছা জন্মেছে; তার ভিতর দিয়ে আপেল ফুলের পাপড়ি ছড়ানো পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে আজ যা দেখে এসেছে তাই নিয়েই ভাবতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বাড়ি ফিরলে গোমস্তা বিশেষ স্মিত হাসির সঙ্গে জানতে চাইল, সে তখনই খেতে বসবে কি না; তার ভয়, কানে ঝোপ্পা-পরা মেয়েটির সহ-যোগিতায় তার স্ত্রী রান্নাবান্না যা করেছে বেশী দেরী করলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

টেবিলের উপর একটা মোটা মাড়হীন চাদর পাতা হয়েছে। হাত-ভাঙা একটা সুদৃশ্য ঝোলের গামলায় আলু-মুরগির ঝোল রাখা হয়েছে। ঝোলের পর দেওয়া হল ঝলসানো মুরগির মাংস আর অনেক তেল আর চিনি দিয়ে ঠাসা দই-বড়া। কোনটাই সুখাদ্য না হলেও অন্যমনস্ক নেখ্‌লুয়ুদভ তাই খেয়ে নিল।

খাওয়া শেষ করে নেখ্‌লুয়ুদভ অনেক কষ্টে তাকে আসনে বসাতে পারল। তখন সে চাষীদের মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারটা গোমস্তাকে বুঝিয়ে

বলে তার মতামত জানতে চাইল। কিন্তু সারাক্ষণ হাসলেও গোমস্তা কিছুই বুঝতে পারল না। নেখ্‌ল্যুদভ সব কথা পরিষ্কার করে বলতে না পারার দরুণ যে সে বুঝতে পারে নি তা নয়; আসলে নেখ্‌ল্যুদভের প্রকল্পের ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াবে যে অন্যের লাভের জন্য নেখ্‌ল্যুদভ তার নিজের লাভটা ছেড়ে দিচ্ছে; কিন্তু সকলেই চায় নিজের লাভ ও অন্যের ক্ষতি, এই ধারণাটা গোমস্তার মনে এতই বদ্ধমূল যে, নেখ্‌ল্যুদভ যখন বলল, জমির যা আয় হবে তা চাষীদের সমবায়-ভাণ্ডারেই জমা পড়বে তখন গোমস্তা সে কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না।

হঠাৎ সে বলে উঠল, 'ও হো, বুঝতে পেরেছি; মূলধনের একটা অংশ তাহলে আপনি পাবেন।'

'না হে, না! তুমি কি বুঝতে পারছ না যে জমি কোন ব্যক্তি-বিশেষের মালিকানা সম্পত্তি হতে পারে না?'

'তা বটে।'

'কাজেই জমি থেকে যা পাওয়া যাবে সেটা সকলেই পাবে।'

এবার আর গোমস্তার মুখে হাসি নেই। সে বলল, 'কিন্তু তাহলে তো আপনার কোন আয়ই থাকছে না।'

'না, আমার আয়টা আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

গোমস্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তারপরই আবার হাসতে শুরু করল। এবার সে বুঝেছে যে, নেখ্‌ল্যুদভের মাথার ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবতে শুরু করল, নেখ্‌ল্যুদভের এই পরিকল্পনা থেকে কি ভাবে সে নিজে কিছু মুনাফা লুটতে পারে।

কিন্তু যখন বুঝল যে তাও সম্ভব নয়, তখন তার মন খারাপ হয়ে গেল; নতুন পরিকল্পনার ব্যাপারে আর কোন রকম আগ্রহই রইল না; তখনও যে সে হাসতে লাগল সে শুধু 'মনিব'কে খুশি করবার জন্য।

যখন বুঝতে পারল যে গোমস্তা তার কথা কিছুই বুঝতে পারছে না, তখন তাকে বিদায় দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ টেবিলে বসে তার প্রকল্পের একটা খসড়া কাগজে-কলমে তৈরি করতে লাগল।

নতুন পাতা-গজানো লেবু-বাগানের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে নেখ্‌ল্যুদভকে কামরাতে লাগল। লেখা শেষ হলে সে গরু-বাছুরের ডাক শুনতে পেল; গ্রামের ভিতর থেকে দরজা খোলার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ এবং চাষীদের জমায়েতের কলরবও কানে এল। সে গোমস্তাকে বলেই দিয়েছিল, চাষীদের জমায়েত যেন কাছারিতে ডাকা না হয়; তার ইচ্ছা গ্রামের ভিতরে গিয়েই তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। কোন রকমে গোমস্তার দেওয়া এক পাত্র চা খেয়েই নেখ্‌ল্যুদভ গ্রামের দিকে পা বাড়াল।

অধ্যায়—৭

গ্রাম-প্রধানের বাড়ির সামনে সমবেত জনতার কোলাহল ভেসে আসছে ; নেখ্‌ল্যুদভ সেখানে উপস্থিত হতেই সকলে চুপ করল, এবং কুজ্‌মিন্‌স্কোয়ের চাষীদের মতই মাথার টুপি খুলে ফেলল। এখানকার চাষীরা কুজমিন্‌স্কোয়ের চাষীদের চাইতেও গরীব। সকলেরই পরনে বাকলের জুতো, আর হাতে-বোনা মোটা কাপড়ের শার্ট ও ট্রাউজার। অনেকেরই খালি পা, পরণে শার্ট, ঠিক যেভাবে কাজ থেকে ফিরেছে।

নেখ্‌ল্যুদভ বেশ কষ্ট করে তাদের বোঝাতে চাইল যে সে তাদের মধ্যে জমি বিলি করে দিতে চায়। চাষীরা চুপচাপ বসে রইল, তাদের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তনই হল না।

নেখ্‌ল্যুদভ লাজুক ভঙ্গীতে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি যে, জমিতে যে কাজ করে না জমির উপর তার কোন অধিকারও থাকতে পারে না। এবং জমিকে কাজে লাগাবার অধিকার সকলেরই আছে।'

'ঠিক, ঠিক কথা,' কয়েকজন বলে উঠল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলতে লাগল, জমি থেকে যা আয় হবে সেটা সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াই উচিত ; কাজেই তার প্রস্তাব, তারা নিজেরাই জমির খাজনার হার স্থির করুক এবং সেই খাজনার টাকায় একটা সমবায়-তহবিল গড়া হোক যেটা সকলেই ব্যবহার করতে পারবে। সম্মতি ও অসম্মতি দুই রকম কথাই শোনা গেল ; তবে চাষীদের গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হয়ে উঠল ; আর যে চোখগুলি এতক্ষণ ঐ ভদ্রলোকটির উপর নিবদ্ধ ছিল সে সব চোখ নেমে গেল ; দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ভদ্রলোকটির চালাকি ধরে ফেলেছে এবং তিনি যে তাদের আর ঠকাতে পারবেন না, এটা তাকে জানতে দিয়ে তারা তাকে লজ্জায় ফেলতে চাইছে না।

নেখ্‌ল্যুদভ বেশ খোলাখুলিই সব কথা বলেছে, আর চাষীরাও বুদ্ধিমান। তথাপি যে কারণে গোমস্তাটি তার কথা বুঝতে পারে নি, সেই কারণেই তারাও তার কথা বুঝতে পারে নি এবং বুঝতে চায় নি।

তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নিজের স্বার্থটা দেখা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় তারা জেনেছে, চাষীদের ক্ষতি করেই জমিদাররা তাদের স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে চলে। সুতরাং আজ যদি কোন জমিদার এসে নিজের থেকে তাদের ডেকে নতুন কিছু বলে, তবে তার একমাত্র অর্থ—আগের থেকে আরও চালাকির সঙ্গে তাদের পকেট কাটার ব্যবস্থা করা।

নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তাহলে জমির কি খাজনা তোমরা ধার্য করবে?'

ভীড়ের ভিতর থেকে কয়েকজন জবাব দিল, 'আমরা কি করে দর ঠিক

করব? আমরা সেটা করতে পারি না। জমি আপনার, তাই ক্ষমতাও আপনারই হাতে।'

'আহা, তা মোটেই নয়। সমবায়ের কাজে সে টাকা তো তোমরাই খাটাবে।'

'তা আমরা করতে পারি না। 'কম্যুন' এক জিনিস, আর এটা অন্য জিনিস।'

গোমস্তা হেসে বলল, (নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে সেও সভায় এসেছে) 'তোমরা বুঝতে পারছ না। টাকার বিনিময়ে প্রিন্স তোমাদের জমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন এবং সেই টাকাটাই 'কম্যুন'-এর তহবিল গড়বার জন্য তোমাদের ফেরৎ দিচ্ছেন।'

চোখ না তুলেই একটি দন্তহীন বৃদ্ধ বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমরা খুব ভালই বুঝতে পেরেছি। অনেকটা ব্যাংকের মত; একটা নির্দিষ্ট সময়ে টাকাটা ফেরৎ দিতে হবে। সে আমরা চাই না; যে ব্যবস্থা চলছে সেটা কষ্টকর, কিন্তু ওটা আমাদের একেবারেই শেষ করে ফেলবে।'

জনাকয়েক অসন্তুষ্ট রুক্ষ গলায় বলে উঠল, 'ওটা ভাল পথ নয়। আমরা সাবেক ব্যবস্থায়ই চলতে চাই।'

এর পরে নেখ্‌ল্যুদভ যখন বলল যে সে একটা চুক্তি-নামার খসড়া প্রস্তুত করবে আর সে নিজে ও অন্য সকলকেই তাতে সই করতে হবে, তখন আপত্তি আরও সপ্তমে চড়ল।

'সই আবার কেন? এতদিন যেমন করে এসেছি, আমরা সেই ভাবেই কাজ করব। এ সব দিয়ে কি হবে? আমরা বোকা-সোকা লোক।'

'আমরা এতে মত দিতে পারি না, কারণ ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই নতুন রকমের। যেমন চলছিল তেমনই চলুক। শুধু বীজের ব্যাপারটায় আমরা হাত গোটাতে চাই।'

এ কথার অর্থ হল, চলতি ব্যবস্থায় চাষীকেই বীজ দিতে হয়, কিন্তু চাষীরা চায় যে বীজটা জমিদারই দিক।

একটি মাঝ-বয়েসী খালি-পা চাষীকে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'তাহলে আমি কি এই বুঝব যে তোমরা জমি নিতে চাও না?' লোকটির চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল। গায়ে ছেঁড়া কোট, বাঁ হাতে জীর্ণ টুপিটাকে এমন ভঙ্গীতে ধরেছে যেমন সেনাপতির নির্দেশে সৈনিকরা সাধারণত করে থাকে।

লোকটি এক সময়ে সেনাদলে ছিল। সামরিক জীবনের মোহ তার এখনও কাটে নি। সে বলল, 'ঠিক তাই।'

'তার মানে যথেষ্ট জমি তোমাদের আছে?' নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল।

প্রাক্তণ সৈনিকটি জবাব দিল, 'না, স্যার, তা নেই।'

'আচ্ছা; তবু আমার কথাগুলি আর একবার ভেবে দেখো।'

বিস্মিত হলেও নেখ্‌ল্যুদভ তার প্রস্তাবটা পুনরায় রাখল।

বিষণ্ণ দন্তহীন বুড়োটি রেগে বলল, 'আমাদের ভাববার কিছু নেই; যা বলেছি, তাই হবে।'

'কাল পর্যন্ত আমি এখানে আছি। যদি তোমাদের মত পাল্টায়, লোক মারফৎ আমাকে জানিয়ে দিও।'

চাষীরা কোন জবাব দিল না।

সকলের সঙ্গে দেখা করে নেখ্‌ল্যুদভের কোন ফল হল না।

বাড়ি ফিরে গোমস্তাটি বলল, 'আমি বলছি প্রিন্স, ওদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আপনি যেতে পারবেন না; ওরা ভয়ানক একগুঁয়ে। ওরা সব সময় একটা কথাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে, কিছুতেই তা থেকে ওদের নড়ানো যায় না। এর কারণ সব কিছুকেই ওরা ভয় পায়। ওই তো, ওই চাষীদেরই কথা ধরুন না—ওই পাকা চুল আর কাঁচা চুল যেই হোক না—যারা একবাক্যে আপত্তি জানাল, ওরা কিন্তু খুব বুদ্ধিমান লোক। যখন ওদের একজন কেউ কাছারিতে আসে, বা এক সঙ্গে বসে চা খায়, তখন সে যেন জ্ঞান-মন্দিরের বাসিন্দা—তার মনটা একেবারে পাকা রাজনীতিকের—সব কিছু সে ঠিক ওজন করে বিচার করে। কিন্তু সভায় বসলে সে সম্পূর্ণ অন্য লোক,—একই কথা বার বার বলতে থাকে—'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আচ্ছা, ওদের মধ্যে কয়েকজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোককে এখানে ডাকা যায় না? সব ব্যাপারটা তাঁদের ভাল করে বুঝিয়ে বলতাম।'

'তা ডাকা যেতে পারে,' হাসিমুখ গোমস্তাটি বলল।

'তাহলে, দয়া করে তাদের কালই ডাক।'

'নিশ্চয় ডাকব', বলে গোমস্তাটি আরও খোসমেজাজে হাসতে লাগল। 'কালই তাদের ডেকে পাঠাব।'

ফিরে যেতে যেতে একজন চাষী বলে উঠল, 'সই করবে! বটে, সই কর আর তিনি তোমাকে জ্যান্ত গিলে খান।'

একটি বুড়ো বলল, 'ঠিক কথা।' তারপর তারা চুপচাপ। বড় রাস্তা থেকে শুধু ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে।

অধ্যায়—৮

নেখ্‌ল্যুদভ ফিরে গিয়ে দেখল, কাছারি-ঘরেই তার শোবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরে একটা উঁচু খাট পাতা হয়েছে; তাতে পালকের গদি ও ছুটো বড় বড় বালিশ। একটা গাঢ় লাল রেশমের চমৎকার লেপ দিয়ে বিছানাটা ঢাকা। এটা নিশ্চয় গোমস্তার স্ত্রীর বিয়ের যৌতুক। গোমস্তা নেখ্‌ল্যুদভকে

আবার খেতে অনুরোধ করলে নেখ্‌লুদভ আপত্তি জানাল। তখন খাকা-খাওয়ার অব্যবস্থার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে গোমস্তা নেখ্‌লুদভকে একা রেখে চলে গেল।

চাষীদের আপত্তিতে নেখ্‌লুদভের কোন রকম মন খারাপ হয় নি। উপরন্তু কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে তার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তারা তাকে ধন্যবাদও দিয়েছে। আর এখানে সে পেয়েছে শুধু সন্দেহ আর বিরূপতা, তবু তার মন খুশি ও আনন্দে ভরে উঠেছে।

অপরিচ্ছন্ন কাছারির কাছেই বাগান। নেখ্‌লুদভ উঠোনে নেমে বাগানের দিকেই যাচ্ছিল, এমন সময় সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল: দাসীদের ঘর, পাশের ফটক—মন খারাপ হয়ে গেল, পাপ স্মৃতিতে অপবিত্র করা সেই জায়গাটিতে যেতে তার মন চাইল না। দোরগোড়াতেই বসে পড়ল, বার্চ গাছের নতুন পাতার তীব্র গন্ধে আমোদিত উষ্ণ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। কলের শব্দ ও পাশের ঝোপ থেকে ভেসে-আসা নাইটিঙ্গেল ও অন্য কোন পাখির একঘেয়ে ডাক শুনতে শুনতে সামনের অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে সে অনেকক্ষণ বসে রইল। গোমস্তার জানালায় আলো নিভে গেল; পূব দিকে গোলাবাড়ির পিছন থেকে চাঁদের আলো ফুটে উঠল। আর সেই আলোয় ধ্বংসপ্রায় বাড়িটা এবং ফুলে ও আগাছায় ভর্তি বাগানটা ক্রমেই বেশী করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দূরে মেঘের ডাক শোনা গেল। আকাশের এক-তৃতীয়াংশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। নাইটিঙ্গেল ও অন্য সব পাখিরা চুপচাপ। কল থেকে আসা জলের শব্দকে ছাপিয়ে ভেসে এল হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক শব্দ; তারপরই গ্রামের ভিতর থেকে এবং গোমস্তার উঠোন থেকে প্রথম মোরগের ডাক শোনা গেল; ঝড়ের রাতে সাধারণত সে ডাকটা একটু আগেই শোনা যায়। একটা কথা আছে যে, প্রথম রাতে যদি মোরগ ডাকে তাহলে রাতটা ভাল কাটে। নেখ্‌লুদভের পক্ষে রাতটা তো ভালই কাটছে। সুখ ও আনন্দে ভরা একটি রাত। একটি নিষ্পাপ ছেলে হিসাবে যে বসন্তকালটা সে এখানে সুখে কাটিয়েছিল, কল্পনায় সেদিনটা নতুন হয়ে তার কাছে ফিরে এসেছে।

তার মনে পড়ল, কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে তার মনে প্রলোভন জেগেছিল; বাড়ি, জঙ্গল, খামার ও জমির জন্য তার মনে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। সে নিজেকে প্রশ্ন করল, সে ক্ষোভ কি এখনও আছে? এক সময় যে তার মনে ক্ষোভ জন্মেছিল তা ভেবেই সে আশ্চর্য বোধ করল। আজ সে যা কিছু দেখেছে সব মনে পড়তে লাগল: ছেলেমেয়ে সহ সেই স্ত্রীলোকটিকে মনে পড়ল যার স্বামী তার (নেখ্‌লুদভের) জঙ্গলের গাছ কেটেছিল বলে কারাগারে গেছে; ভয়ংকরী মাত্রিয়নাকে মনে পড়ল; সে তো মনে করে, তার মত অবস্থার মেয়েদের ভদ্রলোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার

মনে ভেসে উঠল কারাগার, কামানো মাথা, সেল, দুর্গন্ধ, শিকল, এবং তারই পাশাপাশি ধনীদের (তাকে নিয়ে) প্রাচুর্যে ভরা নাগরিক জীবন। সব কিছুই তার কাছে সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ততক্ষণে গোলাবাড়ির মাথার উপর প্রায় ভরা চাঁদ উঠেছে। উঠোনের উপর কালো কালো ছায়া পড়েছে, আর ভেঙে-পড়া বাড়ির লোহার ছাদের উপর চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে।

যেন এ রাত যাতে বৃথা না যায় সেই জন্যই নাইটিঙ্গেল পাখিরা আবার গান শুরু করে দিল।

কালো মেঘে সারা আকাশটা ছেয়ে গেছে; মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার আলোয় উঠোন ও ভাঙা ফটক সমেত পুরনো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে; মাথার উপর বজ্রের হুংকার উঠছে। পাখিরা সব চুপচাপ; শুধু পাতাগুলি খসখস শব্দ করছে, আর বাতাস এসে নেখ্‌ল্যুদভের চুল নিয়ে খেলা করছে। একটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল, আর একটা, তারপর গাছের পাতায় ও লোহার ছাদে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল, আর একটা বিদ্যুতের ঝলকানিতে বাতাস ভরে গেল। নেখ্‌ল্যুদভ তিন পর্যন্ত গুণবার আগেই মাথার উপরে একটা বাজ গর্জে উঠে সমস্ত আকাশকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল।

সে ঘরের ভিতরে চলে গেল।

সে ভাবতে লাগল, 'ঠিক, ঠিক। আমরা যা কিছু করি, সারা জীবনের সব কাজ, তার অর্থ, কোন কিছুই আমার কাছে বোধগম্য নয়। আমার পিসীদের কাজ কি ছিল? কাতয়ুশারই বা কি কাজ? আর আমার সেই উন্মাদনা? সেই যুদ্ধ কেন হল? পরবর্তীকালের আমার উচ্ছৃংখল জীবনেরই বা অর্থ কি? এ সব বুঝতে পারা, প্রভুর সর্বাত্মক ইচ্ছাকে বুঝতে পারা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু তাঁর যে ইচ্ছা আমার বিবেকের মধ্যে প্রতিফলিত তাকে পূর্ণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত—আর সেটা যে কি তা আমি ভালই জানি। সে কর্তব্য পালন করলেই আমি পাব নিশ্চিন্ত শান্তি।'

মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সে জল হু হু শব্দে ছাদ থেকে নীচের একটা টবের মধ্যে পড়ছে। তখনও মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। নেখ্‌ল্যুদভ ঘরে গিয়ে পোষাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। তার ভয় হল, দেয়ালের নোংরা ছেঁড়া কাগজের ভিতর নিশ্চয় ছারপোকা আছে।

নিজেকে প্রভু না মনে করে ভৃত্য মনে করতে হবে', এই চিন্তায় তার মন উল্লসিত হয়ে উঠল।

তার আশংকা অমূলক নয়। মোমবাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছারপোকাদের কামড় শুরু হল।

'সব কিছু ছেড়ে সাইবেরিয়ায় যাব—সেখানে তো পিসু-কীট, ছারপোকা, নোংরা সবই আছে। তাতে কি আসে যায়? যদি থাকেই, সব সহ্য করব।'

কিন্তু মনে যাই ভাবুক, কার্যক্ষেত্রে সে ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পারল না। জানালার নীচে বসে অপসৃয়মান মেঘের ফাঁকে চাঁদের আবির্ভাবের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায়—৯

নেখ্‌ল্যুদভের ঘুমুতে অনেক দেরী হল। ফলে তার ঘুম বেশ দেরীতেই ভাঙল।

দুপুরে গোমস্তার দ্বারা মনোনীত ও আমন্ত্রিত সাতজন চাষী ফল-বাগানে হাজির হল। সেখানেই মাটিতে খুঁটি পুঁতে তার উপর তক্তা পেতে গোমস্তা টেবিল ও বেঞ্চ বানিয়ে রেখেছিল। টুপি মাথায় রেখে সেখানে বসাতে চাষীদের অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হল। বিশেষ করে প্রাক্তণ সৈনিকটি তো কিছুতেই বসবে না। সে আজ বাকলের জুতো পরে এসেছে। শবযাত্রার সামরিক কানুন অনুসারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে টুপিটা ধরে আছে। মাইকেল্যাঞ্জেলোর আঁকা মোজেসের ছবির মত দেখতে দাড়িতে গিঁট দেওয়া এবং টাক মাথা ঘিরে কোঁকড়ানো পাকা চুলওয়ালা একটি চওড়া-কাঁধ সম্ভ্রান্ত চেহারার চাষী যখন তার বড় টুপিটা মাথায় দিয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে বেঞ্চিতে গিয়ে বসল, তখন অন্য সবাই তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে নেখ্‌ল্যুদভ তাদের উল্টো দিকে বসল এবং টেবিলের উপর রাখা তার প্রকল্পের খসড়া কাগজখানার উপর ঝুঁকে পড়ে কথা বলতে শুরু করল।

প্রথমেই সে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করল।

'আমার মতে জমির কেনা-বেচা চলতে পারে না। কারণ তা যদি চলত তাহলে যে লোকের যথেষ্ট টাকা আছে সে সব জমি কিনে নিয়ে যাদের কিছু জমিও নেই তাদের কাছ থেকে যা খুশি তাই আদায় করতে পারত।' স্পেন্সারের যুক্তিটা ব্যবহার করে সে আরও বলল, 'শেষ পর্যন্ত জমির উপর পা রাখবার জন্যও টাকা দাবী করতে পারত।'

সাদা দাড়ি ও চকচকে চোখওয়ালা বুড়োটি বলে উঠল, 'ওড়া বন্ধ করার একমাত্র ওষুধ—পাখাটা কেটে দাও।'

ভরাট গলায় দীর্ঘনাসা লোকটি বলল, 'ঠিক কথা।'

সাদা দাড়িওয়ালা খোঁড়া লোকটি বলল, 'একটা মেয়েছেলে তার গরুটার জন্য একটু ঘাস নিল; দাও তাকে ধরে কারাগারে পাঠিয়ে।'

'আমাদের নিজেদের জমি পাঁচ 'ভার্স্ট' (প্রায় ৩/৪ মাইল) দূরে, আর নতুন জমি খাজনায় নেওয়াও অসম্ভব; দর এত চড়া যে মজুরি পোষাবে না। তারা আমাদের দড়ির মত পাকাচ্ছে; আমরা ক্রীতদাসেরও অধম।' দন্তহীন

লোকটি বলল।

'আমি তোমাদের সঙ্গে একমত; জমি রাখাকে আমিও পাপ বলে মনে করি। তাই আমি জমি দিয়ে দিতে চাইছি', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

মাইকেল্যাঞ্জেলোর মোজেসের মত দেখতে বুড়ো লোকটি ভাবল, নেখ্‌ল্যুদভ খাজনায় জমি-বিলির কথাই বলছে। তাই সে বলল, 'বেশ তো, সে তো ভাল কথা।'

'আমি এখানে এসেছি কারণ আমি আর কোন জমিই দখলে রাখতে চাই না। এখন আমাদের ভাবতে হবে, কি ভাবে জমি ভাগ করতে হবে।'

বিরক্ত দন্তহীন বুড়োটি বলল, 'চাষীদের সব দিয়ে দিন, তাহলেই তো হল।'

নেখ্‌ল্যুদভ মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। তার মনে হল, এ কথাগুলির ভিতর দিয়ে তার সততার প্রতি সন্দেহই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে ফিরে পেল এবং মনের কথা সজোরে প্রকাশ করে বলল, 'আমি তো তাদের দিতেই চাই। কিন্তু কাকে দেব? কেমন করে দেব? দয়মিনৃস্কয়ের কম্যুনকে না দিয়ে তোমাদের কম্যুনকেই বা দেব কেন?' (দয়মিনৃস্কয়ে পার্শ্ববর্তী একটা গ্রামের নাম; সেখানকার অধিবাসীদের কোন জমি নেই বললেই হয়।)

সকলেই চুপচাপ। প্রাক্তণ সৈনিকটি শুধু বলল, 'ঠিক কথা।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলতে লাগল, 'তারপর ধরো, জার যদি বলেন যে জমিদারদের কাছ থেকে সব জমি কেড়ে নিয়ে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে…'

'এ রকম কোন গুজব রটেছে নাকি?' বুড়ো লোকটি প্রশ্ন করল।

'না; জারের কাছ থেকে এ রকম কোন নির্দেশ আসে নি। আমি কথার কথাই বলছি। জার যদি আদেশ জারি করেন যে সব জমি জমিদারদের কাছ থেকে নিয়ে চাষীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে, তাহলে তোমরা কি ভাবে ভাগ করবে?'

একজন উনুন-তৈরিকারক ভুরু নাচাতে নাচাতে বলে উঠল, 'কি ভাবে? সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেব, প্রতিটি মানুষ, চাষী, জমিদার সমানভাবে এতটা করে জমি পাবে।'

পায়ে ডোরা-কাটা পট্টি লাগানো ভাল মানুষ খোড়া লোকটি বলল, 'আবার কি? প্রত্যেকের জন্য এতটা করে জমি।'

ব্যবস্থাটাকে সন্তোষজনক বিবেচনা করে সকলেই তাতে সায় দিল।

'জনপ্রতি এতটা জমি, এই তো? তাহলে বাড়ির চাকররাও একটা অংশ পাবে তো?' নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল।

প্রাক্তণ সৈনিকটি সাহস দেখিয়ে বলে উঠল, 'না স্যার।'

কিন্তু লম্বা বিবেচক লোকটি তার সঙ্গে একমত হল না।

সে বলল, 'ভাগ যদি করতেই হয়, সকলেই সমান অংশ পাবে।'

এর জবাব নেখ্‌ল্যুদভের তৈরি করাই ছিল। সে বলল, 'সেটা করা যাবে

না। সকলেই যদি সমান অংশ পায়, তাহলে যারা নিজেরা জমিতে কাজ করে না, জমি চাষ করে না—মনিব ও ভৃত্য, রাঁধুনি, পদস্থ কর্মচারি, করণিক, শহরের লোকেরা—তারা তো ধনীদের কাছে তাদের অংশ বিক্রি করে দেবে। জমি আবার ধনীদের হাতে গিয়ে উঠবে। যারা জমিতে কাজ করে খায় তাদের সংখ্যা বাড়বে, আর জমি আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। তাহলে জমি যারা চায় তারা আবার ধনীদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে।'

প্রাক্তণ সৈনিকটি বলে উঠল, 'ঠিক তাই।'

উনুন তৈরিকারক রেগে বাধা দিল, 'জমি বিক্রি বন্ধ করে দিন; যাতে যে জমি চাষ করবে সেই শুধু জমি পায়।'

নেখ্‌ল্যুদভ জবাবে বলল, কে নিজের জন্য চাষ করছে আর কে পরের জন্য চাষ করছে সেটা জানা অসম্ভব।

লম্বা বিবেচক লোকটি প্রস্তাব করল, এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক যাতে সকলকেই এক সঙ্গে চাষের কাজ করতে হবে এবং যারা চাষ করবে তারা ফসলের ভাগ পাবে, যারা করবে না তারা কিছুই পাবে না।

এই সাম্যবাদী প্রকল্পের জবাবও নেখ্‌ল্যুদভের হাতে তৈরিই ছিল। সে বলল, এ রকম ব্যবস্থা করতে হলে প্রত্যেকের লাঙল থাকতে হবে ও সমান সংখ্যক ঘোড়া থাকতে হবে, যাতে কাউকে বসে যেতে না হয়; তাছাড়া লাঙল, ঘোড়া, ঝাড়াই-যন্ত্র এবং অন্য সব যন্ত্রপাতি সকলের সম্পত্তি হওয়া চাই, আর তা করতে হলে সকলের তাতে সম্মতি থাকা চাই।

বিরক্ত বুড়োটি বলে উঠল, 'আমাদের লোকজনরা সারা জীবনেও এ বিষয়ে একমত হতে পারবে না।'

আর একজন বলল, 'আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাবে। মেয়েরা এ-ওর চোখ উপড়ে নেবে।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'তাছাড়া জমির ভাল-মন্দের কি হবে? একজন ভাল জমি পাবে, আর একজন শুধু কাদা আর বালি পাবে কেন?'

উনুন-তৈরিকারক বলল, 'সব জমিই ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে প্রত্যেককে এক ভাগ করে দিয়ে দিলেই হবে।'

তার জবাবে নেখ্‌ল্যুদভ জানাল, শুধু একটা কম্যুনের জমি ভাগের প্রশ্ন তো নয়, আমাদের ভাবতে হবে বিভিন্ন জেলার সব জমি-বণ্টনের কথা। চাষীদের যদি বিনামূল্যেই জমি দেওয়া হয়, তাহলে কেউ ভাল জমি আর কেউ মন্দ জমি পাবে কেন? সকলেই তো ভাল জমি চাইবে।'

প্রাক্তণ সৈনিকটি বলল, 'ঠিক কথা।'

অন্য সকলেই চুপচাপ।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'কাজেই ব্যাপারটাকে যত সহজ মনে হয় আসলে তা নয়। শুধু আমরা নই, আরও অনেকেই এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। একজন

আমেরিকান ভদ্রলোক আছেন তার নাম হেনরি জর্জ; তিনি এই ভাবেই ব্যাপারটাকে দেখেছেন, আর তার সঙ্গে আমি একমত......'

বিরক্ত বুড়োটি বলে উঠল, 'আপনি মনিব, আপনি যেমন ইচ্ছা করতে পারেন। আপনাকে কে ঠেকাচ্ছে? ক্ষমতা আপনার হাতে।'

নেখ্‌ল্যুদভ বিচলিত হল; তবে এই দেখে সে খুশি হল যে লোকটির কথা বলায় শুধু যে সেই অসন্তুষ্ট হয়েছে তা নয়।

বিবেচক লোকটিও গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি একটু থামো তো সেম্য়ন খুড়ো; ওকে কথা বলতে দাও।'

এ-কথায় উৎসাহিত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ হেনরি জর্জের একক-করনীতির ব্যাখ্যা শুরু করল।

'পৃথিবীটা মানুষের নয়; এটা ঈশ্বরের', এই বলে সে শুরু করল।

কয়েকজন সমস্বরে বলল, 'ঠিক তাই, ঠিক তাই।'

'জমি সকলের। সকলেরই তাতে সমান অধিকার। কিন্তু জমির ভাল-মন্দ আছে। আর সকলেই ভাল জমিটা পেতে চাইবে। ঠিক ঠিক ভাগ কি ভাবে করা যায়? এই ভাবে: যে ভাল জমি পেয়েছে সে অন্যকে তার দাম ধরে দেবে।' এই ভাবে নেখ্‌ল্যুদভ তার নিজের প্রশ্নেরই জবাব দিতে লাগল। 'যেহেতু কে কাকে দামটা দেবে সেটা বলা খুব শক্ত, এবং যেহেতু কম্যুনেরও টাকার প্রয়োজন, সেই জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার যে, ভাল জমি যে ব্যবহার করবে সে তার দামটা কম্যুনের প্রয়োজনে দিয়ে দেবে। তাহলে সকলেই সমানভাবে তার ভাগ পাবে। তুমি যদি জমি চাও, দাম দাও—ভাল জমি হলে বেশী দাম, মন্দ জমি হলে অল্প দাম। যদি তুমি জমি না চাও, টাকা দিও না; সে ক্ষেত্রে যারা জমি ব্যবহার করবে তারাই তোমার হয়ে কর ও কম্যুনের অন্য ব্যয়ভার বহন করবে।'

ভুরু নাচাতে নাচাতে উনুন-তৈরিকারক বলল, 'ঠিক কথা। যে ভাল জমি নেবে সে বেশী দাম দেবে।'

দাড়িতে গিঁট-দেওয়া গ্রাম-বৃদ্ধ বলল, 'দেখছি, জর্জ লোকটার মাথা আছে!'

প্রকল্পের অর্থ বুঝতে পেরে লম্বা লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, 'অবশ্য টাকাটা যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয়।'

নেখ্‌ল্যুদভ জবাবে বলল, 'টাকাটা খুব বেশী হওয়াও উচিত নয়, খুব অল্প হওয়াও উচিত নয়। খুব বেশী হলে সেটা আদায় হবে না, ফলে লোকসান হবে; খুব অল্প হলে জমির বেচা-কেনা শুরু হয়ে যাবে। জমির ব্যবসা চালু হয়ে যাবে। দেখ, তোমাদের জন্য এই ব্যবস্থাই আমি করতে চাই।'

চাষীরা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'এটাই ন্যায়, এটাই ঠিক; হ্যাঁ, এতেই হবে।'

কোঁকড়া-চুল চওড়া-কাঁধ বুড়োটি বলল, 'এই জর্জ লোকটির মাথা ছিল। দেখ না, কী একখানা বানিয়েছে।'

সদাহাস্যময় গোমস্তাটি বলল, 'আচ্ছা, ধরুন আমি কিছু জমি নিতে চাই, তখন?'

'যদি দেবার মত জমি তখন থাকে, তাহলে নেবে, চাষ করবে,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

যা হোক, এই ভাবে সভা শেষ হয়ে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ পুনরায় তার প্রস্তাবটা রেখে জানাল, এখনই জবাব দেবার দরকার নেই, কম্যুনের অন্য লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে তারা যেন ফলাফল তাকে জানায়।

আলোচনা করে জবাব দেবে বলে চাষীরা খুবই উত্তেজিতভাবে সেখান থেকে চলে গেল। পথে যেতে যেতে তাদের জোরালো কথাবার্তা কানে আসছিল, আর অনেক রাতে তাদের কণ্ঠস্বর গ্রামের নদীর স্রোতে ভেসে আসছিল।

চাষীরা পরদিন কাজে গেল না; জমিদারের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে কাটাল। কম্যুন দুই দলে ভাগ হয়ে গেল—একদল রায় দিল, প্রস্তাবটা লোভজনক এবং গ্রহণ করায় কোন বিপদ নেই, আর দ্বিতীয় দল প্রস্তাবটা না বুঝেই ভয়ে নানা রকম সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। যা হোক, তৃতীয় দিনে সকলে একমত হল এবং নেখ্‌ল্যুদভের কাছে লোক পাঠিয়ে প্রস্তাব গ্রহণের কথা জানিয়ে দিল।

'মনিব' সকলকে টাকা-পয়সা দান করছে এ কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় দলে দলে লোক, বিশেষ করে মেয়েরা, তার কাছে ভিড় করতে লাগল। কি করে দিতে হবে, কত দিতে হবে, কাকে দিতে হবে—এ সব কিছুই নেখ্‌ল্যুদভ জানে না। তার শুধু একটি কথাই মনে হল, তার যখন অনেক টাকা আছে তখন এই সব গরীব মানুষদের টাকা দিতে অস্বীকার করা অসম্ভব; আবার যে এসে চাইবে তাকেই যখন-তখন টাকা দেওয়াও সঙ্গত নয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের একটিমাত্র পথই তার চোখে পড়ল—সেটা হল এখান থেকে চলে যাওয়া, আর তাই সে করল।

পানোভো থেকে যাবার শেষ দিনটিতে নেখ্‌ল্যুদভ পিসীদের বাড়ির জিনিসপত্রগুলি ঘুরে ঘুরে দেখল। মেহগেনি কাঠের পোষাকের আলমারির নীচের দেরাজটার গায়ে আংটা-পরানো একটা পিতলের সিংহের মাথা লাগানো ছিল। তার মধ্যে সে কিছু চিঠিপত্র পেল, আর পেল একখানা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ, তাতে রয়েছে দুই পিসী সোফিয়া আইভানভ্‌না ও মারিয়া আইভানভ্‌না, ছাত্রবেশে সে নিজে, আর পবিত্র, প্রিয়দর্শিনী, আনন্দময়ী কাতয়ুশা। চিঠিগুলি ও ফটোগ্রাফখানা সে নিল। বাকি সব কিছু সে

কলওয়ালাকে দিয়ে গেল। সদাহাস্যময় গোমস্তার পরামর্শে সব কিছু সমেত বাড়িটাকে সে কলওয়ালার কাছেই বিক্রি করে দিয়েছে প্রকৃত দামের দশ ভাগের এক ভাগ দামে। গাড়ি বোঝাই করে সব জিনিস সেই নিয়ে যাবে।

কুজমিন্স্কোয়ে-তে সম্পত্তি হারিয়ে সে কেন অনুতপ্ত হয়েছিল সে কথা মনে পড়ায় নেখ্‌ল্যুদভ বিস্ময় বোধ করতে লাগল। আজ কিন্তু মুক্তির অবিরাম আনন্দ ছাড়া তার মনে আর কোন অনুভূতি নেই; কোন পথিক যখন নতুন দেশ আবিষ্কার করে তখন তার মনে নতুনত্বের যে স্বাদ জাগে সেই স্বাদ তার মনকেও জুড়ে রইল।

অধ্যায়—১০

ফিরে এসে নেখ্‌ল্যুদভ শহরটাকে যেন নতুন চোখে দেখল। সন্ধ্যায় সে যখন পৌঁছল তখন আলো জ্বলেছে। গাড়ি চেপে স্টেশন থেকে বাড়ি পৌঁছে দেখল, তখনও ঘরময় ন্যাপথালিনের গন্ধ; যে সব জিনিসপত্র শুধু ঝুলিয়ে রাখা, বাতাসে দেওয়া এবং বাক্সবন্দী করে রাখার জন্যই সংগ্রহ করা হয়েছিল বলে মনে হয়, তা নিয়ে আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না ও কর্নেই দুজনই ক্লান্ত ও বিরক্ত; এমন কি তা নিয়ে দুজনের মধ্যে ঝগড়াও হয়ে গেছে। নেখ্‌ল্যুদভের ঘরটা খালি, কিন্তু গোছানো নয়, ঘরে ঢুকবার পথটা পর্যন্ত ট্রাংক দিয়ে ঠাসা। বোঝাই যাচ্ছে, তার আসার জন্যই কাজটা মাঝপথে থেমে গেছে। চাষীদের জীবনের যে দুঃখ সে দেখে এসেছে তাতে এই সব কাজের বোকামি তার কাছে এতই স্পষ্ট হয়ে তার চোখে পড়ল যে, নেখ্‌ল্যুদভ পরদিনই কোন বোর্ডিং-এ চলে যাওয়া স্থির করল। এদিকে আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না তার বুদ্ধিমত জিনিসপত্রের যে ব্যবস্থা হয় করুক, পরে তার দিদি এসে বাড়ির চূড়ান্ত বিলি-বন্দোবস্ত করবে।

খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ কারাগারের কাছাকাছি একটা মোটামুটি ধরনের লজিং-হাউসের দুটো ঘর পছন্দ করল, এবং তার কিছু কিছু জিনিসপত্র সেখানে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। ঝড়-বৃষ্টির পরেই ঠাণ্ডাটা পড়েছে, বসন্তকালে যেমন সাধারণত হয়ে থাকে। বাইরে এত ঠাণ্ডা আর বাতাস এত তীব্র যে হাল্‌কা ওভারকোট পরেও তার বেশ শীত করছিল। তাই গরম হবার আশায় সে জোরে হাঁটতে লাগল।

একটা রাস্তায় লোহা-বোঝাই এক সার গাড়ি তার সামনে পড়ে গেল। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় সেই লোহার এমন কর্কশ শব্দ হতে লাগল যে তার কান ও মাথা ধরার মত অবস্থা। গাড়িগুলোকে পার হয়ে যাবার জন্য সে

আরও জোরে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সেই ঝন্-ঝন্ শব্দকে ছাপিয়ে কে যেন তার নাম ধরে ডাক দিল। সে দাঁড়াল। দেখতে পেল, একখানি বড় ইজভজচিকে বসে একজন অফিসার বন্ধুর মত হাত নাড়ছে। তার চকচকে মুখে মোমে-মাজা সুঁচলো গোঁফ; হাসতে গিয়ে দুপাটি অস্বাভাবিক সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

'নেখ্‌লয়ুদভ, তুমি ?'

নেখ্‌লয়ুদভ বেশ খুশি বোধ করল।

সানন্দে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে, শেনবক !' কিন্তু পর মুহূর্তেই সে বুঝতে পারল, খুশি হবার কোন কারণ নেই।

অনেক দিন আগে নেখ্‌লয়ুদভের পিসীদের বাড়িতে যে গিয়েছিল এ সেই শেনবক। নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি, কিন্তু সে শুনেছে, অনেক ধার-দেনা সত্ত্বেও সে এখনও অশ্বারোহী বাহিনীতেই আছে, এবং যে করেই হোক বেশ ধনীদের দলেই চলাফেরা করছে। তার প্রফুল্ল সুখী চেহারা সেই সংবাদকেই সমর্থন করছে।

গাড়ি থেকে নেমে গলা বাড়িয়ে সে বলল, 'কী ভাগ্যি, তোমার দেখা পেলাম। শহরে তো জানাশোনা কেউ নেই। আরে ভাই, তুমি তো বেশ বুড়িয়ে গেছ। শুধু তোমার হাঁটার চলন দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। দেখ, আজ এক সঙ্গে খাব। বেশ ভাল খাওয়ার এমন কোন জায়গা জানা আছে কি ?'

সঙ্গীকে কোন রকম আঘাত না দিয়েও কি করে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় সে কথা ভেবেই নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'আমার তো সময় হবে না। তা, তুমি এখানে কেন ?'

'কাজ রে ভাই, কাজ। অভিভাবকের কাজ। আমি এখন একজন অভিভাবক। কোটিপতি সামানভ্‌দের নাম শুনেছ তো, আমিই তাদের সব কিছু দেখাশুনা করি। তার মাথার ঘিলু নরম হলে কি হবে, চুয়ান্ন হাজার 'দেসতিন' জমির সে মালিক', এমন গর্বভরে সে কথা বলল যেন এসব জমি সেই সংগ্রহ করেছে। 'তার জমিদারির হাল খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। সব জমি চাষীদের খাজনা-বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, আর তারা এক পয়সাও দিত না, ফলে আশি হাজার রুবলেরও বেশী দেনা হয়েছিল। এক বছরে আমি চেহারা পাল্টে দিয়েছি: জমিদারীর আয় শতকরা সত্তর ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি কি মনে কর ?' বেশ গর্বভরেই সে প্রশ্ন করল।

নেখ্‌লয়ুদভের মনে পড়ল, এ সবই সে শুনেছে। নিজের সব কিছু খুইয়ে ঋণের পর ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে যে কোন ফিকিরেই হোক শেনবক এমন একটি ধনী বৃদ্ধের অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছে যার বিষয়-সম্পত্তি তচনচ হয়ে যাচ্ছিল; এখন সেই অভিভাবকত্বই শেনবকের জীবিকা।

লোকটির মোমে-মাজা গোঁফ ও চকচকে ফোলা-ফোলা মুখের দিকে তাকিয়ে, তার বন্ধুর মত সরস আলাপ ও ভাল খাবারের সন্ধান এবং অভিভাবক হিসাবে তার কাজকর্মের সগর্ব বর্ণনা শুনে নেখ্‌লয়ুদভ ভাবল, 'ওকে আঘাত না দিয়েও কেমন করে ওর হাত থেকে উদ্ধার পাই ?'

'তাহলে কোথায় খাওয়া যায় বল ?'

ঘড়ি দেখে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'সত্যি বলছি, আমার সময় নেই।'

'ঠিক আছে। আচ্ছা, আজ রাতে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেতে পারবে ?'

'না, তাও পারব না।'

'আরে, একবার এস না। আমার তো এখন নিজের ঘোড়া নেই, আমি গ্রীশার ঘোড়ার উপরে বাজী রাখি। মনে আছে তো, তার একটা চমৎকার ঘোড়া আছে। তাহলে তুমি আসছ ? রাতে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।'

নেখ্‌লয়ুদভ হেসে বলল, 'না ভাই, তোমার সঙ্গে খেতে যেতেও পারব না।'

'দেখ, এটা কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে! এখন চলেছ কোথায় ? তোমাকে পৌঁছে দেব কি ?'

'একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, কাছেই—মোড়টা ঘুরলেই।'

'ঠিক আছে। তুমি কারাগার নিয়ে মেতে উঠেছ—কয়েদীদের হয়ে লড়ছ, এ রকমটা শুনেছি,' শেনবক হাসতে হাসতে বলল। 'করচাগিনরা আমাকে বলেছে। তারাও তো শহর ছেড়ে চলে গেছে। ব্যাপার কি বল তো ?'

নেখ্‌লয়ুদভ জবাব দিল, 'ঠিকই শুনেছ। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো এসব কথা হয় না।'

'তা বটে, তা বটে ; তোমার মাথার স্ক্রু সব সময়েই একটু ঢিলে। যাক গে, তা ঘোড়দৌড়ে আসছ তো ?'

'না, যেতে পারব না ; আসলে আমার যাবার ইচ্ছাই নেই। দয়া করে আমার উপর রাগ করো না।'

'রাগ ? আরে, না না। আচ্ছা, তাহলে চলি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম।' নেখ্‌লয়ুদভের হাতখানাকে সাদরে চাপ দিয়ে সে লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল এবং চকচকে মুখের সামনে সাদা দস্তানা পরা হাতটা নাড়তে লাগল, মুখের স্বভাবসিদ্ধ হাসির ফলে অস্বাভাবিক সাদা দাঁত-গুলো বেড়িয়ে পড়ল।

অ্যাডভোকেটের বাড়ির দিকে যেতে যেতে নেখ্‌লয়ুদভ ভাবতে লাগল, 'আমিও কি ঐ রকমই হতাম ? হ্যাঁ, ঠিক ও রকম আমি নই, তবু ওই রকমই হতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ ভাবেই জীবন যাপন করব।'

অধ্যায়—১১

নেখ্‌ল্যুদভের সময় হবার আগেই অ্যাডভোকেট তাকে ডেকে পাঠাল এবং মেনশভদের মামলা নিয়ে কথা শুরু করে দিল।

সে বলল, 'মামলাটা অত্যন্ত আপত্তিকর। বাড়িটার দরুণ বীমার টাকাটা পাবার জন্য মালিক নিজেই বাড়িতে আগুন দিয়েছে, এটা তো হতেই পারে। কিন্তু আসল কথা হল, মেনশভদের অপরাধ একেবারেই প্রমাণ হয় নি। ম্যাজিস্ট্রেটের উদাসীনতা এবং সরকারী উকিলের অতিরিক্ত উৎসাহই এর কারণ। প্রাদেশিক আদালতে না হয়ে যদি এখানে তাদের বিচার হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় করে বলছি তারা খালাস পাবে, আর আমি একটি পয়সাও নেব না।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমার কাছে একটা চিঠি এসেছে। তারা যা লিখেছে তা যদি সত্য হয় তাহলে কেসটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আজ আমি নিজে তাদের সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানতে চেষ্টা করব।'

অ্যাডভোকেট হেসে বলল, 'আপনি দেখছি একটা ফানেল হয়ে উঠেছেন, আর তার ভিতর দিয়ে কারাগারের যত অভিযোগ সব ঢালা হচ্ছে। কিন্তু বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে; এতটা সামলাতে পারবেন না।'

'তা পারব না। কিন্তু ঘটনাটি খুবই উল্লেখযোগ্য', বলে নেখ্‌ল্যুদভ নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল: বাইবেল পাঠ করবার জন্য কিছু চাষী তাদের গ্রামে সমবেত হয় এবং কর্তৃপক্ষ এসে তাদের হটিয়ে দেয়। পরবর্তী রবিবারে তারা আবার একত্র হয় এবং একজন পুলিশের লোক এসে তাদের গ্রেপ্তার করে ও আদালতে হাজির করে। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের জেরা করে, সরকারী উকিল চার্জশিট দেয় এবং বিচারকরা তাদের দায়রায় সোপর্দ করে। সরকারী উকিল তাদের অপরাধের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকখানি বাইবেল দাখিল করে এবং তাদের নির্বাসনদণ্ড হয়। 'কী সাংঘাতিক কথা! এও কি সত্যি হতে পারে?'

'আপনি কিসে অবাক হচ্ছেন?'

'কেন, সব কিছুতে। পুলিশ-অফিসারকে আমি বুঝতে পারি, কারণ তার কাজ হুকুম তামিল করা। কিন্তু সরকারী উকিল এ ধরনের একটা মামলা খাড়া করতে পারলেন? একজন শিক্ষিত লোক হয়ে—'

'এখানেই ভুল করেন। সরকারী উকিল ও বিচারকদের আমরা উদারদৃষ্টি-সম্পন্ন লোক বলেই ভাবতে অভ্যস্ত। এক সময়ে তারা তাই ছিলেন, কিন্তু এখন দিনকাল পাল্টে গেছে। তারা এখন শুধুই কর্মচারি, তাদের একমাত্র লক্ষ্য মাইনের দিনটি। তারা মাইনে পান, আরও বেশী মাইনে চান, বাস, সেখানেই ন্যায়-নীতির ইতি। আপনি যাকে চান তারা তাকেই অভিযুক্ত

করবে, তার বিচার করবে, তাকে শাস্তি দেবে।'

'ঠিক; কিন্তু অপরের সঙ্গে একত্র হয়ে বাইবেল পড়লেই একটা লোককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনদণ্ড দেবার কোন আইন তো সত্যি নেই।'

'আছে, নির্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা আছে, শুধু যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে, বাইবেল পাঠ করতে গিয়ে সে নির্দেশ-বহির্ভূতভাবে অন্যের কাছে বাইবেলের অপব্যাখ্যা করেছে এবং গীর্জা-কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে নিন্দা করেছে। প্রকাশ্যে গ্রীক গোড়া ধর্মমতের নিন্দা করার অর্থই হল ১৯৬ ধারা মতে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন।'

'অসম্ভব!'

'আমি বলছি, ঠিক তাই। এই সব বিচারক ভদ্রলোকদের আমি তো সব সময়ই বলি, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই; কারণ আমি, আপনি ও অন্য সবাই যে কারাগারে যাই নি সেটা তো তাদের অনুগ্রহে। সব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সাইবেরিয়ার অপেক্ষাকৃত সল্প দূরবর্তী অঞ্চলে আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া তো তাদের কাছে খুব সোজা ব্যাপার।'

'দেখুন, তাই যদি হয়, সব কিছু যদি ন্যায়াধীশ ও অন্যদের উপরেই নির্ভর করে, তারা যদি ইচ্ছামত আইন প্রয়োগ করতে বা না করতে পারেন, তাহলে এই সব বিচার-ব্যবস্থার দরকার কি?'

অ্যাডভোকেট প্রাণ খুলে হেসে উঠল। 'আপনি অদ্ভুত সব প্রশ্ন করেন! প্রিয় মহাশয়, এ সব তো দর্শনের কথা। তা, সে বিষয়েও কথা হতে পারে। আপনি কি শনিবারে আসতে পারবেন? আমার বাড়িতে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একটা বৈঠক বসবে; সেখানে এই সব অমূর্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' কথাগুলি বলবার সময় অ্যাডভোকেট 'বিমূর্ত বিষয়' শব্দ দুটির উপর ব্যঙ্গাত্মক ভাবে জোর দিল। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কি? তাহলে চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ, চেষ্টা করব', নেখ্‌লয়ুদভ বলল। সে জানে সে মিথ্যা বলছে। এই মুহূর্তে সে যদি কোন কিছু কেরতে সচেষ্ট হয়, তাহলে সেটা হবে অ্যাডভোকেটের সেই সান্ধ্য বৈঠক এবং তার বিজ্ঞানী, শিল্পী ও সাহিত্যিক-চক্র থেকে দূরে থাকা।

নেখ্‌লয়ুদভ যখন বলল যে বিচারকরা যদি তাদের ইচ্ছামতই আইন প্রয়োগ করতে বা না করতে পারে তাহলে তো বিচারের কোন অর্থই হয় না, তখন অ্যাডভোকেট যে ভাবে হেসে উঠল এবং যে সুরে সে 'দর্শন' ও 'অমূর্ত বিষয়' কথাগুলি উচ্চারণ করল, তাতেই নেখ্‌লয়ুদভ পরিষ্কার বুঝতে পারল, সে এবং অ্যাডভোকেট, সম্ভবত তার বন্ধুরাও, কতখানি ভিন্ন দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখে; সে আরও বুঝল, তার এবং তার প্রাক্তণ বন্ধু শেনবক প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য যত বেশীই হোক, তার এবং অ্যাডভোকেট ও তার বন্ধুমহলের পার্থক্য আরও

অনেক বেশী।

অধ্যায়—১২

কারাগার অনেকটা পথ। দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে নেখ্‌ল্যুদভ একটা ইজভজচিক ভাড়া করল। ইজভজচিক লোকটি মাঝ-বয়সী, বুদ্ধিমান, দয়ালু। একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে একটা নির্মীয়মান প্রকাণ্ড বাড়ি তাকে দেখাল।

'দেখুন, কী প্রকাণ্ড একটা বাড়ি তুলছে,' এমন ভাবে কথাটা বলল যেন সে নিজেও ঐ বাড়ি তৈরির সঙ্গে জড়িত এবং সেজন্য গর্বিত।

বাড়িটা সত্যি প্রকাণ্ড; গঠনভঙ্গী জটিল ও মৌলিক। লোহা দিয়ে বাঁধা বিরাট সব পাইনের খুঁটি দিয়ে বাড়িটার চারদিকে ভারা বাঁধা হয়েছে। একটা সাইনবোর্ড দিয়ে বাড়িটাকে রাস্তা থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। ভারার তক্তার উপরে সারা গায়ে মশলা-মাখা মজুররা পিঁপড়ের মত এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে। কেউ ইট বসাচ্ছে, কেউ ইট কাটছে, কেউ বা ভারী ভারী হাতলওয়ালা পাত্র ও বালতি তুলছে আর সেগুলিকে খালি করে নামাচ্ছে।

একজন স্থূলকায় সুবেশ ভদ্রলোক—সম্ভবত স্থপতি—ভারার পাশে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে দেখিয়ে কণ্ট্রাক্টরকে কি যেন বোঝাচ্ছে। কণ্ট্রাক্টরটি ভ্লাদিমির জেলার একটি চাষী। সে সসম্ভ্রমে সব কিছু শুনছে। সব মাল-বোঝাই গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকছে এবং খালি হয়ে বেরিয়ে স্থপতি ও কণ্ট্রাক্টরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবতে লাগল, 'যারা এখানে কাজ করছে আর যারা কাজ করাচ্ছে সকলেই কত নিশ্চিন্ত। বাড়িতে তাদের স্ত্রীরা সাধ্যের অতীত পরিশ্রম করছে, তালি-মারা টুপি-পরা সন্তানরা অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, কচি মুখে বুড়োদের মত হাসতে হাসতে তাদের ছোট ছোট ঠ্যাংগুলি বেঁকে যাচ্ছে, আর এখানে তারা এই অর্থহীন অদরকারী প্রাসাদ তৈরি করে চলেছে এমন কোন অর্থহীন অদরকারী লোকের জন্য যে তাদেরই একজন যারা তাদের সর্বস্ব হরণ করেছে, তাদের ধ্বংস করেছে।'

চিন্তাকে ভাষা দিয়ে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, একটা অর্থহীন বাড়ি।'

অসন্তুষ্ট গলায় ইজভজচিক* বলল, 'অর্থহীন কেন? বাড়িটা উঠছে তাই লোকে কাজ পাচ্ছে; এটা অর্থহীন নয়।'

'কিন্তু কাজটা তো অদরকারী।'

'অদরকারী হতে পারে না; তাহলে কাজটা করা হবে কেন? এর দ্বারা

* গাড়ি ও চালক উভয়কেই ইজভজচিক বলা হয়।

লোকের রুজি-রোজগার হচ্ছে।'

নেখ্‌লয়ুদভ চুপ করল, কারণ চাকার শব্দকে ছাপিয়ে কথা বলা শক্ত।

কারাগারের কাছে পৌঁছে ইজভজচিক যখন পাথরের রাস্তা থেকে বাঁধানো রাস্তায় পড়ল, তখন কথা বলা সহজসাধ্য হওয়ায় সে আবার নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ঘাড় ফেরাল।

ভেড়ার চামড়ার কোট পরে কাঁধে বোঁচকা বেঁধে করাত-কুড়ুল হাতে একদল চাষী-মজুর এগিয়ে আসছিল। তাদের দেখিয়ে ইজভজচিক বলল, 'কত লোক যে আজকাল শহরে এসে ভীড় করছে ; ভয়ংকর অবস্থা।'

'অন্যান্য বছর থেকে বেশী কি ?' নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'অনেক বেশী। এ বছর সব জায়গায় লোক গিজগিজ করছে। অবস্থা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। মালিকরা তাদের তুষের মত ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছে। একটা কাজও জুটছে না।'

'এ রকম হল কেন ?'

'অনেক বেশী লোক এসেছে! তত লোকের জায়গা নেই।'

'তা তো হল, কিন্তু এত লোক এসেছে কেন ? তারা গ্রামে থাকছে না কেন ?'

'গ্রামেও তো কোন কাজ নেই। জমি মিলছে না।'

ক্ষতস্থানে আঘাত লাগলে যেমন হয় নেখ্‌লয়ুদভের মনের অবস্থা তেমনি। লোকে মনে করে, ঘায়ের জায়গায়ই বুঝি আঘাত লাগে ; আসলে ঘা আছে বলেই আঘাতটা লাগে।

'এও কি সম্ভব যে সর্বত্র একই জিনিস ঘটছে ?' এই কথা ভেবে নেখ্‌লয়ুদভ ইজভজচিককে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল—তার গাঁয়ের জমি কেমন, তার নিজের কতটা জমি আছে, সে কেন গাঁ ছেড়ে এসেছে।

ইজভজচিক স্বেচ্ছায় বলতে লাগল, 'জনপ্রতি আমাদের এক "দেসাতিন" করে জমি আছে স্যার, আর আমার পরিবারের আছে তিনজনের অংশ। আমার বাবা ও এক ভাই বাড়িতে থেকে জমি-জমা দেখে, আর এক ভাই ফৌজীতে কাজ করে। কিন্তু বাড়িতে কাজকর্ম কিছু নেই। তাই ভাইও ভাবছে মস্কোতে চলে আসবে।'

'আরও জমি কি খাজনায় পাওয়া যায় না ?'

'কি করে আর পাওয়া যাবে ? ভদ্রলোকরা তাদের জমি-জমা সব উড়িয়ে দিয়েছে, সব গিয়ে ঢুকেছে ব্যবসায়ীদের হাতের মধ্যে। তাদের কাছ থেকে খাজনায় জমি পাওয়া যায় না—তারা নিজেরাই চাষ-আবাদ করে। আমাদের অঞ্চলে একজন ফরাসী এসেছে ; আমাদের সাবেক জমিদারের কাছ থেকে সে সব জমি কিনে নিয়েছে ; এখন আর খাজনায় বিলি করে না। আর জমি তো অফুরন্ত নয়।'

'ফরাসী লোকটির নাম কি ?'

'ফরাসীটির নাম ডুফোর। তার নাম হয় তো শুনেছেন। বড় বড় থিয়েটারের অভিনেতাদের জন্য পরচুলা বানায়। খুব ভাল ব্যবসা, লোকটা অনেক টাকা করেছে। আমাদের জমিদারণীর কাছ থেকে সে সবটা জমিদারি কিনে নিয়েছে; এখন আমরা তার পায়ের তলায় পড়েছি; সে যেমন খুশি আমাদের উপর দিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে। প্রভুকে ধন্যবাদ, সে নিজে লোক ভাল, কিন্তু তার বৌ—সে রুশ মহিলা একটি জন্তুবিশেষ—ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করুন। সে লোকের একেবারে পকেট কাটছে। অবস্থা শোচনীয়। এই যে, কারাগারে এসে গেছি। ফটক পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যাব কি ? সেখান পর্যন্ত যেতে দেবে বলে তো মনে হয় না।'

অধ্যায়—১৩

সামনের ফটকের ঘণ্টাটা বাজিয়েই নেখ্‌ল্যুদভের বুক শুকিয়ে গেল; না জানি মাসলভাকে আজ কি অবস্থায় দেখবে; মাসলভা এবং কারাগারের সবাইকে ঘিরে একটা রহস্য যেন ঘনিয়ে উঠেছে। রক্ষী দরজা খুলে দিতেই সে মাসলভার কথা জিজ্ঞাসা করল। একটু খোঁজ-খবর নিয়ে রক্ষী জানাল, সে হাসপাতালে আছে। সেখানে হাসপাতালের দরোয়ান দয়ালু বুড়ো লোকটি তাকে সঙ্গে সঙ্গে ঢুকতে দিল। তাকে মাসলভার কথা বলায় সে ছোটদের ওয়ার্ডটা দেখিয়ে দিল।

দালানেই কার্বলিক অ্যাসিডের গন্ধে ভরা একটি তরুণ ডাক্তার বেরিয়ে এসে কড়া গলায় নেখ্‌ল্যুদভকে জিজ্ঞাসা করল, সে কি চায়। ডাক্তারটি সদাসর্বদাই কয়েদীদের ভাল করবার চেষ্টা করায় কারা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং প্রধান ডাক্তারের সঙ্গে প্রায়ই তার খিটিমিটি লাগে। নেখ্‌ল্যুদভ হয়তো বেআইনী কোন সুযোগ নিতে চাইবে এই আশংকা করে এবং সে যে কাউকে বিশেষ কোন খাতির করে না সেটা বোঝাবার জন্যও ডাক্তারটি রাগের ভান করল।

সে বলল, 'এখানে কোন মেয়েছেলে থাকে না; এটা শিশুদের ওয়ার্ড।'

'আমি জানি; কিন্তু এখানে একটি মেয়ে-কয়েদীকে সহকারী নার্স হিসাবে নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, সে রকম দুজন আছে। আপনি কাকে চান ?'

নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল, 'তাদের মধ্যে যার নাম মাসলভা সে আমার নিকট আত্মীয়, আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তার মামলার ব্যাপারে সেনেটের কাছে আপীল করতে আমি পিতার্সবার্গ যাব, তাই তাকে এটা দিতে চাই। এটা একটা ফটোগ্রাফমাত্র।' নেখ্‌ল্যুদভ পকেট থেকে একখানা খাম বের করল।

'ঠিক আছে, এতে কোন আপত্তি নেই।' সাদা এপ্রন-পরিহিতা একটি বুড়ির দিকে ফিরে তাকে বলল, কয়েদী মাসলভাকে ডেকে দিতে। 'আপনি কি এখানেই বসবেন, না ওয়েটিং-রুমে যাবেন?' সে প্রশ্ন করল।

নেখ্‌ল্যুদভ ধন্যবাদ জানাল। ডাক্তারের এ রকম সহযোগিতার মনোভাবে সাহস পেয়ে সে আরও জানতে চাইল, হাসপাতালে মাসলভার কাজ কেমন চলছে।

'তা, ভালই। তার পূর্বেকার জীবনের কথা মনে করে বলা যায় যে, কাজকর্ম সে মোটামুটি ভালই করছে। ঐ তো সে এসে পড়েছে।'

একটা দরজায় বুড়ি নার্সকে দেখা গেল। তার পিছনে মাসলভা। পরণে ডোরা-কাটা পোষাক, সাদা এপ্রন, আর একটা রুমাল দিয়ে মাথাটা প্রায় ঢাকা। নেখ্‌ল্যুদভকে দেখেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল। প্রথমে সে ইতস্তত করে থেমে গেল, তারপর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল; চোখ নামিয়ে দালানের মাঝখানের কার্পেটের উপর দিয়ে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। নেখ্‌ল্যুদভের কাছে পৌঁছে হাত বাড়াতে না চেয়েও শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল; তার মুখখানি আরও লাল হয়ে উঠল।

নেখ্‌ল্যুদভ যেদিন তার অসংযত ইন্দ্রিয়াবেগের জন্য তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল, তারপর আর মাসলভার সঙ্গে তার দেখা হয় নি। সে ভেবেছিল, মাসলভা সেই রকমই আছে। কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তার মুখের ভঙ্গীতে একটা নতুন কিছু—সংযত ও লাজুক একটা ভাব ছিল। নেখ্‌লযুদভের মনে হল, সে যেন তার প্রতি কিছুটা বিরূপও বটে। সে পিতার্সবার্গ যাচ্ছে এই মর্মে ডাক্তারকে যা বলেছিল তাকেও তাই বলল এবং পানোভো থেকে আনা ফটোগ্রাফসমেত খামখানা তার হাতে দিল।

'পানোভো-তে এটা পেয়েছি—একখানা পুরনো ফটো; হয়তো তোমার ভাল লাগবে। এটা নাও।'

কালো ভুরু তুলে ঈষৎ টেঁরা চোখে সে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল, 'এ দিয়ে কি হবে। তারপর কোন কথা না বলে ফটোগ্রাফখানা নিয়ে এপ্রনের মধ্যে রেখে দিল।

'সেখানে তোমার পিসীর সঙ্গে আমি দেখা করেছি; নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

নিরাসক্তভাবে সে বলল, 'তাই বুঝি?'

'তুমি এখানে ভাল আছ তো?' নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, ভাল আছি', সে জবাব দিল।

'খুব কঠিন কাজ কি?'

'না, না। তবে এ কাজ করতে অভ্যস্ত নই তো।'

'তোমার এই ব্যবস্থায় আমি খুশি হয়েছি। অন্তত সেখানকার থেকে তো ভাল।'

'সেখানকার থেকে—কোথাকার ?' তার মুখ আবার লাল হয়ে উঠল।

'সেখানে—মানে কারাগারে,' নেখ্‌ল্যুদভ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

'ভাল কেন ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

'মনে হয় এখানকার লোকজনরা ভাল। ওখানকার অনেকের মত নয়।'

'সেখানেও অনেক ভাল লোক আছে।' সে বলল।

'মেনশভদের ব্যাপারটা আমি দেখছি; আশা করি তারা ছাড়া পেয়ে যাবে,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। বৃদ্ধাটি কী চমৎকার মানুষ', ঈষৎ হেসে সে বলল।

'আজই আমি পিতার্সবার্গ যাচ্ছি। শীঘ্রই তোমার মামলাটা উঠবে। আশা করি দণ্ডাদেশ মকুব হবে।'

'মকুব হোক আর নাই হোক, এখন সবই সমান', সে বলল।

'এখন বলছ কেন ?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে মাসলভা বলল, 'দেখুন।'

কথাটা ও তার চাউনির অর্থ নেখ্‌ল্যুদভ বুঝতে পারল। সে জানতে চাইছে, নেখ্‌ল্যুদভ এখনও তার সিদ্ধান্তে অবিচল আছে, না তার প্রত্যাখ্যানকেই মেনে নিয়েছে।

সে বলল, 'তোমার কাছে সবই এক কেন আমি জানি না। আমার কথা বলতে পারি, তুমি ছাড়া পাও আর নাই পাও আমার কাছে সবই সমান। যে কোন অবস্থাতেই আমি যা বলেছি তা করতে আমি প্রস্তুত।' স্থির সংকল্পের সুরে সে কথাগুলি বলল।

মাসলভা মাথা তুলে ঈষৎ টেঁরা কালো চোখের স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে, বুঝি বা তার থেকে দূরের দিকে তাকাল। তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু তার মুখের ভাষা চোখের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

সে বলল, 'এ কথা না বললেই পারতেন।'

'তোমার জানা দরকার বলেই বলছি।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে সে বলল, 'এ বিষয়ে সব কথা বলা হয়েছে, আর কিছুই বলার নেই।'

হাসপাতাল ওয়ার্ডে একটা সোরগোল উঠল; একটি শিশুর কান্না শোনা গেল।

'মনে হচ্ছে তারা আমাকে ডাকছে,' অস্বস্তিকর ভাবে চারদিকে তাকিয়ে সে বলল।

'আচ্ছা, তাহলে চলি', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

তার প্রসারিত হাতখানা মাসলভা ইচ্ছা করেই দেখল না। হাতখানা না ধরেই সে মুখ ঘুরিয়ে কার্পেটের উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল। মনের

খুশিকে সে অনেক চেষ্টায় চেপে রাখল।

'মাসলভার মনের মধ্যে কি হচ্ছে? সে কি ভাবছে? কিসের অনুভূতি তার হচ্ছে? সে কি আমাকে পরীক্ষা করছে, নাকি আমাকে সত্যিসত্যি ক্ষমা করতে পারছে না? না কি তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছে না, বা প্রকাশ করতে চাইছে না? সে কি আগের চাইতে নরম হয়েছে, না আরও কঠিন হয়েছে?'

নিজেকে এইসব প্রশ্ন করে নেখ্‌ল্যুদভ কোন জবাব পেল না। সে শুধু এইটুকু বুঝল যে, মাসলভা বদলেছে, তার আত্মার গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছে, আর সেই পরিবর্তনই তাকে যুক্ত করছে শুধু মাসলভার সঙ্গেই নয়, সেই ভগবানের সঙ্গেও যিনি এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই যোগ তাকে অনুভূতি করেছে, আনন্দে উল্লসিত করেছে।

আটটি বেডযুক্ত ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে নার্সের আদেশমত মাসলভা একটা বিছানা ঠিক করতে লাগল। চাদরটা হাতে নিয়ে অনেক বেশী উপুড় হতে গিয়ে হঠাৎ পা ফস্কে সে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

গলায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি ছোট ছেলে তা দেখে হেসে উঠল। মাসলভা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, সশব্দে হেসে উঠল। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে আরও কয়েকটি ছেলে হো-হো করে হেসে উঠল। নার্স রেগে মাসলভাকে বকুনি দিল।

'হৈ-চৈ করছ কেন? তুমি কি ভেবেছ আগের জায়গায়ই আছ? যাও খাবার নিয়ে এস।'

মাসলভা চুপ করে থালা-বাটি নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে সেই ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই সে আরও চাপা হাসি হাসতে লাগল।

একটু ফাঁকা পেলেই মাসলভা বার বার ফটোগ্রাফখানা খাম থেকে একটু-খানি বের করে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সেটাকে দেখছিল। তারপর সন্ধ্যার পরে কাজ শেষ হলে নিজের ঘরে গিয়ে খাম থেকে ফটোখানা বের করল; নিশ্চুপ হয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে লাগল প্রতিটি জিনিস, মুখ ও পোষাক, বারান্দার ধাপগুলো, তার নিজের, নেখ্‌ল্যুদভের ও তার পিসীদের মুখের পিছনকার ঝোপগুলি। বিবর্ণ হলদে ফটোগ্রাফখানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তার মন খুশিতে ভরে উঠল, বিশেষ করে তার সুন্দর তরুণ মুখ, আর কপাল ঘিরে কোঁকড়া চুলের রাশি তার ভারি ভাল লাগল। ছবি দেখতে সে এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল যে নার্সের ঘরে ঢোকা সে টেরও পেল না।

ফটোর উপর ঝুঁকে পড়ে নার্স বলল, 'সে তোমাকে এটা কি দিয়ে গেল? এটা কে? তুমি?'

'আবার কে?' সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে সে হেসে জবাব দিল।

'আর এই বুঝি সে?—আর এটা, তার মা বুঝি?'

'না, তার পিসী। তুমি কি ছবিতে আমাকে চিনতে পারতে না?'

'কখনও না। মুখটা তো বদলে গেছে। তা, এটা তো দশ বছর আগেকার হবে।'

'বছর নয়, একটা পুরো জীবন আগেকার,' মাসলভা বলল। সঙ্গে সঙ্গে তার সব উৎসাহ নিভে গেল, মুখের উপর ছায়া নেমে এল, দুই ভুরুর মাঝখানে একটা গভীর রেখা ফুটে উঠল।

'তা কেন? তোমার জীবন তো বেশ স্বচ্ছন্দই ছিল।'

'স্বচ্ছন্দই বটে,' চোখ বুজে হাত নাড়তে নাড়তে মাসলভা কথাটা বার দুই বলল। 'নরকের চেয়ে খারাপ।'

'কেন? বল তো?'

'কেন? রাত আটটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত, আর প্রতিটি রাতেই সেই একই ব্যাপার।'

'তাহলে তারা এ কাজ ছেড়ে দেয় না কেন?'

'ইচ্ছা থাকলেও ছেড়ে দিতে পারে না। কিন্তু সে সব কথা বলে লাভ কি?' মাসলভা চেঁচিয়ে বলল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে ফটোখানা দেরাজের ভিতর রেখে দিল। রাগে তার চোখে জল আসছিল। অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে সে ছুটে দালানে চলে গেল। দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল।

গ্রুপ-ফটোর দিকে তাকিয়ে তার আগেকার দিনের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল; তার চোখে লেগেছিল সেদিনের স্বপ্ন আর নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে নতুন স্বপ্নের ছোঁয়া! কিন্তু সঙ্গিনীর কথায় তার মনে পড়ে গেল আজ সে কি হয়েছে আর সেদিন সে কি ছিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই জীবনের সমস্ত আতংক তার মনকে চেপে ধরল।

হঠাৎ নেখ্‌ল্যুদভের প্রতি তার আগেকার তিক্ততা আবার জেগে উঠল। তার ইচ্ছা হল তাকে নতুন করে ভর্ৎসনা করে। অনুশোচনা হতে লাগল কেন সে আজ আবার সুযোগ পেয়েও তাকে বলে নি যে, তাকে সে ভাল করেই চেনে, তাই তার কাছে আর হার মানবে না—তার দেহ নিয়ে একদিন সে খেলা করেছে, কিন্তু তার মন নিয়ে তাকে সে খেলতে দেবে না। নিজের প্রতি করুণা আর নেখ্‌ল্যুদভের প্রতি ভর্ৎসনার বিফল বাসনাকে চাপা দেবার জন্য তার মদ খাবার ইচ্ছা হল। কারাগারে থাকলে হয়তো তার প্রতিজ্ঞা সে ভাঙত; কিন্তু এখানে তো ডাক্তারের সহকারীর কাছে আবেদন না করে মদ পাবার উপায় নেই। দালানে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে তার ছোট ঘরটায় ফিরে গেল। সঙ্গিনীর কোন কথায় কান না দিয়ে তার শোচনীয় জীবনের কথা ভেবে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল।

অধ্যায়—১৪

পিতার্সবার্গে নেখ্‌ল্যুদভের হাতে চারটে কাজ: সেনেটে দরখাস্ত পেশ করা; ফেদসিয়া বিরযুকভার মামলাটা দরখাস্ত-কমিটিতে তোলা; আর ভেরা দুখোভার অনুরোধ—তার বান্ধবী শুস্তভাকে খালাসের চেষ্টা করা ও একটি মা যাতে কারাগারে তার ছেলের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পায় সেই চেষ্টা করা। শেষ দুটি অনুরোধ ভেরা দুখোভা তাকে চিঠিতে জানিয়েছিল। এ দুটোকে তাই সে একটি কাজ বলেই মনে করে।

চতুর্থ কাজটি হল সেই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে যারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনার অপরাধে পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ককেসাসে নির্বাসিত হয়েছে। যতটা তাদের কাছে নয় তার চাইতেও বেশী করে সে নিজের কাছেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে।

পিতার্সবার্গে এসে নেখ্‌ল্যুদভ তার মাসি জনৈক প্রাক্তণ মন্ত্রীর পত্নী কাউণ্টেস চারস্কায়ার বাড়িতে উঠল। যে অভিজাত সমাজ তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এখানে এসে আবার সে সেই সমাজের একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়ল। অবস্থাটা অস্বস্তিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু এ থেকে অব্যাহতি লাভেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না। মাসির বাড়িতে না উঠে হোটেলে উঠলে মাসি অসন্তুষ্ট হত; তাছাড়া, মাসির অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, ফলে অনেক কাজে তার সহায়তা পাওয়া যাবে।

'তোমার সম্বন্ধে এসব কি শুনছি? যতসব আজগুবি ব্যাপার,' পৌঁছবার পরেই কফি দিতে দিতে কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না চারাস্কায়া বলল। 'Vous posez pour un Howard (তুমি দেখছি হাওয়ার্ড হয়ে উঠেছ)—অপরাধীদের সাহায্য করছ, বারে বারে কারাগারে যাচ্ছ, অন্যায়ের প্রতিকার করছ।'

'না, না, সে রকম কিছু না।'

'নয় কেন? ভাল কাজই তো করছ; শুনেছি এর সঙ্গে একটা রোমাণ্টিক গল্প জড়িত আছে। আমাকে সব কথা বল।'

মাসলভার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা নেখ্‌ল্যুদভ খোলাখুলিভাবেই সব বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে তোমার মা আমাকে কথাটা বলেছিল। সেই বুড়িদের সঙ্গে যখন তুমি থাকতে সেই সময়কার ব্যাপার। আমি তো ভেবেছিলাম, তারা তাদের পালিতাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল (কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না সব সময়ই নেখ্‌ল্যুদভের পিসীদের ঘৃণা করত)। এই তাহলে সেই। Elle est encore Jolie (সে কি এখনও সুন্দরী আছে)?'

কাতেরিনা আইভানভ্‌নার বয়স ষাট বছর; শক্ত, উজ্জ্বল, উৎসাহী, বাকপটু

মহিলা। যেমন উঁচু-লম্বা, তেমনি মজবুত চেহারা। তার যে কালো গোঁফ আছে সেটা খুবই স্পষ্ট। নেখ্‌লুয়্‌দভ তাকে ভালবাসত, শিশুকাল থেকেই তার উৎসাহ ও উল্লাস তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

'নাগো মাসি, সে সব চুকে গেছে। আমি তাকে শুধু সাহায্য করতে চাই, কারণ নির্দোষ হয়েও সে শাস্তি পাচ্ছে। এ সবের কারণ আমি; আমার জন্যই তার এই পরিণতি। তার জন্য যথাসাধ্য কিছু করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি তুমি তাকে বিয়ে করতে চাও?'

'হ্যাঁ, আমি তাই চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা চায় না।'

নীরব বিস্ময়ে কাতেরিনা আইভানভ্‌না ভুরু তুলে চোখ নামিয়ে বোনপোর দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলে গেল। খুশি-খুশি চোখে সে বলল:

'দেখ, তোমার চাইতে সে বুদ্ধিমতী। বাবা আমার, তুমি একটি বোকা। তুমি কি সত্যি তাকে বিয়ে করতে?'

'নিশ্চয়।'

'তার সব কথা জেনেছ?'

'জানি বলেই তো; আমিই সে সব কিছুর কারণ।'

হাসি চেপে মাসি বলল, 'তুমি একটি গবেট—ভীষণ গবেট। আর সেই জন্যই তোমাকে আমি ভালবাসি। ভাল কথা, তুমি কি জান—ভাগ্যগুণে একটা ভাল সুযোগ এসেছে! এলিন-এর একটা চমৎকার আশ্রম আছে—বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনীদের আশ্রম। আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানেই ওকে—মানে, তোমার লোককে রেখে দেব। যদি কেউ তাকে শোধরাতে পারে তো সে এলিন।'

'কিন্তু তার তো নির্বাসন দণ্ড হয়েছে। সে ব্যাপারে আপীল করতেই আমি এসেছি। তোমার কাছে আমার সেটাও একটা অনুরোধ।'

'তাই নাকি; কোথায় আপীল করবে?'

'সেনেটের কাছে।'

'ও হো, সেনেট! হাঁ, আমার জ্ঞাতি-ভাই লিও সেনেটে আছে, সে অবশ্য উৎসব-অনুষ্ঠান বিভাগে আছে; আসল লোকদের কাউকে আমি চিনি না। তারা সবাই কোন না কোন শ্রেণীর জার্মান: গে, ফে, ডে—অথবা আইভানভ্‌, সেমুয়নভ্‌ নিকিতিন, অথবা আইভানেংকো, সাইমনেংকো, মিকিতেংকো, pour varier (যত বিচিত্র সব মানুষ)। Des gens de L'autre monde (যেন অন্য জগতের লোক)। সে যাই হোক, আমার স্বামীকে বলব, সে সকলকেই চেনে। সব রকম লোকের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিন্তু তোমাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে, কারণ আমার কথা সে বুঝতে

পারে না। আমি যা কিছু বলি, সে সব কথাতেই বলে বুঝতে পারছে না। C'est un parti pris (তার আর নড়চড় নেই)। সবাই বোঝে, শুধু সে বোঝে না।'

ঠিক সেই সময় হাঁটু পর্যন্ত আটো পাজামা পরা একটি পিয়ন রূপোর থালায় একটা চিঠি নিয়ে এল।

'এই তো, স্বয়ং এলিনের চিঠি। কীসেওয়েটার-এর কথা শুনবার সুযোগ তুমি পেয়ে যাচ্ছ।'

'কীসেওয়েটার কে?'

'কীসেওয়েটার? আজ সন্ধ্যায় এলেই দেখতে পাবে সে কে। সে এত সুন্দর বলতে পারে যে তার কথা শুনে হাড়-পাজি বদমাস পর্যন্ত অনুতাপের কান্নায় ভেঙে পড়ে।'

শুনতে যতই বিস্ময়কর লাগুক, আর তার চরিত্রের অন্য দিকগুলির সঙ্গে যতই বেমানান হোক, কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্না মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, খৃস্টধর্মের মূল কথাই হল মুক্তিতে বিশ্বাস। এই বাণী যেখানেই প্রচারিত হয় সেই সভায়ই সে যায়; নিজের বাড়িতেও ভক্ত-সমাবেশের ব্যবস্থা করে। যদিও এই শিক্ষায় সব রকম অনুষ্ঠান, বিগ্রহ ও পূজাদি নিষিদ্ধ, তথাপি কাতেরিনা আইভানভ্না সব ঘরে বিগ্রহ রেখেছে, তার বিছানার উপরকার দেয়ালেও একটি আছে; তাছাড়া গীর্জার নির্দেশমত সব অনুষ্ঠানই সে পালন করে। এর মধ্যে সে কোন বিরোধ দেখতে পায় না।

কাউণ্টেস বলল, 'দেখে নিও, তোমার ম্যাগডোলেনও (সংশোধিত চরিত্র বেশ্যা) তার কথা শুনে বদলে যাবে। আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে থেকো; তার কথা শুনতে পাবে। সে এক আশ্চর্য মানুষ।'

'এ সবে আমার কোন আগ্রহ নেই গো মাসি।'

'কিন্তু আমি বলছি ব্যাপারটা আকর্ষণীয়, আর তুমিও অবশ্য বাড়িতে থাকবে। আমার কাছে তোমার আর কি চাই? Videz votre sac (বস্তা ঝেড়ে ফেল, অর্থাৎ যা কিছু বলার আছে বলে ফেল)।

'পরের কথাটা দুর্গের ব্যাপার।'

'দুর্গে? সেজন্য ব্যারণ ক্রিগস্মাথ-এর কাছে একটা চিঠি তোমাকে দিয়ে দেব। c'est un tres brave homme (চমৎকার মানুষ তিনি)। আরে, তাকে তো তুমি চেন; তিনি তোমার বাবার বন্ধু ছিলেন। I donne dans le spiritisme (এখন তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে ঝুঁকেছেন)। কিন্তু তাতে অসুবিধা হবে না, তিনি খুব ভাল মানুষ। সেখানে তোমার কি দরকার?'

'সেখানে কারারুদ্ধ একটি ছেলের সঙ্গে তার মা যাতে দেখা করতে পারে তার জন্য অনুমতি সংগ্রহ করতে চাই। কিন্তু আমি শুনেছি সেটা চেরভিয়ান্-

ষ্কির উপর নির্ভর করে, ক্রিগস্‌মাথের উপর নয়।'

'চেরভিয়ান্‌স্কিকে আমি পছন্দ করি না, কিন্তু সে মারিয়েতের স্বামী ; তাকে আমরা বলতে পারি। আমার জন্য এ কাজ সে করে দেবে। Elle est tres gentille (সে খুব ভাল মেয়ে)।'

'আর একটি মেয়ের দরখাস্তও নিয়ে এসেছি : সেও কারাগারে বন্দিনী, কিন্তু কেন তা সে জানে না।'

'কোন ভয় নেই ; সে ভালই জানে। তারা সবাই সব কিছু জানে। ওই সব ছোট-চুল মেয়েগুলোর উচিত সাজাই হয়েছে।'

'সাজাটা উচিত কিনা আমি জানি না। কিন্তু তারা কষ্ট পাচ্ছে। তুমি একজন খৃস্টান, ধর্মগ্রন্থের বাণীতে তুমি বিশ্বাস কর, অথচ তুমি এত নির্দয়।'

'তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মগ্রন্থ ধর্মগ্রন্থ, আর যা বিরক্তিকর তা সব সময়ই বিরক্তিকর। যে নৈরাজ্যবাদীদের (Nihilists) আমি সহ্য করতে পারি না, তাদের বিশেষ করে ছোট-চুল মেয়ে নৈরাজ্যবাদীদের প্রতি যদি আমি ভালবাসার ভান করতাম সেটা হত আরও খারাপ।'

'কেন তুমি তাদের সহ্য করতে পার না ?'

'কেন ? ১লা মার্চের পরেও তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন ? (১৮৮১-র ১লা মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দার খুন হয়েছিল)

'তারা সকলেই কিছু ১লা মার্চের ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে নি।'

'তা না হয় হল। যেটা তাদের কাজ নয় তাতে হাত ঢোকানো তাদের উচিত নয়। এটা তো মেয়েদের কাজ নয়।'

'অথচ তুমি মনে করছ যে মারিয়েৎ এ ব্যাপারে হাত দেবে।'

'মারিয়েৎ ? মারিয়েৎ হল মারিয়েৎ, আর এরা যে কি তা কেউ জানে না। তারা তো সবাইকেই শিক্ষা দিতে চায়।'

'শিক্ষা দিতে নয়, মানুষকে সাহায্য করতে চায়।'

'কাকে সাহায্য করতে হবে আর কাকে করতে হবে না, সেটা ওদের ছাড়াই আমরা জানি।'

'কিন্তু চাষীদের যে সাহায্যের বড়ই দরকার। এইমাত্র আমি গ্রাম থেকে এসেছি। এটা কি একান্তই প্রয়োজন যে শক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত তারা খাটবে অথচ পেটভরে খেতে পাবে না, আর আমরা মহাসুখে প্রাচুর্যের মধ্যে দিন কাটাব ?' নেখ্‌লুয়ুদভ বলল। মাসির ভালমানষেমির সুযোগ নিয়ে নিজের অজানতেই সে তাকে তার মনের কথাই বলে ফেলল।

'তাহলে তুমি কি চাও ? তুমি কি চাও যে আমি খাটব, কিন্তু কিছু খাব না ?'

নিজের অজ্ঞাতেই হেসে উঠে নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, 'না, তুমি খাবে না তা আমি চাই না ; আমি শুধু চাই, আমরা সকলেই খাটব, সকলেই খাব।'

পুনরায় ভুরু তুলে চোখ নামিয়ে মাসি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলল, 'Mon cher, vous finirez mal (বাছা, তোমার পরিণাম খুব খারাপ।'

'কিন্তু কেন ?'

ঠিক সেই সময় কাউণ্টেস চারস্কায়ার স্বামী ও প্রাক্তণ মন্ত্রী জেনারেল ঘরে ঢুকল। লোকটি দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ।

সদ্য কামানো গাল চুম্বনের জন্য নেখ্‌লুদভের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, 'আরে দিমিত্রি, কেমন আছ ? কখন এলে ?' সে নিঃশব্দে স্ত্রীর কপালে চুম্বন করল।

'Non, il est impayable (ওঃ, তার তুলনা হয় না।),' স্বামীর দিকে ঘুরে কাউণ্টেস বলল। 'সে চায় আমি নিজের হাতে কাপড়-চোপড় কাচি আর আলু খেয়ে বাঁচি। ছেলেটা ভয়ংকর বোকা। কিন্তু তাহলেও সে তোমাকে যা যা বলে তা করে দিও।'

তারপর বলল, 'তুমি কি শুনেছ, কামেন্‌স্কির মায়ের জীবন-সংশয়। তোমার এখনই সেখানে যাওয়া উচিত।'

'তা ঠিক,' স্বামী বলল।

'তার আগে ওর সঙ্গে একটু কথা বল। আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।'

নেখ্‌লুদভ ড্রয়িং-রুমের পাশের ঘরে পা দেওয়া মাত্রই মহিলাটি আবার তাকে ডেকে পাঠাল।

'তাহলে মারিয়েৎকে চিঠি লিখব কি ?'

'দয়া করে লেখ মাসি।'

'ছোট-চুলওয়ালি সম্পর্কে তুমি যা বলতে চাও সেজন্য আমি খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে দেব ; তাহলেই সে তার স্বামীকে আদেশ করবে, আর সেও আদেশ পালন করবে। তুমি আমাকে খারাপ ভেব না ; তোমার ঐ সব লোকগুলো বড়ই বিরক্তিকর, কিন্তু Je ne leur veux pas de mal (আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না)। আচ্ছা, যাও, কিন্তু খেয়াল থাকে যেন, আজ সন্ধ্যায় কীসেওয়েটারের বাণী শুনবার জন্য বাড়িতে থেকো। কিছু প্রার্থনার ব্যবস্থাও থাকবে। তুমি বাধা না দিলে ca vous fera beaucoup de bien (এতে তোমার অনেক উপকার হবে)। আমি জানি, তোমার মা এবং তোমরা সকলেই এ বিষয়ে চিরদিনই পিছিয়ে আছ। আপাতত বিদায়।'

অধ্যায়—১৫

কাউণ্ট আইভান মিখাইলভিচ এক সময়ে মন্ত্রী ছিল। কতকগুলি প্রত্যয়ে সে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল।

তার প্রত্যয়গুলির অন্যতম হল এই বিশ্বাস যে, একটা পাখির পক্ষে যেমন কীট-পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকা, পাখনা-পালকে শরীর ঢেকে রাখা এবং আকাশে উড়ে বেড়ানোই স্বাভাবিক, তেমনি তার পক্ষেও বেশী মাইনের রাঁধুনির হাতে প্রস্তুত ভাল ভাল দামী খাবার খাওয়া, সব চাইতে আরামদায়ক দামী পোষাক পরা এবং সব চাইতে ভাল দ্রুততম ঘোড়ায় চড়াই স্বাভাবিক; সুতরাং এ সব কিছুই তার হাতের কাছে মজুদ থাকা চাই। এ ছাড়া, কাউণ্ট আইভান মিখাইলভিচ মনে করে যে, যে-কোন উপায়ে সরকারী তহবিল থেকে যত বেশী টাকা বাগানো যায় ততই মঙ্গল।

নেখ্‌লুয়ুদভের সব কথা শুনে সে বলল, সে তাকে দুটো চিঠি লিখে দেবে; তার মধ্যে একটি আপীল বিভাগের সেনেটর উল্‌ফ্‌-কে, আর একটি চিঠি দরখাস্ত-কমিটির একজন গণমান্য সদস্যের কাছে।

এই দুখানি চিঠি এবং মাসির লেখা মারিয়েতের চিঠি হাতে পেয়েই নেখ্‌লুয়ুদভ ঐ সব ঠিকানার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমেই গেল মারিয়েতের কাছে। কিশোরী বয়সে সে তাকে চিনত। একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে সে; কিন্তু পরিবারটি বিত্তবান নয়। যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সে একজন পদস্থ ব্যক্তি। তবে তার সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা সে শুনেছে। সব চাইতে খারাপ যা শুনেছে সেটা হল, পদস্থ কর্মচারি হিসাবে তার কাজই হল রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতন করা এবং হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দীকে নির্যাতন করার ব্যাপারে সে তাদের প্রতি এতটুকু করুণা করে না। অন্য সময়ের মতই এখনও নেখ্‌লুয়ুদভের কাছে এটা অসহ্য মনে হতে লাগল যে, অত্যাচারিতকে সাহায্য করতে গিয়ে তাকে অত্যাচারীদের পাশে গিয়েই দাঁড়াতে হচ্ছে; সেই অত্যাচারীরা যে নিষ্ঠুরতায় অভ্যস্ত, যে নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে হয় তো সচেতনও নয়, সেই নিষ্ঠুরতাকে কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে অন্তত কিছুটা হ্রাস করা হোক এই আবেদনের ভিতর দিয়ে সে তো তাদের কার্যকলাপকেই সমর্থন করছে। এ সব ক্ষেত্রে সে সব সময়ই নিজের ভিতরে একটি প্রতিবাদ ও অসন্তোষ অনুভব করে; সুবিধাটুকু চাইবে কি চাইবে না সে ব্যাপারে ইতস্তত করে এবং শেষ পর্যন্ত চাইতেই হয়।

অনেকদিন সে পিতার্সবার্গে আসে নি। তবু শহরটা তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উত্তেজনা ও নৈতিক বিষণ্ণতার প্রভাব তার মনে ছড়িয়ে দিল।

সব কিছুই এত পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক ও সুবিন্যস্ত, মানুষগুলি নৈতিক

ব্যাপারে এতই উদার যে জীবনযাত্রা বেশ সহজ বলেই মনে হল।

একজন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ভদ্র ইজভজচিক তাকে নিয়ে মারিয়েতের বাড়িতে যাবার পথে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, ভদ্র পুলিশকে পাশ কাটিয়ে, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, জলে-ধোয়া রাজপথ ধরে, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন সব বাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল।

সদর দরজায় বিলিতি সাজ-পরানো একজোড়া বিলিতি ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল, পোষাক-পরা একজন বিলিতি কোচয়ান একটা চাবুক হাতে নিয়ে সগর্বে বাক্সে বসে আছে। তার গোঁফ-জোড়া দুদিকেই গালের নীচে নেমে গেছে।

অদ্ভুত রকমের পরিচ্ছন্ন উর্দিপরা দরোয়ান হলের দরজাটা খুলে দিল। সেখানে আরও বেশী পরিচ্ছন্ন সোনালি দড়ি লাগানো উর্দি-পরা চমৎকার চিরুনি-চালানো গোঁফওয়ালা পিওন এবং নতুন ইউনিফর্মে সজ্জিত আর্দালি দাঁড়িয়েছিল।

'জেনারেল কারও সঙ্গে দেখা করবেন না, মাননীয়া মহাশয়াও কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। তিনি এখনই বাইরে যাবেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ কাতেরিনা আইভানভ্‌নার চিঠিখানা বের করে টেবিলটার কাছে গিয়ে তার কার্ডে লিখল, কারও দেখা না পাওয়ায় সে দুঃখিত। পিয়ন সিঁড়ির কাছে এগিয়ে গেল, দরোয়ান বাইরে গিয়ে কোচয়ানকে হাঁক দিল, আর আর্দালি দুই হাত পাশে এলিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার ছোট ছোট চোখ দিয়ে দেখতে লাগল, পোষাকের জাঁকজমকের সঙ্গে একেবারেই বেমানান একটি ছোটখাট ক্ষীণকায়া মহিলা দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

মারিয়েতের মাথায় পালক-লাগানো বড় টুপি, কালো পোষাক, ও নতুন কালো দস্তানা। একটা ওড়নায় তার মুখ ঢাকা।

নেখ্‌ল্যুদভকে দেখতে পেয়ে সে ওড়নাটা তুলে দিল। সুন্দর মুখের দুটি উজ্জ্বল চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে সে তার দিকে তাকাল।

খুশি-ভরা মৃদু গলায় সে বলে উঠল, 'আরে, প্রিন্স দিমিত্রি আইভানভিচ। আমার আগেই চেনা উচিত ছিল—'

'সে কি! আমার নামটাও তোমার মনে আছে?'

মারিয়েৎ ফরাসিতে বলল, 'তাই তো মনে হয়। আরে, আমার বোন আর আমি তো তোমার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বদলে গেছ।··· আহা, কী দুঃখের কথা, আমাকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। চল, আবার উপরেই যাই।' কথাটা বলে সে ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘড়িটার দিকে তাকাল। 'না, তা হবে না। মৃতের প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতে কামেন্‌স্কিদের বাড়ি যাচ্ছি। তার মা খুবই ভেঙে পড়েছে।'

'কামেন্‌স্কিরা কারা?'

'তুমি শোন নি? তার ছেলে দ্বৈত-যুদ্ধে মারা গেছে। সে পোসেন-এর

সঙ্গে লড়েছিল। সেই একমাত্র ছেলে। কী ভয়ংকর! মা একেবারেই ভেঙে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে।'

'না। আমি বরং চলেই যাই। আজ রাতে বা কাল তুমি অবশ্য আসবে,' এই কথা বলে সে দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

একটু এগিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আজ রাতে আমি আসতে পারব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।' ঘোড়া দুটো তখন সদর দরজার আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

'কিসের অনুরোধ?'

'আমার মাসি এই চিঠিটা তোমাকে পাঠিয়েছে।' নেখ্‌ল্যুদভ মস্ত বড় মোহরাংকিত একটা লম্বা খাম তার হাতে দিল। 'এতেই সব লেখা আছে।'

'আমি জানি, কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না মনে করেন যে আমার স্বামীর কাজকর্মে তার উপর আমার কিছুটা প্রভাব আছে। সেটা তার ভুল। আমি কিছুই করতে পারি না, এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করতেও চাই না। কিন্তু কাউণ্টেসের জন্য এবং তোমার জন্য আমি সে নীতি লংঘন করতে রাজী আছি। কাজটা কি বল তো?' কালো দস্তানা পরা হাত দিয়ে পকেটের ভিতর বৃথাই কি যেন খুঁজতে খুঁজতে সে বলল।

'দুর্গের মধ্যে একটি মেয়ে বন্দী হয়ে আছে, কিন্তু সে অসুস্থ ও নির্দোষ।'

'তার নাম কি?'

'শুস্তভা—লিডিয়া শুস্তভা। চিঠিতেই লেখা আছে।'

'ঠিক আছে; দেখব কি করতে পারি,' বলেই সে আস্তে লাফ দিয়ে তার নতুন গদি-আটা খোলা গাড়িতে উঠে ছোট ছাতাটা খুলল। গাড়ির বার্নিশ-করা উজ্জ্বল মাড-গার্ড রোদ্দুরে ঝকমক করতে লাগল। পিওন উঠে বক্সে বসেই কোচয়ানকে গাড়ি চালাতে বলল। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মারিয়েৎ ছোট ছাতাটা দিয়ে কোচয়ানের গায়ে টোকা দিতেই ঘোড়া দুটি থেমে গেল; লাগামে টান পড়ায় তাদের ঘাড় দুটি ধনুকের মত বেঁকে গেল।

'তুমি কিন্তু অবশ্য আসবে; তবে দয়া করে কোন কাজ নিয়ে আসবে না,' নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে সে হাসল; সে-হাসির ক্ষমতা সে ভালই জানে। তারপর যেন নাটক শেষ হয়ে যবনিকা নেমে আসছে এমনি ভাবে সে ওড়নাটা আবার মুখের উপর নামিয়ে দিল। 'ঠিক আছে', বলে আবার সে ছোট ছাতাটা দিয়ে কোচয়ানকে স্পর্শ করল।

নেখ্‌ল্যুদভ মাথার টুপিটা তুলে ধরল। সুশিক্ষিত ঘোড়া দুটি সামান্য শব্দ করে ছুটতে শুরু করল; পাথরের রাস্তায় খুরের শব্দ উঠল; নতুন রবার-টায়ার লাগানো গাড়িটা নিঃশব্দে দ্রুত এগিয়ে চলল; শুধু রাস্তার কোন কোন উচু-নীচু জায়গায় মাঝে মাঝে একটু ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

অধ্যায়—১৬

তার ও মারিয়েতের মধ্যে যে হাসি-বিনিময় হয়ে গেল সেটা মনে করে নেখ্‌লয়ুদভ মাথা নাড়তে লাগল।

'এ-জীবনে ফিরে যাবার মত যথেষ্ট সময় তোমার হাতে নেই', যে-মানুষকে সে শ্রদ্ধা করে না তার কাছে উপকার চাইতে গেলেই তার মনের উপর বিরোধ ও সন্দেহের যে চাপ পড়ে সেটা অনুভব করেই মনে মনে সে কথাগুলি বলল।

এবার কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে নেখ্‌লয়ুদভ সেনেটের দিকে রওনা দিল। আপিসে ঢুকে সে চমৎকার একটা ঘরে অনেকগুলি ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন কর্মচারিকে কাজ করতে দেখল।

তারাই জানাল, মাসলভার দরখাস্ত পাওয়া গেছে এবং বিবেচনা ও মন্তব্যের জন্য সেনেটের উল্‌ফের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই উল্‌ফের কাছেই তার মেসোও চিঠি লিখে দিয়েছে।

একজন কর্মচারি বলল, 'এই সপ্তাহেই সেনেটের একটা সভা আছে, কিন্তু বিশেষ অনুরোধ না এলে মাসলভার ব্যাপারটা সে সভায় উঠবার সম্ভাবনা নেই। তবে যদি বিশেষ অনুরোধ আসে তাহলে বুধবারেই সেটা উঠতে পারে।'

সেখান থেকে নেখ্‌লয়ুদভ দরখাস্ত কমিটির সদস্য ব্যারণ ভরভ্‌য়ভ্‌-এর চমৎকার সরকারী ভবনে গেল। দরোয়ান কড়া গলায় জানিয়ে দিল, একমাত্র সাক্ষাৎকারের দিন ছাড়া ব্যারণের সঙ্গে দেখা হবে না; আজ তিনি মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে আছেন, আর কাল তাকে একটা প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অগত্যা মেসোর চিঠিখানা দরোয়ানের হাতে দিয়ে সে সেনেটের উল্‌ফের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

উল্‌ফ্‌ সবে খাওয়া শেষ করেছে এমন সময় নেখ্‌লয়ুদভ ঘরে ঢুকল। অভ্যাসমত উল্‌ফ্‌ তখন একটা সিগার টানতে টানতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল।

পায়চারি থামিয়ে উল্‌ফ্‌ বন্ধুত্বপূর্ণ অথচ ঈষৎ বিদ্রূপের হাসির সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করে নেখ্‌লয়ুদভের দেওয়া চিঠিখানি পড়ল।

'দয়া করে আসন গ্রহণ করুন, আর আপনার অনুমতি নিয়ে আমি যদি একটু পায়চারি করি তাহলে সেটা ক্ষমা করবেন,' কোটের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে প্রকাণ্ড সুসজ্জিত পড়ার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতেই সে কথাগুলি বলল।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারি খুশি হলাম, আর কাউণ্ট আইভান মিখাইলভিচ যা চেয়েছেন সে কাজও সানন্দেই করব,' মুখ দিয়ে সুগন্ধি নীল নীল ধোঁয়া ছেড়ে ছাইটা যাতে ভেঙে না পড়ে সেজন্য সিগারটাকে খুব সতর্ক ভাবে মুখ থেকে নামিয়ে সে বলল।

'আমি শুধু বলতে চাইছি কেসটা যেন তাড়াতাড়ি ওঠে, যাতে কয়েদীকে সাইবেরিয়ায় যেতে হলে সে শীঘ্রই যাত্রা করতে পারে', নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিঝ্‌নি নভগরদ থেকে প্রথম স্টিমারেই যেতে পারবে। আমি জানি।' যে যাই বলুক সে যে সেটা আগে থেকেই জানে এমনি মুরুব্বিয়ানা চালে উল্‌ফ্‌ কথাগুলি বলল। 'কয়েদীর নামটা কি?'

'মাসলভা।'

উল্‌ফ্‌ টেবিলের কাছে গিয়ে ফাইলের ভিতর থেকে খুঁজে নিয়ে একখানা কাগজে চোখ বুলিয়ে নিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাসলভা। ঠিক আছে, অন্য সকলকেও বলে দেব। বুধবারেই এ কেসের শুনানি হবে।'

'তাহলে আমি কি অ্যাডভোকেটকে টেলিগ্রাম করতে পারি?'

'অ্যাডভোকেট! কিসের জন্য? অবশ্য আপনি যদি চান, আপত্তি কি?'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'আপীলের যুক্তিগুলো হয়তো যথেষ্ট নয়, কিন্তু কেসটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্যই শাস্তিটা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হতে পারে; কিন্তু সেনেট তো কেসটাকে সে ভাবে দেখতে পারে না,' সিগারের ছাইয়ের দিকে চোখ রেখে উল্‌ফ্‌ কড়া স্বরে বলল। 'সেনেট শুধু বিবেচনা করবে আইনের সঠিক প্রয়োগ ও তার সঠিক ব্যাখ্যা।'

'কিন্তু আমার মনে হয় এ কেসটা একটু অন্য রকম।'

'জানি, জানি! সব কেসই অন্য রকম। আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করব। বাস।' ছাইটা তখনও ঠিক আছে, তবে একটা চিঁড় ধরেছে, ভেঙে পড়তে পারে।

ছাইটা যাতে না পড়ে সেই ভাবে সিগারটা ধরে উল্‌ফ্‌ বলল, 'আপনি কি প্রায়ই পিতার্সবার্গে আসেন?' পাছে ছাইটা পড়ে যায়, তাই সে সযত্নে সেটাকে ছাই-দানির কাছে নিয়ে ছাইটা ঝেড়ে ফেলল।

তারপর বলে উঠল, 'এই কামেনস্কির ব্যাপারটা কী ভয়ংকর। চমৎকার ছেলেটি। একমাত্র ছেলে⋯ ⋯বিশেষ করে মায়ের কথাটা ভাবুন,' সে সময় পিতার্সবার্গের প্রতিটি মানুষ কামেনস্কি-প্রসঙ্গে যা যা বলছিল সেই কথাগুলিই সে হুবহু বলে চলল।

কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না ও নতুন ধর্ম-শিক্ষার ব্যাপারে তার উৎসাহের কথা কিছুটা উল্লেখ করে উল্‌ফ্‌ ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল।

নেখ্‌লয়ুদভ অভিবাদন করল।

হাত বাড়িয়ে উল্‌ফ্‌ বলল, 'সুবিধা হলে বুধবার এখানে এসে খাবেন; তখন আপনাকে চূড়ান্ত খবর দিতে পারব।'

বেশ দেরী হয়ে গেছে। নেখ্‌লয়ুদভ মাসির বাড়ি ফিরে গেল।

অধ্যায়—১৭

কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌নার নৈশাহারের সময় সাড়ে সাতটা। যেভাবে খাবার পরিবেশন করা হল সেটাও নেখ্‌লয়ুভের কাছে নতুন। টেবিলের উপর ডিসগুলি সাজিয়ে রেখে পিওনরা ঘর থেকে চলে গেল, আর আহারার্থীরা নিজেরাই সব ব্যবস্থা করতে লাগল। পুরুষরা মহিলাদের কোন রকম পরিশ্রম করতে দেবে না; তাই তারা পুরুষোচিত ভাবেই মহিলাদের ও নিজেদের আহার্য ও পানীয় পরিবেশনের ভার নিল। একটা কোর্স শেষ হতেই কাউণ্টেস বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামটা টিপল আর সঙ্গে সঙ্গে লোকজনরা নিঃশব্দে এসে তাড়াতাড়ি ডিসগুলি সরিয়ে নিয়ে প্লেট পাল্টে দিল এবং পরবর্তী কোর্সটা এনে হাজির করল। খাবার-দাবার সবই বাছাই-করা, মদও খুবই দামী। দুটি সাদা-পোষাকের সহকারীকে নিয়ে ফরাসি রাঁধুনিটি সব কাজ করছে। খাবার টেবিলে মোট ছ'জন উপস্থিত ছিল: কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, তাদের ছেলে (রক্ষী-বাহিনীর রুক্ষমেজাজের অফিসার; টেবিলে কনুই রেখে বসেছে), নেখ্‌লয়ুদভ, একজন ফরাসি সঙ্গী ও গ্রাম থেকে আসা কাউণ্টের প্রধান গোমস্তা।

এখানেও দ্বৈতযুদ্ধ নিয়েই আলোচনা শুরু হল। এ বিষয়ে সম্রাটের অভিমতের উপরেই নানা রকম মন্তব্য চলতে লাগল। মায়ের জন্য সম্রাট খুবই দুঃখিত—অন্য সবাই দুঃখিত; হত্যাকারীর প্রতি সম্রাট খুব কঠোর হবে না, কারণ সে তার সামরিক মর্যাদা রক্ষা করেছে,—ঐ একই কারণে সকলেই তার প্রতি উদার মনোভাবের পক্ষপাতী। একমাত্র কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না স্বাধীন চিন্তাহীনতার বশে ভিন্নমত প্রকাশ করল।

'ওরা মদ খেয়ে সহজ সরল ছেলেগুলোকে খুন করে। আমি তাদের কোন মতেই ক্ষমা করব না।' সে বলল।

কাউণ্ট বলল, 'দেখ, তোমার এ কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

কাউণ্টেস বলল, 'আমি জানি, আমার কথা তুমি কোন দিনই বুঝতে পারবে না।' তারপর নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ফিরে বলল, 'আমার স্বামী ছাড়া আর সকলেই বুঝতে পারে। আমি বলছি, মায়ের জন্য আমি দুঃখিত; আমি চাইনা যে সে লোকটা খুন করেও বহালতবিয়তে থাকবে।'

যাই হোক, এ নিয়ে অনেক কথাকাটাকাটি হল। তারপর খাওয়া শেষ হলে মস্ত বড় নাচ-ঘরে উঁচু পিঠওয়ালা কারুকার্যখচিত চেয়ারগুলোকে সভার মত করে সারি দিয়ে সাজানো হল; একদিকে ছোট টেবিলে বক্তার জন্য এক কুঁজো জল রাখা হল, আর তার পাশে রাখা হল একটা হাতল-ওয়ালা চেয়ার। ক্রমে বিদেশী প্রচারক কীসেওয়েটারের বাণী শুনবার জন্য লোক জমতে লাগল।

সদর দরজায় সুন্দর সুন্দর সব গাড়ি এসে থামল। মূল্যবান আসবাবে

সজ্জিত ঘরে রেশম, ভেলভেট ও লেস-এ মোড়া, মাথায় পরচুলা ও শরীরে প্যাড লাগানো মহিলারা বসল, তাদের সঙ্গে এল ইউনিফর্ম ও সান্ধ্য-পোষাকে সজ্জিত পুরুষরা, আর আধ ডজনখানেক সাধারণ মানুষ: দুজন চাকর, একজন দোকানি, একটি পিওন ও একটি কোচয়ান।

কীসেওয়েটারের শরীর মজবুত, গায়ের রং আধূসর। সে ইংরেজিতে বলতে লাগল, আর পিঁসনে-পরা একটি একহারা তরুণী সঙ্গে সঙ্গে প্রাঞ্জল রুশ ভাষায় সেটা অনুবাদ করতে লাগল।

সে বলতে লাগল, আমাদের পাপ এত বেশী, তার দরুন শাস্তি এত কঠোর ও অপরিহার্য যে সে শাস্তির আশংকা মনের মধ্যে নিয়ে বেঁচে থাকাই অসম্ভব।

'প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, মুহূর্তের জন্য আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমরা কি করছি: আমরা কি ভাবে জীবন চালাচ্ছি, সকলের প্রতি প্রেমময় প্রভুকে কি ভাবে আমরা আঘাত করছি, কি ভাবে খৃস্টকে যন্ত্রণা দিচ্ছি; তাহলেই আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, পরিত্রাণ নেই, মুক্তি নেই: ধ্বংসই আমাদের সকলের অনিবার্য নিয়তি। একটা ভয়ংকর পরিণতি —শাশ্বত যন্ত্রণা—আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' চোখের জলে কম্পিত কণ্ঠে সে কথা বলতে লাগল। 'আহা, কেমন করে আমরা রক্ষা পাব ভ্রাতৃগণ? এই ভীষণ চির-জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে কেমন করে আমরা রক্ষা পাব? সারা বাড়িতে আগুন লেগেছে; পালাবার পথ নেই।'

কিছু সময়ের জন্য সে চুপ করল। তার দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। গত আট বছর ধরে যখনই সে ভাষণের ঠিক এই জায়গাটায় আসে (এই জায়গাটি সে নিজেও খুব পছন্দ করে) তখনই তার গলা আটকে আসে, নাক সুড়্সুড়্ করে এবং চোখে জল আসে; সেই চোখের জল তাকে আরও বিচলিত করে তোলে।

ঘরের মধ্যে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল। টেবিলের উপর কনুই রেখে দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে কাউন্টেস কাতেরিনা আইভানভ্না বসে ছিল। তার মোটা কাঁধ দুটি ফুলে ফুলে কাঁপছে। কোচয়ান ভয়ে ও বিস্ময়ে জার্মান লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে; তার মনে হতে লাগল সে যেন লোকটিকে তার গাড়ির নীচে চাপা দিতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু বিদেশী লোকটি কিছুতেই সরে যাচ্ছে না। সকলেই কাতেরিনা আইভানভ্নার ভঙ্গীতেই বসে আছে। উল্ফের সুসজ্জিতা একহারা মেয়েটি দুই হাতে মুখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসেছে।

সহসা বক্তা মুখের ঢাকনাটা ফেলে দিয়ে যেমন ভাবে অভিনেতারা মনের খুশির ভাবকে প্রকাশ করে থাকে তেমনি ভাবে সত্যিকারের হাসি হাসল। এবং শান্ত মৃদু কণ্ঠে বলতে লাগল:

'তথাপি মুক্তির পথ অবশ্যই আছে। এই সেই পথ—আনন্দময় সহজ পথ।

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র আমাদের জন্য যে রক্ত দিয়েছেন, আমাদের জন্য সব যন্ত্রণা যিনি সহ্য করেছেন, সেই রক্তেই আছে আমাদের মুক্তি। তাঁর যন্ত্রণা, তাঁর রক্তই আমাদের রক্ষা করবে। ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ,' কান্না-ভেজা গলায় সে বলতে লাগল, 'জগতের মুক্তির জন্য যে প্রভু তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, আসুন আমরা তাঁর গুণকীর্তন করি। তাঁর পবিত্র রক্ত—'

নেখ্‌লুদভ বিরক্ত হয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল; লজ্জাজনক আর্তনাদকে পিছনে ফেলে চোখে ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুলে নিঃশব্দ পায়ে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

অধ্যায়—১৮

পরদিন নেখ্‌লুদভ সবে পোষাক পরে নীচে নামতে যাচ্ছে এমন সময় পিওন মস্কোর অ্যাডভোকেটের কার্ড এনে দিল। নিজের কাজেই সে পিতার্সবার্গ এসেছে; তবে মাসলভার মামলার শুনানী যদি শীঘ্র শুরু হয় তাহলে সেনেটের সভায়ও সে উপস্থিত থাকতে পারবে। নেখ্‌লুদভের টেলিগ্রাম পৌছবার আগেই সে চলে এসেছে। মামলার শুনানী কবে হবে এবং কোন্ কোন্ সেনেটর তখন উপস্থিত থাকবে, এ সব কথা নেখ্‌লুদভের মুখে শুনে সে হাসল।

বলল, 'ঠিক তিন প্রকৃতির সেনেটরই থাকছে। উল্ফ্ পিতার্সবার্গের একজন সরকারী কর্মচারি; স্কভরদ্নিকভ্ একজন তাত্ত্বিক আইনজ্ঞ; আর বে একজন আইন-ব্যবসায়ী, সুতরাং তিনজনের মধ্যে সেই সর্বাধিক উদ্যমশীল। তার জন্যই যা ভরসা। ভাল কথা, দরখাস্ত-কমিটির খবর কি?'

'আজই ব্যারণ ভরব্‌য়ভ্-এর কাছে যাব। গতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

একটা রুশ নামের বিদেশী উপাধির উপর নেখ্‌লুদভ কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক জোর দিয়ে কথা বলায় অ্যাডভোকেট বলল, 'তিনি কেমন করে "ব্যারণ" ভরব্‌য়ভ্ হলেন তা জানেন কি? কারণ সম্রাট পল তার ঠাকুর্দাকে (মনে হয় তিনি দরবারের একজন পিওন ছিলেন)—ঐ উপাধি দান করেছিলেন। যে রকম করেই হোক তিনি সম্রাটকে খুশি করে ওটা পেয়েছিলেন। এই ভাবেই "ব্যারণ" ভরব্‌য়ভ্-এর সৃষ্টি হয়েছে, আর সে উপাধি নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই। বুড়ো ভারি চালাক।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' নেখ্‌লুদভ বলল।

'ভাল কথা; আমরা এক সঙ্গেই যেতে পারি। পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

বেরুবার মুখে পাশের ঘরেই পিওন তার হাতে মরিয়েত-এর একখানি চিঠি দিল:

'Pour vous faire plaisir, j'ai agi Tout a´ fait contre mes principes, et j'ai interceced´ aupres demon mari pour votre protegee. Il se trouve bue cette personne peut etre velachee immediatement. Mon mari a ecrit au commandant. Vanez donc disinterestedly. Je vous attends. M.' (তোমাকে খুশি করতে আমার নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেছি; তোমার আশ্রিতার জন্য আমার স্বামীকে বলেছি। দেখে মনে হচ্ছে এই ব্যক্তিকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া যাবে। আমার স্বামী কম্যাণ্ডারকে লিখেছে। অতএব এস, বিনা কাজে এস। তোমার আশায় থাকব। এম।)

'কল্পনা করুন!' নেখ্‌ল্যুদভ অ্যাডভোকেটকে বলল। 'ভয়ংকর কথা নয় কি? যে স্ত্রীলোকটিকে তারা সাত মাস ধরে নির্জন সেলে আটকে রেখেছে, দেখা যাচ্ছে সে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং একটি কথাতেই তার মুক্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

'তাই হয়। যাই হোক, আপনার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে।'

'তা হয়েছে, কিন্তু এই সাফল্যে আমি ব্যথা পাচ্ছি। ভেবে দেখুন ওখানে কি অবস্থা চলছে। কেন তারা ওকে আটকে রেখেছিল?'

'এ সব ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা না ঘামানোই ভাল। তাহলে আমার গাড়িতেই যাচ্ছেন তো?' বাড়ি থেকে বেরুতে বেরুতে অ্যাডভোকেট বলল। অ্যাডভোকেটের ভাড়া করা সুদৃশ্য গাড়িখানা দরজায় এসে দাঁড়াল।

অ্যাডভোকেট কোচয়ানকে গন্তব্যস্থানের কথা বলে দিতে ঘোড়া দুটি অতি দ্রুত নেখ্‌ল্যুদভকে ব্যারণের ভবনে পেঁাছে দিল। ব্যারণ বাড়িতেই ছিল। ইউনিফর্মপরিহিত একটি যুবক কর্মচারি দুটি মহিলাসহ প্রথম ঘরেই বসে ছিল। যুবকটির গলা সরু ও লম্বা, গলার টুটিটা বেশ বড়, হাঁটে খুব ধীরে।

সাবলীল ভঙ্গীতে মহিলাদের কাছ থেকে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে এগিয়ে এসে যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, 'দয়া করে আপনার নামটি বলুন।'

নেখ্‌ল্যুদভ নাম বলল।

'ব্যারণ আপনার কথা বলে রেখেছেন। এক মিনিট,' বলেই একটা ভিতরের দরজা দিয়ে যুবকটি অদৃশ্য হয়ে গেল। শোকের পোষাক পরা একটি ক্রন্দনরতা মহিলাকে নিয়ে সে ফিরে এল। চোখের জল ঢাকবার জন্য মহিলাটি শীর্ণ আঙুল দিয়ে ওড়নাটা মুখের উপর টেনে দেবার চেষ্টা করছে।

লঘু পায়ে পড়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিয়ে যুবকটি নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, 'আসুন।'

ঘরে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভ দেখল, একটা বড় লেখার টেবিলের উল্টো দিকে হাতল-চেয়ারে বসে আছে একটি মাঝারি গড়নের লোক। তার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরণে ফ্রক-কোট, মুখে হাসি।

তার গোলাপ-রাঙা মুখে পাকা চুল, গোঁফ ও দাড়ি স্পষ্টতই চোখে পড়ে। নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ঘুরে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির সঙ্গে সে বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। তোমার মা আমার পরিচিতা ও বান্ধবী ছিলেন। ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছি; পরে অফিসার হিসাবেও দেখেছি। বল তোমার জন্য কি করতে পারি?' নেখ্‌ল্যুদভ ফেদসিয়ার কথা বলতে শুরু করলে সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলে যাও, বলে যাও। আমি ঠিক বুঝতে পারছি। খুবই দুঃখের কথা। তুমি দরখাস্তটা দিয়েছ কি?'

পকেট থেকে দরখাস্তটা বের করে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'দরখাস্ত নিয়েই এসেছি। ব্যাপারটা যাতে বিশেষ মনোযোগ পেতে পারে সেজন্য আপনার সঙ্গে আগে কথা বলে নিলেই সুবিধা হবে বলে আমার মনে হয়েছিল।'

'খুব ভাল করেছ। আমি নিজেই ব্যাপারটা তুলব,' খুশি-ভরা মুখে দুঃখের ভাব ফোটাবার বৃথা চেষ্টা করে ব্যারণ বলল, 'খুবই দুঃখের কথা! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা একেবারেই ছেলেমানুষ। স্বামীর খারাপ ব্যবহারে তার মন খিঁচড়ে যায়; পরে দুজন দুজনকে ভালবাসতে শুরু করে। হ্যাঁ, আমিই ব্যাপারটা তুলব।'

'কাউন্ট আইভান মিখাইলভিচও এ বিষয়ে কথা বলবেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারণের মুখটা বদলে গেল।

সে বলল, 'তুমি বরং আপিসেই দরখাস্তটা জমা দিয়ে যাও; আমি যা করার তা করব।'

সেই সময় যুবক কর্মচারিটি আমার ঘরে ঢুকল।

'সেই মহিলাটি আরও কয়েকটি কথা বলতে চান।'

'বেশ, পাঠিয়ে দাও।...দেখছ তো বাপু, কত না চোখের জল আমাদের দেখতে হয়! সে সব যদি মুছিয়ে দিতে পারতাম। যতটুকু সাধ্যে কুলোয় তাই করি।'

মহিলাটি ঘরে ঢুকল।

'আমি বলতে এলাম, তিনি যেন মেয়েকে ত্যাগ করতে না পারেন কারণ—'

'বলেছি তো আমার যা সাধ্য তা করব।'

'ব্যারণ, ঈশ্বরের দোহাই! একটি মাকে বাঁচান।'

মহিলাটি ব্যারণের হাতখানি চেপে ধরে তাতে চুম্বন করতে লাগল।

'যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।'

মহিলাটি চলে গেলে নেখ্‌ল্যুদভ উঠে দাঁড়াল।

'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব। আগে বিচারবিভাগীয় মন্ত্রিসভায় কথাটা তুলব, তারপর তাদের জবাব এলে আমাদের যা করবার তা করব।'

নেখ্‌ল্যুদভ আপিসে গেল। সেনেট-আপিসের মত এখানেও মস্ত বড় কামরা, ধোপ-দুরস্ত বহু কর্মচারি—পরিচ্ছন্ন, ভদ্র, নিখুঁত, চলনে-বলনে

কেতাদুরস্ত।

'এ রকম আরও কত আছে; এমন পেট-ভরে খাওয়া মানুষ আরও কত আছে। এদের শার্ট, এদের হাত কেমন পরিষ্কার; জুতোগুলো কী সুন্দর পালিশ-করা। কারা করে দেয়? শুধু কয়েদীদের তুলনায়ই নয়, চাষীদের সঙ্গে তুলনায়ও এরা সবাই কত আরামে আছে!' আপনা থেকেই কথাগুলি নেখ্‌ল্যুদভের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

অধ্যায়—১৯

পিতার্সবার্গের কয়েদীদের ভাগ্য নির্ভর করে একজন সুখ্যাত বৃদ্ধ জেনারেলের উপর। লোকটি জার্মান বংশোদ্ভুত একজন ব্যারণ। অনেক সামরিক সম্মানে সে ভূষিত হয়েছে, কিন্তু পরে থাকে মাত্র একটি—অর্ডার অব্‌ দি হোয়াইট ক্রশ। এই সম্মান-নিদর্শনটি তার কাছে খুব মূল্যবান। ককেশাস অঞ্চলে সেনাবাহিনীতে থাকা কালে তারই নির্দেশে চুল-ছাঁটা, ইউনিফর্ম-পরা, বন্দুক ও সঙ্গীনধারী একদল রুশ চাষী সহস্রাধিক লোককে হত্যা করেছিল; তাদের অপরাধ তারা তাদের স্বাধীনতা, তাদের বাড়ি-ঘর ও তাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই যুদ্ধজয়ের পুরস্কারস্বরূপই এই নিদর্শনটি সে পেয়েছিল। তারপর সে গিয়েছিল পোল্যাণ্ডে। সেখানেও তার নির্দেশে রুশ চাষীরা অনেক দুষ্কর্ম করেছে, আর সে লাভ করেছে অনেক সম্মান, অনেক নিদর্শক। আরও অনেক স্থানে সে কাজ করেছে। এখন বুড়ো বয়সে এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ভাল বাড়ি, মোটা আয় ও সম্মান ভোগ করছে। 'উপর থেকে' যে সব নির্দেশ আসে সেগুলি সে কঠোরভাবে পালন করে। সেই সব নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সে অত্যন্ত উৎসাহী; সে মনে করে, পৃথিবীতে আর সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটতে পারে, শুধু 'উপর থেকে' আসা এই সব নির্দেশ অপরিবর্তনীয়। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক বন্দীকে নির্জন কারাবাসে আটক রাখাই তার কাজ। সে কাজ সে এমনভাবে করে যে গত দশ বছরে তাদের অর্ধেকের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে : কেউ পাগল হয়ে গেছে, কেউ যক্ষ্মায় মরেছে, আর কেউবা অনশনে কাঁচের টুকরো দিয়ে শিরা কেটে, ফাঁসিতে ঝুলে অথবা আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছে।

বৃদ্ধ জেনারেল এ সম্পর্কে অনবহিত নয়, তার কারণ তার চোখের সামনেই এ সব ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু এ সব ঘটনা ঝড়, বন্যা প্রভৃতি কারণে আকস্মিক মৃত্যুর চাইতে তার মনকে বেশী নাড়া দেয় না। 'উপর থেকে' মহামান্য সম্রাট যে সব নির্দেশ পাঠান, এ সব তো সেই নির্দেশ পালনেরই ফলশ্রুতি। নির্দেশ পালন তো অবশ্য কর্তব্য, সুতরাং তার পরিণতিতে কি ঘটছে সেটা ভাবা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

বৃদ্ধ জেনারেল সপ্তাহে একদিন সেলগুলি ঘুরে দেখে—এটা তার অন্যতম কর্তব্য—এবং কয়েদীদের কোন প্রার্থনা আছে কিনা জানতে চায়। কয়েদীদের কাছ থেকে হরেক রকম অনুরোধ আসে। দুর্ভেদ্য নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে সে সবই সে শান্তভাবে শোনে, কিন্তু কখনও তার একটিও পূর্ণ করে না, কারণ সে সব অনুরোধই নির্দেশ-বিরোধী।

জেনারেল নেখ্‌লুদভ বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম। তুমি কি অনেকদিন পিতার্সবার্গে এসেছ?'

নেখ্‌লুদভ জানাল, সে সবেমাত্র এসেছে।

'তোমার মা প্রিন্সেস ভাল আছেন?'

'আমার মা মারা গেছেন।'

'ক্ষমা করো; আমি খুব দুঃখিত। আমার ছেলে বলেছে তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল।'

জেনারেলের ছেলে বাবার মতই চাকরিতে বেশ উন্নতি করে চলেছে। এখন সে গোয়েন্দা বিভাগে আছে; সেখানে তার কাজকর্ম নিয়ে সে বেশ গর্ববোধ করে। সরকারী গুপ্তচরদের পরিচালনা করাই তার কাজ।

'দেখ, তোমার বাবা আর আমি একসঙ্গে কাজ করেছি। আমরা ছিলাম বন্ধু—কমরেড। আর তুমি; তুমিও তো চাকরিতেই আছ?'

'না, আমি চাকরিতে নেই।'

জেনারেল অসম্মতিসূচক ভাবে মাথা নীচু করল।

'জেনারেল, আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'খু—ব ভাল কথা। কি ভাবে তোমার কাজে লাগতে পারি?'

'আমার অনুরোধ যদি অসঙ্গত হয়, দয়া করে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে অনুরোধ জানাতে আমি বাধ্য।'

'কি বল?'

'এই দুর্গে গুর্থেভিচ নামে একজন বন্দী আছে। তার মা তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়, অথবা অন্ততপক্ষে তাকে কিছু বই পাঠাবার অনুমতি চায়।'

নেখ্‌লুদভের অনুরোধে জেনারেল সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছুই প্রকাশ করল না, মাথাটা একদিকে কাত করে এমনভাবে চোখ বুজল যেন ব্যাপারটা ভেবে দেখছে। আসলে সে কিছুই ভাবছিল না, নেখ্‌লুদভের অনুরোধের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই নেই, কারণ সে যে আইন মোতাবেকই জবাব দেবে এটা সে ভাল ভাবেই জানে। তাই সে মোটেই কিছু ভাবছিল না, শুধু একটুখানি মানসিক বিশ্রাম নিচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'দেখ, এটা আমার উপর নির্ভর করে না। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে মহামান্য সম্রাটের দ্বারা সমর্থিত একটা আইন আছে; আর

বইয়ের ব্যাপারে ভাল বইয়ের একটা লাইব্রেরি আমাদের আছে ; অনুমোদিত সব বইই তারা পেতে পারে।'

'তা ঠিক। তবে তার বিজ্ঞানের বই দরকার ; সে পড়াশুনা করতে চায়।'

'ও সব কথা বিশ্বাস করো না,' জেনারেল হুংকার দিয়ে উঠেই চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, 'পড়াশুনা করতে চায় না হে ; ওটা হল এক রকম অস্থিরতা।'

'তাহলে কি করা যাবে? কঠোর পরিবেশের মধ্যে তাদের তো সময় কাটাতে হবে,' নেখ্‌লুদভ বলল।

জেনারেল বলল, 'ওদের স্বভাবই অভিযোগ করা। ওদের আমরা চিনি।' তার কথায় মনে হল যেন বিশেষ খারাপ জাতের কোন লোক সম্পর্কে কথা বলছে।'

'এখানে তারা যে সব সুবিধা পেয়ে থাকে আর কোথাও তা মেলে না,' জেনারেল বলল। 'এ কথা ঠিক, এক সময় অবস্থা খারাপ ছিল, কিন্তু এখন তাদের খুব ভাল ভাবে রাখা হয়। তারা তিন পদ খাবার পায়—তার একটা মাংস : কাটলেট অথবা ক্রাই। রবিবারে আর একটা পদ বেশী—মিষ্টি। ঈশ্বর করুন, রাশিয়ার প্রতিটি মানুষ যেন তাদের মত ভালভাবে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে।'

সব বুড়ো মানুষের মতই জেনারেলও একবার কোন বিষয়ে কথা শুরু করলে আর থামতে চায় না।

'ধর্ম-বিষয়ক বই তাদের দেওয়া হয়, পুরনো সাময়িক পত্র দেওয়া হয়। আমাদের একটা লাইব্রেরি আছে। কিন্তু তারা কদাচিত কিছু পড়ে। প্রথম প্রথম কিছুটা আগ্রহ থাকে, কিন্তু পরবর্তী কালে নতুন বইয়ের অর্ধেক পাতাও কাটা হয় না। আর পুরনো বইয়ের তো একটা পাতাও ওল্টানো হয় না। আমরা অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। প্রথম দিকে তাদের মধ্যে চঞ্চলতা থাকে, কিন্তু পরে তারা মুটিয়ে যায় এবং খুব শান্ত হয়ে পড়ে।' জেনারেল এই ভাবে কথা বলে যায়, কিন্তু এ সব কথার অর্থ যে কত সাংঘাতিক ভুলেও তা বুঝতে পারে না।

নেখ্‌লুদভ চুপচাপ সব কথা শুনে গেল। সে জানে, এই বুড়োর কথার জবাব দেওয়া বৃথা। সে শুধু নিজের কাজের কথাটাই আর একবার তুলল। শুস্তভার খালাসের যে হুকুম হয়েছে সে কথা আজ সকালেই শুনেছে। তার কথাই সে জানতে চাইল।

'শুস্তভা—শুস্তভা? এ রকম এত নাম আছে যে সে সব মনেও রাখতে পারি না।' সে ঘণ্টা বাজিয়ে সেক্রেটারিকে ডেকে দিতে বলল। সেক্রেটারি না আসা পর্যন্ত সে এই বলে নেখ্‌লুদভকে সেনাদলে চাকরি নিতে প্ররোচিত করতে লাগল যে, সৎ ও মহৎ লোকদের (তার মধ্যে সে নিজেও একজন)

জারের—এবং দেশের বড় প্রয়োজন।

'আমি আজ বৃদ্ধ হয়েছি, তবু যথাসাধ্য কাজ করে চলেছি।'

সেক্রেটারি ঘরে ঢুকে জানাল, শুস্তভাকে একটা দুর্ভেদ্য জায়গায় আটক রাখা হয়েছে, আর তার সম্পর্কে কোন নির্দেশ সে পায় নি।

'নির্দেশ পেলে সেই দিনই তাকে ছেড়ে দেব। তাকে রাখতে আমরা চাই না; তাদের উপস্থিতিকে খুব মূল্যবান বলেও মনে করি না,' হাল্কা হাসি হাসতে চেষ্টা করে জেনারেল কথাগুলি বলল, কিন্তু তাতে তার বার্ধক্যজীর্ণ মুখটা আরও বিকৃত দেখাল।

নেখ্‌লয়ুদভ উঠে দাঁড়াল।

'বিদায় বাবাজি, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে স্নেহ করি বলেই কথাগুলি বললাম। যে সব লোক এখানে থাকে তাদের সঙ্গে মেলামেশা রেখ না। তারা কেউ নির্দোষ নয়। তারা সব নচ্ছার। আমরা তাদের চিনি।' এমন ভাবে সে কথা বলল যেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'সব চাইতে ভাল কাজ, সৈন্যদলে যোগ দাও; জার চান সৎ লোক—দেশও চায়। ধর, তোমার মত আমরা সবাই যদি সৈন্যদল ছেড়ে চলে আসি, তাহলে কি হবে? কে কাজ করবে? এখানে আমরা দোষ ধরে বেড়াচ্ছি, অথচ সরকারের হয়ে কাজ করতে কেউ চাই না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেখ্‌লয়ুদভ অভিবাদন জানাল, তার দিকে দয়া করে বাড়ানো হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল, তারপর ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

ইজভজচিক গাড়ি ছেড়ে দিল।

বলল, 'স্যার, এখানটা বড়ই গুমোট; আমি ভাবছিলাম আপনার জন্য আর অপেক্ষা না করে গাড়ি নিয়ে চলে যাব।

নেখ্‌লয়ুদভ ঘাড় নাড়ল, 'সত্যি, জায়গাটা গুমোট।' একটা প্রশ্বাস টেনে আমাদের দিকে তাকাল। ধূসর মেঘের দল ভেসে চলেছে। দূরে নেভার বুকে নৌকো ও স্টিমার চলাচলের ফলে নদীর ঢেউগুলি ঝিকমিক করছে। নেখ্‌লয়ুদভের মনে স্বস্তি ফিরে এল।

অধ্যায়—২০

পরদিন সেনেটে মাসলভার মামলার শুনানি হবার কথা। বাড়িটার প্রকাণ্ড ফটকে নেখ্‌লয়ুদভ ও অ্যাডভোকেটের দেখা হল। সেখানে অনেকগুলি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। এখানের গলি-ঘুঁজি ফানারিনের জানা। দোতলার ঝকঝকে প্রকাণ্ড সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাঁয়ে মোড় নিয়ে তারা একটা ঘরে ঢুকল। দরজার উপরে আইন প্রণয়নের তারিখটা উৎকীর্ণ রয়েছে।

চাপরাশি জানাল, সেনেটররা সকলেই হাজির হয়েছে।

সেদিন একটা মিথ্যা অপবাদের মামলারও শুনানীর দিন ছিল। কাজেই আদালতে প্রচুর ভীড় হয়েছে—বিশেষ করে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত বহু লোক জমায়েত হয়েছে।

ঘোষক যথারীতি গম্ভীরভাবে ঘোষণা করল, 'আদালত আসছেন।' সকলেই যথারীতি উঠে দাঁড়াল। ইউনিফর্ম পরিহিত সেনেটরগণ ঘরে ঢুকে উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হল।

চারজন সেনেটর উপস্থিত ছিল—নিকিতিন সভাপতি—দাড়ি-গোঁফ কামানো সরু মুখ, ইস্পাত-নীল চোখ; চাপা-ঠোঁট উল্ফ্, ছোট সাদা হাত দুটি দিয়ে দরকারী কাগজপত্র নাড়তে লাগল; মুখে ব্রুনির দাগ ভরা বিজ্ঞ আইনজ্ঞ স্থূলকায় স্কভরদ্‌নিকভ্; এবং সবশেষআগত মহামান্ত-চেহারার বে।

সেনেটরদের সঙ্গেই ঘরে ঢুকল চিফ্ সেক্রেটারি ও সরকারী উকিল। তার পরনে অদ্ভুত ইউনিফর্ম। আজ ছ' বছর তার সঙ্গে দেখা নেই, তবু এক নজর দেখেই নেখ্‌লয়ুদভ তাকে চিনতে পারল। ছাত্রাবস্থায় সে ছিল নেখ্‌লয়ুদভের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

অ্যাডভোকেটের দিকে ঘুরে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই কি সরকারী উকিল সেলেনিন?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'আমি একে চিনি। খুব ভাল লোক।'

'ভাল উকিলও বটে—কর্মদক্ষ। এর সঙ্গেই আপনার যোগাযোগ করা উচিত।'

সেলেনিনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল তার পবিত্রতা, সততা ও সুশিক্ষা প্রভৃতি সদগুণাবলীর কথা। সে বলল, 'সে নিশ্চয় তার বিবেকানুযায়ী কাজ করবে।'

মামলার প্রতিবেদন শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেদিকে কান রেখে ফানারিন ফিস ফিস করে বলল, 'তা বটে। তাছাড়া, এখন তো দেরীও হয়ে গেছে।'

একটি সংবাদপত্রকে নিয়ে মামলা। একটি লিমিটেড কোম্পানির ডিরেক্টরের জালিয়াতির ব্যাপার ঐ সংবাদপত্রে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই মামলার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, ডিরেক্টরটি সত্যিসত্যি তার উপর ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে কি না, এবং করে থাকলে সে রকম কাজ থেকে তাকে বিরত করা। কিন্তু এখানে আলোচনা শুরু হয়ে গেল, উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের আইনগত অধিকার সম্পাদকের আছে কি না, এবং সেটা প্রকাশ করায় তার প্রকৃত অপরাধ কি—অপবাদ না কুৎসা রটনা—এবং অপবাদ কতদূর পর্যন্ত কুৎসা অথবা কুৎসা কতদূর পর্যন্ত অপবাদ; এককথায় এমন সব কথার কচকচি যা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য।

ঘোষক কানারিনের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোন্ মামলার জন্য এসেছেন?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি: মাসলভার মামলা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। সে মামলার শুনানীও আজই হবে, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'দেখুন, এ ব্যাপারে কোন রকম জেরা হবে ওরা আশা করেন নি। তাই আলোচ্য মামলার রায় ঘোষণা করে ওরা আর বেরিয়ে আসবেন না। তবে আমি তাঁদের বলব।'

"আপনি কি বলছেন?'

"আমি তাঁদের বলব; আমি তাঁদের বলব।' ঘোষক তার নোট-বইতে আবারও কি যেন লিখল।

আসলে সেনেটরদের ইচ্ছা ছিল, কুৎসার মামলার রায় ঘোষণার পরে তারা আর আলোচনা-সভা ছেড়ে উঠবে না; সেখানেই চা ও সিগারেট খেতে খেতে মাসলভার মামলাসহ অন্য মামলার কাজ শেষ করবে।

অধ্যায়—২১

সেনেটরগণ বিতর্ক-সভায় টেবিলের চারধারে সমবেত হওয়া মাত্র উল্ফ্‌, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মামলা খারিজের পক্ষে সব রকম যুক্তি দেখাতে লাগল। যা হোক প্রবল বিতর্ক ও উত্তেজনার মধ্যে শেষ পর্যন্ত আলোচনা শেষ হল। প্রেসিডেন্টের সম্মতিক্রমে আপিল খারিজ করার সিদ্ধান্ত হল। তখন সেনেটরগণ চায়ের হুকুম দিয়ে নানা বিষয়ের আলোচনায় মেতে উঠল।

এমন সময় ঘোষক এসে জানাল, অ্যাডভোকেট ও নেখ্‌ল্যুদভ মাসলভার মামলার সময় উপস্থিত থাকতে চায়।

উল্ফ্‌ বলল, 'মামলাটা বেশ রোম্যান্টিক।' মাসলভার সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের সম্পর্কের কথা যা সে জানত সব খুলে বলল।

এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা সেরে সেনেটররা চা ও সিগারেট পর্ব সমাধা করে সেনেট-কক্ষে ফিরে এল এবং কুৎসার মামলার রায় ঘোষণা করে মাসলভার আপিলের শুনানী শুরু করল।

সরু গলায় উল্ফ্‌ মাসলভার আপিলের একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন রাখল; তার মূল সুরটা দণ্ডাদেশ রহিত করারই পক্ষে।

কানারিনের দিকে ঘুরে চেয়ারম্যান বলল, 'আপনার আর কিছু বলার আছে?'

কানারিন উঠে দাঁড়াল। চওড়া বুকটা ফুলিয়ে একটা একটা করে পয়েন্ট ধরে সে প্রমাণ করতে লাগল যে ছ' ছ'টা পয়েন্টে ফৌজদারি আদালত

আইনের প্রকৃত অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, সুতরাং এ দণ্ডাদেশ চূড়ান্ত অন্যায়েরই নামান্তর। তার সংক্ষিপ্ত অথচ জোড়ালো বক্তৃতার মূল সুর কিন্তু সেনেটরদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা : সেনেটরগণ তাদের তীক্ষ্ন দূরদৃষ্টি ও আইনের জ্ঞানের দ্বারা এ বিষয়ে তার চাইতে ভালই বুঝতে পারবেন; তবু যে তাকে এই বক্তৃতা করতে হচ্ছে তার কারণ যে-কর্তব্য সে গ্রহণ করেছে তাকে পালন তো করতে হবেই।

ফানারিনের বক্তৃতার পরে সহজেই মনে হতে পারে যে সেনেট কর্তৃক আদালতের রায় বাতিল করার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বক্তৃতা শেষ করে ফানারিন জয়ের হাসি হেসে চারদিকে তাকাল। তা দেখে নেখ্‌ল্যুদভও ভাবল যে মামলায় তাদের জয় হবে। কিন্তু সেনেটরদের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল যে সে হাসি ও জয় শুধু ফানারিনের একার। সিনেটরগণ ও সরকারী উকিলের মুখে হাসি নেই, জয়ের আনন্দও নেই। বরং দেখে মনে হল তারা চিন্তিত, যেন ভাবছে, 'তোমার মত লোকের কথা আমরা অনেক শুনেছি—কিন্তু সব বৃথা। ফানারিন যখন বক্তৃতা শেষ করে তাদের অকারণে আটকে রাখার হাত থেকে অব্যাহতি দিল তখন তারা খুশিই হল। অ্যাডভোকেটের বক্তৃতার পরেই প্রেসিডেণ্ট সরকারী উকিলের দিকে তাকাল। দণ্ডাদেশ পুনর্বিবেচনার সপক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলো যথেষ্ট কার্যকরী নয় এই অভিমত ব্যক্ত করে সেলেনিন সংক্ষেপে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় আদালতের রায়কে অপরিবর্তিত রাখার স্বপক্ষে মত দিল। তারপর সেনেটররা আলোচনা-কক্ষে চলে গেল। তাদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিল। উল্‌ফ্‌ আপিল মঞ্জুরের পক্ষে মত দিল। বে উৎসাহের সঙ্গে তাকে সমর্থন করল। নিকিতিন সর্বদাই কঠোরতা ও চিরাচরিত প্রথার সমর্থক। সে ভিন্ন মত ব্যক্ত করল। তখন সব কিছু যখন স্কভরদ্‌নিকভের ভোটের উপর নির্ভরশীল তখন সে আপিল খারিজের সপক্ষে ভোট দিল, আর তার প্রধান কারণ হল, নেখ্‌ল্যুদভ যে নৈতিক কারণে স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করতে দৃঢ়সংকল্প এটা তার কাছে অত্যন্ত ঘৃণাকারজনক বলে মনে হয়েছে।

স্কভরদ্‌নিকভ্‌ একজন বস্তুবাদী ও ডারুইনপন্থী; বিমূর্ত নৈতিকতা এবং তার চাইতেও বেশী ধর্মবোধের যে কোন প্রকাশকেই ঘৃণার্হ নির্বুদ্ধিতা এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে সে মনে করে। সেনেটে একজন খ্যাতনামা অ্যাড-ভোকেট ও নেখ্‌ল্যুদভের উপস্থিতি এবং একটা বেশ্যাকে নিয়ে এই মাতামাতি তার কাছে অসহ্য। সুতরাং আপিলের সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই এই অভিমত গ্রহণ করে সেও প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে একমত হল যে আদালতের রায় অপরি-বর্তিতই থাকবে।

কাজেই দণ্ডাদেশ যথাপূর্ব বহাল রইল।

অধ্যায়—২২

অ্যাডভোকেটের সঙ্গে ওয়েটিং-রুমে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভ বলে উঠল, 'কী ভয়ংকর! যেখানে ব্যাপারটা অত্যন্ত সরল, সেখানেও তারা বাহ্যিক রীতি-টাকেই বড় করে দেখে, কিছুতেই হস্তক্ষেপ করতে চায় না। ভয়ংকর!'

অ্যাডভোকেট বলল, 'ফৌজদারি আদালতই মামলা নষ্ট করে দিয়েছে।'

'আর সেলেনিন, সেও খারিজের পক্ষে মত দিল। ভয়ংকর! ভয়ংকর!' নেখ্‌ল্যুদভ বারবার বলতে লাগল। 'এখন কি করা হবে?'

'আমরা মহামান্য সম্রাটের কাছে আবেদন করব। এখানে থেকে আপনিই হাতে হাতে দরখাস্তটা দিয়ে যাবেন। আমিই লিখে দেব।'

ঠিক সেই সময় তারকাখচিত ইউনিফর্ম-পরিহিত ছোট্ট মানুষ উল্‌ফ্‌ ওয়েটিং-রুমে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গেল। ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ বুঁজে সে বলল, 'প্রিয় প্রিন্স, কিছুই করা গেল না। আপিলের সপক্ষের যুক্তিগুলো মোটেই যথেষ্ট ছিল না।' কথাগুলি বলেই সে চলে গেল।

তার পুরনো বন্ধু নেখ্‌ল্যুদভ এখানে আছে, সেনেটরদের কাছে এ-কথা শুনে সেলেনিনও এল।

'দেখ, তোমাকে এখানে দেখতে পাব আমি আশাই করি নি,' সেলেনিন বলল। তার ঠোঁটে হাসি, কিন্তু চোখ দুটি বিষণ্ণ। 'আমি জানতাম না যে তুমি পিতার্সবার্গে আছ।'

'আর আমিও জানতাম না যে তুমি উপ-ন্যায়াধীশ।''

'সহকারী', সেলেনিন সংশোধন করে দিল। 'কিন্তু তুমি সেনেটে এসেছ কেন?' আমি শুনলাম তুমি পিতার্সবার্গে এসেছ। কিন্তু এখানে কি করছ?'

'এখাছে? আমি এখানে এসেছি কারণ আমি আশা করেছিলাম, ন্যায় বিচার পাব, নির্দোষ হয়েও দণ্ডিত একটি স্ত্রীলোককে বাঁচাতে পারব।'

'কে সে স্ত্রীলোক?'

'এই মাত্র যার মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।'

হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সেলেনিন বলল, 'ওহো। মাসলভা মামলা। আপিলের কোন যুক্তিই যে নেই।'

'আপিলের কথা নয়; স্ত্রীলোকটির কথা; সে নির্দোষ, অথচ তার শাস্তি হচ্ছে।'

সেলেনিন নিঃশ্বাস ছাড়ল।

'তা হতে পারে, কিন্তু—'

'হতে পারে নয়, তাই হচ্ছে—'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমিও জুরিতে ছিলাম। আমি জানি, আমরা কি ভুল করেছিলাম।'

সেলেনিন চিন্তিত হয়ে পড়ল।

বলল, 'সেই সময় তোমার একটা বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল।'

'আমি বিবৃতি দিয়েছিলাম।'

'সেটাকে সরকারী প্রতিবেদকের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। আপিলের দরখাস্তের সঙ্গে যদি সেটা জুড়ে দেওয়া হত—'

সেলেনিন ব্যস্ত মানুষ। বাইরের সমাজে খুব একটা মেশেও না। কাজেই নেখ্‌লুদভের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার কিছুই সে জানে না। সেটা বুঝতে পেরে নেখ্‌লুদভ স্থির করল, মাসলভার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা কিছু না বলাই ভাল।

'তা ঠিক; কিন্তু যে অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তাতেই তো বোঝা যায় যে রায়টা স্ববিরোধী।'

সেলেনিন বলল, 'সে কথা বলবার কোন অধিকার সেনেটের নেই। সেনেট যদি নিজেদের ইচ্ছামত আদালতের রায়কে পাল্টাতে শুরু করে তাহলে জুরিদের রায় অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং সেনেট ন্যায়ের রক্ষক না হয়ে ন্যায়-লংঘনকারী হয়ে উঠবে।'

'আমি শুধু এই বুঝি যে, স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণ নির্দোষ, এবং যে শাস্তি তার প্রাপ্য নয় তার হাত থেকে তাকে বাঁচাবার শেষ আশাও নিঃশেষ হয়ে গেল। উচ্চতম আদালত জঘন্যতম অবিচারকেই সমর্থন করল।'

চোখ মিটমিট করে সেলেনিন বলল, 'এটাই শেষ সিদ্ধান্ত নয়। মামলার ভাল-মন্দের বিচারে সেনেট যেতে পারে না। কখনও যায় না।'

পরক্ষণেই আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টাবার জন্য সেলেনিন বলল, 'তুমি তো তোমার মাসির কাছেই উঠেছ। কাল তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখানে এসেছ; একজন বিদেশী প্রচারকের ভাষণকে উপলক্ষ্য করে তিনি গতকাল সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

সেলেনিন বিষয়ান্তরে চলে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'হ্যাঁ, আমি সেখানে ছিলাম, কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলাম।'

'কেন, বিরক্ত হয়ে কেন? একপেশে এবং সম্প্রদায়গত হলেও সেও তো একটা ধর্মমতেরই অভিব্যক্তি।'

'ও তো এক ধরনের খেয়ালী মূর্খামী।'

'না ভাই, না। আশ্চর্যের বিষয় কি জান, আমাদের গীর্জার শিক্ষাকেই আমরা এত অল্প জানি যে আমাদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসকেই আমরা অনেক সময় নতুন বলে মনে করি।'

নেখ্‌লুদভ সবিস্ময়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেলেনিনের দিকে তাকাল। সেলেনিন চোখ নামাল। তার চোখের দৃষ্টিতে শুধু বিষাদ নয়, অশুভ ইচ্ছারও প্রকাশ।

নেখ্‌লুদভ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি তাহলে গীর্জার মতামতে বিশ্বাস কর?'
নির্জীব দৃষ্টিতে নেখ্‌লুদভের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সেলেনিন জবাব দিল, 'নিশ্চয় করি।'

নেখ্‌লুদভ নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, 'আশ্চর্য!'

সেলেনিন বলল, 'যা হোক, এ বিষয়ে অন্য সময় আলোচনা করা যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার দেখা হবে। কিন্তু তোমাকে কোথায় পাওয়া যাবে? সাতটার ডিনারে তুমি আমাকে সব সময় বাড়িতে পাবে। আমার ঠিকানা নাদেজ্‌-দিন্‌স্কায়া।' সে নম্বরটাও বলে দিল। 'হায় রে, সময় কখনও থেমে থাকে না।' শুধু ঠোঁটের হাসি হেসে সে পা বাড়াল।

'পারলেই যাব', নেখ্‌লুদভ বলল। তার মনে হল, যে মানুষ একদিন তার কত কাছের, কত আপনার ছিল, একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনার ফলেই হঠাৎ সে কত অচেনা, কত দূরের, আর, বিরুদ্ধ না হলেও, কত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

অধ্যায়—২৩

নেখ্‌লুদভ যখন ছাত্র হিসাবে সেলেনিনকে চিনত তখন সে ছিল ছেলে হিসাবে ভাল, বন্ধু হিসাবে বিশ্বস্ত, আর বয়সের তুলনায় বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন একটি শিক্ষিত মানুষ,—রুচিবান, সুদর্শন এবং অস্বাভাবিক রকমের বিশ্বস্ত ও সৎ। সে অত্যধিক পরিশ্রম করত না, পণ্ডিতম্মন্যও ছিল না; কিন্তু পড়াশুনায় বেশ ভালই ছিল; প্রতিটি প্রবন্ধ রচনার জন্যই সে সোনার মেডেল পেত।

শুধু কথায় নয়। কাজেও মানবসেবাকেই সে জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করত। সরকারের চাকরি করা ছাড়া মানবসেবার অন্য কোন পথ তার চোখে পড়ত না। সুতরাং পড়াশুনার পাট চুকিয়ে দেবার পরেই কোন্‌ কাজে জীবন উৎসর্গ করা যায় সে বিষয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে স্থির করল, আইন প্রণয়নকারী চ্যান্সেলারি-র দ্বিতীয় বিভাগই তার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র এবং সরকারী চাকরির সেই বিভাগেই সে যোগদান করল। কিন্তু কঠোর আনুগত্যের সঙ্গে স্বীয় কর্তব্য পালন করা সত্ত্বেও সে কাজ তার মনঃপূত হল না এবং সে যে 'ঠিক কাজটি' করছে এ চেতনা তার মধ্যে জাগল না।

তার অত্যন্ত সংকীর্ণ-মনা গর্বিত ঊর্ধ্বতন কর্মচারির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেওয়ায় এই অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে সে চ্যান্সেলারি ছেড়ে সেনেটে ঢুকল। সেখানে পরিস্থিতি অনেকটা ভাল, কিন্তু সেই একই অসন্তোষ এখানেও তাকে তাড়া করতে লাগল; এই বিভাগটি যে রকম হবে বলে সে আশা করেছিল এবং যে রকমটা হওয়া উচিত, আসলে তার থেকে অত্যন্ত পৃথক বলে তার মনে হল।

যখন সে বিয়ে করল তখনও এই একই মনোভাব তাকে পেয়ে বসল জাগতিক বিচারে একটা খুব ভাল পাত্রী তার জন্য দেখা হল; সেও বিয়ে করল; কিন্তু বিয়ে করার প্রধান কারণ এ বিয়ে না করলে যে তরুণীটি তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক এবং যারা বিয়েটার ব্যবস্থাপক তারা উভয়েই মনে কষ্ট পাবে; তাছাড়া, উচ্চ বংশের একটি সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করতে পারছে বলে সে বেশ গর্ব ও আত্মসুখ অনুভব করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই বিয়েও সরকারী চাকরির মত 'ঠিক কাজটি' নয় বলে তার মনে হতে লাগল।

তাদের প্রথম সন্তানের জন্মের পরে স্ত্রী স্থির করল, আর কোন সন্তান হবে না। সে তখন জাকজমকপূর্ণ যে পার্থিব সুখের জীবন যাপন করতে শুরু করল, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক স্বামীকেও সেই জীবনেরই অংশীদার হতে হল।

ছোট্ট মেয়েটির খালি পা আর সোনালি কোঁকড়া চুল। কিন্তু সে যেন তার আপনজন নয়, কারণ সে যে রকমটা চেয়েছিল তার ঠিক উল্টো রকমে তাকে মানুষ করা হচ্ছিল। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিল এবং তার থেকে শুরু হল নীরব যুদ্ধ, ভদ্রতার আবরণে বাইরের লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে। ফলে তার পারিবারিক জীবন বোঝার মত হয়ে উঠল, এবং সরকারী চাকরির মত এ জীবনটাও তার কাছে 'ঠিক কাজটি' নয় বলে মনে হল।

ধর্মের ব্যাপারেও তার মনে একই ভাব গড়ে উঠল। নানা কারণে যে ধর্মমতকে সে প্রশ্রয় দিল, স্বীয় জীবনে গ্রহণ করল, সেটাও তার কাছে 'ঠিক কাজটি' হয়ে উঠতে পারল না।

তাই এতদিন পরে নেখ্‌লয়ুদভের সঙ্গে দেখা হওয়াতে মনের এই অসন্তোষ যেন নতুন করে তার মধ্যে জেগে উঠল। তার মন আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ল।

ফলে দুজনই পুনরায় দেখা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও দেখা করবার কোন রকম চেষ্টাই কেউ করল না। এবং যতদিন নেখ্‌লয়ুদভ পিতার্সবার্গে থাকল ততদিনের মধ্যে তাদের দুজনের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটল না।

অধ্যায়—২৪

সেনেট থেকে বেরিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ ও অ্যাডভোকেট এক সঙ্গে হাঁটতে লাগল। অ্যাডভোকেটের নির্দেশে তার গাড়ির কোচয়ান গাড়িটা নিয়ে তাদের পিছন পিছন চলল। হাঁটতে হাঁটতে অ্যাডভোকেট পদস্থ কর্মচারি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নানা রকম চুরি, জোচ্চুরি ও নৈতিক অধঃপতনের কাহিনী অনর্গল বলে যেতে লাগল। সে সব কাহিনী ভাল না লাগায়

নেখ্‌লয়ুদভ একখানি ইজভজচিক ভাড়া করে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভের মন খুব খারাপ। সেনেট তার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে; ফলে নির্দোষ মাসলভা যে অর্থহীন যন্ত্রণা ভোগ করছে তার কোন প্রতিকার হল না; শুধু তাই নয়, এর ফলে মাসলভার সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িত করা আরও শক্ত হয়ে পড়ল। সমাজে প্রচলিত অসদাচরণের যে সব ভয়ংকর কাহিনী অ্যাডভোকেটটি বর্ণনা করল এবং একদা মিষ্টি স্বভাবের সরল উদার সেলেনিন আজ যে রকম উদাসীন আচরণ করল, তাতে তার মনোকষ্ট যেন অনেকগুণ বর্ধিত হল।

বাড়ি ফিরলে দরোয়ান তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে কিছুটা ঘৃণার সুরেই জানাল, কে একটি মেয়েছেলে হলে বসে চিঠিটা লিখে রেখে গেছে। লিখেছে শুস্তভার মা। সে লিখেছে, মেয়ের হিতকারক উদ্ধারকর্তাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং ভাসিলয়েভস্কি, ৫ম লাইন,—নম্বর বাড়িতে তাদের সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানাতে সে এসেছিল। ভেরা দুখোভার জন্যই এটা একান্তভাবে প্রয়োজন। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে বিরক্ত করব, এ আশংকা যেন তিনি না করেন। তাদের কৃতজ্ঞতা তারা ভাষায় প্রকাশ করতে চায় না, তাঁকে দেখার আনন্দটুকুই চায়। কাল সকালে কি তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়?

আর একখানা চিঠি এসেছে প্রাক্তণ সহকর্মী বর্তমানে সম্রাটের এ-ডি-কং বোগাত্যর্‌য়ভ-এর কাছ থেকে। সে লিখেছে, ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে লিখিত যে দরখাস্তখানা নেখ্‌লয়ুদভ তাকে দিয়েছে সেখানা সে নিজ হাতেই সম্রাটের হাতে পৌঁছে দেবে; তবে তার মনে হচ্ছে, এই ব্যাপাটা যে-লোকের উপর নির্ভর করছে নেখ্‌লয়ুদভ তার সঙ্গে একবার দেখা করলে ভাল হয়।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল এবং একটি পিওন ঘরে ঢুকে জানাল; কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌না তাকে চা খেতে ডাকছে। কাগজপত্র ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রেখে সে মাসির বসবার ঘরের দিকে চলল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বাড়ির সামনে মারিয়েত-এর ঘোড়া দুটোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সহসা তার মুখ উজ্জল হয়ে হাসি ফুটে উঠল।

মাথায় টুপি পরে কালোর বদলে নানান রঙের একটা হাল্‌কা পোষাকে কাউণ্টেসের আরাম কেদারার পাশে বসে এক কাপ চা হাতে নিয়ে মারিয়েত অনর্গল কথা বলে চলেছে। তার হাসি-হাসি চোখ দুটি চক্‌চক্‌ করছে। নেখ্‌লয়ুদভ যখন ঘরে ঢুকল তখন সে এমন একটা মজার কথা বলছিল যে মাসি হেসে একেবারে লুটোপাটি খাচ্ছিল।

'তুমি আমাকে মেরে ফেলবে', মাসি কাশতে কাশতে বলল।

'কেমন আছ' বলে নেখ্‌লয়ুদভ বসল।

মারিয়েত জানতে চাইলে, তার কাজকর্ম কেমন চলছে। সেনেটে তার

অকৃতকার্যতা ও সেলেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'আহা, কী সরল মানুষ! সে সত্যি a chevalier sans peur et sans reproche (ভয়হীন ও অভিযোগহীন একটি নাইট)! বড়ই সরল!' সেলেনিন সম্পর্কে পিতার্সবার্গের সমাজে প্রচলিত কথাগুলি উচ্চারণ করেই দুটি মহিলা এক সঙ্গে কথা বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'তার স্ত্রী মানুষটি কেমন?'

'তার স্ত্রী? দেখ, সে কথা আমি বলতে চাই না, তবে সে মহিলা ওকে বুঝতে পারে না।'

প্রকৃত সহানুভূতির সঙ্গে মারিয়েত বলল, 'এও কি সম্ভব যে সেও আপিল খারিজের পক্ষে মত দিল?' পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কী ভীষণ কথা। মেয়েটির জন্য আমি দুঃখিত।'

নেখ্‌ল্যুদভের ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। বিষয়ান্তরে যাবার জন্য সে শুস্তভার কথা তুলল। মারিয়েতের চেষ্টায়ই তাকে দুর্গ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতেই মারিয়েত নেখ্‌ল্যুদভকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ওকথা আমাকে আর বলতে হবে না। যখন আমার স্বামী বলল যে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে তখনই আমার মনে হয়েছিল, "সে যদি নির্দোষই হয় তাহলে তাকে এতদিন কারাগারে রাখা হয়েছিল কেন?" বিরক্তিকর—ব্যাপারটা বড়ই বিরক্তিকর।'

মারিয়েত তার বোনপোর সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছে দেখে কাউন্টেস কাতেরিনা আইভানভ্‌নার খুব মজা লাগল। তারা কথা থামালে সে বলল, 'আমি সব বুঝিয়ে দেব। কাল রাতে এলিনের বাড়িতে চল। কীসেওয়েটার সেখানে আসবেন। তুমিও এস মারিয়েত।'

তারপর আবার বোনপোর দিকে ফিরে বলল, 'Il vous a remarque (তিনি তোমাকে লক্ষ্য করেছেন)। তিনি আমাকে বলেছেন, তুমি যা যা বলেছ সেটা খুব ভাল লক্ষণ এবং যীশুর কাছে তোমাকে যেতেই হবে। যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ওকে আসতে বলো মারিয়েত, আর তুমি নিজেও এস।'

নেখ্‌ল্যুদভের দিকে চোখ রেখে মারিয়েত বলল, 'দেখুন কাউন্টেস্‌, প্রথমত, প্রিন্সকে কোন রকম পরামর্শ দেবার অধিকার আমার নেই; দ্বিতীয়তঃ, আপনি তো জানেন, ও সব বাণী-টানী আমি মানি না......'

'তা জানি; সব কাজই তুমি ভুল পথে কর, আর তাও নিজের ধারণা মতই কর।'

মারিয়েত হেসে বলল, 'আমার ধারণা? সে তো একটি সাধারণ চাষীমেয়ের ধারণা। আর তৃতীয়ত, কাল রাতে আমি ফরাসি থিয়েটার যাচ্ছি।'

'ওঃ, তুমি তাহলে দেখেছ—সেই যে কি যেন নামটা তার?'

মারিয়েত একজন বিখ্যাত ফরাসি অভিনেত্রীর নাম করল।

'তুমি অবশ্য যাবে ; অপূর্ব অভিনয় করে।'

নেখ্‌লুয়ুদভ হেসে বলল, 'মাসি গো, কার বাণী আগে শুনব : অভিনেত্রীর, না প্রচারকের ?

'দয়া করে পেঁচিয়ে কথা বল না।'

'আমার তো মনে হয় আগে প্রচারক, পরে অভিনেত্রী, অন্যথায় প্রচারকের বাণী মাঠে মারা যেতে পারে, নেখ্‌লুয়ুদভ বলল।

'না ; বরং ফরাসি থিয়েটার দিয়েই শুরু কর ; প্রায়শ্চিত্ত পরে করলেও চলবে।'

'এই, দেখ, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করো না। প্রচারক প্রচারক, আর থিয়েটার থিয়েটার। উদ্ধারলাভের জন্য কাউকে মুখ বেজাড় করে কাঁদতে হবে না। বিশ্বাস যদি থাকে, আনন্দ আপনা থেকেই আসবে।'

'সত্যি মাসি গো, যে কোন প্রচারকের চাইতে তুমি ভাল প্রচার চালাতে জান।'

মারিয়েত বলল, 'কাল আমার বক্সে এস, আমি তোমাকে বলে দেব।'

'মনে হচ্ছে, আমি যেতে পারব না—'

'পিওন এসে জানাল, একজন দর্শনার্থী এসেছে। একটি মানব-কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি। কাউণ্টেস স্বয়ং সেই সমিতির প্রেসিডেণ্ট।

'আঃ, লোকটা বোকার একশেষ। আমি বরং বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে আসছি। মারিয়েত, ততক্ষণ ওকে একটু চা দাও ; এই কথা বলে কাউণ্টেস দ্রুতপদে ঘর থেকে চলে গেল।

মারিয়েত হাত থেকে দস্তানাটা খুলে ফেলল। তার অনামিকায় অনেকগুলি আংটি।

জলন্ত স্পিরিট-ল্যাম্পের উপর থেকে রূপোর কেত্‌লিটা তুলে বলল, 'একটু চা খাও।'

তার মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর।

নেখ্‌লুয়ুদভ নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল ; তার মুখের উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারল না।

'তুমি ভাব যে তোমাকে এবং তোমার ভিতরে যা চলছে তা আমি বুঝতে পারি না। তুমি কি করে বেড়াচ্ছ তা তো সকলেই জানে। C'est le secret de polichinelle (এটা তো প্রকাশ্য গোপন কথা)। তোমার কাজে আমি খুশি। আমি তোমাকে সমর্থন করি।'

'আসলে কিন্তু খুশি হবার মত কিছু নেই : এখনও পর্যন্ত যৎসামান্যই করতে পেরেছি।'

'তাতে কি যায় আসে। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পারি ; সেই মেয়েটিকেও আমি বুঝি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এ বিষয়ে আর কিছু বলব

না।' তার চোখে-মুখে অসন্তোষ লক্ষ্য করে মারিয়েত বলল। নারীর সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নেখ্‌লুদভের কাছে কোন্ প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ সেটা অনুধাবন করে মারিয়েত আবার বলল, 'তুমি দুঃখিজনকে সাহায্য করতে চাও: অন্যের নিষ্ঠুরতায় ও উদাসীনতায় যারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করছে তাদের তুমি সাহায্য করতে চাও। জীবন বিলিয়ে দেবার বাসনাকে আমি বুঝতে পারি; এরকম মহান কাজে নিজের জীবনও বিলিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু প্রত্যেককেই তো তার ভাগ্য নিয়ে থাকতে হবে।'

'তোমার ভাগ্য নিয়ে কি তুমি সন্তুষ্ট নও?'

এ রকম একটা প্রশ্ন করায় বিস্মিত হয়ে সে বলে উঠল, 'আমি? আমাকে সন্তুষ্ট থাকতেই হবে। আমি সন্তুষ্টই আছি। কিন্তু একটা পোকা মাঝে মাঝে মাথা তোলে——'

নেখ্‌লুদভ ফাঁদে পা দিল। বলল, 'তাকে আবার ঘুমিয়ে পড়তে দিও না। সে কণ্ঠস্বরকে মান্য করতেই হবে।'

পরবর্তীকালে অনেক অনেক বার নেখ্‌লুদভ সে দিকের এই কথাগুলিকে লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করেছে।

কাউন্টেস ফিরে এসে দেখল, তারা দুজন শুধু যে পুরনো কথা বলছে তাই নয়, মনে হচ্ছে নিরাসক্ত এক জনতার মাঝখানে একমাত্র তারা দুই বন্ধুই পরস্পরকে বুঝতে পেরেছে।

ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্ভাগাদের যন্ত্রণা, জনগণের দারিদ্র্য—এই সব বিষয় নিয়েই তারা কথা বলছিল; কিন্তু আসলে তাদের সব কথাকে ছাপিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখে-চোখে শুধু বলছিল, তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পার?' আর জবাব দিচ্ছিল, 'আমি পারি'; আর এমনি করে নানা অপ্রত্যাশিত ও আকর্ষণীয় রূপে যৌন আকর্ষণ তাদের পরস্পরকে কাছে টেনে নিচ্ছিল।

চলে যাবার সময় মারিয়েত জানাল, যে কোন ভাবে সাধ্যমত সে তার সেবা করতে ইচ্ছুক। আরও জানাল, মুহূর্তের জন্য হলেও পরদিন সে যেন থিয়েটারে তার সঙ্গে দেখা করে, কারণ একটি গুরুতর কথা বলবার আছে।

অলংকারখচিত হাতখানা সযত্নে দস্তানা দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'যেয়ো; কে জানে আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?'

নেখ্‌লুদভ কথা দিল।

সেদিন রাতে নিজের ঘরে একাকী শুয়ে পড়ে সে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। কিন্তু ঘুম এল না। মাসলভার কথা, সেনেটের সিদ্ধান্ত, যে কোন অবস্থায় মাসলভার সঙ্গী হবার প্রতিজ্ঞা, সব জমিদারি ত্যাগ, এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সহসা মারিয়েতের মুখখানি ভেসে উঠল। একদৃষ্টিতে

তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে যেন বলছে, 'আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?' তার হাসিটি এতই স্পষ্ট যে সে নিজেও হেসে উঠল, ঠিক যেন তাকে দেখতে পাচ্ছে। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল, 'আমার সাইবেরিয়া যাওয়া কি ঠিক হবে ? আর সব সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে কি ভাল করেছি ?'

পিটার্সবার্গের সেই রাতে জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরের মধ্যে পড়ছিল। সে রাতে এ সব প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পায় নি। সব কিছুই কেমন যেন গোলমেলে। পূর্বেকার মানসিক অবস্থা ও চিন্তাধারা মনে পড়ল, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেকার সেই জোর ও স্বতঃসিদ্ধতা যেন ছিল না।

সে ভাবতে লাগল, 'যদি ধরে নি যে এ সবই আমার কল্পনা, এ পথে চলতে আমি পারব না—যদি ধরে নি যে এ কাজের জন্য আমাকে পরে অনুতাপ করতে হবে, তাহলে ?' এ প্রশ্নের কোন জবাব না পেয়ে অভূতপূর্ব যন্ত্রণায় ও নৈরাশ্যে সে ভেঙে পড়ল। তারপর একসময় সেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল যে-ঘুম সে আগেকার দিনে তাস-খেলায় প্রচণ্ডভাবে হেরে এসে ঘুমোত।

অধ্যায়—২৫

পরদিন ঘুম ভাঙতেই নেখ্‌লুদভের মনে হল, গতকাল সে কিছু অন্যায় করেছে।

সে ভাবতে আরম্ভ করল। অন্যায় কিছু করেছে বলে তার মনে পড়ল না। কোন পাপ কাজ সে করে নি। সে শুধু ভেবেছিল, কাতয়ুশাকে বিয়ে করবার এবং সব জমি বিলিয়ে দেবার যে সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে তা অপ্রাপণীয় স্বপ্নমাত্র; সে জীবনের ভার সে সইতে পারবে না; সে জীবন কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক; তাকে পূর্বেকার জীবনেই ফিরে যেতে হবে।

সে কোন পাপ কাজ করে নি বটে, কিন্তু পাপ কাজের চাইতেও যা খারাপ সেই পাপ চিন্তা সে করেছে: পাপ চিন্তা থেকেই তো পাপ কাজের সূচনা।

পাপ কাজ একবার করে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটালে চলে, তার জন্য অনুশোচনাও করা যায়; কিন্তু পাপ চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় পাপ কাজ।

একটা পাপ কাজ আর একটা পাপ কাজের পথকে মসৃণ করে দেয় মাত্র; পাপ চিন্তা মানুষকে দুর্বার বেগে পাপের পথে টেনে নিয়ে যায়।

পিতার্সবার্গের সেই শেষ দিনটিতে সকালেই সে শুস্তভার সঙ্গে দেখা করতে ভাসিল্যেভস্কি দ্বীপে গেল।

শুস্তভা দোতলায় থাকে। পিছনের সিঁড়িটা দেখিয়ে দেওয়াতে নেখ্‌লুদভ সোজা খাবারের গন্ধে-ভরা গরম রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। গোটানো আস্তিন, এপ্রন ও চশমাপরিহিতা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে কি

যেন নাড়ছিল।

চশমার উপর দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে সে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাই?'

নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দেবার আগেই তার মুখে যুগপৎ আতংক ও আনন্দের আভাষ ফুটে উঠল।

এপ্রনে হাত মুছতে মুছতে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, প্রিন্স! আপনি পিছনের দরজা দিয়ে কেন এসেছেন? আপনি আমাদের পরম উপকারী। আমি তার মা। আমার মেয়েটিকে তারা প্রায় মেরে ফেলেছিল। আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন।' নেখ্‌ল্যুদভের হাতখানি ধরে চুম্বনের চেষ্টা করে সে বলল, 'গতকাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার বোনই যেতে বলেছিল। সেও এখানে আছে। এই দিকে, দয়া করে এই দিকে আসুন।' মাথার চুলটা ঠিক করে নিয়ে স্কার্টটা উঁচু করে ধরে সরু দরজাটা পেরিয়ে একটা অন্ধকার দালানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে শুস্তভার মা কথাগুলি বলল। 'আমার বোনের নাম কর্নিলভা। তার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন।' একটা বন্ধ দরজার কাছে থেমে চুপি চুপি সে বলল, 'একটা রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িয়ে পড়েছিল। খুব চতুর মেয়ে।'

শুস্তভার মা দরজা খুলে নেখ্‌ল্যুদভকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। সোফার উপরে একটি ছোটখাট হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে বসেছিল। তার গোল বিবর্ণ মুখকে ঘিরে সুন্দর কোঁকড়া চুলের রাশি। পরণে ডোরা-কাটা সুতীর ব্লাউস। মুখখানি ঠিক তার মায়ের মত।

তার উল্টো দিকে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে একটি যুবক বসেছিল। তার মুখে ঈষৎ কালো দাড়ি ও গোঁফ; পরনে কাজ-করা রুশ শার্ট। তারা দুজন আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল যে নেখ্‌ল্যুদভ ঘরের মধ্যে ঢুকলে তবে তারা মুখ তুলে তাকাল।

মা বলল, 'লিডিয়া, প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভ! সেই তিনি……।'

বিবর্ণ মেয়েটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একগুচ্ছ চুল কানের পাশে গুঁজতে গুঁজতে বড় বড় চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে নবাগতের দিকে তাকিয়ে রইল।

নেখ্‌ল্যুদভ হেসে বলল, 'ভেরা দুখোভা যার জন্য আমাকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছিল তুমিই তাহলে সেই ভয়ংকর মেয়েটি?'

'হ্যাঁ, আমি।' শুস্তভার শিশুসুলভ হাসিতে সুন্দর দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ল। 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে মাসির খুব আগ্রহ। মাসি!' শান্ত, নরম গলায় সে ডাক দিল।

'তুমি বন্দী হওয়ায় ভেরা দুখোভা খুবই দুঃখ পেয়েছিল', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

যে যুবকটি আরাম-কেদারায় বসে ছিল সে এবার উঠে দাঁড়াল। সেই ভাঙা

কেদারাটা দেখিয়ে লিডিয়া বলল, 'এখানে বসুন, না বরং এখানে বসুন।'

নেখ্‌লুদভ যুবকটির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে বলল, 'আমার জাতি-ভাই আখায়ভ।'

লিডিয়ার মত সদয় হাসির সঙ্গেই যুবকটি নবাগতকে অভিবাদন জানাল। নেখ্‌লুদভ আসন গ্রহণ করলে আর একখানা চেয়ার নিয়ে এসে সে তার পাশেই বসল। বছর ষোল বয়সের একটি স্কুলের ছেলেও ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে জানালার গোবরাটে বসল।

শুস্তভা বলল, 'ভেরা দুখোভা আমার মাসির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কিন্তু আমি তাকে প্রায় চিনিই না।'

পাশের ঘর থেকে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। মুখখানি ভারি সুন্দর। পরণে সাদা ব্লাউজ ও চামড়ার বেল্ট।

সোফায় লিডিয়ার পাশে বসেই সে বলল, 'কেমন আছেন? আপনি যে এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। তারপর, ভেরা কেমন আছে? তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে কি? নিজের ভাগ্যকে সে কি ভাবে নিয়েছে?'

নেখ্‌লুদভ জবাব দিল, 'সে কোন অভিযোগ করে নি; বরং বলেছে, সে স্বর্গীয় সুখে আছে।'

মাথা নেড়ে হেসে মাসি বলল, 'এই তো ভেরার উপযুক্ত কথা। আমি তাকে চিনি। তাকে চিনতে হয়। দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। সব কিছুই পরের জন্য, নিজের জন্য কিছুই নয়।'

'না, নিজের জন্য সে কিছুই চায় নি; আপনার বোন-ঝিকে নিয়েই তার যত ভাবনা। সে বলেছে, আপনার বোন-ঝি যে বিনা কারণে গ্রেপ্তার হয়েছে সেটাই তার কাছে বেশী দুঃখের কারণ।'

মাসি বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। খুবই ভয়ানক ব্যাপার। আমার জন্যই সে কষ্ট পেয়েছে।'

'মোটেই তা নয় মাসি; কাগজগুলো তো আমাকে নিতেই হত।'

মাসি বলল, 'সব কথা আমাকে ভালভাবে জানতে দাও। দেখুন, ঐ সব ঘটনার কারণ হল, একজন কেউ তার কাগজপত্রগুলি কিছু সময়ের জন্য আমাকে রাখতে দিয়েছিল। সে সময় আমার কোন আস্তানা না থাকায় ওর কাছে রেখে দিয়েছিলাম। সেই রাতেই পুলিশ ওর ঘরে তল্লাসি চালিয়ে ওকে কাগজ-পত্র শুদ্ধু ধরে নিয়ে যায় এবং সেগুলো ও কার কাছ থেকে পেয়েছে সেটা জানবার জন্য এতদিন ওকে আটক করে রাখে।'

অকারণেই একগুচ্ছ চুল ঠিক করতে করতে লিডিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিন্তু আমি তাদের কিছু বলি নি।'

মাসি বলল, 'তুমি কিছু বলে দিয়েছ এ কথা তো আমি কখনও বলি নি।'

অস্বস্তিকরভাবে চারদিকে তাকিয়ে আরক্ত মুখে লিডিয়া বলল, 'তারা

যদি মিতিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, সেজন্য আমি দায়ী নই।'

মা বলে উঠল, 'ও সব কথা থাক লিডিয়া।'

'কেন থাকবে? সব কথা আমি বলতে চাই', লিডিয়া বলল। এখন তার মুখে হাসি নেই, বরং আরও লাল হয়ে উঠেছে।

'গতকাল এ সব কথা বলবার সময় কি হয়েছিল সেটা ভুলে যেয়ো না।'

'মোটেই ভুলি নি—আমাকে রেহাই দাও মা।. আমি তো কিছুই বলি নি, চুপ করেই তো ছিলাম। মিতিন ও মাসির ব্যাপারে সে যখন আমাকে জেরা করছিল তখন আমি কিছুই বলি নি; শুধু বলেছিলাম, তার কোন কথার জবাব আমি দেব না। তখন এই···পেত্রভ্—'

বোন-ঝির কথাগুলি নেখ্‌লুদভকে বোঝাবার জন্য মাসি বলল, 'পেত্রভ্ একটি গুপ্তচর, একটি সৈনিক, নীচ লোক।'

উত্তেজনার বশে লিডিয়া দ্রুত বলতে লাগল, 'তখন সে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। বলল, "তুমি আমাকে যাই বল না কেন তাতে কারও ক্ষতি হবে না; বরং সব কথা যদি বল তাহলে যে সব নির্দোষ লোককে হয় তো আমরা বৃথাই যন্ত্রণা দিতাম তাদের আমরা ছেড়ে দিতে পারব।" দেখুন, আমি তখনও বলেছি, কিছুই বলব না। তখন সে বলল, "ঠিক আছে, বলো না, কিন্তু আমি যা বলব তা অস্বীকার করো না।" এবং সে মিতিনের নাম করল।'

'ও সব কথা বলো না', মাসি বলল।

'আঃ মাসি, বাধা দিও না।···আর ভাবুন, পরদিনই আমি শুনলাম—দেয়ালে টোকা মেরে তারাই আমাকে জানিয়ে গেল—যে মিতিন গ্রেপ্তার হয়েছে। দেখুন, আমি মনে করি আমি তাকে ধরিয়ে দিয়েছি, আর এই চিন্তাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে—এত কষ্ট দিচ্ছে যে আমি প্রায় পাগল হতে চলেছি।'

মাসি বলল, 'কিন্তু আমরা তো জানতে পেরেছি যে তোমার জন্য সে গ্রেপ্তার হয় নি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তা জানতাম না। "আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েছি।" ঘরময় হাঁটি আর ভাবি, "আমি তাকে ধরিয়ে দিয়েছি।" চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেও শুনতে পাই কানের কাছে কে যেন চুপি চুপি বলছে, 'ধরিয়ে দিয়েছ! মিতিনকে ধরিয়ে দিয়েছ! মিতিনকে ধরিয়ে দিয়েছ!' আমি জানি, এটা দিবাস্বপ্ন মাত্র, কিন্তু না শুনে পারি না। ঘুমোতে চাই, তাও পারি না। এ সব ভাবতে চাই না। কিন্তু না ভেবে পারি না। কী ভয়ংকর অবস্থা!' যত কথা বলে লিডিয়া ততই উত্তেজিত হয়ে ওঠে; আঙুলে চুলের গুচ্ছ জড়ায় আর খোলে, আর চারদিকে তাকায়।

তার কাঁধে হাত রেখে মা বলল, 'লিডিয়া, মা, শান্ত হও।'

কিন্তু শান্ততা তাকে থামাতে পারল না।

'ব্যাপারটা আরও ভয়ংকর কারণ···' কথা শেষ না করেই লিডিয়া চীৎকার করে লাফিয়ে উঠে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

তার মাও পিছনে পিছনে গেল।

'ওদের ফাঁসি দেওয়া উচিত, বদমায়েসের দল!' স্কুলের ছেলেটি বলে উঠল।

'ও আবার কি?' মা বলল।

'আমি শুধু বলছিলাম···না, সে কিছু না,' বলে স্কুলের ছেলেটি টেবিলের উপরে থেকে সিগারেটটা নিয়ে টানতে লাগল।

অধ্যায়—২৬

একটা সিগারেট ধরিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে মাসি বলল, 'সত্যি, নির্জন বন্দীজীবন ছোটদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর।'

'আমি বলব, সকলের পক্ষেই কষ্টকর', নেখ্‌লুদভ বলল।

'না, সকলের পক্ষে নয়,' মাসি বলল। 'আমি শুনেছি, আসল বিপ্লবীদের কাছে ওটা বিশ্রাম ও শান্তি। পুলিশ যার পিছু নেয় তাকে সব সময় দুশ্চিন্তা ও নানা রকমের অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাতে হয়; তার ভয় নিজের জন্য, অপরের জন্য এবং তার আদর্শের জন্য। শেষ পর্যন্ত সে যখন ধরা পড়ে তখন তো সব শেষ; তার ঘাড় থেকে সব দায়-দায়িত্ব নেমে যায়; ঠেশান দিয়ে বসে সে তখন বিশ্রাম নিতে পারে। শুনেছি, গ্রেপ্তার হলেই তারা খুশি হয়। কিন্তু যাদের বয়স অল্প, যারা নির্দোষ—তারা সব সময়ই প্রথমে লিডিয়ার মত নিরপরাধদেরই গ্রেপ্তার করে থাকে—তাদের কাছে প্রথম ধাক্কাটা খুবই সাংঘাতিক। চলা-ফেরার স্বাধীনতা থাকে না, বা খারাপ খাবার খেয়েও খারাপ বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে হয়—সে সব কিছুই না। ওর তিনগুণ কষ্ট তারা অনায়াসেই সহ্য করতে পারে; কিন্তু প্রথম গ্রেপ্তার হওয়ার নৈতিক আঘাতটাই ভয়ংকর।'

'আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আছে নাকি?'

'আমি? আমি দু'বার কারাগারে গিয়েছি,' বিষণ্ণ হাসি হেসে মাসি জবাব দিল। 'প্রথমবার যখন গ্রেপ্তার হই তখন আমি কিছুই করি নি। আমার বয়স তখন বাইশ বছর, একটি সন্তান হয়েছে, আরও একটির আসবার সময় হয়ে এসেছে। চলা-ফেরার স্বাধীনতা হারানো এবং স্বামী-সন্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খুবই কষ্টের সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন দেখতে পেলাম যে আমি আর মানুষ নেই, একটি বস্তুকে পরিণত হয়েছি, তখনকার অনুভূতির সঙ্গে তুলনায় সে সব তো কিছুই না। ছোট মেয়েটির কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে তুলে দেওয়া হল একটা ইস্তভজচিকের

খাঁচায়। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জবাব এল, সেখানে গেলেই জানতে পারব। আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানতে চাইলাম, কোন জবাব পেলাম না। আমাকে পরীক্ষা করা হল, আমার পোষাক খুলে কারাগারের নম্বরী জামা পরানো হল, আমাকে একটা গুদাম-ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তখন আমি একেবারে একা। শুধু একটি শান্ত্রী গুলি-ভরা রাইফেল কাঁধে নিয়ে আমার দরজার সামনে এদিক-ওদিক চলতে চলতে একটা ফোকড়ের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে লাগল। এই সব দেখে-শুনে আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। জনৈক সৈনিক-অফিসার আমাকে জেরা করবার পর যখন একটা সিগারেট আমাকে দিল তখনই আমি সব চাইতে বেশী অবাক হলাম। তাহলে সে তো জানে যে, মানুষ ধূমপান করতে ভালবাসে; তাহলে সে তো এটাও নিশ্চয় জানে যে, মানুষ স্বাধীনতা ও আলো ভালবাসে, মা সন্তানকে ভালবাসে, সন্তান মাকে ভালবাসে। তাহলে যা কিছু আমার প্রিয় তাদের কাছ থেকে এমন নির্মমভাবে ছিনিয়ে এনে একটা বন্য পশুর মত তারা আমাকে কারাগারে বন্দী করে রাখল কেমন করে? এ সবের ফল কখনও ভাল হয় না। ঈশ্বরে ও মানুষে যাদের বিশ্বাস আছে, যারা বিশ্বাস করে যে মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে, এ সমস্ত অভিজ্ঞতার পরে তাদের সে বিশ্বাস চলে যায়। তখন থেকেই আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস হারিয়েছি, জীবন আমার কাছে তিক্ত হয়ে উঠেছে,' ম্লান হেসে সে কথা শেষ করল।

লিডিয়ার মা ঘরে ঢুকে জানাল, সে খুবই মুসড়ে পড়েছে, তাই আর আসতে পারবে না।

মাসি বলল, 'এই তরুণ জীবনটি নষ্ট হয়ে গেল কিসের জন্য? আমিই এর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী, এই চিন্তাই আমার কাছে বিশেষভাবে বেদনাদায়ক।'

মা বলল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় গ্রামে ফিরে গেলে সে ভাল হয়ে যাবে। ওর বাবার কাছে ওকে পাঠিয়ে দেব।'

মাসি বলল, 'আপনি না থাকলে ও একেবারেই শেষ হয়ে যেত। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু যে জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম সেটা এই: ভেরা দুখোভার কাছে একখানা চিঠি পৌঁছে দিতে আপনাকে অনুরোধ করব।' পকেট থেকে সে একখানা চিঠি বের করল। 'চিঠিটা সিল করা নয়; আপনি এটা পড়তে পারেন, ছিঁড়তে পারেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এর মধ্যে আপত্তিকর কিছুই নেই।'

নেখ্‌লুয়্দভ চিঠিটা নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে বলে কথা দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চিঠিটি না পড়েই সেটাকে সে সিল করল; যথাস্থানেই চিঠিটা সে পৌঁছে দেবে।

অধ্যায়—২৭

পিতার্সবার্গে নেখ্‌লয়ুদভের শেষ কাজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের আবেদন। প্রাক্তণ সহকর্মী এ-ডি-কং বগাতিরভ-এর মারফৎ দরখাস্তখানা জারের হাতে পৌছে দেবার ইচ্ছা তার ছিল। সকলে বগাতিরভ-এর ভবনে পৌছে দেখল, বাইরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে প্রাতরাশে বসেছে। লোকটি দীর্ঘকায় না হলেও বেশ শক্ত-সমর্থ এবং অমিত বলশালী (ঘোড়ার নালও সে বাঁকাতে পারে) ; সে দয়ালু, সৎ, সরল ও উদার। এ সব গুণ সত্বেও সে কিন্তু দরবারে বেশ ঘনিষ্ঠ এবং জার ও তার পরিবারের প্রিয়। সেই উঁচু মহলে চলাফেরা করেও আশ্চর্য কোন উপায়ে সে সেখানে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু দেখে না এবং সেখানকার পাপ ও দুর্নীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে না। কখনও সে কোন ব্যক্তিকে বা কোন ব্যবস্থাকে নিন্দা করে না—সর্বদাই হয় চুপচাপ থাকে, আর না হয় তো অট্ট হাসি হাসতে হাসতে উচ্চ বলিষ্ঠ কণ্ঠে তার বক্তব্যকে প্রকাশ করে। কোন কূটনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সে এ রকম করে না, আসলে এটাই তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

'আরে, খুব ভাল হয়েছে যে তুমি এসেছ। কিছু খাবে না কি ? বস, বস, শিক-কাবাবটা চমৎকার হয়েছে! আমি সব সময়ই ভাল কিছু দিয়ে শুরু করি—শুরু করি এবং শেষও করি। হাঃ! হাঃ! হাঃ! তাহলে একপাত্র টেনে নাও,' ক্লারেটপূর্ণ একটি কাঁচের পাত্র দেখিয়ে সে সোচ্চারে বলে উঠল। 'তোমার কথাই ভাবছিলাম। দরখাস্তটা আমিই নিয়ে যাব ; তাঁর নিজের হাতে দিয়ে দেব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার ; তবে আমার মনে হয়েছিল যে, তুমি যদি একবার তপরভ-এর সঙ্গে দেখা করতে তাহলে ভাল হত।'

তপরভ-এর কথা বলায় নেখ্‌লয়ুদভ বিকৃত মুখভঙ্গি করল।

'তার উপরেই ব্যাপারটা নির্ভর করছে। তার সঙ্গে নিশ্চয় পরামর্শও করা হবে। হয় তো সে নিজেও তোমার কাজটা করে দিতে পারে।'

'তুমি যদি বল তাহলে যাব।'

'ঠিক আছে। তারপর, পিতার্সবার্গ কেমন লাগছে ? বগাতিরভ চেঁচিয়ে বলল। 'আরে, বলেই ফেল না।'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'আমি তো মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।'

'মোহাচ্ছন্ন!' উচ্চকণ্ঠে হেসে বগাতিরভ কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। 'তুমি তাহলে কিছুই খাবে না ? বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছা।' তোয়ালে দিয়ে গোঁফটা মুছে নিয়ে সে বলল, 'তাহলে তুমি যাচ্ছ ? কি বল ? তিনি যদি কিছু না করেন, তাহলে দরখাস্তটা আমাকে দিও, কাল আমি হাতে হাতে দিয়ে দেব।' কথা বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়াল এবং যে রকম অন্যমনস্ক ভাবে গোঁফটা মুছেছিল সেই একই ভাবে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে তরবারিটা বাঁধতে শুরু করল।

'তাহলে বিদায় ; আমাকে যেতে দাও।'

'চল, দুজনই যাচ্ছি,' বগাতিরভ-এর শক্ত, চওড়া হাতখানিতে ঝাঁকুনি দিয়ে সে দ্বারপথেই তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

'কোন ফল হবে না জেনেও বগাতিরভ-এর পরামর্শমত সে তপরভ-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

অভ্যর্থনা-কক্ষে যে কর্মচারিটি বসেছিল সে নেখ্‌লয়ুদভের দরকারের কথা শুনে জানতে চাইল, দরখাস্তখানা একবার পড়তে দিতে তার কোন আপত্তি আছে কি না। নেখ্‌লয়ুদভ সেখানা তার হাতে দিলে সে আপিসে ঢুকে গেল। নেখ্‌লয়ুদভ বাইরেই রইল। দরখাস্তটা পড়তে পড়তে তপরভ মাথা নাড়তে লাগল। দরখাস্তের সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ শব্দযোজনায় সে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হল।

পড়তে পড়তে সে ভাবল, 'এটা যদি সম্রাটের হাতে পড়ে তাহলে অনেক ভুল-বোঝাবুঝি ও অস্বস্তি দেখা দিতে পারে।' দরখাস্তটা টেবিলে রেখে সে ঘণ্টা বাজিয়ে নেখ্‌লয়ুদভকে ডেকে পাঠাল।

এই ধর্ম-সম্প্রদায়ের ব্যাপারটা তার মনে পড়েছে ; তাদের কাছ থেকেই একটা দরখাস্ত সে আগেও পেয়েছে। ব্যাপারটা এই। গোঁড়া গ্রীক গীর্জা থেকে বিতাড়িত হবার পরে প্রথমে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় এবং বিচারে তারা খালাস পায়। তখন বিশপ ও গভর্ণর একত্র মিলে তাদের বিবাহ আইনত অসিদ্ধ এই ওজুহাতে উক্ত সম্প্রদায়ভূক্ত লোকগুলিকে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করে। সেই সব পিতা ও পত্নীরা আবেদন করে যে তাদের বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়। তপরভ-এর মনে পড়ল, বিষয়টা তার দৃষ্টিগোচরে আনা হলে ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়ে ফেলবে কিনা এ বিষয়ে সে ইতস্তত করেছিল। কিন্তু পরে তার মনে হয়েছিল যে, উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ভূক্ত পরিবারগুলির লোকজনদের আলাদা আলাদা করে নির্বাসন দণ্ড দিলে তাতে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ঐ সব চাষী পরিবারকে যদি স্বস্থানে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে সেখানকার অন্য অধিবাসীদের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে এবং তার গোঁড়া গীর্জা থেকে সরে যেতে হতে পারে। তারপর তখন জানা গেল যে এ ব্যাপারে বিশপের যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে, তখন সে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু এখন যেহেতু নেখ্‌লয়ুদভের মত একজন অ্যাডভোকেট তাদের পক্ষে রয়েছে এবং পিতার্সবার্গে তার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও আছে, হয়তো একটা নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত হিসাবে বিষয়টা সম্রাটের কানে তোলা হতে পারে, বা বিদেশী সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তপরভ একটি অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল।

'কেমন আছেন?' পাশে দাঁড়ান নেখ্‌লয়ুদভকে এই কথা বলে অভ্যর্থনা জানিয়েই সে সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল।

দরখাস্তটা হাতে নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা আমার জানা। নামগুলো দেখেই এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটা আমার মনে পড়েছে। নতুন করে সেটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আপনার কাছে আমি ঋণী। এটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অতি-উৎসাহেরই ফল।'

সম্মুখের একটি অবিচল বিবর্ণ মুখোশ নামক মুখের দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

এই সব ব্যবস্থা রদ করে লোকগুলি যাতে স্ব স্ব বাড়িতে বসবাস করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ আমি পাঠিয়ে দেব।'

'তার মানে এই দরখাস্তের কোন দরকার নেই?'

'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি,' তপরভ কথাটা বলবার সময় 'আমি'-র উপর এমন ভাবে জোর দিল যাতে মনে হয় যে, তার সততা, তার কথাই সব চাইতে বড় ভরসাস্থল। 'সব চাইতে ভাল, এখনই আদেশটা লিখে দেওয়া। আপনি দয়া করে বসুন।'

টেবিলের কাছে গিয়ে সে লিখতে শুরু করল। নেখ্‌লয়ুদভ না বসে তার টাক মাথা ও তার নীল শিরা বের-করা মোটা হাতের দ্রুতচালিত কলমের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগল, এই অনুভূতিবিহীন মানুষটি এ কাজ কেন করছে, আর এত যত্নসহকারেই বা কেন করছে।

খামটা সিল করে তপরভ বলল, 'এই দেখুন, লিখে দিলাম। আপনাদের মক্কেলদের জানিয়ে দিতে পারেন।' একটা হাসির আভাষ ফোটাবার জন্য সে ঠোঁট দুটোকে প্রসারিত করল।

খামটা হাতে নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল, 'এই লোকগুলি তাহলে এতদিন কষ্ট পেল কেন?'

তপরভ মাথাটা তুলে হাসল, যেন প্রশ্নটা তাকে খুশি করেছে।

'সে কথা আপনাকে বলতে পারি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, জনগণের স্বার্থ আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর সে দিক থেকে ধর্মের ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ ততটা বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর সম্প্রতিকালের ব্যাপক উদাসীনতা—'

'কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে ধর্মের নামে ন্যায়পরায়ণতার প্রথম দাবীকেই লংঘণ করা হল—পরিবারগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা হল?'

তপরভ বলল, 'একজন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই রকমই মনে হতে পারে বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য ভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। যাই হোক, আমাদের কাজ এখানেই শেষ হল।' তপরভ মাথা নুইয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

নেখ্‌লয়ুদভ নীরবে হাতখানা চেপে ধরে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। হাতটা ধরবার জন্য তার অনুশোচনা হল।

যেতে যেতে সে ভাবল, 'জনগণের স্বার্থে! অর্থাৎ তোমাদের স্বার্থে!'

অধ্যায়—২৮

নেখ্‌লুয়ুদভ হয় তো সেদিন সন্ধ্যায়ই পিতার্সবার্গ থেকে চলে যেত, কিন্তু মারিয়েতকে সে কথা দিয়েছে, থিয়েটারে তার সঙ্গে দেখা করবে; যদিও সে জানত যে সে-কথা রাখা তার পক্ষে উচিত নয়, তবু সে নিজেকে মিথ্যা করে বোঝাল যে, কথা দিয়ে সে কথা না রাখাটা অন্যায়।

নিজেকে সে প্রশ্ন করল, 'এই সব প্রলোভনকে জয় করবার শক্তি কি আমার আছে? এই শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখতে হবে।'

সান্ধ্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে সে যখন থিয়েটারে পৌছল তখন চিরন্তন নাটক Dame aux Came'lias-এর দ্বিতীয় অংক চলছে: একটি বিদেশিনী অভিনেত্রী জনৈকা যক্ষ্মারোগগ্রস্তা নারীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করছে।

থিয়েটার দর্শকে পূর্ণ। নেখ্‌লুয়ুদভ জিজ্ঞাসা করবার সঙ্গে সঙ্গেই সসম্মানে মারিয়েতের বক্সটা তাকে দেখিয়ে দেওয়া হল।

উর্দিপরা একজন ভৃত্য বাইরে করিডরে দাঁড়িয়েছিল, পরিচিতজনের মত নেখ্‌লুয়ুদভকে অভিবাদন করে সে বক্সের দরজা খুলে দিল।

'বিপরীত দিকের বক্সে যারা বসে বা দাঁড়িয়েছিল, আশেপাশে যারা বসে ছিল বা গ্যালারির নীচের আসনগুলিতে যারা ছিল—কাঁচা, পাকা, কোঁকড়া-চুল বা টাক মাথা—সকলেই অভিভূত হয়ে অভিনয় দেখছিল: কৃশকায়া, হাড়-বের করা অভিনেত্রীটি রেশম ও লেসের পোষাক পরে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে।

দরজাটা খুলতেই কে যেন বলে উঠল, 'আস্তে!' আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা ও একটা গরম বাতাস নেখ্‌লুয়ুদভের মুখে এসে লাগল।

বক্সে চারজন বসে ছিল: মারিয়েত, লাল টুপি ও ভারী পোষাক পরা একটি মহিলা, মারিয়েতের স্বামী এবং মস্ত বড় গোঁফের ফাঁকে একটুখানি কামানো চিবুকওয়ালা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক।

অভিনেত্রীটির একক সংলাপ শেষ হতেই করতালিধ্বনিতে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত হয়ে উঠল। মারিয়েত আসন থেকে উঠে বক্সের পিছনে গিয়ে তার স্বামীর সঙ্গে নেখ্‌লুয়ুদভকে পরিচয় করিয়ে দিল।

জেনারেল বলল, সে খুব খুশি হয়েছে; কিন্তু তারপরেই অজ্ঞাত কারণে একেবারে চুপ করে গেল।

নেখ্‌লুয়ুদভ মারিয়েতকে বলল, 'তোমাকে কথা না দিলে আমি আজই চলে যেতাম।'

তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে জবাবে মারিয়েত বলল, 'আমাকে দেখবার

ইচ্ছা না থাকলেও একটি অপূর্ব অভিনেত্রীকে তুমি দেখতে পাবে।' তারপর স্বামীর দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল, 'আগের দৃশ্যটাতে কী অদ্ভুত অভিনয় করল না?'

স্বামী মাথা নাড়ল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, 'এ সব আমাকে স্পর্শ করে না। আজই সত্যিকারের যন্ত্রণা এত বেশী দেখেছি যে—'

'ঠিক আছে, এখানে বসে তাই আমাকে বল।'

স্বামীটিও সব কথা শুনছে। তার চোখের হাসিতে ক্রমেই বেশী করে ব্যঙ্গের আভাস ফুটে উঠছে।

'একটি মেয়েকে দেখে এলাম; এতদিন কারাগারে রেখে সম্প্রতি তাকে ছেড়ে দিয়েছে। মেয়েটি একেবারেই ভেঙে পড়েছে।'

মারিয়েত স্বামীকে বলল, 'এই মেয়েটির কথাই তোমাকে বলেছিলাম।'

'ওঃ, আচ্ছা, তাকে ছেড়ে দেওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি। বাইরে গিয়ে একটু ধূমপান করে আসছি।'

মারিয়েত তাকে কি বলতে চায় শুনবার জন্য নেখ্‌লুয়ুদভ অপেক্ষা করে রইল। সে কিন্তু কিছুই বলল না, বলবার চেষ্টাও করল না। অভিনয়ের কথা নিয়েই হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

অবশেষে নেখ্‌লুয়ুদভ বুঝতে পারল, তার বলবার কিছুই নেই, সে শুধু তাকে দেখাতে চায় তার জাঁকজমক—তার সাজ-পোষাক, তার ঘাড়, তার তিল-চিহ্ন। এ সব নেখ্‌লুয়ুদভের মনকে টানে, আবার তাকে বিরক্তও করে। উঠে পড়বার জন্য বার কয়েক সে টুপিটা হাতেও নিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার স্বামী যখন তার ঘন গোঁফের ভিতর দিয়ে তামাকের কড়া গন্ধ ছড়িয়ে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে এমন অবজ্ঞাভরে তাকাল যেন তাকে চিনতেই পারছে না, তখন নেখ্‌লুয়ুদভ বক্স থেকে উঠে ওভারকোটটা নিয়ে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গেল।

নেভ্‌স্কি ধরে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়ল, উগ্র পোষাকে সজ্জিত একটি দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক নিঃশব্দে তার আগে আগে হেঁটে চলেছে। তার মুখে ও সমস্ত দেহেই তার অশুভ শক্তির আভাস ফুটে উঠেছে। যে কেউ তার সঙ্গে দেখা করল বা তার পাশ দিয়ে চলে গেল সেই একবার তার দিকে তাকাল। নেখ্‌লুয়ুদভ স্ত্রীলোকটি অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখের দিকে তাকাল। রং-মাখা মুখটা দেখতে সুন্দর। স্ত্রীলোকটি তার দিকে তাকিয়ে হাসল; তার চোখ দুটো ঝিকমিকিয়ে উঠল। আর কী আশ্চর্য, নেখ্‌লুয়ুদভের হঠাৎ মারিয়েত্তকে মনে পড়ে গেল, কারণ থিয়েটারের মতই আবার সে মনের মধ্যে একই সঙ্গে আকর্ষণ ও বিরক্তি

অনুভব করল।

দ্রুতপায়ে স্ত্রীলোকটিকে পার হয়ে বিরক্ত নেখ্‌লয়ুদভ মর্ষ্কায়ার দিকে মোড় নিল এবং নদীর তীর ধরে হাঁটতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, 'আমি যখন বক্সে ঢুকেছিলাম তখন সেও তো এমনি ভাবেই হেসেছিল, আর দুটি হাসির একই অর্থ। দুয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ, এ খোলা-খুলিই বলছে, "যদি আমাকে চাও তো নাও, নইলে পথ দেখ", আর সে এমন ভাব দেখায় যেন এ সব কথা সে ভাবে না, বরং অনেক উঁচু সংস্কৃতির স্তরে বাস করে,—অথচ তলে তলে ঐ একই কথা। এ অন্তত সত্যবাদী, কিন্তু সে তো মিথ্যুক। তাছাড়া, এ এ-পথে এসেছে প্রয়োজনের তাগিদে, আর সে এই মনোরম অথচ বিরক্তিকর ও ভয়ংকর প্রবৃত্তিকে নিয়ে মজার খেলা খেলছে। রাস্তার এই স্ত্রীলোকটি যেন বদ্ধ পচা জল, বিরক্তি অপেক্ষা তৃষ্ণা যাদের প্রবলতর তারাই সেই জল পান করে; আর থিয়েটারের সে স্ত্রীলোকটি তো বিষ, যাকে স্পর্শ করে অলক্ষ্যে তাকেই বিষাক্ত করে তোলে।

মার্শালের স্ত্রীর সঙ্গে তার কাণ্ড-কারখানার কথা নেখ্‌লয়ুদভের মনে পড়ে গেল। অনেক লজ্জাকর স্মৃতি তার সামনে ভেসে উঠল।

সে ভাবতে লাগল, 'মানুষের পশু-প্রকৃতির এই জৈবধর্ম বিরক্তিকর, কিন্তু যতদিন সেটা খোলাখুলিভাবে আমাদের সামনে থাকে ততদিন আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চাসন থেকে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমরা তাকে ঘৃণা করি; এবং কেউ সে প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণই করুক আর তাকে প্রতিরোধই করুক, সে যা ছিল তাই থাকে। কিন্তু সেই জৈবধর্ম যখন কাব্য ও সৌন্দর্যানুভূতির মুখোশ পরে এসে আমাদের পূজা দাবী করে—তখন তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে আমরা সেই জৈবধর্মকেই পূজা করি, ভাল-মন্দর পার্থক্যটাও ভুলে যাই। তখনই অবস্থা হয় ভয়ংকর।'

তখন নেখ্‌লয়ুদভ যে রকম পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল প্রাসাদ, শান্ত্রী, দুর্গ, নদী, নৌকা ও স্টক-এক্সচেঞ্জের বাড়ি, তেমনি পরিষ্কারভাবেই এ সব সত্য তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল।

সে চাইল এ সব কিছু ভুলতে, সব কিছু না দেখতে, কিন্তু না দেখে তো তার উপায় নেই। পিতার্সবার্গের উপর যে আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার উৎস যেমন সে দেখতে পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি যে আলোয় এ সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে তার উৎসও সে দেখতে পাচ্ছে না। আর সে আলো যদিও তার কাছে একঘেয়ে, বিষণ্ণ ও অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, তথাপি সে আলোয় যা ফুটে উঠেছে তাকে দেখতে সে বাধ্য; আর তা দেখে তার মন যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে ভরে উঠল।

অধ্যায়—২৯

মস্কোতে ফিরে গিয়ে নেখ্লয়ুদভ তৎক্ষণাৎ কারা-হাসপাতালে চলে গেল। সেনেট যে আদালতের রায়ই বহাল রেখেছে এবং মাসলভাকে সাইবেরিয়া যাত্রার জন্ত তৈরি হতে হবে, এ দুঃসংবাদটা তো মাসলভাকে জানাতে হবে।

সম্রাটের কাছে যে দরখাস্তটা অ্যাডভোকেট লিখে দিয়েছে সেটার সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ কোন আশা পোষণ না করলেও মাসলভাকে দিয়ে সই করাবার জন্ত দরখাস্তটা সে সঙ্গে করেই এনেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, দরখাস্তটা কার্যকরী হোক সেটা সে আর চায়ও না। সাইবেরিয়ায় গিয়ে নির্বাসিত ও দণ্ডিতদের মধ্যে বাস করবার চিন্তায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ; তাছাড়া মাসলভা ছাড়া পেলে তাদের দুজনের জীবনযাত্রা কি রূপ নেবে সেটা ধারণায়ও আনতে পারছে না। মার্কিন লেখক থরোর কথা তার মনে পড়ল! আমেরিকায় যখন ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল তখন সে লিখেছিল, "যে সরকারের অধীনে একজনও অন্তায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়, সেখানে কারাগারই একজন ন্তায়বান লোকের প্রকৃত বাসস্থান।" পিতার্সবার্গ ভ্রমণকালে নেখ্লয়ুদভ সেখানে যা কিছু দেখেছে তারপরে সেও সেই চিন্তাধারারই অনুগামী হয়ে পড়েছে।

'হ্যাঁ, বর্তমান রাশিয়াতে কারাগারই একজন সৎলোকের উপযুক্ত বাসস্থান,' একথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হল, ব্যক্তিগতভাবে তার বেলায় এ কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

কারা-প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতেই হাসপাতালের দরোয়ান নেখ্লয়ুদভকে চিনতে পেরে জানাল যে, মাসলভা সেখানে নেই।

'তাহলে সে কোথায় আছে ?'

'সে কারাগারেই ফিরে গেছে।'

'এখান থেকে তাকে সরানো হল কেন ?' নেখ্লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

দরোয়ান হেসে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'দেখুন মাননীয় মহাশয়, এ সব লোক এই রকমই হয়। ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে ফস্টিনস্টি শুরু করায় প্রধান ডাক্তার তাকে ফেরৎ পাঠিয়েছে।'

মাসলভা ও তার মন যে নেখ্লয়ুদভের কাছে কতখানি তা সে নিজেই জানত না। এই খবর শুনে সে একেবারে পাথর হয়ে গেল।

একটা বড় রকমের অদৃষ্টপূর্ব দুর্ভাগ্যের সংবাদে যেমনটি হয় তারও সেই অবস্থাই হল। তীব্র যন্ত্রণা তাকে আঘাত করল। তার প্রথম অনুভূতি হল লজ্জার। মাসলভার আত্মার পরিবর্তন ঘটছে বলে যে কল্পনা সে করেছিল সেটা তার নিজের কাছেই হাস্তকর হয়ে উঠল। তার মনে হল, তার আত্মত্যাগকে স্বীকার না করতে মাসলভা যত কথা বলেছে, তার সব অনুযোগ ও চোখের জল,—এসবই নিজের সুবিধার জন্ত তাকে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক একটি

ভ্রষ্টচরিত্র নারীর অপকৌশলমাত্র। তার মনে পড়ল, শেষ সাক্ষাৎকারের সময় মাসলভার এই একগুঁয়েমির লক্ষণ সে দেখতে পেয়েছিল। টুপিটা মাথায় দিয়ে সে হাসপাতাল থেকে চলে গেল।

'এখন আমি কি করব? এখনও কি তার সঙ্গে আমি বাঁধা আছি? তার এই কাজ কি আমাকে মুক্তি দেয় নি?' কিন্তু এই সব প্রশ্ন নিজেকে করামাত্র সে বুঝতে পারল, সে যদি নিজেকে মুক্ত মনে করে মাসলভাকে পরিত্যাগ করে তাহলে সে যা চাইছে তা হবে না, তাতে মাসলভার শাস্তি না হয়ে শাস্তি হবে তার নিজের। অমনি ভয় তাকে ঘিরে ধরল।

'না, যা ঘটেছে তা আমার সংকল্পকে পরিবর্তিত না করে বরং তাকে আরও শক্তিশালী করবে। তার যা খুশি তাই সে করুক। ডাক্তারের সহকারীকে নিয়ে যদি সে চলতে চায়, তাই চলুক; সেটা তার ব্যাপার। আমার বিবেক যা বলবে আমি তাই করব। আর আমার বিবেক বলছে, আমার মুক্তিকে বলি দিতে হবে। তাকে বিয়ে করবার, তাকে যেখানে পাঠানো হবে সেখানেই তাকে অনুসরণ করবার যে সংকল্প আমি করেছি তার কোন পরিবর্তন হবে না।' দৃঢ় পদক্ষেপে কারাগারের বড় বড় ফটকের দিকে অগ্রসর হতে হতে নেখ্‌লয়ুদভ আপন মনে এই কথাগুলি বলতে লাগল।

ফটকে পাহারারত রক্ষীকে সে বলল, সে মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চায় এ সংবাদটা ইন্সপেক্টরকে জানানো হোক। রক্ষী নেখ্‌লয়ুদভকে চিনত বলেই কারাগারের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তাকে জানিয়ে দিল। পুরনো ইন্সপেক্টরকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একজন নতুন খুব কড়া কর্মচারিকে নিয়োগ করা হয়েছে।

রক্ষী বলল, 'এখানে খুব কড়াকড়ি চলছে; অবস্থা ভয়াবহ। তিনি ভিতরেই আছেন, এখনই খবর পাঠাচ্ছি।'

নতুন ইন্সপেক্টর কারাগারের ভিতরেই ছিল, একটু পরেই বেরিয়ে নেখ্‌লয়ুদভের কাছে এল। লোকটি দীর্ঘদেহ, চিবুকের হাড় বেশ উঁচু, মুখটা বিষণ্ণ, চলাফেরা করে শ্লথ গতিতে।

নেখ্‌লয়ুদভের দিকে না তাকিয়েই সে বলল, 'নির্দিষ্ট দিনগুলিতে ভিজিটিং-রুমেই দেখা করতে দেওয়া হয়ে থাকে।'

'কিন্তু আমার কাছে সম্রাটের বরাবর একটা দরখাস্ত আছে, সেটা সই করাতে হবে।'

'সেটা আমাকে দিতে পারেন।'

'আমি নিজে কয়েদীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। এর আগে সে অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আগে', নেখ্‌লয়ুদভের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর জবাব দিল।

নেখ্‌লুয়ুদভ তবু বলল, 'আমার কাছে গভর্ণরের অনুমতি-পত্র আছে।'

'আমাকে দিন', তার দিকে তাকিয়েই ইন্সপেক্টর বলল। নেখ্‌লুয়ুদভের কাছ থেকে কাগজখানা নিয়ে ধীরে ধীরে পড়ে বলল, 'দয়া করে আপিসে আসুন।'

আপিস তখন খালি। টেবিলে বসে ইন্সপেক্টর কতকগুলি কাগজপত্র বাছাই করতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ যখন জানতে চাইল, রাজনৈতিক বন্দী তুখোভাব সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে কি না, তখন ইন্সপেক্টর সংক্ষেপে জানাল, পারবে না।

'রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না', বলেই সে আবার কাগজপত্রে মন দিল।

তুখোভার চিঠিখানা তখনও তার পকেটে। তার মনে হল, সে যেন কোন অপরাধ করতে চলেছে।

মাসলভা ঘরে ঢুকলে ইন্সপেক্টর মাথাটা একবার তুলল। কিন্তু তার দিকে বা নেখ্‌লুয়ুভের দিকে না তাকিয়েই 'আপনারা কথা বলতে পারেন,' এটুকু বলেই আবার কাগজপত্র যাচাই করতে শুরু করল।

মাসলভার পরণে সেই সাদা জ্যাকেট, স্কার্ট ও রুমাল। নেখ্‌লুয়ুদভের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার ঠাণ্ডা, কঠিন চোখের দিকে তাকিয়ে মাসলভার মুখ লাল হয়ে উঠল। হাত দিয়ে জ্যাকেটের প্রান্ত মুচড়ে ধরে সে চোখ নীচু করল।

তার সেই বিচলিত ভাব দেখে নেখ্‌লুয়ুদভের মনে হল, হাসপাতালের দরোয়ানের কথাগুলি তাহলে ঠিক।

নেখ্‌লুয়ুদভ ভেবেছিল তার সঙ্গে আগেকার মতই ব্যবহার করবে, কিন্তু এখন তার প্রতি সে এতই বিরূপ হয়ে পড়েছে যে তার সঙ্গে করমর্দন করতেও তার ইচ্ছা হল না।

তার দিকে না তাকিয়ে, তার হাতখানি পর্যন্ত না ধরে একঘেয়ে গলায় সে বলল, 'আমি খারাপ খবর এনেছি। সেনেট তোমার আবেদন বাতিল করেছে।

'আমি জানতাম তারা তাই করবে', এমন অদ্ভুতভাবে সে কথাগুলি বলল যেন তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

আগে হলে নেখ্‌লুয়ুদভ জিজ্ঞাসা করত, এ কথা সে কেন বলছে; কিন্তু এখন সে শুধু তার দিকে চেয়ে রইল। মাসলভার দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে।

কিন্তু তাতেও তার মন নরম হল না, বরং তার বিরক্তি আরও বেড়ে গেল।

ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

এই মুহূর্তে মাসলভার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও নেখ্‌লুয়ুদভের মনে হল, সেনেটের এই সিদ্ধান্তে তার দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।

সে বলল, 'তুমি নিরাশ হয়ো না। সম্রাটের কাছে আবেদন হয় তো সফল

হতে পারে। আমি আশা করছি—'

ভিজে ট্যারা চোখে তার দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে মাসলভা বলল, 'আমি সে কথা ভাবছি না।'

'তাহলে কি ভাবছ?'

'আপনি তো হাসপাতালে গিয়েছিলেন; তারা নিশ্চয় আমার বিষয়ে বলেছে যে—'

'তাতে কি হয়েছে? সেটা তো তোমার ব্যাপার,' ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলি বলে সে ভুরু কোঁচকাল।

আহত গর্বের যে নিষ্ঠুর মনোভাব শান্ত হয়ে এসেছিল, হাসপাতালের উল্লেখে সেটা নতুন করে মাথা চাড়া দিল।

ঘৃণার দৃষ্টিতে মাসলভার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ ভাবতে লাগল: শ্রেষ্ঠ পরিবারের যে কোন মেয়ে তাকে বিয়ে করতে পারলে সুখী হত; অথচ সে যেচে তার স্বামী হতে চাওয়া সত্ত্বেও এই নারী একটু অপেক্ষাও না করে একটা ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে দিল।

পকেট থেকে একটা বড় খাম বের করে টেবিলের উপর রেখে বলল, 'এটা সই কর।' রুমালের কোণা দিয়ে চোখের জল মুছে সে জানতে চাইল, কোথায় কি লিখতে হবে।

সে দেখিয়ে দিল। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের আস্তিন গুটিয়ে মাসলভা বসে পড়ল। নেখ্‌ল্যুদভ তার পিছনে দাঁড়াল। চাপা আবেগে মাসলভার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আহত গর্বের অভিমান আর যন্ত্রণাকাতরের প্রতি করুণা—মন্দ আর ভাল দুটো প্রবৃত্তি নেখ্‌ল্যুদভের বুকের মধ্যে লড়াই শুরু করে দিল—শেষ পর্যন্ত শেষেরটিই জয়লাভ করল।

সে মনে করতে পারছে না কোন্‌টি আগে এসেছে; তার প্রতি করুণা আগে মনে জেগেছে, না যে অপকর্মের জন্য আজ সে মাসলভাকে দোষী করছে সেই কাজ সে আগে করেছে? সে যাই হোক, তার মনে অপরাধ-বোধ ও করুণা যুগপৎ জাগ্রত হল।

দরখাস্তটা সই করে আঙুলের কালি পেটিকোটে মুছে সে উঠে দাঁড়াল; নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

'যাই ঘটুক, আর এর ফলাফল যাই হোক, আমার সংকল্প অপরিবর্তিতই আছে', নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

সে যে ক্ষমা করতে পেরেছে এই চিন্তার ফলে মাসলভার প্রতি তার করুণা ও সহানুভূতি আরও বেড়ে গেল; সে তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল।

'আমি যা বলেছি তাই করব; ওরা তোমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে আমি তোমার সঙ্গেই থাকব।'

তার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও মাসলভা তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল,

'তাতে লাভ কি ?'

'সে সব না ভেবে পথে তোমার কি কি লাগবে সেইটে বরং ভাব।'

'সে সব কিছুই আমি জানি না ; আপনাকে ধন্যবাদ।'

ইন্‌সপেক্টর এগিয়ে আসতেই তার কথার জন্য অপেক্ষা না করে নেখ্‌লুয়ুদভ বিদায় নিয়ে চলে গেল। অন্তরের মধ্যে সকলের প্রতি শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের এমন অনুভূতি তার আগে কখনও হয় নি। মাসলভার কোন কাজেই তার প্রতি নিজের ভালবাসার কোন পরিবর্তন ঘটবে না, এই নিশ্চিত বিশ্বাস তাকে আনন্দে ভরে তুলল, এমন এটা উচ্চাসনে তাকে বসিয়ে দিল যেখানে সে এর আগে কখনও উঠতে পারে নি। ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে সে যা খুশি করুক ; সেটা তার ব্যাপার। সে তো নিজের জন্য তাকে ভালবাসে নি, ভালবেসেছে তারই জন্য, ঈশ্বরের জন্য।

যে ব্যাপারের জন্য মাসলভাকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে জন্য নেখ্‌লুয়ুদভ তাকেই দোষী মনে করেছে, সেটা কিন্তু আসলে এই রকম।

করিডরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ডিস্‌পেন্সারি থেকে কিছু ওষুধের নির্যাস আনবার জন্য হেড নার্স মাসলভাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। সহকারিটি ঢ্যাঙা, মুখে ফুটকি দাগ ; কিছুদিন ধরেই সে মাসলভার পিছনে লেগেছিল। তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য মাসলভা তাকে এমন ধাক্কা মেরেছিল যে তার মাথা একটা তাকের উপর পড়ায় দুটো বোতল নীচে পড়ে ভেঙে যায়।

প্রধান ডাক্তার তখন সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনে এবং মাসলভাকে রক্তিম মুখে ছুটে বেরিয়ে যেতে দেখে সে রেগে চীৎকার করে উঠল :

'দেখ ভালমানুষের মেয়ে, এখানেও যদি এসব চালাও তাহলে তোমার জায়গায়ই তোমাকে ফেরৎ পাঠাব। ···এ সবের মানে কি ?' এগিয়ে গিয়ে সহকারীর দিকে চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে সে বলল।

সহকারীটি হেসে নিজেকে সমর্থন করল। ডাক্তার তার কোন কথায় কান দিল না। ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে সেইদিনই ইন্‌সপেক্টরকে জানাল, মাসলভার জায়গায় একজন ধীর-স্থির সহকারী নার্স তার চাই।

ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে এইটুকুই তার 'ফস্টিনস্টি'। ভালবাসাবাসির অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, এইটেই মাসলভার বিশেষ কষ্টের কারণ। পুরুষের সঙ্গ তার কাছে অনেকদিন থেকেই বিরক্তিকর, বিশেষ করে নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সেটা আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। তার অতীত ও বর্তমান জীবনের কথা ভেবে প্রত্যেক পুরুষ মানুষ, এমন কি এই ফুটকি-মুখো সহকারীটি পর্যন্ত, ধরে নিয়েছে যে তাকে অপমান করবার এবং সে অস্বীকৃত হলে তাতে বিস্মিত হবার অধিকার তাদের আছে—

এই চিন্তাই তাকে বেশী করে আঘাত করছে, আত্ম-করুণায় তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। এবার নেখ্‌লয়ুদভের কাছে এসে নিজের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগকে খণ্ডন করতেই সে চেয়েছিল, কিন্তু তার মনে হল, নেখ্‌লয়ুদভ তার কথা বিশ্বাস করবে না, বরং আত্ম-পক্ষ সমর্থন করলে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যাবে; তাই চোখের জলে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল, সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

মাসলভা তখনও মনে করছে, নেখ্‌লয়ুদভকে সে ক্ষমা করে নি; দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে যেমন বলেছিল এখনও তাকে তেমনি ঘৃণা করে; কিন্তু আসলে সে তাকে আবার ভালবেসেছে, এমন ভালবেসেছে যে নিজের অজ্ঞাতেই তার ইচ্ছামত সব কাজই সে করে চলেছে; মদ ছেড়েছে, ধূমপান ছেড়েছে, ফস্টিনস্টি ছেড়েছে, এবং তার ইচ্ছামতই হাসপাতালের কাজও নিয়েছিল। অবশ্য নেখ্‌লয়ুদভ যতবার জানিয়েছে যে সব কিছু ছেড়ে সে তাকে বিয়ে করবে ততবারই সে যে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে তার কারণ একবার যে গর্বিত কথাগুলি সে বলেছিল সেগুলিকে বার বার উচ্চারণ করতে তার ভাল লাগত, এবং সে জানত যে তার সঙ্গে বিয়ে হলে নেখ্‌লয়ুদভের পক্ষে সেটা দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। মনে মনে সে একান্তভাবেই সংকল্প করে নিয়েছিল যে নেখ্‌লয়ুদভের এই আত্মত্যাগকে সে কিছুতেই মেনে নেবে না, তথাপি সে যে তাকে ঘৃণা করছে, বিশ্বাস করছে যে সে যা ছিল আজও তাই আছে, তার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা বুঝতেও পারছে না, এটা তার কাছে বড় বেদনাদায়ক। নেখ্‌লয়ুদভ যে এখনও মনে করে যে হাসপাতালে থাকতে সে একটা অন্যায় করেছে, তার দণ্ডাদেশ বহালের দুঃসংবাদ অপেক্ষাও এই চিন্তাই তাকে বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছে।

অধ্যায়—৩০

কয়েদীদের প্রথম দলের সঙ্গেই মাসলভাকে পাঠানো হতে পারে; কাজেই নেখ্‌লয়ুদভ যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিল। কিন্তু সে জন্য এত কিছু করার রয়েছে যে, তার মনে হল, যত সময়ই হাতে থাকুক সব কাজ শেষ করা যাবে না। আগের থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে তাকে করণীয় কাজ খুঁজে বের করতে হত, আর সে সব কাজের কেন্দ্র-বিন্দু ছিল একটি মাত্র লোক, অর্থাৎ দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌লয়ুদভ; তথাপি তার জীবনের সব কিছু ঐভাবে কেন্দ্রায়িত হওয়া সত্ত্বেও সব কাজই ক্লান্তিকর মনে হত। এখন তার সব কাজের লক্ষ্যই অন্য মানুষ, দিমিত্রি আইভানভিচ নয়; সব কাজই উৎসাহজনক ও আকর্ষণীয়; সে কাজের আর শেষ নেই।

এখানেই শেষ নয়। আগেকার দিনে দিমিত্রি আইভানভিচ নেখ্‌লয়ুদভের

কাজকর্ম তার কাছে অস্বস্তিকর ও বিরক্তিকর বলে মনে হত; এখনকার কাজ-কর্ম তার মনকে আনন্দে ভরে দেয়।

নেখ্‌লুদভের বর্তমান কাজকর্মকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিজের স্বাভাবিক পণ্ডিতন্মন্যতায় সেও সব কাজকে তিন ভাগে ভাগ করে সব কাগজ-পত্রকেও তিনটে আলাদা ফাইলে গুছিয়ে রাখতে লাগল।

প্রথমটি মাসলভা সংক্রান্ত: সম্রাটের কাছে যে দরখাস্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার সাইবেরিয়া ভ্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

দ্বিতীয়টি জমিদারির বিলি-ব্যবস্থা সংক্রান্ত। পানোভো-তে সে চাষীদের এই শর্তে জমি দিয়েছে যে, তারা যে খাজনা দেবে সেটা তাদের সমবায়ের প্রয়োজনেই ব্যয়িত হবে। কিন্তু সে ব্যাপারেও একটা আইনানুগ দলিল তৈরি করা এবং তদনুযায়ী উইল প্রস্তুত করা দরকার। কুজমিন্‌স্কোয়ে-তে প্রথম যে বন্দোবস্ত করেছিল তাই বলবৎ আছে: খাজনাটা সে পাবে; কিন্তু খাজনার হার ঠিক করতে হবে এবং সে টাকার কতটা সে নিজের জন্য ব্যয় করবে আর কতটা চাষীদের জন্য রাখা হবে সেটাও স্থির করতে হবে। সাইবেরিয়া যাত্রার ব্যাপারে কত খরচ লাগবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকায় সে-খাতের উপার্জন সবটা ছেড়ে দেওয়ার কথা সে এখনও ভাবে নি, যদিও সেটাকে আধাআধিতে নামিয়ে এনেছে।

তার তৃতীয় কাজ হল সেই সব কয়েদীদের সাহায্য করা যারা ইদানীং দলে দলে সাহায্যের জন্য তার কাছে আবেদন করছে।

কয়েদীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায়, যারা এখনও কারাগারে রয়েছে তাদের তালিকা দেখে এবং অ্যাডভোকেট, কারা-পুরোহিত ও ইন্সপেক্টরকে জেরা করে যতটা জানা গেছে তা থেকে নেখ্‌লুদভ এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে কয়েদীদের, তথাকথিত অপরাধীদের, পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম হল সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়েও বিচারবিভাগীয় ভ্রান্তির ফলে যারা দণ্ডিত হয়েছে। এই দলে আছে আগুন লাগানোর অভিযোগে অভিযুক্ত মেন্‌শভরা, মাসলভা এবং আরও অনেকে। সংখ্যায় তারা খুব বেশী নয়—পুরোহিতের বিবরণ অনুসারে শতকরা সাতজন মাত্র—কিন্তু তাদের অবস্থা বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে সেই সব মানুষ যারা কামনা, ঈর্ষা বা মদ্যপানজনিত মত্ততা প্রভৃতি এমন সব বিশেষ অবস্থায় কৃত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছে যে অবস্থায় পড়লে তাদের বিচারকরাও অনুরূপ কাজই করত। নেখ্‌লুদভের পর্যবেক্ষণ অনুসারে অর্ধেকের বেশী অপরাধী এই দলে পড়ে।

তৃতীয় শ্রেণীতে আছে সেই সব মানুষ যারা এমন সব কাজের জন্য দণ্ডিত হয়েছে যাকে তারা নিজেরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও ভাল কাজ বলে মনে করলেও

আইন-প্রণেতারা তাকে অপরাধ বলে গণ্য করে। এই দলে আছে সেই সব লোক যারা বিনা লাইসেন্সে মদ বিক্রি করে, যারা চোরা-কারবার চালায়, যারা বড় বড় জমিদারির অন্তর্ভুক্ত এবং সম্রাটের খাঁস জঙ্গল থেকে ঘাস ও কাঠ কেটে নেয়, পার্বত্য পথে যারা ডাকাতি করে, আর সেই সব অবিশ্বাসীর দল যারা গীর্জার সম্পত্তি লুঠ করে।

চতুর্থ শ্রেণীতে আছে তারা যাদের বন্দী করার কারণ সমাজের সাধারণ স্তরের মানুষের তুলনায় তারা নৈতিক বিচারে অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত। তারা হল ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক, স্বাধীনতা অর্জনের কামনায় বিদ্রোহী পোল ও সারকাশিয়ানরা, রাজনৈতিক বন্দী, সমাজবাদী ও ধর্মঘটকারীরা। নেখ্‌ল্যুদভের পর্যবেক্ষণ অনুসারে শতকরা একটা বড় অংশই এই দলে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমন অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষ আছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যই যাদের দণ্ডিত করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণীতে আছে সেই সব মানুষ সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে যারা নিজেরা যত না অন্যায় করেছে তার চাইতে বেশী অন্যায় করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। তারা সেই সব সমাজ পরিত্যক্ত মানুষ যারা নিয়ত উৎপীড়ণ ও প্রলোভনে হতবুদ্ধি, যেমন সেই ছেলেটি যে মাদুর চুরি করেছিল এবং সেই রকম আরও শত শত মানুষ, নেখ্‌ল্যুদভ কারাগারের ভিতরে ও বাইরে যাদের দেখা পেয়েছে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তারা বেঁচে থাকে, অপরাধ বলে বর্ণিত এই সব কাজ তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ। নেখ্‌ল্যুদভের মতে, বহুসংখ্যক চোর ও খুনী যাদের সঙ্গে ইদানিং তার যোগাযোগ ঘটেছে তারা এই দলেই পড়ে। সেই সব ভ্রষ্টচরিত্র নীতিহীন জীবদের সে এই দলে ফেলেছে অপরাধতত্ত্বের নতুন শাখা যাদের স্বভাব-অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছে এবং যাদের অস্তিত্বকেই ফৌজদারি আইন ও দণ্ডের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে প্রধান প্রমাণ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। নেখ্‌ল্যুদভের মতে, এই সব নীতিহীন, চরিত্রহীন, অস্বাভাবিক লোকগুলির প্রতিও সমাজই অবিচার করেছে; শুধু তাদের ক্ষেত্রে অবিচারটা সরাসরি না করে করা হয়েছে তাদের পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের প্রতি।

এই শেষের শ্রেণীর একটি লোক বিশেষভাবে নেখ্‌ল্যুদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার নাম ওখোতিন; দাগী চোর, এক বেশ্যার জারজ সন্তান, মানুষ হয়েছে সস্তার বস্তিতে। জীবনের ত্রিশ বছর পর্যন্ত এমন কোন লোককে সে চোখেও দেখে নি যার নৈতিক চরিত্র একটি পুলিশ অপেক্ষা শ্রেয়তর। অল্প বয়সেই সে একটা চোরের দলে ভিড়ে যায়। তবে হাসি-মস্করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ, তাই সকলেই তাকে ভালবাসত। নেখ্‌ল্যুদভকে তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করার সময় সে নিজেকে নিয়ে এবং উকিল, কারাগার ও মানবিক এবং ঐশ্বরিক নিয়ম-কানুন নিয়ে অনেক রকম ঠাট্টা-

তামাশা করেছিল। ঐ রকম আর একজন সুদর্শন ফিয়দরভ। সে ছিল একটা ডাকাত-দলের সর্দার। দলবল নিয়ে সে একজন বৃদ্ধ সরকারী কর্মচারিকে খুন করে তার সর্বস্ব লুঠ করেছিল। গোড়ায় সে ছিল চাষী। তার বাবাকে বেআইনিভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে সেনাদলে কাজ করবার সময় জনৈক অফিসারের সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রেমে পড়ার অপরাধে তাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। তার প্রকৃতি ছিল কামময় ও আকর্ষণীয়, তাই যে কোন ভাবে কামনা চরিতার্থ করার বাসনা ছিল তার প্রবল। সে কখনও কোন সংযত-চরিত্র মানুষকে দেখে নি, এবং সম্ভোগ ছাড়া জীবনের আর কোন আদর্শের কথাও কখনও শোনে নি। নেখ্‌লুদভ বুঝেছিল, এই দুটি লোকই প্রকৃতির প্রভূত দানে সমৃদ্ধ হয়েও অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছের মতই অবহেলিত ও অসার্থক হয়ে পড়েছে। এমন একটি ভবঘুরে ও একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গেও তার দেখা হয়েছিল যাদের আপাত নিষ্ঠুরতায় বীতশ্রদ্ধ হলেও তাদের কারও মধ্যেই সেই অপরাধ প্রবণতা সে দেখতে পায় নি যার কথা ইতালীয় অপরাধ-তাত্ত্বিকরা লিখেছে; বরং তাদের প্রতি সেই রকম ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণাই সে বোধ করেছে যে রকমটা সে বোধ করেছে কারাগারের বাইরের সেই সব লোকদের প্রতি যারা লেজ-ওয়ালা কোট পরে, কাঁধে মর্যাদাসূচক তকমা ধারণ করে, বা লেস-বসানো জামা গায় দেয়।

সুতরাং সেই সব বিচিত্র চরিত্রের লোকদের কেন কারাগারে রাখা হয়েছে, অথচ তাদেরই মত অন্যরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কারণ খুঁজে বের করাই নেখ্‌লুদভের চতুর্থ কর্তব্য।

সে আশা করেছিল পুঁথিপত্রে এ-প্রশ্নের জবাব পাবে। তাই এ বিষয়ে লিখিত সব বই সে কিনল। লম্‌ব্রসো, গারোফালো, ফেরি, লিজ্‌ত্‌, মড্‌স্লে ও তাদের সব বই কিনে সে যত্ন করে পড়ল। কিন্তু যত পড়ল ততই সে হতাশ হল। বিজ্ঞান-চর্চার জন্য নয়, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার জন্য নয়, বিতর্কের জন্য নয়, শিক্ষাদানের জন্যও নয়, শুধুমাত্র জীবনের প্রাত্যহিক প্রশ্নের জবাব পাবার আশায় যারা বিজ্ঞানের আশ্রয় নেয় তাদের বেলায় সচরাচর যা ঘটে থাকে, তার বেলায়ও তাই ঘটল। ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত হাজার রকমের সূক্ষ্ম ও অকৃত্রিম প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে, শুধু দিতে পারে না যে প্রশ্নের জবাব সে খুঁজছে সেটা।

একটিমাত্র অতীব সরল প্রশ্ন তার: 'কিছু লোক অপর লোকদের আটক করে, যন্ত্রণা দেয়, নির্বাসনে পাঠায়, চাবুক মারে এবং খুন করে কেন এবং কোন্ অধিকারে, যখন তারাও তাদেরই মত একই স্তরের জীব?' এই প্রশ্নের জবাবে সে পেয়েছে শুধু আলোচনা: মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি নেই; মাথার খুলির পরিমাপের দ্বারা অপরাধের লক্ষণ ধরা যায় কি না; অপরাধের ক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা কতখানি; নীতিহীনতা বংশানুক্রমিক কিনা; নীতি

কি, উন্মত্ততা কি, অধঃপতন কি, বা স্বভাব কি ; জলবায়ু, খাদ্য, অজ্ঞতা, অনুকরণের প্রবৃত্তি, সম্মোহন বা কামনা অপরাধকে কতখানি প্রভাবিত করে ; সমাজ কি ; সমাজের কর্তব্য কি—এমনি সব আলোচনা।

এই সব আলোচনা পড়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরবার পথে একটি ছোট ছেলে একদা যে জবাব দিয়েছিল সেটা নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ল। নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বানান করতে শিখেছে কি না।

'হ্যাঁ, আমি বানান করতে পারি', ছেলেটি জবাব দিল।

'বেশ, তাহলে বল তো, leg (পা) বানান কি ?'

চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেলেটি বলল, 'কুকুরের পা, না কিসের পা ?'

বিজ্ঞানের সব বইতেই তার একটিমাত্র মৌলিক প্রশ্নের ওই একই রকম জবাব নেখ্‌ল্যুদভ পেয়েছিল।

জ্ঞান, শিক্ষা ও আগ্রহের অনেক কথাই তাতে ছিল ; ছিল না শুধু তার প্রধান প্রশ্নের জবাব : 'কোন্ অধিকারে কিছু মানুষ অন্য মানুষকে শাস্তি দেয় ?'

শুধু যে কোন জবাব মেলে নি তাই নয়, সব যুক্তিই দেওয়া হয়েছে শাস্তির ব্যাখ্যায় ও সমর্থনে, যেন শাস্তির প্রয়োজনটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

নেখ্‌ল্যুদভ অনেক পড়াশুনা করল, কিন্তু সবই ছাড়া-ছাড়া ভাবে ; এই ধরনের পড়াশুনাকেই তার ব্যর্থতার কারণ বলে ধরে নিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ আশায় রইল, পরবর্তীকালে এর জবাব পাবে। কিন্তু যে জবাব পরে প্রায়শই তার সামনে হাজির হতে লাগল তার সত্যতায় সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না।

অধ্যায়—৩১

যে কয়েদী-দলের সঙ্গে মাসলভা যাবে তারা ৫ই জুলাই যাত্রা শুরু করবে। নেখ্‌ল্যুদভও সেই দিনই যাত্রার ব্যবস্থা করল।

তার আগের দিন নেখ্‌ল্যুদভের দিদি ও তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে এল।

নেখ্‌ল্যুদভের দিদি নাতালিয়া আইভানভ্‌না রাগঝিন্‌স্কি ভাইয়ের থেকে দশ বছরের বড়। অংশত এই দিদির প্রভাবেই সে মানুষ হয়েছে। ছেলে-বেলায় নেখ্‌ল্যুদভ দিদির খুব প্রিয় ছিল ; তারপরে বিয়ের আগে দুজনের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে, যেন দুটি সমবয়সী ভাই-বোন, অথচ দিদি তখন পঁচিশ বছরের যুবতী, আর সে পনেরো বছরের কিশোর। সেই সময় সে ভাইয়ের বন্ধু নিকলেংকা ইর্তেন্যেভকে ভালবেসেছিল। আজ আর সে বেঁচে নেই।

তারপর থেকে দুজনই চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে : ভাই চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে সামরিক

চাকরি আর পাপাসক্ত জীবনের জন্য, আর দিদি চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে এমন একটি লোককে বিয়ে করে যার প্রতি তার ভালবাসা কাম-প্রণোদিত ; তাছাড়া সে লোকটিও এক সময় যা কিছু তার ও তার ভাইয়ের কাছে ছিল একান্ত প্রিয় ও পবিত্র সে সবের ধার তো ধারেই না, বরং নৈতিক পূর্ণতার আকাংখা ও লোক-সেবার অর্থই সে বুঝতে পারে না ; সে শুধু বোঝে উচ্চাকাংখা ও জাকজমকপূর্ণ জীবন।

নাতালিয়ার স্বামীর খ্যাতি বা সম্পত্তি কিছুই নেই, কিন্তু লোকটি স্বীয় বৃত্তিতে সুনিপুণ। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে উদারনীতি ও রক্ষণশীলতার মাঝখানে থেকে যখন যেটা সুবিধাজনক মনে হয় সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে, এবং রমণীরঞ্জনের উপযুক্ত কতকগুলি গুণের সাহায্যে সেই আইনের বৃত্তিতে একটা মোটামুটি উজ্জ্বল জীবিকা গড়ে তুলেছে। প্রথম যৌবন পার হয়ে দেশভ্রমণে বের হয়ে সে নেখ্‌লুয়ুদভের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং যেন তেন প্রকারেন পরিণত বয়স্কা নাতালিয়াকে নিজের প্রতি প্রণয়াসক্তা করে তোলে। নাতালিয়ার মায়ের এ বিয়েতে মত ছিল না ; এ বিয়েকে সে অসম-বিবাহ বলে মনে করেছিল।

নেখ্‌লুয়ুদভও ভগ্নিপতিকে ঘৃণা করত, যদিও সে মনোভাব সে নিজের কথা থেকেও লুকিয়ে রাখতে এবং সর্বদাই মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করত।

রাগঝিন্‌স্কির প্রতি তার এই বিরূপতার কারণ তারই নীচতা ও সংকীর্ণতা হলেও তার আসল কারণ নাতালিয়া। স্বামীর চরিত্রের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও নাতালিয়া তাকে এত তীব্রভাবে স্বার্থপরের মত ইন্দ্রিয় সুখপরিতৃপ্তির জন্য ভালবাসে যার ফলে তার মধ্যে একদিন যা কিছু মহৎ ছিল সব বিনষ্ট হয়ে গেছে।

ঐ লোমশ চকচকে টাক-মাথা আত্মম্ভরী লোকটার স্ত্রী হিসাবে নাতালিয়াকে ভাবতে তার কষ্ট হয়। এমন কি তার সন্তানদের প্রতিও সে বিরূপ মনোভাব পোষণ না করে পারে না।

রাগঝিন্‌স্কিরা দুজনই শুধু মস্কোয় এসেছে, ছেলে ও মেয়ে বাড়িতেই আছে। এখানে সব চাইতে বড় হোটেলের সব চাইতে ভাল ঘর তারা নিয়েছে। এসেই নাতালিয়া মায়ের পুরণো বাড়িতে গিয়েছিল ; কিন্তু যখন আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নার কাছে শুনল যে তার ভাই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা লজিং-এ থাকে, তখনই সে সেখানে চলে যায়। লজিং-এর অন্ধকার দালানে দিনমানেও আলো জলে। সেখানেই একটা নোংরা চাকরের সঙ্গে দেখা হলে সে জানাল যে প্রিন্স বাইরে চলে গেছে।

তার জন্য একটা চিঠি লিখে যাবার জন্য নাতালিয়া নেখ্‌লুয়ুদভের ঘরটা দেখিয়ে দিতে বলাতে চাকর তাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল।

নাতালিয়া ভাইয়ের দুখানি ছোট ছোট্‌ ঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। সে

লক্ষ্য করল, সব কিছুতেই ভাইয়ের স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা ও শৃংখলা-প্রীতির স্বাক্ষর রয়েছে। পরিবেশের অদ্ভুত সরলতাও তার খুব ভাল লাগল। লেখার টেবিলের উপর রাখা ব্রোঞ্জের কুকুর-বসানো কাগজ-চাপাটা দেখেই সে চিনতে পারল; বিভিন্ন ফাইল ও লেখার সরঞ্জাম যে রকম পরিচ্ছন্ন ভাবে টেবিলে সাজানো রয়েছে তাও তার পরিচিত; হেনরি জর্জের লেখা একখানি ইংরেজি বই এবং দণ্ডবিধির উপরে লেখা অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে তার্দের লেখা ফরাসি বইয়ের ভিতরে পৃষ্ঠা-চিহ্ন হিসাবে রাখা হাতির দাঁতের বাঁকানো কাগজ-কাটা ছুরিটাও সে দেখেই চিনতে পারল।

টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখে তাকে সেইদিনই দেখা করতে বলে সে হোটেলে ফিরে গেল।

ভাইয়ের দুটো সমস্যা নিয়ে সে এখন বিব্রত; কাতয়ুশার সঙ্গে তার বিয়ে—তাদের শহরেই অনেকের মুখে সে কথা সে শুনেছে—এবং চাষীদের সব জমি বিলিয়ে দেওয়া—সেটাও এখন সর্বজনবিদিত, আর অনেকেই কাজটাকে রাজনীতিগন্ধী ও বিপজ্জনক বলে মনে করে। একদিক থেকে কাতয়ুশার সঙ্গে বিয়েতে সে খুশি হয়েছে। তার বিয়ের আগের সেই সুখের দিনগুলিতে ভাই-বোনের চরিত্রে যে দৃঢ়তা ছিল ভাইয়ের এই সংকল্পের ভিতর দিয়ে তারই প্রকাশকে সে প্রশংসার চোখেই দেখেছে। তবু এ রকম একটি ভয়ংকরী নারীকে তার ভাই বিয়ে করছে এ কথা ভাবতেও সে আতংকিত হয়ে উঠেছে। এই আতংকের অনুভূতিটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তাই সে স্থির করেছে, কাজটা কঠিন হলেও এ বিয়ে বন্ধ করতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

চাষীদের জমি দেওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু তাকে ততটা বিচলিত করে নি, যদিও তার স্বামীর এ বিষয়ে খুবই আপত্তি এবং সে আশা করছে যে দিদির চেষ্টায় সেটা হয় তো বন্ধ করা যাবে। স্বামী বলল, 'জমির খাজনা তারা নিজেদেরই দেবে এই শর্তে চাষীদের জমি বন্দোবস্ত দেবার কি অর্থ হয়? সে যদি এই ব্যবস্থাই করতে চেয়েছিল তাহলে "চাষীদের ব্যাংক"-এর মারফৎ তাদের জমিগুলো বিক্রি করে দিল না কেন? তার তো খানিকটা মানে বোঝা যেত। আসলে, তার এ কাজ পাগলের কাণ্ড-কারখানারই সামিল।

নেখ্‌লুয়ুদভের কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য একজন আইনানুগ অছি নিযুক্ত করার কথা রাগঝিন্‌স্কি বিশেষভাবে চিন্তা করতে লাগল এবং তার স্ত্রীকে বলল, সে যেন এ বিষয়ে ভাইয়ের সঙ্গে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করে।

অধ্যায়—৩২

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে এসে টেবিলের উপর দিদির চিঠিটা পেয়ে নেখ্‌লয়ুদভ তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল। মায়ের মৃত্যুর পরে তাদের আর দেখা হয় নি। নাতালিয়া তখন ঘরে একা ছিল। স্বামী পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিল। তার পরণে কালো রেশমের একটা আটো পোষাক, সামনে একটা লাল 'বো', মাথার চুল আধুনিক কেতায় বাঁধা।

সে স্বামীর সম-বয়সী, তাই স্বামীর জন্যই নিজেকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাবার চেষ্টাটা অত্যন্ত প্রকট।

ভাইকে দেখেই সে লাফ দিয়ে উঠে রেশমের পোষাকে খস্‌খস্‌ শব্দ তুলতে তুলতে ছুটে গিয়ে তাকে চুম্বন করল। হাসিমুখে দুজন দুজনকে দেখতে লাগল। তাদের সেই রহস্যময় দৃষ্টি-বিনিময়ের ভিতর দিয়ে যে অর্থ ও সত্য প্রকাশ পেল কোন ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। তারপরই শুরু হল কথার খেলা ; তাতে আন্তরিকতার স্পর্শ কম।

'তুমি তো আরও শক্ত-সমর্থ, আরও কম বয়স্কা হয়েছ', নেখ্‌লয়ুদভ বলল। খুশিতে তার ঠোঁটে ভাঁজ পড়ল।

'আর তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ।'

'তোমার স্বামী কেমন আছে ?'

'ও একটু বিশ্রাম নিচ্ছে ; সারা রাত ঘুম হয় নি।'

অনেক কথাই বলবার ছিল,—কিন্তু মুখে বলা হল না ; যা ভাষায় বলা গেল না, চোখে-চোখে তাই বলা হয়ে গেল।

'তোমার লজিং-এ গিয়েছিলাম।'

'জানি। বাড়িটা অত্যন্ত বড় বলেই সেখান থেকে চলে গেছি। সেখানে বড়ই একলা, বড়ই একঘেয়ে লাগত। সেখানকার কিছুই আমি চাই না, সে সব তুমি নিয়ে নাও। মানে, আসবাবপত্র প্রভৃতির কথা বলছি।'

'হ্যা। আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না আমাকে বলেছে। আমি সেখানেও গিয়েছিলাম। অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু—'

এমন সময় রুপোর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে পরিচারক ঘরে ঢুকল।

সেই টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিল। সকলেই চুপচাপ, নাতালিয়া টেবিলের কাছে গিয়ে নীরবেই চা তৈরি করল। নেখ্‌লয়ুদভও কোন কথা বলল না।

শেষ পর্যন্ত নাতালিয়াই প্রথম কথা বলল।

'দেখ দিমিত্রি, আমি সবই শুনেছি।' সে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'তাতে কি হল ? তুমি তো জান আমি খুশি হয়েছি।'

'যে জীবন সে পেরিয়ে এসেছে তারপরেও তাকে ভাল করে তুলতে পারবে

এ আশা তুমি কি করে করছ ?'

ছোট চেয়ারটায় সোজা হয়ে বসে সে মনোযোগ দিয়ে দিদির কথা শুনতে লাগল। তাকে ঠিক ঠিক বুঝে ঠিক ঠিক জবাব দেওয়াই তার ইচ্ছা। মাসলভার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের ফলে তার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেই শান্ত আনন্দ ও শুভ-বুদ্ধি তখনও তার মনকে ভরে রেখেছে।

সে জবাব দিল, 'তাকে তো নয়, আমি আমাকেই ভাল করে তুলতে চাইছি।'

নাতালিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'বিয়ে ছাড়া অন্য পথেও তো তা করা যায়।'

'কিন্তু আমি মনে করি, এটাই শ্রেষ্ঠ পথ। তাছাড়া, এর ফলে যে জগতে আমি যাব সেখানে আমার অনেক কিছু করার আছে।'

'এতে তুমি সুখী হবে, এ বিশ্বাস আমি করি না।'

'আমার সুখটাই বড় কথা নয়।'

'তা হয়তো ঠিক; কিন্তু তার যদি মন বলে কিছু থাকে তাহলে সেও এতে সুখী হবে না—এমন কি সে এটা চাইবেও না।'

'সে এটা চায় না।'

'বুঝলাম ; কিন্তু জীবন—'

'হ্যা—জীবন ?'

'জীবনের দাবী যে অন্য রকম।'

দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লুদভ বলল, 'আমরা ন্যায় কাজ করব, এ ছাড়া অন্য কোন দাবী জীবন করতে পারে না।'

'আমি বুঝতে পারছি না', বলে দিদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'বেচারি দিদি আমার, তার এতদূর পরিবর্তন হয়েছে ?' নেখ্‌লুদভ ভাবল। তার মনে পড়ল বিয়ের আগেকার নাতালিয়ার কথা, শৈশবের অজস্র স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলির কথা মনে পড়ে তার প্রতি গভীর মমতায় মনটা ভরে উঠল।

সেই মুহূর্তে রাগঝিন্‌স্কি ঘরে ঢুকল। তার চশমা, টাক ও কালো দাড়ি—সবই চকচক করছে।

কথাগুলির উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে সে বলল, 'কেমন আছ ? কেমন আছ ?'

তারা কর-মর্দন করল। রাগঝিন্‌স্কি আস্তে একটা আরাম-কেদারায় বসে পড়ল।

'তোমাদের আলাপে বাধা দিলাম না তো ?

'না, আমি যা বলছি বা করছি তা কারও কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাই না।'

যে মুহূর্তে তার লোমশ হাত চোখে পড়ল, ও তার আত্মম্ভরী অভিভাবক-সুলভ কথা কানে গেল, সেই মুহূর্তে তার মন থেকে সব বিনয়-নম্রতা উড়ে গেল।

নাতালিয়া বলল, 'তার মনের অভিপ্রায় নিয়েই কথা হচ্ছিল।' চায়ের পাত্রটা তুলে বলল, 'তোমাকে এক কাপ চা দেব কি?'

'ধন্যবাদ। তা অভিপ্রায়গুলি কি কি?'

জবাবটা নেখ্‌লয়ুদভই দিল, 'যে নারীর প্রতি আমি অন্যায় করেছি বলে মনে করি সে যে কয়েদীদের দলে রয়েছে তাদের সঙ্গে আমি সাইবেরিয়ায় যাব।'

'শুনেছি, শুধু সঙ্গে যাওয়া নয়, আরও বেশী কিছু।'

'হ্যাঁ, সে চাইলে তাকে বিয়ে করব।'

'বটে! যদি কিছু মনে না কর, তোমার মনের কথাটা আমাকে বুঝিয়ে বলবে কি? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনের কথা…এই নারী…অধঃপতনের পথে এই নারীর প্রথম পদক্ষেপ…' সঠিক ভাষা মনে না আসায় নেখ্‌লয়ুদভ নিজের উপরেই চটে গেল। 'আমার মনের কথা হল, দোষী আমি আর শাস্তি পাচ্ছে সে।'

'যখন শাস্তি ভোগ করছে তখন তো সেও নির্দোষ হতে পারে না।'

'সে সম্পূর্ণ নির্দোষ।'

অপ্রয়োজনীয় আবেগের সঙ্গে নেখ্‌লয়ুদভ সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করল।

'বুঝলাম, প্রেসিডেন্টের অবহেলার ফলে জুরিরা একটা অবিবেচনাপূর্ণ রায় দেওয়াতেই ব্যাপারটা ঘটেছে। কিন্তু এ ধরনের মামলার জন্য তো সেনেট রয়েছে।'

'সেনেট আপিল খারিজ করে দিয়েছে।'

'দেখ, সেনেট যদি খারিজ করে দিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপিলের পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল না,' রাগঝিন্‌স্কি বলল। স্পষ্টতই সেও এই প্রচলিত মতই পোষণ করে যে, সত্য আইনগত সিদ্ধান্তেরই ফল। 'সেনেট কোন মামলার ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে না। সত্যি যদি ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত করা উচিত।'

'সেটা করা হয়েছে, তবে তাতে কোন ফল হবার সম্ভাবনা নেই। তারা বিষয়টা মন্ত্রিসভার কাছে পাঠাবে, মন্ত্রিসভা সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করবে, সেনেট তার আগেকার সিদ্ধান্তই বহাল রাখবে এবং যথারীতি যে নির্দোষ সে শাস্তি ভোগ করবে।'

একটুখানি ক্ষমার হাসি হেসে রাগঝিন্‌স্কি বলল, 'প্রথমত, মন্ত্রিসভা সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করবে না; আদালতের কাছ থেকে মূল দলিল-পত্র চেয়ে পাঠাবে এবং তাতে কোন ভুল দেখতে পেলে তদনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে। আর দ্বিতীয়ত, যে নির্দোষ সে কখনও শাস্তি পায় না; পেলেও সে ধরনের ঘটনা খুবই বিরল। যে দোষী সেই শাস্তি পায়।' আত্ম-তুষ্ট হাসির সঙ্গে বেশ ভেবে-চিন্তেই

রাগঝিন্স্কি কথাগুলি বলল।

ভগ্নিপতির উপর অসন্তুষ্ট হয়েই নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমি কিন্তু উল্টোটাই বিশ্বাস করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আইনের বিধানে যাদের দণ্ড হয় তাদের একটা বড় অংশই নির্দোষ।'

'কোন্ অর্থে ?

'শব্দটার আক্ষরিক অর্থেই। এই নারী যেমন কাউকে বিষ খাওয়ানোর ব্যাপারে নির্দোষ, যে চাষীটি খুন না করেও দণ্ডিত হয়েছে তার মত নির্দোষ; যে অগ্নিকাণ্ড বাড়ির মালিক নিজেই ঘটিয়েছে সেই অপরাধে দণ্ডোন্মুখ মা ও ছেলের মত নির্দোষ।'

'দেখ, বিচারে ভুল-ভ্রান্তি তো হয়ই, ভবিষ্যতেও হবে। মানুষের গড়া কোন প্রতিষ্ঠানই পূর্ণ হতে পারে না।'

'তাছাড়া, যে সমাজে তারা মানুষ হয়েছে সেখানে যে সব কাজকে অন্যায় বলে মনে করা হয় সে রকম কিছু না করেও বহুলোক দণ্ডিত হয়েছে।'

'আমাকে ক্ষমা কর, সে রকমটা হয় না; প্রত্যেক চোরই জানে চুরি করা অন্যায়, আমাদের চুরি করা উচিত নয়—চুরি করাটা দুর্নীতি।' কথা বলার সময় রাগঝিন্স্কির মুখে ঈষৎ ঘৃণার যে হাসি ফুটে উঠল তা দেখে নেখ্‌ল্যুদভ আরও চটে গেল।

'না, সে তা জানে না; তারা অবশ্য বলে, "চুরি করো না," কিন্তু সে তো জানে কারখানার মালিক কম মজুরি দিয়ে তার শ্রম চুরি করে; নানা রকম কর বসিয়ে কর্মচারিদের মারফৎ সরকার অনবরত তার টাকা লুঠ করে।'

শ্যালকের কথাগুলি বিশ্লেষণ করে রাগঝিন্স্কি শান্তভাবে বলল, 'আর, এ তো নৈরাজ্যবাদের কথা।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলতে লাগল, 'কিসের কথা- আমি জানি না; আমি শুধু যা ঘটে তাই বলছি। সে জানে, সরকার তার প্রাপ্য লুঠ করে; দীর্ঘকাল ধরে জমিদার তার প্রাপ্য লুঠ করে আসছে, যে জমি সকলের সম্পত্তি হওয়া উচিত তা থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে; আর তারপরে আগুন জ্বালাবার জন্য সেই চুরি-করা জমি থেকে সে যদি গাছের পাতা কুড়োয় বা ডাল ভাঙে, তাহলেই তাকে আমরা জেলে পাঠাই এবং তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে সেই চোর। অবশ্য সে জানে, যারা তার জমি লুঠ করে নিয়েছে তারাই চোর, সে নয়, এবং সেই চোরাই মালের কিছুটা পুনরুদ্ধার করা পরিবারের প্রতি তার পবিত্র কর্তব্য।'

'আমি বুঝতে পারছি না, আর বুঝতে পারলেও একমত হতে পারছি না। জমি তো কারও না কারও সম্পত্তি হবেই। তাকে যদি আজ সমানভাবে ভাগ করে দাও—', রাগঝিন্স্কি ধীরে ধীরে বলতে লাগল। তার নিশ্চিত ধারণা, নেখ্‌ল্যুদভ একজন সমাজবাদী, জমির সম-বণ্টন সমাজবাদেরই দাবী,

সম-বণ্টন ব্যবস্থা খুবই বোকামি, আর সে কথা সে সহজেই প্রমাণ করে দিতে পারে। 'আজ যদি জমিকে সমান ভাবে ভাগ করে দাও, কালই আবার সে জমি পরিশ্রমী ও কৌশলী লোকদের হাতে গিয়ে পড়বে।'

'জমির সম-বণ্টনের কথা তো ভাবা হচ্ছে না। জমি কারও সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়; তা নিয়ে কেনা, বেচা, বা ভাড়া খাটানো চলবে না।'

'সম্পত্তিতে মানুষের অধিকার জন্মগত ; এ অধিকার না থাকলে জমি চাষ করবার কোন প্রেরণাই থাকত না। সম্পত্তির অধিকার ধ্বংস কর, দেখবে আমরা বর্বরতার যুগে ফিরে গেছি।' রাগঝিন্স্কি খুব জোর দিয়ে কথাগুলি বলল। জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সপক্ষে যে সব যুক্তিকে অখণ্ডনীয় বলে মনে করা হয় সেই প্রচলিত যুক্তিগুলিরই পুনরাবৃত্তি সে করে গেল।

'ঠিক উল্টো। জমি যখন কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না তখন আর কোন জমিই পতিত পড়ে থাকবে না যেমন এখন থাকে ; আর তার কারণ জমিদাররা এখন নিজেরাও জমি চষতে পারে না, আবার যারা চাষ করতে পারে তাদেরও চাষ করতে দেয় না।'

'কিন্তু দিমিত্রি আইভানভিচ, তুমি যা বলছ এতো নিছক পাগলামি। এ যুগে কি জমিদারি লোপ করা সম্ভব? আমি জানি, এটা তোমার পুরনো নেশা। তবু আমি তোমাকে খোলাখুলিই বলছি', বলতে বলতে রাগঝিন্স্কির মুখ ম্লান হয়ে উঠল, তার গলা কাঁপতে লাগল—'বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার আগে সমস্যাটাকে তলিয়ে ভেবে দেখো, এই আমার পরামর্শ।'

'আপনি কি আমার ব্যক্তিগত বিষয়ের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমি মনে করি, যে বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে আমরা মানুষ হই সেই অবস্থা থেকে উদ্ভূত দায়িত্বও আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। আমার সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত: আমি যা আয় করি তাতে আমাদের আরামে চলে যায়; আমি আশা করি তাতে আমার সন্তানদের জীবনও আরামেই কাটবে। কাজেই তোমার কৃতকর্মের ব্যাপারে—আমি মনে করি কাজটা মোটেই সুবিবেচিত হয় নি—আমার আগ্রহ কোন রকম ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত নয়; নীতিগত ভাবেই আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তাই আমার পরামর্শ, সব ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখ, ভাল করে পড়াশুনা করে—'

নেখ্‌লয়ুদভ ম্লান মুখে বলল, 'দয়া করে আমার ব্যাপার আমাকেই মেটাতে দিন, আর আমি কি পড়ব না পড়ব সেটাও আমাকেই ঠিক করতে দিন।' নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, তার হাত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারছে না। তাই কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে সে চা খেতে শুরু করল।

অধ্যায়—৩৩

অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ দিদিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে ?'

দিদি জানাল, তারা তাদের ঠাকুরমার কাছে আছে। আরও বলল, ছেলে-বেলায় তুমি যেমন একটা নিগ্রো ও একটা ফরাসি বৌ-পুতুল নিয়ে খেলা করতে, আমরা চলে আসার পরে তারাও তেমনি খেলা করছে।

নেখ্‌লয়ুদভ হেসে বলল, 'সত্যি সে সব তোমার মনে আছে ?'

'হ্যাঁ ; আরও ভেবে দেখ, তারাও ঠিক সেই একই রকম খেলা খেলে।'

ভগ্নিপতি ও নেখ্‌লয়ুদভের মধ্যে তখন অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। এক সময়ে বিচারের প্রসঙ্গ উঠলে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'ন্যায়-বিচাব কি আইনের লক্ষ্য ?'

'তাছাড়া আর কি হতে পারে ?'

'কেন ? শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করা। আমি মনে করি, আমাদের শ্রেণীর সুবিধার জন্য প্রচলিত ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার যন্ত্র হল আইন।'

শান্ত হাসির সঙ্গে রাগঝিন্‌স্কি বলল, 'এটা কিন্তু খুব নতুন কথা। সাধারণেব ধারণা, আইনের লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা।'

'হ্যাঁ, নীতিগত ভাবে তাই, কিন্তু আমি তো দেখেছি বাস্তবে তা নয়। আইনের একমাত্র লক্ষ্য বর্তমান ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাই যে সব সাধারণের চাইতে উঁচু স্তরের মানুষ সে ব্যবস্থাকে পাল্টাতে চায়—যেমন তথা-কথিত রাজনৈতিক অপরাধীরা—এবং যারা আরও নীচু স্তরের মানুষ—যেমন তথাকথিত অপরাধপ্রবণ লোকরা—আইন তাদেরই শাস্তি দেয়।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। প্রথমত, রাজনৈতিক শ্রেণীভুক্ত অপরাধীদের উঁচু স্তরের মানুষ বলেই শাস্তি দেওয়া হয় এটা আমি স্বীকার করি না। অনেকক্ষেত্রেই তারা সমাজের আবর্জনা ; ভিন্ন রূপে হলেও যাদের তুমি নীচু স্তরের অপরাধী বলছ তাদের মতই বিকৃতবুদ্ধি।'

'কিন্তু আমি এমন লোকদের জানি যারা নৈতিক বিচারে তাদের বিচারকদের চাইতে অনেক উঁচু ; ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা নীতিবাদী, দৃঢ়চিত্ত—'

রাগঝিন্‌স্কি কথা বলার সময় বাধাপ্রাপ্ত হতে অভ্যস্ত নয়। নেখ্‌লয়ুদভের কথায় কান না দিয়েই সে কথা বলে চলল।

'বর্তমান ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখাই আইনের লক্ষ্য, একথাও আমি স্বীকার করি না। আইনের লক্ষ্য সংস্কার করা—'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'কারাগারে ঢুকিয়ে সংস্কার, চমৎকার !'

রাগঝিন্‌স্কি নিজের কথাই বলে চলল, 'অথবা যে সব বিকৃতবুদ্ধি ও

পশুভাবাপন্ন মানুষ সমাজকে বিপন্ন করে তোলে তাদের বিতাড়িত করা।'

'ঠিক সেইটেই সে করে না। এর কোনটা করার শক্তিই সমাজের নেই।'

জোর করে মুখে হাসি এনে রাগঝিন্‌স্কি বলল, 'তা কি করে হয়? আমি বুঝতে পারি না।'

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'আমি বলতে চাই, যুক্তিসম্মত শাস্তি মাত্র দু' রকমের হতে পারে, যেমন আগেকার দিনে ছিল: দৈহিক শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড; সমাজ যতই মানবিক হয়ে উঠছে এ দুটো ব্যবস্থাও ততই লোপ পেতে চলেছে।'

'সত্যি, তোমার মুখে এ সব কথা বেশ নতুন ও আশ্চর্যজনক।'

'হ্যাঁ, একটা লোককে শারীরিক আঘাত দেওয়া যুক্তিসম্মত যাতে সে ভবিষ্যতে অনুরূপ কাজ না করে; আর একটা লোক যখন সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে তখন তার মাথাটা কেটে ফেলাও যুক্তিযুক্ত। এসব শাস্তির তবু অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু কাজের অভাবে এবং খারাপ দৃষ্টান্তের ফলে বিকৃতবুদ্ধি একটি লোককে কারাগারে বন্দী করে রাখার অর্থ কি? কারাগারে তার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, তার উপরে একটা অলস জীবন চাপিয়ে দেওয়া এবং অত্যন্ত বিকৃতবুদ্ধি সব মানুষের মধ্যে তাকে ঠেলে দেবারই বা অর্থ কি? জনসাধারণের টাকায় (জনপ্রতি ব্যয় হয় পাঁচশ' রুবলেরও বেশী) একটা লোককে তুলা থেকে ইর্কুতস্ক জেলায় চালান দেওয়া, অথবা কুর্স্ক থেকে—'

'হ্যাঁ, জনসাধারণের টাকায় হলেও এই সব পথ চলাকে লোকে ভয় করে, এবং দীর্ঘ পথচলা ও কারাগার না থাকলে, তুমি আমি আজ এখানে এ ভাবে বসে থাকতে পারতাম না।'

'কিন্তু কারাগার তো আমাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে পারে না, কারণ সেই সব লোক সেখানে চিরকাল থাকে না, তাদের আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। বরং এই সব জায়গায় মানুষকে সব চাইতে বেশী পাপ ও অধঃপতনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়; কাজেই বিপদ আরও বাড়ে।'

'তুমি তাহলে বলতে চাও যে, কারা-ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করা দরকার?'

'তার কোন উন্নতি হতে পারে না। উন্নত ধরনের কারাগার মানেই বর্তমান জন-শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার চাইতেও অধিক অর্থব্যয় এবং জনসাধারণের ঘাড়ে আরও বোঝা চাপিয়ে দেওয়া।'

শ্যালকের কথায় কান না দিয়ে রাগঝিন্‌স্কি বলল, 'কিন্তু কারা-ব্যবস্থার ত্রুটি তো আইনকে অসিদ্ধ করতে পারে না।'

আরও গলা তুলে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'এ সব ত্রুটির কোন প্রতিকার নেই।'

রাগঝিন্‌স্কি মন্তব্য করল, 'তাহলে? তাদের স্রেফ মেরে ফেলা হবে? বা কোন কূটনীতিক যেমন প্রস্তাব করেছেন, লোকের চোখ উপড়ে নেওয়া হবে?'

'হ্যাঁ, কাজটা খুব নিষ্ঠুর হলেও কলপ্রসূ হবে। এখন যা করা হয় তাও

নিষ্ঠুর, এবং শুধু যে অফলপ্রসূ তাই নয়, সেটা এতদূর বোকামি যে বুদ্ধিমান লোকরা কেমন করে যে ফৌজদারি আইনের মত একটা অবাস্তব ও নিষ্ঠুর কাজের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে তা তো বুঝতে পারি না।'

বিবর্ণ মুখে রাগঝিন্স্কি বলল, 'কিন্তু আমিও তো ঐ কাজের সঙ্গেই জড়িত।'

'সেটা আপনার ব্যাপার। আমার কাছে এটা দুর্বোধ্য।'

কাঁপা গলায় রাগঝিন্স্কি বলল, 'আমার মনে হয়, অনেক ভাল জিনিসই তোমার কাছে দুর্বোধ্য।' সে উঠে দাঁড়াল।

নেখ্‌ল্যুদভের চোখে পড়ল, ভগ্নিপতির চশমার নীচে কি যেন চিকচিক করছে। 'চোখের জল কি?' সে ভাবল। চোখের জলই বটে, তবে আহত গর্বের অশ্রু। জানালার কাছে গিয়ে রাগঝিন্স্কি রুমাল বের করে একটু কেশে চশমা মুছল এবং পরে চশমা খুলে নিয়ে চোখ মুছল।

সোফায় ফিরে গিয়ে একটা সিগার ধরাল। আর কোন কথাই বলল না।

ভগ্নিপতি ও দিদিকে এতখানি আঘাত দেওয়ায় নেখ্‌ল্যুদভ দুঃখিত হল, লজ্জাবোধ করল; বিশেষ করে যখন পরের দিনই সে চলে যাচ্ছে এবং আর কোন দিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

বিচলিতভাবে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে বাড়ি ফিরে গেল।

সে ভাবতে লাগল, 'হয় তো আমি যা কিছু বলেছি সবই সত্য—অন্তত তিনি তো কোন জবাব দেন নি। কিন্তু কথাগুলি বলা ঠিক হয় নি। তাদের প্রতি বিরক্তিবশত আমি যখন তাকে এবং বেচারি নাতালিয়াকে দুঃখ দিতে, আঘাত করতে পেরেছি, তখন বুঝতে হবে আমি সত্যি বদলে গেছি।'

অধ্যায়—৩৪

যে কয়েদীদের দলে মাসলভা ছিল তারা বেলা তিনটের ট্রেনে মস্কো ছাড়বে; কাজেই কয়েদীদের যাত্রারম্ভের সময় উপস্থিত থেকে তাদের সঙ্গে স্টেশনে যাবার উদ্দেশ্যে নেখ্‌ল্যুদভ বেলা বারোটার আগেই কারাগারে পৌঁছবে স্থির করল।

গত রাত্রে জিনিসপত্র গুছিয়ে কাগজপত্র বেছে নেবার সময় দিন-পঞ্জীটা হাতে পড়ল। পাতা উল্টে এখানে-সেখানে কিছুটা কিছুটা পড়ল। পিতার্সবার্গ যাবার আগে দিন-পঞ্জীতে শেষ লিখেছিল; 'আমার ত্যাগকে কাতয়ুশা গ্রহণ করতে চায় না; সে নিজেই ত্যাগ করতে চায়। সে বিজয়িনী হয়েছে, আর আমিও বিজয়ী হয়েছি। যদিও আমার বিশ্বাস করতে ভয় হয় তবু তার মধ্যে যে আন্তর-পরিবর্তন শুরু হয়েছে তাতেই আমি সুখী। বিশ্বাস করতে আমার ভয় হলেও মনে হয় সে আবার জীবনের পথে ফিরে আসছে।' সে আরও পড়তে লাগল। 'অত্যন্ত কঠোর অথচ অত্যন্ত আনন্দময় অবস্থার ভিতর দিয়ে

আমি চলেছি। যখন শুনলাম, হাসপাতালে সে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে, তখন হঠাৎ মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। এটা যে এতদূর বেদনাদায়ক হতে পারে তা আগে বুঝতে পারি নি। মনে বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। তখনি হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে অপরাধের জন্য তাকে আমি ঘৃণা করছি, অন্ততঃ চিন্তায়ও আমি নিজেও তো সে অপরাধ কতবার করেছি এবং এখনও করে চলেছি; তৎক্ষণাৎ আমি নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলাম; তার প্রতি মনে করুণা জাগল; আবার আমি সুখী হলাম। সময় মত নিজেদের বড় বড় দোষগুলি চোখে পড়লে আমরা অন্যের প্রতি কত সদয়ই না হতে পারি।' এ পর্যন্ত পড়ে সে নতুন করে লিখল: 'নাতালিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আত্ম-তুষ্টি আবার আমাকে নির্মম করে তুলেছিল, অন্যকে আঘাত করতে প্ররোচিত করেছিল। মন এখনও ভারি হয়ে আছে। কোন উপায় নেই। আগামীকাল শুরু হবে নতুন জীবন। পুরনো জীবনকে জানাব শেষ বিদায়! অনেক নতুন ধারণা মনের মধ্যে জমে উঠেছে, কিন্তু এখনও তাদের একসূত্রে বাঁধতে পারছি না।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙবার পরে প্রথমেই ভগ্নিপতির প্রতি গতকালের আচরণের জন্য নেখ্‌ল্যুদভের মনে অনুশোচনা দেখা দিল।

সে ভাবল, 'এ ভাবে আমি চলে যেতে পারি না। এখনই গিয়ে তাদের সঙ্গে মিটমাট করে আসব।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে যাবার সময় নেই। কয়েদীদলের যাত্রার সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে হলে তাকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে। অতি দ্রুত জিনিসপত্র ঠিক করে একটি চাকর ও ফেদসিয়ার স্বামী তারাসকে দিয়ে সেগুলি স্টেশনে পাঠিয়ে দিল এবং প্রথম যে ইজভজচিকটা পেল তাতেই চড়ে কারাগারের দিকে অগ্রসর হল।

যে ট্রেনে সে যাবে তার মাত্র দু'ঘণ্টা আগে কয়েদীদের ট্রেনটা ছাড়বে। কাজেই নেখ্‌ল্যুদভ লজিং-এর পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত সেখান থেকে বিদায় নিল।

তখন জুলাই মাস। আবহাওয়া অসহ্য গরম। রাজপথের পাথর, দেয়াল ও ছাদের লোহা সারা রাত গুমোটের জন্য মোটেই ঠাণ্ডা হয় নি; তার থেকে নিশ্চল বাতাসে যেন আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা ঈষৎ ঠাণ্ডা বাতাস বইলেও তার ফলে ধুলো ও তেল-রঙের গন্ধভরা গরম বাতাসের ঝাপটা এসে গায়ে লাগছে।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। যারা আছে তারাও ছায়ার দিকটা দিয়েই চলতে চেষ্টা করছে। শুধু রোদে-পোড়া তামাটে মুখের চাষীরা বাকলের জুতো পরে রাস্তা মেরামত করছে; রোদ্দুরে বসে তারা তপ্ত বালুর মধ্যে পাথর বসাবার জন্য হাতুড়ি পিটছে। বিষণ্ণ পুলিশরা রাস্তার মাঝখানে

দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়ায় টানা ট্রামগুলো ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রৌদ্রদগ্ধ পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করছে।

নেখ্‌ল্যুদভ যখন কারাগারে পৌছল, কয়েদীরা তখনও প্রাঙ্গণ ছেড়ে যায়নি। কয়েদীদের ছেড়ে দেওয়া ও বুঝে নেওয়ার ঝঞ্ঝাটপূর্ণ কাজটা শুরু হয়েছিল ভোর চারটের সময়, সে এখনও চলেছে। দলে আছে ছ' শ' তেইশজন পুরুষ ও চৌষট্টি জন স্ত্রীলোক। তাদের সকলকে গুণতে হবে, রেজিস্ট্রি-তালিকার সঙ্গে মেলাতে হবে, রুগ্ন ও দুর্বলদের আলাদা করতে হবে এবং তারপর সকলকে 'কনভয়' (সহগামী রক্ষি-দল)-এর হাতে তুলে দিতে হবে। দু'জন সহকারী সহ নতুন ইন্সপেক্টর, ডাক্তার, তার সহকারী, কনভয়-অফিসার ও করণিক সকলেই কারাপ্রাঙ্গণে দেয়ালের ছায়ায় লেখার সরঞ্জাম ও কাগজপত্র বোঝাই একজন একটা টেবিলে বসে আছে। তারা একজন একজন করে কয়েদীদের ডাকছে, পরীক্ষা করছে, প্রশ্ন করছে, আর মন্তব্য লিখছে।

রোদ ক্রমে টেবিলে এসে পড়ল। একে বাতাস নেই, তাতে একগাদা কয়েদীর নিঃশ্বাস, জায়গাটা অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে।

'হায় ভগবান, এর কি আর শেষ হবে না!' কনভয়-অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠল। ঢ্যাঙা, মোটা, লাল-মুখ লোকটির কাঁধ দুটি চওড়া, হাত দুখানি ছোট। ঘন গোঁফের ভিতর দিয়ে অবিরাম সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। 'আপনারা কি আমাকে মেরে ফেলবেন? এতসব জুটিয়েছেন কোত্থেকে? আরও অনেক বাকি আছে নাকি?'

করণিক তালিকাটা দেখল।

'আরও চব্বিশটি পুরুষ-কয়েদী আছে; তাছাড়া মেয়ে-কয়েদী তো আছেই।'

বাকি কয়েদীরা সার ধরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে কনভয়-অফিসার হাঁক দিল, 'ওখানে সব দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে এস।' তিন ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে কয়েদীরা গাদাগাদি করে প্রচণ্ড রোদ্দুরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, কখন কার ডাক আসবে সেই আশায়।

কারা-প্রাঙ্গণে যখন এই সব চলছিল তখন ফটকের বাইরে (একজন রাইফেলধারী শান্ত্রী তো যথারীতি দাঁড়িয়েই ছিল) কয়েদীদের মালপত্র এবং যে সব কয়েদী হেঁটে যেতে পারবে না তাদের বয়ে নিয়ে যাবার জন্য খান বিশেক গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। এককোণে দাঁড়িয়েছিল কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব; কয়েদীরা যখন বেরিয়ে আসবে তখন তাদের একবার দেখতে পাবার এবং সুযোগ পেলে দুটো কথা বলার ও কিছু জিনিসপত্র দেবার আশায়।

সেই দলের মধ্যে নেখ্‌ল্যুদভও জায়গা করে নিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াবার পর শোনা গেল শিকলের ঝনঝন্, পা ফেলার শব্দ, কর্তৃপক্ষের হাঁক-ডাক, কাশির শব্দ ও অনেক মানুষের কল-গুঞ্জন।

এই চলল প্রায় পাঁচ মিনিট। এর মধ্যে কয়েকটি রক্ষী বার বার ফটক দিয়ে আসা-যাওয়া করল। তারপর শোনা গেল আদেশ।

ফটকটা সশব্দে খুলে গেল। শিকলের ঝনাৎকার উচ্চতর হল, কনভয়ের সাদা কোর্তা পরা রাইফেলধারী রক্ষীদল রাজপথে বেরিয়ে এসে ফটকের সামনে গোল হয়ে দাঁড়াল। এইটেই প্রচলিত ব্যবস্থা। তখন আর একটা আদেশ ধ্বনিত হল। সঙ্গে সঙ্গে জোড়ায়-জোড়ায় কয়েদীরা বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের কামানো মাথায় চ্যাপ্টা টুপি, কাঁধে ঝোলা। এক হাতে ঝোলাটা ধরে অন্য হাত ঝোলান্তে ঝোলাতে শিকলে বাঁধা পা টেনে টেনে তারা বেরুতে লাগল।

প্রথমে এল সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা। সকলের একই পোষাক—ধূসর ট্রাউজার ও আলখাল্লা, পিঠের উপর নম্বর-মারা। যুবক ও বৃদ্ধ, সরু ও মোটা, ফ্যাকাসে, লাল ও কালো, দাড়িওয়ালা ও দাড়িবিহীন, রুশ, তাতার ও ইহুদি—সকলেই শিকলের শব্দ করে সবেগে হাত দোলাতে দোলাতে এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন তারা দীর্ঘ পথের যাত্রী, কিন্তু দশ পা যাবার পরেই তাদের থামিয়ে দেওয়া হল ; তারাও একান্ত অনুগতভাবে চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে আরও মাথা কামানো লোক দলে দলে বেরিয়ে এল। তাদেরও একই পোষাক, শুধু পায়ে শিকল নেই, কিন্তু দু'জন করে এক সঙ্গে হাতে হাত-কড়া লাগানো। এদের হয়েছে নির্বাসন দণ্ড। তারা ঐ একইভাবে দ্রুতগতিতে এসেই হঠাৎ থেমে গেল এবং চারজন করে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে এল সেই সব কয়েদী যারা তাদের কম্যুন কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছে।

তারপর সেই একই পর্যায়ক্রমে এল নারী-কয়েদীরা। প্রথমে, সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিতরা, তাদের পরণে ধূসর আলখাল্লা ও রুমাল ; তারপর নির্বাসিত নারী ও যে সব স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করে চলেছে তারা, তাদের পরণে নিজ নিজ গ্রাম বা শহরের পোষাক। কারও বা কোলে শিশু-সন্তান।

স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এসেছে ছোট ছেলে-মেয়ে ও বালক-বালিকা ; একদল ঘোড়ার বাচ্চার মত তারা কয়েদীদের পিছু পিছু চলেছে।

পুরুষরা নীরবেই দাঁড়িয়ে আছে ; মাঝে মাঝে একটু কাশছে, বা দু' একটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করছে।

কিন্তু মেয়েরা অনবরত বকে চলেছে। নেখ্‌লুদভের মনে হল, সে যেন একবার মাসলভাকে দেখতে পেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। তার চোখের সামনে শুধু একদল ধূসর জীববিশেষ—তাদের মানবিকতার বিশেষ করে নারীত্বের লক্ষণমাত্র নেই। পিঠের উপর বোঁচকা ও চারদিকে ছেলেমেয়ে নিয়ে পুরুষদের পিছনে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

কারা-প্রাচীরের ভিতরে যদিও কয়েদীদের একবার গুণতি করা হয়েছে, তবু কনভয় আর একবার তাদের গুণে তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে নিল। এতে অনেক

সময় লাগল ; বিশেষ করে কিছু কয়েদী চলাফেরা করে জায়গা বদল করায় কনভয়ের হিসাবে গোলমাল পাকিয়ে দেওয়ায় সময় আরও বেশী লাগল।

কনভয়ের সৈন্যদল কয়েদীদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে আর একবার গুণে নিল। সব গুণতি শেষ হয়ে গেলে অফিসার যাত্রার আদেশ দিতেই হৈ-চৈ লেগে গেল। পুরুষ, নারী, বাচ্চা সকলেই বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে যে যার আগে পারে গাড়িতে উঠতে লাগল। স্ত্রীলোকদের কোলে শিশুরা কাঁদছে, একটু বড় ছেলেমেয়েরা জায়গার জন্য কাড়াকাড়ি করছে, আর পুরুষরা বিষণ্ন মনে গাড়িতে উঠছে।

কিছু কয়েদী মাথার টুপি খুলে অফিসারের কাছে কি যেন অনুনয়-বিনয় করতে লাগল। নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, তারা গাড়িতে একটুখানি জায়গা চাইছে। অফিসারটি এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এমনভাবে হাত ছুঁড়তে লাগল যে কয়েদীরা ভয়ে সরে গেল।

অফিসার চেঁচিয়ে বলল, 'তোদের এমন গাড়ি চড়াব যে চিরদিন মনে থাকবে। যা, যা, হেঁটে চলে যা।'

শুধু একটি লোককে অনুমতি দেওয়া হল। লোকটি বুড়ো, পায়ে শিকল পরানো। ভারী শিকল নিয়ে সে পা দুটো তুলতেও পারছিল না। পাশ হতে একটি স্ত্রীলোক হাত ধরে তাকে গাড়িতে তুলে নিল।

সব মালপত্র ও লোকজন ওঠানো হয়ে গেলে অফিসার মাথার টুপি খুলে কপাল, টাক-মাথা ও লাল ঘাড়টা মুছে একটা ক্রশ-চিহ্ন আঁকল।

'আগে বাড়।' সে যাত্রার আদেশ দিল।

সৈন্যদের রাইফেলে খটখট শব্দ উঠল, কয়েদীরা টুপি খুলে ক্রশ-চিহ্ন আঁকল, যারা দেখা করতে এসেছিল তারা চীৎকার করে কি যেন বলতে লাগল, আর কয়েদীরাও প্রত্যুত্তরে কি সব বলল। সৈন্য পরিবৃত হয়ে একদল শিকল-পরা লোক পায়ে পায়ে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে সৈন্যদল ; তারপর শিকল-পরা সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা ; তারপর নির্বাসিত ও কম্যুন-কর্তৃক দণ্ডিত দু'জন করে হাত-কড়া লাগানো কয়েদীরা ; তারপর মেয়েরা। তাদের পিছনে বোঁচকা-বুঁচকি বোঝাই গাড়িতে করে চলল দুর্বল কয়েদীরা। গাড়িতে বসে একটি স্ত্রীলোক সমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অধ্যায়—৩৫

কয়েদীদের সারিটা এতই লম্বা হয়েছিল যে সামনের লোকজনরা যখন চোখের আড়ালে চলে গেল, মালপত্র ও দুর্বল কয়েদী বোঝাই গাড়িগুলো তখন সবে চলতে শুরু করল। শেষ গাড়িটা ছেড়ে দিলে নেখ্‌লয়ুদভ অপেক্ষমান ইজভজচিককে বলল গাড়ি চালিয়ে সামনের কয়েদীদের ধরে ফেলতে ; তাহলেই দলে কোন পরিচিত কেউ থাকলে তার নজরে পড়বে এবং মাসলভাকে খুঁজে

পেয়ে পাঠানো জিনিসগুলো সে পেয়েছে কিনা সেটা জানবার চেষ্টাও করতে পারবে।

দিনটা অত্যন্ত গরম। একেবারেই বাতাস নেই। এক হাজার পায়ে পায়ে ধূলোর মেঘ উঠে রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলা কয়েদীদের মাথার উপর ঝুলে রয়েছে। কয়েদীরা বেশ দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে, কাজেই তাদের ধরে ফেলতে ধীর-গতি ইজভজচিকের ঘোড়াটার বেশ কিছু সময় লাগল। তারা একের পর এক সেই অপরিচিত ভীষণ-দর্শন কয়েদীদের দলকে পার হয়ে গেল, কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ তাদের কাউকে চিনতে পারল না।

সকলেরই এক রকম পোষাক। পায়ে এক রকম জুতো। খালি হাতটা দোলাতে দোলাতে পা ফেলে ফেলে তারা এগিয়ে চলেছে। তারা সংখ্যায় এত বেশী, দেখতে এতই এক রকম, আর এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থায় তাদের ফেলা হয়েছে যে নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল ওরা মানুষ নয়, অন্য কোন ভয়ংকর জীব। এই দলের মধ্যে যখন সে খুনী ফিয়দরভকে, নির্বাসিত ওখোতিন্‌কে এবং তার সাহায্যপ্রার্থী অপর একজন ভবঘুরেকে দেখতে পেল, তখন তার মনের এই ভাব কেটে গেল। তার গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন কয়েদীরা সকলেই গাড়িটার দিকে এবং ভিতরে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে দেখছিল। ফিয়দরভ যে তাকে চিনতে পেরেছে সেটা বোঝাবার জন্য মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে দিল, ওখোতিন্‌ একটু চোখটা টিপল, কিন্তু কেউই অভিবাদন করল না; হয় তো তারা মনে করেছে, এ অবস্থায় অভিবাদন করা চলে না।

মেয়েদের কাছে পৌঁছেই নেখ্‌লয়ুদভ মাসলভাকে চিনতে পারল। সে দ্বিতীয় সারিতে ছিল। তাদের সারির প্রথমে ছিল একটি খাটো পা, কালো চোখ, বীভৎস মেয়েমানুষ, আলখাল্লাটাকে সে কোমরে গুঁজে নিয়েছে। তার নাম খরলাভ্‌কা। দ্বিতীয় একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক, অতিকষ্টে সে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে। মাসলভা তৃতীয়; কাঁধে বোঁচকা নিয়ে সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ শান্ত ও সংকল্পে দৃঢ়। সারির চতুর্থ জন একটি সুন্দরী তরুণী; পরণে খাটো আলখাল্লা, মাথায় চাষীদের মত করে রুমাল বাধা; বেশ তেজের সঙ্গে হাঁটছে। সেই ফেদসিয়া।

নেখ্‌লয়ুদভ গাড়ি থেকে নেমে মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেল। মনের ইচ্ছা, মাসলভাকে জিজ্ঞাসা করবে পাঠানো জিনিসগুলো পেয়েছে কিনা এবং তার কেমন লাগছে। কনভয়-সার্জেন্টটি সেই দিক ধরেই হাঁটছিল। তাকে দেখেই সে ছুটে এল।

'এ কাজ করবেন না স্যার। দলের কারও সঙ্গে কথা বলা নিয়মবিরুদ্ধ।'

কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভকে চিনতে পেরে (কারাগারের সকলেই তাকে চিনত) সার্জেন্টটি তার কাছে এসে টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'এখন নয় স্যার;

রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ; এখানে দেখা করতে দেওয়া হয় না। এই —পিছিয়ে থেক না, আগে বাড়!' কয়েদীদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে পায়ে সুদৃশ্য নতুন জুতো থাকা সত্বেও সেই প্রচণ্ড গরমে একলাফে সে তার জায়গায় ফিরে গেল।

নেখ্‌লুদভ পাশের ফুটপাথে উঠে গেল এবং ইজভজচিককে পিছন পিছন আসতে বলে পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল। কয়েদীর দল যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানেই আতংক ও সমবেদনা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে সকলে তাদের দেখছে। গাড়ি করে যারা যাচ্ছে তারা মুখ বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায় তাদের দেখছে। পদযাত্রীরা দাঁড়িয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখছে। কেউ এগিয়ে এসে কয়েদীদের ভিক্ষা দিচ্ছে, কনভয়ের লোকেরাই সেগুলি নিয়ে নিচ্ছে। অনেকে আবার মোহাচ্ছন্নের মত কয়েদীদের পিছনে চলতে লাগল ; তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথা নেড়ে হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সর্বত্রই মানুষ ফটকে ও দরজায় এসে দাঁড়াল, হাঁক দিয়ে অন্যদের ডাকল, অথবা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এই ভীতিপ্রদ লোকযাত্রা দেখতে লাগল।

অধ্যায়—৩৬

কয়েদীদের দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখেই নেখ্‌লুদভ এগোতে লাগল। হাল্কা জামা-কাপড়েও তার ভীষণ গরম লাগছিল ; দমবন্ধ করা, নিশ্চল, ধুলো-ভরা জলন্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও বেশ কষ্ট হচ্ছিল।

সিকি মাইলটাক হাঁটবার পরে সে আবার গাড়িতে উঠে বসল। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে বলে সেখানে গরম আরও বেশী। গত রাতে ভগ্নিপতির সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল সেটা মনে পড়ল ; কিন্তু সকলের মত এখন আর সে রকম উত্তেজনা বোধ করল না। কয়েদীদের যাত্রা ও পথ চলা, এবং বিশেষ করে এই অসহ্য গরম সে সব কিছু ঢেকে দিয়েছে।

ফুটপাথের উপরে একটা বেড়ার উপর থেকে ঝুঁকে পড়া গাছের ছায়ায় দুটি স্কুলের ছাত্র একজন বরফওয়ালার সামনে দাঁড়িয়েছিল। একজন একটা বরফ খাচ্ছিল, আর একজনের জন্য সে সরবত তৈরি করছিল।

কিছু পানীয়ের প্রয়োজন বোধ করায় নেখ্‌লুদভ ইজভজচিককে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কিছু পানীয় কোথায় পাওয়া যাবে?'

'কাছেই একটা ভাল জায়গা আছে,' বলে ইজভজচিক মোড় ঘুরে মস্ত বড় সাইনবোর্ড লাগানো একটা দরজার সামনে তাকে নিয়ে গেল।

এক বোতল সোডার জলের অর্ডার দিয়ে নেখ্‌লুদভ ময়লা চাদরে ঢাকা একটা ছোট টেবিলে গিয়ে বসল। আর একটা টেবিলে দুটো লোক চা ও একটা সাদা বোতল সামনে নিয়ে বসে ছিল। তাদের একজনের রং ময়লা,

মাথায় টাক, আর পিছনের দিকে অল্প কিছু চুল। অনেকটা রাগঝিনৃস্কির মত। তাকে দেখেই গতকাল ভগ্নিপতির সঙ্গে তার যে সব কথা হয়েছিল সেগুলি মনে পড়ে গেল, আর অমনি বোন ও ভগ্নিপতির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা তার মনে জাগল।

সে ভাবল, 'ট্রেন ছাড়বার আগে তো আর সে সময় হবে না। তার চাইতে একটা চিঠি লিখি।' কাগজ, খাম ও টিকিট চেয়ে নিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সে ভাবতে লাগল কি লিখবে। মাথায় এলোমেলো চিন্তা ঢোকায় চিঠির বয়ান কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

'প্রিয় নাতালিয়া,—গতকাল তোমার স্বামীর সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তার গুরুভার মনের মধ্যে বহন করে আমি চলে যেতে পারছি না।···আর কি? কাল যা কিছু বলেছি তার জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি যা মনে করি তাই তাকে বলেছি। তিনি হয় তো ভাববেন, আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ—না, আমি পারি না—' তার মনের মধ্যে পুনরায় লোকটির প্রতি ঘৃণা জেগে উঠল। অসমাপ্ত চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে দাম চুকিয়ে সে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর গাড়িতে উঠে কয়েদীর দলকে ধরতে এগিয়ে চলল।

গরম আরও বেড়েছে। পাথর ও দেয়াল থেকে যেন গরম ভাঁপ বেরুচ্ছে, ফুটপাথে পা যেন পুড়ে যাচ্ছে, গাড়ির রং-করা মাড্-গার্ডে হাত দিতেই হাতে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগল।

রাস্তাটা যেখানে একটা নর্দমার দিকে ঢালু হয়ে গেছে সেখানে একটা বড় বাড়ির ফটকের সামনে একদল লোক জমা হয়েছে এবং কনভয়ের একটি সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে।

নেখ্‌লয়ুদভ কোচয়ানকে থামতে বলল। একজন কুলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'একটা কয়েদীর কি যেন হয়েছে।'

গাড়ি থেকে নেমে নেখ্‌লয়ুদভ ভীড়ের দিকে এগিয়ে গেল। নর্দমার এবড়ো-খেবড়ো পাথরের উপরে ঢালুর দিকে মাথা রেখে একটি বয়স্ক কয়েদী পড়ে আছে। মুখে লাল দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, সারা মুখটাও খুব লাল। পরণে একটা ধূসর আলখাল্লা ও ধূসর ট্রাউজার। ফুটকি-ফুটকি দাগওয়ালা হাতের তালু ছড়িয়ে দিয়ে লোকটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। রক্তের মত লাল চোখ দুটো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। চওড়া উঁচু বুকটা বেশ কিছুক্ষণ পরে পরে উঠছে-নামছে, আর একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিরক্ত পুলিশ, একটি ফেরিওয়ালা, ডাক-পিয়ন, করণিক, ছোট ছাতা হাতে একটি বৃদ্ধা, ও খালি ঝুড়ি হাতে ছোট করে চুল ছাঁটা একটি ছেলে।

নেখ্‌লয়ুদভকে দেখে করণিক বলল, 'এমনিতেই খুব দুর্বল। হাজতে আটক থেকে থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তার উপর এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে চলেছে।'

ছাতা হাতে বৃদ্ধাটি বলল, 'হয় তো মারাই যাবে।'

পিওন বলল, 'ওর কলারটা ঢিলে করে দেওয়া উচিত।'

পুলিশের লোকটি কাঁপা কাঁপা আঙুল দিয়ে কলারটা খুলতে শুরু করল। সেও বেশ উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছে। তবু জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এখানে ভীড় করেছ কেন? এমনিতেই এই গরম। তার উপর তোমরা বাতাসটাও আটকে দিয়েছ।'

করণিক আইনের জ্ঞান দেখাতে বলল, 'উচিত ছিল একজন ডাক্তার দিয়ে সকলকে পরীক্ষা করানো এবং যারা দুর্বল তাদের রেখে আসা। প্রায় মরা অবস্থায়ই তো একে চালান করে দিয়েছে।'

শার্টের ফিতেটা খুলে দিয়ে পুলিশটি উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল।

'সবাই সরে পড়। এখানে তোমাদের কি কাজ? হাঁ করে দেখার কি আছে?' বলতে বলতে সে সমর্থনের আশায় নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকাল। কিন্তু তার মুখে সমর্থকের চিহ্ন না দেখে কনভয়-সৈন্যটির দিকে মুখ ফেরাল।

কিন্তু সে তখন তার মাড়িয়ে-দেওয়া জুতোর গোড়ালি পরীক্ষা করতেই ব্যস্ত, পুলিশের দিকে তার নজর নেই।

ভীড়ের ভিতর থেকে কেউ কেউ বলে উঠল, 'যাদের কাজ তারা তো থোরাই কেয়ার করে।......এই ভাবে মানুষকে মেরে ফেলা কি ঠিক,...... কয়েদীও তো মানুষ।'

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'ওর মাথাটা তুলে ধর, আর একটু জল দাও।'

'জল আনতে পাঠিয়েছি,' বলে পুলিশটি দুই হাতে কয়েদীটিকে ধরে অনেক কষ্টে নিজেও একটু উঁচু হল।

'এখানে এত ভীড় কিসের?' একটা কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আর পরিষ্কার ভাবে কামানো ঝকঝকে জামা ও ততোধিক ঝকঝকে টপ-বুট পরা একজন পুলিশ-অফিসার দর্শন দিল।

'এগিয়ে যাও। এখানে দাঁড়ানো চলবে না।' ভীড় কেন জমেছে সেটা খোঁজ না করেই সে চেঁচিয়ে বলল।

তারপর কাছে গিয়ে মুমূর্ষু কয়েদীটিকে দেখতে পেয়ে এমন ভাবে মাথাটা নাড়ল যেন এটা তার আগে থেকেই জানা ছিল। পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাপার কি?'

পুলিশ জানাল, একদল কয়েদী যাচ্ছিল; একজন কয়েদী নীচে পড়ে গেলে কনভয়-অফিসারের আদেশে তাকে ফেলেই সকলে চলে গেছে।

'আচ্ছা। ঠিক আছে। ওকে থানায় নিয়ে যেতে হবে। একটা ইজভজ-চিক ডাকো।'

টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে পুলিশ বলল, 'গাড়ি ডাকতে কুলি গেছে।'

করণিক গরম সম্পর্কে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, পুলিশ অফিসার বাধা দিল, 'সেটা কি আমার ব্যাপার, অ্যাঁ? চলে যাও এখান থেকে।' সে এমন ভাবে তাকাল যে করণিকটি চুপ করে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, 'একটু জল একে দেওয়া উচিত।'

পুলিশ-অফিসার তার দিকেও কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। কুলি এক মগ জল নিয়ে এলে অফিসার পুলিশকে বলল খানিকটা জল খাইয়ে দিতে। পুলিশ তার ঢলে-পড়া মুখটা তুলে একটু জল ঢেলে দিল, কিন্তু বন্দী সে জল গিলতে পারল না, তার দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কুর্তা ও নোংরা সুতীর শার্টটা ভিজিয়ে দিল।

অফিসার আদেশ করল, 'জলটা ওর মাথায় ঢেলে দাও'; পুলিশ টুপিটা খুলে বন্দীর লাল চুল ও টাকের উপর জলটা ঢেলে দিল।

লোকটি যেন ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল; কিন্তু তার অবস্থা এক রকমই রইল।

তার নোংরা মুখ থেকে জমাট ধুলো-বালি ধুয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু মুখটা আগের মতই খাবি খেতে লাগল, সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

নেখ্‌লয়ুদভের ইজভজচিকটা দেখিয়ে পুলিশ-অফিসার বলল, 'দেখ, এটা নিয়ে যাও। এই, এগিয়ে আয়।'

চোখ না তুলেই ইজভজচিক বিরক্ত গলায় বলল, 'ভাড়া আছে।'

'ইজভজচিকটা আমার। তুমি ওকে নিয়ে যাও, ভাড়া আমিই দেব।' শেষের কথাগুলি নেখ্‌লয়ুদভ কোচয়ানকে বলল।

অফিসার চীৎকার করে উঠল, 'হাঁ করে আছ কেন সব? ওকে ধরে তোল।'

পুলিশ, কুলি ও কনভয়-সৈন্যটি মিলে মৃতপ্রায় লোকটিকে তুলে নিয়ে গাড়ির মধ্যে আসনে বসিয়ে দিল। কিন্তু সে বসে থাকতে পারল না; মাথাটা ঢলে পড়ল, আর তারপরেই সমস্ত শরীরটা আসন থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

অফিসার হুকুম দিল, 'ওকে নীচেই শুইয়ে দাও।'

মৃতপ্রায় লোকটিকে আসনে নিজের পাশে বসিয়ে দিয়ে শক্ত ডান হাতটা দিয়ে তার শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে পুলিশটি বলল, 'ঠিক আছে স্যার; এই ভাবেই ওকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

কনভয়-সৈন্যটি তার কারা-জুতো পরা মোজাহীন পা দুটি ধরে গাড়ির ভিতরে তুলে দিল।

কয়েদীর টুপিটাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ-অফিসার সেটাকে তুলে নিয়ে তার ঢলে-পড়া ভিজে মাথায় পরিয়ে দিল।

তারপর হুকুম করল, 'এগিয়ে চল।'

ইজভজচিক রেগে চারদিকে তাকাল, মাথা নাড়ল, তারপর কনভয়-

সৈন্যটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে থানার দিকে এগিয়ে চলল। কয়েদীর পাশে বসে পুলিশটি বারে বারে পিছলে পড়ে-যাওয়া দেহটা টেনে তুলতে লাগল; তার মাথাটা এ-পাশ থেকে ও-পাশে দুলতে লাগল।

কনভয়-সৈন্যটি গাড়ির পাশে পাশে হাঁটছিল। সেও বারে বারে কয়েদীর পা জোড়াকে ঠিকমত রেখে দিচ্ছিল। নেখ্‌ল্যুদভ গাড়ির পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল।

অধ্যায়—৩৭

থানার ফটকে একজন সশস্ত্র শান্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে পেরিয়ে গাড়িটা থানার উঠোনে ঢুকে একটা দরজার সামনে থামল।

উঠোনে জনকয়েক লোক হাতের আস্তিন গুটিয়ে গাড়ি ধুতে ধুতে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা বলছিল।

গাড়িটা থামলে কয়েকজন পুলিশ সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং কয়েদীর প্রাণহীন দেহটাকে বাইরে বের করল।

যে পুলিশটি মৃতদেহটাকে এতক্ষণ ধরে ছিল সে গাড়ি থেকে নেমে অবশ হাতটাকে বার কয়েক নেড়ে-চেড়ে টুপিটা খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। মৃতদেহটাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হল। নেখ্‌ল্যুদভও সঙ্গে গেল। ছোট, নোংরা ঘরটায় চারটে শয্যা ছিল। দুটোতে ড্রেসিং-গাউন পরা দুটি রোগী বসেছিল; একজনের বাঁকা মুখ, গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, অপরজন ক্ষয়রোগী। দুটো শয্যা খালি ছিল; একটাতে কয়েদীকে শুইয়ে দেওয়া হল। একটি ছোটখাট মানুষ শুধুমাত্র তলবাস ও মোজা পরে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। তার চোখ দুটি চকচক করছে, ভুরু দুটো অনবরত নাচছে। প্রথমে কয়েদীর দিকে, তারপরে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে লোকটি হঠাৎ হো-হো করে হেসে উঠল। লোকটা পাগল, পুলিশ হাসপাতালে আছে।

'ওরা আমাকে ভয় দেখাতে চায়, কিন্তু না, তা পারবে না,' লোকটা বলল।

একজন পুলিশ অফিসার ও ডাক্তারের সাহায্যকারী ঘরে ঢুকল।

ডাক্তারের সাহায্যকারী মৃত লোকটির কাছে গিয়ে ফুটকি দাগওয়ালা হাতটা তুলে ধরল। তখনও নরম থাকলেও হাতটা মরার মত সাদা ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এক মুহূর্তের জন্য হাতটা ধরে রেখেই ছেড়ে দিল। হাতটা নির্জীবভাবে মৃত লোকটির পেটের উপর পড়ল।

সাহায্যকারী বলল, 'এর হয়ে গেছে।' তবু নিয়মরক্ষার জন্য কয়েদীর ভিজে জামাটা খুলে কোঁকড়া চুলগুলি পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে সে তার হলদেটে চওড়া নিশ্চল বুকের উপর কানটা রাখল। কোন শব্দ নেই। সাহায্যকারী উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা নাড়ল, তারপর লোকটির স্থির নীল চোখ দুটির প্রথমে

একটির ও পরে অপরটির পাতা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল।

ডাক্তারের সাহায্যকারীর দিকে থুথু ছিঁটিয়ে পাগলটা বার বার বলতে লাগল, 'আমি ভয় পাই নি, আমি ভয় পাই নি।'

'তারপর?' পুলিশ-অফিসার জিজ্ঞাসা করল।

ডাক্তারের সাহায্যকারী জবাব দিল, 'তারপর? একে শব-ঘরে পাঠাতে হবে।'

'খুব সাবধান! আপনি নিশ্চিত তো?' পুলিশ-অফিসার বলল।

মৃতের বুকের উপরে শার্টটা টেনে দিয়ে সাহায্যকারী বলল, 'এত দিনে তো বোঝা উচিত। যা হোক, মাত্‌ভি আইভানভিচকে ডেকে পাঠাচ্ছি, তিনি এসে একবার দেখুন। পেত্রভ, তাকে ডাক।' বলেই সে চলে গেল।

পুলিশ-অফিসার বলল, 'ওকে শব-ঘরে নিয়ে যাও।' তারপর কনভয়-সৈনিকটিকে বলল, 'তারপর তুমি আপিসে এসে সই করবে।'

'হ্যাঁ স্যার', সৈনিকটি বলল।

পুলিশরা ধরাধরি করে মৃতদেহটা নামিয়ে নিয়ে গেল। নেখ্‌ল্যুদভও যাচ্ছিল, কিন্তু পাগলটা তাকে বাধা দিল।

'আপনি তো এদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে নেই, তাহলে একটা সিগারেট দিন,' সে বলল। নেখ্‌ল্যুদভ সিগারেট কেসটা বের করে তাকে একটা সিগারেট দিল।

পাগলটা সারাক্ষণ ভুরু দুটো নাচাতে নাচাতে নানা রকম প্রশ্ন করে করে তাকে কি ভাবে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার বর্ণনা দিতে লাগল।

'জানেন, ওরা সব আমার শত্রু, নানা রকম পদ্ধতিতে ওরা আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিচ্ছে।'

'ক্ষমা করবেন,' বলে তার কোন কথায় কান না দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ উঠোনে বেরিয়ে গেল। মৃতদেহটা কোথায় রাখা হয় সেটা দেখাই তার ইচ্ছা।

পুলিশ অফিসার তাকে বাধা দিল।

'আপনি কি চান?'

'কিছু না।'

'কিছু না? তাহলে চলে যান।'

তার কথা মত নেখ্‌ল্যুদভ বেরিয়ে এসে ইজভজচিকের কাছে গেল। সে তখন ঝিমুচ্ছিল। তাকে জাগিয়ে তুলে দুজনে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হল।

তারা একশ' গজও পার হয় নি, এমন সময় রাইফেলধারী জনৈক কনভয়-সৈন্যসহ একখানা গাড়ির সঙ্গে তাদের দেখা হল। গাড়িতে আর একটি কয়েদী শুয়ে আছে; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে ইতিমধ্যেই মারা গেছে। কয়েদীটি গাড়ির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, গাড়ির প্রতিটি ধাক্কায় তার কামানো মাথাটা

লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। ভারী বুট পরা গাড়োয়ান রাসটা হাতে নিয়ে গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলেছে; একজন পুলিশও তার পিছন পিছন হাঁটছে। নেখ্‌ল্যুদভ ইজভজচিকের ঘাড়ে হাত রাখল।

ঘোড়া থামিয়ে ইজভজচিক বলল, 'দেখুন ওরা কি করছে!'

গাড়ি থেকে নেমে নেখ্‌ল্যুদভ কয়েদী-গাড়ির পিছন পিছন আবার থানার ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

পুলিশ-অফিসার এগিয়ে এসে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'একে আবার কোথেকে জোটালে?'

'গর্‌বাতভ্‌স্কায়া থেকে,' পুলিশটি জবাব দিল।

ফায়ার-বিগ্রেডের ক্যাপ্টেন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রশ্ন করল, 'কয়েদী নাকি?'

'হ্যাঁ। এটা দু'নম্বর।'

পুলিশরা মৃত লোকটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আগের মতই দোতলার হাসপাতালে নিয়ে গেল। নেখ্‌ল্যুদভ মোহাচ্ছন্নের মত তাদের অনুসরণ করল।

'আপনি কি চান?' একজন পুলিশ জিজ্ঞাসা করল।

নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল না। সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল। বিছানার উপর বসে পাগলটা নেখ্‌লয়ুদভের দেওয়া সিগারেটটাকে লোভীর মত টেনে যাচ্ছে।

হেসে বলল, 'আরে, আপনি ফিরে এসেছেন। মৃতদেহটা দেখতে পেয়ে মুখ ভেংচে বলল, 'আবার! আর পারি না। আমি তো ছেলেমানুষ নই, কি বলেন?' নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ঘুরে হাসতে হাসতে সে প্রশ্নটা করল।

নেখ্‌ল্যুদভ মৃত লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মুখটা দেখা যাচ্ছে, কয়েদীটির মুখ ও শরীর দুইই সুন্দর। পূর্ণ যৌবনদীপ্ত চেহারা। মাথার অর্ধেকটা কামানোর জন্য দেখতে কিছুটা খারাপ লাগলেও চুলের কাছটাতে ঈষৎ বাঁকানো সোজা কপাল, ও দুটি নিষ্প্রাণ চোখ বড়ই সুন্দর। সরু কালো গোঁফের উপর নাকটাও সুন্দর। ঠোঁট দুটি নীল হতে আরম্ভ করলেও এখনও তাতে হাসি লেগে রয়েছে। মুখের নীচের দিকে সামান্য দাড়ি, আর মাথার কামানো দিকটায় একটা সুগঠিত কানও দেখা যাচ্ছে। মুখের ভাবটা শান্ত, গম্ভীর, দয়াপরবশ।

সহজেই বোঝা যায়, লোকটির ভেতরকার একটি মহত্তর জীবনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা হয়েছে। তার হাতের ও শৃংখলিত পায়ের মজবুত হাড় ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্ত মাংসপেশী দেখে বোঝা যায় কী সুন্দর, শক্তিমান, কর্মচঞ্চল একটি মানব-পশু সে ছিল। তবু তার মৃত্যু ঘটান হল। আর সে জন্য একটি মানুষও দুঃখবোধ করল না, মানুষ হিসাবে তো নয়ই, এমন একটি কর্মক্ষম

পশুর মৃত্যুর জন্যও কেউ দুঃখিত হল না। তাকে কেন্দ্র করে একটি মাত্র মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে—আসন্ন পচনের আশংকায় তার দ্রুত অপসারণের প্রয়োজনীয়তার চিন্তাপ্রসূত বিরক্তি।

থানার ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ডাক্তার ও তার সাহায্যকারী ঘরে ঢুকল।

মৃত লোকটির বিছানার পাশে বসে ডাক্তার তার সাহায্যকারীর মতই লোকটির হাতটা তুলে ধরল, বুকের উপর কানটা রাখল, তারপর ট্রাউজারটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

'এর চাইতে আর বেশী মরতে পারে না,' ডাক্তার বলল।

ইন্সপেক্টর মুখ ভরে বাতাস নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়তে লাগল।

কনভয়-সৈন্যটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ কারাগার থেকে সে এসেছে?'

সৈনিক খবরটা জানিয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে মৃত লোকটির শিকলটা রয়েছে।

'সে আমি খুলিয়ে নেব; প্রভুকে ধন্যবাদ, হাতের কাছেই একজন কামার আছে,' কথাটা বলে পুনরায় বাতাসে গাল ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে সেটা ছাড়তে ছাড়তে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, 'এ রকম হল কেন?'

চশমার ভিতর দিয়ে ডাক্তার তার দিকে তাকাল।

'এ রকম কেন হয়েছে? মানে আপনি বলতে চান, সর্দিগর্মিতে এরা মরে কেন? কারণটা এই। সারা শীতকালটা এরা বিনা পরিশ্রমে, বিনা আলোয় বসে বসে কাটায়, আর তারপরই এই রকম একটা দিনের প্রচণ্ড রোদ্দুরে হঠাৎ তাদের বাইরে আনা হয়: দল বেঁধে এগিয়ে চলে বলে একটু বাতাসও পায় না, ফলে সর্দি-গর্মি লাগে।'

তাহলে এভাবে বাইরে আনা হয় কেন?'

'ওঃ, এই কথা। তা সেটা যারা পাঠায় তাদের জিজ্ঞাসা করুন গে। কিন্তু আমি কে জানতে পারি কি?'

'একজন পথিক মাত্র।'

'খুব ভাল কথা। শুভ অপরাহ্ন; আমার আর সময় নেই।' বিরক্ত হয়ে ডাক্তার ট্রাউজারটাকে নীচের দিকে টেনে রোগীর বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

'তুমি কেমন আছ?' বাঁকা মুখ, গলায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বিবর্ণ লোকটাকে ডাক্তার প্রশ্ন করল।

এদিকে পাগলটা বিছানায় বসে সিগারেটটা শেষ করে ডাক্তারের দিকে থুথু ফেলতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ বাইরে গিয়ে উঠোন পেরিয়ে ফটকটা পার হয়ে গেল। তারপর গাড়িতে উঠে বসল। কোচয়ান আবারও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অধ্যায়—৩৮

নেখ্‌লয়ুদভ যখন স্টেশনে পৌঁছল কয়েদীরা তখন রেলের কামরায় যার যার আসনে বসে পড়েছে। সব কামরার জানালাই লোহার জাল দিয়ে ঢাকা। তাদের সঙ্গে যারা দেখা করতে এসেছে তারা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে; কাউকে কামরার কাছে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

সেদিন কনভয়কে খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। কারাগার থেকে স্টেশনে আসবার পথে যে দুজনকে নেখ্‌লয়ুদভ দেখেছে তা ছাড়াও আরও তিনজন কয়েদী সর্দিগর্মিতে মারা গেছে। প্রথম দুজনের মত অপর একজনকেও নিকটবর্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, অন্যরা রেলওয়ে স্টেশনেই মারা গেছে।*

যে পাঁচটি লোক বেঁচে থাকতে পারত, তাদের হেপাজতে থেকে তারা মারা গেল, সে জন্য যে কনভয়ের লোকেরা কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছে তা নয়। এ সব ক্ষেত্রে আইনমাফিক যা কিছু করা দরকার পাছে তার কিছু বাদ পড়ে যায় সেটাই তাদের আসল দুশ্চিন্তা। নির্দিষ্ট স্থানে মৃতদেহগুলি পৌঁছে দেওয়া, তাদের কাগজপত্র ও জিনিসপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করা, নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদে যাদের পৌঁছে দিতে হবে তাদের তালিকা থেকে এদের নাম কেটে দেওয়া—এ সবই অত্যন্ত গোলমেলে কাজ, বিশেষ করে এ রকম প্রচণ্ড গরমের দিনে।

সব কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কনভয়ের লোকরা এই নিয়েই ব্যস্ত রইল। নেখ্‌লয়ুদভ ও অন্য যারা এ সব কাজ করবার অনুমতি চেয়েছিল তাদের কাউকে কামরার কাছে যেতেই দেওয়া হল না। অবশ্য নেখ্‌লয়ুদভ কনভয়-সার্জেন্টকে কিছু বসশিস দিয়ে সেখানে যাবার অনুমতি পেয়ে গেল। সার্জেন্ট তাকে বলল, ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নজরে পড়বার আগেই যেন সে তাড়াতাড়ি কথাবার্তা সেরে ফেলে। ট্রেনে মোট আঠারোটা কামরা ছিল, তার মধ্যে সরকারী কর্মচারিদের জন্য নির্দিষ্ট একটা কামড়া ছাড়া বাকী সবগুলিই কয়েদীতে বোঝাই। যেতে যেতে নেখ্‌লয়ুদভ সব কামরাগুলোতেই শুনতে পেল শিকলের ঝনঝনানি, মিলিত হট্টগোল আর শাপ-শাপান্ত; সঙ্গী মৃত কয়েদীর কথা কারও মুখে শোনা গেল না। বস্তা, খাবার জল আর জায়গা নির্বাচন নিয়েই যত কথাকাটাকাটি।

পুরুষদের কামরা পার হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ মেয়েদের কামরার কাছে গেল। দ্বিতীয় কামরা থেকে একটি মেয়ের আর্তনাদ শোনা গেল: 'ওঃ ওঃ, ওঃ! হা

---

*১৮৮০ সালে মস্কোতে বুতিরস্কায়া কারাগার থেকে নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ রেলওয়ে স্টেশনে যাবার পথে একদিনে পাঁচজন কয়েদী সর্দিগর্মিতে মারা গিয়েছিল।—এল. টি.

ঈশ্বর! ওঃ, ওঃ, হা ঈশ্বর!'

জনৈক সৈন্যের নির্দেশক্রমে নেখ্‌ল্যুদভ তৃতীয় কামরার একটা জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। মানুষের ঘামের গন্ধেভরা একটা গরম বাতাস তার নাকে এসে লাগল। কানে এল নানা নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

সবগুলি আসনই কারাগারের আলখাল্লা ও সাদা কোর্তা পরিহিত উচ্চকণ্ঠে আলোচনা রত ঘর্মাক্ত-দেহ মেয়েমানুষে বোঝাই। জানালায় নেখ্‌ল্যুদভের মুখটা দেখা যেতেই তার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ল। যারা কাছে ছিল তারা গল্প থামিয়ে এগিয়ে এল। মাসলভা বসেছিল বিপরীত দিকের জানালায়। পরণে সাদা কোর্তা, মাথা খোলা। হাস্যময়ী সুন্দরী ফেদসিয়া তার পাশেই বসেছিল। নেখল্যুদভকে চিনতে পেরে সে কনুই দিয়ে মাসলভাকে ঠেলা মেরে জানালার দিকে ইঙ্গিত করল।

মাসলভা দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় রুমালটা বেঁধে নিল এবং তপ্ত লাল মুখে হাসি ফুটিয়ে জানালার কাছে গিয়ে একটা শিক ধরে দাঁড়াল।

স্মিত হাসি হেসে সে বলল, 'আজ বড় গরম।'

'জিনিসগুলো সব পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ।'

'তোমার আর কিছু চাই কি?' চুল্লির ভিতর থেকে আসা গরম বাতাসের মত একটা তপ্ত হাওয়া গাড়ির ভিতর থেকে এসে তার গায়ে লাগল।

'ধন্যবাদ, আর কিছু চাই না।'

ফেদসিয়া বলল, 'খাবার জল একটু যদি পেতাম।'

মাসলভা কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল।

'কেন, তোমাদের জল দেয় নি?'

'খানিকটা দিয়েছিল, সব ফুরিয়ে গেছে।'

'কনভয়ের কোন লোককে আমি বলে দেব। নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে পৌঁছবার আগে আর আমাদের দেখা হবে না।'

'সে কি! আপনিও যাচ্ছেন?' মাসলভা এমনভাবে কথা বলল যেন সে জানত না। সানন্দে সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

'আমি পরের ট্রেনে যাচ্ছি।'

মাসলভা কথা বলল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পুরুষের মত ভরাট গলায় একটি ভীষণ-দর্শন বৃদ্ধা বলল, 'একথা কি সত্যি স্যার যে দশজন কয়েদীকে মেরে ফেলেছে?'

'দশজনের কথা শুনি নি; আমি দুজনকে দেখেছি,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'সকলে বলছে ওরা দশজনকে মেরে ফেলেছে। আর ওদের কিছু হবে না? ভাবুন তো! যত সব শয়তান!'

'কোন স্ত্রীলোক কি অসুস্থ হয় নি?' নেখ্‌ল্যুদভ প্রশ্ন করল।

একটি ছোটখাট কয়েদী হেসে বলল, 'মেয়েরা বেশী শক্ত; শুধু একটি মেয়ের মাথায় ঢুকেছে তার প্রসব হবে। ওই সে যাচ্ছে।' পাশের যে কামরা থেকে আর্তনাদ ভেসে আসছিল সেই দিকটা সে দেখাল।

ঠোঁটের হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে মাসলভা বলল, 'আপনি বলছেন আমাদের কিছু চাই কি না। ওই মেয়েটার তো ব্যথা উঠেছে। ওকে কি এখানে রেখে যাওয়া যায় না? আপনি যদি কর্তাদের একটু বলেন—'

'হ্যাঁ, বলব।'

'আর একটি কথা; ও কি ওর স্বামী তারাস-এর সঙ্গে দেখা করতে পারে না?' চোখের ইঙ্গিতে সে হাস্যময়ী ফেদসিয়াকে দেখিয়ে বলল। 'সেও তো আপনার সঙ্গে যাচ্ছে, তাই না?'

কনভয়-সার্জেন্ট বলল, 'স্যার, কথা বলবেন না।'

যে সার্জেন্ট নেখ্‌ল্যুদভকে অনুমতি দিয়েছে এ সে নয়।

নেখ্‌ল্যুদভ কামরার কাছ থেকে চলে গেল। কিন্তু অনেক খুঁজেও কনভয়-অফিসারের দেখা পেল না।

অবশেষে যখন দেখা পেল তখন ট্রেন ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা বেজে গেছে।

হাত-কাটা অফিসারটি ঠুঁটো হাত দিয়ে মুখ-ভর্তি গোঁফ জোড়াটা মুছতে মুছতে জনৈক কর্পোরালকে কি জানি কেন খুব ধমকাচ্ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি চাই?'

'এখানে একটি স্ত্রীলোক আছে যার প্রসব হবে, তাই ভাবছিলাম···'

'ওঃ, বেশ তো প্রসব হোক না; ও সব পরে দেখা যাবে.' ঠুঁটো হাতটা দ্রুত দোলাতে দোলাতে সে দৌড়ে কামরার দিকে চলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁশি হাতে নিয়ে গার্ড চলে গেল, শেষ ঘণ্টা বাজল, আর প্ল্যাটফর্মের লোকজনের মধ্যে এবং মেয়েদের কামরা থেকে কান্না আর প্রার্থনার রোল উঠল।

প্ল্যাটফর্মে তারাসের পাশে দাঁড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ তাকিয়ে রইল; মাথা কামানো কয়েদীদের নিয়ে কামরাগুলি একের পর এক তার চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল। তারপর এল মেয়েদের প্রথম কামরা; জানালায় অনেক মাথা, কতক রুমাল-বাঁধা, কতক খোলা; তারপর দ্বিতীয় কামরা; গোঙানি তখনও শোনা যাচ্ছে; তারপর মাসলভার কামরা; অন্যদের সঙ্গে সেও জানালায় দাঁড়িয়ে আছে; করুণ হাসি হেসে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

অধ্যায়—৩৯

যে যাত্রীবাহী ট্রেনে নেখ্‌ল্যুদভ যাবে সেটা ছাড়তে তখনও দু'ঘণ্টা বাকি। একবার ভাবল, এই ফাঁকে দিদির সঙ্গে দেখা করে আসবে; কিন্তু সকাল থেকে এত ধকল গেছে যে প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে একটা সোফার উপর বসে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার এমন ঘুম পেয়ে গেল যে পাশ ফিরে শোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার নীচে হাতটা রেখে সে ঘুমিয়েই পড়ল।

তোয়ালে হাতে উর্দি-পরা ওয়েটার এসে তার ঘুম ভাঙাল।

'দেখুন স্যার, আপনি তো প্রিন্স নেখ্‌ল্যুদভ? একটি মহিলা আপনার খোঁজ করছেন।'

নেখ্‌ল্যুদভ চমকে উঠে বসল। চোখ মুছতে মুছতে সে কোথায় আছে, আর সকাল থেকে কি কি ঘটেছে সব তার মনে পড়ে গেল।

কল্পনায় সে দেখতে পেল কয়েদীদের যাত্রা, মৃতদেহ, জাল দিয়ে ঘেরা জানালা সমেত রেলের কামরা, তাতে অনেক মেয়ে কয়েদী ঠাসা, একজনের প্রসব-ব্যথা উঠেছে অথচ তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই, আর একজন গরাদের ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে করুণ ভাবে হাসছে।

কিন্তু তার সামনের বাস্তব দৃশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত: একটা টেবিলে ফুলদানি, মোমবাতি-দান ও চায়ের সরঞ্জাম সাজানো, চঞ্চল ওয়েটাররা চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে; ঘরের অন্য প্রান্তে একটা ক্যাবার্ড, অনেকগুলো বোতল সাজানো ফল ভর্তি পাত্র, একজন কর্মচারি ও দাঁড়িয়ে থাকা অনেক যাত্রীর পিঠ।

উঠে বসতেই তার চোখে পড়ল, ঘরের সকলেই সাগ্রহে দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। সেও তাকাল। দেখল, একদল লোক একটা চেয়ার বয়ে নিয়ে চলেছে আর একটি মহিলা সেই চেয়ারে বসে আছে। তার মাথাটা খুব পাতলা কাপড়ে ঢাকা। নেখ্‌ল্যুদভের মনে হল, ঐসব লোক-লোকজনের মধ্যে কাউকে সে চেনে। একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী সখীও একটা পুটুলি, কয়েকটা ছাতা ও একটা গোলাকার চামড়ার ব্যাগ নিয়ে তার পিছন পিছন হেঁটে যাচ্ছে। তারপর এল প্রিন্স কর্চাগিন; তার ঠোঁট দুখানি পুরু, ঘাড়টা অনবরত দোলে। মাথায় একটা যাত্রা-টুপি। তার পিছনেই মিসি, তার ভাই মিশা ও নেখ্‌ল্যুদভের পরিচিত হাঁস-গলা রাজনীতিবিদ্ অস্টেন। ঠাট্টার সঙ্গেই বেশ জোর দিয়ে সে যেন কি বলছে আর মিসি হাসছে। সক্রোধে একটা সিগারেট টানতে টানতে ডাক্তার চলেছে সকলের শেষে।

কর্চাগিন-পরিবার তাদের শহরের উপকণ্ঠবর্তী জমিদারি থেকে নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ রেলপথের পার্শ্ববর্তী প্রিন্সেসের বোনের জমিদারীতে যাচ্ছে।

চেয়ার বহনকারী লোকজন, সখী ও ডাক্তারসহ পুরো দলটা মহিলাদের বিশ্রাম কক্ষের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু বৃদ্ধ প্রিন্স সেখানেই থেকে গেল।

একটা টেবিলে বসে ওয়েটারকে ডেকে খাদ্য ও পানীয়ের অর্ডার দিল। মিসি এবং অস্টেনও ভোজনাগারেই থেকে গেল। তারাও টেবিলে বসতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজার কাছে একটি পরিচিত মহিলাকে দেখতে পেয়ে সেই দিকে এগিয়ে গেল। মহিলাটি নাতালিয়া রাগঝিন্স্কি।

আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নাকে সঙ্গে নিয়ে নাতালিয়া ভোজন-কক্ষে ঢুকে চারদিকে তাকাল। একই সঙ্গে সে তার ভাইকে ও মিসিকে পেল। ভাইয়ের দিকে মাথাটা নেড়ে প্রথমে সে মিসির কাছেই গেল। তাকে চুম্বন করে সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ের কাছে গেল।

বলল, 'শেষ পর্যন্ত তোমাকে পেলাম।'

মিসি, মিশা ও অস্টেনকে অভ্যর্থনা জানাতে ও তাদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে নেখ্‌ল্যুদভ উঠে দাঁড়াল। মিসি জানাল, তাদের গ্রামের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগার জন্যই তারা বাধ্য হয়ে মাসির বাড়ি যাচ্ছে। অস্টেন অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে একটা মজার গল্প ফেঁদে বসল।

সেদিকে কান না দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভ দিদির দিকে মুখ ফেরাল।

'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি।'

নাতালিয়া বলল, 'আমি অনেকক্ষণ এসেছি। আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নাও আমার সঙ্গে এসেছে।' আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকেই কিছুটা বিচলিত ভাবে মর্যাদাসহকারে অভিবাদন জানাল।

'তোমাকে সব জায়গায় খুঁজেছি।'

'আর আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।' নেখ্‌ল্যুদভ আবার বলল, 'তুমি আসায় খুশি হয়েছি। তোমাকে একটা চিঠি লিখতে আরম্ভও করেছিলাম।'

ভীত গলায় নাতালিয়া বলল, 'সত্যি? কি ব্যাপার?'

মিসি ও ভদ্রলোকটি বুঝতে পারল যে ভাই-বোনের মধ্যে অন্তরঙ্গ আলোচনা শুরু হতে চলেছে। তাই তারা সরে গেল। নেখ্‌ল্যুদভ ও তার দিদি জানালার ধারে একটা ভেলভেট-মোড়া সোফায় গিয়ে বসল। সেখানে একটা কম্বল, একটা বাক্স ও কিছু টুকিটাকি জিনিস ছিল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'কাল তোমাদের ওখান থেকে আসবার পরেই মনে হল ফিরে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে আসি। কিন্তু তোমার স্বামী ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেবে ঠিক বুঝতে পারি নি। তার সঙ্গে ও ভাবে কথা বলার জন্য আমি দুঃখবোধ করছিলাম।'

দিদি বলল, 'আমি জানতাম, ঠিক জানতাম, ওটা তোমার মনের কথা নয়। ওঃ, তুমি তো জান!' বলতে বলতে তার চোখে জল এসে গেল। ভাইয়ের হাতটা সে চেপে ধরল।

'তোমাকে ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।' এমন সময় হঠাৎ দ্বিতীয় মৃত কয়েদীর

কথা তার মনে পড়ে গেল। 'ওঃ, আজ কী দেখেছি! দুটি কয়েদীকে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'মেরে ফেলেছে? কি ভাবে?'

'হ্যাঁ, মেরে ফেলেছে। এই গরমে তাদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল, দুজন সর্দিগর্মিতে মারা গেছে।'

'অসম্ভব! কি বললে, আজই? এইমাত্র?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র। মৃতদেহ দুটি আমি দেখেছি।'

মাতালিয়া বলে উঠল, 'কিন্তু মেরে ফেলেছে বলছ কেন? কে মারল?'

এ ব্যাপারটাকেও সে তার স্বামীর চোখ দিয়েই দেখছে এই কথা ভেবে বিরক্ত হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ বলল, 'যারা তাদের যেতে বাধ্য করেছে তারাই মেরে ফেলেছে।'

আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না ততক্ষণে এগিয়ে এসেছিল। সে বলে উঠল, 'হা ঈশ্বর!'

'এই সব হতভাগ্যের প্রতি যে কী ব্যবহার করা হচ্ছে তার তিলমাত্র ধারণা আমাদের নেই। কিন্তু সকলকে এটা জানতে হবে,' কথাগুলি বলে সে বৃদ্ধ কর্চাগিনের দিকে তাকাল। বৃদ্ধ তখন গলায় তোয়ালে জড়িয়ে সামনে একটা বোতল নিয়ে বসেছিল। ঠিক সেই সময় সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। ডেকে বলল, নেখ্‌ল্যুদভ, আমার সঙ্গে বসে একটু খানাপিনা করবে না? দীর্ঘ যাত্রার আগে এটা খুব উপকারী।'

নেখ্‌ল্যুদভ অসম্মতি জানিয়ে মুখ ফেরাল।

নাতালিয়া বলল, 'কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি কি করবে?'

'যা করতে পারি। কি করব আমি জানি না, শুধু বুঝি কিছু একটা করতে হবে। এবং আমার যা সাধ্য তা করব।'

'হুঁ বুঝেছি। কিন্তু ওদের ব্যাপারে কি হবে?' হেসে কর্চাগিনকে দেখিয়ে সে বলল। 'ও পাট কি একেবারেই চুকে গেল?'

'সম্পূর্ণ, এবং আমার মনে হয় তাতে কোন পক্ষেরই কোন আপসোস নেই।'

'এটা বড়ই দুঃখের কথা। আমি কষ্টবোধ করছি। ওকে আমি ভালবাসি। আর তাই যদি হয়, তাহলেই বা তুমি......তুমি নিজেকে বাঁধতে চাইছ কেন?' সহজভাবে নাতালিয়া বলল। 'তুমি সেখানে যাচ্ছ কেন?'

যেন এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যই নেখ্‌ল্যুদভ গম্ভীর শুকনো গলায় জবাব দিল, 'আমি যাচ্ছি, কারণ যেতে আমাকে হবেই।'

সঙ্গে সঙ্গে এই রূঢ় ব্যবহারের জন্য সে লজ্জিত বোধ করল। ভাবল, আমার মনের সব কথা ওকে খুলে বলতে দোষ কি? আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নাও সব কিছু শুনুক না।

'তুমি তো কাতয়ুশাকে বিয়ে করার কথা বলছ? দেখ, আমি স্থির করে-

ছিলাম বিয়ে করব, কিন্তু সে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আপত্তি করেছে।' কথাগুলি বলবার সময় নেখ্‌লয়ুদভের গলা কাঁপতে লাগল। এ বিষয়ে কথা বললেই তার গলা কেঁপে ওঠে। 'আমার কোন ত্যাগই সে গ্রহণ করতে চায় না, বরং সে নিজেই ত্যাগ করে চলেছে। কিন্তু তার এই ত্যাগ যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল হয়ে থাকে, তাহলে তো সেটাকে আমি মেনে নিতে পারি না। তাই আমি তার সঙ্গে চলেছি, সে যেখানে থাকবে সেখানেই থাকব এবং তার ভাগ্যের বোঝাকে যথাসাধ্য হাল্কা করতে চেষ্টা করব।'

নাতালিয়া কিছুই বলল না। আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌না তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে লাগল। ঠিক সেই সময় মহিলা বিশ্রাম-কক্ষ থেকে সেই দলটা আবার বেরিয়ে এল। সেই সুদর্শন ফিলিপ ও দরোয়ান প্রিন্সেস কর্চাগিনাকে বয়ে নিয়ে চলল। বাহকদের থামিয়ে সে নেখ্‌লয়ুদভকে কাছে ডাকল। করুণভাবে আংটি পরা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'Epouvantable' (অসহ্য) সে গরমের কথাই বলল। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না! Ce climat me tue! (এ আবহাওয়া আমাকে মেরে ফেলল!)' তারপর রাশিয়ার আবহাওয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে এবং নেখ্‌লয়ুদভকে দেখা করবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সে লোকজনদের এগিয়ে যেতে বলল।

যেতে যেতেই মুখ ফিরিয়ে আবার বলল, 'আমাদের সঙ্গে দেখা করতে অবশ্য এস।'

লোকজনরা প্রিন্সেসকে নিয়ে ডাইনে ঘুরে প্রথম শ্রেণীর কামরার দিকে এগিয়ে গেল। কুলিটাকে নিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বাঁ দিকে ঘুরল। বোঁচকাটা নিয়ে তারাসও তার সঙ্গে চলল।

তারাসকে দেখিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ দিদিকে বলল, 'এই আমার সঙ্গী।' তারাসের কথা সে আগেই দিদিকে বলেছিল।

নেখ্‌লয়ুদভ যখন একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে থামল এবং তারাস ও কুলিটা মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে গেল, তখন নাতালিয়া বলল, 'তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে নিশ্চয় যাচ্ছ না?'

সে বলল, 'হ্যাঁ আমি এটাই পছন্দ করি। তারাসের সঙ্গে একত্রে যাচ্ছি। আর একটা কথা, কুজমিন্‌স্কোয়ের জমি এখনও চাষীদের দেওয়া হয় নি; কাজেই আমার মৃত্যু হলে তোমার ছেলেমেয়েরাই সেটা পাবে।'

'ওকথা বলো না দিমিত্রি,' নাতালিয়া বলল।

'জমি যদি বিলিয়েও দেই, তাহলেও আর যা কিছু আছে সব তারাই পাবে, কারণ আমি আর বিয়ে করব না; এবং বিয়ে যদি করিও, আমার কোন সন্তান হবে না, সুতরাং—'

'দিমিত্রি, ও ভাবে কথা বলো না!' নাতালিয়া বলল। কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ

বুঝতে পারল, তার কথায় সে খুশিই হয়েছে।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে গেল। গার্ডরা কামরার দরজা বন্ধ করতে করতে যাত্রীদের ভিতরে যেতে এবং অন্যদের বেড়িয়ে আসতে বলল।

নেখ্‌লয়ুদভ সেই গরম দুর্গন্ধময় কামরায় ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে কামরার পিছন দিককার ছোট প্ল্যাটফর্মটায় গিয়ে দাঁড়াল।

কেতাদুরুস্ত ওড়না ও টুপি পরা নাতালিয়া আগ্রাফেনা পেত্রভ্‌নাকে নিয়ে কামরার পাশেই দাঁড়িয়ে। কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিল।

'চিঠি লিখো', এ কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারছিল না, কারণ কথাটা নিয়ে একসময়ে তারা অনেক হাসি-ঠাট্টা করত। বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনার ফলে তাদের মনের ভাই-বোনের ভালবাসাটা যেন মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারা যেন পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কাজেই ট্রেনটা যখন চলতে শুরু করল তখন সে মাথাটা নেড়ে বিষণ্ণ মুখে কোনমতে শুধু বলল, 'বিদায়, বিদায় দিমিত্রি।'

গাড়ি চলে যেতেই নাতালিয়া ভাবতে লাগল, কেমন করে ভাইয়ের কথাগুলি স্বামীকে শোনাবে ; তার মুখ গম্ভীর ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

নেখ্‌লয়ুদভও ভাবতে লাগল, দিদিকে সে কত ভালবাসত, তার কাছ থেকে কিছুই গোপন করত না, অথচ তাকে নিয়ে সে অস্বস্তি বোধ করছে, বিদায় নিতে পেরে সে যেন খুশিই হয়েছে। তার মনে হল, যে নাতালিয়া একদিন তার এত প্রিয় ছিল, সে আজ আর নেই, তার জায়গা নিয়েছে একজন অপরিচিত, অপ্রীতিকর, কৃষ্ণাঙ্গ, লোমশ মানুষের এক ক্রীতদাসী। সে যখন বিষয়-সম্পত্তি ও চাষীদের জমি বিলিয়ে দেবার কথা অর্থাৎ তার স্বামীর স্বার্থ-সংক্রান্ত কথা বলছিল তখন নাতালিয়ার সারা মুখ যে রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাতেই এই সত্য তার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এ অনুভূতিতে তার মন দুঃখে ভরে উঠল।

অধ্যায়—৪০

তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটা সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সেটা এতই তেতে উঠেছে যে নেখ্‌লয়ুদভ কামরার ভিতরে না গিয়ে পিছনের ছোট প্ল্যাটফর্মটাতেই দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সেখানেও বাতাসের লেশমাত্রও ছিল না। ট্রেনটা দালান-কোঠা পার হবার পরে তবে একটু বাতাস পাওয়া গেল ; নেখ্‌লয়ুদভও বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস টানল।

'হ্যা, মেরে ফেলেছে,' দিদিকে যা বলেছিল সেই কথাটাই সে নিজের মনে বলে উঠল। দ্বিতীয় মৃত কয়েদীটির সুন্দর মুখখানি, ঠোঁটের হাসিটুকু, দুটি ভুরুর কঠোর ভঙ্গী, বাঁকানো নীলাভ খুলির নীচের কানটা—কল্পনায় ফের তার

চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল।

সে ভাবতে লাগল, 'এইটেই সব চাইতে ভয়াবহ যে সে খুন হল, কিন্তু কে যে তাকে খুন করল তা কেউ জানে না। অথচ তাকে খুন করা হয়েছে। অন্য সব কয়েদীর মতই তাকেও মাস্‌লেনিকভের আদেশেই বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল। নাম ছাপানো একখণ্ড কাগজে মাস্‌লেনিকভই হয় তো মহাসমারোহে স্বাক্ষর করেছিল, অথচ নিজেকে সে নিশ্চয়ই দোষী বলে মনে করে নি। যে কারা-ডাক্তার কয়েদীদের পরীক্ষা করেছিল সে তো আরও মনে করবে না। সে ঠিকমতই তার কর্তব্য করেছিল, দুর্বলদের আলাদা করেও দিয়েছিল। এই প্রচণ্ড গরমের কথা, অথবা এমন ভীড় করে এত বেলায় এদের যাত্রা শুরু হবে সে কথা সে কি করে আগে থেকে জানবে? কারা-ইন্সপেক্টর? কিন্তু সে তো আদেশ পালন করছে মাত্র। কনভয়-অফিসারও দোষী হতে পারে না, কারণ এক জায়গা থেকে কতগুলি লোককে বুঝে নেওয়া এবং অন্য এক জায়গায় তাদের জমা দিয়ে দেওয়াই তার কাজ। সে তো যথানিয়মেই তাদের নিয়ে যাচ্ছিল; দুটি শক্ত-সমর্থ লোক যে সে যাত্রার ধকল সইতে না পেরে মারা যাবে তা দেখে তো সে বুঝতেই পারে নি। কেউ দোষী নয়, অথচ তাদের মৃত্যুর জন্য দোষী নয় এমন লোকরাই তাদের খুন করেছে।

'এই সব ঘটছে তার কারণ এই সব লোকরা এই গভর্ণর, ইন্সপেক্টর, পুলিশ-অফিসার, পুলিশের লোক—মনে করে যে, এমন কতকগুলি পরিস্থিতি আছে যেখানে মানুষে-মানুষে মানবিক সম্পর্কের কোন প্রয়োজন নেই। এই সব লোক, মাস্‌লেনিকভ, এবং ইন্সপেক্টর, এবং কনভয়-অফিসার, এরা যদি গভর্ণর, ইন্সপেক্টর বা অফিসার না হত, তাহলে এতগুলো লোককে এক সঙ্গে এই প্রচণ্ড গরমে বাইরে পাঠাবার আগে বিশ বার ভাবত,—পথে বিশ বার থামত, এবং একটি লোক ক্রমেই দুর্বল হয়ে শ্বাস টানছে দেখলে তাকে ছায়ায় নিয়ে যেত, জল খাওয়াত, বিশ্রাম করতে দিত, আর তার পরেও যদি দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করত। কিন্তু এসব কিছুই তারা করে নি, বরং অন্য কেউ করতে চাইলে তাকে বাধা দিয়েছে, কারণ তারা কেউই মানুষের কথা এবং মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা ভাবে নি, ভেবেছে শুধু যার যার চাকরির কথা, আর মনে করেছে যে চাকরির প্রতি কর্তব্য মানবিক সম্পর্কের চাইতে বড়। এই হচ্ছে আসল কথা।' নেখ্‌লুদভ ভেবেই চলল। 'মাত্র এক ঘণ্টার জন্যই হোক আর কোন বিশেষ ক্ষেত্রেই হোক, একবার যদি মেনে নেই যে মানুষের প্রতি ভালবাসার চাইতেও বড় কিছু আছে, তাহলে এমন কোন অপরাধ নেই যা আমরা অপরাধবোধ মুক্ত হয়ে খোলা মনে করতে না পারি।'

নেখ্‌লুদভ নিজের চিন্তার মধ্যে এতই ডুবে গিয়েছিল যে আবহাওয়ার পরিবর্তনটা তার চোখেই পড়ে নি। একটা ঝুলে-পড়া ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ

সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। পশ্চিম দিক থেকে একটা ঘন আধূসর মেঘ দ্রুত এগিয়ে আসছে, এবং অনেক দূরে মাঠ ও গাছপালার উপর ঘন বর্ষণ শুরু হয়েছে। মেঘের জল-কণা বাতাসের সঙ্গে মিশেছে। মেঘের বুক চিরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, এবং বজ্রের গর্জন ট্রেনের ঝক-ঝক আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বাতাস ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বায়ুতাড়িত বৃষ্টির তির্যক ফোঁটাগুলো প্ল্যাটফর্মে ও নেখ্‌লয়ুদভের কোটের উপর পড়তে লাগল। প্ল্যাট-ফর্মের অপর দিকটায় সরে গিয়ে ফসলের ও ভিজে মাটির গন্ধে ভরা তাজা জলীয় বাতাসে নিঃশ্বাস টানতে টানতে সেখানে দাঁড়িয়েই সে দেখতে লাগল, বাগান, গাছপালা, হলুদ যবের ক্ষেত, সবুজ যইয়ের ক্ষেত, ফুলন্ত আলু-গাছের ঘন সবুজ সারি—সব সরে সরে যাচ্ছে। সব কিছুই ঝকঝক করছে: সবুজ সবুজতর দেখাচ্ছে, হলুদ আরও হলুদ এবং কালো আরও কালো।

নববর্ষণে উজ্জীবিত বাগান ও গাছপালা দেখে উৎফুল্লচিত্তে নেখ্‌লয়ুদভ বলে উঠল, 'আরও! আরও!'

ঘন বর্ষণ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। মেঘের কিছুটা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল, কিছুটা হাওয়ায় উড়ে গেল, আর দেখতে দেখতে বৃষ্টির শেষ ফোঁটাগুলি সোজা ভিজে মাটির উপর পড়তে লাগল। আবার সূর্য উঠল, সব কিছু চিক-চিক করতে লাগল, আর পূর্ব প্রান্তে—দিগন্ত-রেখা থেকে খুব উঁচুতে নয়—একটা উজ্জ্বল রামধনু দেখা দিল; তার এক দিক ভাঙা, আর বেগুনি রংটা বড়ই স্পষ্ট।

প্রকৃতির এই দৃশ্য-পরিবর্তন যখন শেষ হয়ে গেল, ট্রেনটা যখন দুই পাশের উঁচু ঢালের ভিতর দিয়ে চলেছে, তখন নেখ্‌লয়ুদভ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁ, আমি যেন কি ভাবছিলাম?'

'ওঃ! এই সব লোকের কথা ভবছিলাম: ইন্সপেক্টর, কনভয়ের লোকজন যারা চাকরি করে এবং যারা মূলত ভাল লোক, শুধু চাকরি করে বলেই নিষ্ঠুর।'

সে আবার ভাবতে লাগল, 'গভর্ণর, ইন্সপেক্টর, পুলিশ,—হয় তো এদেরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে যখন প্রধান মানবিক গুণ পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির অভাব ঘটে সে যে বড়ই মর্মান্তিক।

'আসলে যা আইন নয় তাকেই এরা আইন বলে মানে, আর ঈশ্বর নিজের হাতে মানুষের বুকের মধ্যে যে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় আইন লিখে রাখেন তাকে এরা আইন বলে মোটেই মানে না। সেই জন্যই যখনই এসব লোকের সংস্পর্শে আসি তখনই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তাদের আমি ভয় করি। সত্যি তারা ভয়ংকর, দস্যুর চাইতেও ভয়ংকর। দস্যুর অন্তরেও করুণা থাকে, কিন্তু তাদের মনে করুণার স্থান নেই; এই সব পাথরের বুকে যেমন গাছ জন্মে না, তেমনি তাদের বুকে করুণার শিকড় গজায় না। সেই জন্যই তারা ভয়ংকর।

লোকে বলে "পুগাচভ্" ও "রাজিন"রা* ভয়ংকর। এই সব লোকরা তাদের চাইতে হাজার গুণ ভয়ংকর।' নেখ্‌লুয়ুদভের চিন্তা এগিয়েই চলল।

কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমাদের সমকালীন মানুষরা—খৃস্টধর্মে-বিশ্বাসী, মানবিকবোধসম্পন্ন, দয়ালু মানুষরা—অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ করবে অথচ তাদের মনে কোন রকম অপরাধবোধ জাগবে না, এই রকম একটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা যদি উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে তার একটিমাত্র সমাধানই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে: যা করা হচ্ছে সেটাকেই চালিয়ে যাওয়া। শুধু দরকার এই মানুষগুলিকে গভর্নর, ইন্সপেক্টর, পুলিশ বানিয়ে দেওয়া; তাদের শুধু এইটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যে সরকারী চাকরি নামক এক ধরনের কাজ আছে যাতে মানুষের সঙ্গে ভাইয়ের মত ব্যবহার না করে কোন বস্তুর মত ব্যবহার করা চলে; আর এই সরকারী চাকরির সুতো দিয়ে তাদের সকলকে এমন ভাবে একত্রে বেঁধে দেওয়া দরকার যাতে তাদের কৃতকর্মের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে কারও একলার ঘাড়ে না চাপে। আজ যে সব ভয়ংকর ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখলাম, এই পথে ছাড়া আজকের দিনে তা কিছুতেই ঘটতে পারত না। এর একমাত্র কারণ, মানুষ মনে করে যে কোন কোন পরিস্থিতিতে মানুষের সঙ্গে প্রেমহীন আচরণ করা যায়। কিন্তু এ রকম কোন পরিস্থিতি থাকতে পারে না। প্রেমহীন আচরণ বস্তুর সঙ্গে করা যায়—বিনা প্রেমে আমরা গাছ কাটতে পারি, ইট বানাতে পারি, লোহা পিটতে পারি,—কিন্তু খুব সাবধান না হয়ে যেমন মৌমাছির সঙ্গে ব্যবহার করা চলে না, ঠিক তেমনি বিনা প্রেমে মানুষের সঙ্গেও ব্যবহার করা যায় না। মৌমাছির সঙ্গে অসতর্ক ব্যবহার করলে মৌমাছিদেরও ক্ষতি হবে, নিজেরও ক্ষতি হবে। মানুষের বেলায়ও ঠিক তাই। তার অন্যথা হতে পারে না, কারণ পারস্পরিক ভালবাসাই মানব জীবনের মূল নীতি। একথা ঠিক যে মানুষকে দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না; কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভালবাসা ছাড়াই মানুষের সঙ্গে চলা যায়, বিশেষ করে সেই মানুষের কাছে যদি কোন প্রত্যাশা থাকে। তোমার মনে যদি ভালবাসা না থাকে, চুপ করে বসে থাক, নানা রকম জিনিস নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, তোমার যা খুশি তাই নিয়ে থাক, শুধু মানুষের কাছে এস না। একমাত্র ক্ষিধে থাকলেই যেমন তুমি নিজের ক্ষতি না করে খেতে পার, ঠিক তেমনি একমাত্র ভালবাসা থাকলেই তুমি বিনা ক্ষতিতে সকলের কল্যাণে কাজ করতে পার। বিনা প্রেমে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার কর, যেমন গতকাল আমার ভগ্নিপতির সঙ্গে আমি করেছি, দেখবে অপরের প্রতি তোমার নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার কোন সীমা থাকবে

---

* রাশিয়ায় সংঘটিত বিদ্রোহের দুই নেতা: স্তেংকা রাজিন সপ্তদশ শতাব্দীর এবং পুগাচভ্ অষ্টাদশ শতাব্দীর।

না, যেমনটি আজ আমি নিজের চোখে দেখলাম, এবং তার ফলে তুমি নিজের জন্যও সীমাহীন যন্ত্রণা ডেকে আনবে—যে যন্ত্রণার সাক্ষী আমার সমস্ত জীবন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই; এই প্রকৃত সত্য; হ্যাঁ, এই প্রকৃত সত্য।' অসহ্য গরমের পরে প্রকৃতির শীতল আবহাওয়ায় যে সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে তার মনকে ঘিরে ছিল তার একটা সুস্পষ্ট সমাধান খুঁজে পেয়ে নেখ্‌লয়ুদভ নিজের মনেই কথাগুলি বার বার বলতে লাগল।

অধ্যায়—৪১

নেখ্‌লয়ুদভের কামরাটা লোকজনে অর্ধেক ভর্তি। তাদের মধ্যে চাকর, মজুর, কারখানার কর্মী, কসাই, ইহুদি, দোকানদার, মজুরদের স্ত্রী, একজন সৈনিক, দুটি মহিলা (একটি তরুণী ও খোলা হাতে ব্রেসলেট পরা একটি বৃদ্ধা) এবং কালো টুপিতে প্রতীক-চিহ্ন বসানো একটি ভীষণ-দর্শন ভদ্রলোক। যার যার জায়গা দখলের হৈচৈ থেমে গেছে; সকলেই চুপচাপ বসে আছে; কেউ কড়মড় করে চানা-ভাজা খাচ্ছে, কেউ ধূমপান করছে, কেউ বা গল্প করছে। তারাস পথের পাশে খুশি মনে বসে আছে। নেখ্‌লয়ুদভের জন্যও একটা জায়গা রেখেছে। সুতীর কোট-পরা একটি পেশীবহুল লোকের সঙ্গে সে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। নেখ্‌লয়ুদভ পরে জেনেছিল, সে একজন মালী, নতুন জায়গায় চলেছে। তারাসের কাছে যাবার আগে নেখ্‌লয়ুদভ পথের পাশেই সাদা দাড়িওয়ালা সুতীর হলদে কোট-পরা একটি বুড়ো লোকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাষীদের পোষাকপরা একটি যুবতীর সঙ্গে বুড়ো কথা বলছিল। যুবতীটির পাশে বসে বছর সাতেকের একটি নতুন জামা পরা মেয়ে অনবরত চানা খাচ্ছিল।

বুড়ো লোকটি নেখ্‌লয়ুদভকে দেখতে পেয়ে নিজের জামার কোণটা সরিয়ে একটুখানি জায়গা করে দিয়ে বলল, 'এই যে, এখানে একটা জায়গা আছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি আবার কথা লতে শুরু করল।

সে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। শহরে গিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে স্বামী তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে তাই সে বলছিল।

'সেই "শ্রোভটাইড" উৎসবের সময় একবার গিয়েছিলাম, আর প্রভুর ইচ্ছায় এখন একবার গেলাম। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে খৃস্টমাসের সময় আর বএকবার যাব।'

নেখ্‌লয়ুদভের দিকে একবার তাকিয়ে বুড়ো বলল, 'ঠিক করেছ। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ করা ভাল, নইলে শহর বলে কথা, একটা লোকের বিগড়ে যেতে কতক্ষণ।'

'না, না, আমার মানুষটা সে রকম নয়। কোন রকম বদ্‌দোষ নেই : একেবারে কুমারী মেয়েটির মত থাকে। যা কিছু উপার্জন করে একটা কোপেক পর্যন্ত বাড়িতে পাঠায়। আর এই যে মেয়েটি, একে দেখে কী যে খুশি হয়েছে সে আর কি বলব।' কথা বলে যুবতীটি হাসতে লাগল।

বুড়ো বলল, 'আরে, তাহলে তো খুবই ভাল কথা। ও রকমটা নয় তো?' কামরার অন্য দিকে কারখানার মজুর শ্রেণীর দুটি স্বামী-স্ত্রী বসে ছিল। তাদের দেখিয়ে বুড়ো শেষের কথাগুলি বলল।

স্বামী একটা বোতল থেকে গলায় ভদকা ঢালছিল আর স্ত্রী একটা থলে হাতে নিয়ে হাঁ করে তাই দেখছিল।

যুবতীটি বলে উঠল, 'না, না, আমার মানুষটা মদ খায় না, ধোঁয়া টানে না। না গো, তার মত মানুষ জগতে বেশী মেলে না।' তারপর নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে ফিরে বলল, 'এই এর মত মানুষ সে।'

খাওয়া শেষ করে লোকটা স্ত্রীকে বোতলটা দিল। সেও ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে সেটাতে ঠোঁট লাগাল। নেখ্‌লুয়ুদভ ও বুড়ো লোকটি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে মজুরটি নেখ্‌লুয়ুদভকে বলল :

'কি দেখছেন স্যার? ভদকা খাচ্ছি তাই? আমরা কি কাজ করি সেটা কেউ দেখে না, সকলেই মদ খাওয়াটাই দেখে। নিজের টাকায় কিনেছি, নিজে খাচ্ছি, বৌকে খাওয়াচ্ছি। বাস। খতম।'

কি বলবে বুঝতে না পেরে নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

'ঠিকই স্যার। আমার বৌ খুব ভাল। তাকে নিয়ে সুখে আসি, কারণ সে আমার দুঃখ বোঝে। কি বলিস্ মাভ্‌রা, ঠিক বলি নি?'

বোতলটা ফিরিয়ে দিয়ে বৌ বলল, 'এই নাও, আমি আর চাই না। আরে, এমন করে ফেলে দিচ্ছ কেন?'

'লাও ঠেলা! ভাল তো—বেশ ভাল; তারপরই মরচে-ধরা চাকার মত খিচ্‌খিচ্‌ শুরু করে দেবে। ঠিক বলেছি কিনা মাভ্‌রা?'

মাভ্‌রা হেসে উঠল। মাতালের মত হাতটা নাড়তে লাগল।

'মলো যা, আবার শুরু করল।'

'লাও ঠেলা! ভাল তো—বেশ ভাল; কিন্তু লেজে পা পড়লেই একেবারে ফোঁস।......কেমন, ঠিক বলেছি কি না? ক্ষমা করবেন স্যার, একটু টেনেছি! কি আর করা যাবে?' বলতে বলতে মজুরটি ঘুম দেবার জন্য তার হাসি-মুখ বৌটির কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বুড়োর কাছে কিছুক্ষণ বসল। বুড়োও নিজের কথা বলতে শুরু করল। লোকটি স্টোভ তৈরি করে। পঞ্চাশ বছর ধরে এ কাজ করছে। এত স্টোভ তৈরি করেছে যে গুণে শেষ করা যায় না। এবার সে বিশ্রাম নিতে চায়, কিন্তু তার আর সময় হচ্ছে না। শহরে গিয়ে ছেলেপিলেদের

কাজের ব্যবস্থা করেছে, এবার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। বুড়োর গল্প শুনে নেখ্‌ল্যুদভ তারাসের কাছে ফিরে গেল।

তারাসের উল্টো দিকে বসে ছিল মালী। নেখ্‌ল্যুদভের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বন্ধুত্বের সুরে বলে উঠল, 'ঠিক আছে স্যার, বসুন; বস্তাটা সরিয়ে দিচ্ছি।'

তারাস হেসে বলল, 'একটু চাপাচাপি হবে, তা হোক, আমরা তো সব বন্ধুর মত।' পাঁচ স্টোন ওজনের বস্তাটাকে একটা পাখির পালকের মত আস্তে তুলে সে দরজার কাছে নিয়ে গেল।

'প্রচুর জায়গা; তাছাড়া দরকার হলে একটু দাঁড়াতেও পারি, বা সিটের নীচেও ঢুকতে পারি। এখানে বেশ আরাম। ঝগড়াঝাটির কোন কারণই নেই।'

তারাস বলত, পেটে মদ না পড়লে সে কথা বলতে পারে না; মদ খেলেই ঠিক ঠিক কথাগুলো তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে আর সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারে। সত্যি, স্বাভাবিক অবস্থায় তারাস একেবারে চুপচাপ; কিন্তু কালে-ভদ্রে যখন মদ খায় তখন বেশ বাচাল হয়ে ওঠে। তখন সে অনেক কথা বলে; সহজ, সরলভাবে সত্য কথা বলে; তখন তার দুটি শান্ত নীল চোখের চাউনিতে এবং সদাহাস্যময় দুই ঠোঁটে অনেক সহৃদয়তা ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

আজ সে সেই রকম অবস্থারই আছে। নেখ্‌ল্যুদভ এসে পড়ায় তাদের আলোচনায় বাধা পড়েছিল। বস্তাটাকে ঠিক জায়গায় রেখে তারাস আবার তার আসনে বসল এবং দুটো হাত এক করে ক্রোলের উপর রেখে মালীর দিকে সোজা তাকিয়ে আগের কথায় ফিরে গেল। সে সবিস্তারে তার স্ত্রীর কথা বলছিল: কেন তাকে সাইবেরিয়ায় পাঠানো হচ্ছে, কেনই বা সেও তার সঙ্গে যাচ্ছে।

নেখ্‌ল্যুদভ এতটা বিস্তারিত বিবরণ জানত না, তাই সেও সাগ্রহে শুনতে লাগল। সে যখন এসে দাঁড়িয়েছে তখন গল্পটা সেই পর্যন্ত পৌঁচেছে যেখানে বিষপ্রয়োগের চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং পরিবারের সকলেই বুঝতে পেরেছে যে সেটা ফেদসিয়ারই কাজ।

নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে তারাস বলল, 'আমার দুঃখের কথা বলছি। এমন একটি ভাল লোকের দেখা পেয়ে গেলাম বলেই কথায় কথায় তাকে সবই বলেছি।'

'বটে,' নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

'তারপর বুঝলে বন্ধু, এইভাবে সব জানাজানি হয়ে গেল। মা পিঠেটা হাতে নিয়ে বলল, "আমি পুলিশ-অফিসারের কাছে যাচ্ছি।" বাবা বুড়ো মানুষ সে বলল, "দাঁড়াও বৌ, ও মেয়েটা ছেলেমানুষ, কি করেছে তা নিজেই জানে না। ওকে সবাই দয়া কর। তাহলেই ওর সুবুদ্ধি ফিরে আসবে।" কিন্তু কি বিপদ, মা কিছুতেই শুনবে না। সে বলে উঠল, "ওকে এখানে রাখলে

আমাদের সবাইকে আরসোলার মত শেষ করে ফেলবে।" বুঝলে বন্ধু, সে তো পুলিশ-অফিসারের কাছে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অফিসার এসে হাজির। সাক্ষীদের ডাকল।'

মারী জিজ্ঞাসা করল, 'আর তুমি?'

'আমি? আরে বন্ধু, আমি তো তখন পেটের ব্যথায় গড়াগড়ি দিচ্ছি আর বমি করছি। পেটের ভিতর থেকে সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে; কথাটাও বলতে পারছি না। তখন বাবাই গাড়ি জুতে ফেদসিয়াকে গাড়িতে বসিয়ে প্রথমে থানায় ও তারপরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল। আর সেও বুঝলে, প্রথম থেকেই যেমন করছিল ঠিক তেমনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও সব কবুল করল—কোথায় আর্সেনিক পেল, কেমন করে পিঠে বানাল, সব। ম্যাজিস্ট্রেট শুধাল, "তুমি এ কাজ করলে কেন?" সে বলল, "কেন? কারণ ওকে আমি ঘৃণা করি। ওর কাছে থাকার চাইতে সাইবেরিয়ায় যাওয়াও ভাল।" এই হল ব্যাপার।' তারাস হাসল।

'তারপর সে তো সব কবুল করল। তখন স্বভাবতই—কারাগার; বাবা একা বাড়ি ফিরে গেল। সামনে ফসলের মরশুম, বাড়িতে মা একমাত্র মেয়ে-মানুষ, তার উপর তার শরীরেও আর আগের মত শক্তি নেই। কাজেই ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ওকে কি জামিনে বের করে আনা যায় না? অগত্যা বাবা গিয়ে একজন কর্মচারির সঙ্গে দেখা করল। সে ভাগিয়ে দিল। তারপর আর একজনের কাছে। এইভাবে পাঁচ পাঁচ জন। তখন ভাবলাম, ও চেষ্টা ছেড়েই দেব। তখন হঠাৎই একজন করণিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এমন চালাক-চতুর লোক সচরাচর দেখা যায় না। সে বলল, "আমাকে পাঁচ রুবল দাও, ওকে বের করে দিচ্ছি।" তিন-এ রফা হল। কি রকম বুঝছ বন্ধু? বৌর নিজের হাতে বোনা কাপড়টা বন্ধক দিয়ে তাকে টাকাটা দিলাম। যেই না কাগজটা লিখে শেষ করল,' তারাস এমন ভাবে হাতটা ঘোরালো যেন সে বন্দুক থেকে গুলি করার বর্ণনা দিচ্ছে, 'আর সঙ্গে সঙ্গে ফল হল। আমি ততদিনে উঠে দাঁড়িয়েছি। নিজেই তাকে আনতে গেলাম।'

'তারপর বন্ধু, শহরে গেলাম, ঘোড়াটাকে রাখলাম, কাগজখানা নিলাম, কারাগারে হাজির হলাম। "কি চাও?" আমি বললাম, "এই চাই; আমার বৌকে কারাগারে আটক রেখেছ।" "সঙ্গে কাগজ এনেছ?" কাগজখানা দিলাম। সে একনজর দেখে বলল, "অপেক্ষা কর।" একটা বেঞ্চিতে বসলাম। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। একজন বাবু বেরিয়ে এল। "তুমি বিরয়ুকভ?" "আমি।" "বেশ, নিয়ে যাও।" ফটক খুলে গেল। সুস্থ শরীরে নিজের পোষাকেই তাকে বের করে দিল। "আরে, চলে এস।" "তুমি কি পায়ে হেঁটে এসেছ?" "না, ঘোড়া নিয়ে এসেছি।" তারপর সহিসকে তার পাওনা মিটিয়ে দিলাম, ঘোড়াটাকে জুতলাম, বাকি খড়টা

বিছিয়ে তার উপর বস্তা পেতে তার বসার জায়গা করে দিলাম। একটা শালে শরীরটা ঢেকে সে উঠে বসল। আমিও ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। সেও কিছু বলে না, আমিও কিছু বলি না। বাড়ির কাছাকাছি গেলে সে বলল, "মা কেমন আছে? বেঁচে আছে তো?" "হ্যাঁ, আছে।" "আর বাবা, সে বেঁচে আছে তো?" "হ্যাঁ আছে।" সে বলল, "তারাস, আমার বোকামির জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমি যে কি করলাম আমি নিজেই বুঝতে পারি নি।" আমি বললাম, "কথায় তো কাজ হবে না। অনেক আগেই তোমাকে ক্ষমা করেছি।" সে আর কোন কথা বলল না। আমরা বাড়ি পৌঁছলাম। সে মার পায়ের উপর উপুর হয়ে পড়ল। মা বলল, "প্রভু তোমাকে ক্ষমা করবেন।" আর বাবা বলল, "কেমন আছ? যা হবার তা হয়ে গেছে। ভালভাবে চলতে চেষ্টা কর। এখন এসব কথার সময় নয়। ফসল কাটার সময় হয়ে গেছে। প্রভুর ইচ্ছায় মাঠে এত যব হয়েছে যে কাস্তে চালান যাচ্ছে না। সব জড়িয়ে ফসলের ভারে মাঠে শুয়ে পড়েছে; কিন্তু যেমন করে হোক কাটতে তো হবেই। কালই তারাস আর তুমি গিয়ে বরং দেখে এস।" দেখ বন্ধু, সেই থেকেই সে কাজে লেগে গেল, আর এমন কাজ করতে লাগল যে সকলেই অবাক হয়ে গেল। ঐ সময় আমরা তিন "দেসাতিনা" (১ দেসাতিনা=২$\frac{৩}{৪}$ একর) জমি ভাড়া নিয়েছিলাম এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রচুর যই ও যব আমরা পেলাম। আমি ফসল কাটি ও আঁটি বাঁধে, কখনও বা দুজনই কাটি। আমি ভালই কাজ করি, কাজকে ডরাই না, কিন্তু ও যে কাজে হাত দেয় সেটা আরও ভাল ভাবে করে। ও খুবই চটপটে আর জীবন্ত। কি বলব বন্ধু কাজে ওর এত আগ্রহ যে অনেক সময় আমাকে থামিয়ে দিতে হয়। যখন বাড়ি ফিরে যাই, আঙুলগুলো ফুলে ওঠে, হাত ব্যথা করে; কিন্তু ও বিশ্রাম না নিয়েই পরদিন আঁটি বাঁধবার দড়ির জোগাড় করতে সঙ্গে সঙ্গে গোলায় চলে যায়। কী পরিবর্তন!'

মালী জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে তখন ভাল ব্যবহার করত তো?'

'নিশ্চয়। সে এমন ভাবে আমার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল যেন আমরা এক আত্মা! আমি যা বলি তাই সে বোঝে। খুব রেগে থাকলেও মাও না বলে পারল না; "মনে হচ্ছে আমাদের ফেদসিয়া বদলে গেছে; সে এখন একেবারে আলাদা মেয়েমানুষ!" খড় বোঝাই করে আনবার জন্য দুটো গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। সে আর আমি এক গাড়িতেই ছিলাম। আমি বললাম, "ফেদসিয়া, ও কাজটা করবার কথা তোমার মাথায় এল কেমন করে?" সে বলল, "এই ভাবে কিনা আমি তোমার সঙ্গে থাকতেই চাই নি। ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভাল।" আমি বললাম, "আর এখন?" সে বলল, "এখন তো তুমি আমার প্রাণের প্রাণ!" তারাস থামল।

খুশির হাসি হাসল, আর তার পরেই সবিস্ময়ে মাথা নাড়তে লাগল। 'সবে ফসল ঘরে তুলেছি, শন-পাট জলে ভিজিয়ে বাড়ি ফিরেছি,' কথা থামিয়ে সে মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার শুরু করল,—'এমন সময় সমন এসে হাজির; ওকে বিচারের জন্য হাজির হতে হবে। আমরা তো এর মধ্যে সে সব কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

মালী বলল, 'সবই শয়তানের কাজ। কোন মানুষ কি নিজের থেকে আর একটা জীবনকে নষ্ট করার কথা ভাবতে পারে? এক সময়ে আমাদের একজন চেনাশোনা লোক ছিল'—মালী একটা গল্প ফাঁদতে যাবে এমন সময় ট্রেনের গতি কমতে লাগল।

সে বলল, 'মনে হচ্ছে একটা স্টেশন আসছে। এক চুমুক খেয়ে আসি।'

আলোচনা বন্ধ হল। মালীর সাথে সাথে নেখ্‌ল্যুদভও কামরা থেকে বেরিয়ে স্টেশনের ভিজে প্ল্যাটফর্মে পা দিল।

অধ্যায়—৪২

কামরা থেকে বের হবার আগেই নেখ্‌ল্যুদভের নজরে পড়েছিল, স্টেশন-চত্বরে যেন কিছু সুসজ্জিত গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন, চাকর-বাকর হাজির রয়েছে। কোন গাড়িতে তিনটি, কোন গাড়িতে চারটি ঘোড়া জোতা রয়েছে; তাদের গলার ঘণ্টা ঠুন-ঠুন্ করে বাজছে। ভিজে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই সে দেখতে পেল, প্রথম শ্রেণীর কামরার সামনে একদল লোক জটলা করছে। তাদের মধ্যে আছে একটি মজবুত চেহারার মহিলা; তার গায়ে একটা ওয়াটার-প্রুফ জড়ানো, টুপিতে দামী পালক বসানো। তার পাশেই একটি একহারা চেহারার যুবক, পরণে সাইক্লিং স্যুট। গলায় দামী কলার বাঁধা একটা মস্ত বড় কুকুর তার সঙ্গে। তাদের পিছনে একটি লোক ছাতা ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর আছে কোচয়ান।

মোটা সোটা মহিলাটি থেকে লম্বা কোট-পরা কোচয়ান পর্যন্ত সকলেরই চেহারায় ঐশ্বর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। দেখতে দেখতে তাদের চারপাশে ছোটখাট ভীড় জমে গেল—লাল টুপি-পরা স্টেশন-মাস্টার, একটি সৈনিক, গলায় মালা একটি শুকনো চেহারার কৃশ তরুণী, জনৈক করণিক, ও কিছু

কুকুর হাতে যুবকটিকে নেখ্‌ল্যুদভ চিনতে পারল—ব্যায়ামের আখড়ার ছাত্র তরুণ কর্চাগিন। তাহলে ঐ মোটা মহিলাটি নিশ্চয় প্রিন্সেসের বোন, যার জমিদারিতে কর্চাগিনরা চলেছে। সোনালি দড়ি-লাগানো পোষাক ও চকচকে টপ-বুট পায়ে চীফ গার্ড সসম্মানে কামরার দরজা খুলে দাঁড়াল; ফিলিপ ও সাদা এপ্রন-পরা একটি কুলি খুব সাবধানে ফোল্ডিং-চেয়ারে বসিয়ে

প্রিন্সেসকে কামরা থেকে নামাল। দুই বোনের দেখা হল, আর ফরাসী শব্দের ফোয়ারা ছুটল। প্রিন্সেস ঢাকা গাড়িতে যাবেন, না খোলা গাড়িতে? অবশেষে শোভাযাত্রা শুরু হল ; সকলের শেষে চলল মহিলার পরিচারিকাটি, তার হাতে ছাতা ও চামড়ার ব্যাগ।

এদের সঙ্গে পুনরায় দেখা করার ইচ্ছা নেখ্‌ল্যুদভের ছিল না। তাই এরা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

• প্রিন্সেস, তার ছেলে মিসি, ডাক্তার ও পরিচারিকা প্রথম গেল। বৃদ্ধ প্রিন্স ও তার শ্যালিকা তাদের পিছনে। নেখ্‌ল্যুদভ তাদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই কয়েকটি অসংলগ্ন ফরাসী উক্তি ছাড়া আর কিছুই তার কানে এল না। যে কারণেই হোক প্রিন্সের একটা বক্তব্য অবিকল তারই উচ্চারণ-ভঙ্গীসহ নেখ্‌ল্যুদভের স্মৃতিতে দাগ কেটে গেল।

রক্ষী ও কুলিদের নিয়ে শ্যালিকাকে সঙ্গে করে স্টেশন থেকে বের হবার সময় প্রিন্স তার আত্মম্ভরী উচ্চকণ্ঠে কার প্রসঙ্গে যেন বলে উঠল, "Oh it est du vrai grand monde, du vrai grand monde" (ওঃ, সে খুব বড় ঘরের ছেলে, খুব-বড় ঘরের ছেলে)।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্টেশনের এক কোণ থেকে একদল মজুর এসে হাজির হল। তাদের পায়ে বাকলের জুতো, কাঁধে ভেড়ার চামড়ার কোট ও বস্তা। সামনে যে কামরা পেল সেটাতেই তারা উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু গার্ড তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দিল। মজুররাও ছুটাছুটি ঠেলাঠেলি করে পরের কামরায় উঠতে গেল। তাদের দেখতে পেয়ে আর একজন গার্ড এসে ভীষণ ভাবে বকতে শুরু করে দিল। অগত্যা তারা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে এসে পরের কামরাটার দিকে গেল। সেই কামরাতেই নেখ্‌ল্যুদভ ছিল। গার্ড সেখানেও তাদের বাধা দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ বলল যে ভিতরে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, তারা স্বচ্ছন্দে উঠতে পাবে। নেখ্‌ল্যুদভের পিছনে পিছনে তারা সকলেই সেই কামরায় উঠে পড়ল। সকলে বসতে যাবে এমন সময় সেই প্রতীক চিহ্ন লাগানো ভদ্রলোক ও মহিলা দুটি ভীষণ ভাবে আপত্তি করে তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইল। মজুরদের দলে ছেলে-বুড়ো মিলিয়ে জনকুড়ি লোক। কী আর করে, বস্তাগুলো টানতে টানতে তারা আবার দরজার দিকে এগোতে লাগল। দেখে মনে হল, যেন তারাই দোষ করেছে এবং পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও যেখানে তাদের বসতে বলা হবে সেখানেই তারা বসতে রাজী, লোহার গজালের উপর বসতেও বুঝি তাদের আপত্তি নেই।

আর একজন গার্ডের কাছে পৌঁছতেই সেও খেঁকিয়ে উঠল, 'এই শয়তানের বাচ্চারা। ঠেলতে ঠেলতে কোথায় চলেছিস ? এখানে বসে পড়্।'

মহিলা দুটির মধ্যে যে ছোট সে চেঁচিয়ে বলল, 'Voila encore des novelles (এ তো দেখছি বেশ নতুন কম ব্যবস্থা) !' তার ধারণা, তার

চোস্ত্ ফরাসী শুনে নেখ্‌লুয়ুদভ তার দিকে নজর দেবে।

ব্রেসলেট-পরা মহিলাটি মুখভঙ্গী করে হাঁচতে শুরু করল; এই সব দুর্গন্ধ চাষীদের সঙ্গে চলা ফেরায় যে কী সুখ তা নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল।

একটা বিপদ কেটে গেলে মানুষ যে রকম খুশি হয়ে ওঠে তেমনি খুশি মনে কাঁধ থেকে বস্তাগুলো নামিয়ে মজুররা সব সিটের নীচে সেগুলি ঠেলে দিল।

তারাসের সামনে দুটো ও পাশে একটা সিট খালি ছিল। তিনটি মজুর সেখানে বসে পড়ল। কিন্তু ভদ্রলোকের পোষাক-পরা নেখ্‌লুয়ুদভ যখন সেখানে এসে দাঁড়াল তখন অপ্রস্তুতের মত তারা উঠে দাঁড়াল। নেখ্‌লুয়ুদভ তাদের বসতে বলে একটু দূরে আর একটা সিটে গিয়ে বসল।

বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি মজুর আর একটি কম বয়সী মজুরের সঙ্গে বিস্মিত, বুঝিবা ভীত দৃষ্টি-বিনিময় করল। একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা স্বাভাবিক নেখ্‌লুয়ুদভ সে ভাবে তাদের বকুনি দিয়ে না তাড়িয়ে নিজের জায়গায় তাদের বসতে দিল, এতে তারা বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করতে লাগল। তাদের ভয় হল, কি জানি এর ফলে আবার খারাপ কিছু না ঘটে।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা যখন দেখল নেখ্‌লুয়ুদভ বেশ সহজ ভাবেই তারাসের সঙ্গে কথা বলছে, তখন তারা বুঝতে পারল এর পিছনে কোন ষড়যন্ত্র নেই। এইটুকু স্বস্তি বোধ করে তারা একটা ছেলেকে বস্তার উপর বসতে বলে নেখ্‌লুয়ুদভকে তার সিটে গিয়ে বসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। যে বয়স্ক লোকটি নেখ্‌লুয়ুদভের মুখোমুখি বসে ছিল প্রথমে সে পা গুটিয়ে একপাশে কুঁকড়ে বসে ছিল, পাছে ভদ্রলোকের গায়ে পা লেগে যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে বেশ বন্ধুর মত হয়ে উঠল এবং কথা বলতে বলতে নেখ্‌লুয়ুদভের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য দু'একবার তার হাঁটুতে থাপ্পড়ও বসিয়ে দিল।

তার সব কথা সে বলতে লাগল। জল-ভরা খনির মধ্যে তাকে কাজ করতে হয়। আড়াই মাস কাজ করে এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে আছে দশ রুবলের মত, কারণ কাজে ঢুকবার আগেই কিছুটা আগাম নেওয়া ছিল। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এক-হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের কাজ করতে হয়; মাঝে দু'ঘণ্টা খাওয়ার ছুটি।

'যাদের অভ্যাস নেই তাদের খুবই কষ্ট হয়, তবে একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কষ্ট হয় না, অবশ্য খাওয়াটা যদি ভাল হয়। গোড়ায় খাবার খারাপ দিত। তারপর সকলে নালিশ করায় এখন ভাল খাবার দেয়। ফলে কাজের সুবিধা হয়েছে।'

সে বলতে লাগল, 'বিশ বছর যাবৎ সে কাজ করছে আর সব উপার্জনের টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছে; প্রথমে বাবাকে, তারপর বড় ভাইকে, আর এখন ভাই-পোকে, কারণ সেই এখন বাড়ির কর্তা। বছরে যে পঞ্চাশ ষাট রুবল সে

উপার্জন করে তার থেকে দুই বা তিন রুবল মাত্র সে নিজের জন্য খরচ করে—তামাক, দেশলাই ইত্যাদি বাবদ।'

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে সে আরও বলল, 'তবে আমারও পাপ আছে; খুব ক্লান্তি বোধ করলে মাঝেসাঝে একটু ভদ্‌কা খাই।'

তারপর বাড়িতে মেয়েরা কি রকম কাজকর্ম করে সে কথা বলল। আরও বলল, 'আজ রওনা হবার আগে কণ্টাক্টর মজুরদের আধ-বালতি ভদ্‌কা খাইয়েছে, তাদের মধ্যে একজন মারা গেছে, আর একজন অসুস্থ অবস্থায় তাদের সঙ্গেই ফিরছে। অসুস্থ ছেলেটি কামরার এককোণে বসে ছিল। তার চোখ-মুখ বসে গেছে, ঠোঁট দুটি নীল হয়ে গেছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। নেখ্‌লয়ুদভ তার কাছে এগিয়ে গেলে ছেলেটি এমন কাতর চোখে তার দিকে তাকাল যে তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে নেখ্‌লয়ুদভ বয়স্ক লোকটিকে বলল কুইনিন কিনে দিতে, আর কথাটা একটা কাগজে লিখেও দিল। দামটাও দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মজুরটি জানাল, দামটা সেই দেবে।

বুড়ো লোকটি তারাসকে বলল, 'দেখ, আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এ রকম একজন ভদ্রলোক কখনও দেখি নি। মাথায় ঘুসি মারার বদলে তিনি নিজের জায়গাটাই তোমাকে ছেড়ে দেন। বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোকও নানা রকম হয়।'

এই সব বলিষ্ঠ দেহ, ঘরে-তৈরি মোটা কাপড়ের পোষাক, আর রোদে-পোড়া শ্রান্ত, ক্লান্ত মুখগুলির দিকে তাকিয়ে এবং চারিদিকে নতুন মানুষের দল ও তাদের শ্রমিক জীবনের সুখ-দুঃখের মাঝখানে বসে নেখ্‌লয়ুদভের মনে হল, 'হ্যাঁ, সত্যি এ এক নতুন ও স্বতন্ত্র জগৎ।'

সে মনে মনে বলল, 'এই তো le vrai grand monde (সব বড় ঘরের ছেলে)। প্রিন্স কর্চাগিনের কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, সংকীর্ণ, হীন স্বার্থসর্বস্ব কর্চাগিন-পরিবারের অলস, বিলাসবহুল জগতের কথা।

সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন, অজ্ঞাতপূর্ব ও সুন্দর জগতের আবিষ্কর্তা অভিযাত্রীর আনন্দে তার মন ভরে গেল।

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যায়—১

যে কয়েদীদের দলে মাসলভা ছিল তারা প্রায় তিন হাজার মাইল পার হয়ে গেছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডিত বন্দীদের সঙ্গে সেও রেল ও স্টীমবোটে পার্ম শহর পর্যন্ত যায়। ভেরা দুখোভার পরামর্শ অনুসারে নেখ্‌ল্‌-যুদভের চেষ্টায় সেখান থেকেই মাসলভা রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে পথ চলবার অনুমতি পায়। ভেরা দুখোভাও সেই দলেই ছিল।

কি শারীরিক দিক থেকে, কি নৈতিক দিক থেকে, পার্ম পর্যন্ত পথযাত্রা মাসলভার পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক ছিল: শারীরিক দিক থেকে, কারণ অত্যধিক ভীড়, নোংরা, আর অস্বস্তিকর পোকা-মাকড়, যার ফলে তার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না; আর নৈতিক দিক থেকে কারণ সমান অস্বস্তিকর পুরুষের দল। প্রতিটি বিরতি-কেন্দ্রে কিছু কিছু বদল হলেও সর্বত্রই পুরুষগুলি ছিল পোকা-মাকড়ের মতই নাছোড়বান্দা। তারা ঝাঁক বেঁধে তাকে ঘিরে থাকত, এতটুকু বিশ্রাম দিত না। স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীর দল, রক্ষীদল, কনভয়-সৈনিক দল—সকলের মধ্যেই ইতর ব্যভিচারের স্বভাব এমনই বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে কোন স্ত্রী-কয়েদী যদি তার নারীত্বের সুযোগ নিতে না চায় তাহলে তাকে সদা-সর্বদা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হবে। সর্বদা ভয় ও সংঘর্ষের মধ্যে থাকা খুবই কষ্টকর; আর মাসলভার উপরেই আক্রমণটা চলত বেশী, কারণ তার চেহারা সুন্দর, আর তার অতীতও সকলের জানা। যে রকম দৃঢ়তার সঙ্গে সে পুরুষদের নাছোড়বান্দা আচরণের মোকাবিলা করতে লাগল তাতে তারা সকলেই তার উপর চটে গেল, তাদের মনে তার প্রতি একটা বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হল। তবে ফেদসিয়া ও তারাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় তার কিছুটা সুবিধা হয়েছিল। স্ত্রীর উপর নির্যাতনের খবর শুনে তাকে সাহায্য করবার আশায় সে স্বেচ্ছায় নিঝ্‌নি নভ্‌গরদে গ্রেপ্তার বরণ করে এবং ঐ দলের সঙ্গেই কয়েদী হিসাবে চলতে থাকে।

তারপর যখন মাসলভাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল তখন তার অবস্থা অনেকটা সহনীয় হয়ে উঠল। রাজনৈতিক বন্দীদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক ভাল, এবং তাদের প্রতি ব্যবহারও ততটা কঠোর নয়। পুরুষের হাতে নির্যাতন সইতে হচ্ছিল না বলে এবং যে অতীতকে সে ভুলে থাকতে চায় সেটাকে কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছিল না বলে তখন মাসলভার অবস্থা অনেকটা ভাল। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে তার সব

চাইতে বড় সুবিধা এই হল যে, এখানে এমন কয়েকটি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটল যারা তার চরিত্রের উপর একটা নিঃসংশয় ও কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

সবগুলি বিরতি-কেন্দ্রেই মাসলভাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকতে দেওয়া হত; কিন্তু তার গায়ে জোর থাকায় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকায় তাকে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গেই পথ চলতে বাধ্য করা হত। এই ভাবে তম্‌স্ক্‌ থেকে সারাটা পথ তাকে হেঁটেই যেতে হল। দুটি রাজনৈতিক বন্দীও সেই দলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল: একজন পিঙ্গল-নয়না সুন্দরী মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না—নেখ্‌ল্যুদভ যখন কারাগারে দুখোভার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল তখন এই মেয়েটির প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল; অপরজন সাইমনসন; যুবকটির গায়ের রং গাঢ়, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটি বসা; ঐ একই সময়ে নেখ্‌ল্যুদভ তাকেও দেখেছিল, আর এখন সে চলেছে ইয়াকুতস্ক অঞ্চলে নির্বাসনে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না হেঁটেই চলেছে কারণ সে তার গাড়ির আসনটা একটি গর্ভবতী সাধারণ কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে; আর সাইমনসন হেঁটে চলেছে কারণ একটা শ্রেণীগত সুবিধা ভোগ করাটা সে উচিত বলে মনে করে না। এই তিনজন খুব ভোরে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে যাত্রা করত; বাকি রাজনৈতিক বন্দীরা গাড়িতে চড়ে পরে আসত; একটা বড় শহরে পেঁছবার আগে পর্যন্ত যাত্রাপথে এই ব্যবস্থাই চলছিল; সেখানে পৌঁছে একজন নতুন কনভয়-অফিসার সেই দলের দায়িত্ব গ্রহণ করত।

সেপ্টেম্বরের একটি বর্ষণসিক্ত সকাল। মাঝে মাঝেই একটা ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া বইছে। কখনও বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বরফ পড়ছে। কয়েদীদের পুরো দলটা (প্রায় চারশ' পুরুষ ও পঞ্চাশটি স্ত্রীলোক) বিরতি-কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে জমা হয়েছে। কিছু কয়েদী কনভয়ের প্রধান কর্মকর্তাকে ঘিরে ধরেছে, কারণ কিছু কিছু, বিশেষভাবে বেছে নেওয়া কয়েদীর হাতে সে দুদিনের খরচের টাকা দিয়ে দিচ্ছিল অপর কয়েদীদের মধ্যে বিলি করে দেবার জন্য; আবার কিছু কয়েদী ফেরিওয়ালীদের কাছ থেকে খাবার-দাবার কিনছিল। কয়েদীদের টাকা গোণার ও জিনিসপত্র কেনার শব্দ এবং ফেরিওয়ালীদের কর্কশ শব্দ কানে আসছিল।

কাতয়ুশা ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বাড়িটার ভিতর থেকে উঠোনে বেরিয়ে এল। দুজনেরই পায়ে উঁচু বুট, গায়ে কলামের তৈরি খাটো জোব্বা, আর মাথায় শাল জড়ানো। ফেরিওয়ালীরা তখন বাতাস থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য উঠোনের উত্তরের দেয়ালের নীচে বসে তারস্বরে চেঁচিয়ে যার যার বেসাতী বেচতে ব্যস্ত: টাটকা রুটি, মাংসের পিঠে, মাছ, সেমাই, যবের হালুয়া, যকৃৎ, গো-মাংস, ডিম, দুধ—একজনের কাছে একটা সেদ্ধ শূকর-ছানাও ছিল।

সাইমনসন রবারের কুর্তা, রবারের জুতো ও সুতীর মোজা পরে (সে

নিরামিষাশী বলে কোন জন্তুর চামড়া ব্যবহার করে না) দলের যাত্রার অপেক্ষায় সেই উঠোনেই দাঁড়িয়েছিল। ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে যা মনে আসছিল তাই তার নোট-বইতে লিখে নিচ্ছিল। সে লিখল: "কোন সংক্রামক জীবাণু যদি মানুষের নখ পরীক্ষা করতে পারত তাহলে সে ওটাকে অজীব পদার্থ বলে ঘোষণা করত; ভূ-মণ্ডলের বেলায় আমরাও সেই রকম তার বহিরাবরণটিকে পরীক্ষা করেই তাকে অজীব বলে ঘোষণা করি। এটা ভুল।"

ডিম, রুটি, মাছ ও চাপাটি কিনে মাসলভা সেগুলিকে তার থলেতে ভরছিল আর মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না স্ত্রীলোকটিকে তার দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় কয়েদীদের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। সকলেই চুপচাপ যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। অফিসারটি বেরিয়ে এসে যাত্রা শুরু করার আদেশ দিল।

যথারীতি আবার সবই করা হল। কয়েদীদের গুণতি করা হল, তাদের পায়ের শিকল পরীক্ষা করা হল, আর যারা জোড়ায়-জোড়ায় যাবে তাদের দুজন করে হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে এক সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। কিন্তু হঠাৎ অফিসারটি সক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল এবং একটা আঘাতের শব্দ ও একটা শিশুর কান্না শোনা গেল। মুহূর্তের জন্য সব নিশ্চুপ, আর তারপরই ভিড়ের ভিতর থেকে একটা চাঁপা গুঞ্জন ভেসে এল। যেখান থেকে শব্দটা আসছিল আসলভা ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না সেই দিকে এগিয়ে গেল।

অধ্যায়—২

ঘটনাস্থলে পৌঁছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ও কাতয়ুশা দেখতে পেল, সুন্দর একজোড়া গোঁফওয়ালা গাট্টাগোট্টা অফিসারটি ভুরু কুঁচকে কর্কশ গলায় কাঁচা খিস্তি করতে করতে নিজের ডান হাতের তালুটা ঘষছে; একটি কয়েদীর মুখে চড় কসাবার দরুণ তার হাতে লেগেছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ঢ্যাঙা, লিকলিকে কয়েদী; তার মাথাটা অর্ধেক কামানো, একটা খাটো জোব্বা এবং ততোধিক খাটো ট্রাউজার পড়নে; সে এক হাতে তার রক্তাক্ত মুখটা মুছছে এবং আরেক হাতে শালে মোড়া একটি ছোট মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েটি ভয়ে চীৎকার করছে।

"আমি তোকে এইটে (কাঁচা খিস্তি) দেব। মুখে-মুখে তর্ক করার এমন ঝাল বুঝিয়ে দেব (আরও খিস্তি)। ওটাকে মেয়েদের হাতে দিয়ে দিতে হবে!" অফিসারটি চেঁচাতে লাগল। "এই—এবার যাত্রা শুরু করাও।"

গ্রাম্য কম্যুন কর্তৃক নির্বাসিত এই কয়েদীটি তমস্ক্ থেকে সারাটা পথ

ছোট মেয়েটিকে বয়ে এনেছে, কারণ সেখানেই তার স্ত্রী টাইফয়েডরোগে মারা গেছে। এখানে এসে অফিসার হুকুম দিয়েছে, তার হাতে হাত-কড়া পরাতে হবে। নির্বাসিত লোকটি আপত্তি জানিয়ে বলেছে যে হাত-কড়া লাগালে সে মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। অফিসারটির মেজাজ এমনিতেই খারাপ ছিল। বাস, এতেই সে খাপ্পা হয়ে ওঠে এবং তার আদেশ অমান্য করায় গোলমেলে কয়েদীটিকে ঠেঙানি দেয়।*

আহত কয়েদীটির পাশে একজন কনভয়-সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল। আর তার পাশে ছিল কালো দাড়িওয়ালা একটি কয়েদী; তার এক হাতে এক জোড়া হাত-কড়া; সে বিষণ্ণ মুখে একবার অফিসারের দিকে একবার মেয়ে-কোলে আহত কয়েদীটির দিকে তাকাচ্ছিল। অফিসার পুনরায় সৈনিকটিকে আদেশ করল মেয়েটিকে নিয়ে যেতে। এবার কয়েদীদের কলগুঞ্জন উচ্চতর হল।

পিছন থেকে কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল, "তমৃস্ক্‌ থেকে সারাটা পথ তো তাদের হাত-কড়া পরানো হয় নি।"

"এটা তো একটা শিশু, কুকুরের বাচ্চা নয়।"

"মেয়েটাকে নিয়ে সে কি করবে?"

"এটা তো আইন নয়," অপর কেউ বলল।

"লোকটা কে হে?" যেন কেউ হুল ফুটিয়েছে এমন ভাবে অফিসারটি চীৎকার করে উঠল; ভীড়ের মধ্যে ছুটে গিয়ে বলল, "তোকে আইন শেখাচ্ছি। কে বলেছে? তুই? তুই?"

"সকলেই বলেছে, কারণ—" একটি বেঁটে চওড়া-মুখ কয়েদী জবাব দিল।

তার কথা শেষ হবার আগেই অফিসারটি দুই হাতে তার মুখে আঘাত করল। "বিদ্রোহ? বটে? বিদ্রোহ কাকে বলে দেখাচ্ছি! তোদের সব্বাইকে কুকুরের মত গুলি করে মারব, আর তাতে কর্তৃপক্ষ আমাকে ধন্যবাদ দেবে। মেয়েটাকে নিয়ে যাও।"

ভীড় নিশ্চুপ। একটি কনভয়-সৈনিক ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে জোর করে কেড়ে নিল। অপর সৈনিক কয়েদীটির হাতে হাত-কড়া পরিয়ে দিল; এবার সে বিনীতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

তলোয়ার-বাঁধা বেল্টটা ঠিক করতে করতে অফিসার চেঁচিয়ে বলল, "ওকে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও।"

ছোট মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। শালের ভিতর থেকে হাত দুটি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে তারস্বরে চীৎকার করছে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ভীড়ের

---

* ডি. এ. লিন্যেভ 'Transportation' গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন। —এল. টি.

ভিতর থেকে অফিসারের কাছে এগিয়ে গেল।

বলল, "আমি কি এই ছোট মেয়েটিকে বয়ে নিয়ে যেতে পারি?"

"কে তুমি?" অফিসার জিজ্ঞাসা করল।

"একজন রাজনৈতিক বন্দী।"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সুন্দর মুখ ও বড় বড় দুটি চোখ (কয়েদীদের বুঝে নেবার সময়ই অফিসার তাকে লক্ষ্য করেছিল) অফিসারের উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হল। নীরবে তার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে সে বলল: "ইচ্ছা করলে নিতে পার, আমার কোন আপত্তি নেই। তোমার পক্ষে দয়া দেখানো সহজ! কিন্তু লোকটা পালিয়ে গেলে কে তার জবাবদিহি করত?"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল "একটা মেয়েকে কোলে নিয়ে সে পালাবে কেমন করে?"

"তোমার সঙ্গে বক-বক্ করবার সময় আমার নেই। ইচ্ছা হলে ওটাকে নিতে পার।"

"ওকে দিয়ে দেব কি?" সৈনিকটি জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ, দিয়ে দাও।"

মেয়েটিকে ভুলিয়ে কাছে আনবার জন্য মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আমার কাছে এস।"

কিন্তু শিশুটি সৈনিকের কোল থেকেই তার বাবার দিকে হাত বাড়িয়ে কাঁদতে লাগল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার কাছে যেতে চাইল না।

থলে থেকে একটা পিঠে বের করে মাসলভা বলল, "একটু অপেক্ষা কর মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না, ও আমার কাছে আসবে।"

ছোট মেয়েটি মাসলভাকে চিনত; তার মুখ ও পিঠেটা দেখে সে তার কোলে গেল।

আবার সব শান্ত। ফটক খোলা হল। কয়েদীর দল বাইরে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াল। কনভয় আবারও কয়েদীদের গুণ্‌তি করল। গাড়ির উপর বস্তাগুলি চাপিয়ে তার উপর দুর্বল কয়েদীদের বসানো হল। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে মাসলভা মেয়েদের দলে ফেদসিয়ার পাশে জায়গা করে নিল। সাইমনসন এতক্ষণ সব কিছু দেখছিল; এবার সে দৃঢ় পদক্ষেপে অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল। যাত্রার আদেশ দিয়ে সবে সে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাইমনসন বলল:

"আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন।"

"তোমার জায়গায় যাও; সেটা তোমার ব্যাপার নয়।"

"আপনি যে খারাপ ব্যবহার করেছেন সেটা জানিয়ে দেওয়া আমার কাজ, আর সেটা আপনাকে জানিয়ে গেলাম।" পুরু ভুরুর নীচ থেকে অফিসারের

মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে সাইমনসন কথাগুলি বলল।

তার কথায় কান না দিয়ে অফিসার হাঁক দিয়ে উঠল, "তৈরি? আগে বাড়! বলেই কোচয়ানের ঘাড়ে হাত রেখে সে গাড়িতে উঠে বসল।

কয়েদীর দল যাত্রা শুরু করল। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যে কর্দমাক্ত বড় রাস্তাটা চলে গেছে তার দুই দিকেই নালা। সেই রাস্তায় পড়ে কয়েদীর দল সার বেঁধে এগিয়ে চলল।

অধ্যায়—৩

যত কষ্টকরই হোক, দীর্ঘ ছ বছর শহরের লাঞ্ছিত, বিলাসী ও নারীসুলভ জীবন এবং সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে দু'মাস কারা-জীবন কাটাবার পরে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে জীবন কাটাতে কাতয়ুশার বেশ ভালই লাগছিল। প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ মাইল পথ পার হওয়া, ভাল খাবার ও দু'দিন অন্তর একদিন বিশ্রাম—ফলে তার শরীরে বল ফিরে এল। নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এমন একটি অর্থপূর্ণ নতুন জীবনকে সে দেখতে পেল যার কথা আগে কখনও সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। যে সব আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে (তার নিজের কথা) সে চলেছে তেমন সে আগে কখনও দেখা তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারে নি।

সে বলত, "দেখ! যখন শাস্তি দেওয়া হল তখন আমি কেঁদেছিলাম! অথচ এই দণ্ডাজ্ঞার জন্য আমার সারা জীবন ধরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। নইলে তো আজ আমি যাঁদের চিনেছি কোন দিন তাঁদের দেখা পেতাম না।"

বিনা চেষ্টায় সহজেই সে এই সব মানুষের কাজের মূল প্রেরণাটাকে উপলব্ধি করতে করতে এবং সে নিজেও জনতার একজন হওয়ার দরুন তাঁদের প্রতি তার পূর্ণ সহানুভূতি জেগে উঠল। সে বুঝতে পারত, এই মানুষগুলি উচ্চশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ সমর্থক, এবং নিজেরা সেই উচ্চশ্রেণীর লোক হয়েও জনগণের জন্যই সব সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে। বিশেষ করে সেই জন্যই সে তাঁদের এত বড় মনে করে, এত প্রশংসা করে।

নতুন সঙ্গীদের সকলকেই তার ভাল লাগে, কিন্তু বিশেষ করে ভাল লাগে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে। শুধু যে ভাল লাগে তাই নয়, একটা অদ্ভুত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে সে তাকে ভালবাসে। এই সুন্দরী মেয়েটি তিনটে ভাষা বলতে পারে, সে একজন ধনী জেনারেলের মেয়ে, তার ধনী দাদা যা কিছু পাঠিয়েছিল সব সে বিলিয়ে দিয়েছে, একটি সরল মজুর মেয়ের মত সে থাকে, তার সাজ-পোষাক শুধু সরল নয়, একেবারেই গরীবের মত, নিজের

চেহারার দিকেও তার দৃষ্টি নেই। এ সব কিছু দেখে মাসলভা অভিভূত হয়েছে। তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নারীসুলভ ছলা-কলার সম্পূর্ণ অভাবই মাসলভার কাছে বিশেষভাবে বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

মাসলভা বুঝতে পারে, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যে সুন্দরী তা সে নিজে জানে এবং জেনে খুশিও হয়, অথচ তার সেই সুন্দর চেহারার যে প্রতিক্রিয়া পুরুষের মনে দেখা দেয় তাতে সে মোটেই খুশি নয় ঃ বরং সেটাকে সে ভয় করে এবং সকলেই যে তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে চায় এতে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে, ভীত হয়। তার পুরুষ সঙ্গীরা এ কথা জানে এবং কখনও তার সঙ্গে প্রেমে পড়ে না—আর পড়লেও তা চেপে রাখে—এবং তার সঙ্গে একটি পুরুষ-সঙ্গীর মতই ব্যবহার করে ; কিন্তু অপরিচিত যে সব পুরুষ তাকে জ্বালাতন করে তাদের বেলায় তার দৈহিক শক্তিটা খুবই কাজে লাগে।

সে হাসতে হাসতে কাতয়ুশাকে বলে, "একদিন হল কি একটি লোক পথে আমার পিছু নিল। সে কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। শেষে তাকে ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলাম যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।"

সে নিজেই বলেছে, শিশুকাল থেকেই সে ধনী লোকদের জীবনযাত্রাকে অপছন্দ করত এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে ভালবাসত, আর সেই জন্যই সে বিপ্লবী হয়েছে। বসবার ঘরের বদলে চাকরদের ঘরে, রান্নাঘরে বা আস্তাবলে দিন কাটাত বলে তখন সে অনেক বকুনি খেয়েছে।

সে বলে, "রাঁধুনি ও কোচোয়ানদের সঙ্গে থাকতেই আমার ভাল লাগত ; ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকদের সঙ্গে থাকলেই কেমন মন খারাপ হয়ে যেত। তারপর যখন সব কিছু বুঝতে শিখলাম তখন দেখলাম, আমাদের জীবনটা একেবারেই ভুল। আমার মা ছিল না। বাবাকেও ভাল লাগত না। তাই উনিশ বছর বয়সেই বাড়ি ছাড়লাম এবং একটি মেয়ে-বন্ধুর সঙ্গে কারখানায় কাজে ঢুকলাম।"

কারখানা ছেড়ে সে কিছুদিন গ্রামে ছিল। তারপর শহরে ফিরে সে এমন একটা আস্তানায় থাকত যেখানে তাদের একটা গুপ্ত ছাপাখানা ছিল। সেখান থেকেই সে গ্রেপ্তার হয় এবং সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সে নিজে কিছু না বললেও কাতয়ুশা অন্যদের কাছ থেকে শুনেছে যে, পুলিশ যখন তাদের আস্তানায় খানাতল্লাসি চালায় তখন একজন বিপ্লবী অন্ধকারের ভিতর থেকে গুলি চালায় এবং সেই দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না দণ্ডভোগ করে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই কাতয়ুশা লক্ষ্য করছে যে, নিজে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন সে কখনও নিজের কথা ভাবে না, সর্বদাই অপরের সেবা করতেই সে ব্যস্ত ; ছোট বড় যে কোন ব্যাপারে অন্যকে সাহায্য করতেই সে চায়। তার সম্পর্কে একজন বর্তমান সঙ্গী মন্তব্য করেছে যে বিশ্ব-প্রেমের খেলায় সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। কথাটি ঠিক। খেলোয়াড় যেমন

খেলার সন্ধানে ফেরে, সেই রকম অপরকে সেবা করবার সুযোগ খোঁজাই তার সারা জীবনের লক্ষ্য। সেই খেলা ক্রমে তার জীবনের অভ্যাস ও কাজে পরিণত হয়েছে ; এমন সহজভাবে এ সব কাজ সে করে যে যারা তাকে জানে তারা এ জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, বরং প্রত্যাশাই করে।

মাসলভা যখন প্রথম তাদের মধ্যে এল তখন মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার প্রতি বিরূপ হয়েছিল, বিরক্ত হয়েছিল। কাতয়ুশাও সেটা লক্ষ্য করেছিল ; কিন্তু সে আরও বুঝতে পেরেছিল যে সে মনোভাবকে জয় করবার চেষ্টার ফলে ক্রমে সে মাসলভার প্রতি বিশেষ মমতা ও করুণা বোধ করতে শুরু করেছে। একটি অসাধারণ মানুষের এই মমতা ও করুণা মাসলভাকে এতই অভিভূত করে ফেলল যে সে তার সমস্ত অন্তরটাই তাকে দিয়ে ফেলল ; নিজের অজ্ঞাতেই তার মতামতকে গ্রহণ করে সর্বপ্রকারে তাকে অনুকরণ করতে লাগল। আর মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাও কাতয়ুশার এই আত্ম-নিবেদিত ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে প্রতিদানে তাকেও ভালবেসে ফেলল।

যৌন ভালবাসার প্রতি বিরূপতাও তাদের দুজনকে এক সূত্রে বেঁধে দিল। একজন সে ভালবাসাকে ঘৃণা করে কারণ সে ভালবাসার সব রকম বিভীষিকার অভিজ্ঞতা তার হয়েছে ; আর অপর জন সেদিক থেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হওয়ায় সেটাকে একটা দুর্বোধ্য, ঘৃণ্য ও মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী কিছু বলে মনে করে।

অধ্যায়—৪

যেসব প্রভাবের কাছে মাসলভা নিজেকে নত করেছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার প্রভাব তাদের অন্যতম। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার প্রতি মাসলভার ভালবাসাই তার উৎস। তার জীবনের আর একটি প্রভাব এসেছে সাইমনসনের কাছ থেকে। মাসলভার প্রতি সাইমনসনের ভালবাসাই তার উৎস।

মানুষ বেঁচে থাকে এবং কাজ করে অংশত নিজের ধারণা এবং অংশত অপরের ধারণা অনুসারে। এই দুয়ের তারতম্য অনুসারেই একজন মানুষ থেকে আর একজন মানুষকে পৃথক করা হয়। কারও কাছে চিন্তা এক ধরনের মানসিক খেলা : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের বুদ্ধিকে সংযোগরক্ষাকারী ফিতেবিহীন একটা চালক-চক্রের (driving wheel) মত ব্যবহার করে, এবং অপর লোকের ধারণার দ্বারা—প্রচলিত রীতিনীতি, ঐতিহ্য অথবা আইনের দ্বারা—পরিচালিত হয়। আবার কেউ বা সব রকম কাজের ক্ষেত্রেই নিজেদের ধারণাকেই প্রধান প্রেরণা-শক্তি বলে গ্রহণ করে, নিজেদের বুদ্ধির নির্দেশকেই মেনে চলে ; তবে কখনও কখনও ভাল করে বিচার-বিবেচনা করে তবে অপরের মতামতকে গ্রহণ করে। সাইমনসন সেই রকম একটি মানুষ ; সমস্ত

ঘটনাকে ভাল করে পরীক্ষা করে নিজের বুদ্ধি অনুসারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং তার পরে তদনুসারেই কাজ করে।

স্কুলের ছাত্রাবস্থায় যখন সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সরকারী আপিসে খাজাঞ্চির কাজে নিযুক্ত তার বাবার আয় সৎপথে উপার্জিত নয়, তখনই সে বাবাকে বলেছিল সে-টাকা জনসাধারণকে দিয়ে দেওয়া উচিত। তার কথা না শুনে বাবা যখন উল্টে তাকেই বকুনি লাগাল তখনই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এবং কিছুতেই আর বাবার টাকা-পয়সা নিতে রাজী হল না। যখনই তার মনে হল যে জনগণের অশিক্ষাই সব দোষের মূল কারণ, তখনই সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসেই "নারদনিক" (গণ দল)-এ যোগ দিল, একটি গ্রাম স্কুল-শিক্ষকের চাকরি নিল এবং ছাত্রদের ও চাষীদের সাহসের সঙ্গে সেই সব শিক্ষা দিতে লাগল যাকে সে ন্যায় বলে মনে করে, আর যাকে অন্যায় বলে মনে করে প্রকাশ্যে তার প্রতিবাদ করতে লাগল।

সে গ্রেপ্তার হল। তার বিচারও হল।

বিচারের সময় সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে তার বিচার করবার কোন অধিকার তার বিচারকদের নেই, আর সে কথা তাদের জানিয়েও দিল। বিচারকরা যখন তার কথায় কান না দিয়ে বিচার চালিয়ে যেতে লাগল, তখন সে স্থির করল তাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেবে না, এবং তাদের সব রকম জেরার উত্তরে একেবারে চুপ করে রইল।

আর্খাঙ্গেল্‌স্ক্‌ জেলায় তাকে নির্বাসিত করা হল। সেখানে একটি নতুন ধর্ম-শিক্ষার প্রবর্তন করে তদনুসারে তার সব কাজকর্ম পরিচালিত করতে লাগল। সেই শিক্ষার মূল কথা হল: এই জগতের সব কিছুই প্রাণময়, কোন কিছুই মৃত নয়, যে সকল বস্তুকে আমরা নিষ্প্রাণ বা অজৈব বলে মনে করি সে সব কিছুই আমাদের বুদ্ধির অগম্য এক বিরাট জৈব সত্তার অংশ মাত্র; আর সেই বিরাট জীব-দেহের ও তার প্রতিটি জীবন্ত অংশের প্রাণ-প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তার অংশস্বরূপ প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। এবং তার মতে জীব-হিংসামাত্রই অপরাধ; তাই সে যুদ্ধ, প্রাণদণ্ড এবং মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী হত্যার বিরোধী। বিবাহ-বিষয়েও তার একটা নিজস্ব মত ছিল: সে মনে করত, জীবসৃষ্টি মানব-জীবনের নীচু স্তরের কর্তব্য, জীবিত প্রাণীর সেবাই তার মহত্তর কর্তব্য। রক্তে শ্বেত-কণিকার অস্তিত্বই তার মতকে সমর্থন করে বলে সে বিশ্বাস করত। তার মতে চিরকুমাররা ঐ শ্বেত-কণিকার মত, জীব-দেহের দুর্বল ও রুগ্ন অংশকে সাহায্য করাই তাদের কাজ। এই সিদ্ধান্তে আসার পর থেকেই সে অনুরূপ জীবন যাপন করতে শুরু করেছে, যদিও যৌবনে সে অনেক প্রমোদে দিন কাটিয়েছে। নিজেকে এবং মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকেও সে মানবিক শ্বেত-কণিকা বলে মনে করে।

কাতয়ুশার প্রতি তার ভালবাসা এই ধারণার পরিপন্থী নয়, কারণ তার সে

ভালবাসা দেহাতীত ; কাজেই তার মতে সেই ভালবাসা শ্বেত-কণিকা হিসাবে তার কাজের বিঘ্ন তো নয়ই, বরং প্রেরণা স্বরূপ।

তার নিজের মত করে সে যে শুধু নৈতিক সমস্যারই সামাধান করেছে তা নয়, বাস্তব সমস্যারও সমাধান করছে। সব বৈষয়িক ব্যাপারেই তার একটা নিজস্ব মত ছিল ; কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে, কত ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে, কি রকম খাদ্য খেতে হবে, কি রকম সাজ-পোষাক করতে হবে, এবং কি ভাবে ঘরকে গরম রাখতে বা আলোকিত করতে হবে—এ সবই সে নিয়মমাফিক করত।

এ সব সত্ত্বেও সাইমনসন ছিল লাজুক ও নম্র স্বভাবের মানুষ ; কিন্তু একবার মনস্থির করলে কিছুই তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারত না।

এই মানুষটি মাসলভার প্রতি ভালবাসার জোরে তার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। নারীর সহজাত প্রবৃত্তিবলেই মাসলভাও অচিরেই বুঝতে পারল যে সাইমনসন তাকে ভালবাসে, আর এমন একটি ছেলের ভালবাসা পেয়েছে বলে নিজের কাছেই সে যেন অনেক বড় হয়ে উঠল। নেখ্‌লুদভ তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে উদারতাবশে, অতীতের কিছু ঘটনার ফলে, কিন্তু সাইমনসন ভালবেসেছে আজকের মাসলভাকে, ভালবাসার জন্যই ভালবেসেছে। সে ভাবল, সাইমনসন নিশ্চয় তাকে বিশেষ মহৎ গুণ সম্পন্ন অসাধারণ স্ত্রীলোক বলে মনে করে। তার মধ্যে কি কি মহৎ গুণ আছে বলে সে মনে করে মাসলভা তা জানে না, কিন্তু নিজেকে নিরাপদ রাখবার জন্য এবং তাকে নিয়ে সাইমনসনের যাতে স্বপ্নভঙ্গ না হয় সেজন্য নিজের ধারণামত শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অধিকারিণী হবার জন্য যথাসম্ভব ভাল হয়ে উঠবার জন্য সে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল।

তারা যখন কারাগারে ছিল তখন থেকেই এটা শুরু হয়েছে। সেটা ছিল সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ; মাসলভা লক্ষ্য করল, এই দুটি দয়ালু ঘন নীল চোখ চওড়া ভুরুর নীচ থেকে এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে আরও লক্ষ্য করল যে, লোকটি যেমন অদ্ভুত, তার চেয়ে থাকার ধরণটাও তেমনি অদ্ভুত। সে আরও লক্ষ্য করল, তার এলোমেলো চুল ও কুঞ্চিত ললাটের রুক্ষতার সঙ্গে তার দৃষ্টির শিশুসুলভ মমতা ও সরলতার একটা আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে। তার সঙ্গে মাসলভার আবার দেখা হয় তম্‌স্ক্‌-এ যখন সে রাজনৈতিক কয়েদীদের দলে চলে আসে। যদিও তাদের মধ্যে তখন একটিও কথা হয় নি, তবু দৃষ্টি বিনিময়ের ভিতর দিয়েই তারা পরস্পরকে চিনেছিল ও পরস্পরের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছিল। এমন কি তারপরেও তাদের মধ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কখনও হয় নি, কিন্তু মাসলভা যেন বুঝতে পেরেছে যে, যখনি তার উপস্থিতিতে সাইমনসন কোন কথা বলেছে সে কথা তাকে লক্ষ্য করে তার জন্যই বলেছে, নিজেকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যই বলেছে।

কিন্তু যখন থেকে তারা সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল একমাত্র তখন থেকেই তারা পরস্পরের অনেকটা কাছে এসে গেল।

অধ্যায়—৫

পার্ম ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্ত নেখ্‌লয়ুদভ দুবার মাত্র কাতয়ুশার সঙ্গে দেখা করতে পেরেছে—একবার নিঝ্‌নি নভ্‌গরদ-এ কয়েদীদের যখন তারের জাল দিয়ে ঘেরা খাঁচায় ভরবার জন্য বজরায় তোলা হচ্ছিল, এবং আর একবার পার্ম-এর কারা-আপিসে। সে দু'বারই কাতয়ুশাকে দেখেছে সংযত ও বিরূপ। সে যখন প্রশ্ন করেছে তার কিছু চাই কিনা এবং সে বেশ ভাল আছে কি না তখন সে লজ্জার সঙ্গে খুবই ভাসা-ভাসা জবাব দিয়েছে; নেখ্‌লয়ুদভের মনে হয়েছে, তার আগেও কয়েকবার যে বিরূপ তিরস্কারের মনোভাব সে দেখিয়েছে সেখানেও তাই দেখিয়েছে। সে সময় পুরুষগুলো যে ভাবে তার পিছনে লেগেছিল তাতে কাতয়ুশা খুবই মনমরা হয়েছিল, আর সে জন্য নেখ্‌লয়ুদভও যন্ত্রণা ভোগ করছিল। তার ভয় হয়েছিল পাছে যাত্রাপথের এই কঠোর অবমাননাকর পরিস্থিতিতে আবার সে আগেকার মতই নৈরাশ্য ও সংঘাতের চাপে ভেঙে পড়ে তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে এবং সব কিছু ভুলে থাকবার জন্য আগেকার মতই আবার মদ খেতে ও ধূমপান করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু সে সময়ে তাকে কোন প্রকার সাহায্য করাই তার পক্ষে সম্ভব হয় নি যেহেতু তখন সে তার সঙ্গে দেখাই করতে পারে নি। কিন্তু যখন সে রাজনৈতিক বন্দীদের দলে যোগ দিল তখন থেকেই নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল তার সে আশংকা কত ভিত্তিহীন; প্রতিটি সাক্ষাৎকারেই সে লক্ষ্য করতে লাগল যে, কাতয়ুশার অন্তরের পরিবর্তন ক্রমাগতই সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। একান্ত ভাবে এই পরিবর্তনই তো সে চেয়েছিল। তম্‌স্ক্‌-এ যখন প্রথম তাদের দেখা হল তখন মাসলভা যেন আবার মস্কো ছেড়ে আসবার সময়কার দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছিল। নেখ্‌লয়ুদভকে দেখে সে ভ্রূকুটি করল না, বিচলিত হল না, বরং সরলভাবে খুশি মনে তার সঙ্গে দেখা করল, তার জন্য সে যা কিছু করেছে, বিশেষ করে যে লোকদের সঙ্গে সে এখন আছে সেখানে তাকে নিয়ে আসবার জন্য সে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

দলের সঙ্গে দুটো মাস পথ চলবার পরে তার মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটা তার চেহারায় ফুটে উঠেছে। তার চেহারা রোদে-পোড়া ও আগেকার তুলনায় কৃশ হয়েছে; তাকে কিছুটা বয়স্কও দেখাচ্ছে; কপালে ও মুখের চার পাশের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। কিন্তু তার কপালের উপর একগাছিও চুল এসে পড়ে নি, সব চুল রুমাল দিয়ে ঢাকা। যেভাবে সে চুল বেঁধেছে, পোষাক পরেছে ও কথা বলছে তাতে ছলা-কলার চিহ্নমাত্র নেই। এই ভাবে

যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং অবিরাম ঘটে চলেছে তাতে নেখ্‌ল্যুদভ খুব খুশি হল।

মাসলভার প্রতি তার এমন একটা অনুভূতি হল যার অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি। তার প্রথম কাব্যিক ভালবাসার সঙ্গে এই অনুভূতির কোন মিল নেই; পরবর্তীকালের যৌন ভালবাসা অথবা বিচারের পরে যে কর্তব্য পালনের আত্মতুষ্টিতে (আত্ম-প্রশংসাও তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল) সে তাকে বিয়ের সংকল্প করেছিল, তার সঙ্গেও এ অনুভূতির কোন মিলই নেই। বর্তমান অনুভূতি শুধুমাত্র করুণা ও মমতার অনুভূতি। এই অনুভূতি তার মনে জেগেছিল যখন সে প্রথমবার তাকে দেখতে কারাগারে গিয়েছিল, এবং পুনরায় জেগেছিল যখন নিজের বিতৃষ্ণাকে জয় করে হাসপাতালের ডাক্তারের সহকারীর সঙ্গে তার কাল্পনিক ফস্টিনস্টিকে সে ক্ষমা করেছিল (তখন তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল সেটা পরে ধরাও পড়েছে)। এখনও সেই অনুভূতিই তার মনে জেগেছে, তবে দুয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে তখন যেটা ছিল সাময়িক এখন সেটা হয়েছে স্থায়ী অনুভূতি। এখন সে যা কিছু ভাবে, যা কিছু করে, সব সময়ই তার মনে জেগে থাকে সেই করুণা ও মমতার অনুভূতি, শুধু মাসলভার জন্য নয়, প্রত্যেকের জন্য।

নেখ্‌ল্যুদভের অন্তরে যে ভালবাসার প্রবাহ এতদিন অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, এই অনুভূতি যেন তার দুয়ার খুলে দিয়েছে, তাই সে ভালবাসা এখন সকলের দিকেই সমভাবে বয়ে চলেছে।

এই ভ্রমণকালে নেখ্‌ল্যুদভের অনুভূতি এতখানি সজাগ হয়ে উঠেছে যে কোচয়ান থেকে আরম্ভ করে কনভয়-সৈনিক, কারা-পরিদর্শক ও গভর্ণর পর্যন্ত যার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে তার প্রতিই মনোযোগী ও বিবেচনাশীল না হয়ে সে পারে নি।

মাসলভা এখন রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকে; ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের অনেকের সঙ্গেই নেখ্‌ল্যুদভের পরিচয় ঘটেছে; প্রথমে ইয়েকাতেরিনবার্গে যেখানে বন্দীদের অনেক বেশী স্বাধীনতা ছিল এবং সকলকে এক সঙ্গে একটা বড় ঘরে রাখা হয়েছিল, এবং তারপরে পথ চলতে সেই পাঁচজন পুরুষ ও চারজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাদের দলে মাসলভাকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এইভাবে রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিতদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার ফলে তাদের সম্পর্কে নেখ্‌ল্যুদভের ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

রাশিয়ায় বিপ্লব আন্দোলনের শুরু থেকেই, বিশেষ করে ১লা মার্চ তারিখে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার নিহত হবার পর থেকে নেখ্‌ল্যুদভ বিপ্লবীদের অপছন্দ করত, ঘৃণা করত। সরকার-বিরোধী সংগ্রামে যে নিষ্ঠুরতা ও গোপনতার নীতি তারা মেনে চলত, বিশেষ করে তারা যে সব হত্যাকাণ্ড করত তার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তার মন বিদ্রোহ করত। এই সব বিপ্লবীরা নিজেদের যে

ভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করত তাও সে অপছন্দ করত। কিন্তু এখন আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাদের পরিচয় পেয়ে এবং সরকারের হাতে যে নির্যাতন তারা সহ্য করেছে সেটা জানতে পেরে সে ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে তারা যা তার চাইতে অন্য কিছু হতে পারত না।

ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডিত কয়েদীদের উপর ভয়ংকর ও অর্থহীন অত্যাচার করা হয় সত্য, তবু দণ্ডাদেশের আগে ও পরে তাদের প্রতি অন্তত একটা লোক-দেখানো সুবিচার প্রদর্শন করা হয়ে থাকে; কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় সেই লোক-দেখানো ভড়ংটুকুও থাকে না; শুস্তভার ক্ষেত্রে এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রেই নেখ্‌ল্যুদভ সেটা লক্ষ্য করেছে। তাদের প্রতি জালে আটক মাছের মত ব্যবহার করা হয়: যা কিছু জালে পড়ে সব শুদ্ধ ডাঙায় টেনে তোলা হয়; তারপর দরকারী বড় মাছগুলোকে বেছে আলাদা করে নিয়ে ছোটগুলোকে সেখানেই অযত্নে ফেলে রাখা হয় যাতে তারা শুকিয়ে মরে যায়। যে সকল নির্দোষ মানুষ কখনও কোন বিপদ ঘটাতে পারত না তাদের শ'য়ে শ'য়ে গ্রেপ্তার করে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে আটক রাখা হয়; সেখানে তারা ক্ষয়রোগে ভোগে, পাগল হয়ে যায়, বা আত্মহত্যা করে; অথচ তাদের আটক রাখার একমাত্র কারণ সরকারী কর্মচারিরা তাদের মুক্তির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোরই দরকার বোধ করে নি, বরং ভেবেছে যে তাদের নিরাপদে কারাগারে রাখলে হয়তো কোন সময়ে কোন রকম বিচার বিভাগীয় তদন্তের সুবিধা হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন কি সরকারী দৃষ্টি-কোণ থেকেও নির্দোষ এই সব মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে কতকগুলি পুলিশ-অফিসার, গুপ্তচর, সরকারী উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট, গভর্ণর, বা মন্ত্রীর খেয়াল, অবসর ও খুশির উপর। এই সব কর্মচারিদের অনেকেরই কাজে মন থাকে না অথবা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, এবং নিজের খেয়ালের বশে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের খেয়ালমাফিক মানুষকে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, অথবা মুক্তির আদেশ দেয়। আর সেই সব উর্ধ্বতন কর্মচারিও সেই একই কারণে অথবা কোন মন্ত্রীর চাপে মানুষকে পৃথিবীর ওপারে নির্বাসনে পাঠায়, নির্জন কক্ষে আটক রাখে, সাইবেরিয়ায় পাঠায়, কঠোর শ্রম ও মৃত্যুদণ্ড দেয়, আবার কোন মহিলার অনুরোধে মুক্তিও দেয়।

তাদের প্রতি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাই তারাও সরকারী কর্মচারিদের বিরুদ্ধে সেই একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এবং সামরিক বিভাগের লোকজন যেমন এমন একটি জনমতের বাতাবরণের মধ্যে বাস করে যাতে তাদের কাজকর্মের দোষ তো ঢাকা পড়েই, উপরন্তু সে সব কাজকে বীরত্বের পরিচায়ক বলেও প্রচার করা হয়, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক অপরাধীরা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী যে সব লোকের মধ্যে বাস করে তারাও এমন একটা বাতাবরণের সৃষ্টি করে যাতে নিজেদের স্বাধীনতা ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এবং মানুষের কাছে যা

কিছু প্রিয় তার ঝুঁকি নিয়ে সমূহ বিপদের মুখে তারা যে সব নিষ্ঠুর কাজ করে সেগুলিকেও খারাপের বদলে গৌরবজনক বলেই মনে হয়। যে সকল নরম স্বভাবের মানুষ কাউকে যন্ত্রণা দেওয়া দূরের কথা কোন প্রাণীর উপর নির্যাতন চোখে পর্যন্ত দেখতে পারত না তারাই আবার শান্ত চিত্তে মানুষকে খুন করতে পারে, এই বিস্ময়কর ঘটনার একটা ব্যাখ্যা যেন নেখ্‌লুদভ এবার খুঁজে পেয়েছে; তাদের প্রায় সকলেই মনে করে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং জনকল্যাণের যে মহান আদর্শ তারা গ্রহণ করেছে তাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনে হত্যা আইনসম্মত ও ন্যায়সম্মত। সরকার তার নিজের কাজকর্মের উপর এবং রাজনৈতিক অপরাধীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে তার ফলেই বিপ্লবীরাও তাদের আদর্শের উপর ও নিজেদের উপর সেই একই গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যে নির্যাতন তাদের উপর চালানো হয় সেটাকে সহ্য করবার জন্যই নিজেদের সম্পর্কে একটা উচ্চ ধারণা তাদের পোষণ করতে হয়।

তাদের আরও ভালভাবে জানবার পরে নেখ্‌লুদভ বুঝতে পেরেছে, কিছু লোক তাদের যে ধরনের পাড় দুর্বৃত্ত মনে করে, অথবা কিছু লোক তাদের যে ধরনের পুরোপুরি মহাবীর বলে মনে করে, তার কোনটাই তারা নয়; তারা সকলেই অতি সাধারণ মানুষ, এবং অন্য সব জায়গার মত তাদের মধ্যেও কিছু ভাল, কিছু মন্দ, ও কিছু মাঝারি লোক আছে।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবী হয়েছে কারণ তারা সৎভাবে বিশ্বাস করে যে বর্তমান অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা তাদের কর্তব্য; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা উচ্চাকাংখার বশীভূত হয়ে এই কর্ম-পদ্ধতি বেছে নিয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ লোকই বিপদ, ঝুঁকি ও জীবন নিয়ে খেলার নেশায়ই বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে; সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেখ্‌লুদভ ভাল করেই জানে যে, মানুষের মন যখন যৌবনের শক্তিতে ভরপুর থাকে তখন অতি সাধারণ মানুষের অন্তরেও এই সব অনুভূতি জাগ্রত হয়ে থাকে। তবে সাধারণ মানুষ থেকে তাদের এই পার্থক্য আছে যে তাদের নৈতিকতার ধারণাটা অনেক উঁচু পর্দায় বাঁধা। শুধু যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, কঠোর জীবনযাপন, সত্যপরায়ণতা ও নিঃস্বার্থপরতাকেই তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে তাই নয়, আদর্শের জন্য সব কিছু, এমন কি জীবন পর্যন্ত বলি দেওয়াকেও তারা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ তারা সাধারণের পক্ষে দুরধিগম্য একটি নৈতিক স্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠ; আর যারা নিকৃষ্ট তারা সাধারণ মানুষের চাইতেও নীচু স্তরের জীব; এমন কি তাদের মধ্যে অনেকেই মিথ্যাচারী, প্রবঞ্চক, আত্মম্ভরী ও গর্বে উদ্ধত। ফলে নেখ্‌লুদভ তার কিছু নবপরিচিত মানুষকে শ্রদ্ধা করতে, এমন কি সর্বান্তঃকরণে ভালবাসতেও শিখল, আর বাকিদের সম্পর্কে সে রইলো একান্ত উদাসীন।

অধ্যায়—৬

বিশেষ করে ক্রাইল্‌ত্‌সভকে নেখ্‌লুয়ুদভের খুব ভাল লেগে গেল। এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত যুবকটি সশ্রম দণ্ড ভোগ করতে কাতয়ুশাদের দলের সঙ্গেই যাচ্ছিল। ইয়েকাতেরিনবার্গে তার সঙ্গে নেখ্‌লুয়ুদভের প্রথম পরিচয় হয়। তারপর পথ চলতেও কয়েকবার আলাপ হয়েছে। একদা গ্রীষ্মকালে একটি বিরতি-কেন্দ্রে নেখ্‌লুয়ুদভ একটা পুরো দিন তার সঙ্গে কাটিয়েছিল, আর ক্রাইল্‌ত্‌সভও কথাপ্রসঙ্গে তার জীবনের কাহিনী, কেমন করে সে বিপ্লবী হয়েছে সবই একে একে বলেছিল। অচিরেই কারাদণ্ডের পূর্ব পর্যন্ত সব কথাই সে বলে ফেলল। তার বাবা ছিল দক্ষিণ রাশিয়ার এক ধনী জমিদার। শৈশবেই সে বাবাকে হারায়। সেই একমাত্র ছেলে। মাই তাকে বড় করে তুলল। সহজেই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করল। গণিত বিভাগে প্রথম হল। বিদেশে পড়াশুনা করবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা বৃত্তিও পেল। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে সে দেরী করে ফেলল। সে প্রেমে পড়ল, বিয়ের কথাও ভাবল, গ্রামের শাসনকার্যে অংশ নেবার কথাও ভাবতে লাগল। সব কিছু করতেই মন চায়, কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারে না। সেই সংকট-মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি সহপাঠী জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তার কাছে কিছু টাকা চাইল। সে জানত কাজটা বিপ্লবসংক্রান্ত। সে সময় বিপ্লবের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকলেও সহপাঠীদের টানে এবং পাছে তারা মনে করে যে সে ভয় পেয়েছে সেই আত্মম্ভরিতার বশে টাকাটা সে দিয়ে দিল। টাকাটা যারা নিয়েছিল তারা ধরা পড়ল এবং তাদের কাছে এমন একটা চিঠি পাওয়া গেল যাতে প্রমাণ হল যে ক্রাইল্‌ত্‌সভই টাকাটা দিয়েছিল। তাকে গ্রেপ্তার করা হল, এবং প্রথমে থানায় ও পরে কারাগারে পাঠানো হল।

"কারাগারের লোকজনরা খুব একটা কড়া ছিল না," ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলতে লাগল (উঁচু বিছানার তাকে সে বসেছিল; কনুই দুটো হাঁটুর উপরে রাখা, বুকটা বসে গেছে, চকচকে দুটি সুন্দর চোখে সে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকিয়ে ছিল)। "দেয়ালে টোকা দেওয়া ছাড়া অন্যভাবেও আমরা কথাবার্তা চালাতাম, করিডরে বেড়াতে পারতাম, খাদ্য ও তামাক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারতাম, এমন কি সন্ধ্যাবেলা গলা মিশিয়ে সকলে গানও করতাম। আমার গলা খুব ভাল ছিল। মা অবশ্য খুবই দুঃখ পেয়েছিল, নইলে আর সবই ঠিকমত সুখে-আনন্দেই চলছিল। সেখানেই বিখ্যাত পেত্রভ ও আরও অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পেত্রভ অবশ্য পরে দুর্গের মধ্যে একখানা কাঁচের সাহায্যে আত্মহত্যা করে। কিন্তু তখনও আমি বিপ্লবী হই নি। পাশাপাশি সেল-এর আরও দুজনের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল। একই কাজের জন্য তারা দুজন ধরা পড়ে। তাদের কাছে পোল্যাণ্ড-ঘোষণাপত্র

পাওয়া যায়। রেলওয়ে স্টেশনে যাবার পথে কনভয় থেকে পালাবার চেষ্টার অপরাধে তাদের বিচার হয়। তাদের একজন হল পোল্যাণ্ডের লজিনস্কি, অপর-জন ইহুদি রজভস্কি। হ্যাঁ। রজভস্কি তখন একেবারেই ছেলেমানুষ। সে বলত সতেরো বছর, কিন্তু তাকে দেখাত পনেরো বছর। একহারা, বেঁটে, কর্মঠ, দুটি ঝকঝকে কালো চোখ, আর অধিকাংশ ইহুদির মতই ভারি সুরেলা গলা। গলার স্বর তখনও ভাঙছে, তবু চমৎকার গাইত। হ্যাঁ। দুজনকেই বিচারের জন্য নিয়ে যেতে দেখলাম। সকালবেলা নিয়ে গেল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে তারা জানাল, তাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। এটা কেউই আশংকা করে নি। তাদের কেসটা এতই তুচ্ছ; তারা কনভয় থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল শুধু, কাউকে জখম পর্যন্ত করে নি। তাছাড়া রজভস্কির মত একটা ছেলেমানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া খুবই অস্বাভাবিক। কারাগারে আমরা সকলেই ভাবলাম, তাদের ভয় দেখাবার জন্যই এ দণ্ড দেওয়া হয়েছে, শেষ পর্যন্ত কার্যকর করা হবে না। প্রথমে আমরা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, পরে অবশ্য নিজেদের শান্ত করলাম এবং আমাদের জীবন আগের মতই চলতে লাগল। হ্যাঁ। তারপর একদিন সন্ধ্যায় পাহারাওয়ালা আমার দরজার কাছে এসে রহস্যজনকভাবে জানাল যে মিস্ত্রিরা এসে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করছে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারি নি। কি বললে? কিসের ফাঁসি-মঞ্চ? কিন্তু বুড়ো পাহারাওয়ালাটা এতই উত্তেজিত হয়েছিল যে তখনই বুঝতে পারলাম, আমাদের দুটি ছেলের জন্যই এই ব্যবস্থা। দেয়ালে টোকা দিয়ে অন্য সহকর্মীদের জানাতে চাইলাম, কিন্তু ভয় হল পাছে ওরা দুজন শুনে ফেলে। কমরেডরা সকলেই চুপচাপ। বুঝলাম, সকলেই জেনেছে। সেদিন সারাটা সন্ধ্যা সেল-এর ভিতরে ও করিডরে সব কিছুই মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ। দেয়ালে কোন টোকা পড়ল না, কেউ গান করল না। দশটার সময় পাহারা-ওয়ালা আবার এসে জানাল, মস্কো থেকে জল্লাদ এসে হাজির হয়েছে। এই কথা বলেই সে চলে গেল। তাকে ডাকতে লাগলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম করিডরের ওপাশ থেকে রজভস্কি আমাকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্যাপার কি? ওকে ডাকছ কেন?' আমি বললাম, ওকে দিয়ে কিছুটা তামাক আনাব। কিন্তু কি বুঝে সে আমাকে প্রশ্ন করল, 'আজ রাতে আমরা গান করলাম না কেন? দেয়ালে টোকা দিলাম না কেন?' তাকে কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে যাতে তার সঙ্গে কথা বলতে না হয় তাই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ; সে এক ভয়ংকর রাত। সারা রাত কান পেতে রইলাম। ভোরের দিকে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ শুনলাম। কারা যেন হেঁটে যাচ্ছে—অনেক মানুষ। দরজার ছিদ্রটার কাছে এগিয়ে গেলাম। করিডরে একটা আলো জ্বলছে। প্রথমে গেল ইন্সপেক্টর; স্বাভাবিক অবস্থায় লোকটি সংকল্পে দৃঢ় ও আত্মপ্রত্যয়শীল, কিন্তু এখন তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা, বিপর্যস্ত, বুঝি বা ভীত; তারপরে এল তার সহকারী, বিষণ্ন কিন্তু সংকল্পে দৃঢ়; সকলের পিছনে সৈনিকরা। আমার

দরজা পার হয়ে পরের দরজার সামনে তারা থামল। শুনতে পেলাম সহকারীটি আশ্চর্য এক গলায় বলে উঠল, 'লজিন্‌স্কি, ওঠ, পরিষ্কার পোষাক পরে নাও!' হ্যাঁ। তারপর দরজা খোলার শব্দ শুনলাম। তারা সেল-এ ঢুকল। তারপর শুনতে পেলাম, লজিন্‌স্কি করিডরের উল্টো দিকে চলে গেল। আমি শুধু ইন্সপেক্টরকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। ফ্যাকাসে মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে, কোটের বোতামগুলো খুলছে আর লাগাচ্ছে, মাঝে মাঝেই ঘাড় ঝাঁকুনি দিচ্ছে। হ্যাঁ। তারপর যেন কোন কিছুতে ভয় পেয়ে সেখান থেকে সে সরে গেল। সে লজিন্‌স্কি। তাকে পাশ কাটিয়ে লজিন্‌স্কি আমার দরজার কাছে এল। বলেছি তো, ছেলেটি ভাবী সুন্দর, চোখে-মুখে পোল্যাণ্ডের কমনীয়তা: চওড়া সোজা ভুরু, এক-মাথা সুন্দর কোঁকড়া চুল, দুটি সুন্দর নীল চোখ। ফোটা ফুলের মত কী তাজা, কী স্বাস্থ্যবান। সে আমার ছিদ্রটার সামনে এসে দাঁড়াল; তার সবটা মুখ আমি দেখতে পেলাম। একখানি ভয়ংকর, বিশীর্ণ, বিবর্ণ মুখ। 'ক্রাইল্‌ত্‌সভ, সিগারেট আছে?' কয়েকটা দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সহকারীটি তাড়াতাড়ি তার সিগারেট-কেসটা বের করে এগিয়ে দিল। একটা সিগারেট সে তুলে নিল। সহকারী দেশলাই জ্বালাল। সিগারেটটা ধরিয়ে টানতে টানতে সে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়েছে এইভাবে বলে উঠল, 'এ নিষ্ঠুর—এ অন্যায়। আমি কোন অপরাধ করি নি। আমি—' আমি দেখতে পেলাম তার গলার ভিতরে কি যেন কাঁপছে। চোখ ফেরাতে পারলাম না। সে থামল। হ্যাঁ। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম, রজভ্‌স্কি তার জোরালো ইহুদি-গলায় চীৎকার করছে। লজিন্‌স্কি সিগারেটটা ফেলে দিয়ে দরজা থেকে সরে গেল। আমার ছিদ্র-পথে এসে দাঁড়াল রজভ্‌স্কি। ছেলেমানুষী মুখখানি রক্তিম ও সিক্ত। দুটি স্বচ্ছ কালো চোখ। তারও পরণে পরিষ্কার পোষাক। ট্রাউজারটা এত ঢিলে যে টেনে ধরে রেখেছে। সারা শরীর কাঁপছে। করুণ মুখখানি আমার ছিদ্রের কাছে তুলে ধরল। 'ক্রাইল্‌ত্‌সভ, ডাক্তার আমার জন্য একটা কাশির ওষুধ দিয়েছে সেটা কি সত্যি, না কি? আমার শরীর ভাল নেই। আরও ওষুধ আমি খাব।' কেউ জবাব দিল না; সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, একবার ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাতে লাগল। সে যে কি বলতে চেয়েছিল, আমি কোন দিন বুঝতে পারি নি। হ্যাঁ। হঠাৎ সহকারীটি কঠোর মুখে কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'আরে, এসব কি ইয়ার্কি হচ্ছে? এবার আমাদের যেতে হবে।' মনে হল, তার সামনে কি অপেক্ষা করে আছে তা সে বুঝতে পারে নি; তাই সে করিডর ধরে সকলের আগে দৌড়ে চলে গেল। কিন্তু তারপরেই পিছিয়ে এল; তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ও কান্নার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। তারপর অনেক পায়ের শব্দ, অনেক গোলমাল। সে আর্তনাদ করছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সব শব্দ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে এল, সব শেষে দরজার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ, তারপর সব শান্ত।......হ্যাঁ। তাদের ফাঁসি

হয়ে গেল। একগাছি দড়িতে দুজনের গলায় ফাঁস পরানো হল। অপর একটি পাহারাওয়ালা ফাঁসিটা দেখেছিল। সে আমাকে বলল, লজিন্‌স্কি একটুও বাধা দেয় নি; কিন্তু রজভ্‌স্কি অনেকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল, সকলে তাকে টানতে টানতে ফাঁসির মঞ্চে তুলে জোর করে ফাঁসির দড়ি তার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ। পাহারাওয়ালাটা একটু বোকা ছিল। সে বলল: 'স্যার, ওরা আমাকে বলেছিল যে ব্যাপারটা খুব ভয় পাবার মত, কিন্তু মোটেই ভয় পাবার মত নয়। যখন ঝুলিয়ে দেওয়া হল তখন শুধু দু'বার তারা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়েছিল—এই ভাবে,'—ঘাড়টা কি ভাবে উঠেছিল আর পড়েছিল সেটাই সে দেখাল—'তারপর ফাঁসিটাকে আঁটবার জন্য জল্লাদ একটু টান দিল, আর সব শেষ হয়ে গেল; তারা আর নড়ল না।' "

ক্রাইল্‌ত্‌সভ পাহারাওয়ালার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে বলল, "মোটেই ভয় পাবার মত নয়," সে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু চাপা কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর অনেকক্ষণ সে একেবারে চুপ করে রইল; ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, আর যে চাপা কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল তাকে চাপা দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

"সেই দিন থেকে আমি বিপ্লবী হলাম। হ্যাঁ।" অনেকটা শান্ত হলে সে কথাগুলি বলল এবং অল্প কথায় তার কাহিনী শেষ করল।

সে "নারদ্‌নিক" দলের লোক; যে "ধ্বংসসাধক দল"-এর লক্ষ্যই ছিল সরকার যাতে স্বেচ্ছায় জনগণের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় সেজন্য তাকে সন্ত্রস্ত করে তোলা সেই দলের প্রধানের পদেও সে অধিষ্ঠিত ছিল। এই উপলক্ষ্যে সে পিতার্সবার্গ, কিয়েভ, ওডেসা ও বিদেশে ভ্রমণ করেছে এবং সর্বত্রই সফলকাম হয়েছে। কিন্তু একজন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোক তাকে ধরিয়ে দেয়। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার বিচার হয়, এবং দু বছর কারাগারে আটক রাখার পরে তার প্রাণদণ্ড হয়; কিন্তু পরে সে দণ্ড হ্রাস করে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

কারাগারে থাকতেই তার ক্ষয়রোগ দেখা দেয়; বর্তমানে তার যা স্বাস্থ্যের অবস্থা তাতে আর কয়েক মাসের বেশী সে বাঁচবে না। তা সে জানে, কিন্তু সেজন্য তার মনে কোন অনুশোচনা নেই; সে বলে, যদি আর একটা জীবন সে পায় তাহলে সে জীবনও এই একই ভাবে কাটাবে, যাতে এ জীবনে যে সব জিনিস সে দেখেছে যে-ব্যবস্থায় তা ঘটে তার পরিবর্তন সে ঘটাতে পারে।

যে সব কথা নেখ্‌ল্যুদভ আগে বুঝত না এই লোকটির গল্প শুনে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে সে-সবই এখন বুঝতে পেরেছে।

অধ্যায়—৭

যেদিন বিরতি-কেন্দ্রে একটি শিশুকে নিয়ে কয়েদীদের সঙ্গে কনভয়-অফিসারের গোলমাল হয়েছিল সেদিন নেখ্‌লয়ুদভ একটা গ্রাম্য সরাইখানায় রাত কাটিয়েছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরী হওয়ায় এবং পরবর্তী বড় 'শহরে' ডাকে ফেলবার জন্য কিছু চিঠিপত্র লেখায় সরাইখানা থেকে বের হতে অন্য দিনের চাইতে কিছুটা দেরী হয়ে গিয়েছিল ; ফলে অন্যান্য দিনের মত কয়েদীদের দলকে পথের মধ্যে সে ধরতে পারে নি, এবং পরবর্তী বিরতি-কেন্দ্রের গ্রামে যখন সে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সরাইখানায় ঢুকে গাটা গরম করে নিল। সরাইখানার মালকিনের সাদা ঘাড়টা অসম্ভব রকম মোটা। অনেক মূর্তি ও ছবিতে সাজানো একটি পরিষ্কার ঘরে বসে চা খেয়েই সে তাড়াতাড়ি কাতয়ুশার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি সংগ্রহের জন্য অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

গত ছ'টা বিরতি-কেন্দ্রের অফিসারের কাছ থেকে এই অনুমতি সে পায় নি। বার কয়েক অফিসার বদল হলেও তাদের কেউই নেখ্‌লয়ুদভকে বিরতি-কেন্দ্রে ঢুকতে দেয় নি ; ফলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে কাতয়ুশাকে সে দেখে নি। একজন উচ্চপদস্থ কারা-অফিসারের এই পথ দিয়ে যাবার কথা আছে বলেই এত কড়াকড়ি চলছে। দলটাকে পরিদর্শন না করেই সে অফিসারটা চলে গেছে ; তাই নেখ্‌লয়ুদভ আশা করছে আগেকার অন্য অফিসারদের মতই নতুন অফিসারটিও এবার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি তাকে দেবে।

গ্রামের অপর প্রান্তে অবস্থিত বিরতি-কেন্দ্রে নিয়ে যাবার জন্য মালকিন একটা গাড়ি ডেকে দেবার কথা বলেছিল, কিন্তু নেখ্‌লয়ুদভ হেঁটেই চলতে লাগল। হারকিউলিসের মত চওড়া-কাঁধ একটি যুবক মজুর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যুবকটির পায়ের ঢাউস হাই-বুটের নতুন লাগানো কড়া পালিশের তীব্র গন্ধ তার নাকে আসছিল।

একটা ঘন কুয়াসায় আকাশটা ঢাকা। ফলে রাস্তাটা এত অন্ধকার যে মাঝে মাঝে পাশের কোন জানালার আলো এসে না পড়লে তিন-পা আগের যুবকটিকেও সে দেখতে পাচ্ছিল না। তবে গভীর আঠালো কাদায় তার ভারী বুটের থপ-থপ শব্দ ঠিকই শুনতে পাচ্ছিল।

গীর্জার সামনেকার খোলা জায়গা এবং দুদিকের সারি সারি জানালার উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত বড় রাস্তা পার হয়ে নেখ্‌লয়ুদভ যখন যুবকটির পিছনে পিছনে গ্রামের শেষ সীমায় পৌঁছল সেখানে তখন গাঢ় অন্ধকার। তবে বিরতি-কেন্দ্রের সামনেকার বাতির আলো কুয়াসা ভেদ করেও তার চোখে এসে পড়ল। সেই আলোর লাল বিন্দুগুলি ক্রমেই বড় হতে লাগল। ক্রমে অনেকগুলি খুঁটি ও বেড়া, শান্ত্রীর চলমান মূর্তি, সাদা-কালো দাগ টানা একটা

বোর্ড, ও শাস্ত্রীর দাঁড়াবার বাক্স—সবই দেখা যেতে লাগল।

তারা এগিয়ে যেতেই শাস্ত্রী যথারীতি হাঁক দিল, "কে যায়"; তারপর তাদের অপরিচিত লোক বলে বুঝতে পেরে বেড়ার কাছেও এগোতে দিল না। কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গী এই কড়াকড়িতে মোটেই ঘাবড়াল না।

"আরে বাবা, এত ক্ষেপেছ কেন? গিয়ে তোমার কর্তাকে ডেকে তোল, আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।"

শাস্ত্রী কোন জবাব না দিয়ে ফটকের কাউকে চেঁচিয়ে কি যেন বলল। বাতির আলোয় একটা টুকরো কাঠ খুঁজে নিয়ে মজুরটি সেটা দিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের বুটের কাদা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে দিতে লাগল আর শাস্ত্রীও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে লাগল। বেড়ার পিছন দিক থেকে নারী-পুরুষের গলার শব্দ ভেসে এল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে ফটকটা খুলে গেল। কাঁধের উপর জোব্বাটা চাপিয়ে একজন সার্জেণ্ট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে বাতির আলোয় এসে কি ব্যাপার জানতে চাইল।

সার্জেণ্টটি শাস্ত্রীর মত অত কড়া নয়, বরং সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইল। কিছু বকশিশের আশায় এবং সেটা যাতে ফস্কে না যায় সেজন্য সে জানতে চাইল, অফিসারের সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভের কিসের দরকার, সে কে, ইত্যাদি। নেখ্‌ল্যুদভ জানাল, একটা বিশেষ কাজে সে এসেছে এবং কিছু উপর-হস্তও করবে; এখন সার্জেণ্ট কি একটা চিঠি অফিসারকে পৌঁছে দিতে পারবে? চিঠিটা নিয়ে মাথা নুইয়ে সার্জেণ্ট চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ফটক খোলার শব্দ হল। সাইবেরীয় ভাষায় উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে বলতে একদল স্ত্রীলোক ঝুড়ি, বাক্স, জগ ও বস্তা নিয়ে বেরিয়ে এসে ফটকে দাঁড়াল। তাদের কারও পরনেই চাষীদের পোষাক নেই, তার বদলে আছে শহুরে কায়দায় তৈরি জ্যাকেট ও লোমের লাইনিং দেওয়া জোব্বা। ঘাঘরাগুলো বেশ উঁচুতে তোলা আর মাথায় শাল জড়ানো। বাতির আলোয় তারা অদ্ভুতভাবে নেখ্‌ল্যুদভ ও তার সঙ্গীকে দেখতে লাগল। একজন তো চওড়া-কাঁধ যুবকটিকে দেখে বেশ খুশি হয়ে উঠল এবং আদর করে তাকে একটি সাইবেরীয় খিস্তি ঝেড়ে দিল।

বলে উঠল, "এই দস্যি, এখানে কি করছিস? তোকে শয়তানে ধরুক।'

যুবকটি জবাব দিল, 'এই ভদ্রলোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি। তোরা এখানে কি নিয়ে এসেছিলি?'

"গোয়ালের জিনিসপত্তর। সকালে আরও আনতে হবে।"

যুবকটি জিজ্ঞাসা করল, "রাতের জন্য তোকে আটকে রাখল না?"

মেয়েটি হেসে বলল, "মুখে আগুন, মিথ্যুক কোথাকার! আরে, আমাদের সঙ্গে গাঁ পর্যন্ত চল্ না।"

যুবকটি কি যেন বলল আর তা শুনে শাস্ত্রী সমেত সকলেই হেসে উঠল।

তারপর নেখ্‌লয়ুদভের দিকে ফিরে বলল, "একাই ফিরে যেতে পারবেন তো? না কি, হারিয়ে যাবেন?"

"ঠিক পথ চিনে নিতে পারব।"

"গীর্জাটা পার হয়ে তিন-তলা বাড়িটা থেকে দ্বিতীয় বাড়ি। ও হো, এই যে, লাঠিটা নিন," তার নিজের থেকেও লম্বা হাতের লাঠিটা সে নেখ্‌লয়ুদভকে দিয়ে দিল, তারপর কর্দমাক্ত পথে ঢাউস বুটের শব্দ করতে করতে মেয়েদের সঙ্গে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুয়াসার ভিতর থেকে মেয়েদের গলার সঙ্গে তার গলা ভেসে আসতে লাগল। এমন সময় ফটকটা আবার সশব্দে খুলে গেল, আর সার্জেণ্ট বেরিয়ে এসে অফিসারের কাছে নিয়ে যাবার জন্য তাকে ডাক দিল।

অধ্যায়—৮

সাইবেরিয়া যাবার পথের পাশে অবস্থিত অন্য সব বিরতি-কেন্দ্রের মতই এই বিরতি-কেন্দ্রটিও চারদিকে সূক্ষ্মাগ্র খুঁটি দিয়ে ঘেরা তিনটি একতলা বাড়িতে অবস্থিত। যে বাড়িটি সব চাইতে বড় ও জানালায় লোহার তার লাগানো সেটাতে কয়েদীরা থাকে; আর একটায় কনভয়-সৈনিকরা থাকে; আর তৃতীয়টিতে আপিস ও অফিসারের থাকার ব্যবস্থা। তিনটি বাড়ির জানালাতেই আলো দেখা যাচ্ছে; সে আলো দেখে অবশ্য মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে ভিতরকার ব্যবস্থা বেশ আরামদায়ক। বাড়িগুলোর ফটকেও আলো জ্বলছে; তাছাড়া দেয়াল বরাবর আরও পাঁচটা আলো থাকায় উঠোনটাও বেশ আলোকিত। উঠোনের এক পাশ থেকে অপর পাশ পযন্ত পাতা একটা কাঠের উপর দিয়ে সার্জেণ্ট নেখ্‌লয়ুদভকে নিয়ে ছোট বাড়িটার ফটকে হাজির হল। তিনটে সিঁড়ি ভেঙে সার্জেণ্ট সামনের ছোট ঘরটায় নেখ্‌লয়ুদভকে এগিয়ে দিল। ঘরে একটা ছোট বাতি জ্বলছে; তার ধোঁয়ায় ঘরটা আচ্ছন্ন। স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে মোটা সার্ট এবং নেকটাই ও কালো ট্রাউজার পরা একটি সৈনিক এক পায়ে টপ-বুট পরে অন্য টপ-বুটটা দিয়ে সামোভার-এর কয়লায় হাওয়া করছে। নেখ্‌লয়ুদভকে দেখতে পেয়ে সে এগিয়ে এসে তার চামড়ার কোটটা খুলতে সাহায্য করল এবং তারপরেই ভিতরকার ঘরটায় চলে গেল।

"তিনি এসেছেন স্যার।"

"উত্তম। তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও," একটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গর্জন করে উঠল।

"দরজা দিয়ে ভিতরে যান," বলে সৈনিকটি আবার সামোভার-এ কাজে লেগে গেল।

পাশের ঘরে একটা ঝোলানো বাতিতে আলো জ্বলছিল। টেবিলের পাশে একজন অফিসার বসে। লাল মুখে একজোড়া সুন্দর গোঁফ, গায়ের আঁটো

অস্ট্রীয়ান জ্যাকেটটা চওড়া বুকে ও ঘাড়ে বেশ চেপে বসেছে। টেবিলের উপরে রাতের খাবারের কিছু কিছু পড়ে আছে, আর আছে দুটো বোতল। ঘরের বাতাসে তামাকের আর সস্তা আতরের কড়া গন্ধ। নেখ্‌লয়ুদভকে দেখে অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকাল।

"আপনার কি চাই?" বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "বারনভ! সামোভার! এতক্ষণ কি করছ?"

"এখুনি যাচ্ছি।"

"দেখাচ্ছি তোমার 'এখুনি' তখন বুঝবে ঠেলা," অফিসারটি চীৎকার করে বলল। তার চোখ দুটো জ্বলছে।

"যাচ্ছি," বলে সৈনিকটি সামোভার নিয়ে ঢুকল।

নেখ্‌লয়ুদভ দাঁড়িয়েই রইল। সৈনিকটি টেবিলের উপর সামোভারটা রেখে ঘর থেকে চলে গেল। নিষ্ঠুর চোখ মেলে তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে থেকে অফিসার চা তৈরি করে একটা চৌকো পাত্রে ঢালল এবং তার স্যুটকেস থেকে কয়েকখানা আলবার্ট বিস্কুট বের করল। সব কিছু টেবিলে সাজিয়ে সে আবার নেখ্‌লয়ুদভের দিকে মুখ ফেরাল।

"হ্যাঁ আপনার জন্য কি করতে পারি?"

না বসেই নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "একটি কয়েদীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা যদি করে দেন।"

"রাজনৈতিক কয়েদী কি? সেটা তো আইনত বারন," অফিসার বলল।

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "আমি যে স্ত্রীলোকটির কথা বলছি সে রাজনৈতিক বন্দী নয়।"

"বটে; আরে, আপনি বসুন," অফিসার বলল।

নেখ্‌লয়ুদভ বসল।

"সে রাজনৈতিক বন্দী নয়, কিন্তু আমার অনুরোধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাকে রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন—"

অফিসার বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি। ছোটখাট, ময়লা রং! তা, সে ব্যবস্থা করা যাবে। ধূমপান করেন তো?"

সিগারেটের বাক্সটা নেখ্‌লয়ুদভের দিকে এগিয়ে দিল। দুই গ্লাসে চা ঢেলে একটা নেখ্‌লয়ুদভের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "যদি আপত্তি না করেন—"

"ধন্যবাদ। আমি কিন্তু দেখাটা—"

"রাত তো লম্বা। অনেক সময় পাবেন। ওকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।"

নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "কিন্তু সে যেখানে আছে সেখানে কি দেখা হতে পারে না? পাঠিয়ে দেবার কি দরকার?"

"রাজনৈতিক বন্দীদের কাছে গিয়ে? সেটা আইনবিরুদ্ধ।"

"অনেক বার তো আমাকে যেতে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে কিছু পাচার করে দেবার কথাই যদি বলেন সে তো ওর মারফৎ দিতে পারি।"

"না, না, তাকে তো সার্চ করা হবে," বলেই অফিসার অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগল।

"বেশ তো, তাহলে আমাকেই সার্চ করুন।"

"ঠিক আছে, ব্যবস্থা একটা করে দেব।" কথা বলে কাঁচের পাত্রটার মুখ খুলে নেখ্‌লুদভের চায়ের গ্লাসের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'আপনাকে আর একটু দেব কি? না? ঠিক আছে, আপনার যেমন ইচ্ছা। এই সাইবেরিয়ায় থাকলে মশায়, একজন শিক্ষিত লোকের দেখা পেলে ভারি ভাল লাগে। জানেন তো এমনিতেই আমাদের কাজটা বাজে, তারপর কিছুদিন ভালভাবে কাটাবার পরে এখানে এসে আরও খারাপ লাগে। লোকের ধারণা, আমরা কনভয়-অফিসাররা কাঠখোট্টা অশিক্ষিত মানুষ; কেউ একবারও ভাবে না যে এর চাইতে অনেক ভাল কাজও আমরা পেতে পারতাম।"

এই অফিসারটির লাল মুখ, আতর, আংটি, বিশেষ করে তার অস্বস্তিকর হাসি—সবই নেখ্‌ল্যুদভের কাছে খুব বিরক্তিকর লাগছিল; কিন্তু এই পথ-পরিক্রমার কালে অন্য সব দিনের মত আজও মনের সেই গম্ভীর অবিচল অবস্থাই সে বজায় রেখে চলল যাতে কোন মানুষের সঙ্গেই উপেক্ষা বা ঘৃণাসূচক ব্যবহার না করে তার পরিভাষা মতে "খোলাখুলি" ভাবেই কথা বলতে পারে। অফিসারটির কথা শুনে তার মনে হল, অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার কাজটাকে সে কষ্টসাধ্য বলেই মনে করে।

গম্ভীর গলায় নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "আমার মনে হয়, আপনার অবস্থায় থেকেও দুঃখী মানুষকে কিছুটা সাহায্য করতে পারা যায়।"

"তাদের আবার কিসের দুঃখ? এই সব লোক যে কী তা আপনি জানেন না।"

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "তারা বিশেষ ধরনের কোন জীব নয়। তারাও ঠিক অন্য মানুষেরই মত; বরং কেউ কেউ সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

অবশ্যি সব রকম লোকই তাদের মধ্যে আছে, আর তাই তাদের প্রতি করুণাও হয়। কেউ কেউ হয় তো খুবই কড়া, তবে আমি যতটা পারি তাদের বোঝা হাল্কা করতেই চেষ্টা করি। তাদের বদলে না হয় আমিই কিছুটা কষ্ট পেলাম। অনেকেই আইনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, এমন কি গুলি পর্যন্ত করে; কিন্তু আমি দয়া করি......। অনুমতি করেন তো—আর এক গ্লাস হোক।" নেখ্‌ল্যুদভের জন্য সে আর এক গ্লাস চা ঢেলে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ, যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনি দেখা করতে চান সে কে?"

নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল, "একটি ভাগ্যহীনা নারী যাকে পতিতালয়েও ঢুকতে হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে মিথ্যা করে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ আনা

হয়েছিল ; কিন্তু মেয়েটি বড় ভাল মানুষ।”

অফিসার মাথা নাড়ল।

“হ্যাঁ, এ রকমটা ঘটে, জনৈকা এম্‌মার কথা আপনাকে বলতে পারি। সে কাজান-এ থাকত। মেয়েটি জন্মসূত্রে হাঙ্গেরীয় হলেও তার চোখ দুটি ছিল পুরোপুরি পারসিক।” তার কথা মনে হতেই অফিসারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলতে লাগল, “তার মধ্যে এমন একটা লাবণ্য ছিল যে সে কোন কাউণ্টের পত্নীও হতে পারত।”

নেখ্‌ল্যুদভ বাধা দিয়ে পূর্ব-আলোচনায় ফিরে গেল।

যেন কোন বিদেশী বা শিশুর সঙ্গে কথা বলছে এমনিভাবে প্রতিটি শব্দকে যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে সে বলতে লাগল, “আমি তো মনে করি, আপনার হেপাজতে যারা আছে তাদের কষ্ট লাঘব করতে আপনি পারেন, এবং সে কাজ করলে আপনিও নিশ্চয় যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করবেন।”

অফিসারটি চকচকে চোখ তুলে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। কখন সে থামবে তার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কারণ পারসিক নয়নের সেই হাঙ্গেরীয় নারী এতই স্পষ্ট হয়ে তার স্মৃতি-পথে জাগরূক হয়েছে এবং তার মনোযোগকে এতদূর আকর্ষণ করেছে যে তার কাহিনীটি বলবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সে বলল, “হ্যাঁ, এ সবই সত্যি ; আর তাদের আমি দয়াও করি ; কিন্তু সেই এম্‌মার কথা আপনাকে বলছি। সে কি করেছিল জানেন—”

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, “জানবার কোন আগ্রহ আমার নেই। আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, যদিও একসময় আমি অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলাম, এখন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ও ধরনের সম্পর্ককে আমি ঘৃণা করি।”

অফিসার সন্ত্রস্ত চোখে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল।

বলল, “আর একটু চা নেবেন কি ?”

“না, ধন্যবাদ।”

অফিসার হাঁক দিল, “বারনভ! এই ভদ্রলোককে ভাকুলভ-এর কাছে নিয়ে যাও। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য যে আলাদা ঘরটা আছে সেখানে ওঁকে নিয়ে যেতে বল, কয়েদী পরিদর্শনের সময় পর্যন্ত উনি সেখানে থাকবেন।”

অধ্যায়—৯

আর্দালির সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভ বাতির লাল আলোয় স্বপ্নালোকিত উঠোনে নামল।

একটি কনভয়-সৈনিক আর্দালিকে জিজ্ঞাসা করল, “কোথায় যাচ্ছ ?”

“৫নং আলাদা ঘরে।”

"এদিক দিয়ে যেতে পারবে না, তালা দেওয়া আছে। ও পাশ দিয়ে ঘুরে যাও।"

"তালা দেওয়া কেন ?"

"বড়কর্তা গ্রামে গেছেন, আর চাবিটা তার কাছেই আছে।"

"ঠিক আছে। এদিকে আসুন।"

সৈনিকটি তাকে নিয়ে কাঠের উপরে পা ফেলে ফেলে আর একটা দরজার কাছে নিয়ে গেল। উঠোনে থাকতেই নেখ্‌লয়ুদভ শুনতে পেয়েছিল, ভিতরে অস্পষ্ট শব্দ ও হৈ-চৈ হচ্ছিল ; মৌ-চাক ছেড়ে উড়ে যাবার আগে মৌমাছিদের মধ্যে ঠিক এই ধরনের গুঞ্জন শোনা যায়। কিন্তু কাছে গিয়ে দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে গুঞ্জন স্পষ্টতর হয়ে নানা রকম চীৎকার, গালাগালি ও উচ্চ হাসিতে রূপান্তরিত হল। তার কানে এল শিকলের ঝন্‌ঝন্ শব্দ ও নাকে লাগল অতি-পরিচিত দুর্গন্ধ।

অন্য সময়ের মতই সেই হৈ হট্টগোল, শিকলের ঝনঝনানি ও দুর্গন্ধ একত্র হয়ে নেখ্‌লয়ুদভের মনে এমন একটা নৈতিক বিবমীষা সৃষ্টি করল যা ক্রমে দৈহিক বিবমীষায় পরিণতি লাভ করল এবং এই দুই অনুভূতি একত্র মিলিত হয়ে একটা অপরটাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে লাগল।

ঘরে ঢুকে নেখ্‌লয়ুদভ প্রথমেই দেখতে পেল, মস্তবড় দুর্গন্ধময় একটা পিপের কানার উপর একটি স্ত্রীলোক বসে আছে, আর মাথার আধখানা কামানো দিকটার উপর পিঠের আকারের টুপি পরা একটি লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে তারা কথা বলছিল। নেখ্‌লয়ুদভকে দেখে লোকটি চোখ টিপে বলল :

"স্বয়ং জারও নদীর স্রোতকে আটকাতে পারেন না।"

স্ত্রীলোকটি কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে জোব্বার কোণাটা নামিয়ে দিল।

দরজার মুখ থেকেই একটা করিডর চলে গেছে। তার পাশে-পাশে কয়েকটি দরজা খোলা। প্রথমটিতে সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা, দ্বিতীয়টি একক পুরুষদের এবং একেবারে শেষের দুটো ঘর রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য আলাদা করে রাখা।

বাড়িটায় মোট দেড়শ' কয়েদী থাকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখন এত ভীড় যে চারশ' পঞ্চাশ জন কয়েদী সেখানে আছে ; ফলে ঘরের মধ্যে সকলের জায়গা হয় নি, অনেকে দালানেও রয়েছে। কেউ কেউ মেঝেতে শুয়ে-বসে আছে, কেউ খালি চায়ের পাত্র নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, কেউ বা তাতে গরম জল ভরে নিয়ে ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে তারাসও ছিল। নেখ্‌লয়ুদভের কাছে এসে সে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। নাকের উপরে ও চোখের নীচে কালসিটে দাগ পড়ে তারাসের সুন্দর মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে।

"তোমার কি হয়েছে ?" নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্ন করল।

তারাস হেসে জবাব দিল, "এই, কিছু একটা হয়েছে।"

কনভয়-সৈনিকটি বলল, "ঝগড়া-ঝাটি লেগেই আছে।"

তারাসের পিছনে আর একটি কয়েদী আসছিল। সে বলল, "একটি মেয়েকে নিয়েই ঝামেলা। কানা ফেদকার সঙ্গে এর এক হাত হয়ে গেছে।"

"আর ফেদসিয়া কেমন আছে?"

"সে ভালই আছে। তার চায়ের জন্যই জল নিয়ে যাচ্ছি।" কথা কয়টি বলে তারাস প্রথম ঘরে ঢুকে গেল।

নেখ্‌ল্যুদভ দরজা দিয়ে ভিতরে তাকাল। স্ত্রী-পুরুষে ঘরটা ভর্তি; কেউ তাকের উপর বিছানায়, কেউ বা তার নীচে। ভিজে কাপড় শুকোতে দেবার জন্য ঘরটা গরম ভাপে ভর্তি। মেয়েদের কলকণ্ঠের বিরাম নেই। পরের ঘরটা পুরুষদের। সেটা আরও বোঝাই; এমন কি দরজা ও সামনের দালানটাতেও লোক থিক্‌-থিক্‌ করছে। সকলেরই জামা-কাপড় ভেজা, সকলেই কোন না কোন কাজে ব্যতিব্যস্ত। কনভয়-সার্জেণ্ট বুঝিয়ে দিল: যে কয়েদীটির উপর সকলের খাবার-দাবার কেনার ভার সে জনৈক তাসের জুয়ারীর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল, আর এখন খাবার কেনার টাকা থেকেই সেই ধার শোধ করছে এবং তার কাছ থেকে তাসের তৈরি কতকগুলি ছোট ছোট টিকিট নিচ্ছে। কনভয়-সৈনিক ও একটি ভদ্রলোককে দেখে তারা চুপ করে বাঁকা-চোখে তাদের দেখতে লাগল। তাদের মধ্যেই নেখ্‌ল্যুদভ তার পূর্ব-পরিচিত অপরাধী ফিয়দরভকে দেখতে পেল। ফোলা চেহারার ভুরু-ওল্টানো একটা দুঃখী ছেলেকে সে সব সময় সঙ্গে রাখত। তার সঙ্গে আর থাকত মুখে বসন্তের দাগ-ভরা একটা ভবঘুরে লোক যাকে কয়েদীরা সকলেই ভাল করে চেনে, কারণ একবার কারাগার থেকে পালবার সময় একজন স্যাঙাতকে সে জলাভূমির মধ্যে খুন করেছিল এবং শোনা যায় যে তার মাংস খেয়ে পেট ভরিয়েছিল। সেই ভবঘুরেটা কাঁধের উপর ভিজে জোব্বাটা ফেলে উদ্ধত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল, একটুও সরল না। নেখ্‌ল্যুদভ পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

যদিও এ ধরনের দৃশ্য এখন তার কাছে খুবই পরিচিত, যদিও গত তিন মাস ধরে এই চার শ' কয়েদীকে সে বার বার নানা অবস্থার মধ্যে দেখেছে—প্রচণ্ড গরমে পথে পথে শিকল-বাঁধা পা টেনে টেনে চলার ফলে ধুলোর মেঘে আচ্ছন্ন অবস্থায়; পথের পাশের বিরতি-কেন্দ্রে; বিরতি-কেন্দ্রের ভিতরে; এবং গরমের সময়ে খোলা উঠোনে অত্যন্ত বেহায়া ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার নৃশংস দৃশ্যের মধ্যে—তথাপি যখনই সে তাদের মধ্যে এসেছে, আজকের মত যখনই কেউ তাকে একদৃষ্টিতে দেখেছে, তখনই লজ্জা ও তাদের প্রতি পাপের চেতনা তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। সেই লজ্জা ও

অপরাধবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঘৃণা ও বিভীষিকার একটা দুর্জয় অনুভূতি। সে জানে, যে অবস্থায় তারা আছে তাতে এর চাইতে ভাল কিছু হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু এই বীতরাগকে সে চেপে মারতে পারে না।

রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরের দিকে যেতে যেতে সে শুনতে পেল, কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল, "গরীবের রক্ত-চোষাদের জন্য এই যথেষ্ট।" আরও কিছু কাঁচা খিস্তি সে করল; সকলে ঘৃণায়, বিদ্রূপে হো-হো করে হেসে উঠল।

অধ্যায়—১০

অবিবাহিতদের ঘরটা পার হয়েই নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গী সার্জেণ্টটি চলে গেল; বলে গেল, পরিদর্শনের আগে সে আবার আসবে। সার্জেণ্ট চলে যেতেই পায়ের শিকল তুলে ধরে খালি পায়ে একটি কয়েদী দ্রুত তার কাছে এগিয়ে এল। একটা তীব্র কটু ঘামের গন্ধ তার নাকে এসে লাগল। কয়েদীটি অদ্ভুতভাবে ফিসফিস করে বলল:

"কেসটা হাতে নিন স্যার। ছেলেটাকে তারা সম্পূর্ণ বোকা বানিয়ে ফেলেছে। তারা ওকে মদ খাইয়েছে, আর আজ পরিদর্শনের সময় সে তার নাম বলে দিয়েছে কারমানভ। এটা বন্ধ করুন স্যার; আমাদের সাহস হয় না; ওরা আমাদের খুন করে ফেলবে।" কথাগুলি বলেই অস্বস্তিকরভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে চলে গেল।

ঘটনাটা এই রকম। কারমানভ নামক জনৈক অপরাধী ঠিক তার মত দেখতে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত একটি যুবককে রাজী করিয়েছে, যেন সে তার সঙ্গে নাম বদল করে তার জায়গায় খনিতে চলে যায়, যাতে সে (কারমানভ) যুবকটির বদলে নির্বাসনে যেতে পারে।

এই নাম-বদলের খবর নেখ্‌ল্যুদভ জানত। আগের সপ্তাহে ওই কয়েদীই তাকে বলেছে। সে ইঙ্গিতে তাকে বোঝাল যে যা করবার তা সে করবে এবং তারপরেই কোন দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেল।

যে কয়েদীটি তার সঙ্গে কথা বলল নেখ্‌ল্যুদভ তাকে চেনে। ইয়েকাতেরিন-বার্গে থাকতে তার স্ত্রী যাতে তার সঙ্গে যেতে পারে তার অনুমতি আদায় করে দেবার জন্য সে নেখ্‌ল্যুদভকে ধরেছিল। অতি সাধারণ চাষী গোছের লোক; মাঝারি গড়ন, বছর ত্রিশেক বয়স, খুন ও রাহাজানির চেষ্টার অভিযোগে সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত। নাম মাকার দেভকিন। তার অপরাধটা একটু অদ্ভুত ধরনের। নেখ্‌ল্যুদভকে সে বলেছিল। কাজটা সে নিজে (মাকার) করে নি, করেছে আর একজন, মানে শয়তান। সে বলেছিল: একটি পথিক তার বাবার কাছে এসে ছাব্বিশ মাইল দূরের একটি গ্রামে যাবার

জন্য স্লেজ ভাড়া করল। মাকারের বাবা তাকে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে বলল, আর সেও গাড়িতে ঘোড়া জুতে পোষাক পরে সেই পথিকের সঙ্গে চা খেতে বসল। চা খেতে খেতে পথিক বলল, শীঘ্রই তার বিয়ে হবে এবং মস্কো থেকে সে পাঁচ শ' রুবল উপার্জন করে নিয়ে চলেছে। এই কথা শুনে মাকার বেরিয়ে উঠোনে গেল এবং স্লেজের খড়ের নীচে একটা কুড়ুল রেখে দিল।

সে বলল, "আমি নিজেই জানতাম না কুড়ুলটা কেন নিলাম; সেই আর একজনই আমাকে বলল 'কুড়ুলটা নাও', আর আমিও নিলাম। স্লেজে চেপে যাত্রা শুরু করলাম। ভালভাবেই চলতে লাগলাম। এমন কি কুড়ুলটার কথাও ভুলে গেলাম। গ্রামের কাছে পৌঁছে গেলাম—আর মাত্র মাইলচারেক বাকি। জংশন থেকে বড় রাস্তাটা ক্রমেই উপরে উঠেছে, তাই আমি গাড়ি থেকে নেমে পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। সেই আর একজন আমার কানে কানে বলল, 'কি ভাবছ? পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেই পথে অনেক লোকজন চোখে পড়বে, আর তার পরেই তো গ্রামটা। তখন তো ও টাকাটা নিয়ে সরে পড়বে; যদি কাজটা করতে চাও তো এই সময়। যেন খড়গুলো ঠিক করছি এইভাবে আমি স্লেজটার উপর উপুড় হলাম আর কুড়ুলটা যেন নিজের থেকেই লাফিয়ে আমার হাতে উঠে এল। লোকটি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কি করছ তুমি?' আমি কুড়ুলটা তুলে তাকে মারতে গেলাম; কিন্তু সে তাড়াতাড়ি লাফ দিয়ে নেমে আমার হাতটা চেপে ধরল। 'এটা কি করছ শয়তান?' সে আমাকে বরফের উপর ফেলে দিল; আমি কোন রকম বাধা না দিয়েই তার হাতে ধরা দিলাম। চাবুকটা দিয়ে আমার হাত বেঁধে গাড়িতে তুলে আমাকে সোজা থানায় নিয়ে গেল। আমাকে কারাগারে পাঠাল। বিচার হল। কম্যুন আমার চরিত্রের প্রশংসা করে বলল, আমি খুব ভাল ছেলে, কখনও কোন খারাপ কাজ করতে আমাকে দেখা যায় নি। যাদের বাড়িতে আমি কাজ করতাম সেই মনিবরাও আমাকে ভাল বলল। কিন্তু উকিল লাগাবার পয়সা তো আমাদের ছিল না, তাই আমার চার বছর সশ্রম দণ্ডাদেশ হ'ল।'

এই লোকটিই স্বগ্রামবাসী একটি লোককে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নেখ্‌ল্যুদভের কাছে কয়েদীটির গোপন কথা বলে দিল। তার এ কাজের কথা তারা যদি জানতে পারে তাহ'লে নির্ঘাৎ তাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে।

অধ্যায়—১১

রাজনৈতিক বন্দীদের দুটো ছোট ঘরে রাখা হয়েছে। দরজার সামনেকার দালানের সেই অংশটুকু একটা বেড়া দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সেই

ঘেরা জায়গাটায় ঢুকে নেখ্‌লয়ুদভ দেখতে পেল, রবারের কুর্তা পরে হাতে একটা পাইনের কাঠ নিয়ে সাইমনসন স্টোভের পাশে ঝুঁকে বসে আছে। ভিতরকার গরমের টানে দরজাটা কাঁপছে।

নেখ্‌লয়ুদভকে দেখতে পেয়ে উঁচু ভুরুর নীচ দিয়ে সে তার দিকে তাকাল এবং উঠে না দাঁড়িয়েই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মুখে একটা বিশেষ ভাব ফুটিয়ে নেখ্‌লয়ুদভের চোখে চোখ রেখে সে বলল, "আপনি আসাতে খুব খুশি হয়েছি। আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

"আচ্ছা, কি কথা?" নেখ্‌লয়ুদভ জিজ্ঞাসা করল।

"পরে বলব। এখন খুব ব্যস্ত আছি।"

সাইমনসন আবার স্টোভের প্রতি মনোযোগ দিল। যতদূর সম্ভব কম তাপ-শক্তি নষ্ট হয় এ রকম একটা নিজস্ব পদ্ধতিতে স্টোভটা জ্বালাচ্ছিল।

নেখ্‌লয়ুদভ প্রথম দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবে এমন সময় অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এল মাসলভা। হাতল-ছাড়া একটা বার্চের ঝাঁটা হাতে নিয়ে নীচু হয়ে সে একগাদা জঞ্জাল ও ধূলো-ময়লা ঝেঁটিয়ে স্টোভের কাছে জমা করল। পরনে সাদা কুর্তা, ঘাঘরাটা একটু তুলে কোমরে গোঁজা আর ধূলো থেকে চুলগুলোকে বাঁচাবার জন্য একটা রুমাল ভুরু পর্যন্ত জড়ানো। নেখ্‌লয়ুদভকে দেখতে পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার চোখ-মুখ ঝলমলিয়ে উঠল; হাতের ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে ঘাঘরায় হাত মুছে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কর-মর্দণ করে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "ঘর সাফাই করছ দেখতে পাচ্ছি।"

সে হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমার পুরনো কাজ। কিন্তু কী ধূলো! আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। সাফাই করছি তো করছিই!" সাইমনসনের দিকে ফিরে বলল, "কম্বলটা শুকিয়েছে কি?"

"প্রায়", বিশেষ ভাবে মাসলভার দিকে তাকিয়ে সে জবাব দিল। সেটা নেখ্‌লয়ুদভের দৃষ্টি এড়াল না।

"ঠিক আছে। এখনই নিয়ে যাব, আর জোব্বাগুলো নিয়ে আসব শুকোবার জন্য।...আমাদের লোকজন সব ওখানে আছে," দ্বিতীয় দরজা দিয়ে যেতে যেতে প্রথম দরজাটা দেখিয়ে সে নেখ্‌লয়ুদভকে শেষের কথা-কয়টি বলল।

দরজা ঠেলে নেখ্‌লয়ুদভ একটা ছোট ঘরে ঢুকল। তক্তপোষ হিসাবে ব্যবহারের জন্য দেয়ালের সঙ্গে আটকানো তাকের একপাশে একটা ছোট টিনের বাতি জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটা ঈষৎ আলোকিত হয়েছে। ঘরের ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঝাঁট-দেওয়া ধূলোটা এখনও মরে নি। ফলে ঘরের বাতাস ধূলো, স্যাঁতসেঁতে মেঝে ও তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ভরা। ছোট টিনের বাতিটার কাছে যারা রয়েছে তাদের উপর বেশ আলো পড়েছে, কিন্তু বিছানাগুলি সবই অন্ধকারে ঢাকা, ছায়াগুলি দেয়ালের উপর নড়াচড়া করছে।

খাদ্যপরিবেশনকারী দু'জন গরম জল ও খাবার আনতে বাইরে গেছে, তবে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রায় সকলেই এই ছোট ঘরটাতে জমায়েত হয়েছে। নেখ্‌ল্যুদভের পরিচিত ভেরা দুখোভাও আছে। আগের থেকে আরও কৃশ ও হলদে হয়ে গেছে। বড় বড় দুটি ভাক চোখ, খাটো চুল আর কপালে একটা ফুলে-ওঠা শিরা তেমনি আছে। পরণে একটা ধূসর কুর্তা। সামনে একখানা খোলা খবরের কাগজ নিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সিগারেট পাকাচ্ছে।

এমিলিয়া রান্ত্‌সেভাও আছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তাকেই নেখ্‌ল্যুদভের সব চাইতে ভাল লাগে। সে এখানকার গৃহস্থালি দেখাশুনা করে। অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যেও সে সর্বত্র একটা বাড়ির আরাম ও আকর্ষণ ছড়িয়ে দিতে পারে। হাতের আস্তিন গুটিয়ে সে বাতিটার পাশে বসে কাপ ও মগগুলি ভাল করে মুছে তার রোদে-পোড়া সুন্দর কুশলী হাতে একটা তাকের উপর বিছানা চাদরের উপর সাজিয়ে রাখছিল। রান্ত্‌সেভা দেখতে একটি সাধারণ যুবতী। মুখশ্রীটি সুন্দর। সে যখন হাসে তখন সমস্ত মুখটা খুব সতেজ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মুখে সেই হাসি ফুটিয়েই সে নেখ্‌ল্যুদভকে অভ্যর্থনা জানাল।

সে বলল, 'সে কি, আমরা তো ভেবেছি আপনি রাশিয়ায় ফিরে গেছেন।'

ছোট মেয়েটিকে নিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাও একটা অন্ধকার কোণে বসেছিল। মেয়েটি তার ছেলেমানুষি গলায় অনর্গল বক্‌-বক্‌ করে চলেছে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, 'আপনি আসায় কী যে ভাল লাগছে। কাত্‌যুশার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? এখানে একটি নতুন মানুষও আছে," বলে সে ছোট মেয়েটিকে দেখাল।

আনাতলি ক্রাইল্‌ত্‌সভও সেখানে ছিল। জুতো শুদ্ধ দুই পা ভেঙে শির-দাঁড়াটাকে বেঁকিয়ে একেবারে উপুড় হয়ে ঘরের এককোণে বসে সে কাঁপছে। হাত দুটো জোব্বার আস্তিনের মধ্যে ঢোকানো। জ্বরক্লান্ত চোখে সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। নেখ্‌ল্যুদভও তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তার চোখে পড়ল দরজার ডান পাশে একটি লোক সুন্দরী হাস্যময় গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে কথা বলছে। তার চোখে চশমা, মাথায় কোঁকড়া লাল চুল, পরণে রবারের কুর্তা। ইনিই বিখ্যাত বিপ্লবী নভদ্‌ভরভ্‌। তার সঙ্গে দেখা করতে নেখ্‌ল্যুদভ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ির কারণ, রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এই লোকটিকেই সে সব চাইতে অপছন্দ করে। ভুরু কুঁচকে সে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকাল। চশমার ভিতর দিয়ে তার নীল চোখ দুটি ঝকঝক করতে লাগল। শীর্ণ হাতখানি এগিয়ে দিয়ে বিদ্রূপের সুরে সে বলল, "আরে, ভ্রমণটা বেশ ভালই হচ্ছে তো?"

যেন বিদ্রূপটা সে বুঝতেই পারে নি, বরং প্রশ্নটাকে ভদ্রতা বলেই মনে করেছে এমনিভাবেই নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল, "হ্যাঁ, আকর্ষণীয় অনেক কিছুই

তো আছে।" বলেই সে ক্রাইল্‌ত্‌সভের দিকে এগিয়ে গেল।

সব ব্যাপারে উদাসীন থাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও আসলে নেখ্‌ল্যুদভ সেটা পারছিল না। অস্বস্তিকর কিছু বলবার বা করবার ইচ্ছায়ই নভদ্‌ভরভ্‌ যে কথাগুলি বলল তাতে নেখ্‌ল্যুদভের মনে বেশ আঘাত লাগল। মনে মনে সে দুঃখে অবসন্ন বোধ করতে লাগল।

যাই হোক, ক্রাইল্‌ত্‌সভের ঠাণ্ডা কাঁপা হাতটা চেপে ধরে সে জিজ্ঞাসা করল, "এই যে, কেমন আছ?"

তাড়াতাড়ি হাতটা জোব্বার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলল, "খুব ভাল। শুধু শরীরটা কিছুতেই গরম হচ্ছে না; সব যেন ভিজে যাচ্ছে। আর এ জায়গাটাও অসম্ভব ঠাণ্ডা। দেখুন না, জানালার কাঁচগুলোও ভাঙা।" লোহার গরাদের পিছনকার ভাঙা কাঁচগুলো সে হাত দিয়ে দেখাল। "আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন আমাদের দেখতে আসেন নি কেন?"

"আমাকে আসতে দেয় নি। কর্তৃপক্ষ বড়ই কড়া ছিল। আজকের অফিসারটি একটু উদার।"

"উদার! তা বটে" ক্রাইল্‌ত্‌সভ মন্তব্য করল। "মারিয়াকে জিজ্ঞাসা করুন না, আজ সকালে সে কি করেছে।"

সকালে তারা বিরতি-কেন্দ্র থেকে চলে গেলে ছোট মেয়েটির কি হয়েছিল সে ঘটনাটা মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার জায়গায় এক কোণে বসেই বলল।

"আমি মনে করি সকলে মিলে এর প্রতিবাদ করা অত্যন্ত দরকার," সুদৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলি বলে ভেরা দুখোভা ভীত, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাতে লাগল। "ভ্লাদিমির সাইমনসন প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়।"

বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলল, "কী প্রতিবাদ আপনি চান?" ভেরা দুখোভার সরলতার অভাব, তার কৃত্রিম চাল-চলন ও স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ক্রাইল্‌ত্‌সভ অনেকদিন থেকেই বিরক্ত বোধ করছিল।

নেখ্‌ল্যুদভকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি কাতয়ুশাকে খুঁজছেন? তিনি তো সারাক্ষণ শুধু কাজই করছেন। পুরুষদের এই ঘরটা পরিষ্কার করে এবার গেছেন মেয়েদের ঘরে। কিন্তু মাছিগুলোকে কিছুতেই তাড়ানো যায় না— যেন জীবন্ত খেয়ে ফেলতে চায়। আরে, মারিয়া ওখানে কি করছে?" মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যেখানে বসেছিল সেই কোণটা দেখিয়ে সে বলল।

রান্ত্‌সেভা জবাব দিল, "পালিতা কন্যার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।"

ক্রাইল্‌ত্‌সভ বলল, "কিন্তু উকুনগুলো আমাদের তাড়া করবে না তো?"

রান্ত্‌সেভার দিকে ঘুরে মারিয়া বলল, "আরে না, না; আমার নজর আছে। এখন ও খুব ধোপ-দুরস্ত মেয়ে হয়ে গেছে। তুমি ওকে ধরো, আমি ততক্ষণ মাসলভাকে সাহায্য করিগে। ওর কম্বলটাও এনে দেব।"

রাস্ত্‌সেভা ছোট মেয়েটিকে কোলে নিয়ে তার মোটাসোটা হাত দুটো মায়ের স্নেহে বুকে চেপে ধরে তাকে একটুকরো মিছরি দিল।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুটি লোক গরম জল ও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

অধ্যায়—১২

নবাগত দুজনের একটি যুবক বেটেখাটো ও শীর্ণকায়। গায়ে কাপড়ের আস্তরণ দেওয়া ভেড়ার চামড়ার কোট, পায়ে হাই-বুট। দুটো ধূমায়িত চায়ের পাত্র ও বগলের নীচে কাপড়ে-মোড়া একটা রুটি সে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল।

চায়ের পাত্র দুটো কাপের পাশে রেখে রুটিটা রাস্ত্‌সেভাকে দিয়ে সে বলল, "আরে, আমাদের যুবরাজ যে আবার হাজির হয়েছেন। আমরা কিন্তু খুব ভাল ভাল জিনিস এনেছি।" ভেড়ার চামড়াটা খুলে সকলের মাথার উপর দিয়ে তাকের বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, "মার্কেল কিনেছে দুধ ও ডিম; তার মানে আজ রাতে রীতিমত বল-নাচ জমে উঠবে। এদিকে রাস্ত্‌সেভা তো চারদিকে সুচারু পরিচ্ছন্নতা ছড়িয়ে দিয়েছে; আশা করি এবার সে কাটা তৈরি করবে।"

এই লোকটির উপস্থিতি: তার গতিবিধি, তার কণ্ঠস্বর, তার দৃষ্টি—সব কিছু থেকেই যেন উৎসাহ ও আনন্দ ঝরে পড়ছে। তার অপর সঙ্গীটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত; সে হতাশ ও বিষণ্ণ। চেহারা ছোটখাটো, হাড় মোটা, চোয়াল বের-করা, বিবর্ণ মুখ, পাতলা ঠোঁট, সুন্দর সবুজাভ চোখ। গায়ে পুরনো তালি-মারা কোট, পায়ে উঁচু বুট ও "গ্যালোস"। দুই পাত্র দুধ ও বার্চ-গাছের বাকলের তৈরি দুটো গোল বাক্স এনে সে রাস্ত্‌সেভার সামনে রাখল। শুধু ঘাড়টা নুইয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে নেখ্‌লয়ুদভকে অভ্যর্থনা জানাল। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিজে হাতটা দিয়ে কর-মর্দন করে সে খাবার জিনিসগুলি বের করতে লাগল।

এই দুজন রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ মানুষ। প্রথমটি নবতভ, একজন চাষী; দ্বিতীয়টি মার্কেল কন্দ্রাতেভ, একজন মজুর। মার্কেল বিপ্লবী দলে এসেছে বেশী বয়সে; নবতভ যোগ দিয়েছে ষোল বছর বয়সে। গ্রামের স্কুল ছাড়বার পরে অসাধারণ মেধার জন্য হাই স্কুলে জায়গা পেয়ে গেল; যতদিন সেখানে ছিল অন্যকে পড়িয়ে নিজের খরচ চালাত; পড়া শেষ করে সোনার মেডেল পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ঢুকল না। কারণ স্কুলের উপরের শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই সে মনস্থির করে ফেলেছিল যে জনতার মধ্যে চলে গিয়ে অবহেলিত ভাইদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাবে। তাই সে করল। প্রথমে

একটা বড় গ্রামে সরকারী কর্মণিকের চাকরি পেল। অচিরেই তাকে গ্রেপ্তার করা হল, কারণ সে চাষীদের অনেক কিছু পড়ে শোনাত এবং তাদের ফসল তোলা ও বিক্রির ব্যাপারে একটা সমবায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল। আট মাস কারাগারে আটক রেখে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু তখনও পুলিশের নজরবন্দী করে রাখা হল। ছাড়া পেয়েই সে স্কুল-শিক্ষকের চাকরি নিয়ে আর একটা গ্রামে চলে গেল এবং প্রথম গ্রামে যা করেছিল তাই করতে লাগল। ফলে আবার গ্রেপ্তার এবং চোদ্দ মাস কারাবাস। সেখানেই তার রাজনৈতিক প্রত্যয় দৃঢ়তর হল।

তারপর তাকে পার্ম জেলায় নির্বাসিত করা হল এবং সেও সেখান থেকে পালাল। তারপর আবার সাত মাস কারাবাস এবং তারপরে আর্খাঞ্জেলস্‌-এ নির্বাসন। নতুন জারের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করায় তাকে পাঠানো হল ইয়াকুতস্ক্‌ অঞ্চলে। এই ভাবে তার পরিণত জীবনের অর্ধেকটাই কেটে গেল কারাগারে ও নির্বাসনে। কিন্তু এই সব অভিযান তার চিত্তকে তিক্ত করে তোলে নি, তার শক্তিকে দুর্বল করে নি, বরং উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলেছে। সে সর্বদাই কর্মব্যস্ত, আনন্দময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। কোন কিছুর জন্যই তার অনুশোচনা নেই, দূর ভবিষ্যতের দিকে সে তাকায় না, তার সব শক্তি, কুশলতা ও বাস্তব জ্ঞান নিয়ে বর্তমান জীবনকে ঘিরেই কাজ করে চলে। যখনই মুক্ত থাকে, নিজের উদ্দেশ্য সাধনেই কাজ করে—মজুরদের, বিশেষ করে গ্রাম্য মজুরদের মধ্যে আলোক বিতরণ করা আর তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তোলাই সেই উদ্দেশ্য। যখন কারাগারে থাকে তখনও বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার উপায়-উদ্ভাবনে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে নিজের এবং দলের অন্য সকলের জীবনকে যতটা আরামে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করতে সে সমান উত্তম ও বাস্তবতার সঙ্গেই কাজ করে যায়। সব চাইতে বড় কথা সে সামাজিক লোক—কম্যুনের একজন সদস্য। তাকে দেখলেই মনে হয়, নিজের জন্য সে কিছুই চায় না, যৎসামান্য কিছু পেলেই সে সন্তুষ্ট, কিন্তু সহকর্মীদের জন্য সে চায় অনেক কিছু এবং তার জন্য দিন-রাত না ঘুমিয়ে, না খেয়ে সে শরীর ও মনের দিক থেকে অবিরাম কর্মব্যস্ত থাকতে পারে। চাষী হিসাবে সে ছিল পরিশ্রমী, পর্যবেক্ষণশীল ও কর্মপটু; সে ছিল স্বভাবতই সংযত, ভদ্র এবং অপরের ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তার বুড়ি মা তখনও বেঁচেছিল; একটি অশিক্ষিতা, কুসংস্কারপরায়ণা, বৃদ্ধা কৃষক রমণী। নবতভ তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করত, ছাড়া পেলেই গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করত। যতদিন বাড়িতে তার কাছে থাকত ততদিন মার জীবনের সব কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকত, তার কাজে সাহায্য করত, ছোটবেলার খেলার সঙ্গীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, তাঁদের সঙ্গে মিশে সস্তা সিগারেট খেত, তাদের মুষ্টিযুদ্ধে অংশ নিত, তাদের বুঝিয়ে দিত কি ভাবে তারা

প্রতারিত হচ্ছে এবং কি করলে তারা এই প্রতারণার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। বিপ্লব সম্পর্কে যখনই সে ভাবত বা কথা বলত, তখনই সে কল্পনা করত যে, যে-জনগণের ভিতর থেকে সে উঠে এসেছে তারা প্রায় আগেকার মত অবস্থায়ই থাকবে, শুধু তাদের যথেষ্ট জমি থাকবে এবং ভদ্র-লোক ও সরকারী কর্মচারিরা তাতে নাক গলাবে না। তার মতে—আর এ ব্যাপারে নভদ্‌ভরভ্‌ ও তার অনুগামী মার্কেল কন্দ্রাতেভ-এর সঙ্গে তার মত-বিরোধ আছে—বিপ্লব কখনও জনগণের মৌলিক জীবন-ধারাকে বদলে ফেলবে না, পুরো বাড়িটাকেই ভেঙে ফেলবে না, শুধু তার বড় আদরের সুন্দর, মজবুত, বিরাট পুরনো বাড়িটার ভিতরকার দেয়ালগুলোকে বদলে দেবে।

ধর্মের ব্যাপারেও চাষীদের চিরন্তন ধারণারই সে অনুবর্তী : তাত্ত্বিক সমস্যা, সব উৎসের মূল উৎসের সমস্যা বা ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা নিয়ে সে চিন্তাই করে না। তার কাছে ঈশ্বর (আরাগোর মতই) এমন একটি কল্পনা যার প্রয়োজন সে আজ পর্যন্ত বোধ করে নি। জগতের আদি কারণ নিয়ে তার কোন রকম মাথা-ব্যথা নেই; মোজেস বা ডারউইন কার কথা ঠিক তাতেও তার কিছু যায় আসে না। যে ডারউইন-তত্ত্বকে তার বন্ধুরা এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, তার কাছে কিন্তু সেটাও ছ'টি দিন সৃষ্টির মত একটা মানসিক খেলার মতই।

পৃথিবী কি করে সৃষ্টি হয়েছিল সে ব্যাপারেও তার কোন আগ্রহ নেই, কারণ এই পৃথিবীতে কি করে ভালভাবে বেঁচে থাকা যায় সেই সমস্যা নিয়েই সে সব সময় ব্যাপৃত থাকত। পরজন্মের কথাও সে কখনও ভাবত না। দেশের অন্য সব মজুরদের মতই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে পাওয়া এই দৃঢ় মূল অবিচলিত বিশ্বাসকেই সে অন্তরের অন্তস্তলে আঁকড়ে ধরে ছিল যে, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে যেমন কোন কিছুরই বিনাশ নেই, শুধু অবিরাম প্রতিটি বস্তুর আকারের পরিবর্তন ঘটছে মাত্র—সার থেকে শস্য, শস্য থেকে মুরগি, ব্যাঙাচি থেকে ব্যাং, শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি, বীজ থেকে বনস্পতি—ঠিক সেই রকম মানুষেরও বিনাশ নেই, আছে শুধু পরিবর্তন। এ বিশ্বাস তার ছিল, আর ছিল বলেই সে সব সময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারত, এবং যে দুঃখ-যন্ত্রণা মানুষকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায় তাকে সে সাহসের সঙ্গে সহ্য করতেও পারত; শুধু সে সম্পর্কে কোন কথা বলতে জানত না, বলতে চাইতও না। সে কাজকে ভালবাসত, সব সময়ই কোন না কোন কাজ নিয়ে থাকত, এবং সহকর্মীদেরও সেই পথেই টেনে নিয়ে যেত।

জনগণের ভিতর থেকে আসা দ্বিতীয় রাজনৈতিক বন্দী মার্কেল কন্দ্রাতেভ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। পনেরো বছর বয়সেই সে মজুরী শুরু করে এবং তার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে এই অস্পষ্ট ধারণাটাকে গলা টিপে মারবার জন্য ধূমপান করতে ও মদ খেতে শেখে। তার প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে এ বোধ

তার প্রথম জন্মে একটি খৃস্টমাস দিবসে। মালিকের স্ত্রীর দ্বারা আয়োজিত একটি খৃস্টমাস-বৃক্ষের উৎসবে তারা (কারখানার ছেলেমেয়েরা) আমন্ত্রিত হয়েছিল। সেখানে সে পেল এক ফার্দিং দামের একটা বাঁশি, একটা আপেল, একটা রাংতা-লাগানো আখরোট গাছ ও ডুমুর গাছ; আর মালিকের ছেলে-মেয়েরা যে উপহার পেল তা যেন পরীদের দেশ থেকে আনা, আর তার দাম, সেটা সে পরে শুনেছিল, পঞ্চাশ রুবলেরও বেশী। তার বয়স যখন বিশ বছর তখন একজন খ্যাতনাম্নী বিপ্লবী তাদের কারখানায় মজুরের কাজ করতে এল। তার অনেক রকম গুণের পরিচয় পেয়ে সেই মেয়েটিই কন্দ্রাতেভকে নানা রকম পুস্তক-পুস্তিকা দিতে শুরু করল, তার সঙ্গে কথা বলে তার বর্তমান অবস্থা ও তার প্রতিকারের কথা বুঝিয়ে বলতে লাগল। অত্যাচারের হাত থেকে নিজেকে ও অন্যকে মুক্ত করার সম্ভাবনা যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন চলতি ব্যবস্থার অন্যায়গুলি অনেক বেশী নিষ্ঠুর ও নৃশংস বলে মনে হতে লাগল; এবং শুধু মুক্তি নয়, এই নিষ্ঠুর অন্যায় অবস্থার যারা ব্যবস্থাপক ও রক্ষক তাদের শাস্তি দানের বাসনাও তার মনে উদগ্র হয়ে উঠল। তাকে বলা হল, একমাত্র জ্ঞানের পথেই তা সম্ভব; কন্দ্রাতেভও এক মনে জ্ঞানার্জনে আত্ম-নিয়োগ করল। জ্ঞানের পথ ধরে কেমন করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পৌছনো যাবে তা সে বুঝত না, কিন্তু সে বিশ্বাস করত যে-জ্ঞান তার জীবনের সব অন্যায়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সেই জ্ঞানই সে অন্যায়কে দূর করতেও পারবে। তাছাড়া এই জ্ঞানই তাকে অন্য সকলের উপরে তুলে দেবে সে মনে করত। সুতরাং সে ধূমপান ও মদ খাওয়া ছেড়ে দিল এবং সবটা অবসর সময়ই (মালখানার কাজে বদলি হওয়ায় অনেক বেশী অবসর সে তখন পেত) পড়াশুনা নিয়ে থাকত।

বিপ্লবী মেয়েটি তাকে পাঠ দিত; তার সব কিছু জানবার আগ্রহ এবং গ্রহণ করবার ক্ষমতা দেখে সে বিস্মিত হয়ে যেত। দু'বছরের মধ্যেই সে বীজগণিত, জ্যামিতি ও ইতিহাস (তার প্রিয় বিষয়) ভালভাবেই শিখে ফেলল, এবং কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ, বিশেষ করে সমাজতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠল।

বিপ্লবীটি গ্রেপ্তার হল; সেই সঙ্গে কন্দ্রাতেভও, কারণ নিষিদ্ধ বইগুলি তার কাছেই পাওয়া গেল। দুজনকেই কারাগারে পাঠানো হল এবং সেখান থেকে ভলগ্‌দা জেলায় নির্বাসনে। সেখানেই তার পরিচয় হল নভদ্‌ভরভ-এর সঙ্গে; আরও অনেক বেশী বৈপ্লবিক পুঁথিপত্র পড়ল, সব কিছু মনে রাখল এবং সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শে তার প্রত্যয় দৃঢ়তর হল। নির্বাসনের পরে একটা বড় ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিল। শেষ পর্যন্ত কারখানাটা ধ্বংস হয়ে গেল এবং তার ডিরেক্টর খুন হল। আবার গ্রেপ্তার হয়ে সেও নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হল।

প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রকম ধর্মের বিষয়েও সেই রকম

তার অভিমত নেহাৎই নঞার্থক। যে ধর্মের মধ্যে সে বড় হয়ে উঠেছে তার অবাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং প্রথমে সভয়ে ও পরে সোৎসাহে অনেক চেষ্টা করে তার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে এখন সে সুযোগ পেলেই সক্রোধে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় পুরোহিত ও ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে কখনও কসুর করে না; হয় তো তাকে ও তার পূর্বপুরুষগণকে যে ভাবে এতকাল বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যই এ কাজ সে করে।

সে খুব সংযত কঠোর জীবন যাপন করে। প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু পেলেই সে সন্তুষ্ট। ছেলেবেলা থেকেই সে কাজ করতে অভ্যস্ত; তার মাংস-পেশীগুলিও সরল; তাই যে কোন দৈহিক পরিশ্রমের কাজই সে খুব সহজেই দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। তবে তার কাছে সব চাইতে মূল্যবান কারাগারে ও বিরতি কেন্দ্রের অবসরের সময়গুলি, কারণ সেই সময়টা সে পড়াশুনা করতে পারে। সে এখন কার্ল মার্কসের প্রথম খণ্ডটি পড়ছে; বইটিকে সে সব সময়ই একটি মূল্যবান সম্পদের মত তার থলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। একমাত্র নভ্‌দভরভ্‌ ছাড়া অন্য সব সহকর্মীর প্রতিই সে সংযত ও উদাসীন ব্যবহার করে থাকে। নভদ্‌ভরভের প্রতি সে খুবই অনুরক্ত; আর সব বিষয়েই তার যুক্তিকে সে অখণ্ডনীয় বলে গ্রহণ করে থাকে।

স্ত্রীলোকদের প্রতি তার অপরিসীম ঘৃণা; তাদের সে সব প্রয়োজনীয় কাজের পক্ষেই বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে করে। কিন্তু মাসলভার প্রতি সে সহানুভূতি-শীল এবং তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করে। সে মনে করে, উচ্চতর শ্রেণী নিম্নতর শ্রেণীর উপর যে শাসন চালিয়ে থাকে মাসলভা তারই একটি দৃষ্টান্তস্থল। সেই একই কারণে সে নেখ্‌লুদভকে অপছন্দ করে; তাই তার সঙ্গে সে কদাচিত কথা বলে এবং তার হাতে হাত রাখে; তবে তার সঙ্গে দেখা হলে কর-মর্দণের জন্য নিজের হাতটাই এগিয়ে দেয়।

অধ্যায়—১৩

স্টোভ গরম হওয়ায় আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে; চা তৈরি হয়ে কাপে ও মগে ঢালা হয়েছে, দুধ মেশানো হয়েছে; বিস্কুট, গমের টাটকা রুটি, মাখন, সিদ্ধ ডিম, এবং বাছুরের মাথা ও পা টেবিল-ঢাকনার উপর সাজানো হয়েছে। যে বিছানার তাকটা টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সকলেই সেখানে ভিড় করে খেতে খেতে গল্প-গুজব করছে। রান্‌ত্‌সেভা একটা বাক্সের উপর বসে চা ঢালছে। সকলেই তাকে ঘিরে ধরেছে, শুধু ক্রাইল্‌ত্‌সভ ছাড়া। ভিজে জোব্বাটা গা থেকে খুলে একটা শুকনো কম্বল জড়িয়ে নিজের জায়গায় বসেই সে নেখ্‌লুদভের সঙ্গে কথা বলছে।

মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে এসে এখানেও সকলে ধূলো-ময়লা ও বিশৃংখলার মধ্যে পড়ে; অনেক কষ্টে সাফ-সাফাই করে এবং কিছু মুখে দিয়ে ও গরম গরম চা খেয়ে এখন সকলেরই মন-মেজাজ বেশ খুশি হয়ে উঠেছে।

দেয়ালের ওপাশ থেকে কয়েদীদের পায়ের শব্দ আর চীৎকার-চেঁচামেচি ও গালাগালির শব্দ ভেসে আসছে। তা থেকেই তাদের পরিবেশের অবস্থাটা বুঝতে পারার জন্যই এ ঘরে সকলের আরাম-বোধটা যেন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেন সমুদ্রের মাঝখানে একটা দ্বীপে এই লোকগুলো এমন একটুখানি জায়গা পেয়েছে যেখানে চারপাশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ছাপ পড়ে নি। এতেই তাদের মনের অবস্থা অনেকটা ভাল হয়েছে, তারা বেশ উত্তেজিত বোধ করছে। বর্তমান অবস্থা ও আসন্ন ভবিষ্যৎ ছাড়া আর সব কিছু নিয়েই তারা আলোচনা করছে। তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সাধারণত যে রকম ঘটে থাকে—বিশেষত তাদের যদি এই লোকগুলির মত বাধ্য হয়ে এক সঙ্গে থাকতে হয়—সব রকম মিল-অমিল ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটা মিশ্রিত মনোভাব তাদের পেয়ে বসেছে। প্রায় সকলেই প্রেমে পড়েছে। নভদ্‌ভরভ্‌ প্রেমে পড়েছে সুন্দরী হাস্যময়ী গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে। এই অবিবেচক মেয়েটি গিয়েছিল লেখাপড়া করতে, বিপ্লবের ব্যাপারে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন; কিন্তু যুগের হাওয়ায় পড়ে কি ভাবে যেন দলে ভিড়ে গেল এবং নির্বাসিত হল। যখন বাইরে ছিল তখনও যেমন, বিচার চলাকালে, কারাগারে এবং নির্বাসনেও তেমনই পুরুষকে জয় করাই ছিল তার জীবনের প্রধান আগ্রহ। এখন পথ-পরিক্রমার কালে সে যে নভদ্‌ভরভ্‌-এর মনকে জয় করতে পেরেছে তাতেই তার সুখ; সেও তাকে ভালবেসেছে। ভেরা দুখোভা প্রেমে পড়তে খুবই উৎসুক, কিন্তু অপরের মনে প্রেম জাগাতে সে পারে না; তাই প্রেমের প্রত্যাশায় সে একবার নবতভের দিকে একবার নভদ্‌ভরভের দিকে ঝুঁকছে। ক্রাইল্‌ত্‌সভের মনেও জেগেছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার প্রতি ভালবাসা। সে পুরুষের মন নিয়েই মারিয়াকে ভালবাসে, কিন্তু এ ধরনের ভালবাসাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বুঝতে পেরে যে রকম মমতায় মারিয়া তার সেবা করে চলেছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের আবরণেই সে নিজের ভালবাসাকে ঢেকে রেখেছে। নবতভ ও রান্ত্‌সেভা পরস্পরকে বড়ই জটিল বাঁধনে বেঁধেছে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র একটি কুমারী কন্যা, রান্ত্‌সেভাও তেমনই স্বামীর পত্নী হিসাবে একান্ত ভাবেই পতিপ্রাণা।

যখন ষোল বছরের একটি স্কুলের ছাত্রী তখনই সে পিতার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রান্ত্‌সেভাকে ভালবাসে এবং সে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার আগেই মাত্র উনিশ বছর বয়সে তাকে বিয়ে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার চতুর্থ বছরে তার স্বামী একটা ছাত্র-গোলযোগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে, পিতার্সবার্গ থেকে নির্বাসিত হয় এবং বিপ্লবী দলে যোগদান করে। মেয়েটিও তখন ডাক্তারি পড়া ছেড়ে

দিয়ে তার দেখাদেখি বিপ্লবীদলে যোগ দেয়। স্বামীকে সে যদি চতুরতম ও শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে না করত তাহলে তার প্রেমে পড়ত না, আর প্রেমে না পড়লে তাকে বিয়েও করত না; কিন্তু চতুরতম ও শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে যাকে ভালবেসেছে ও বিয়ে করেছে, জীবন ও তার আদর্শকে সে চোখে দেখেছে স্বভাবতই মেয়েটিও সেই চোখেই জীবন ও তার আদর্শকে দেখেছে। প্রথমে সে মনে করত যে শিক্ষাই জীবনের আদর্শ, তাই মেয়েটিও তখন তাই মনে করত। পরে সে বিপ্লবী হলে মেয়েটিও তাই হল। রাস্ত্সেভ। বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলত যে বর্তমান ব্যবস্থা চলতে পারে না, কাজেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিটি মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে তদনুরূপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গড়ে তুলতে সংগ্রাম করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য; আর মেয়েটিও মনে করত যে সেও বুঝি তাই ভাবে ও অনুভব করে, কিন্তু আসলে তার স্বামীর যত কিছু চিন্তা-ভাবনা তাকেই সে একান্ত সত্য বলে মনে করে, আর সর্ব অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে পূর্ণ মতৈক্য এবং তার সঙ্গে নিজের পরিপূর্ণ একাত্মবোধই তার জীবনের একমাত্র কাম্য বলে মনে করে, কারণ তাতেই সে পরিপূর্ণ নৈতিক সন্তুষ্টি খুঁজে পায়।

স্বামী ও সন্তানকে (সে তার মায়ের কাছে আছে) ছেড়ে আসতে তার খুবই কষ্ট হয়েছে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে ও শান্ত চিত্তে সে কষ্ট সে সহ্য করেছে, কারণ এ সবই সে করেছে স্বামীর জন্য, আর তার স্বামী যে আদর্শের জন্য কাজ করে চলেছে সেটা যে খুবই ভাল সে বিষয়ে তার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। চিন্তায় সে এখনও স্বামীর সঙ্গেই আছে, তাই তার কাছে কাছে থাকতে যেমন পারত না তেমনই এখনও অপর কাউকে ভালবাসতে সে পারে না। কিন্তু নবতভ-এর আন্তরিক পবিত্র ভালবাসা তার মনকে ছুঁয়েছে, তাকে উত্তেজিত করেছে। স্বামীর বন্ধু এই দৃঢ়চরিত্রের নীতিবান মানুষটি তাকে ভগ্নির মত দেখতেই চেষ্টা করে, তবু তার আচরণে তার চাইতেও বেশী কিছু বুঝি আত্মপ্রকাশ করে, তাতে দুজনই ভয় পায়, আবার তার ফলেই তাদের এই কঠোর জীবনে বুঝি রংও লাগে।

কাজেই সারা দলটার মধ্যে একমাত্র মারিয়া পাভ্‌ল্‌ভনা ও কন্‌দ্রাতেভই বুঝি প্রেমের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

অধ্যায়—১৪

চায়ের পরে কাতয়ুশার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলা যাবে এই আশায় নেখ্‌লয়ুদভ ক্রাইল্‌ত্‌সভ-এর পাশে বসে গল্প করতে লাগল। কথা প্রসঙ্গে সে মাকার-এর কথা ও তার অনুরোধের কথাও জানাল। চকচকে চোখ মেলে নেখ্‌লয়ুদভের দিকে তাকিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠল, "সত্যি, আমিও মাঝে মাঝেই ভাবি, এই যে

আমরা পাশাপাশি যাদের সঙ্গে যাচ্ছি—তারা কারা? তারাই তো সেই মানুষ যাদের জন্য আমরা এ পথে চলেছি অথচ তাদের যে আমরা চিনি না শুধু তাই নয়, চিনতে চাইও না। তার চাইতেও খারাপ, তারা আমাদের ঘৃণা করে, শত্রু বলে মনে করে। কী সাংঘাতিক অবস্থা বলুন তো?"

তাদের আলোচনা শুনতে পেয়ে নভদ্‌ভরভ্‌ মাঝখানে বলে উঠল, "এর মধ্যে সাংঘাতিক তো কিছু নেই। জনতা সব সময়ই একমাত্র ক্ষমতাকেই পূজা করে। আজ সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে, তাই তারা সরকারকে পূজা করে, আর আমাদের ঘৃণা করে। কাল আমরা ক্ষমতা হাতে পাব, তখন তারা আমাদেরই পূজা করবে।

ঠিক সেই সময় দেয়ালের ও পাশ থেকে প্রচণ্ড গালাগালি ও শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ ভেসে এল। কারা যেন দেয়ালে আঘাত করছে আর চীৎকার চেঁচামেচি করছে। কাকে যেন পেটানো হচ্ছে, আর সে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "খুন! বাঁচাও!"

নভদ্‌ভরভ্‌ শান্ত গলায় মন্তব্য করল, "ওই শোন, পশুগুলোর কাণ্ড! ওদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা কেমন করে সম্ভব?"

"আপনি ওদের পশু বলছেন, আর নেখ্‌ল্যুদভ এই মাত্র এমন একটা ঘটনা আমাকে বলেছেন," বিরক্ত গলায় ক্রাইল্‌ত্‌সভ পাল্টা জবাব দিল এবং মাকার কি ভাবে একজন গ্রামের প্রতিবেশীকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে তাও বলল। "এটা তো পশুর কাজ নয়, এটা তো বীরত্ব।"

"বাজে ভাবালুতা!" নভদ্‌ভরভ্‌ ঘৃণার সঙ্গে সজোরে বলে উঠল। "এই লোকগুলোর মনোভাব ও তাদের কাজের ধারা বোঝা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তুমি দেখছ উদারতা, কিন্তু এটা অপর কয়েদীর প্রতি ঈর্ষাও হতে পারে।"

হঠাৎ রেগে গিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "অন্যের কিছুই কি আপনি ভাল দেখতে পারেন না?

"যার অস্তিত্বই নেই তাকে কেমন করে দেখা যাবে।"

"একটা মানুষ যখন নৃশংস মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়, তখন নিশ্চয় ভাল কিছু থাকে।"

নভদ্‌ভরভ্‌ বলল, "আমি মনে করি, আমরা যদি কিছু করতে চাই তাহলে তার প্রথম শর্ত হল—" (এই সময় কন্দ্রাতেভ হাতের বইটা বন্ধ করে গুরুর কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুরু করল) "কল্পনায় ভেসে না গিয়ে আমরা কঠোর বাস্তবকে দেখব। জনগণের জন্য সাধ্যমত সব কিছু আমরা করব, বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করব না। জনগণ আমাদের কাজের উপলক্ষ্যই হতে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত তারা আজকের মত অকর্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকবে ততদিন তারা আমাদের সহকর্মী হতে পারবে না।" সে যেন একটা বক্তৃতা দিয়ে চলল। "কাজেই তাদের যে উন্নতি সাধনের জন্য আমরা কাজ করে

চলেছি যতদিন সে উন্নতি সাধিত না হয় ততদিন তাদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য প্রত্যাশা করা ভুল।"

"কিসের উন্নতি?" ক্রাইল্‌ত্‌সভ পুনরায় রেগে বলল, "আমরা বলে থাকি যে স্বেচ্ছাচারী শক্তির আমরা বিরোধী ; অথচ এটা কি অত্যন্ত ভয়াবহ স্বেচ্ছাচারী শক্তি নয়?"

নভদ্‌ভরভ্‌ শান্ত ভাবে জবাব দিল, "এটা কোন রকম স্বেচ্ছাচারী শক্তিই নয়। আমি শুধু বলছি, জনগণের পথের হদিস আমি জানি, আর তাই তাদের পথ দেখাতে পারি।"

"কিন্তু আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন যে আপনার দেখানো পথই ঠিক পথ? যে স্বেচ্ছাচারী থেকে ফরাসী বিপ্লবের এত বিচার, দণ্ড ও প্রাণ-বলির জন্ম হয়েছিল, এটাও কি ঠিক তাই নয়? তারাও তো বিজ্ঞানের সাহায্যে একটিমাত্র সঠিক পথই জেনেছিল।"

"তারা ভুল করেছিল বলে আমিও ভুল করছি তা তো প্রমাণ হয় না। তাছাড়া, আদর্শের বাগাড়ম্বর আর অর্থনীতির দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ঘটনার মধ্যে অনেক তফাৎ।"

নভদ্‌ভরভ্‌-এর কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে গম-গম করতে লাগল। একমাত্র সেই কথা বলে চলল, আর সকলেই নীরব।

একটি নিশ্চুপ মুহূর্তের অবসরে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "এরা সব সময় তর্ক নিয়ে আছে।"

নেখ্‌ল্যুদভ তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ ব্যাপারে আপনি নিজে কি মনে করেন?"

"আমি মনে করি ক্রাইল্‌ত্‌সভই ঠিক বলেছে—জনগণের উপর আমাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।"

"আর তুমি কাতয়ুশা?" নেখ্‌ল্যুদভ হেসে জিজ্ঞাসা করল। পাছে সে অদ্ভুত কিছু বলে বসে তাই সে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তার জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

"আমি মনে করি, সাধারণ মানুষের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে," কথাগুলি বলেই মাসলভা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। "আমি মনে করি, তাদের প্রতি ভয়ংকর অন্যায় করা হচ্ছে।"

নবতভ জোর গলায় বলে উঠল, "ঠিক বলেছ মাসলভা, ঠিক বলেছ। তাদের প্রতি ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে—জনগণের প্রতি—কিন্তু তাদের প্রতি অবিচার করা চলবে না, আর সেটাই আমাদের কাজ।"

"বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পর্কে এ এক অদ্ভুত ধারণা" বিরক্ত কণ্ঠে মন্তব্য করে নভদ্‌ভরভ্‌ নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল।

"ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না," চুপি চুপি কথা কয়টি বলে

ক্রাইল্‌ত্‌সভও চুপ করল।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "না পারাই ভাল।"

অধ্যায়—১৫

সব বিপ্লবীই নভদ্‌ভরভ্‌কে শ্রদ্ধা করে ; সে শিক্ষিত এবং সকলে তাকে জ্ঞানী লোক বলেই মনে করে ; কিন্তু নেখ্‌ল্যুদভ মনে করে, যে সব মানুষ বিপ্লবী হয়েও নৈতিক বিচারে সাধারণ মানুষ অপেক্ষাও নীচু স্তরের, সে তাদেরই একজন। লোকটির বুদ্ধির উৎকর্ষ—তার লব—খুব বেশী ; কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার ধারণা—তার হর—অপরিমেয় ভাবে বেশী, এবং তার বুদ্ধির উৎকর্ষকে অনেক বেশী ছাড়িয়ে গেছে।

তার প্রকৃতি সাইমনসনের প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। সাইমনসন পুরুষোচিত চরিত্রের মানুষ ; বিচারবুদ্ধির নির্দেশেই সে কাজ করে, তার দ্বারাই পরিচালিত হয়। অপরদিকে, নভদ্‌ভরভ্‌ নারীসুলভ চরিত্রের লোকদের অন্যতম ; তাদের বিচারবুদ্ধি পরিচালিত হয় অংশত আবেগ-নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টায় এবং অংশত সেই চেষ্টাপ্রসূত কার্যাবলীর সমর্থনে।

যদিও নভদ্‌ভরভ্‌ তার বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারে, তথাপি নেখ্‌ল্যুদভ মনে করে যে, সে সবই তার উচ্চাকাংখা ও আধিপত্য কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম দিকে অন্যের চিত্তকে গ্রহণ করবার এবং সঠিকভাবে তাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সে বেশ একটা আধিপত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কারণ সেখানে এই সব গুণকে খুবই মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে, আর তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু পড়া শেষ করে ডিপ্লোমা পাবার পরে সে আধিপত্য যখন চলে গেল, তখন হঠাৎ অন্যত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য সে মত পাল্টে ফেলল (ক্রাইল্‌ত্‌সভ তাই বলে) এবং সংযত উদারপন্থী থেকে নারদনিক-দলের প্রচণ্ড ভক্ত হয়ে পড়ল।

যে নৈতিক ও নান্দনিক গুণাবলী থাকলে মানুষের মনে সন্দেহ ও দ্বিধা দেখা দেয় তা না থাকায় অচিরেই সে বিপ্লবী মহলে তার ঈপ্সিত আসনটি পেয়ে গেল—দলনেতার আসন। একবার একটা পথ বেছে নেবার পরে সে আর কোন সন্দেহ বা দ্বিধা করে না ; সুতরাং সে একেবারেই নিশ্চিত যে তার কখনও ভুল হয় না। তার চোখে সব কিছুই সহজ, সরল, নিশ্চিত। তার মতাদর্শের সংকীর্ণতা ও একদেশদর্শিতার জন্যই সব কিছু এত সরল ও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে ; সে তো বলেই, দরকার শুধু যুক্তিনিষ্ঠ হওয়া। তার আত্ম-প্রত্যয় এত বেশী যে মানুষ হয় তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়, নয় তো তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। যেহেতু সে প্রধানত অল্প বয়সী যুবকদের মধ্যেই কাজ-

কর্ম করে এবং তারাও তার সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়কে গভীর জ্ঞান বলে ভুল করে, তাই বেশীর ভাগ কর্মীই তাকে মেনে নেয় এবং বিপ্লবী মহলে তার বিপুল সাফল্য স্বীকৃতি লাভ করে। এমন একটি গণ-অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিতে সে তার ক্রিয়া-কলাপকে পরিচালিত করছে যার ফলে সে ক্ষমতা দখল করতে পারবে এবং সেই উদ্দেশ্যে সে একটি সমাবেশের ডাক দিয়েছে। তার রচিত একটি কর্ম-পন্থা সেই সমাবেশের সামনে রাখা হবে ; তার স্থির বিশ্বাস, তার সেই কর্ম-পন্থা সব সমস্যার সমাধান করবে এবং সেটা নিশ্চয় গৃহীত হবে।

সাহস ও দৃঢ় চিত্ততার জন্য সহকর্মীরা তাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালবাসে না। সেও কাউকে ভালবাসে না ; খ্যাতিমান সব লোককেই সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং সম্ভব হলে ধেড়ে বাঁদর বাচ্চা বাঁদরদের সঙ্গে যে ব্যবহার করে থাকে তাদের সকলের প্রতি সেই ব্যবহারই করে। অন্য লোকের মন থেকে সব শক্তি, সব ক্ষমতা সে ছিঁড়ে ফেলে দিত, যাতে তারা কেউ তার ক্ষমতা প্রকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। যারা তার কাছে মাথা নত করে শুধু তাদের সঙ্গেই সে ভাল ব্যবহার করে। এখনও এই পথ-পরিক্রমায় সে ভাল ব্যবহার করছে কন্দ্রাতেভ-এর সঙ্গে (তার প্রচারকার্যের দ্বারা সে প্রভাবিত হয়েছে) এবং ভেরা দুখোভা ও সুন্দরী গ্রাবেৎস-এর সঙ্গে (এরা দুজনই তার প্রেমে পড়েছে)। নীতিগতভাবে মেয়েদের আন্দোলনকে সমর্থন করলেও মনে মনে সে কিন্তু সব স্ত্রীলোককেই নির্বোধ ও তুচ্ছ মনে করে ; তবে যে সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে ভালবাসার আবেগে জড়িত (যেমন এখন সে গ্রাবেৎস্‌কে ভালবাসে) তাদের কথা আলাদা ; তাদের সে ব্যতিক্রম বলেই মনে করে এবং তাদের গুণপনা একমাত্র সেই বুঝতে পারে।

যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে সে মনে করে যে যথেচ্ছ মিলনই এ সমস্যার সার্থক সমাধান।

তার একটি নামমাত্র স্ত্রী ছিল এবং একটি আসল স্ত্রীও ছিল ; কিন্তু আসল স্ত্রীর কাছ থেকে সে আলাদা হয়ে গেছে কারণ সে বুঝেছে যে তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা নেই। আর এখন সে গ্রাবেৎসের সঙ্গে যথেচ্ছ মিলনের কথা ভাবছে।

নভদ্‌ভরভ নেখ্‌লুয়ুদভকে ঘৃণা করে, তার কারণ সে মাসলভার সঙ্গে (তার ভাষা অনুযায়ী) "বোকা বোকা খেলা খেলছে" ; বিশেষত প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার ত্রুটি ও সেই ত্রুটি সংশোধনের পদ্ধতির ব্যাপারে নভদ্‌ভরভের দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ অনুসরণ করেছে তার নিজস্ব পথ-পদ্ধতি : একজন প্রিন্সের পদ্ধতি অর্থাৎ বোকার পদ্ধতি। তার প্রতি নভদ্‌ভরভ্-এর এই মনোভাবের কথা নেখ্‌লুয়ুদভ জানে ; সে দুঃখের সঙ্গে আরও জানে যে, এই পথ-পরিক্রমার কালে মনের যে শুভ-বুদ্ধি সে অর্জন করেছে তা সত্ত্বেও এই লোকটিকে উচিত কথা না বলে সে পারে নি, তার প্রতি মনের গভীর

বিতৃষ্ণাকে সে চেপে রাখতে পারে নি।

অধ্যায়—১৬

পাশের ঘর থেকে সরকারী কর্মচারিদের গলা ভেসে এল। কয়েদীরা সব চুপচাপ। দুজন কনভয়-সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে সার্জেণ্ট ঘরে ঢুকল। পরিদর্শনের সময় হয়েছে। সার্জেণ্ট সকলকে গুণতি করল। নেখ্‌ল্যুদভের পালা এলে সার্জেণ্ট চেনা লোকের মত তাকে বলল, "প্রিন্স, পরিদর্শনের পরে আপনি এখানে থাকবেন না। এবার আপনাকে যেতে হবে।"

এর অর্থ নেখ্‌ল্যুদভ জানে। সার্জেণ্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার হাতে একটি তিন রুবলের নোট গুঁজে দিল।

"আহা, ঠিক আছে; আপনাকে নিয়ে কী যে করি? ইচ্ছা হলে আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারেন।"

সার্জেণ্ট বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই আর একজন সার্জেণ্ট একটি কয়েদীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। কয়েদীটির মুখে হাল্কা দাড়ি, আর চোখের নীচে আঘাতের দাগ।

কয়েদীটি বলল, "একটি মেয়ের জন্য আমি এসেছি।"

"এই যে বাপি এসেছে।" একটি শিশুর গলা শোনা গেল। রান্তসেভার পিছন থেকে একটি মাথা উঁকি দিল। রান্তসেভা নিজের পেটিকোটটা কেটে কাতয়ুশা ও মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সাহায্যে শিশুটির জন্য একটা নতুন জামা তৈরি করছিল।

কয়েদী বুজভ্‌কিন সস্নেহে বলল, "হ্যাঁ মা, আমি এসেছি।"

বুজভ্‌কিনের ছড়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ও আমাদের কাছেই থাকুক।"

রান্তসেভার হাতের সেলাইটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, "মাসিরা আমার জন্য নতুন জামা বানিয়ে দিচ্ছে। কী সু-ন্দর চ-ম-ৎ-কা-র জামা!"

মেয়েটিকে আদর করে রান্তসেভা বলল, "তুমি আমাদের কাছে শোবে তো?"

"হ্যাঁ, শোব। বাপিও শোবে।"

রান্তসেভার মুখে একটুকরো হাসি ঝিলিক দিল। বাপের দিকে ফিরে সে বলল, "না, বাপি শোবে না। তাহলে ওকে আমরা রাখছি।"

"হ্যাঁ, ওকে রেখে যেতে পার", এই কথা বলে প্রথম সার্জেণ্ট অপর জনকে নিয়ে চলে গেল।

তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই নবভভ বুজভ্‌কিনের কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে বলল, "আচ্ছা বুড়ো, কারমানভ্‌ নাম বদল করতে চায় এটা

কি সত্যি ?"

বুজভ্‌কিনের সদয় শান্ত মুখখানি হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠল ; তার চোখের উপর যেন একটা পর্দা নেমে এল।

সে ধীরে ধীরে বলল, "আমরা কিছু শুনি নি" ; তারপর চোখে সেই আবছা দৃষ্টি নিয়েই সে মেয়ের দিকে তাকাল।

"দেখ আক্সয়ুত্‌কা, মাসিদের কাছে বেশ ভাল হয়ে থেকো," বলেই সে দ্রুত পায়ে চলে গেল।

নবতভ বলল, "নাম বদলের কথাটা সত্যি, আর ও তা ভাল করেই জানে। আপনি কি করবেন ?"

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "পাশের ঘরের কর্তাব্যক্তিদের আমি সব বলব। কয়েদী দুজনকে আমি দেখলেই চিনতে পারব।"

আবার একটা তর্ক বেঁধে যাবে ভয়ে সকলেই চুপ করে রইল।

সাইমনসন এতক্ষণ দুই হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে ছিল ; কোন কথাই বলে নি। সে এবার উঠে যারা বসেছিল তাদের পাশ কাটিয়ে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"এবার আমার কথা শুনবেন কি ?"

"নিশ্চয়।" নেখ্‌ল্যুদভ উঠে তাকে অনুসরণ করল।

মাসলভা সবিস্ময়ে চোখ তুলল। নেখ্‌ল্যুদভের চোখে চোখ পড়তেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল ; বিচলিতভাবে সে মাথা নাড়তে লাগল।

বাইরের দালানে গিয়ে সাইমনসন কথা বলতে শুরু করল, "আমি যা বলতে চাই তা এই।" কয়েদীদের গলার শব্দ ও চীৎকার-চেঁচামেচি এখানে আরও বেশী করে কানে আসছে। নেখ্‌ল্যুদভ মুখটা বাঁকাল, কিন্তু সাইমনসন তাতে মোটেই ঘাবড়াল না। গম্ভীর স্বরে সে বলতে শুরু করল, "কাতয়ুশা মাসলভার সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানি বলেই এটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি যে—।" সে কথা থামাতে বাধ্য হল, কারণ দরজার কাছেই দুটো গলা একসঙ্গে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে।

একজন চেঁচিয়ে বলল, "বোকার ডিম, আমি বলছি ওগুলো আমার নয়।"

অপরজন চেঁচিয়ে বলল, "চুপ কর্ শয়তান।"

ঠিক সেই সময় মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না দালানে বেরিয়ে এল।

সে বলল, "এখানে কথা বলবেন কেমন করে ? ভিতরে যান ; ভেরা একা আছে।" দ্বিতীয় দরজা দিয়ে সে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকল। ঘরটা নির্জন সেল হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এখন রাজনৈতিক নারী বন্দীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ভেরা দুখোভা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ওর মাথা ধরেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে ; আপনাদের কথা শুনতে পাবে না। আর আমি চলে যাচ্ছি।"

সাইমনসন বলল, "আপনি বরং এখানেই থাকুন। কারও কাছ থেকে গোপন করবার মত কথা আমার নেই—আপনার কাছ থেকে তো নয়ই।"

"ঠিক আছে," বলে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না ছোট মেয়ের মত শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে শোবার তাকের কাছে চলে গেল, এবং সেখানে স্থির হয়ে বসল। তার সুন্দর বাদামী চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেছে।

সাইমনসন আবার বলল, "দেখুন, এই হল আমার কথা। কাতয়ুশা মাসলভার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা জানি বলেই আমি মনে করি যে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে আমি বাধ্য।"

নেখ্‌লয়ুদভ সাইমনসনের বলার সরলতা ও স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা না করে পারল না।

"আপনি কি বলতে চান?" সে প্রশ্ন করল।

"আমি বলতে চাই, কাতয়ুশা মাসলভাকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

সাইমনসনের দিকে চোখ রেখে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ও কথা বলবেন না!"

সাইমনসন বলেই চলল, "তাই—আমি স্থির করেছি, তাকে আমার স্ত্রী হতে অনুরোধ করব।"

"তাতে আমি কি করতে পারি? এটা তো তার উপরে নির্ভর করে।"

"তা ঠিক, কিন্তু আপনাকে ছাড়া সে কিছুই স্থির করতে পারবে না।"

"কেন?"

"কারণ তার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা না মিটলে সে মনস্থির করতে পারছে না।"

"আমার দিক থেকে তো চূড়ান্তভাবেই সব মিটে গেছে। আমি যা কর্তব্য বলে মনে করি তাই করতে চাই; তার দুর্ভাগ্যকেও হ্রাস করতে চাই; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তার উপর কোন রকম চাপ সৃষ্টি করতে চাই না।"

"তা ঠিক, কিন্তু সে তো আপনার ত্যাগকে গ্রহণ করতে চায় না।"

"এটা কোন ত্যাগ নয়।"

"আমি জানি, তার এ সিদ্ধান্ত পাকা।"

"তাহলে তো আমার সঙ্গে কথা বলার কোন দরকারই নেই," নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

"আপনিও যে তার মতই ভাবছেন সেটা আপনি স্বীকার করুন, তাই সে চায়।"

"যা আমার কর্তব্য বলে মনে করি তা করব না, একথা আমি স্বীকার করি কেমন করে? আমি শুধু এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, আমি মুক্ত নই, কিন্তু সে মুক্ত।"

সাইমনসন চুপ করে রইল। একটু চিন্তা করে বলল: "ঠিক আছে,

তাহলে এই কথাই তাকে বলব। ভাববেন না যে আমি তার প্রেমে পড়েছি। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে এমন একটি অসাধারণ আশ্চর্য মানুষ হিসাবে আমি তাকে ভালবাসি। তার কাছে আমি কিছুই চাই না। আমার মনের গভীর বাসনা তার দুঃখকে লাঘব করতে"—

সাইমনসনের কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনে নেখ্‌ল্যুদভ বিস্মিত হল।

সাইমনসন বলতে লাগল, "তার দুঃখকে লাঘব করতে সাহায্য করা। সে যদি আপনার সাহায্য নিতে না চায়, তাহলে তাকে আমার সাহায্য নিতে দিন। তার সম্মতি থাকলে সে যেখানে আটক থাকবে সেখানেই যাবার অনুমতি আমি চাইব। চারটি বছর তো অনন্তকাল নয়। তার পাশে পাশে থাকব, হয়তো তার ভাগ্যের বোঝা কিছুটা হাল্কা করতে পারব—" সে আবার থেমে গেল; উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে আর কথা বের হল না।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "আমি কি বলব? আপনার মত একজন আশ্রয়দাতা সে পেয়েছে দেখে আমি খুশি হয়েছি—"

সাইমনসন আবার বাধা দিয়ে বলল, "আমিও তাই জানতে চেয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, তাকে ভালবেসে, তার সুখের কামনা করে আপনি একথা মনে করেন কি না যে আমাকে বিয়ে করলে তার ভাল হবে?"

নেখ্‌ল্যুদভ দৃঢ় গলায় বলল, "হ্যাঁ, তা মনে করি।"

"সবই তার উপর নির্ভর করছে। আমি শুধু চাই, এই দুঃখী মানুষটা একটু শান্তি পাক।" এমন শিশুসুলভ মমতায় সাইমনসন কথাগুলি বলল যে তার মত একটি বিষণ্ণ-দর্শন লোকের মুখ থেকে কেউ তা আশা করতে পারে না।

সাইমনসন উঠে নেখ্‌ল্যুদভের কাছে গেল, সলজ্জভাবে হাসল, তারপর তাকে চুম্বন করল।

"সেই কথাই তাকে বলব", বলে সে চলে গেল।

অধ্যায়—১৭

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "এ ব্যাপারে আপনার কি মত? প্রেমে পড়েছে, গভীর প্রেমে পড়েছে! তবে তার কাছ থেকে এ রকমটা আমি আশা করি নি—ভ্লাদিমির সাইমনসনও প্রেমে পড়বে, তাও আবার এরকম ছেলেমানুষের মত! এটা সত্যি বিস্ময়কর, আর সত্যি কথা বলতে কি, দুঃখজনকও বটে।" সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু সে—কাতয়ুশা? সে এটাকে কি চোখে দেখছে বলে আপনার মনে হয়?"

"সে?" সম্ভবত যথাসম্ভব সঠিক জবাব দেবার জন্যই মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না

একটু থামল। "সে ? দেখুন, তার অতীত যাই হোক, তার নৈতিক বোধ খুব ভাল—আর তার মনটাও সুন্দর। সে আপনাকে ভালবাসে, যথার্থই ভালবাসে, আর আপনি যাতে তাকে নিয়ে জড়িয়ে না পড়েন অন্তত সেটুকু করতে পেরেও সে খুব খুশি। আপনার সঙ্গে বিয়ে তার পক্ষে ভয়ংকর অধঃপতন, এমন কি তার সমস্ত অতীত অপেক্ষাও ভয়ংকর ; আর সেই জন্যই সে বিয়েতে সে কোন দিন সম্মত হবে না। অথচ আপনার সান্নিধ্য আজও তাকে উদ্বেলিত করে।"

"আচ্ছা, তাহলে আমি কি করব ? উধাও হয়ে যাব কি ?"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না শিশুসুলভ হাসি হেসে বলল, "হ্যাঁ, খানিকটা তাই।"

"খানিকটা উধাও হওয়া যায় কি ভাবে ?"

"আমার কথার হয়তো কোন অর্থই নেই। তবে তার দিক থেকে আপনাকে বলতে পারি, সাইমনসনের এ ধরনের উচ্ছ্বসিত ভালবাসার তুচ্ছতা সে হয়তো বুঝতে পারে—সাইমনসন এখনও তাকে কিছু বলে নি,—আর এ ব্যাপারে সে যেমন গর্ববোধ করে, তেমনই ভয়ও পায়। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, এ ব্যাপারে কোন রায় দেবার মত যোগ্যতা আমার নেই ; তবু আমার বিশ্বাস, যে আবরণেই ঢাকা থাকুক সাইমনসনের দিক থেকে ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। সে বলছে, এই ভালবাসা তাকে উজ্জীবিত করে, এই ভালবাসা দেহাতীত, কিন্তু আমি জানি, যতই ব্যতিক্রম হোক না কেন এরও তলায় রয়েছে সেই একই মলিনতা......যে মলিনতা রয়েছে নভদ্‌ভরভ্‌ ও গ্রাবেৎসের মধ্যে।"

প্রিয় বিষয়ের আলোচনা শুরু হওয়ায় মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না মূল কথা থেকে সরে গেছে।

"কিন্তু আমি কি করব ?" নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তো মনে করি, আপনার উচিত সব কিছু তাকে খুলে বলা। সব কিছু খোলাখুলি হওয়া সব সময়ই ভাল। তার সঙ্গে কথা বলুন। আমি তাকে ডেকে দেব। দেব কি ?"

"হ্যাঁ, তাই দিন," নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না চলে গেল।

ছোট ঘরটাতে নেখ্‌ল্যুদভ তখন একা। ভেরা দুখোভা ঘুমুচ্ছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গোঙানির শব্দ। দুটো দরজা দিয়ে ভেসে আসছে অবিশ্রাম হৈ-হট্টগোল। নেখ্‌ল্যুদভের মনে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগল।

স্বেচ্ছায় যে কর্তব্যকে সে ঘাড়ে নিয়েছিল, অনেক দুর্বল মুহূর্তে যে কর্তব্য তার কাছে বড়ই কঠোর ও বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে, আজ সাইমনসনের কথা সে কর্তব্য থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে ; তথাপি তার মনে এমন একটা অনুভূতি জেগেছে যেটা শুধু অপ্রীতিকরই নয়, বেদনাদায়কও বটে। সে

বুঝতে পারছে, সাইমনসনের এই প্রস্তাব তার নিজের ত্যাগের বিরল গৌরবকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এবং তার নিজের ও অন্য সকলের কাছেই তার মূল্য অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ রকম একটি ভালমানুষ যদি কোন রকম বাধ্য-বাধকতা না থাকা সত্ত্বেও মাসলভার সঙ্গে তার নিজের ভাগ্যকে একসূত্রে বাঁধতে চায়, তাহলে তার ত্যাগের মহত্ত্ব কোথায় থাকে! সাধারণ ঈর্ষাও হয়তো এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাকে ভালবাসতে সে এতখানি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে অন্য কেউ তাকে ভালবাসুক এটা সে মেনে নিতে পারছে না।

তারপর যতদিন মাসলভা দণ্ডভোগ করবে ততদিন তার কাছে থাকবার যে পরিকল্পনা সে করেছিল তাও তো ভেস্তে যাচ্ছে। সে যদি সাইমনসনকে বিয়ে করে তাহলে তো উপস্থিতির আর কোন দরকারই থাকবে না; তাকে নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

নিজের মনকে বিশ্লেষণ করবার আগেই কয়েদীদের উচ্চ কলরব (আজ তাদের মধ্যে যেন বিশেষ কিছু ঘটে চলেছে) সবেগে ঘরে ঢুকল। দরজা খুলে দেখা দিল কাতয়ুশা।

দ্রুত পায়ে সে নেখ্‌লুয়ুদভের কাছে এগিয়ে এল।

বলল, "মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না আমাকে পাঠিয়ে দিল।"

"হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কথা আছে। বস। ভ্লাদিমির সাইমনসন আমার সঙ্গে কথা বলেছে।"

কোলের উপর হাত দুটি ভাঁজ করে সে চুপচাপ বসে ছিল। কিন্তু নেখ্‌লুয়ুদভ সাইমনসনের নাম করতেই তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

জিজ্ঞাসা করল, "সে কি বলেছে?"

"সে আমাকে বলল, সে তোমাকে বিয়ে করতে চায়।"

সহসা তার মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল। কোন কথা না বলে সে চোখ নামাল।

"সে আমার সম্মতি চাইছিল, অথবা আমার পরামর্শও বলতে পার। আমি বলেছি, সব কিছুই তোমার উপর নির্ভর করে—সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।"

"আঃ, এ সবের অর্থ কি? কেন?" কোন রকমে কথাগুলি উচ্চারণ করে ঈষৎ টেঁরা দৃষ্টিতে সে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকাল। পরস্পরের চোখে চোখ রেখে কয়েক সেকেণ্ড তারা চুপচাপ বসে রইল। সে দৃষ্টি বুঝি অনেক কিছুই তাদের বলে দিল।

নেখ্‌লুয়ুদভ আবার বলল, "তোমাকেই সব স্থির করতে হবে।"

"কি স্থির করব? অনেক আগেই তো সব কিছু স্থির হয়ে গেছে।"

"না, ভ্লাদিমির সাইমনসনের প্রস্তাব তুমি গ্রহণ করবে কি না সেটা

তোমাকেই স্থির করতে হবে," নেখ্‌ল্যুদভ বলল।

"আমি তো দণ্ডিত কয়েদী—আমি কেমন করে স্ত্রী হব? আমি ভ্লাদিমির সাইমনসনকেও নষ্ট করব কেন?" ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে সে বলল।

"আচ্ছা, ধরো যদি দণ্ড মকুব করা হয়?"

"আঃ, আমাকে ছেড়ে দিন। আর কিছু বলার নেই," কথা থামিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে যাবার জন্য সে উঠে দাঁড়াল।

অধ্যায়—১৮

কাতয়ুশার পিছনে পিছনে পুরুষদের ঘরে ঢুকে নেখ্‌ল্যুদভ দেখল সেখানে সকলেই উত্তেজিত হয়ে আছে। নবতভ সব জায়গায় যাতায়াত করে, সকলকে চেনে-জানে, সব কিছু খবরও রাখে। এইমাত্র সে এমন একটা খবর এনেছে যাতে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। খবরটা হল—কোন একটা দেয়ালের গায়ে সে বিপ্লবী পেত্‌লিন-এর হাতে লেখা একটা মন্তব্য দেখতে পেয়েছে। তাকে সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল এবং সকলেই জানে যে অনেক দিন আগেই সে কারায় পৌঁছে গেছে; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে মিশে খুব সম্প্রতিকালেও সে এই পথ দিয়ে চলে গেছে।

মন্তব্যে লেখা আছে, "১৭ই অগস্ট তারিখে কয়েদীদের সঙ্গে শুধু আমাকে পাঠানো হয়েছিল। নেভেরভ আমার সঙ্গে ছিল, কিন্তু কাজানের পাগলা গারদে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি ভাল আছি, মন-মেজাজ ভাল আছে, আশা করছি থাকবেও।"

সকলেই পেত্‌লিন-এর অবস্থা ও নেভেরভ-এর আত্মহত্যার কারণ নিয়ে আলোচনা করছে। শুধু ক্রাইল্‌ত্‌সভ চুপচাপ বসে নিজের মধ্যেই ডুবে গিয়েছে। তার ঝকঝকে চোখ দুটি একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

রান্ত্‌সেভা বলল, "আমার স্বামী আমাকে বলেছে, নেভেরভ যখন 'পিতার অ্যাণ্ড পল' দুর্গে ছিল তখনই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল।"

নভদ্‌ভরভ্‌ বলল, "হ্যাঁ, সে ছিল কবি ও স্বপ্নদর্শী; এ ধরনের লোকরা নির্জন কারাবাস সহ্য করতে পারে না। আমি যখন নির্জন কারাবাসে ছিলাম, কখনও নিজেকে কল্পনায় উড়ে যেতে দেই নি; অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে দিনগুলি কাটাতাম বলেই সব কিছু ভালভাবে সইতে পেরেছি।"

সকলের মনের বিষণ্ণতা কাটিয়ে দেবার জন্য নবতভ খুশিমনে বলে উঠল, "তা আর পারবেন না কেন? তারা আমাকে যখন ঘরে তালাবন্ধী করল, তখন আমিও তো বেশ খুশিই ছিলাম। যত কিছু ভয় সব গোড়ার

দিকে: গ্রেপ্তার করবে, অস্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে, সব কাজ পণ্ড করে দেবে; তারপর যেই সেলে বন্দী হলাম, অমনি সব দায়িত্ব শেষ; বিশ্রাম কর আর বসে বসে সিগারেট টানো।"

ক্রাইল্‌ত্‌সভের বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি তাকে ভাল করে চিনতে?"

যেন অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়েছে বা গান করেছে এমনিভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্রাইল্‌ত্‌সভ হঠাৎ বলতে লাগল, "নেভেরভ স্বপ্নদর্শী। আমাদের দরোয়ানের ভাষায় বলা যায়, নেভেরভের মত মানুষ 'পৃথিবীতে অল্পই জন্মে'। ঠিক······তার প্রকৃতি ছিল স্ফটিকের মত; তার ভিতরকার সব কিছু দেখা যায়। সে মিথ্যা বলতে পারত না; তার স্বভাবে কপটতাও ছিল না। শুধু যে তার চামড়া পাতলা ছিল তাই নয়, তার সব স্নায়ু-তন্তুও ছিল খোলা, যেন কেউ তার চামড়াটা খুলে নিয়েছে। হ্যাঁ······সে ছিল জটিল মহৎ প্রকৃতির মানুষ······অন্যদের মত নয়। কিন্তু সে কথা বলে আর কি লাভ?" সে একটু থামল, তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে আবার বলতে লাগল, "আগে জনগণকে শিক্ষিত করে তুলে তারপর সমাজ-জীবনের মানের পরিবর্তন করা হবে, না আগেই সমাজ-জীবনের মান পরিবর্তন করা হবে, এ নিয়ে আমরা তর্ক করে থাকি; তারপর আমরা তর্ক করি, আমাদের সংগ্রাম কোন্ পথে চলবে: শান্তিপূর্ণ প্রচার না সন্ত্রাসের পথে? আমরা তর্ক করি। কিন্তু তাঁরা তর্ক করে না, তাঁরা তাঁদের কাজ বোঝে: ডজন ডজন, শত-শত লোক মরল কিনা তারা ভাবেও না। আর কী মানুষ তাঁরা! না, তাঁরা চায়, যারা শ্রেষ্ঠ তারাই জীবন দিক। হ্যাঁ, হেরজেন বলেছেন, ডিসেম্বরবাদীদের যখন সরিয়ে নেওয়া হল, তখন সমাজের সাধারণ মান অনেক নেমে গেল। সত্যি তাই। তারপর স্বয়ং হেরজেন ও তাঁর দলবলকেও সরিয়ে দেওয়া হল; এবার নেভেরভদের পালা······"

তেমনি খুশির সুরেই নবতভ বলল, "কিন্তু তাঁদের সবাইকে সরানো যায় না। দলকে বাঁচিয়ে রাখবার মত লোকের অভাব কোন দিন হবে না।"

"না, তা হবে না, শুধু আমরা যদি তাঁদের একটু করুণার চোখে দেখি," কেউ যাতে তার কথায় বাধা দিতে না পারে সেজন্য গলা তুলে ক্রাইল্‌ত্‌সব কথাগুলি বলল। "আমাকে একটা সিগারেট দিন।"

মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আঃ, আনাতলি, ওটা তোমার পক্ষে ভাল নয়। সিগারেট খেয়ো না।"

সে রেগে বলল, "আঃ, রাখ তো।" একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই সে আবার কাশতে ও হেঁচকি তুলতে লাগল, খুব অসুস্থ হয়েই পড়বে। খানিকটা গয়ের তুলে সে আবার বলতে শুরু করল: "আমরা যা করে চলেছি সেটা কোন কাজের কাজই নয়। তর্ক করা নয়, ঐক্যবদ্ধ হওয়া······ওদের

ধ্বংস করা চাই।”

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, কিন্তু তারাও তো মানুষ।”

“না, তারা মানুষ নয়ঃ তারা যা করছে তা কোন মানুষ করে না।…… না।………শুনছি নতুন ধরনের বোমা ও বেলুন আবিষ্কার হয়েছে। একজন কেউ বেলুনে চড়ে উপরে গিয়ে বোমা ছুঁড়বে আর সব মানুষ ছারপোকার মত ধ্বংস হয়ে যাবে।……হ্যাঁ। কারণ……।” সে আরও কথা বলতে চেয়েছিল কিন্তু আগের চাইতেও বেশী করে কাশতে কাশতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, এক ঝলক রক্ত উঠে এল মুখে।

নবতভ বরফ আনতে ছুটে গেল। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না একটা ওষুধ এনে দিতে গেল, কিন্তু জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতেই সরু সাদা হাতটা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে সে চোখ বুজল। বরফ ও ঠাণ্ডা জলে কিছুটা শান্ত হলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। সার্জেণ্ট অনেকক্ষণ ধরেই নেখ্‌ল্যুদভের জন্য অপেক্ষা করছিল। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কয়েদীরা এখন চুপচাপ। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা শোবার তাকের উপরে, নীচে এবং দুটো তাকের মাঝখানে মেঝেয় শুয়ে পড়েছে; তবু সেখানে সকলের জায়গা না হওয়ায় অনেকে বাইরের দালানে বস্তা মাথায় দিয়ে ভিজে জোব্বায় শরীর ঢেকে শুয়ে আছে।

নাক ডাকার শব্দ, গোঙানি ও ঘুমের ঘোরে নানারকম শব্দ খোলা দরজা দিয়ে দালানে আসছে। সব জায়গায়ই কারাগারের জোব্বায় ঢাকা মানুষের দল স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। শুধু একক পুরুষদের ঘরে কিছু লোক প্রায়-নিঃশেষিত মোমবাতির আলোয় (সার্জেণ্টকে দেখে তারা মোমবাতিটা নিভিয়ে রেখেছিল) জেগে বসেছিল, আর একটি বুড়ো দালানের বাড়ির নীচে খালি গায়ে বসে শার্ট থেকে ছারপোকা বাছছিল। এখানকার ঘেসাঘেসি ভীড়ের দুর্গন্ধের তুলনায় রাজনৈতিক বন্দীদের ঘরের দুর্গন্ধ বাতাসকে মনে হবে সতেজ ও খোলা। ধোঁয়ায় ঢাকা বাতিটা যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে অস্পষ্ট আলো ফেলেছে। নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। দালানের ভিতর দিয়ে চলতে হলে খুব সতর্ক হতে হবে, একটা পা ফেলে আর একটা পা ফেলবার মত ফাঁকা জায়গা খুঁজে নিতে হবে। তিনটি লোক দালানেও জায়গা না পেয়ে ছিদ্র টবের জলে পংকিল জায়গাটার পাশে ছোট ঘরটাতেই শুয়ে আছে। তাদের একজন একটি বোকা-বোকা বুড়ো মানুষ; নেখ্‌ল্যুদভ অনেকবারই তাকে দলের সঙ্গে পথ চলতে দেখেছে; আর একটি ছেলের বয়স বছর দশেক; একটি কয়েদীর পায়ের উপর মাথা রেখে সে দুজনের মাঝখানে শুয়ে আছে।

ফটক পার হয়ে নেখ্‌ল্যুদভ একটা টানা নিঃশ্বাস নিল এবং অনেকক্ষণ ধরে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে নিঃশ্বাস টানতে লাগল।

অধ্যায়—১৯

পরিষ্কার আকাশে তারাগুলি ঝলমল করছে। কিছু কিছু জায়গা ছাড়া কাদা শুকিয়ে জমে গেছে। তার ভিতর দিয়ে সরাইখানায় পৌঁছে নেখ্‌ল্যুদভ একটা অন্ধকার জানালায় টোকা দিতে লাগল। চওড়া-কাঁধ মজুরটি খালি পায়ে এসে দরজা খুললে সে ভিতরে ঢুকল। ডাইনের দরজা দিয়ে পিছনের ঘরগুলো দেখা যায়। গাড়িওয়ালারা সেখানে ঘুমোয়। তাদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠোন থেকে অনেকগুলো ঘোড়ার যই চিবনোর শব্দও আসছে। সামনের ঘরে মূর্তির সামনে একটা লাল আলো জলছিল; সেখান থেকে সোমরাজ-কাঠ ও ঘামের গন্ধ আসছিল; একটা বেড়ার ও-পাশে একটি লোক বেশ জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। পোষাক ছেড়ে নেখ্‌ল্যুদভ তার ভ্রমণ-বালিশটা সোফায় রেখে কম্বলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সারাটা দিন যা শুনেছে ও দেখেছে শুয়ে শুয়ে তাই ভাবতে লাগল। একজন কয়েদীর পায়ের উপর মাথা রেখে টবের দুর্গন্ধ জলের মধ্যে ঘুমন্ত ছেলেটিকেই তার সব চাইতে ভয়ংকর মনে হল।

সন্ধ্যায় সাইমনসন ও কাতয়ুশার সঙ্গে তার যে সব কথা হয়েছিল সেটা অপ্রত্যাশিত ও গুরুতর হলেও এখন সে কথা তার মনে পড়ল না। সে ব্যাপারে তার অবস্থা এতই জটিল ও অনির্দিষ্ট যে সে চিন্তাকেই সে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে হতভাগারা সেই অস্বাস্থ্যকর বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আর দুর্গন্ধ টবের জলের মধ্যে শুয়েছিল তাদের কথা, বিশেষ করে যে ছেলেটি একটা কয়েদীর পায়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল তার নির্দোষ মুখখানিই বার বার তার মনের সামনে ভেসে উঠছিল; তাদের চিন্তাকে সে কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছিল না।

অনেক দূরে কোন এক জায়গায় বসে কিছু মানুষ অন্য সব মানুষের মাথায় অসম্মান ও নির্যাতনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে এ-কথা শুধুমাত্র জানা, আর তিনটি মাস ধরে অনবরত চোখের সামনে সেই অসম্মান ও নির্যাতনকে প্রত্যক্ষ করা—এ দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। এই তিন মাসে অনেকবার সে নিজেকে প্রশ্ন করেছে, "আমি কি পাগল যে কেউ যা দেখতে পায় না আমি তাই দেখি, না কি যা আমি দেখি সে সব কাজ যারা করে তারাই পাগল? অথচ তারা (সংখ্যায় তারা অনেক) এই সব কাজকে এত স্থির মস্তিষ্কে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজ মনে করে যে তাদের পাগল ভাবা খুব শক্ত; আবার নিজেকেও সে তো পাগল ভাবতে পারে না। এই চিন্তা-সংকট তাকে অনবরত বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

কিন্তু এখন নেখ্‌ল্যুদভ কারা-জীবনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছে। সে জেনেছে, মাতলামি, জুয়াখেলা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংস অপরাধ, এমন কি নরমাংস-

ভোজন প্রভৃতি যে সব পাপ কয়েদীদের মধ্যে গড়ে ওঠে সেগুলি আকস্মিক নয়, অধঃপতনপ্রসূত নয়, অপরাধপ্রবণ মানুষের অমানুষিকতার ফলও নয় (যদিও সরকারের পক্ষসমর্থনকারী বিজ্ঞানীরা এই ভাবেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে), বরং মানুষ একে অন্যকে শাস্তি দিতে পারে, এই অকল্পনীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই অনিবার্য ফল। নেখ্‌লুয়ুদভ বুঝতে পেরেছে, নরমাংস-লিপ্সার জন্ম কোন জলা-ভূমিতে হয় না, তার জন্ম হয় মন্ত্রিসভায়, কমিটিতে এবং সরকারী দপ্তরখানায় আর তার পরে সে কাজটা সংঘটিত হয় কোন জলাভূমিতে। সে দেখেছে, ঘোষণাকারী থেকে উকিল (তার ভগ্নীপতিসহ) ও সরকারী কর্মচারি কেউই ন্যায়-বিচারের জন্য অথবা মানুষের ভালর জন্য এতটুকু মাথা ঘামায় না; বরং যে সব ক্রিয়া-কলাপের ফলে এই অধঃপতন ও দুঃখ-যন্ত্রণার সূচনা হয়ে থাকে সেই সব কাজ-কর্ম নিয়মমাফিক সম্পাদন করবার জন্য যে রুবল তাদের দেওয়া হয় সেটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এটা খুবই স্পষ্ট সত্য।

"তাহলে এ সবই কি একটা ভুল-বোঝাবুঝির ফল? এ রকম একটা ব্যবস্থা কি করা যায় না যে, এই সব কর্মচারিদের বেতন যথারীতি দেওয়া হবে, কিছু উপরি পাওনাও তারা পাবে, আর বিনিময়ে এখন তারা যে সব কাজ-কর্ম করছে তা থেকে বিরত থাকবে?" কথাগুলি নেখ্‌লুয়ুদভ ভাবল; আর ভাবতে ভাবতে মোরগরা যখন দ্বিতীয়বার ডেকে উঠল তখন মাছির ঝাঁক ঝর্ণার মত তাকে চার দিক থেকে ঘিরে ধরা সত্ত্বেও সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

অধ্যায়—২০

নেখ্‌লুয়ুদভের ঘুম ভাঙবার অনেক আগেই গারোয়ানরা সরাইখানা থেকে চলে গেছে। চা-খাওয়া শেষ করে সরাইখানার মালকিন তার মোটা ঘর্মাক্ত ঘাড়টা মুছতে মুছতে এসে জানাল, বিরতি-কেন্দ্র থেকে জনৈক সৈনিক একটা চিঠি দিয়ে গেছে। চিঠিটা লিখেছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না। সে জানিয়েছে, ক্রাইলত্‌সভের অসুখ খুব বেড়েছে। প্রথমে আমরা চেয়েছিলাম তাকে এখানেই রেখে দেব এবং আমরা তার সঙ্গে থেকে যাবার অনুমতি চেয়ে নেব; কিন্তু সে অনুমতি মেলে নি, কাজেই আমরা তাকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের খুব ভয় হচ্ছে, কখন কি ঘটে যায়। দয়া করে এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে পরবর্তী শহরে তাকে রাখা যায় এবং আমরা একজন তার সঙ্গে থাকতে পারি। তার সঙ্গে থাকবার জন্য যদি তাকে বিয়ে করতে হয়, আমি তাতেও রাজী আছি।"

মজুর যুবকটিকে ঘোড়া ভাড়া করবার জন্য ডাক-ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। তার দ্বিতীয় গ্লাস চা শেষ হবার আগেই একটা তিন-ঘোড়ার ডাক-গাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে

ফটকে এসে দাঁড়াল। জমাট কাদার উপর গাড়ির চাকাগুলো যেন পাথরের মত শব্দ করতে করতে এল। ঘাড়-মোটা মালকিনের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ তাড়াতাড়ি বাইরে এসে গাড়িতে চেপে বসল; কোচয়ানকে হুকুম দিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালিয়ে কয়েদীর দলটাকে ধরতে হবে। সমবায় চারণ-ভূমির ফটক পার হয়েই তারা বস্তা ও রুগ্ন কয়েদী বোঝাই গাড়িটা ধরে ফেলল। সে গাড়িতে অফিসার ছিল না; সে আগে চলে গেছে। সৈনিকরা মদ খেতে খেতে মনের ফূর্তিতে গল্প-গুজব করতে করতে গাড়ির পাশে হেঁটে চলেছে। অনেকগুলো গাড়ি চলেছে। প্রথম দিককার প্রতিটি গাড়িতে দুজন করে অশক্ত কয়েদীকে ঠেসে বোঝাই করা হয়েছে। আর শেষের তিনটে গাড়ির প্রত্যেকটিতে রয়েছে তিনজন করে রাজনৈতিক বন্দী: একটায় আছে নভদ্‌ভরভ্‌, গ্রাবেৎস্‌, ও কন্দ্রাতেভ, আর একটাতে রান্ত্‌সেভা, নবতভ ও সেই মেয়েটি মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না যাকে তার জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছে। তৃতীয় গাড়িতে এক গাদা খড়ের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়ে ক্রাইল্‌ত্‌সভ শুয়ে আছে, আর তার পাশে গাড়ির এক কোণে বসে আছে মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না। কোচয়ানকে থামতে বলে নেখ্‌লুয়ুদভ গাড়ি থেকে নেমে ক্রাইল্‌ত্‌সভের দিকে এগিয়ে গেল। একটি মাতাল সৈনিক হাত তুলে নিষেধ করল, কিন্তু তাতে কান না দিয়ে সে গাড়িটাকে হাত দিয়ে ধরে ক্রাইল্‌ত্‌সভের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। গায়ে ভেড়ার চামড়ার কোট, মাথায় ফারের টুপি, মুখটা রুমাল দিয়ে বাঁধা, ক্রাইল্‌ত্‌সভ্‌কে আগের চাইতেও ফ্যাকাসে ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। সুন্দর চোখ দুটি যেন আরও বড়, আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে এ-পাশ ও-পাশ দুলতে দুলতে সে শুয়ে শুয়েই একদৃষ্টিতে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কেমন আছে জানতে চাইলে সে শুধু চোখ দুটি বুজল, রাগের সঙ্গে মাথাটা নাড়তে লাগল; গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করতেই যেন তার সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে। মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না গাড়ির উল্টো দিকে বসেছিল। তার সঙ্গে নেখ্‌লুয়ুদভের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-বিনিময় হল; তাতেই ক্রাইল্‌ত্‌সভের জন্য তার সব উদ্বেগ প্রকাশ পেল। পরক্ষণেই সে খুশির সুরে কথা বলতে শুরু করল।

গাড়ির চাকার শব্দকেও ছাপিয়ে যাতে শোনা যায় সেই রকম জোরে জোরে সে বলতে লাগল, "মনে হচ্ছে অফিসার তার ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয়েছে। বুজভ্‌কিনের হাত-কড়া খুলে দেওয়া হয়েছে; সেই এখন তার মেয়েটিকে নিয়ে চলেছে। কাতয়ুশা ও সাইমনসন তার সঙ্গে রয়েছে; ভেরাও আছে। সে আমার জায়গাটা নিয়েছে।"

ক্রাইল্‌ত্‌সভ কি যেন বলল, কিন্তু গোলমালে শোনা গেল না। একটা কাশি চাপবার চেষ্টায় ভুরু কুঁচকে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তার কথা শুনবার জন্য নেখ্‌লুয়ুদভ তার মুখের উপর ঝুঁকল; ক্রাইল্‌ত্‌সভ মুখের রুমালটা

সরিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "এখন অনেকটা ভাল। আর ঠাণ্ডা না লাগলেই হয়।"

নেখ্‌ল্যুদভ মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। আবার মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হল।

অনেক চেষ্টা করে একটুখানি হেসে ক্রাইল্‌ত্‌সভ অস্ফুটস্বরে বলল, "তিন গ্রহের সমস্যাটার কি হল? সমাধানটা খুব শক্ত, নয় কি?"

নেখ্‌ল্যুদভ কিছুই বুঝতে পারল না; মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না বুঝিয়ে বলল, সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর অবস্থানগত বিখ্যাত গাণিতিক সমস্যাটির কথাই সে বলতে চেয়েছে; ক্রাইল্‌ত্‌সভ সেই সমস্যাটির সঙ্গে নেখ্‌ল্যুদভ, কাতয়ুশা ও সাইমনসনের পারস্পরিক সম্পর্ককে তুলনা করেছে। ক্রাইল্‌ত্‌সভ মাথা নেড়ে জানাল, মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার ঠাট্টাটাকে ঠিক ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পেরেছে।

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "সমাধানটা তো আমার হাতে নেই।"

"আমার চিঠিটা কি পেয়েছেন? সে কাজটা কি করবেন?" মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না জিজ্ঞাসা করল।

"নিশ্চয় করব," নেখ্‌ল্যুদভ জবাব দিল; তারপর ক্রাইল্‌ত্‌সভের মুখের উপর একটা অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে সে গাড়িতে ফিরে গেল। উঁচু-নীচু রাস্তার খাদে-খানায় পড়ে গাড়িটা এখন এমনভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগল যে সে দুই হাতে গাড়িটা চেপে ধরে বসে রইল। কয়েদীর দলটাকে পাশে রেখে গাড়ি এগিয়ে চলল। ধূসর জোব্বা, ভেড়ার চামড়ার কোট, শিকল ও হাত-কড়ার সেই শোভাযাত্রা রাস্তাটার প্রায় পৌনে এক মাইল পথ জুড়ে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার উল্টো দিকে নেখ্‌ল্যুদভের চোখে পড়ল কাতয়ুশার নীল শাল, ভেরা দুখোভার কালো কোট ও সাইমনসনের ক্রোচেটের টুপি ও বুরুনি-করা সাদা মোজা। সাইমনসন মেয়েদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তুমুল তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে।

নেখ্‌ল্যুদভকে দেখে সকলেই অভিবাদন জানাল, সাইমনসন গম্ভীরভাবে টুপিটা তুলল। কিছু বলার না থাকায় নেখ্‌ল্যুদভ গাড়ি থামাল না। দেখতে দেখতে সে দলটাকে ছাড়িয়ে গেল! রাস্তাব অপেক্ষাকৃত সমতল অংশে পড়ে গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটতে লাগল।

একটা ঘন পাইন-বনের ভিতর দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে। মাঝে মাঝে বার্চ ও ঝাউ গাছের সারি; তাদের হলদে পাতাগুলো তখনও সরে যায় নি। অর্ধেক পথ পার হবার পরে বন শেষ হল। রাস্তার দুদিকেই মাঠ। দূরে একটা মঠের ক্রুশ-চিহ্ন ও গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। মেঘ সরে গেছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার; বনের মাথার উপর দিয়ে সূর্য উঠেছে, তার আলোয় গাছের পাতা, বরফ-জমা জলাশয় ও মঠের সোনালি রং করা ক্রুশ-চিহ্ন ও গম্বুজ ঝলমল করছে।

জোব্বা পরে গ্রামের রাস্তায় চলাফেরা করছে। মাতাল ও ভালমানুষ স্ত্রী-পুরুষের দল এখানে-ওখানে জটলা করছে। দেখলেই বোঝা যায় কাছেই একটা শহর আছে।

কোচয়ান চাবুক মেরে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। দেখতে দেখতে তারা একটা নদীর তীরে উপস্থিত হল। সেখানে খেয়ায় পার হতে হবে। খেয়া নৌকোটা তখন মাঝ নদী থেকে এগিয়ে আসছে। প্রায় কুড়িটা গাড়ি পার হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। নেখ্‌ল্যুদভকে অবশ্য বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না।

চওড়া-কাঁধ পেশীবহুল দীর্ঘকায় খেয়ার মাঝি নীরবে দড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে নৌকোটা নোঙর করল। যে সব গাড়ি ও যাত্রী তীরে অপেক্ষা করছিল, তাদের খেয়ায় তুলে নিল। নৌকোটা গাড়ি-ঘোড়ায় বোঝাই হয়ে গেল। জল দেখে ঘোড়াগুলো পা ছুঁড়তে শুরু করল। নদীর তীব্র স্রোত খেয়ার গায়ে আছড়ে পড়ছে। ফলে দড়িতে আরও টান পড়ছে। খেয়া বোঝাই হয়ে গেল। নেখ্‌ল্যুদভের গাড়িটাও তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে মাঝি খেয়ার মুখটা হুড়কো টেনে বন্ধ করে দিল; যারা উঠতে পারে নি তাদের কোন কাকুতি-মিনতিই শুনল না; দড়ি খুলে খেয়া ছেড়ে দিল।

নৌকোয় সকলেই চুপচাপ। শুধু খেয়ার মাঝিদের পায়ের শব্দ। আর ঘোড়ার ক্ষুরের খটখট শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

অধ্যায়—২১

খেয়ার এক কোণে দাঁড়িয়ে নেখ্‌ল্যুদভ চওড়া নদীটার দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মনের সামনে দুটো ছবি ভেসে উঠল। একটি, ক্রোধে মুমূর্ষু ক্রাইল্‌ত্‌সভের মাথা নাড়া; অপরটি, সাইমনসনের পাশাপাশি কাতয়ুশার দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলা। ক্রাইল্‌ত্‌সভের প্রস্তুতিহীন মৃত্যু-যাত্রা তার মনের উপর একটা বিষাদের ছায়া বিছিয়ে দিল। কাতয়ুশা যে সাইমনসনের মত একটি মানুষের ভালবাসা পেয়েছে এবং সত্যের লক্ষ্যে চলবার একটা প্রকৃত নির্ভর-যোগ্য পথের সন্ধান পেয়েছে তাতে নেখ্‌ল্যুদভের খুশি হওয়াই উচিত, অথচ এতেও তার মনের উপর একটা ভারী চাপ পড়েছে।

শহরের দিক থেকে একটা বড় ধাতব ঘণ্টার শব্দ কেঁপে কেঁপে ভেসে এল। নেখ্‌ল্যুদভের কোচয়ান ও অন্য সকলেই টুপি খুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল—শুধু রেলিং-এর ধারে দাঁড়ানো একটি বেঁটেখাটো বিপর্যস্ত চেহারার বুড়ো মানুষ সে সব কিছুই করল না। লোকটিকে নেখ্‌ল্যুদভ আগে খেয়াল করে নি। সে

কাঁধে একটা ছোট ঝোলা, আর মাথায় একটা অতি জীর্ণ ফারের টুপি।

নিজের টুপিটা পুনরায় মাথায় বসাতে বসাতে নেখ্‌ল্যুদভের কোচয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি প্রার্থনা করলে না কেন বুড়ো বাবা? তোমার কি দীক্ষা হয় নি?'

প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে ছিন্নবস্ত্র বুড়োটি সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট জবাব দিল, "কার কাছে প্রার্থনা করব?"

"কার কাছে? ঈশ্বরের কাছে," কোচয়ান বলল।

"তাহলে আমাকে দেখিয়ে দাও তিনি কোথায় থাকেন—তোমাদের এই ঈশ্বর?"

কোচয়ান বুঝতে পারল লোকটি সোজা চিজ নয়; তবু সকলের সামনে মুখ রক্ষার জন্য সেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "কোথায় থাকেন? নিশ্চয় স্বর্গে।"

"সে স্বর্গে কখনও গিয়েছ কি?"

"আমি যাই বা না যাই, সকলেই জানে যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেই হবে।"

"কোন মানুষ কোন দিন ঈশ্বরকে দেখে নি। তাঁর একমাত্র দত্তক পুত্র যিনি পিতার কোলেই ফিরে গেছেন তিনিই তাঁর কথা ঘোষণা করেছেন," ভুরু কুঁচকে সেই একই ভঙ্গীতে বুড়ো কথাগুলি বলল।

কোচয়ান বলল, "বোঝা যাচ্ছে তুমি খৃস্টান নও, তুমি শূন্যের পূজারী। যাও, সেই শূন্যকেই পূজা করগে।"

কেউ কেউ হেসে উঠল।

একটি মাঝ-বয়সী গাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার ধর্ম কি বুড়ো?"

সঙ্গে সঙ্গে আগের মতই দ্বিধাহীনভাবে বুড়ো বলল, "আমার কোন ধর্ম নেই, কারণ আমি কাউকে বিশ্বাস করি না—শুধু নিজেকে ছাড়া।"

এবার নেখ্‌ল্যুদভ আলোচনায় যোগ দিল। বলল, "নিজেকে বিশ্বাস করবে কেমন করে? তোমার তো ভুলও হতে পারে।"

মাথা নেড়ে বুড়ো লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "জীবনে কখনও আমার ভুল হয় নি।"

নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে নানা রকম ধর্ম আছে কেন?"

"নিজেদের বিশ্বাস না করে মানুষ অন্যকে বিশ্বাস করে বলেই নানা রকম ধর্ম আছে। আমিও অন্যকে বিশ্বাস করেছিলাম, আর বিশ্বাস করে এমন গভীর গাড্ডায় পড়েছিলাম যে তা থেকে বেড়িয়ে আসবার কোন আশাই ছিল না। প্রাচীনপন্থী ও নববিধানপন্থী, জুডাইজার ও খ্লাইস্তি, আর পপভ্‌ৎসি ও বেজপপভ্‌ৎসি, আর আভ্‌স্ত্রিয়াক, মলকান ও স্কপ্‌ৎসি—প্রত্যেকটি সম্প্রদায় শুধু নিজেদেরই গুণগান করে, আর কানা কুকুরছানার মত ঘুরে বেড়ায়। ধর্ম অনেক, কিন্তু আত্মা এক—আমার মধ্যে, আপনার মধ্যে এবং তার মধ্যে।

কাজেই প্রত্যেকে যদি নিজেকে বিশ্বাস করে তাহলেই সকলে এক হবে; প্রত্যেকে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেই সকলে এক হয়ে উঠবে।"

বুড়ো লোকটি বেশ জোরে জোরেই কথা বলছিল এবং মাঝে মাঝেই চারদিকে তাকাচ্ছিল; তার ইচ্ছা যাতে সকলেই তার কথা শুনতে পায়।

"তোমার এ বিশ্বাস কি অনেক দিনের?"

"আমার? দীর্ঘদিনের। এই তেইশ বছর তারা আমাকে নির্যাতন করেছে।"

"তোমাকে নির্যাতন করেছে! কেমন করে?"

"যেমন করে তারা খৃস্টকে নির্যাতন করেছিল, সেই ভাবে। তারা আমাকে ধরে নিয়ে আদালতের সামনে, পুরোহিত, মুন্‌সি ও ধর্মধ্বজীদের সামনে হাজির করে। একবার তারা আমাকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিল; কিন্তু আমি মুক্ত, তাই আমার কিছু করতে পারল না। তারা বলল, 'তোমার নাম কি?' ভেবেছিল, আমি একটা নাম বলব। কিন্তু আমার তো কোন নাম নেই। আমি সব কিছু ত্যাগ করেছি; আমার নাম নেই, বাড়ি নেই, দেশ নেই, কিছু নেই। আমি শুধুই আমি। 'তোমার নাম কি?' 'মানুষ।' 'তোমার বয়স কত?' আমি বলি, 'আমি বয়স গণনা করি না; আর বয়স গুণতে পারিও না, কারণ আমি সব সময়ই অতীত এবং ভবিষ্যৎ।' 'তোমার বাবা-মা কারা?' 'ঈশ্বর ও ধরিত্রীমাতা ছাড়া আমার আর কোন বাবা-মা নেই।' 'আর জার? তুমি জারকে স্বীকার কর?' তারা বলে। আমি বলি, 'কেন করব না? তিনি তার নিজের জার, আমি আমার নিজের জার।' 'এর সঙ্গে কথা বলে লাভ কি?' তারা বলে। আর আমি বলি, 'কথা বলতে তো তোমাদের বলি নি।' এই ভাবে তারা আমাকে নির্যাতন করে।"

নেখ্‌লুদভ জিজ্ঞাসা করল, "এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

'ঈশ্বর যেখানে নিয়ে যাবে। কাজ পেলে কাজ করি, না পেলে ভিক্ষে করি।'

বুড়ো দেখল, খেয়া তীরে ভিড়তে চলেছে। তাই সে থেমে বিজয়ীর দৃষ্টিতে আশপাশের সকলের দিকে তাকাতে লাগল।

খেয়া ওপারে ভিড়ল। নেখ্‌লুদভ থলে বের করে বুড়ো লোকটিকে কিছু দিতে গেল। সে না নিয়ে বলল:

"ও সব জিনিস আমি নেই না: শুধু রুটি নেই।"

"আমাকে ক্ষমা কর।"

"ক্ষমার কিছু নেই, আপনি তো আমাকে কোন আঘাত দেন নি, তাছাড়া আমাকে আঘাত দেওয়া সম্ভবও নয়।" লোকটি কাঠের বোঁচকাটা আবার তুলে নিল।

ইতিমধ্যে ডাক-গাড়িটা খেয়া থেকে নামিয়ে ঘোড়াগুলি জোতা হয়ে গেছে।

কোচয়ান বলল, "স্যার, আপনি ওর সঙ্গে কথা বলছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।" খেয়ার মাঝিকে বকশিস দিয়ে নেখ্‌লুয়ুদভ আবার গাড়িতে উঠে বসে বলল, "একটা নিষ্কর্মা ভবঘুরে মাত্র।"

অধ্যায়—৩১

নদীর পাড়ের উপরে উঠে কোচয়ান নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে মুখ ফেরাল।

"কোন্ হোটেলে যাব?"

"কোন্‌টা সব চাইতে ভাল হোটেল?"

" 'দি সাইবেরিয়ান' থেকে ভাল আর নেই, তবে 'দ্যুখভ'ও ভাল।"

"যেটাতে খুশি চল।"

কোচয়ান আবার গাড়ির পাশে বসে সবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এ শহরটাও অন্য সব শহরের মতই। সেই একই রকম বাড়ি-ঘর, একই ধরনের জানালা ও সবুজ ছাদ, একই রকম গীর্জা, বড় রাস্তায় একই রকম দোকানপাট, ভাঁড়ার ঘর, বুঝিবা পুলিশও একই রকম। তবে বাড়িগুলো অধিকাংশই কাঠের, আর রাস্তাগুলো পাকা নয়। জনবহুল রাস্তার একটা হোটেলের সামনে কোচয়ান গাড়ি থামাল, কিন্তু সেখানে জায়গা পাওয়া গেল না। তখন আর একটা হোটেলে নিয়ে গেল। দু'মাস পরে নেখ্‌লুয়ুদভ আরাম ও পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে আবার তার অভ্যস্ত পরিবেশ ফিরে পেল। যদিও ঘরটা খুবই সাধারণ, তবু দুটো মাস ডাক-গাড়ি, গ্রাম্য সরাইখানা ও বিরতি-কেন্দ্রে কাটাবার পরে নেখ্‌লুয়ুদভ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বিরতি-কেন্দ্রগুলিতে ঘোরাফেরার সময় যে উকুনের হাত থেকে সে কিছুতেই নিজেকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারে নি সেগুলোকে দূর করাই হল তার প্রথম কাজ। জিনিস-পত্র খুলে প্রথমেই ঢুকল রুশ স্নান-ঘরে। তারপর শহরের পোষাক—মাড়-দেওয়া শার্ট, ট্রাউজার, ফ্রক-কোট ও ওভারকোট পরে সে আঞ্চলিক গভর্ণরের সঙ্গে দেখা করতে চলল। হোটেলওয়ালাই একজন ইস্তভস্তচিককে ডেকে দিল; তার সুপুষ্ট কিরঘিজ-ঘোড়া ও ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করা গাড়ি অবিলম্বে নেখ্‌লুয়ুদভকে একটা প্রকাণ্ড সুদৃশ্য বাড়ির ফটকের সামনে পৌঁছে দিল। ফটকে শাস্ত্রী ও পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার সামনে ও পিছনে বাগান; সেখানে আস্‌পেন ও বার্চ গাছের প্রসারিত পত্রহীন শাখা-প্রশাখার ফাঁকে ফাঁকে মাথা তুলেছে ঘন সবুজ পাইন ও দেবদারু গাছের সারি।

জেনারেলের শরীর ভাল না থাকায় দেখা করতে চাইল না। তথাপি নেখ্‌লুয়ুদভ পিওনকে তার কার্ডটা দিল। পিওন সুসংবাদ নিয়ে ফিরল।

পিতার্সবার্গের মত, তবে আরও বেশী জমকালো এবং অপেক্ষাকৃত নোংরা।

নেখ্‌ল্যুদভকে পাঠ-কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল।

জেনারেল লোকটি মোটাসোটা ও আত্মপ্রত্যয়শীল। নাকটা মোটা, কপালে বড় বড় আঁব, চোখের নীচটা কালো, মাথায় টাক। একটা তাতার-রেশমের ড্রেসিং-গাউনে শরীরটা ঢেকে সে সিগারেট টানতে টানতে রূপোর পাত্রে রাখা গ্লাস থেকে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল।

ড্রেসিং-গাউনটা মোটা ঘাড়ে জড়িয়ে জেনারেল বলল, "কেমন আছেন বলুন স্যার? ড্রেসিং-গাউন জড়িয়েছি বলে ক্ষমা করবেন। এটা ছাড়া আপনার সঙ্গে দেখাই করতে পারতাম না। শরীরটা ভাল নয়, তাই বাইরে বেরই না। আমাদের এই দূর দেশে কি জন্য এসেছেন?"

নেখ্‌ল্যুদভ বলল, "একদল কয়েদীর সঙ্গে আমি যাচ্ছি। তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ইয়োর এক্সেলেন্সির সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি কতকটা তার পক্ষ হয়ে এবং কতকটা অন্য কাজে।"

জেনারেল সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে চায়ে চুমুক দিল; তারপর সবুজ ম্যালাকাইটের ছাই-দানিতে সিগারেটটা রেখে চকচকে চোখে নেখ্‌ল্যুদভের দিকে তাকিয়ে একমনে তার কথা শুনতে লাগল।

নেখ্‌ল্যুদভ জানাল, যে স্ত্রীলোকটির বিষয়ে সে আগ্রহী তাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং তার পক্ষ থেকে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত পেশ করা হয়েছে।

"বেশ, তারপর?" জেনারেল বলল।

"পিতার্সবার্গ থেকে আমাকে কথা দিয়েছিল যে, মেয়েটির ব্যাপারে যা স্থির হয় সেটা আমাকে একমাসের মধ্যে এবং এখানেই জানিয়ে দেওয়া হবে—"

সিগারেট টানতে টানতে এবং সশব্দে কাশতে কাশতে জেনারেল টেবিলের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বেঁটে-বেঁটে আঙুল দিয়ে ঘণ্টাটা বাজাল।

"তাই আমার অনুরোধ, দরখাস্তের জবাব না আসা পর্যন্ত স্ত্রীলোকটিকে এখানে থাকবার অনুমতি দেওয়া হোক।"

পোষাকধারী আর্দালি ঘরে ঢুকল।

জেনারেল তাকে বলল, "আন্না ভাসিল্যেভ্‌না উঠেছে কি না দেখ। আর আরও খানিকটা চা নিয়ে এসো।" তারপর নেখ্‌ল্যুদভের দিকে ফিরে বলল, "হুঁ, আর কি?"

"আমার অপর অনুরোধ, ঐ দলের একটি রাজনৈতিক বন্দীকে নিয়ে।"

"তাই নাকি?" অর্থপূর্ণভাবে ঘাড় নেড়ে জেনারেল বলল।

যেতে চায়।"

"তার কোন আত্মীয়া কি?"

"না; তবে তাকে বিয়ে করলে যদি তাকে থাকতে দেওয়া হয় তাহলে সে বিয়ে করতেও রাজী।'

চকচকে চোখ মেলে বক্তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবং তাকে পরাজিত করাবার উদ্দেশ্যে জেনারেল নীরবে তার কথা শুনতে শুনতে সিগারেটটা টানতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভের কথা শেষ হতেই জেনারেল টেবিল থেকে একখানা বই তুলে নিল, এবং আঙুল ভিজিয়ে দ্রুত পাতা উল্টে বিবাহ সংক্রান্ত বিধিটা বের করে পড়ে ফেলল।

বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর কি শাস্তি হয়েছে?"

"মেয়েটির? সশ্রম দণ্ড।"

"দেখুন, তাহলে তো বিবাহের ফলে সে ধরনের দণ্ডিত কয়েদীর অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না—"

"তা ঠিক, কিন্তু—"

"মাফ করবেন। কোন মুক্ত নাগরিকও যদি তাকে বিয়ে করে তথাপি তাকে পুরো দণ্ডই ভোগ করতে হবে। এ সব ক্ষেত্রে আসল প্রশ্ন হল, কার শাস্তি বেশী, পুরুষটির না স্ত্রীলোকটির?"

"ওদের দুজনেরই সশ্রম দণ্ডাদেশ হয়েছে।"

"খুব ভাল কথা; তাহলে তো দু'জনই খালাস," বলেই জেনারেল হো-হো করে হেসে উঠল। "ছেলেটির যে অবস্থা মেয়েটিরও সেই অবস্থা, কিন্তু যেহেতু ছেলেটি অসুস্থ তাকে রেখে যাওয়া যেতে পারে, অবশ্য তার সুখ-সুবিধার জন্য যতটা যা করা সম্ভব সেটা করা হবে। কিন্তু মেয়েটির বেলায়, সে যদি ছেলেটিকে বিয়েও করে তাহলেও সে দল ছেড়ে এখানে থাকতে পারে না—"

পিওন ঘোষণা করল, "হার এক্সেলেন্সি কফি পান করছেন।"

জেনারেল মাথা নেড়ে আগের কথায় ফিরে গেল: "যা হোক, আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব। তাদের নামগুলো কি? নাম দুটো এখানে লিখে দিন।"

নেখ্‌লুয়ুদভ নাম দুটো লিখে দিল।

মুমূর্ষু যুবকটিকে দেখার অনুমতি চাইলে জেনারেল নেখ্‌লুয়ুদভকে বলল:

"ওটাও আমি পারি না। আমি অবশ্য আপনাকে সন্দেহ করি না, কিন্তু তার ব্যাপারে এবং আরও অনেকের ব্যাপারে আপনি আগ্রহ প্রকাশ করছেন, আপনার টাকা আছে, আর এসব জায়গায় টাকার জোরে সব কিছু করা যায়। কর্তৃপক্ষ বলেন, 'ঘুষ বন্ধ কর।' কিন্তু সকলেই যেখানে ঘুষ খায় সেখানে আমি

ঘুষ বন্ধ করব কেমন করে? আর যত নীচের দিককার লোক ততই ঘুষের বাহার। তিন হাজার মাইলেরও বেশী জায়গা জুড়ে কে ঘুষ ধরতে পারে? এখানে যেমন আমি, সেখানেও তেমনি প্রত্যেকটি কর্মচারিই একটি ক্ষুদে জার।" জেনারেল হেসে উঠল। "আপনি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেছেন, টাকা দিয়েছেন আর অনুমতি পেয়েছেন। অ্যা?" সে আবার হাসল। "তাই নয় কি?"

"হ্যা, তাই।"

"তাই যে আপনাকে করতে হয়েছে তা আমি ভাল করেই জানি। একটি রাজনৈতিক বন্দীর প্রতি করুণাবশত আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান। ইন্সপেক্টর বা কনভয়-অফিসারও হাত পাতে, কারণ সে মাইনে পায় দৈনিক চল্লিশ কোপেক, তার একটি পরিবার আছে, তাই হাত না পেতে উপায় নেই। তার জায়গায় বা আপনার জায়গায় থাকলে তিনি বা আপনি যা করেছেন আমিও তাই করতাম। কিন্তু আমি যে-পদে অধিষ্ঠিত আছি সেখানে থাকতে নিজেকে আমি আইন থেকে এক ইঞ্চিও সরে যেতে দেব না। কারণ আমিও মানুষ এবং করুণার দ্বারা আমিও প্রভাবিত হতে পারি। আমি শাসন-ব্যবস্থার একজন সদস্য, কতকগুলি শর্তে আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে, আর সে সব শর্ত আমি অবশ্য মেনে চলব।...অতএব সে কথার ইতি হোক। এবার বলুন, রাজধানীর হালচাল কি।" তারপর জেনারেল নানা রকম প্রশ্ন করল, নিজেও অনেক কথা বলল, কিছু সংবাদ নেওয়া এবং নিজের গুরুত্ব জাহির করাই তার একমাত্র বাসনা।

অধ্যায়—২৩

নেখ্‌লুদভের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় জেনারেল জিজ্ঞাসা করল, "ভাল কথা, আপনি উঠেছেন কোথায়? দ্যুখভ'-এ? আরে, সে তো সাংঘাতিক জায়গা। আজ পাঁচটায় আসুন, এখানে আমাদের সঙ্গে আহারাদি করবেন। আপনি ইংরেজীতে কথা বলেন তো?'

"আজ্ঞে হ্যা।"

"খুব ভাল। দেখুন, এইমাত্র একজন ইংরেজ ভ্রমণকারীও এখানে এসে পৌচেছেন। তিনি নির্বাসনের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছেন এবং সেই প্রসঙ্গে সাইবেরিয়ার কারাগারগুলি পরীক্ষা করে দেখেন। দেখুন, আজ সন্ধ্যায় তিনিও আমাদের সঙ্গে আহার করবেন, কাজেই আপনিও আসুন, তার সঙ্গে দেখা করুন। ঠিক পাঁচটায় আমরা খাই, আর আমার স্ত্রী সময়ানুবর্তিতার পক্ষপাতী। সেই সময় সেই মেয়েটি ও অসুস্থ লোকটির ব্যাপারেও আপনাকে আমার জবাবটা জানাতে পারব। হয় তো তার জন্য কাউকে রেখে দেওয়া সম্ভব হতেও

পারে।”

জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেখ্‌লুদভ ডাক-ঘরে গেল। তার মন তখন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরে উঠেছে।

একটা নীচু-ছাদের ঘরে ডাক-ঘরটি অবস্থিত। কাউণ্টারের পিছনে বসে কয়েকজন কর্মচারি কাজ করছে। বেশ ভিড় জমেছে। একজন কর্মচারি মাথা হেলিয়ে বসে একহাতে চিঠিগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর অন্য হাতে তার উপর ছাপ মারছে। নেখ্‌লুদভকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডাকে তার জন্য যা কিছু এসেছিল সবই তার হাতে তুলে দেওয়া হল। অনেক কিছুই ছিল: কতকগুলি চিঠি, টাকা, বই এবং “পিতৃভূমির চিঠি”-র সর্বশেষ সংখ্যাটি। সব কিছু হাতে নিয়ে নেখ্‌লুদভ একটা কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একখানা বই হাতে নিয়ে একটি সৈনিকও সেখানে বসেছিল। তার পাশে বসে নেখ্‌লুদভ চিঠিগুলি সাজাতে লাগল। খুব সুন্দর খামের একটা রেজিস্ট্রি চিঠি ছিল; তার উপর একটা স্পষ্ট লাল সিল মারা। সিলটা ভেঙে কিছু সরকারী কাগজপত্রসহ সেলেনিন-এর চিঠিখানা দেখেই তার মুখে যেন রক্ত উঠে এল। তার হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল। কাতয়ুশার দরখাস্তের জবাব এসেছে। কী সে জবাব? নিশ্চয় বাতিল নয়? অত্যন্ত অস্পষ্ট ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরের কাঁপা হাতে লেখা চিঠিটার উপর অতিদ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে নেখ্‌লুদভ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জবাবটা কাতয়ুশার অনুকূল।

সেলেনিন লিখেছে, “প্রিয় বন্ধু, আমাদের শেষ আলোচনাটি আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। মাসলভার ব্যাপারে তোমার মতই ঠিক। বিষয়টা আমি যত্নসহকারে আগাগোড়া দেখেছি এবং মনে করি যে, তার প্রতি ভয়ংকর অন্যায় করা হয়েছে। যে দরখাস্ত-কমিটির কাছে তুমি দরখাস্তটা করেছিলে একমাত্র তারাই এর প্রতিকার করতে পারত। বিষয়টার পুনর্বি-বেচনার সময় আমি কিছুটা সাহায্য করেছি, এবং এই সঙ্গে দণ্ড হ্রাসের একটি অনুলিপি পাঠাচ্ছি। তোমার মাসি কাউণ্টেস কাতেরিনা আইভানভনা আমাকে যে ঠিকানা দিয়েছেন সেই ঠিকানায়ই তোমাকে কাগজপত্র পাঠালাম। বিচারের আগে সে যে-কারাগারে ছিল মূল দলিলটা সেখানে পাঠানো হয়েছে এবং সম্ভবত সেখান থেকে অতি সত্বর সাইবেরিয়ার প্রধান সরকারী কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমি তাড়াতাড়ি শুভ সংবাদটি তোমাকে জানালাম এবং সাদরে তোমার হাতটি চেপে ধরলাম।—তোমার সেলেনিন।”

দলিলটা এই রকম: “মহামান্য সম্রাটের বরাবরে প্রেরিত দরখাস্তসমূহ গ্রহণকারী মহামান্য সম্রাটের দপ্তরে” (এর পরে রয়েছে তারিখ ও বিভিন্ন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার মুসাবিদা)। “মহামান্য সম্রাটের বরাবরে প্রেরিত দরখাস্তসমূহ গ্রহণকারী মহামান্য সম্রাটের দপ্তরের প্রধান সচিবের আদেশক্রমে ‘মেশ্‌চাংকা’ নারী কাতেরিনা মাসলভাকে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে

যে, তাহার একান্ত অনুগত দরখাস্ত প্রসঙ্গে কৃত প্রার্থনার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মহামান্য সম্রাট এই মর্মে আদেশ প্রচার করিতেছেন যে তাহার প্রতি প্রদত্ত কঠোর দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া সাইবেরিয়ার অপেক্ষাকৃত স্বল্পদূরবর্তী কোন জেলায় নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হইল।"

সংবাদটি গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দের। কাতয়ুশার জন্য এবং নিজের জন্যও নেখ্‌ল্যুদভ যা কিছু আশা করেছিল তাই ঘটেছে। এ কথা সত্য যে মাসলভার এখন যা অবস্থা হল তাতে কিছু নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। সে যখন কয়েদী ছিল তখন তার সঙ্গে বিয়েটা হত নেহাৎই নামকাওয়াস্তে; মাসলভার অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটা ছাড়া সে বিয়ের আর কোন অর্থই থাকত না। কিন্তু এখন তাদের দুজনের একত্রে জীবন যাপনের পথে কোন বাধাই নেই, অথচ নেখ্‌ল্যুদভ সে জন্য নিজেকে মোটেই প্রস্তুত করে নি। আর তাছাড়া, তার সঙ্গে সাইমনসনের সম্পর্কেরই বা কি হবে? গতকাল মাসলভা যে সব কথা বলেছে তার অর্থই বা কি? আবার সে যদি সাইমনসনকে বিয়ে করতে রাজী হয়, তার ফল কি হবে—ভাল না মন্দ? এ সব সমস্যার কোন সুরাহাই সে করতে পারল না; তাই তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে দিল। সে ভাবল, "পরে আপনা থেকেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ নিয়ে এখন কিছু না ভেবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাসলভাকে সুসংবাদটা জানিয়ে তাকে খালাস করতে হবে।" তার মনে হল, দলিলের যে অনুলিপিটি সে পেয়েছে তাই যথেষ্ট; কাজেই ডাক-ঘর থেকে বেরিয়ে সে ইজভজচিককে কারাগারের দিকে যেতে বলল।

সেদিন সকালে কারাগারে ঢুকবার অনুমতি সে গভর্ণরের কাছ থেকে পায় নি। তবু অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, ঊর্ধ্বতন অফিসারদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না, অধীনস্থ কর্মচারিদের কাছ থেকে তা সহজেই পাওয়া যায়। তাই সে চেষ্টা করে কোন রকমে কারাগারে ঢুকে কাতয়ুশাকে সুসংবাদটা জানাবে, হয়তো তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবে, এবং সেই সঙ্গে ক্রাইল্‌ত্‌-সভের স্বাস্থ্যের খবর নেবে ও তাকে এবং মারিয়া পাভ্‌লভ্‌নাকে জেনারেলের কথাগুলি জানাবে।

কারা-ইন্সপেক্টর একটি দীর্ঘদেহ ভারিক্কী চেহারার মানুষ; গোঁফ আর জুলফি দুইই মুখের কোণ পর্যন্ত প্রসারিত। বেশ কড়া মেজাজেই সে নেখ্‌ল্যুদভকে অভ্যর্থনা জানাল। সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল, উপরওয়ালার কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিয়ে না এলে কোন বাইরের লোককে সে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। নেখ্‌ল্যুদভ যখন বলল যে রাজধানীতে পর্যন্ত তাকে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়েছে, তখন সে জবাব দিল:

"তা হতে পারে, কিন্তু আমি অনুমতি দেব না।" মুখে এইটুকুই বলল বটে, কিন্তু তার কণ্ঠের সুর যেন বলতে চাইল, "তোমরা মহানগরের ভদ্রলোকরা

মনে করতে পার যে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে, কিন্তু আমরা পূর্ব সাইবেরিয়ার লোকেরাও আইন কাকে বলে তা জানি, এবং তোমাদের শিখিয়েও দিতে পারি।"

সম্রাটের নিজস্ব দপ্তরের দলিলের অনুলিপি দেখেও কারা-ইন্সপেক্টর ভুলল না। নেখ্‌লুদভকে কারা-প্রাচীরের ভিতরে ঢুকতে দিতে সে সরাসরি আপত্তি জানাল। নেখ্‌লুদভ যখন বলল, যে-অনুলিপিটি সে পেয়েছে মাসলভাকে মুক্তি দেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট, তখন সে শুধু অবজ্ঞার হাসি হাসল; আর সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিল, কাউকে মুক্তি দেবার আগে তার ঊর্ধ্বতন অফিসারের সরাসরি আদেশ-পত্র অবশ্যই প্রয়োজন। সে শুধু এইটুকু করতে রাজী হল যে, তার দণ্ড-হ্রাসের আদেশ যে এসেছে এ-খবর সে মাসলভাকে জানিয়ে দেবে, আর তার প্রধানের কাছ থেকে মাসলভার মুক্তির আদেশ আসবার পরে সে আর একটি ঘণ্টাও তাকে আটকে রাখবে না।

ক্রাইল্‌ত্‌সভের কোন খবর জানাতেও সে রাজী হল না; এমন কি ঐ নামের কোন কয়েদী আছে কি না তাও সে বলল না। কাজেই প্রায় কোন কাজ না করেই নেখ্‌লুদভ গাড়িতে চেপে আবার হোটেলে ফিরে গেল।

অবশ্য ইন্সপেক্টরের এই কড়াকড়ির একটা কারণ ছিল। কারাগারে যত লোক ধরে তার দ্বিগুণ লোক সেখানে রাখা হয়েছে; ফলে কারাগারের ভিতরে টাইফয়েড রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিয়েছে। ইজভজচিকই নেখ্‌লুদভকে বলেছে, "কারাগারে প্রতিদিন অনেক লোক মারা যাচ্ছে। এক ধরনের পোকা তাদের আক্রমণ করেছে। একদিনেই কমসে কম বিশ জনকে কবর দেওয়া হয়েছে।"

অধ্যায়—২৪

কারাগারে ব্যর্থ হলেও মনের সেই একই উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে নেখ্‌লুদভ গভর্ণরের দপ্তরে গেল, যদি মাসলভার মূল দলিলটা সেখানে এসে থাকে। সেখানেও আসে নি; অগত্যা হোটেলে ফিরে সে সেলেনিন ও অ্যাডভোকেটকে ব্যাপারটা লিখে জানাল। চিঠি শেষ করে সে ঘড়ি দেখল; জেনারেলের ভবনে খেতে যাবার সময় হয়ে গেছে।

মনে মনে বলল, "আপাতত এ সব ভুলে যেতে হবে; সময় হলে দেখা যাবে।" সেখানে গিয়ে জেনারেলকে কি বলবে তাই ভাবতে লাগল।

ধনী লোক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের মধ্যে প্রচলিত যে ধরনের বিলাসবহুল আহারাদির ব্যবস্থায় নেখ্‌লুদভ এক সময় অভ্যস্ত ছিল, জেনারেলের ভবনে সেই রকম ব্যবস্থাই করা হয়েছে। শুধু বিলাস-বৈভবই নয়, অত্যন্ত সাধারণ আরাম-আয়েস থেকেও নেখ্‌লুদভ অনেক দিন নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

তাই আহার-পর্বটা তার কাছে খুবই ভাল লাগল।

গৃহকর্ত্রী পিতার্সবার্গের সেকেলে সমাজের একজন সম্মানিতা মহিলা। প্রথম নিকোলাসের রাজ-দরবারে সে ছিল সম্মানিতা সহচরী। সে খুব ভাল ফরাসী বলতে পারে, কিন্তু তার রুশ ভাষা খুবই অস্বাভাবিক। সে শরীরটাকে সব সময় সোজা রাখে এবং হাত নাড়বার সময় কনুই দুটোকে কোমরের খুব কাছাকাছি রাখে। স্বামীর প্রতিও তার মনোযোগ আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন অতিথির প্রতি আচরণের বিভিন্নতা থাকলেও সাধারণভাবে সে একান্তভাবে অতিথিপরায়ণা। নেখ্‌ল্যুদভকে সে আপনজনের মতই গ্রহণ করল; তার সূক্ষ্ম স্তাবকতা নেখ্‌ল্যুদভকে যেন তার নিজের গুণাবলীর কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল; মনে মনে তাতে সে খুশিই হল। যে অভূতপূর্ব সৎ পদক্ষেপের ফলে তাকে সাইবেরিয়ায় আসতে হয়েছে, মহিলাটি সে খবরও রাখে; তাই নেখ্‌ল্যুদভকে সে একজন অসাধারণ মানুষ বলেই মনে করে। এই সূক্ষ্ম স্তাবকতা, জেনারেলের বাসভবনের বিলাসবহুল জাঁকজমক, সুস্বাদু আহার্য, নানা রকম সুধীজনের সমাবেশ—সব মিলিয়ে তার বিগত কয়েক মাসের পরিবেশকে তার কাছে যেন স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল; যেন সে-স্বপ্ন ভেঙে এক নতুন বাস্তবতার মধ্যে সে জেগে উঠেছে।

পরিবারের লোকজন—জেনারেলের মেয়ে-জামাই ও এ-ডি-কং ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিল জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোক, স্বর্ণ-সন্ধানী এক ব্যবসায়ী এবং সাইবেরিয়ার কোন দূরবর্তী শহরের একজন গভর্ণর।

ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ স্বাস্থ্যবান, গায়ের রং গোলাপি, বাজে ফরাসী ভাষা বলে, কিন্তু নিজের ভাষায় তার দখল ও বাগ্মিতা বেশ উঁচুদরের। অনেক কিছু সে দেখেছে। আমেরিকা, ভারতবর্ষ, জাপান ও সাইবেরিয়া প্রসঙ্গে তার বক্তব্য খুবই আকর্ষণীয়।

যুবক ব্যবসায়ীটি একজন চাষীর ছেলে। স্বর্ণ-খনির ব্যাপারে আগ্রহী। পরণে লণ্ডনে-তৈরি সান্ধ্য পোষাক ও হীরের বোতাম লাগানো শার্ট। তার একটা ভাল লাইব্রেরী আছে, মানব-কল্যাণের কাজে সে মুক্ত হস্তে দান করে, মোটামুটি ভাবে ইওরোপে প্রচলিত উদার মতবাদেরই সমর্থক। সংস্কৃতি-বিহীন অথচ সুস্থ চাষী বংশের ভিতর থেকে যে সভ্য ও ইওরোপীয় সংস্কৃতির ধারক নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠেছে তারই দৃষ্টান্তস্থল হিসাবে এই যুবকটিকে নেখ্‌ল্যুদভের বেশ ভাল লাগল।

দূরবর্তী সাইবেরীয় শহরের গভর্ণরটি সরকারী বিভাগের একজন প্রাক্তণ ডিরেক্টর। পিতার্সবার্গে থাকতে নেখ্‌ল্যুদভ তার কথা অনেক শুনেছে। গৃহকর্তা এই গভর্ণরটিকে খুব মান্য করে, কারণ চারদিককার ঘুষখোরদের মধ্যে একমাত্র এই লোকটিই ঘুষ খায় না। গৃহকর্ত্রীও তাকে খুব পছন্দ করে, কারণ সে সঙ্গীতজ্ঞ এবং গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে একটি দ্বৈত নাচে যোগও দিল। তাকেও

নেখ্‌লু্যুদভের ভাল লাগল।

উৎসাহী এ-ডি-কংটি নানাভাবে সকলকে সাহায্য করছিল। তার সুন্দর আচরণ নেখ্‌ল্যুদভকেও খুশি করল।

কিন্তু তাকে সব চাইতে খুশি করেছে সুন্দর তরুণ দম্পতিটি—জেনারেলের কন্যা-জামাতা। মেয়েটি দেখতে যেমন মনের দিক থেকেও তেমনি সহজ, সরল। দুটি সন্তানকে নিয়েই সে সদাব্যস্ত। স্বামীকে সে প্রেম করে বিয়ে করেছিল; অবশ্য সেজন্য বাবা-মার সঙ্গে তাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। ছেলেটি উদারপন্থী; মস্কো বিশ্বালয়ের সান্মাসিক স্নাতক; বিনয়ী, বুদ্ধিমান; সরকারী চাকুরে; সংখ্যাতত্ত্বে তার অনুরাগ; বিশেষ করে স্থানীয় আদি-বাসীদের নিয়ে সে পড়াশুনা করে, তাদের ভালবাসে, তারা যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেজন্য চেষ্টা করে।

এরা সকলেই নতুন মানুষ হিসাবে নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে আলাপ করেও খুশি হয়েছে। জেনারেল ইউনিফর্ম পরে সাদা ক্রুশ-চিহ্ন ঝুলিয়ে আহারে বসল। নেখ্‌ল্যুদভের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করল। অতিথিদের একটা পাশের টেবিলে ডেকে নিয়ে এক গ্লাস করে ভদ্‌কা ও অন্য কিছু দিয়ে ক্ষিদেটা শানিয়ে নিতে বলল। নেখ্‌ল্যুদভ সকাল থেকে কি কি করেছে তাও সে জানতে চাইল। নেখ্‌ল্যুদভ কাশল, সে ডাক-ঘরে গিয়ে খবর পেয়েছে সকালে যার কথা সে বলেছিল তার দণ্ডাদেশ হ্রাস করা হয়েছে; সেই সঙ্গে আবারও সে কারাগারে ঢুকবার অনুমতি চাইল।

খাবার সময় কাজের কথা তোলায় জেনারেল কিছুটা অসন্তুষ্ট হল। ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল।

ইংরেজ ভদ্রলোকটি এইমাত্র এসে পৌঁছল; তাকে ফরাসীতে সম্বোধন করে সে বলল, "এক গ্লাস ভদ্‌কা হোক।"

ভদ্‌কা পান করে ইংরেজটি বলল, "গীর্জা ও কারখানা দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু নির্বাসিতদের বড় কারাগারটা একবার দেখতে পেলে ভাল হত।"

জেনারেল নেখ্‌ল্যুদভকে বলল, "তাহলে তো যোগাযোগ হয়েই গেল। আপনারা একসঙ্গেই যান। ওদের একটা পাশ দিয়ে দিও।" শেষের কথাটা সে এ-ডি-কং-কে বলল।

নেখ্‌ল্যুদভ জিজ্ঞাসা করল, "কখন যেতে চান?"

ইংরেজটি জবাব দিল, "সন্ধ্যার পরে কারাগার পরিদর্শন করাই আমি পছন্দ করি। তখন সকলেই ভিতরে থাকে, আর আগে থেকে কোন প্রস্তুতিও নিতে পারে না; তারা যেভাবে থাকে সেই ভাবেই পাওয়া যায়।"

"ওহো, কারাগারকে উনি পূর্ণ গৌরবে দেখতে চান? তাই দেখুন। আমি অনেক লেখালেখি করেছি, কেউ কান দেয় না। এবার বিদেশের খবরের কাগজ মারফৎ সব জানুক।" কথা শেষ করে জেনারেল খাবারের

টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। গৃহকর্ত্রী তখন অতিথিদের যার যার আসনে বসিয়ে দিল।

আহারাদির পরে কফি খেতে নেখ্‌লয়ুদভ, ইংরেজ ভদ্রলোক ও গৃহকর্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে নিয়ে একটা আকর্ষণীয় আলোচনায় মেতে উঠল। নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, সে এমন সব বুদ্ধির কথা বলছে যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভাল খাবার ও ভাল পানীয়ের পরে উদারহৃদয় রুচিবান ভদ্রলোকদের সঙ্গে আরাম-কেদারায় বসে কফিতে চুমুক দিতে তার যেন ক্রমেই বেশী করে ভাল লাগছে। তারপর ইংরেজ ভদ্রলোকের অনুরোধে গৃহকর্ত্রী যখন বিভাগীয় প্রাক্তণ ডিরেক্টরের সঙ্গে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেল এবং পরিশীলিত ভঙ্গিমায় বীথোভেন-এর "ফিফথ্‌ সিম্পনি" বাজাতে লাগল, তখন নেখ্‌লয়ুদভ এমন একটা পরিপূর্ণ আত্মপ্রসাদের মধ্যে ডুবে গেল যেখান থেকে সে দীর্ঘদিন দূরে পড়েছিল; তার মনে হল, সে যেন সহসা আবিষ্কার করল সে কত ভাল মানুষ।

নেখ্‌লয়ুদভ এমন আনন্দদানের জন্য গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাবে এমন সময় জেনারেলের মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, "আপনি আমার সন্তানদের কথা বলছিলেন; তাদের একবার দেখবেন কি?"

তার মা হেসে বলল, "ওর ধারণা সকলেই ওর ছেলেমেয়েকে দেখতে চায়। নারে, প্রিন্স সে ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী নয়।"

"ঠিক উল্টো, আমি খুবই আগ্রহী," নেখ্‌লয়ুদভ বলল। "দয়া করে তাদের দেখান।"

জামাতা, স্বর্ণ-খনি-ব্যবসায়ী ও এ-ডি-কং-কে নিয়ে জেনারেল তাসের টেবিলে বসেছিল। হাসতে হাসতে সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, "ও তো প্রিন্সকে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের দেখাতে। তুমিও যাও, একটু গুণ-কীর্তন করে এস।"

যুবকটি অগত্যা নেখ্‌লয়ুদভের পিছনে পিছনে ভিতরের ঘরে ঢুকল। ঘরটা উঁচু, সাদা কাগজে মোড়া, একটা ঢাকা-দেওয়া বাতি জ্বলছে। দুটো ছোট খাট পাতা, তার মাঝখানে নার্স বসে আছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে অভিবাদন জানাল।

প্রথম খাটের উপর ঝুঁকে পড়ে মা বলল, "এই হল কাতয়া। খুব সুন্দর না? জানেন, এই দু'বছর মাত্র বয়স হল।"

"চমৎকার!"

"আর এই হল ভাসয়ুক, দাদু ঐ নামেই ডাকে। দেখতে একেবারে অন্য রকম। অনেকটা সাইবেরীয়, নয় কি?"

একটা গোলগাল শিশু উপুর হয়ে ঘুমিয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, "ভারী সুন্দর ছেলে।"

সগর্ব খুশির হাসি হেসে মা বলল, "তা ঠিক।"

নেখ্‌ল্যুদভের মনে পড়ে গেল—শিকল, কামানো মাথা, ঝগড়া, ব্যভিচার, মুমূর্ষু ক্রাইল্‌ত্‌সভ, কাতয়ুশা ও তার অতীত জীবন; সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল; তার মনও যেন এই চাইছে; এই তো পবিত্র, রুচিসম্মত সুখ।

মায়ের কাছে বার বার ছেলেমেয়েদের প্রশংসা করে নেখ্‌ল্যুদভ বসবার ঘরে ফিরে গেল। সেখানে কারাগারে যাবার জন্য ইংরেজ ভদ্রলোক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ছোট-বড় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোককে সঙ্গে করে সে বাড়ির ফটক পার হয়ে গেল।

আবহাওয়া বদলে গেছে। বরফের বড় বড় টুকরো ঘন হয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে রাস্তা, ছাদ, বাগানের গাছপালা, ফটকের সিঁড়ি, গাড়ির মাথা ও ঘোড়ার পিঠ বরফে ঢেকে গেছে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের নিজের গাড়ি ছিল। সে কোচয়ানকে কারাগারে যেতে বলল। নেখ্‌ল্যুদভও তার ইজভজচিককে ডেকে তাতে উঠে বসল। নরম বরফের উপর দিয়ে ইজভজচিকের চাকা বেশ কষ্ট করে ঘুরে চলল।

অধ্যায়—২৫

দরজায় শাস্ত্রী, ফটকের নীচে আলো জ্বলছে, জানালায়-জানালায় আলোর সারি, ফটক, ছাদ ও দেয়ালের উপর বরফের সাদা আস্তরণ—এ সব কিছু সত্ত্বেও বিষণ্ণ কারা-ভবনটি যেন সকালের চাইতেও বেশী বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

ভারিক্কী ইন্সপেক্টরটি ফটকে বেরিয়ে এল, বাতির আলোয় নেখ্‌ল্যুদভ ও ইংরেজ ভদ্রলোককে দেওয়া পাশটা পড়ল এবং বিস্ময়ে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল; কিন্তু পাশের নির্দেশ অনুসারে আগন্তুকদ্বয়কে ভিতরে ঢুকতে বলল। উঠোন পেরিয়ে ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে তারা উপরের আপিসে ঢুকল। তাদের বসতে বলে ইন্সপেক্টর জানতে চাইল, তাদের জন্য সে কি করতে পারে। নেখ্‌ল্যুদভ বলল, সে এখনই মাসলভার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ইন্সপেক্টর একজন রক্ষীকে পাঠাল তাকে ডেকে আনতে। তারপর সে ইংরেজ ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হল। নেখ্‌ল্যুদভ দো-ভাষীর কাজ করতে লাগল।

ইংরেজটি জিজ্ঞাসা করল, "এ কারাগারে কতজন কয়েদী রাখার মত ব্যবস্থা আছে?...আসলে এখন কতজন আছে?...কতজন পুরুষ?...কতজন স্ত্রীলোক? ...শিশু?...কতজনের কঠোর দণ্ডাদেশ হয়েছে?...কতজনের নির্বাসন? ...কতজন অসুস্থ?..."

কে কি বলছে সেদিকে খেয়াল না রেখেই নেখ্‌ল্যুদভ ইংরেজ ভদ্রলোক ও ইন্সপেক্টরের কথাগুলি ভাষান্তর করে দিচ্ছিল। এক ভাবে একটা পংক্তি

ভাষান্তরের ঠিক মাঝখানে সে একটি পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দরজাটা খুলে গেল, একজন রক্ষী ঘরে ঢুকল, তার পিছনে কাতয়ুশা, মাথায় রুমাল বাঁধা, পরণে কারা-কুর্তা। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

"আমি বাঁচতে চাই, পরিবার চাই, সন্তান চাই, মানুষের মত জীবন চাই।" কাতয়ুশা দ্রুত পায়ে চোখ নীচু করে ঢোকামাত্রই এই চিন্তা বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মনের মধ্যে ঝলসে উঠল।

সে উঠে দাঁড়িয়ে, কাতয়ুশার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু কাতয়ুশার মুখ কঠিন, বিরূপ। এর আগে সে যখন নেখল্যুদভকে তিরস্কার করেছিল ঠিক তেমনি। তার মুখ রক্তিম হয়ে ম্লান হয়ে গেল; আঙুল দিয়ে অসহায়ভাবে জ্যাকেটের কোণটা মোচড়াতে লাগল; একবার চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

"তুমি তো জান দণ্ডহ্রাসের আদেশ এসেছে?"

"হ্যাঁ, রক্ষী আমাকে বলেছে।"

"কাজেই মূল দলিলটা আসামাত্রই তুমি ছাড়া পেয়ে কোথায় থাকবে সেটা স্থির করতে পারবে। তখন আমরা ভাবব—"

মাসলভা তৎক্ষণাৎ বাধা দিল।

"আমি আর কি ভাবব? ভ্লাদিমির সাইমনসন যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব।"

প্রভূত উত্তেজনা সত্ত্বেও নেখ্ল্যুদভের দিকে চোখ রেখে সে কথাগুলি এত দ্রুত ও স্পষ্টভাবে বলল যেন আগে থেকে তৈরি হয়েই এসেছিল।

"সত্যি?"

"দেখুন দিমিত্রি আইভানভিচ, সে চায় আমি তার সঙ্গে বাস করি," ভয় পেয়ে সে থেমে গেল; নিজেকে সংশোধন করে বলল, "সে চায় আমি তার কাছে কাছেই থাকি। তার চাইতে বেশী আমি আর কি চাইতে পারি? একেই আমি সুখ বলে মনে করব। আমার আর কি আছে?......"

"দুটোর যে কোন একটা," নেখ্ল্যুদভ ভাবল। "হয় সে সাইমনসনকে ভালবাসে এবং আমি তার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করছি বলে ভাবছি তার কোন প্রয়োজনই তার নেই, অথবা সে এখনও আমাকেই ভালবাসে, এবং আমার জন্যই আমাকে ত্যাগ করে সাইমনসনের সঙ্গে তার ভাগ্যকে জড়িয়ে নিজের জাহাজেই আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।" লজ্জায় সে অবনত হল; সে বুঝল তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

জিজ্ঞাসা করল, "আর তুমি নিজে, তুমি কি তাকে ভালবাস?"

"ভালবাসি কি বাসি না, তাতে কি যায়-আসে? সে সবই তো অতীতের ব্যাপার। তাছাড়া ভ্লাদিমির সাইমনসন একটি অসাধারণ মানুষ।"

"সে তো নিশ্চয়ই," নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, "সে তো চমৎকার লোক ; আমি মনে করি—"

মাসলভা আবার বাধা দিয়ে বলে উঠল, "না, দিমিত্রি আইভানভিচ, আপনার ইচ্ছামত কাজ করতে পারছি না বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।" অতলস্পর্শ ঈষৎ টেঁরা চোখে সে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকাল। "হ্যাঁ, এই রকম হওয়াই উচিত। আপনাকেও তো বাঁচতে হবে।"

কয়েক মুহূর্ত আগে নেখ্‌লুয়ুদভ নিজে যা ভাবছিল ঠিক সেই কথাই মাসলভা তাকে বলছে। কিন্তু এখন আর সে সে-চিন্তা করছে না, তার চিন্তা-ভাবনাও বদলে গেছে। সে যে শুধু লজ্জিত বোধ করছে তাই নয়, মাসলভাকে হারিয়ে সে যে সব কিছুই হারাচ্ছে তাতেই তার দুঃখ।

সে বলল, "এটা আমি আশা করি নি।"

"এখানে থেকে আপনি কেন কষ্ট পাবেন ? যথেষ্ট কষ্ট তো ভোগ করেছেন," বিচিত্র হাসি হেসে সে বলল।

"কোন কষ্টই আমার হয় নি। ওতে আমার ভালই হয়েছে ; যদি পারতাম চিরদিনই এইভাবে তোমার সেবা করে যেতাম।"

"আমরা"—আমরা কথাটা বলেই সে নেখ্‌লুয়ুদভের দিকে তাকাল— "আমরা কিছুই চাই না। এমনিতেই আমার জন্য আপনি অনেক করেছেন। আপনি না থাকলে···" সে আরও কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তার গলা কাঁপতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, "তোমার অন্তত আমাকে ধন্যবাদ দেবার কোন কারণ নেই।"

"হিসাব-নিকাশ করে আর কি হবে ? ঈশ্বর আমাদের হিসাব মিলিয়ে দেবেন," মাসলভা বলল, তার কালো চোখ দুটি অশ্রুজলে চিকচিক করতে লাগল।

নেখ্‌লুয়ুদভ বলল, "তুমি কত ভাল।"

"আমি, ভাল ?" চোখের জলে সে কথা বলল ; একটা বিষণ্ণ হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হল।

ইংরেজ ভদ্রলোক বলল, "আপনি তৈরি ?"

"এখনই," বলে নেখ্‌লুয়ুদভ ক্রাইল্‌ত্‌সভের কথা জিজ্ঞাসা করল।

মনের আবেগ দমন করে মাসলভা শান্তভাবে সব কথা বলল। ক্রাইল্‌ত্‌সভ খুব দুর্বল ; তাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাঠানো হয়েছে ; মারিয়া পাভ্‌লভ্‌না তার জন্য খুবই চিন্তিত ; সে নার্স হয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু অনুমতি পায় নি।

ইংরেজ ভদ্রলোক অপেক্ষা করছে দেখে মাসলভা বলল, "আমি কি এবার চলে যাব ?"

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে নেখ্‌লয়ুদভ বলল, “আমি কোন দিন বলব না বিদায়; আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।”

“আমাকে ক্ষমা করবেন,” এত নীচু গলায় মাসলভা কথা বলল যে সে শুনতেই পেল না। দুজনের চোখে চোখ মিলল; তার টেঁরা চোখের বিচিত্র দৃষ্টি ও মুখের বিষণ্ণ হাসি দেখে নেখ্‌লয়ুদভ বুঝতে পারল, যে দুটি কারণে এই সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে তার দ্বিতীয়টিই সত্য। মাসলভা তাকে ভালবাসে, আর তাই সে ভেবেছে, তার সঙ্গে নিজেকে জড়ালে নেখ্‌লয়ুদভের জীবনকেও সে নষ্ট করে ফেলবে। সে মনে করছে, সাইমনসনের সঙ্গে চলে গেলে সে নেখ্‌লয়ুদভকে মুক্তি দিতে পারবে এবং যদিও সে কাজ করতে পারছে বলে সে খুশিই হয়েছে, তবু তার কাছ থেকে চলে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে।

মাসলভা তার হাতখানা চেপে ধরল, তারপর দ্রুত মুখ ফিরিয়ে চলে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখল, ইংরেজ ভদ্রলোক তখনও কি যেন লিখছে: তাই তাকে বিরক্ত না করে দেয়ালের পাশে একটা কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। সহস্র রাজ্যের ক্লান্তি যেন তাকে ছেয়ে ফেলল। নিদ্রাহীন রাত, বা পথের শ্রম, বা উত্তেজনার জন্য এ ক্লান্তি নয়; বেঁচে থাকাটাই তার কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। কাঠের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে সে চোখ বুজল, আর মুহূর্তের মধ্যে গভীর গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়ল।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করল, “এবার কি সেলগুলি দেখবেন?”

নেখ্‌লয়ুদভ চোখ মেলে তাকাল। নিজেকে সেই অবস্থায় দেখে বিস্মিত হল। ইংরেজ ভদ্রলোক লেখার কাজ শেষ করে সেলগুলি দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করল।

শ্রান্ত, নিরুদ্যম নেখ্‌লয়ুদভ তাকে অনুসরণ করল।

অধ্যায়—২৬

ছোট ঘরটা পেরিয়ে তারা একটা দুর্গন্ধময় করিডরে পড়ল। কী আশ্চর্য, দুটো কয়েদী সেখানে দাঁড়িয়ে মেঝের উপর প্রস্রাব করছে। ইংরেজ ভদ্রলোক, নেখ্‌লয়ুদভ ও ইন্সপেক্টর রক্ষীদের নিয়ে প্রথম ওয়ার্ডে ঢুকল। সেখানে থাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা। সেখানে প্রায় সত্তর জন কয়েদী ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছে। তারা পর পর সারি বেঁধে শুয়ে আছে। আগন্তুকরা ঘরে ঢুকতেই তারা শিকল ঝনঝনিয়ে লাফ দিয়ে উঠে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল; শুধু দুজন উঠল না: তাদের একটি যুবক, তার খুব জ্বর হয়েছে, আর একটি বৃদ্ধ, সে শুধু গোঙাচ্ছে।

ইংরেজটি জানতে চাইল, যুবকটি কত দিন অসুস্থ হয়েছে। ইন্সপেক্টর জবাব দিল, সেদিন সকালেই সে অসুস্থ হয়েছে, তবে বুড়ো লোকটা অনেক দিন

থেকেই পেটের যন্ত্রণায় ভুগছে ; কিন্তু দাতব্য হাসপাতালে জায়গা না থাকায় তাকে সেখানে পাঠানো যাচ্ছে না। ইংরেজটি আপত্তিসূচক ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল, সে ওদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চায়, আর নেখ্‌লয়ুদভ যেন তার কথাগুলি ভাষান্তর করে বুঝিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সাই-বেরিয়ার নির্বাসন-কেন্দ্র ও কারাগারগুলি পরিদর্শন করা ছাড়া ইংরেজ ভদ্র-লোকের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মের পথে ত্রাণ ও উদ্ধারের প্রচার।

সে বলল, "ওদের বলুন, খৃস্ট ওদের করুণা করেন, ওদের ভালবাসেন, ওদের জন্যই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। এ কথা বিশ্বাস করলেই ওরা রক্ষা পাবে।" সে যখন কথা বলছিল, সব বন্দী তখন দুই হাত পাশে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। "ওদের বলুন, এই পুঁথিতে সে সব লেখা আছে। ওদের মধ্যে কেউ কি পড়তে জানে ?"

কুড়ি জনেরও বেশী পড়তে জানে।

ইংরেজটি তার ছোট থলে থেকে কয়েক খণ্ড বাঁধানো "টেস্টামেণ্ট" বের করল, আর কঠিন কালো নখওয়ালা অনেকগুলি শক্তিমান হাত মোটা কাপড়ের শার্টের আস্তিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে কাড়াকাড়ি করে তার দিকে প্রসারিত হল। এই ওয়ার্ডে সে দুখানা 'টেস্টামেণ্ট' বিলিয়ে দিল।

দুই নম্বর ওয়ার্ডেও তাই ঘটল। সেই একই দুর্গন্ধ বাতাস, জানালার মাঝে মাঝে মূর্তি ঝুলছে, দরজার বাঁদিকে সেই একই জলের টব ; গায়ে গা লাগিয়ে সকলেই শুয়ে আছে ; এবং সেই একই ভাবে লাফিয়ে উঠে দুই হাত ঝুলিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল—তিন জন ছাড়া অন্য সবাই ; তাদের মধ্যে দুজন উঠে বসল, আর অপর জন শুয়েই রইল, চোখ মেলে আগন্তুকদের একবার দেখলও না। তারা তিন জনই অসুস্থ। ইংরেজটি সেই একই বক্তৃতা করল এবং আবারও দুখানা "টেস্টামেণ্ট" বিলিয়ে দিল।

তিন নম্বর ঘর থেকে গোলমাল ও চীৎকার ভেসে এল। ইন্সপেক্টর দরজায় টোকা মেরে চেঁচিয়ে উঠল, "চুপ !" দরজা খুললে আগন্তুকরা দেখল, কয়েকজন ছাড়া অন্য সকলেই বিছানার পাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ; যারা দাঁড়ায় নি তাদের মধ্যে কয়েকজন অসুস্থ আর দুজন মারামারি করছে ; তীব্র ক্রোধে তাদের মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে ; পরস্পরকে তারা জড়িয়ে ধরেছে—একজন ধরেছে চুল, আর একজন ধরেছে দাড়ি। ইন্সপেক্টর ছুটে যেতে তবে তারা পরস্পরকে ছেড়ে দিল। একজনের নাকে ঘুঁসি লাগায় নাক দিয়ে রক্ত ও সিকনি গড়িয়ে পড়ছে ; কাফতানের আস্তিন দিয়ে সে সেগুলি মুছতে লাগল। অপর জনের যে দাড়িগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে সেইগুলিই সে কুড়িয়ে নিচ্ছিল।

ইন্সপেক্টর কড়া গলায় হাঁক দিল, "মনিটর !"

একটি বলিষ্ঠ সুন্দর লোক এগিয়ে এল।

চোখ মিটমিট করতে করতে সে বলল, "ওদের আমি ছাড়াতে পারি নি, হুজুর।"

"মজা দেখাচ্ছি।" ভুরু কুঁচকে ইন্সপেক্টর বলল।

ইংরেজ ভদ্রলোক ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কিসের জন্য লড়াই করছিল?"

নেখ্‌লুদভ মনিটরকে জিজ্ঞাসা করল।

মনিটর তখনও হাসছিল। বলল, "একজন অপর জনের কম্বল চুরি করেছিল। একজন ঘুঁসি বাগিয়ে গেছে, আর অন্যজন ঘুঁসি বসিয়ে দিয়েছে।"

ইংরেজটি ইন্সপেক্টরকে বলল, "আমি ওদের কিছু বলতে চাই।"

নেখ্‌লুদভ ভাষান্তর করে বলল।

ইন্সপেক্টর বলল, "বলতে পারেন।" ইংরেজটি একখানি চামড়া-বাঁধানো "টেস্টামেন্ট" বের করে নেখ্‌লুদভকে বলল, "দয়া করে আমার এই কথাগুলি ভাষান্তর করে বলে দিন: 'তোমরা ঝগড়া করতে করতে ঘুঁসোঘুঁসি করেছ, কিন্তু যে খৃস্ট আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন তিনি আমাদের ঝগড়া মেটাবার অন্য পথ দেখিয়েছেন। খৃস্টের উপদেশ অনুসারে কেউ আমাদের প্রতি অন্যায় করলে তার সঙ্গে আমরা কি রকম ব্যবহার করব সেটা ওরা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।

নেখ্‌লুদভ সবটাই ভাষান্তর করে বলল।

ইন্সপেক্টরের ভারিক্কী চেহারার দিকে একনজর তাকিয়ে অন্যতম যুধ্যমান বলল, "প্রধানের কাছে নালিশ কর; সেই সব মিটিয়ে দেবে, এই কথা তো?"

অপরজন বলল, "চোয়ালে লাগাও একখানা কসে, তাহলে আর দ্বিতীয়বার সে তোমার ছায়াও মাড়াবে না।"

ঘরের সকলেই মুখ টিপে হেসে তার কথা সমর্থন করল।

নেখ্‌লুদভ দুজনের জবাবই ভাষান্তর করে দিল।

"ওদের বলে দিন, খৃস্টের উপদেশ অনুসারে তাদের ঠিক বিপরীৎ ব্যবহার করতে হবে; কেউ তোমার এক গালে চড় মারলে অপর গালটি তার দিকে এগিয়ে দাও," নিজের গাল এগিয়ে দিয়ে ইংরেজ ভদ্রলোক বলল।

নেখ্‌লুদভ ভাষান্তর করে দিল।

কে যেন বলে উঠল, "নিজেই একবার পরীক্ষা করে দেখুন না।"

অসুস্থ বন্দীদের একজন জিজ্ঞাসা করল, "সে যদি গালে চড় না মারে, তাহলে কি এগিয়ে দেবেন?"

"সে তাহলে তোমাকে আগা-পাস্তলা ধোলাই দেবে।"

একজন হো-হো করে হেসে বলল, "উনি সেটাই একবার পরীক্ষা করুন!" সারা ঘর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এমন কি নাক দিয়ে রক্ত ও সিক্‌নি ঝরাতে ঝরাতে আহত লোকটিও হেসে উঠল। অসুস্থ বন্দীরাও সে হাসিতে যোগ দিল।

কিন্তু ইংরেজটি তাতে বিচলিত হল না। সে নেখ্‌লয়ুদভকে ওদের জানিয়ে দিতে বলল যে, প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীর কাছে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়, আনন্দদায়ক হয়।

সে বলল, "ওদের জিজ্ঞাসা করুন, ওরা মদ খায় কিনা।"

"খায় না বুঝি!" একজন বলে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে নাক ঝাড়ার শব্দ ও আর এক প্রস্থ অট্টহাসি।

ঐ ঘরে চারজন অসুস্থ বন্দী ছিল। ইংরেজটি যখন জানতে চাইল তাদের আলাদা করে এক ঘরে রাখা হয় নি কেন, তখন ইন্সপেক্টর জানাল, ওরা নিজেরাই সেটা চায় না, ওদের রোগও সংক্রামক নয়, আর তাছাড়া ডাক্তারের সহকারী ওদের দেখাশুনা করে, দরকার মত সব কিছুই করে।

"অথচ উনি এখানে এসেছেন পনেরোটা দিনও হয় নি," কে যেন চাপা গলায় বলল।

ইন্সপেক্টর কোন জবাব দিল না, সকলকে নিয়ে পাশের ওয়ার্ডে ঢুকল। আবার দরজা খোলা হল, সকলে উঠে নীরবে দাঁড়াল, আর ইংরেজটিও আবার "টেস্টামেণ্ট' বিলি করল। পাঁচ নম্বর ও ছয় নম্বর ওয়ার্ডে, ডাইনে ও বাঁয়ের সব ওয়ার্ডেই ওই একই ঘটনা ঘটল।

সেখান থেকে তারা গেল নির্বাসিতদের ওয়ার্ডে; আবার সেখান থেকে কম্যুন কর্তৃক নির্বাসিত এবং যারা স্বেচ্ছায় এসেছে তাদের ওয়ার্ডে। সর্বত্রই শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, কর্মহীন, রোগাতুর, লাঞ্ছিত ও অবরুদ্ধ মানুষগুলিকে বন্য-পশুর মত প্রদর্শন করা হল।

যতগুলি "টেস্টামেণ্ট" বিলি করবার কথা ছিল সেটা হয়ে গেলে ইংরেজটি আর বক্তৃতাও দিল না, পুঁথিও বিলোল না। ঐ সব বিষণ্ণ দৃশ্য ও দম-আটকানো আবহাওয়ায় তার উৎসাহও ঝিমিয়ে পড়ল; সেল থেকে সেলে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ওয়ার্ডের বন্দীদের সম্পর্কে ইন্সপেক্টরের প্রতিবেদন প্রসঙ্গে সে শুধু একটিমাত্র কথাই বলল—"ঠিক আছে।"

নেখ্‌লয়ুদভও শ্রান্তি ও হতাশার সেই একই অনুভূতির চাপে না পারল তাদের সঙ্গে চলতে অস্বীকার করতে, আর না পারল সেখান থেকে চলে যেতে—কেমন যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

অধ্যায়—২৭

নির্বাসিতদের একটি ওয়ার্ডে নেখ্‌লয়ুদভ সেই আশ্চর্য বুড়ো মানুষটিকে দেখে বিস্মিত হল যাকে সেদিন সকালে খেয়া পার হবার সময়ে সে দেখেছিল। এই বিপর্যস্ত বলিরেখাংকিত বুড়ো মানুষটি কয়েদীদের বিছানার পাশে মেঝেয় বসে ছিল। খালি পা, পরণে ছাই-রঙের একটা নোংরা শার্ট, কাঁধের কাছে

ছেঁড়া, আর সেই রকম একটা ট্রাউজার। চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে নবাগতদের দিকে তাকিয়েছিল। নোংরা ছেঁড়া শার্টের ভিতর দিয়ে তার অস্থির দেহটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল লোকটা অত্যন্ত দুর্বল; কিন্তু তার চোখে-মুখে সেদিনকার চাইতেও বেশী উৎসাহ-উদ্দীপনার আভাষ। অন্য ওয়ার্ডের মত এখানেও কর্মচারিরা ঢোকামাত্রই বন্দীরা লাফিয়ে উঠে খাড়া দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে বুড়ো বসেই রইল। দারুণ ক্রোধে তার চোখ দুটি চকচক করছে, ভুরু কুঁচকে উঠেছে।

ইন্সপেক্টর তাকে বলল, "উঠে দাঁড়াও।"

বুড়ো উঠল না, শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

"চাকররা তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমার চাকর নই। তোমার কপালে সেই চিহ্ন দেখছি......" ইন্সপেক্টরের কপাল দেখিয়ে বুড়ো বলল।

"কী-ই-ই?" ইন্সপেক্টর ভয়ংকর ভাবে চেঁচিয়ে এক পা এগিয়ে গেল।

নেখ্‌লয়ুদভ তাড়াতাড়ি বলল, "লোকটিকে আমি চিনি। ওকে বন্দী করা হয়েছে কেন?"

বুড়োর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, "পাশপোর্ট না থাকায় পুলিশ ওকে এখানে পাঠিয়েছে। অনেকবার বলেছি এ রকম পাঠিও না, তবু ওরা পাঠায়।"

বুড়ো নেখ্‌লয়ুদভকে বলল, "তাহলে আপনিও খৃস্টবিরোধী বাহিনীর একজন?"

"না, আমি দর্শনার্থী." নেখ্‌লয়ুদভ বলল।

"সে কি? খৃস্টবিরোধী কি ভাবে মানুষকে নির্যাতন করে তাই দেখতে এসেছেন? তাহলে দেখুন। তাদের সে খাঁচায় বন্দী করেছে—একটা গোটা বাহিনীকে। কথা ছিল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানুষ রুটির জোগাড় করবে। কিন্তু সে তাদের বন্দী করে নিষ্কর্মা করে রেখেছে, তাদের শূয়োরের মত খেতে দিচ্ছে, যাতে দিনে দিনে তারা পশুতে পরিণত হয়।"

"ওকি বলছে?" ইংরেজটি জানতে চাইল।

নেখ্‌লয়ুদভ জানাল, লোকগুলোকে বন্দী করে রাখার জন্য ও ইন্সপেক্টরকে দোষ দিচ্ছে।

ইংরেজটি বলল, "ওকে জিজ্ঞাসা করুন তো, আইন ভঙ্গকারীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত।"

নেখ্‌লয়ুদভ প্রশ্নটি ভাবান্তর করে দিল।

দুই পাটি দন্ত বিকশিত করে লোকটি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল।

ঘৃণার সঙ্গে বলল, "আইন? আগে সে সকলের সব কিছু লুঠ করেছে, সব জমি দখল করেছে, মানুষের সব অধিকার হরণ করেছে—সব নিজের কুক্ষিগত

করেছে—যারা বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের সবাইকে হত্যা করেছে, আর সব কিছু করে তারপরে আইন বানিয়েছে লুণ্ঠন ও হত্যা নিষিদ্ধ করে। এই সব আইন আরও আগে করা উচিত ছিল।"

নেখ্‌লুদভ ভাষান্তর করে দিল। ইংরেজ হাসল।

"আচ্ছা, এবার ওকে জিজ্ঞাসা করুন, এখন চোর ও খুনীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?"

নেখ্‌লুদভ প্রশ্নটাকে আবার ভাষান্তর করে দিল।

তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটির সঙ্গে বুড়ো বলল, "ওকে বলুন, খৃস্টবিরোধী তকমাটা নিজের গা থেকে খুলে ফেলতে হবে। তাহলেই সে দেখতে পাবে, চোরও নেই, খুনীও নেই। কথাগুলি ওকে বলে দিন।"

নেখ্‌লুদভ বুড়োর কথাগুলি ভাষান্তর করে দিলে ইংরেজটি বলল, "লোকটা পাগল"; একটা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে সে সেল থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়ো বলতে লাগল, "নিজের চরকায় তেল দাও বাবা, অন্যকে ছেড়ে দাও। যার যার কাজ তার তার। কাকে শাস্তি দিতে হবে, আর কাকে ক্ষমা করতে হবে, তা ঈশ্বরই জানেন, আমরা জানি না। নিজেই নিজের উপরওয়ালা হও, তাহলে আর উপরওয়ালার দরকার হবে না। যাও, চলে যাও," রাগে ভুরু কুঁচকে সে বলল। নেখ্‌লুদভ তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। চকচকে চোখে তার দিকে ফিরে বলল, "খৃস্টবিরোধীর চেলারা কেমন করে উকুনের মত মানুষকে কুরে কুরে খায় তা আর কত দেখবেন? চলে যান! চলে যান!"

নেখ্‌লুদভ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল। একটা খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ইংরেজটি ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কাদের সেল। সেই সময় নেখ্‌লুদভও সেখানে হাজির হল।

"এটা লাশ-ঘর।"

"ওঃ", বলে ইংরেজটি ভিতরে যেতে চাইল।

লাশ-ঘর একটা সাধারণ সেল, বেশী বড় নয়। একটা ছোট বাতি দেয়ালে ঝুলছে। তার স্বল্প আলোয় দেখা যাচ্ছে এক কোণে কিছু বস্তা ও কাঠ জড়ো করা রয়েছে এবং ডান দিকে শোবার তাকের উপর চারটে মৃতদেহ পড়ে আছে। প্রথম লাশটা মোটা সুতার শার্ট ও পাজামা পরা; লোকটা উঁচু-লম্বা, সামান্য দাড়ি আছে, মাথাটা অর্ধেক কামানো। দেহটা এরই মধ্যে বেশ শক্ত হয়ে গেছে; নীলাভ হাত দুখানি বুকের উপর থেকে এলিয়ে পড়েছে। পা দুটিও ছড়ানো, খালি পায়ের পাতা বেরিয়ে পড়েছে। তার পাশেই খালি-পা, খালি-মাথা একটি বুড়ি, পরণে সাদা পেটিকোট ও কুর্তা, মাথার অল্প চুল খোলা, যন্ত্রণাপীড়িত ছোট হলদে মুখ ও খাড়া নাক। তারপর বেগুনি রঙের পোষাক-পরা আর একটি লোক। ঐ রং দেখে নেখ্‌লুদভের কি যেন মনে

পড়ে গেল।

আরও এগিয়ে এগিয়ে সে লাশটা দেখতে লাগল।

ছোট ছুঁচলো দাড়ি উপরদিকে তোলা, সুগঠিত নাক, উঁচু সাদা কপাল, অল্প কোঁকড়া চুল,—এ সবই তার পরিচিত, কিন্তু নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। গতকালও এই মুখ সে দেখেছে—ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, যন্ত্রণাদীর্ণ; এখন সে মুখ শান্ত, নিশ্চল, ভীষণ সুন্দর।

হ্যাঁ, এই ক্রাইল্‌ত্‌সভ, অথবা তার দৈহিক সত্তার শেষ চিহ্ন তো বটেই।

"কেন সে এত কষ্ট পেল? কেন সে বেঁচেছিল? সে কি এবার তা বুঝতে পেরেছে?" নেখ্‌লুয়ুদভ মনে মনে ভাবল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না; মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই কোথাও নেই; তার মনে হল সে বুঝি মূর্ছা যাবে।

ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই সে ইন্সপেক্টরকে বলল তাকে উঠোনে পৌছে দিতে। এখন সে একটু একা থাকতে চায়। সারাটা সন্ধ্যা যা কিছু ঘটেছে সব কিছু আর একবার ভেবে দেখবার জন্য গাড়িতে চেপে সে হোটেলে ফিরে গেল।

অধ্যায়—২৮

নেখ্‌লুয়ুদভ শুতে গেল না। অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। কাতয়ুশার সঙ্গে তার সব সম্পর্কের অবসান হয়েছে। কাতয়ুশা তাকে চায় না, সেটা তার কাছে একাধারে দুঃখ ও লজ্জা। কিন্তু সে জন্য সে বিচলিত নয়। তার আর একটি কাজ এখনও অসমাপ্ত আছে; সেটা তাকে বিচলিত করেছে, তাকে কাজের মধ্যে টানতে চাইছে।

ইদানীংকালে এই যে এত পাপ সে চোখে দেখেছে, কানে শুনেছে, বিশেষ করে সেই ভয়াবহ কারাগারে আজ সে যা দেখেছে ও শুনেছে—যে পাপ তার বড় আদরের ক্রাইল্‌ত্‌সভকে হত্যা করেছে—শেষ পর্যন্ত তারাই তো জয়লাভ করেছে; অথচ তাদের পরাজিত করবার, এমন কি সে পথের সন্ধানলাভের সম্ভাবনাটুকু পর্যন্ত সে পাচ্ছে না।

কল্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সব হাজার হাজার লাঞ্ছিত মানুষের দল যারা একদল নির্বিকার সেনাপতি, ন্যায়াধীশ ও ইন্সপেক্টরের হাতে কোন না কোন অস্বাস্থ্যকর কারাগারে বন্দী হয়ে আছে; তার মনে পড়ল সেই মুক্ত বৃদ্ধ লোকটির কথা যে কর্তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করায় পাগল সাব্যস্ত হয়েছে; মনে পড়ল অনেকগুলি মৃতদেহের মধ্যে ক্রাইল্‌ত্‌সভ-এর মোমের মত সাদা সুন্দর মুখখানি, অনেকখানি ক্রোধ বুকে নিয়ে যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। তাহলে কে পাগল: সে নেখ্‌লুয়ুদভ নিজে, না এই সব কাজ করবার পরেও যারা মনে করে তারা ঠিক করেছে তারা: এই

প্রশ্নটিই বার বার নতুন শক্তিতে তার সামনে উপস্থিত হয়ে জবাবের দাবী জানাচ্ছে।

পায়চারি করতে করতে শ্রান্ত হয়ে, অবিরাম চিন্তার ভারে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে বাতিটার পাশে সোফায় বসে পড়ল। যে "টেস্টামেণ্ট" খানা ইংরেজ ভদ্রলোক স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে তাকে দিয়েছিল ঘরে ঢুকে পকেট থেকে অন্য সব জিনিস বের করবার সময় সে বইখানি বের করেও সে টেবিলের উপরে রেখেছিল। এবার সে যন্ত্রবৎ সেই বইখানি চোখের সামনে মেলে ধরল।

"লোকে বলে এই বইতে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়", এই কথা ভেবে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ম্যাথু অধ্যায় ১৮ থেকে পড়তে লাগল :

১। ঠিক সেই সময় শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বলল, স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

২। আর যীশু একটি ছোট শিশুকে কাছে ডেকে তাদের মাঝখানে বসিয়ে দিলেন।

৩। আর বললেন, নিশ্চিতরূপেই আমি তোমাদের বলছি, যতক্ষণ তোমরা রূপান্তরিত হয়ে ছোট শিশুদের মত না হবে ততক্ষণ কেউ স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪। সুতরাং যে এই ছোট শিশুটির মত ছোট হতে পারবে সেই হবে স্বর্গ-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, একথা ঠিক," সে বলে উঠল ; তার মনে পড়ল, নিজেকে যখন সে ছোট ও বিনীত করেছিল একমাত্র তখনই সে পেয়েছিল জীবনের শান্তি ও সুখ।

৫। আর যারা এইভাবে আমার নাম নিয়ে এরূপ একটি শিশুকে গ্রহণ করবে তারাই আমাকে পাবে।

৬। আর যারা এইভাবে আমার প্রতি বিশ্বাসী এই সব ছোট শিশুদের প্রতি অন্যায় করবে, গলায় যাঁতার পাথর ঝুলিয়ে তাদের ফাঁসি দেওয়া হোক, সাগরের অতলে তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হোক।

"এ সব কথার অর্থ কি?—'এই ভাবে গ্রহণ করবে।' কি ভাবে গ্রহণ করবে? 'আমার নাম নিয়ে' কথারই বা অর্থ কি?" এই সব প্রশ্ন তার মনে জাগল। সে বুঝতে পারল, এই সব শব্দ তাকে কিছু স্পষ্ট করে বলতে পারে নি। "আর গলায় যাঁতার পাথরই বা কেন? সাগরের অতলেই বা কেন? না, এতে হবে না; এ তো সঠিক নয়, স্পষ্ট নয়;" তার মনে পড়ল, জীবনে একাধিকবার এই ধর্মগ্রন্থ সে পড়েছে, কিন্তু সে সব কথার স্পষ্টতার অভাব বার বার তার মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আবার সে পড়তে লাগল ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোক : তাতে লেখা আছে আঘাতের কথা, আঘাত যে

আসবেই সে কথা, "গেহেন্না'-তে (*) ফেলে দিয়ে শাস্তির কথা, এবং কিছু কিছু দেবদূত যারা স্বর্গে পরম পিতার মুখ দেখতে পায় তাদের কথা। তার মনে হল, "কী দুঃখের কথা যে এ সবই এত সামঞ্জস্যহীন; অথচ মনে হয় বুঝি এর মধ্যে ভাল কিছু আছে।"

১১। আর যা হারিয়েছে তাকে উদ্ধার করবার জন্যই মানবপুত্রের আবির্ভাব হয়েছে, সে পড়েই চলল।

১২। তোমরা কি মনে কর? কোন লোকের যদি একশ'টি ভেড়া থাকে, আর তাদের একটা যদি হারিয়ে যায়, তাহলে সে কি নিরানব্বইটাকে ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে সেই হারিয়ে-যাওয়া একটার খোঁজ করে না?

১৩। আর যদি এমন হয় যে সেটাকে সে খুঁজে পায়, তাহলে, আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বলছি, যে নিরানব্বইটা হারিয়ে যায় নি তাদের চাইতে সেই একটা ভেড়ার জন্যই সে বেশী আনন্দ করে।

১৪। তথাপি তোমাদের স্বর্গের পরমপিতার এ ইচ্ছা নয় যে, এই সব শিশুর একটিও ধ্বংস হয়।

"হ্যাঁ, তারা ধ্বংস হোক এটা পরম পিতার ইচ্ছা নয়, কিন্তু এখানে তারা শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে ধ্বংস হচ্ছে। আর তাদের রক্ষা করবার কোন সম্ভাবনাই নেই," এই কথা ভাবতে ভাবতে সে আরও পড়তে লাগল।

২১। তখন পিটার এসে তাকে বলল, প্রভু, আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে অন্যায় করলেও আমি তাকে ক্ষমা করব? সাত বার পর্যন্ত কি?

২২। যীশু তাকে বলল, আমি তোমাকে বলছি না, সাত বার পর্যন্ত: বরং সত্তর গুণিত সাতবার পর্যন্ত।

২৩। সুতরাং স্বর্গ-রাজ্যকে সেই রাজার সঙ্গে তুলনা করা হয় যে তার ভৃত্যদের কথা বিবেচনা করবে।

২৪। এবং যখন সে হিসাব করতে বসল, তখন তার সামনে এমন একজনকে উপস্থিত করা হল যে তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার ট্যালেণ্ট* ধার করেছিল।

২৫। কিন্তু যেহেতু ধার শোধ করবার মত অর্থ তার ছিল না তাই তার মনিব আদেশ দিল, তাকে, ও তার স্ত্রীকে ও তার সন্তানগণকে,

---

* গেহেন্না—জেরুজালেমের নিকটবর্তী একটি উপত্যকা যেখানে ইস্রাইলরা তাদের সন্তানদের উৎসর্গ করত।

*ট্যালেণ্ট—প্রাচীন মুদ্রা

ও তার যথাসর্বস্ব বিক্রি করে ধার শোধ করা হোক।

২৬। সুতরাং ভৃত্যটি মাটিতে পড়ে তাকে পূজা করে বলল, প্রভু, ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সব ঋণ শোধ করে দেব।

২৭। তখন সেই ভৃত্যের মনিব করুণাপরবশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিল এবং তার সব ঋণ মকুব করে দিল।

২৮। কিন্তু সেই ভৃত্যটিই বাইরে গিয়ে আর একটি সহ-ভৃত্যকে ধরল যে তার কাছ থেকে একশ পেনি ধার করেছিল: আর সে তার গায়ে হাত দিয়ে গলা টিপে ধরে বলল, তুমি যা ধার করেছ তা শোধ করে দাও।

২৯। এবং তার সহ-ভৃত্য তার পায়ের উপর পড়ে অনুনয়-বিনয় করে বলল, তুমি ধৈর্য ধর, তোমার সব পাওনা আমি মিটিয়ে দেব।

৩০। কিন্তু সে শুনল না: ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল।

৩১। তারপর তার অপর সহ-ভৃত্যেরা এই সব দেখে খুব দুঃখিত হল এবং তাদের মনিবের কাছে গিয়ে সব কথা জানাল।

৩২। তখন তার মনিব তাকে কাছে ডেকে বলল, ওরে দুষ্ট ভৃত্য, তোর কথামত তোর সব ঋণ আমি মকুব করে দিয়েছি।

৩৩। আমি যেমন তোর প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছি, তেমনি তোরও কি উচিত ছিল না তোর সহ-কর্মীকে করুণা করা?

"আর এই কি সব? নেখ্‌লয়ুদভ সহসা উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল; আর তার সমগ্র সত্তার অন্তর-কণ্ঠ বলল, "হ্যাঁ, এই সব।"

আর যারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে তাদের যেমন হয়ে থাকে নেখ্‌লয়ুদভেরও তাই হল। যে চিন্তা গোড়ায় মনে হয় অদ্ভুত, আত্ম-বিরোধী, এমন কি বিদ্রূপের বস্তু, জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়ে অকস্মাৎ তাই হয়ে ওঠে সরলতম, নিশ্চিততম সত্য। এই ভাবে যে ভয়ংকর পাপের জন্য মানুষ যন্ত্রণা ভোগ করছে তার হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় যে ঈশ্বরের কাছে সর্বদা নিজেদের অপরাধী বলে স্বীকার করা এবং অন্য কাউকে শাস্তি দিতে বা ভাল করে তুলতে যে তারা অক্ষম সে সত্যকেও স্বীকার করা—সেই ধারণাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল, কারাগারে ও জেলখানায় যে নৃশংস পাপ সে ঘটতে দেখেছে, দেখেছে সেই দুষ্কৃতকারীদের অবিচল আত্ম-প্রত্যয়, সে সবই সম্ভব হয়েছে মানুষের অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টার ফলে: নিজেরা পাপী হয়ে তারা পাপকে সংশোধন করতে চেয়েছে বলে। পাপীরাই অন্য পাপীকে সংশোধন করতে চেষ্টা করেছে; তারা ভেবেছে কতকগুলি যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তারা একাজ করতে পারবে। আর সে সবের মোট ফল হয়েছে এই যে অভাবগ্রস্ত লোভী মানুষরা অন্যকে

শাস্তিদান ও সংশোধনকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিজেরা চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, আর যাদের তারা নির্যাতন করছে তাদেরও অবিরাম ঠেলে দিচ্ছে দুর্নীতির পথে। কোথা থেকে এসেছে এই নৃশংসতা যা সে এতদিন দেখে এসেছে, আর তার অবসান ঘটাতে হলে কি করতে হবে, এখন তা সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে। যে-জবাব সে এতদিন খুঁজে পায় নি সেই জবাবই খৃস্ট দিয়েছেন পিটারকে। সে জবাব হল—সর্বদা ক্ষমা করা, সকলকে ক্ষমা করা, অসংখ্যবার ক্ষমা করা, কারণ যারা নিজেরা দোষী নয়, এবং সেই হেতু অন্যকে শাস্তি দিতে বা সংশোধন করতে পারে এমন কোন মানুষ নেই।

"কিন্তু ব্যাপারটাতো এত সোজা হতে পারে না", সে ভাবল; কিন্তু গোড়ায় যতই অদ্ভুত ঠেকুক, এখন সে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারছে যে মূল সমস্যার এটা যে শুধু একটা নীতিগত সমাধান তাই নয়, এটা কার্যকর সমাধানও বটে। "তাহলে দুষ্কৃতকারীদের নিয়ে কি করা হবে? তারা কি বিনা শাস্তিতেই পার পেয়ে যাবে?" এই মামুলি আপত্তি আজ আর তাকে বিচলিত করতে পারল না। যদি এটা প্রমাণ করা যেত যে শাস্তি অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করে অথবা অপরাধীকে সংশোধন করে, তাহলে হয় তো এই আপত্তির একটা অর্থ থাকত; কিন্তু যেহেতু তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়েছে এবং যেহেতু অপরকে সংশোধন করবার ক্ষমতা কারও নেই, সেই হেতু একমাত্র যুক্তিসম্মত কাজ হচ্ছে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা যা শুধুমাত্র বৃথা চেষ্টাই নয়, যা ক্ষতিকর, নীতিবিরুদ্ধ ও নিষ্ঠুর। অনেক শতাব্দী ধরে অপরাধী বলে গণ্য লোকদের হত্যা করা হচ্ছে। আচ্ছা, তাতে কি অপরাধীরা নির্মূল হয়েছে? নির্মূল হওয়া দূরের কথা, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; আর সে বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে একদিকে শাস্তির ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত অপরাধীরা, আর অন্য দিকে সেই সব আইনসিদ্ধ অপরাধীরা—বিচারক, ন্যায়াধীশ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কারাধ্যক্ষরা—যারা মানুষকে বিচার করে, দণ্ড দেয়। নেখ্‌ল্যুদভ এখন বুঝতে পেরেছে, সমাজ ও শৃংখলা যে এখনও আছে তার কারণ এই সব বিচারক ও দণ্ডদাতা আইনসিদ্ধ অপরাধীরা নয়, তার কারণ তাদের কলুষিত প্রভাব সত্ত্বেও মানুষ আজও মানুষকে করুণা করে, ভালবাসে।

ধর্মগ্রন্থে তার এই চিন্তাধারার সমর্থন লাভের আশায় নেখ্‌ল্যুদভ পুনরায় গোড়া থেকে বইটি পড়তে শুরু করল। সে "পর্বতশিখর থেকে প্রদত্ত কথামৃত (Sermon on the Mount) পড়ে শেষ করল। এই অংশটি সব সময়ই তাকে অভিভূত করে। কিন্তু আজই প্রথম সে বুঝতে পারল, এ কথামৃত শুধু একটি সুন্দর বিমূর্ত চিন্তার প্রকাশই নয়। এতে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কতকগুলি অতিরঞ্জিত ও অসম্ভব দাবী উপস্থিত করা হয়েছে তাও নয়। এতে রয়েছে সরল, সুস্পষ্ট বাস্তবধর্মী এমন কতগুলি বিধান যা কার্যে পরিণত হলে (আর সেটা খুবই সম্ভব) সমাজ-জীবনে এমন এক নতুন ও বিস্ময়কর

পরিবেশের সৃষ্টি হবে যেখানে নেখ্‌লুদভের মনের সব হিংসা-বিরোধী ক্ষোভ আপনা থেকেই শুধু যে দূর হয়ে যাবে তাই নয়, মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদস্বরূপ মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ-রাজ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

এ রকম বিধান আছে পাঁচটি।

প্রথম বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।২১-২৬) হল, মানুষ তার ভাইকে হত্যা করবে না। এমন কি তার প্রতি ক্রোধও প্রকাশ করবে না; কাউকে "রাকা" অকর্মণ্য মনে করবে না; এবং যদি কারও সঙ্গে তার বিবাদ হয়ে থাকে তাহলে ঈশ্বরের কাছে উপহার নিয়ে যাবার আগে, অর্থাৎ প্রার্থনা করবার আগে সে বিবাদ অবশ্য মিটিয়ে ফেলবে।

দ্বিতীয় বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।২৭-৩২) হল, মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না, এবং নারীর সৌন্দর্যকে ভোগ করতে চেষ্টা পর্যন্ত করবে না; যদি সে একবার কোন নারীর সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হয় তাহলে কখনও তার প্রতি অবিশ্বাসী হবে না।

তৃতীয় বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।৩৩-৩৭) হল, মানুষ কখনও শপথের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করবে না।

চতুর্থ বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।৩৮-৪২) হল, মানুষ কখনও চোখের বদলে চোখ দাবী করবে না, কেউ এক গালে আঘাত করলে অন্য গাল এগিয়ে দেবে। কেউ কোন ক্ষতি করলে তাঁকে ক্ষমা করবে ও বিনীতভাবে তা সহ্য করবে, এবং সাহায্য চাইলে কখনও কাউকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

পঞ্চম বিধান (ম্যাথু। অধ্যায় ৫।৪৩-৪৮) হল, মানুষ কখনও শত্রুদের ঘৃণা করবে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, বরং তাদের ভালবাসবে, সাহায্য করবে, সেবা করবে।

নেখ্‌লুদভ বাতিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল; তার হৃদপিণ্ডও স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে-জীবন আমরা যাপন করি তার আসুরিক অব্যবস্থার কথা স্মরণ করে সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, মানুষকে যদি এই সব বিধান মেনে চলতে শেখানো হত তাহলে তাদের জীবন কী হতে পারত; আর যে আনন্দ সে অনেকদিন অনুভব করে নি তাতে তার মন ভরে গেল। যেন দীর্ঘ দিনের ক্লান্তি ও যন্ত্রণার পরে সহসা আজ সে শান্তি ও মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সারা রাত সে ঘুমুতে পারল না; অনেক অনেক মানুষ যারা ধর্মগ্রন্থখানি পড়ে তাদের মতই সেও এই প্রথম প্রতিটি কথার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল, অথচ এই কথাগুলি আগেও সে অনেকবার পড়েছে, কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে নি। একটা স্পঞ্জ যেমন করে জলকে শুষে নেয়, ঠিক তেমনি ভাবে এই সব প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় অভিব্যক্তিকে সে আকণ্ঠ পান করতে লাগল। যা কিছু পড়ছে তাই পরিচিত মনে হচ্ছে;

যা সে আগে থেকেই জানত, কিন্তু যার অর্থ সে কখনও সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করে নি, তাই সে আজ তার চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করছে। এখন সবই সে বুঝতে পারছে, বিশ্বাস করছে। এই সব বিধান পালন করলে মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করবে—শুধু এই উপলব্ধি ও বিশ্বাসই নয়। সে আরও উপলব্ধি করছে, বিশ্বাস করছে যে এই সব বিধানকে পূর্ণ করাই প্রতিটি মানুষের একমাত্র কর্তব্য, তাতেই নিহিত রয়েছে জীবনের একমাত্র অর্থ, এবং এই সব বিধান থেকে বিচ্যুত হলেই ঘটবে ভ্রান্তি, আর সে ভ্রান্তির পরিণতি প্রতিশোধ। সমগ্র কথামৃত থেকে এই সত্যই প্রবাহিত হচ্ছে এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জের নীতি-কাহিনীতে এই সত্যই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে।

চাষীরা ভেবেছিল মনিবের হয়ে যে দ্রাক্ষাকুঞ্জে তারা কাজ করতে গিয়েছিল সেটা তাদের নিজস্ব, সেখানে যা কিছু আছে সবই তাদের, এবং মনিবের কথা ভুলে গিয়ে তার লোকজন সবাইকে হত্যা করে সেই দ্রাক্ষাকুঞ্জে সুখে বাস করাই হল তাদের কাজ।

নেখ্‌লুযুদভ ভাবতে লাগল, "যখন আমরা ভাবি যে আমরাই আমাদের জীবনের মালিক এবং সুখ-সম্ভোগের জন্যই এ জীবন আমরা লাভ করেছি, তখনও কি আমরাও ঠিক ওই কাজই করি না? কিন্তু এতো অসম্ভব। কারও ইচ্ছায় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমাদের এখানে পাঠানো হয়েছে। অথচ আমরা স্থির করেছি, শুধু নিজেদের সুখের জন্যই আমরা বেঁচে থাকব, আর তার ফলেই আমাদের কপালে জোটে দুঃখ, যেমন জুটেছিল সেই চাষীদের কপালে যখন তারা মনিবের আদেশ মত কাজ করে নি। এই সব বিধানের ভিতর দিয়েই মনিবের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। যে মুহূর্তে মানুষ এই সব বিধানকে পূর্ণ করে তুলবে, তখনই মাটির পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গ-রাজ্য, মানুষ লাভ করবে তার শ্রেষ্ঠ কল্যাণ।"

"কিন্তু তোমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁর ধর্মকে আবিষ্কার কর; এবং তাহলেই আর সব কিছু তোমাদের করায়ত্ত হবে।" কিন্তু আমরা শুধু "আর সব কিছুরই সন্ধান করি, আর তাই তাদের খুঁজে পাই না।

"এবং এখানেও তাই ঘটেছে—আমার জীবনের কর্মক্ষেত্রে। একটা কাজ শেষ করতে না করতেই আর একটা শুরু হয়েছে।"

নেখ্‌লুযুদভের কাছে সেই রাত্রে একটা সম্পূর্ণ নতুন জীবনের আবির্ভাব হল; জীবনের নতুন পরিবেশের মধ্যে পদার্পণ করেছে বলে নয়, সেই রাতের পর থেকে সে যা কিছু করছে সে সবই তার জন্য একটা নতুন ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে এনেছে।

তার জীবনের এই নতুন অধ্যায় কি ভাবে শেষ হবে, একমাত্র মহাকালই তা বলতে পারে।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

মাদাম বোভারী

প্রথম খণ্ড

আমরা যখন সকলে পড়ার হল ঘরটায় ছিলাম তখন হঠাৎ হেডমাস্টার একটি নূতন ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। স্কুলের চাকরটার হাতে ছিল একটা বড় দেরাজ। তাদের আসার শব্দে আমাদের কারো কারো ঘুম ছুটে গেল। কিন্তু আমরা সকলেই এমনভাবে আমাদের আপন আপন জায়গায় উঠে দাঁড়ালাম যাতে মনে হবে আমরা সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

হেডমাস্টার ইশারায় আমাদের বসতে বলে শিক্ষক মশাইকে নিচু গলায় বললেন, মঁসিয়ে রোজার, একটি ছেলে এনেছি, এর দিকে একটু বেশী করে লক্ষ্য রাখবে। আমি ওকে প্রাথমিক স্কুলের শেষ স্তরে ভর্তি করছি। যদি ও ভালভাবে কাজকর্ম করে ও ওর ব্যবহার ভাল লাগে তাহলে ওকে আর এক ক্লাস উঁচুতে উঠিয়ে দিও।

আগন্তুক ছেলেটি ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজার কপাটে আড়াল পড়ায় তাকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল না। ছেলেটি গ্রামের। বয়স পনের এবং মাথায় আমাদের থেকে লম্বা। তার মাথার চুলটা খুব ছোট করে ছাঁটা আর তার চোখে মুখে ছিল একটা শান্ত ভীরু-ভীরু ভাব। তার কাঁধ-দুটো এমন কিছু চওড়া ছিল না, তবু কালো বোতামওয়ালা নীল জ্যাকেটটা আঁটসাট দেখাচ্ছিল। তার পায়ে ছিল নীল মোজা আর তার উপর ছিল কাঁটাপেটা ভারী জুতো ; তাতে পালিশ ছিল না।

আমরা আবার পাঠ মুখস্থ বলতে লাগলাম। সে মন দিয়ে তা ধর্মীয় নীতি-উপদেশের মত শুনল। শোনার সময় সে পায়ের উপর পা চাপাল না অথবা কনুইএর উপর ভর দিল না। বেলা দুটোর সময় ঘণ্টা পড়লে আমরা পরবর্তী ক্লাসে যাবার জন্য তৈরি হলে আমাদের শিক্ষককে বলে দিতে হলো সে যেন আমাদের সঙ্গে সার দিয়ে দাঁড়ায়।

আমরা ক্লাসঘরে ঢুকেই আমাদের মাথা থেকে টুপী খুলে উপরে ছুঁড়ে দিলাম। ধূলোর মেঘ উড়ল মাথার উপরে। পরে টুপীগুলো আমাদের বসার পাশে রেখে দিলাম। কিন্তু সে আমাদের এই রীতি জানত না বলে সে তার টুপীটা রেখেছিল তার কোলের উপর। মখমল আর খড়গোশের লোম দিয়ে তৈরি টুপীটা ছিল নূতন আর বেশ চকচকে।

শিক্ষক বললেন, উঠে দাঁড়াও।

ছেলেটি উঠে দাঁড়াতেই তার কোল থেকে পড়ে গেল টুপীটা। ক্লাসের

ছেলেরা হেসে উঠল। সে ঝুঁকে সেটা কুড়িয়ে নিল।

শিক্ষক মশাই রসিক ছিলেন। তিনি বললেন, তোমার মাথার শিরস্ত্রাণ পড়ে গেল যে। ছেলেটি তার টুপীটা মাথায় পড়বে না হাতে ধরে থাকবে তা বুঝে উঠতে পারল না। হাসির রোল উঠল আবার। শিক্ষক মশাই বললেন, তোমার নাম বল।

ছেলেটি কি বলল তা বোঝা গেল না। শিক্ষক তখন বললেন, আবার বল, জোরে বল। ছেলেটি তখন খুব জোরে চিৎকার করে বলল, 'চার বোভারী।'। ছেলেরাও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করতে লাগল নামটা। চিৎকারটা ক্রমে কমে গেলে এখানে সেখানে চাপা গলায় অনেকে হাসতে লাগল।

অবশেষে শিক্ষক মশাইএর ধমকানিতে গোলমাল থেমে গেল। শিক্ষক তখন নিজে নামটা উচ্চারণ করে বললেন 'চার্লস বোভারী।' তারপর বসতে বললেন ছেলেটিকে। ছেলেটি বসলে তাকে বললেন, 'কি খুঁজছ?' ছেলেটি বলল, 'আমার টু—'।

ছেলেটিকে আরো দু ঘণ্টা থাকতে হয়েছিল ক্লাসে। ছেলেরা তার মুখে ক্রমাগত কালি ছিটিয়ে দিচ্ছিল আর সে তাই মুছে ফেলছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে দেখা গেল ছেলেটি প্রচুর যত্নের সঙ্গে কষ্ট করে পড়া তৈরি করছে। মাঝে মাঝে অভিধান দেখছে। এই পরিশ্রমের জন্য তাকে এক ক্লাস নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়নি। ব্যাকরণে তার কিছু জ্ঞান থাকলেও তার অনুবাদের কাজ ভাল হত না। গ্রামের পুরোহিতের কাছে সে প্রথমে লাতিন শেখে। তার কৃপণ বাবা মা অনেক দেরীতে স্কুলে পাঠাল।

তার বাবা মঁসিয়ে চার্লস ডেনিস বার্থোলোম বোভারী প্রথমে এক সামরিক সার্জেনের সহকারী ছিলেন। পরে কোন এক দুর্নীতির ব্যাপারে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি দেখতে খুব ভাল ছিলেন বলে কোন এক ব্যবসায়ীর মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে যায় আর তার সুযোগ নিয়ে বিয়েতে ষাট হাজার ফ্রাঁ যৌতুক আদায় করেন। তিনি দেখতে বেশই সুন্দর ছিলেন। তাঁর লম্বা গালপাট্টা গাল পার হয়ে মোচের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তাঁর পোষাকের জৌলুস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো ছিল আংটিতে ভর্তি। বিয়ের পর দুই বছরের মধ্যেই যৌতুকের প্রায় সব টাকাই খরচ করে ফেলেন। তিনি খাওয়া পরা আমোদ-প্রমোদে প্রচুর টাকা খরচ করতেন। রোজ সকালে অনেক দেরী করে উঠতেন। বড় বড় পোর্সিলেন পাইপ খেতেন। বেশীর ভাগ সময় কাফে রেস্তোরাঁয় কাটাতেন।

তাঁর শ্বশুর মারা গেলে দেখা গেল টাকাকড়ি কিছুই রেখে যাননি। এতে তিনি রেগে যান। এদিকে সব সঞ্চয় ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি কাপড়ের ব্যবসা করেন। কিন্তু বেশ কিছু টাকা লোকসান হওয়ায় সে কারবার ছেড়ে দেন।

এর পর চাষের কাজের জন্য গাঁয়ের বাড়িতে চলে যান তিনি সপরিবারে। কিন্তু চাষের কাজে কোন জ্ঞান ছিল না তাঁর। তাছাড়া চাষের কাজের থেকে বেড়ানো ও শিকারে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। ঘোড়াগুলোকে লাঙল টানার কাজে না লাগিয়ে তাতে চেপে ঘুরে বেড়াতেন। মুরগীর চাষ করতে গিয়ে প্রায়ই ভাল ভাল মোরগ-মুরগীগুলো খেয়ে ফেলতেন। প্রায়ই শূয়োর মেরে তার চর্বি দিয়ে শিকারের জুতো পালিশ করতেন তাই দিয়ে। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তাঁর দ্বারা কোন লাভজনক কারবার হবে না। অবশেষে তিনি নর্ম্যাণ্ডির সীমান্তে অবস্থিত একটা গাঁয়ে বছরে ছশো ফ্রাঁতে একটা বাড়ি ভাড়া করে তাতে বাস করতে লাগলেন। বাড়ির অর্ধেকটা খামার, অর্ধেকটা বাগান। এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সব কিছুর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে দিতে নিজেকে গুটিয়ে নেন মঁসিয়ে বোভারী। একদিন তাঁর স্ত্রী পাগল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর জন্য। আজ তিনিও মোহমুক্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর ভালবাসায় ভাটা পড়েছে। তিনি সব সময় সংসারের কাজকর্ম করে আর ঝি চাকরদের তদারক করে সময় কাটান।

এমন সময় একটি সন্তান হলো তাঁদের। প্রথমে সে সন্তানকে এক ধাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পরে সে বাড়িতে বাবা মার কাছে ফিরে এলে মা তাকে রাজপুত্রের মত যত্নে মানুষ করতে চাইল। কিন্তু বাবা চাইল ছেলেকে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে মানুষ করতে। বাবা চাইল তার ছেলে কৈশোর শিশুরূপে খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াক। তার শোয়ার ঘরে আগুন থাকবে না। স্পার্টানদের মত গড়ে উঠুক। মঁসিয়ে বোভারী কোন মতেই চাইতেন না তাঁর স্ত্রী অত্যধিক আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিক।

কিন্তু বাবার শত কড়াকড়ি সত্ত্বেও মার আদরে ছেলে সারা গাঁয়ে ছুটে বেড়াত মাঠে ঘাটে। অনেক সময় পাখি ধরতে যেত। খালের ধারে কালো জাম গাছে উঠে জাম পাড়ত। চার্লসএর বয়স বারোতে পা দিতে মা ছেলের জন্য গাঁয়ের যাজককে গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। যাজকের নাম ছিল লে কুরে।

শোবার ঘরে ছেলের পড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। যাজক কুরে সেই ঘরে চার্লসকে পড়াতেন। কিন্তু পড়া মোটেই হত না। ঘরটা বেশ গরম থাকায় চার্লস প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ত আর লে কুরেও তখন কোলের উপর হাত দুটো জড়ো করে ঢুলতেন, মাছি উড়ত ওদের মুখের আশপাশে। অনেক সময় লে কুরে যখন মাঠ দিয়ে অথবা গাঁয়ের পাশ দিয়ে কোথাও যেতেন আর চার্লস এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াত তখন কুরে কাছে ডাকতেন তাঁর ছাত্রকে। কথা বলতেন তার সঙ্গে। তবে হঠাৎ বৃষ্টি এলে অথবা কোন পরিচিত পথিক এসে গেলে বাধা পড়ত তাদের কথায়।

ছেলের পড়াশুনো ভাল না হওয়ায় মার উদ্বেগ বেড়ে গেল। তিনি চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু মঁসিয়ে বোভারীর সেদিকে কোন হুঁস ছিল না। প্রথমে স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য করেননি। কিন্তু স্ত্রীর ক্রমাগত চাপে বাধ্য হয়ে ছেলেকে রুয়েনে লাইসীতে পড়তে পাঠালেন। রুয়েনের নূতন পরিবেশে চার্লস ভালই পড়াশুনো করতে লাগল। তার স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন গাঁতেরিক নামে এক লোহার কারবারী। পড়ার সময় পড়া আর অবসর সময়ে খেলা করে বেড়াত চার্লস। খাওয়া দাওয়া ঘুম কোন কিছুর অসুবিধা হত না তার। কিন্তু লাইসীতে পড়া শেষ না হতেই বাপ-মার মত পাল্টে গেল। তাঁরা তাকে ডাক্তারি পড়তে পাঠালেন। মা নিজে গিয়ে ছেলের থাকার ঘর ঠিক করে দিয়ে এলেন। কিন্তু পড়ার বিষয় দেখে ছেলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। শরীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিদ্যা ও ওষুধের বই ছাড়াও তাকে পড়তে হবে জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা। এ সব বিষয় কিছুই বোঝে না চার্লস। এ সব বিষয়ে ক্লাসে অধ্যাপকদের বক্তৃতা সে বুঝত না। অথচ চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না তার। সে তার খাতায় ক্লাসের বক্তৃতা সব নোট করত, হাসপাতালে ঘুরে বেড়াত। বাড়িতে পড়ত। শুধু খেটেই যেত, কিন্তু ময়দার কলের ঘোড়ার মত বুঝত না সে কি চূর্ণ করে চলেছে।

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রিতে তার বাড়িওয়ালা তাকে যা খেতে দিত তাই খেত। খাওয়ার পর জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত নৈশ শহরটার পানে। সবচেয়ে ভাল লাগত গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলো। বাড়ির কাছ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাওয়ায় এ জায়গার মনোহারিত্বটা যেন বেড়ে গেছে। নদীটার জন্য রুয়েনের এই অংশটা ভেনিসের মত দেখায়। বিভিন্ন কলকারখানার কর্মচারিরা নদীর ঘাটে হাত ধুত। একটু আগে নদীর ওপারে সূর্য অস্ত গেছে। তবু ভাল লাগত না চার্লস-এর। তার কেবলি মনে হত রুয়েনের এ জায়গাটা যত ভালই হোক ঠিক এই সময় গ্রামাঞ্চলগুলো কত সুন্দর রূপ ধারণ করে। এখন হয়ত কত ফুল ফুটেছে। সে ফুলের গন্ধে বাতাস কত মন্থর। আকাশটা সেখানে কত উজ্জ্বল। সেই জানালার ধারে বসে এক ঝলক সুগন্ধি বাতাসের জন্য তার উন্মুখ নাসারন্ধ্রটা প্রসারিত করে দিত চার্লস।

দিনে দিনে কেমন যেন লম্বা আর রোগা হয়ে উঠতে লাগল চার্লস-এর চেহারাটা, মুখে কেমন এক সকরুণ ভাব। তার স্বভাবগত চঞ্চলতার জন্য কোন সংকল্পই পূরণ করতে পারত না চার্লস। দিনে দিনে পড়াশুনোয় আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে লাগল সে। কুঁড়ে হয়ে যেতে লাগল। ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দিল। অথচ ক্লাসে না গিয়ে কাফেতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থেকে প্রচুর আনন্দ পেত সে। আধো আলো আধো অন্ধকারে ভরা সেই কাফের একটি বদ্ধ ঘরে জীবনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষিত আনন্দকে সে যেন

খুঁজে পেত। সে ঘরের দরজায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কত কবিতা কত গান কণ্ঠ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে আসত তার।

ডাক্তারি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারল না চার্লস। এটা যেন সে জানত, তাই একেবারেই আশ্চর্য হলো না নিজের অকৃতকার্যতায়। অথচ এই পরীক্ষার সাফল্যের জন্য কত অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন তার বাবা।

রুয়েন থেকে সোজা পায়ে হেঁটে বাড়ি চলে গেল চার্লস। কিন্তু লজ্জায় বাড়িতে ঢুকতে পারল না। গাঁয়ের বাইরে থেকে একজনকে দিয়ে মাকে ডেকে পাঠাল। মা এলে সব তাকে বুঝিয়ে বলল চার্লস। মা বুঝলেন। সব দোষ পরীক্ষকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে ছেলেকে সান্ত্বনা দিলেন।

মার উৎসাহে নূতন উদ্যমে পড়াশুনো শুরু করে দিল চার্লস। সব পড়া ভাল করে মুখস্থ করে ফেলল। এবার পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করল সে। তার এই সাফল্য উপলক্ষ্যে গাঁয়ের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন মা।

ডাক্তার ত হলো। কিন্তু কোথায় ডাক্তারি করবে?

ঠিক হলো তোস্তে নামে এক আধা শহর একটা জায়গা আছে সেখানে অতি বৃদ্ধ এক ডাক্তার আছে। চার্লসএর মা ঠিক করেছিলেন তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার জায়গায় গিয়ে বসবে তাঁর ছেলে। পরিকল্পনামত সেখানে চলে গেল চার্লস।

কিন্তু সেখানে একা একা মন টিকবে না ছেলের। তাই সঙ্গে সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থাও করলেন। পাত্রী যোগাড়ের জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। অবশেষে মেয়েও একটি যোগাড় করলেন। কোন এক সম্প্রতিমৃত ব্যবসাদারের বিধবা স্ত্রী মাদাম ডুবাক। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স। দেখতে যেমন কুৎসিত, চেহারা তেমনি রোগা। নিদাঘের দগ্ধ প্রান্তরের মত মুখে অসংখ্য দাগ। এই পাত্রী পাবার জন্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয় করতে হয়েছে।

চার্লস ভেবেছিল বিয়েতে তার ভাগ্যোন্নতি ঘটবে। বিয়েতে যে টাকা পয়সার স্বচ্ছলতা আসবে তাতে তার স্বাধীনতাকে আরো ভাল করে উপভোগ করতে পারবে সে। কিন্তু বিয়ের পর দেখা গেল তার সে স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে গেল অনেকখানি। সে কোথায় কোন ভোজসভায় যাবে, কোথায় কি খাবে তা ঠিক করে দিতে লাগল তার স্ত্রী। তার প্রতিটি গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখত তার স্ত্রী। তার রোগী দেখার ঘরে কোন মেয়ে এলে কান পেতে সব কথা শুনত সে।

রোজ সকালে এক কাপ করে চকোলেট খেত মাদাম অর্থাৎ চার্লসএর স্ত্রী। তাছাড়া ঝি চাকরদের কাছে নানা রকমের সেবা ও পথ্যের বায়না লেগেই ছিল। দিনরাত প্রায় সব সময় শুয়ে থাকত মাদাম। কখনো বুকে ব্যথা, কখনো পেটে ও দেহের স্নায়ুতে যন্ত্রণা প্রভৃতি নানারকমের রোগের অভিযোগ লেগেই ছিল। তাকে যারা দেখতে আসত তারা চলে গেলে বড়

একা একা লাগত। সেই একাকীত্ব দুর্বিসহ হয়ে উঠত। আবার কোন লোক এলে রেগে উঠত। বলত, আমি কেমন করে মরি তাই দেখতে এসেছে। সারাদিনের কাজকর্মের পর সন্ধ্যের সময় চার্লস বাড়ি ফিরে এলে বিছানার ভিতর থেকে তার শীর্ণ হাত দুটো বার করে এনে গলার দুপাশে জড়িয়ে ধরত তার স্ত্রী।

অনুযোগের স্বরে বলত, তুমি আমাকে ভুলে যাচ্ছ। তুমি নিশ্চয় অন্য কাউকে ভালবাস। আমাকে তাই আগেই লোকে সাবধান করে দিয়েছিল, ও তোমাকে সুখী করতে পারবে না।

সব শেষে রোজ চার্লসএর কাছ থেকে একটা ভাল টনিক আর একটুখানি ভালবাসা চাইত তার স্ত্রী।

২

সেদিন রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় একটা গোলমাল শুনে হঠাৎ জেগে উঠল ওরা। একটা ঘোড়া এসে থামল ওদের সদর দরজার সামনে। ওদের বাড়ির ঝি দরজা না খুলে জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলল নবাগত লোকটির সঙ্গে।

লোকটি পাশের গাঁ থেকে এসেছে ডাক্তারকে নিয়ে যেতে। ঝি নাস্তেসী তখন উপর থেকে চাবি হাতে নেমে এসে আগন্তুককে চার্লসএর শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

লোকটি একখানি খামে ভরা চিঠি দিল চার্লসএর হাতে। বিছানায় বসে বালিশে হেলান দিয়ে সে চিঠি পড়ে দেখল চার্লস। নাস্তেসী আলো দেখাতে লাগল বিছানার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। চিঠিতে ডাক্তার মঁসিয়ে বোভারীকে অনুরোধ করা হয়েছে তাকে এখনি এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে লে বুরো নামে এক গ্রাম্য খামার বাড়িতে গিয়ে কোন এক আহত ব্যক্তির ভাঙ্গা পা জোড়া লাগাতে হবে। মাদাম বোভারী এতক্ষণ বিছানায় পাশ ফিরে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিল। এই অন্ধকার রাত্রিতে এত দূর পথ যেতে দিতে স্বামীকে কোনমতেই অনুমতি দিল না মাদাম। অবশেষে ঠিক হলো তিন ঘণ্টা পর চাঁদ উঠলে রওনা হবে চার্লস। ইতিমধ্যে লোকটি সেখানে ফিরে গিয়ে একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেবে। সে এগিয়ে এসে চার্লসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ও খামার বাড়ির গেটগুলি খুলে দেবে।

যথাসময়ে অন্ধকার আকাশে চাঁদ উঠলে ভারী কোট পরে তার নিজস্ব ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো চার্লস। চোখে তার ঘুম জড়িয়ে ছিল তখনো। পথের মাঝে চাষীদের কাটা খাল পার হবার সময় মাঝে মাঝে ঘোড়াটা থমকে দাঁড়াচ্ছিল।

তখন ভোর চারটে বাজে। চারদিক ফর্সা হয়ে আসছিল। একটু আগে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। পাতাঝরা আপেল গাছগুলোতে

তখন পাখিরা স্তব্ধ হয়ে বসেছিল আর মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটাচ্ছিল ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে। যতদূর দৃষ্টি যায় চোখে পড়ে শুধু দিগন্তব্যাপী ফাঁকা মাঠ। আর মাঝে মাঝে দেখা যায় দু একটা খামারবাড়ি আর তাদের ঘিরে কিছু গাছের জটলা। যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ভোরের আলো, ধীরে ধীরে তন্দ্রা ঝেড়ে ফেলে ততই স্বচ্ছ হয়ে উঠছিল তার চোখের দৃষ্টি, ততই বর্তমান পরিবেশচেতনার সঙ্গে তার অতীত অভিজ্ঞতা মিলে মিশে এক মিশ্র জটিল অনুভূতির সৃষ্টি করছিল চার্লসএর মনে। কিছুদিন আগে যে হাসপাতালে সে ছাত্র হিসাবে ছিল তার কথা মনে পড়ছিল। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছিল তার স্বামী হিসাবে কর্তব্যের কথা, ডাক্তার হিসাবে যে ভাঙা পা জোড়া লাগাতে যাচ্ছে তার কথা। আশপাশের খামারবাড়ির হাঁস-মুরগীর বিচিত্র গন্ধের সঙ্গে শিশিরভেজা বাতাসের গন্ধ ভেসে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার কানে ভেসে আসছিল যেন অদূরবর্তী অতীতের হাসপাতালের রোগীদের সকালের বিছানা থেকে মশারী তোলার শব্দ।

চার্লস হঠাৎ দেখতে পেল একটা ছেলে বসে রয়েছে পথের ধারে। ছেলেটা নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করল তাকে, 'আপনিই কি ডাক্তার?' চার্লস তার উত্তর দিলে ছেলেটি তার কাঠের জুতো হাতে করে তার সামনে ছুটে ছুটে এগিয়ে যেতে লাগল।

ছেলেটির কাছ থেকে একে একে প্রশ্ন করে জানতে পারল চার্লস যার ভাঙা পা সে জোড়া লাগাতে যাচ্ছে তিনি একজন এ অঞ্চলের ধনী চাষী। সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। গত সন্ধ্যায় তিনি তাঁর কোন এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে উৎসব শেষে বাড়ি ফেরার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি বর্তমানে বিপত্নীক। স্ত্রী মারা যাওয়ায় সংসারের সব ভার তাঁর একমাত্র সন্তান তাঁর কন্যাই বহন করে চলেছে।

খামার বাড়িতে ঢুকেই চার্লস বুঝতে পারল এ খামার কোন সংগতিসম্পন্ন চাষীর। শিশিরভেজা ঘাসে ঘোড়ার পা পিছলে যাচ্ছিল। অপরিচিত লোক দেখে খামারের কুকুরগুলো চীৎকার করতে লাগল। পথের দুপাশের গাছগুলোর ডালপালা পথের উপর ঝুঁকে পড়ায় মাথা নত করে যাচ্ছিল চার্লস।

খামারটা সত্যিই খুব বড়। আস্তাবলে বড় বড় চাষের ঘোড়া দেখা যাচ্ছিল। ওধারে এক জায়গায় ছিল এক বিরাট গোময়ের স্তূপ। চাষের জন্য দুটো বড় গাড়ি আর চারটে লাঙল একজায়গায় জড়ো করা ছিল। এছাড়া ছিল প্রচুর মুরগীর ছানা আর ভেড়ার পাল। আর অবশেষে খামারের শোভা সবচেয়ে বাড়িয়ে চার পাঁচটা ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিকটবর্তী একটা পুকুরে রাজহাঁস চরছিল।

ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাড়ি থেকে এগিয়ে এল নীল পোষাকপরা এক যুবতী মেয়ে। মেয়েটি ডাক্তারকে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে

অন্দরমহলে নিয়ে গেল। রান্নাঘরের ভিতর একটা বড় অগ্নিকুণ্ড জ্বলছিল। সেই আগুনের আভায় রান্নাঘরের বাসনপত্রগুলো চকচক করছিল। চার্লস বুঝতে পারল প্রাতরাশের জন্য খাবার প্রস্তুত হচ্ছে।

রোগী দেখার জন্য সোজা উপরতলায় উঠে গেল চার্লস। রোগীর ঘরে ঢুকে দেখল রোগী শুয়ে আছে বিছানায়। রোগীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। বেঁটে খাটো শক্ত চেহারার মানুষ। দেখে বেশ সাহসী মনে হয়। কিন্তু পা ভেঙে খুব কাতর হয়ে পড়েছে। বিছানার পাশে একটা টেবিলে মদের পাত্র নামানো ছিল। যন্ত্রণা উপশমের জন্য তার থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছিল প্রায়ই। আর মাঝে মাঝে অভিশাপ দিচ্ছিল ভাগ্যকে। ডাক্তারকে দেখে রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগল।

হাড়ভাঙার ব্যাপারটা এমন কিছু জটিল নয়। রোগীর পা পরীক্ষা করে চার্লস তা সহজেই ঠিক করে দিল। ঠিক করতে গিয়ে হাসপাতালের শিক্ষকদের কথা মনে পড়ল তার। নানারকম রসিকতার কথা বলে রোগীকে সাহস দিতে লাগল চার্লস। ঝি ছাড়াও রোগীর যুবতী মেয়ে এম্মা সাহায্য করতে লাগল তাকে। হাতের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জুগিয়ে দিতে লাগল। এম্মার হাতগুলো দেখতে বেশ ভাল না হলেও তার আঙুলের নখগুলো বেশ সাদা আর চকচকে। তার চেহারার মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু হলো তার চোখ। তার চোখদুটি বাদামী রঙের হলেও সে যখন স্থির দৃষ্টিতে তাকাত কারো পানে তার চোখের লম্বা পাতাগুলোর জন্য কেমন যেন কালো মনে হত তার চোখদুটিকে।

রোগীর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ শেষ হয়ে গেলে রোগী অর্থাৎ গৃহকর্তা নিজে ডাক্তারকে কিছু খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করল। যাবার আগে অবশ্যই কিছু খেয়ে যেতে হবে।

উপর থেকে নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে নেমে এল চার্লস। মশারী খাটানো এক বড় বিছানার পাশে একটা টেবিলের দুপাশে দুটো চেয়ার পাতা। টেবিলের দুধারে নামানো ছিল দুটো রূপোর মগ। ঘরের এক কোণে জড়ো করা ছিল এক গাদা বস্তা। ঘরের দেওয়ালগুলো ছিল সবুজ রঙে রাঙানো। সেই সবুজ দেওয়ালের এক দিকে টাঙানো ছিল কালো পেন্সিল দিয়ে আঁকা মিনার্ভার একটি ছবি। ছবিটিই ঘরখানির সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। ছবিটির তলায় লেখা ছিল, 'বাবাকে'।

মাদমোজেল রুয়ালত্‌-এর সঙ্গে খেতে বসল চার্লস। খেতে বসে প্রথমে তারা রোগীর সম্বন্ধে কিছু কথা বলল। তারপর তারা আবহাওয়ার কথা, ভয়ঙ্কর শীতের কথা আলোচনা করতে লাগল। সেই সঙ্গে এম্মা বলল, রাত্রি বেলায় মাঠে নেকড়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই প্রসঙ্গে সে জানিয়ে দিল তার হাতে গোটা খামারটার ভার, অথচ তার গ্রাম্য-জীবন ভাল লাগে না।

চার্লস লক্ষ্য করল ঘরখানা ভীষণ ঠাণ্ডা। খেতে খেতে শীতে কাঁপছিল এম্মা। আরো লক্ষ্য করল, যখন কোন কথা বলার ছিল না তখন নিজের ঠোঁট কামড়াচ্ছিল এম্মা। এম্মার মাথার চুলগুলো দুটো বিনুনিতে বিভক্ত হয়ে মাথার দুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এম্মার সুন্দর গাল দুটোতে ছিল গোলাপী আভা। কোন নারীদেহের সৌন্দর্য এমন করে খুঁটিয়ে কোনদিন দেখেনি চার্লস। এ বিষয়ে কোন আগ্রহও ছিল না তার। জীবনে আজ প্রথম এক বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই সব দেখল।

খাওয়ার পর আবার একবার উপরে গিয়ে মঁসিয়ে রুয়ালতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল চার্লস। ফিরে এসে সেই ঘরের ভিতর ঢুকে দেখল জানালার শার্সির উপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এম্মা। চার্লসকে বিছানায় দরজার আশেপাশে চেয়ারের তলায় চারদিকে কিসের খোঁজ করতে দেখে এম্মা বলল, আপনি কি খুঁজছেন?

চার্লস বলল, আমার ঘোড়ার চাবুকটা।

এম্মা সেটা দেখতে পেয়েছিল। সে যখন সেটা নত হয়ে কুড়োচ্ছিল আর চার্লসও হাত বাড়িয়েছিল তখন চার্লসএর গায়ে এম্মার গাটা ঠেকল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে দাঁড়াল এম্মা। তারপর চাবুকটা যখন চার্লসএর হাতে দিয়ে দিল তখন সে তার পানে একবার তাকাল।

চার্লস কথা দিয়েছিল তিনদিন পর রোগীকে আবার দেখতে আসবে। কিন্তু পরের দিনই সে আবার এল লে বুরোর খামার বাড়িতে। এর পর সে সপ্তায় দুদিন করে নিয়মিত আসতে লাগল। এ ছাড়া যখন তখন সে চলে আসত। বলত এদিকে কাজ ছিল তাই একবার দেখতে এল।

যথাসময়ে রোগীর পায়ের হাড়টা জোড়া লেগে গেল। ছেচল্লিশ দিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল মঁসিয়ে রুয়ালত্‌। আগের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল খামারে। সবাই খুশি হলো ডাক্তারের যোগ্যতায়। মঁসিয়ে রুয়ালত্‌ ভাবল রুয়েন শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারও এত তাড়াতাড়ি তাকে সারিয়ে তুলতে পারত না।

লে বুরোর খামার বাড়িটা তার এত কেন ভাল লাগে, কেন সে এত ঘন ঘন সেখানে যায় একথা নিজেকে কোনদিন প্রশ্ন করেনি চার্লস। প্রশ্ন করলে হয়ত এর উত্তরে সে অনেক যুক্তি খাড়া করতে পারত। হয়ত বলত কাজটা গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং তার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য রোগীর প্রতি তার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আরো বলতে পারত তার এটা ব্যবসা এবং সে এখানে এই সঙ্গতি-সম্পন্ন রোগীকে দেখতে এলে মোটা ফী পাবে। তবু এতে আসল উত্তরটা পাওয়া যেত না। একটা কথা বলা হত না। বলা হত না কেন সে তার বৈচিত্র্যহীন নীরস নিরানন্দ জীবনে এই খামারবাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে পেত এক মধুর বৈচিত্র্যের আস্বাদ, পেত এক অনস্বভূতপূর্ব পুলকের বিরল রোমাঞ্চ।

যেদিন লে বুয়োর খামারে যাওয়ার মনস্থ করত চার্লস সেদিন সে খুব সকালে উঠত। ঘোড়া তৈরি করে রওনা হয়ে পড়ত। তারপর খামারবাড়ির সীমানায় পৌঁছেই ঘাসের উপর নেমে পড়ত। হাতে পরত কালো দস্তানা। খামারে আসার এই মুহূর্তটা বড় ভাল লাগত চার্লসএর। গেট খোলার শব্দ, পোষা পাখির ডাক, ছেলেদের কলরব—ছোটখাটো এই সব ঘটনাই মিষ্টি লাগত তার। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার 'পরিত্রাতা বা জীবনদাতা' বলে হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠত মঁসিয়ে রুয়ালত্। এম্মা থাকত রান্নাঘরে। উঁচু গোড়ালিওয়ালা কাঠের জুতো পরে এম্মা যখন হাঁটাহাঁটি করত তখন বেশ ঠকঠক শব্দ হত।

চার্লসএর যাবার সময় তার সঙ্গে এগিয়ে আসত এম্মা। চার্লসএর ঘোড়াটা আসতে দেরী করলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়টা দুজনে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত। বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটা চুকে গেলে দুজনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকত। মৃদু বাতাসে এম্মার মাথার চুল উড়ত, তার জামার আঁচলটা উড়ু উড়ু করত। মাঝে মাঝে বরফ পড়ত, বৃষ্টি পড়ত, আবার এক একসময় বরফ গলত।

প্রথম প্রথম কোন সন্দেহ করত না মাদাম বোভারী। ভাবত রোগী দেখতে যাচ্ছে চার্লস। মঁসিয়ে রুয়ালতের নামটা জেনে ফেলেছিল সে। কিন্তু সে যখন শুনল রুয়ালতের এক যুবতী মেয়ে আছে এবং মেয়েটি কনভেণ্ট থেকে পাশ করেছে আর তার সঙ্গে নাচ গান, ছবি আঁকা, পিয়ানো বাজানো সব কিছু শিখেছে তখন মনে মনে ঈর্ষা অনুভব না করে পারত না সে। তখন সে বুঝতে পারল গোটা ব্যাপারটা। বুঝতে পারল লে বুয়োর খামারবাড়িতে যাবার সময় কেন সহসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চার্লসএর মুখখানা। কেন সে বৃষ্টির সময়ও নূতন ওয়েস্টকোটটা পরে।

সঙ্গে সঙ্গে রুয়ালতের মেয়ে এম্মাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতে লাগল মাদাম বোভারী। প্রথম প্রথম আভাসে ইঙ্গিতে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করল চার্লসকে। চার্লস সে কথা মোটেই গ্রাহ্য না করায় পরে সরাসরি অভিযোগ করতে লাগল মাদাম। বলতে লাগল, মঁসিয়ে রুয়ালত্ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পরেও কেন সে যায় লে বুয়োর খামারবাড়িতে? এর জন্য ত সে কোন ফী পায় না। সে যায় কারণ সেখানে এমন একজন আছে যে শহুরে মেয়ের মত কথা বলতে পারে, কারণ সে খুব চতুর আর তার সাহচর্য উপভোগ করতে ভালবাসে বলেই চার্লস সেখানে প্রায়ই যায়।

চার্লস হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল কথাটা। উপহাসের ভঙ্গিতে বলল, রুয়ালতের মেয়ে এম্মা শহুরে মেয়ে। তার বাবা ঠাকুর্দা সব গ্রাম্য চাষী।

যাই হোক, এসব কথা শুনতে চায় না মাদাম। তাই পারিবারিক শান্তির খাতিরে খামারবাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিল চার্লস। প্রার্থনার [illegible] শপথ

করতে বাধ্য হলো সে। তবু অন্তরের সঙ্গে সে মেনে নিতে পারল না এ বিধান। এক নীরব প্রতিবাদে ও বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চাইল তার সমগ্র অন্তরাত্মা। সে বেশ বুঝতে পারল বাইরের এই অনুশাসন যত কঠোর হয়ে উঠছে ততই তার অন্তর আরো বেশী করে ভালবাসছে এম্মাকে। ততই তার স্ত্রীর কুৎসিত চেহারাটা প্রকট হয়ে উঠছে তার কাছে। উঁচু উঁচু দাঁতওয়ালা অস্থিচর্মসার তার স্ত্রীর চেহারাটা আগের থেকে বেশী খারাপ লাগল তার। সারা বছর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে রাখত মাদাম বোভারী। কালো মোজা আর বড় জুতো পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে যখন হাঁটত মাদাম তখন আরো খারাপ লাগত চার্লসএর।

চার্লসএর মা মাঝে মাঝে ছেলের সংসারে আসতেন। কিন্তু তিনিও পুত্রবধূর মতই জিহ্বার সমস্ত তীক্ষ্নতা দিয়ে আক্রমণ করলেন চার্লসকে। চার্লস অমিতব্যয়ী, যাকে তাকে চা খাওয়ায়। এটা তার ভীষণ অন্যায়।

এদিকে বসন্তকাল আসতেই বিষয়-সম্পত্তির দিক থেকে একটা বড় আঘাত খেল চার্লসএর স্ত্রী বিধবা দুবাক। মাদাম দুবাকের যত সব গচ্ছিত টাকা নিয়ে তার নোটারী বিদেশে পালিয়ে গেল। তখন খোঁজখবর নিয়ে চার্লসএর বাবা জানতে পারলেন দিয়েপ্পেতে মাদাম দুবাকের যে বাড়ি আছে সেটাও বন্ধক আছে। সে বাড়িতে সামান্য কিছু আসবাব ছাড়া আর কিছুই নেই। তাছাড়া বছরে ছ হাজার ফ্রাঁ সুদ পাবার যে কথা বলেছিল মাদাম দুবাক তাও মিথ্যা। একদিন চার্লসএর বাবা ও মা দুজনে তাদের বাড়িতে এলেন। তার বাবা চার্লসএর মার সামনে রেগে একটা চেয়ার ভেঙ্গে তাঁকে দায়ী করলেন। বললেন মা হয়ে তিনিই ছেলেকে একটা মিথ্যাবাদী বুড়ীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার সর্বনাশ করেছে। চার্লসএর স্ত্রী ভয়ে তার কোলের কাছে আশ্রয় চাইলে চার্লস তার পক্ষ অবলম্বন করলে রেগে তার বাবা মা চলে যায়।

এইখানেই শেষ নয়। এর পর চরম আঘাত নেমে এল মাদাম বোভারীর উপর। এক সপ্তার মধ্যেই হঠাৎ একদিন রক্তবমি করতে শুরু করল মাদাম। পরের দিন জানালার পর্দা টানতে গিয়ে একটা চিৎকার করে আর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস টেনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু ঘটল। এমন আকস্মিক ভাবে সব কিছু ঘটে গেল যে কেউ বিশ্বাস করতেই চাইবে না।

স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে বাড়িতে ফিরে এল চার্লস। নিচের তলায় কেউ তখন ছিল না। উপরে শোবার ঘরে চলে গেল সে। লেখার টেবিলের উপর ঝুঁকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একা একা বসে রইল। তার স্ত্রীর একটা পোষাক তখনও ঘরের আলনায় ঝুলছিল। বার বার শুধু একটা কথাই ভাবতে লাগল চার্লস, শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তার স্ত্রী তাকে ভালবাসত।

৩

মঁসিয়ে রুয়ালত্ তার ভাঙ্গা পা সারিয়ে দেবার জন্য ফী দিতে এলেন তার বাড়িতে। চার্লস-এর ফী হলো পঁচাত্তর ফ্রাঁ। তাছাড়া তিনি চার্লস-এর স্ত্রী বিয়োগের কথা শুনেছিলেন। তাই সেই সঙ্গে তাকে সান্ত্বনাও দিলেন।

রুয়ালত্ চার্লসএর কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন, আমি জানি আমি নিজে এ শোকের আঘাত ভোগ করেছি ; সুতরাং আমি জানি এ আঘাতের গুরুত্ব কতখানি। আমি যখন আমার স্ত্রীকে হারাই তখন আমি সোজা মাঠে চলে যাই। একটা গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে শোকে কাঁদতে থাকি। যত সব আজে বাজে কথা বলে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে থাকি। আমি তখন মৃত্যু কামনাও করেছিলাম। যখন আমার মনে হলো ঠিক এই মুহূর্তে কত লোক তাদের স্ত্রীদের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে আদর করছে তখন রাগে দুঃখে ক্ষোভে মাটির উপর আমার লাঠিটা ঠুকতে লাগলাম। আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না কতখানি অশান্ত হয়ে ওঠে তখন আমার মন। আমি একরকম খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করি। কোন কাফে বা চায়ের দোকানে যাবার কথা ভাবতেও পারতাম না। তারপর দিনে দিনে দিন যেতে লাগল। মাসের পর মাস। শীতের পর বসন্ত এল, এবং তারপর গ্রীষ্ম। এইভাবে শোকের বোঝাটাও ক্রমশই কমে আসতে লাগল। অবশ্য শোকের একটা অংশ চিরদিন বেঁচে থাকবে বুকের মধ্যে। তার থেকে নিষ্কৃতি কোনদিন পাওয়া যাবে না।

এই বলে নিজের বুকের উপর হাত রাখল রুয়ালত্। তারপর আবার বলতে লাগল, এ শোক আমাদের সকলের জীবনেই আসে মঁসিয়ে বোভারী। একথা মনেই প্রশ্রয় দেবেন না। একজন মানুষ মরে গেছে বলে আপনি নিজের মৃত্যু কামনা করবেন না। আপনি আমাদের ওখানে চলে আসুন। আমার মেয়ে প্রায়ই প্রতি ক্ষণে আপনার কথা বলে। বলে আপনি আমাদের ভুলে গেছেন একেবারে। শীঘ্রই বসন্ত আসছে। আপনাকে নিয়ে আমি শিকারে বার হব। দেখবেন মন থেকে সব দুঃখের বোঝা কোন দিকে উবে গেছে।

এ পরামর্শ মেনে নিল চার্লস। অনেক দিন পর আবার সে লে বুরোতে গিয়ে হাজির হলো। দেখল সব ঠিক আছে আগের মতই। দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে গেলেও তার মনে হলো সে যেন গতকাল গিয়েছিল সেখানে। দেখল পীয়ার গাছগুলো ফোটা ফুলে ভরে উঠেছে। মঁসিয়ে রুয়ালত্ চারদিকে ছোটা-ছুটি করে জায়গাটাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

মঁসিয়ে রুয়ালত্ হাঁকডাক করে এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলেন যাতে মনে হবে মঁসিয়ে বোভারী নূতন এসেছে এই খামারবাড়িতে। যেন শুধু তার মনটাই শোকদুঃখ জর্জরিত নয়। তার দেহটাও অসুস্থ। তাই তিনি রান্নাঘরে গিয়ে বললেন, ওঁর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করো।

খাবার আগে একবার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল বোভারীর। কিন্তু রুয়ালতের

কথায় সে হাসতে লাগল। খাবার পর সে স্ত্রীর কথাটা ভুলে গেল।

নূতন জীবনধারার সঙ্গে যতই খাপ খাইয়ে নিতে লাগল নিজেকে ততই স্ত্রীর কথাটা মুছে যেতে লাগল বোভারীর মন থেকে। স্বাধীন জীবনযাপনের আনন্দ ক্রমে সহনশীল করে তুলল তার নিঃসঙ্গতাকে। এখন সে ইচ্ছামত খাওয়ার সময় পরিবর্তন করতে পারে, বিছানায় যখন তখন পা ছড়িয়ে শুতে পারে। এখন কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে যেখানে সেখানে যেতে পারে। ফলে চিকিৎসা ব্যবসারও উন্নতি হলো। আগের থেকে আরো বেশী করে রোগী দেখতে যেতে লাগল। আরো বেশী রোগী আসতে লাগল তার কাছে। তার নামযশ বেড়ে গেল। তখন সে লে বুরোর খামারবাড়িতেও ইচ্ছামত যে কোন সময়ে যেতে পারে। অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট সুখের এক কুয়াশাঘেরা আশা মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে লাগল সব সময়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াবার সময় চার্লসএর মনে হতে লাগত সে যেন আগের থেকে বেশী সুন্দর হয়ে উঠেছে।

একদিন বেলা তিনটের সময় সে হঠাৎ খামারবাড়িতে এল। এসে দেখল তখন সকলেই মাঠে গেছে। রান্নাঘরে গিয়ে প্রথমে এম্মাকেও দেখতে পেল না। জানালাগুলো বন্ধ থাকলেও স্বল্প ফাঁক দিয়ে সূর্যের ছটা এসে ঘরের মেঝের উপর লম্বা লম্বা রশ্মি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ছটায় আগুনে পোড়া কাঠের ছাই-গুলোকে নীলচে মখমলের মত দেখাচ্ছে। টেবিলের উপর রাখা গ্লাসগুলোতে মাছি ভন ভন করছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল চার্লসএর একটা জানালা আর উনোনের মাঝখানে বসে এম্মা একমনে বসে কি সেলাই করছে। তার অনাবৃত ঘাড়টায় বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে।

গ্রাম্য প্রথানুসারে এম্মা চার্লসকে কিছু পানীয় দিল। চার্লস তা খেল না। এম্মা জেদ ধরল। অবশেষে হেসে বলল, এস দুজনে খানিকটা মদ খাই। সে তখন কাপবোর্ড থেকে একটা মদের বোতল আর একটা উঁচু তাক থেকে দুটো গ্লাস এনে একটা গ্লাসে একগ্লাস মদ আর একটা গ্লাসে সামান্য একটুখানি মদ ঢালল। তারপর ভর্তি গ্লাসটা চার্লসকে দিয়ে নিজে প্রায় খালি গ্লাসটা চার্লস এর গ্লাসে ঠেকিয়ে খেতে লাগল।

সামান্য মদটুকু খেয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল এম্মা। আবার তার সেলাইএর কাজে মন দিল। সে কার জন্য একটা সাদা মোজা বোনার চেষ্টা করছিল। দুজনেই চুপচাপ। চার্লস বসে বসে দেখতে লাগল দরজার কাছে দমকা হাওয়ায় কিছু ধুলো উড়ে আসছে। বাইরে থেকে ডিমপাড়া মুরগীদের ডাক ভেসে আসছে। এম্মা গরম সহ্য করতে না পেরে হাত দিয়ে মাঝে মাঝে পাখা করে তার গাল দুটোকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছিল।

এক সময় এম্মা অভিযোগ করল চার্লসএর কাছে। গরমে তার খুব খারাপ লাগছে। তারপর জিজ্ঞাসা করল এই গরমে সমুদ্রস্নানে কোন সুবিধা হবে

কি না। এর পর দুজনেই তারা আপন আপন স্কুল জীবনের কথা বলল। সে কথা শেষ হতে ওরা উপর তলায় চলে গেল। এম্মা তার ঘরে চার্লসকে নিয়ে গিয়ে তার গানের খাতাগুলো দেখাতে লাগল। আগে গান শিখত এম্মা। গানের প্রতিযোগিতায় কয়েকবার পুরস্কারও পেয়েছে। ওকপাতার শুকনো মালাগুলো কাপ বোর্ডের তলা থেকে বার করে দেখাল। এর পর এম্মা বলল তার মার কথা। সঙ্গে সঙ্গে চার্লসকে সঙ্গে করে সে নিয়ে গেল তাদের বাগান-সংলগ্ন কবরখানায়। এম্মা বলল সে প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার নিজের হাতে ফুল তুলে সমাধিতে দেয়।

কথায় কথায় এম্মা বলল; শীতকালটা শহরে থাকতে তার ভাল লাগে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলল, গ্রীষ্মকালের দুপুরটাও গাঁয়ের বাড়িতে অসহ্য। দুপুরটা যেন কাটতেই চায় না। বড় বিরক্তি লাগে। তার কথা বলার ভঙ্গিটা বড় ঋজু এবং স্পষ্ট। তবে মাঝে মাঝে কেমন ক্লান্তির ভাব ফুটে ওঠে। কিন্তু এম্মার মুখে কোন ভাব স্থায়ী হয় না। হর্ষবিষাদের আলোছায়ায় প্রায়ই কেমন যেন দোলায়িত হয় তার মন আর মুখটা। এক মুহূর্তে তার যে চোখ-দুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে আনন্দের উত্তেজনায় পরমুহূর্তে তার সেই চোখদুটোই সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে তার বিরক্তি আর বিষাদে। সঙ্গে সঙ্গে তখন মনটা চলে যায় সংশ্লিষ্ট স্থান ছেড়ে বহু দূরে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় চার্লস এম্মার কথাগুলো আপন মনে ভেবে দেখতে লাগল। তার প্রতিটি কথার অর্থ বুঝে তা মনে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। তার কেবলি একটা কথা মনে হতে লাগল, তাদের দেখা হওয়ার আগে এম্মা কিভাবে দিন কাটাত। পরে সে ভাবল এম্মাকে প্রথম যেদিন দেখেছিল আজও ঠিক তেমনিই দেখছে। তার কোন পরিবর্তন হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগল, এম্মা কি বিয়ে করবে? করলে কাকে করবে? তার বাবা ধনী, তার উপর তার রূপ আছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরন্ত লাট্টুর বনবন শব্দের মত কে যেন তার কানের মধ্যে গুন গুন সুরে বার বার একটা কথা বলে যেতে লাগল, তুমি তাকে বিয়ে করছ না কেন?

সে রাতে একটুও ঘুমোতে পারল না চার্লস। মনে হতে লাগল তার গলাটা যেন প্রায়ই শুকিয়ে যাচ্ছে। সে উঠে জল খেল। জল খেয়ে জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে রইল। দেখল আকাশে অসংখ্য তারা ঝিকমিক করছে। গরম বাতাস বয়ে আসছে। দূরে একদল কুকুর চিৎকার করছে। হঠাৎ কি মনে হলো সেই গভীর রাতেই সে লে বুরোর পথে রওনা হয়ে পড়ল।

সে ভাবল সুযোগ বুঝে এবং সুযোগ পেলে কথাটা সে বলবে। হোক না হোক বলে দেখতে ত কোন দোষ নেই। কিন্তু অনেক সময় সুযোগ পেলেও পাছে সদুত্তর না পায় এই ভয়ে কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না চার্লস। তার গলায় আটকে যেতে লাগল কথাটা।

কেউ তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে গেলে মঁসিয়ে রুয়ালত্ মোটে অসন্তুষ্ট হবেন না, কারণ তাঁর মতে তাঁর মেয়ে কোন দিক দিয়েই তাঁকে সাহায্য করে না খাবারের কাছে। তিনি মনে করেন মেয়েটা নিজেকে এমনই বুদ্ধিমতী মনে করে যে চাষের কাজ মোটেই পছন্দ করে না। কারণ এ কাজে টাকা নেই। এতে লক্ষপতি হবার কোন উপায় নেই। কথাটা সত্যি। মঁসিয়ে সারা বছর এত খেটেও অর্থ সঞ্চয় ত দূরের কথা, প্রতি বছর লোকসান হচ্ছে। মঁসিয়ে রুয়ালত্ চাষের কাজ ভাল বোঝেন, কোথায় কি কি দরে বিক্রি হয় তাও জানেন, তবু সব কিছু সত্ত্বেও বোকা বনে যান, কারণ বেশী ফসল ফলানো তাঁর দ্বারা কিছুতেই হয়ে ওঠে না। তিনি পরিচালনার ব্যাপারে কোন লোক কখনো নিযুক্ত করেন না। যা কিছু করেন সব নিজে। তাছাড়া বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও তিনি চিরাচরিত প্রথাকেই মেনে চলেন। তার কোন উন্নতি বিধান করেন না। তিনি রোজ রান্নাঘরে একভাবে আগুনের সামনে পাতা টেবিলটায় একা একা খেতে বসেন। বাঁধা রঙ্গমঞ্চের মত যে টেবিল যুগ যুগ ধরে পাতা আছে সে টেবিলের নড়চড় করেন না কোনদিন।

তিনি এটা বেশই লক্ষ্য করেছিলেন যে চার্লস তাঁর মেয়ের কাছে এক আসক্তিসিক্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মেয়ের প্রতি চার্লসএর একটা দুর্বলতা দানা বেঁধে উঠছে দিনে দিনে এবং সে একদিন তাঁর মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে চাইবেই। তাই তিনি এর আগেই ব্যাপারটা ভেবে রেখেছিলেন আপন মনে। অবশ্য চার্লস তাঁর মনের মত আদর্শ জামাতা নয়। তবু তার কিছুটা পৌরুষ আছে, সে মিতব্যয়ী, সুশিক্ষিত, ভদ্র এবং সবচেয়ে বড় কথা যে যৌতুকের জন্য তাঁকে পীড়াপীড়ি করবে না। তাছাড়া তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁর কিছু ঋণ আছে এবং তার পরিশোধের জন্য বাইশ বিঘে জমি বিক্রি করে দেবেন। সুতরাং এই সময় যদি চার্লস তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য তাঁকে ধরে তাহলে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। বিয়েটাও সেই সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

অক্টোবরের প্রথম দিকে একবার চার্লস তিন দিন লে বুরোর খামার বাড়িতে কাটাল। তিনটি দিনই পর পর কেটে গেল। তবু কথাটা বলতে পারল না মঁসিয়ে রুয়ালত্কে। তৃতীয় দিনের শেষে বাড়ি যাবার জন্য রওনা হলো চার্লস। রুয়ালত্ তাকে এগিয়ে দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে কিছুদূর গেল। খামারের সীমানা পার হয়ে একটা ঝোপের ধারে থমকে দাঁড়াল চার্লস। বলল, মঁসিয়ে রুয়ালত্, আমার একটা কথা আছে।

মঁসিয়ে রুয়ালত্ দাঁড়িয়ে পড়লেন। চার্লস চুপ করে রইল।

রুয়ালত্ হেসে বললেন, আপনার যা মনে আছে বলে ফেলুন। আমি সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি।

মঁসিয়ে রুয়ালত্,...মঁসিয়ে রুয়ালত্...চার্লস আমতা আমতা করে বলতে

লাগল। কিন্তু আসল কথাটা বলতে পারল না।

রুয়ালত্ নিজেই তখন কথাটা তুললেন। বললেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। মনে হয় আমার মেয়েও এতে অমত করবে না। তবু তাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। তার মত নিতে হবে। যাই হোক, আমি এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাব। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। তোমাকে আর ফিরে যেতে হবে না। তাছাড়া মেয়েটাও বিচলিত হবে লজ্জায়। যদি সে মত দেয় তাহলে আমি একটা জানালার কপাট দিয়ে জোরে দেওয়ালে শব্দ করব। তুমি এখান থেকেই বাড়ির দিকে তাকালে তা দেখতে পাবে।

রুয়ালত্ চলে গেলে ঘোড়াটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল চার্লস। পথের উপর দাঁড়িয়ে রইল সে।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। তার পরেও হাত ঘড়িতে উনিশ মিনিট কেটে গেল। গণে দেখল চার্লস। তারপর একটা শব্দ হলো। চার্লস দেখল একটা জানালার কপাট জোরে ঘুরিয়ে দেওয়ালের উপর শব্দ করা হলো। কপাটটা এখনো কাঁপছে।

পরের দিন বেলা নটার সময় খামারবাড়িতে গেল চার্লস। সে সেখানে যেতেই এম্মা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। একটু হাসল। রুয়ালত্ তাকে আলিঙ্গন করল আন্তরিকতার সঙ্গে। তবে টাকা পয়সা বা দেনাপাওনার কথাটা তখন হলো না। এখনো অনেক সময় আছে। চার্লসএর শোকপালন পর্ব এখনো শেষ হয়নি। সুতরাং বিয়ে হবে আগামী বসন্তকালের কাছাকাছি। মাঝখানে গোটা শীতকালটা আছে।

মাদমোজেল রুয়ালত্ তার পোশাকের ফ্যাশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছু পোশাকের জন্য রুয়েনে অর্ডার দিল। এর পর থেকে চার্লস যখনই খামারে আসত তখনই এম্মার সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা হত। কোন্ ঘরে ডাক্তারকে থাকতে দেওয়া হবে, বিয়েতে কি কি আয়োজন করা হবে সে বিষয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হত।

এম্মার ইচ্ছা বিয়েটা হোক মধ্য রাত্রিতে। চারদিকে টর্চের আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। কিন্তু তার বাবা রুয়ালত্ সেকথা শুনবে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে হলো। মোট তেতাল্লিশ জন অতিথি নিমন্ত্রিত হলো বাড়িতে। তার মধ্যে বর ও কন্যাপক্ষের সব আত্মীয়স্বজনরাও ছিলেন। তিন দিন ধরে ভোজ ও উৎসব চলল বাড়িতে।

৪

নিমন্ত্রিত অতিথিরা এসেছিল বিভিন্ন রকমের গাড়িতে। কেউ এসেছিল এক-ঘোড়া টানা গাড়িতে, কেউ এসেছিল দু-ঘোড়া টানা গাড়িতে, কেউ

এসেছিল ছাউনি ছাড়া পুরনো আমলের গাড়িতে বা চামড়ার পর্দাঢাকা ভ্যান গাড়িতে, আর দূর গ্রাম থেকে অনেকে গরুর গাড়িতে করে এসেছিল। তারা এসেছিল প্রায় পঁচিশ মাইল দূরের গোদারভিল, নর্ম্যানভিল, ক্যালি প্রভৃতি গ্রাম থেকে। যে সব আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কিছু বিরোধ ও মন-কষাকষি ছিল এবং দীর্ঘদিন যাদের সঙ্গে দেখাশোনা হয়নি তাদের কাছেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

বিয়ের আগের দিন থেকে খামারবাড়ির অদূরের ঝোপটার ধার থেকেই গাড়ির শব্দ শোনা যেত। সেই সব গাড়ি খামারের গেট পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে থেমে যেত। সেই সব গাড়ি থেকে নামত বিভিন্ন বয়সের মেয়ে ও পুরুষ। সেই সব মেয়েদের পুরনে থাকত শহরের ধাঁচের গাউন আর মাথায় থাকত গ্রাম্য ধাঁচে বাঁধা চুল। পুরুষদের পরণে ছিল লম্বা ঝুলওয়ালা কোট অথবা এমন সব ফ্রক কোট যা সাধারণতঃ বাড়িতে তোলা থাকত এবং এই সব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যেই পরা হত।

মেয়রের অফিসটা ছিল খামার থেকে এক মাইলেরও কম। তাই চার্চের কাজ সেরে বরকনে হেঁটে শোভাযাত্রাসহ মেয়রের অফিসে গেল ও ফিরে এল।

প্রথম দিকে শোভাযাত্রাটা খুব ঘন ছিল। তারপর সবুজ ধানক্ষেতের সরু আলপথের উপর দিয়ে যাবার সময় শোভাযাত্রাটা খুব সরু হয়ে খণ্ড খণ্ড দলে ভাগ হয়ে গেল। শোভাযাত্রার সবচেয়ে আগে ছিল বেহালাওয়ালা, তার বেহালাটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল গলায়। তার পিছনে ছিল বরকনে। তাদের পিছনে তাদের আপন আপন পরিবারের আত্মীয়স্বজন, তারপর তাদের বন্ধু-বান্ধব। সবশেষে ছিল ছেলেমেয়েরা যারা আনন্দে সব সময় খেলাধূলায় ব্যস্ত ছিল।

এম্মার গাউনটা ছিল খুব লম্বা, মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল তার একটা অংশ, মাঝে মাঝে সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে মোটা শুকনো ঘাস আর চোরকাঁটাগুলো খুলে ফেলছিল। চার্লস তখন তার জন্য শুধু হাতে অপেক্ষা করল দাঁড়িয়ে। মঁসিয়ে রুয়ালত, লম্বা কালো কোট পরে যার ফলে হাতাগুলোতে তার আঙুলগুলো ঢাকা পড়ে গিয়েছিল আর মাথায় রেশমী টুপী পরে মাঝে মাঝে চার্লসএর বুড়ী মার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এদিকে মঁসিয়ে বোভারী একটি সুন্দরী যুবতী চাষী মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে সময় কাটাচ্ছিল। আর সবাইকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখছিলেন। তাঁর বিশেষ নজরের ঠেলায় চাষী মেয়েটি লজ্জায় বিব্রত হয়ে পরেছিল। শোভাযাত্রার অন্যান্য সকলে নিজেদের মধ্যে মজা করছিল। ওরা ইচ্ছা করলেই বেহালার বাজনা শুনতে পেত। কিন্তু বেহালা বাজাতে বাজাতে বেহালাবাদক অনেক দূরে এগিয়ে পড়েছিল। অবশেষে সে যখন শোভাযাত্রার লোকজনের অনেক পিছনে পড়ে গেছে তখন সে দাঁড়িয়ে বেহালার তার-গুলো বেঁধে সুর তালটা একটু দেখে নিল। বেহালার জোর বাজনা শুনে

আশপাশের গাছপালায় বসে থাকা পাখিগুলো ভয়ে উড়ে গেল অনেক দূরে।

ভোজসভা বসল গাড়ি রাখার বড় গ্যারেজটায়। গরু, ভেড়া, মুরগী ও শুয়োরের প্রচুর মাংসের আয়োজন করা হয়েছে। তার সঙ্গে আছে প্রচুর মদের ব্যবস্থা। অতিথিরা আপন আপন জায়গায় বসার আগেই গ্লাসগুলো মদ ঢেলে ভর্তি করে রাখা হয়েছে প্রতিটি আসনের সামনে। তার উপর শহরের ভাল দোকান থেকে আনা হয়েছে ভাল কেক আর পুডিং। পুডিংগুলোর উপরে আছে নূতন বরকনের নামের আদি অক্ষর। সবশেষে মঁসিয়ে রুয়ালত্ নিজে কষ্ট করে জেলা শহরে গিয়ে দুটি বড় বিয়ের জন্য বিশেষভাবে করানো কেক এনে হাজির করলেন টেবিলের উপর। সকলের বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টি পড়ল কেক দুটির উপর। একটা কেকের উপর ছোট আকারের কামদেবী ঝুলছিল আর তার উপর ছিল গোলাপ ফুলের কুঁড়ি।

ভোজসভা রাত্রি পর্যন্ত চলল। যারা অনেকক্ষণ বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তারা একবার উঠে বেড়িয়ে এল আবার অনেকে তাস খেলে এল। আবার অনেকে শেষের দিকে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। কিন্তু কফি পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অনেকে গান ও অভিনয় করতে লাগল আপন আপন ভঙ্গিতে। অনেকে নোংরা ভাষায় ঠাট্টা তামাশা করতে করতে তাদের স্ত্রীদের চুম্বন করতে লাগল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে অনেকে ঘোড়া বা গরুর গাড়িতে করে বাড়ি রওনা হলো গ্রাম্য পথে। যারা রয়ে গেল তারা রান্নাঘরে বসে মদপান করতে লাগল। তাদের ছেলেমেয়েগুলো মেঝের উপর যেখানে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

এই সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে মঁসিয়ে রুয়ালত্ সাধারণতঃ গ্রাম্য রসিকতার সুরে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক অসভ্য কথা বলে। এম্মা তা জানত বলে আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছিল তার বাবাকে। রুয়ালতের এক অল্পশিক্ষিত চাষী জ্ঞাতি ভাই তার মুখের জল ছড়িয়ে খেলাচ্ছলে কার সঙ্গে রসিকতা করছিল এমন সময় রুয়ালত্ এসে তাকে সাবধান করে দিল, তার জামাতা শিক্ষিত লোক, তার সামাজিক মর্যাদা আছে। সে এসব নোংরামি পছন্দ করে না। এতে জ্ঞাতি ভাই রেগে গিয়ে তার চার পাঁচ জন সঙ্গীর সঙ্গে জোট বেঁধে এক জায়গায় বসে রুয়ালতের নিন্দা করতে লাগল। বলল, রুয়ালত্ এখন শহুরে জামাই পেয়ে শহুরে হয়ে গেছে। তার পতন অনিবার্য।

চার্লসএর মা সারা দিন মুখ খোলেননি। তাঁর পুত্রবধূর পোষাক আশাক বা অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি তাঁর সঙ্গে। তাই তাঁর রাগ হয়েছে। তিনি তাঁর নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই শুতে চলে গেলেন। তাঁর স্বামী কিন্তু তাঁর কাছে শুতে গেলেন না। তিনি বারবার মদ আর জল পান করে ও ঘন ঘন সিগার খেয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলেন। তাঁর ধারণা কন্যাপক্ষ

যথাবিহিত মর্যাদা তাঁকে দান করেছে।

উৎসবকালে চার্লসএর মনমেজাজও বেশ ভাল ছিল না। খাবার সময় আঞ্চলিক প্রথা অনুসারে নব জামাতার সঙ্গে যে সব রসিকতা করা হয় তাতে সে অস্বস্তি বোধ করছিল।

পরের দিন চার্লস হয়ে উঠল অন্য মানুষ। সে তার স্বাভাবিক লজ্জা হারিয়ে নববধূর সঙ্গে উচ্ছল আচরণ করতে লাগল। এম্মার নাম ধরে ডাকতে লাগল। যখন তখন তার খোঁজ করতে লাগল এবং বাড়ির বাইরে উঠোনে বা বাগানে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে লাগল। তার পায়ের উপর ঝুঁকে তার কোমরটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বেড়াতে লাগল। অথচ কথাবার্তায় বা আচরণে কিছুমাত্র ভাবান্তরও প্রকাশ করল না। তাকে দেখে বোঝাই গেল না যে তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে দেখাতে লাগল সে আগে যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেছে।

বিয়ের দুদিন পর চার্লস তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে তার কাজের জায়গা যাবার জন্য রওনা হলো। তার চিকিৎসা ব্যবসার ক্ষতি হবে ভেবে আর থাকতে চাইল না। তার বাবা মা সেখানে গিয়ে পৌছবেন সন্ধ্যে ছটা নাগাদ। রুয়ালত্ তাঁর গাড়িতে করে নিজে মেয়ে জামাইকে নিয়ে রওনা হলেন। তিনি তাদের কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবেন।

তোস্তের পথে যেতে যেতে গাড়ি বাসলভিলে গিয়ে পৌছলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন রুয়ালত্। তিনি তাঁর মেয়েকে চুম্বন করে বিদায় নিলেন। তাদের বিদায় দিয়ে একশো গজ বাড়ির দিকে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন ওদের গাড়ির শব্দায়মান চাকাগুলো ধুলো উড়িয়ে গ্রাম্য পথে ছুটে চলেছে। সেই দিকে তাকিয়ে তিনি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। সহসা তাঁর অতীত জীবনের অনেক ভুলে যাওয়া কথা একের পর এক করে ঝাঁক বেঁধে এসে ভিড় করতে লাগল মনের চারদিকে। বিশেষ করে মনে পড়ল তাঁর নিজের বিয়ে আর তার স্ত্রীর প্রথম গর্ভধারণের কথা। তাঁদের পুত্র বেঁচে থাকলে আজ তার বয়স হত তিরিশ। তিনি যেদিন বিয়ের পর তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে আসেন এমনি করে সেদিন তাঁর মনে ছিল কত সুখ কত শান্তি। সেদিনটা ছিল খৃস্টের জন্মদিনের কাছাকাছি। দারুণ শীতে বরফ পড়ছিল মাঠে। ক্রমাগত তুষারপাতে সাদা হয়ে উঠেছিল চারদিক। ঠাণ্ডা কনকনে শীতের বাতাস যেন তীক্ষ্ণ কশাঘাতের মত গায়ে এসে পড়ছিল মাঝে মাঝে। তবু তখন কিসের একটা আরামঘন মধুর উত্তাপ অনুভব করছিলেন দেহে মনে। তাঁর স্ত্রীর গোলাপী আভায় উজ্জল হাসি হাসি মুখখানা তাঁর ঘাড়ের কাছে তাঁর গায়ের উপর ঢলে পড়েছিল। তার আঙুলগুলোর মৃদু উত্তাপ প্রায়ই তিনি অনুভব করছিলেন তাঁর হাতে ও বুকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে একবার তাকালেন মঁসিয়ে রুয়ালত্। দেখলেন

গাড়িটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। শূন্য বাড়িটাতে একা ফিরে যেতে ভয় হচ্ছিল তাঁর। উৎসবের ভোজ্যদ্রব্যের কল্পিত সুগন্ধের সঙ্গে তাঁর বিষণ্ণ স্মৃতি আর ছিন্নভিন্ন ভাবনাচিন্তা মিশে একাকার হয়ে তাঁর মাথাটাকে ভারী করে তুলল কেমন যেন। ক্ষ্যালত, একবার ভাবলেন এখান থেকে চার্চে যাবেন। কিন্তু আবার ভাবলেন চার্চের দৃশ্য হয়ত স্মৃতির ভারে আরো বেশী করে ভারাক্রান্ত করে তুলবে তাঁকে। তাই তিনি সোজা বাড়ি চলে গেলেন।

চার্লসএর বাবা মা যখন তোস্তের বাড়িতে পৌছলেন প্রায় তখন ছটা। ডাক্তারের দ্বিতীয় পক্ষের নূতন বউ দেখার জন্য প্রতিবেশীরা জানালা দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। বাড়ির পুরনো ঝি এসে নববধূকে বরণ করে নিয়ে গেল। রাতের খাবার তখনো প্রস্তুত হয়নি বলে ক্ষমা চাইল। অবশ্য ইতিমধ্যে নববধূ নূতন গৃহিণী হিসাবে বাড়িতে কোথায় কি আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে পারেন।

৫

চার্লস-এর বাসা-বাড়িটা ছিল ইটের তৈরি। তার সামনের দিকটা ছিল রাস্তার মুখোমুখি। দরজার পিছনে একটা লম্বা কোট, একটা লাগাম আর একটা চামড়ার টুপী ঝোলানো ছিল। ডান দিকে বৈঠকখানা ঘর। এই ঘরটাই আবার খাবার ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ঘরের দেওয়ালে ছিল হলদে ওয়ালপেপার আর তার উপর সাজানো ছিল কিছু ফুল। জানালায় ছিল সাদা ক্যালিকো কাপড়ের পর্দা। ম্যাণ্টল পিসের উপর একটা বড় ঘড়ি সাজানো ছিল। তার দুদিকে ছিল রূপোর থালায় বসানো দুটো বড় বাতি। হল ঘরের ওপারে চার্লস্-এর রোগী দেখার ঘরটা ছোট। তার মধ্যে ছিল একটা টেবিল আর তিনটে চেয়ার। আর ছিল একটা অফিস-আর্মচেয়ার। ঘরের একদিকে ছিল ছটা তাকওয়ালা একটা বই রাখার সেল্ফ। তাতে শুধু ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিধান। রান্নাঘর থেকে রোগীদের গলার কাশি আর গোপন কথাবার্তা শোনা যায়। এছাড়া সামনের উঠোনের কাছে ছিল একটা অব্যবহৃত ভাঁড়ার ঘর। তাতে যত সব ভাঙ্গা অকেজো জিনিসপত্র ভরে রাখা হয়েছিল।

বাড়ির পিছনের দিকে বাগানটা লম্বালম্বিভাবে চলে গেছে। চওড়াটা খুবই কম। বাগানের দুদিকে মাটির পাঁচিল। বাগানের বাইরেই মাঠ। বাগানের ভিতরে কিছু শাকসব্জীর গাছ। তার মাঝে মাঝে আছে চারটে গোলাপের ঝাড়। বাগানের মাঝখানে এক জায়গায় একটা পাথরের উপর ছিল এক সূর্যঘড়ি।

এম্মা চারিদিক খুঁটিয়ে দেখে উপরতলায় চলে গেল। উপরতলায় পাশাপাশি দুটো শোবার ঘর। একটা একেবারে খালি। আর একটাতে বাসর-

শয্যা সাজানো রয়েছে একটা মেহগেনি কাঠের খাটের উপর। জানালার ধারে ফুলদানিতে ছিল নববধূর জন্য একটা কমলালেবু ও ফুলের তোড়া। এম্মা একটা আর্মচেয়ারে বসে তার ফুলের তোড়াটার কথা ভাবতে লাগল। এই তোড়াটা নিজস্ব বাক্সের ভিতর তার বাপের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। হঠাৎ তার মনে হলো তার মৃত্যু ঘটলে এটার অবস্থা কি হবে।

প্রথম কয়দিন এখন শুধু নানা জল্পনা কল্পনা করে কাটাল। তার একমাত্র চিন্তা বাড়িটাকে কিভাবে নূতন করে সাজানো যায়। অনেক ভেবে বৈঠকখানা ঘরের দেওয়ালের হলুদ কাগজটা বদলে দিল। সিঁড়িতে রং করল। বাগানের সূর্যঘড়ির চারপাশে চেয়ার পাতার ব্যবস্থা করল। বাগানের ভিতর একটা কৃত্রিম ঝর্ণা আর মাছ চাষের উপযুক্ত পুকুরের ব্যবস্থা কি করে করা যায় তার জন্য খোঁজ খবরও করল। এম্মার বেড়ানোর ঝোঁক আছে বলে দু চাকার এক ঘোড়ার গাড়ি কিনল চার্লস।

চার্লস এখন সুখী। এখন কোন দুশ্চিন্তা নেই। এখন সে স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে বসে খায়, সন্ধ্যে বেলায় বড় রাস্তা দিয়ে বেড়ায়। তার স্ত্রী যখন তার চুলে মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দেয় তখন তা দেখতে ভাল লাগে। জানালার কপাটের উপর ঝুলতে থাকা তার শোলার টুপীটাও দেখতে বড় ভাল লাগে। আরো কত সব খুঁটিনাটি। এইসব কিছু অনাবিল আনন্দের এক একটি উপাদান হিসাবে মধুর করে তুলেছে তার গোটা দাম্পত্য জীবনকে। এত সুখ দাম্পত্য জীবনে এর আগে কখনো পায়নি চার্লস।

সকালে বিছানায় যখন দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকে, দুটো মাথা বালিশের উপর পরস্পরের বাহু ঘেঁষে শায়িত থাকে তখন চার্লস মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে কিভাবে জানালা দিয়ে আসা নরম সূর্যরশ্মিগুলো তার স্ত্রীর সোনালি গালের উপর ছড়িয়ে পরে ধীরে ধীরে। রাতের টুপিটা তখনো মাথায় থাকার জন্য গালটা তার অর্ধেক ঢাকা থাকত। খুব কাছে থেকে তার স্ত্রীর সুন্দর চোখগুলো খুব বড় দেখাত, মনে হত তার সারা জীবনের থেকে বড়। বিশেষ করে সকালে ওঠার সময় যখন সে তার চোখের পাতাগুলোকে একবার খুলত আর বন্ধ করত জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। সে চোখ ছায়ার মাঝে দেখলে ঘন কালো দেখাত আর আলোর মাঝে দেখলে ঘন নীল দেখাত। সেই নীল চোখের গভীরে সে যেন ডুবে যেত। সেই নীল চোখের তারায় নিজেকে প্রতিফলিত দেখত যেন নূতন রূপে। তারপর যখন পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে যেত তখন একটা ড্রেসিং গাউন পরে জানালার উপর ঝুঁকে যতক্ষণ পারত দেখত। বাড়ির বাইরে গিয়ে চার্লস জানালার তলায় দাঁড়ালে অনেক সময় কিছু কথা বলত, আবার অনেক সময় একটা ফুল বা গাছের পাতা চিবোতে চিবোতে তা চার্লস-এর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিত আর সেটা বাতাসে অর্ধ বৃত্তাকারে ভাসতে ভাসতে চার্লস-এর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকা সাদা ঘোটকীর ঘাড়ের উপর পড়ত। ঘোড়ার উপর চেপে চার্লস একটা চুম্বন পাঠিয়ে দিত এম্মাকে লক্ষ্য করে এবং এম্মাও হাত নেড়ে তার স্বীকৃতি জানাত। তারপর জানালা থেকে সরে যেত ধীরে ধীরে। চার্লসও ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেত বড় রাস্তায়। তার ঘাড়ের উপর ঝলকে ঝলকে ঝড়ে পড়ত প্রথম সকালের সোনালি সূর্যরশ্মি। তার গায়ে লাগত সকালের শান্ত-শীতল বাতাস। আর তার সারা মনে জড়িয়ে থাকত আরামঘন রাত্রির সুখ-স্মৃতি। সুগন্ধি খাদ্যের কল্পিত আস্বাদের মত সে স্মৃতি উপভোগ করত সে।

এর মত সুখ এর আগে জীবনে কখনো পেয়েছে কি চার্লস? প্রথমে সে যখন লাইসীর স্কুলে পড়ত তখন তার অন্যান্য ধনী শহুরে সহপাঠীদের থেকে নিজেকে পৃথক করে রেখে এক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করত। তার সেই সহপাঠীরা তার গ্রাম্য উচ্চারণ আর পোশাক-আশাক নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। সেই সব সহপাঠীদের মারা যখন তাদের ছেলেদের দেখতে আসত তখন কত রকমের খাবার করে আনত। তারপর চার্লস যখন ডাক্তারি পড়ত তখনও তাকে অনেক হিসেব করে বলতে হত। তখন হাতে বেশী টাকা না থাকায় কোন নাচের আসরে গিয়ে কারো সঙ্গে নাচতে পারত না। তারপর সে তার প্রথম দাম্পত্য জীবনে সেই বিধবা রুগ্ন মহিলাটিকে বিয়ে করে একটি দিনের জন্যও সুখ পায়নি। তার পাগুলো ছিল বরফের মত ঠাণ্ডা। কিন্তু তার এই দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রীকে পেয়ে সে আজ সব দিক দিয়ে সুখী, সব দিক দিয়ে তৃপ্ত। আজ তার সমগ্র জগৎটা যেন তার এই সুন্দরী স্ত্রীর রেশমী পেটিকোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে এত ভালবেসেও কেবলি মনে হয় তার প্রতি তার ভালবাসা যথার্থভাবে প্রকাশ করা হয়নি। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনে হয় কি যেন বলা হয়নি তার স্ত্রীকে। তাই সে ফেরার সময় ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরেই ছুটে উপরতলায় চলে যায়। গিয়ে যদি দেখে এম্মা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে প্রসাধনে মত্ত আছে তাহলে সে চুপি চুপি পিছন থেকে গুড়ি মেরে গিয়ে তাকে চুম্বন করে আর তখন বিস্ময়ে চমকে ওঠে এম্মা।

চার্লস্-এর কি হয়েছে এম্মার দেহ অথবা তার ব্যবহৃত কোন না কোন একটা পোষাক স্পর্শ না করে থাকতে পারে না। তাছাড়া তাকে কাছে পেলেই তার গালে অথবা অনাবৃত হাতটায় আঙুল থেকে শুরু করে বগল পর্যন্ত গোটাটা চুম্বন করতে থাকে পাগলের মত। কিছুটা ভাল লাগে, আবার কিছুটা বিরক্তিও লাগে এম্মার।

বিয়ের আগে এম্মা ভেবেছিল তার জীবনের আকাঙ্ক্ষিত প্রেম সে পেয়ে গেছে। কিন্তু সে প্রেম এখন তাকে প্রত্যাশিত সুখ এনে দিতে না পারায় তার মনে হতে লাগল তার যেন মোহভঙ্গ হয়েছে। অথচ সেই প্রত্যাশিত সুখটা

কি তা স্পষ্ট করে বলতে পারবে না সে। এখন তাই সে সুখ, প্রেমাবেগ প্রভৃতি শব্দগুলো নূতন করে ভেবে দেখছে।

৬

এম্মা পল ভার্জিনিয়া বইখানি নিয়ে অনেক কিছু স্বপ্ন দেখত। কখনো তার মনে হত তার যদি একটা বাঁশের কেবিন থাকত তাহলে ভাল হত। আবার কখনো বা তার মনে হত যদি এমন এক ভাই থাকত যে চার্চের গম্বুজের মত উঁচু গাছ থেকে ফল পেড়ে তাকে দিতে আসত অথবা কোথা থেকে একটা পাখির বাসা এনে তাকে দেবার জন্য গরম বালির উপর দিয়ে খালি পায়ে আসত তার কাছে।

তার বয়স যখন তের তখন তার বাবা তাকে শহরে নিয়ে গিয়ে কনভেণ্টে ভর্তি করে দেয়। ওরা তখন থাকত সেণ্ট গার্ডের কাছে এক হোটেলে। ওরা যে সব প্লেটে খেত সেই প্লেটগুলো ছিল চিত্রিত। সেই সব ছবিতে থাকত লা ভ্যালিয়েরের কথা। ছবির মাঝে মাঝে থাকত খোদাই করা পরিচয়লিপি। তাতে লেখা থাকত ধর্মাচরণ, চিত্তের উদারতা প্রভৃতি গুণের আর রাজসভার ঐশ্বর্যের প্রশংসা।

কনভেণ্টে থাকতে কোন অসুবিধা হয়নি তার। বরং সিস্টারদের সাহচর্য তার ভাল লাগত। যখন তারা তাকে গীর্জায় নিয়ে যেত তখন খুব ভাল লাগত। কোন কিছু প্রশ্ন করলে খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে পারত সে। তাছাড়া একমাত্র সে ছাড়া মঁসিয়ে লে ভিকেয়ারের কঠিন প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে কেউ পারত না। গীর্জায় এসে তার মনটা কেমন যেন হয়ে যেত। স্কুলে ক্লাসের ঘরে যতক্ষণ সে থাকত তার মনটা থাকত এক অবাধ ঔদ্ধত্য আর প্রতাপে ভরা। কিন্তু গীর্জায় গেলে তার মনটা হয়ে উঠত অন্যরকম, সেখানে গেলে কেমন যেন রহস্যময় এক ধর্মীয় অবসাদ আচ্ছন্ন করে তুলত তার মনটাকে। সাদা সাদা মুখওয়ালা মেয়েগুলোর গলায় ঝোলানো ক্রশ, বেদীর ধূপধুনোর উপর গন্ধ। পবিত্র জলের শীতলতা এবং জলন্ত বাতির উজ্জ্বলতা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেত। সে কিন্তু সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করত না। তা না করে সে একটি ধর্মগ্রন্থ খুলে রেখে ছবি দেখত। সেই মহানহৃদয় রাখাল, তীক্ষ্ণ শরের দ্বারা বিদ্ধ সেই পবিত্র হৃৎপিণ্ড, ক্রশের উপর মুমূর্ষু-যীশুর পতন প্রভৃতি ছবিগুলি একটির পর একটি করে দেখে যেত সে। নিজেকে অকারণে দুঃখ দিতে ভালবাসত যেন সে। এক একদিন আত্মনিগ্রহের জন্য সারাদিন সে কিছুই খেত না। এক একবার ভাবত সে একটা কিছু কঠিন শপথ করে বসবে আর সেই শপথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলবে। যখন সে স্বীকারোক্তি অনুষ্ঠানে গিয়ে নানারকমের ছোটখাটো কল্পিত অপরাধের আবিষ্কার করত এবং তার জন্য অন্ধকারে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করত। তাকে দেখে পুরোহিত ও

যাজকরা চুপি চুপি কি সব কথা বলত। 'বাগ্‌দত্তা' সহধর্মিনী, ঐশ্বরিক প্রেমিক প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কথাগুলো এক নূতন রোমাঞ্চের সৃষ্টি করত তার মধ্যে।

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় প্রার্থনার আগে ধর্মগ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করা হত। এক একদিন এক একটা লেখা তার ভাল লাগত। মন দিয়ে তা শুনত এম্মা। এক বিষন্ন অথচ অনির্দেশ্য এক প্রেমানুভূতি সোচ্চার বেদনায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত যেন সারা স্বর্গ মর্ত্য জুড়ে। প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না তার। শৈশব থেকে সে যদি কোন ঘিঞ্জী শহরের ইট কাঠ পাথরের মধ্যে দুঃসহ জীবন কাটাত তাহলে কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সামান্যতম আবেদনেও সাড়া না দিয়ে পারত না তার মন। কিন্তু ছোট থেকে গ্রামের মধ্যে মানুষ হওয়ায় প্রকৃতি সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানত। গবাদি পশুর পাল, গোয়ালিনী মেয়ে, চাষীদের লাঙ্গল প্রভৃতি সে অনেক দেখেছে। কিন্তু যাই সে দেখুক, সব কিছুর থেকে সে শুধু তার মনোমত দিকটাকেই গ্রহণ করত। কোন বস্তুর দ্রুত তৃপ্তিদানের ক্ষমতা না থাকলেই সে তা প্রত্যাখ্যান করত সঙ্গে সঙ্গে। তার মনটা ছিল ভাবপ্রবণ কিন্তু শিল্পানুরাগী সব কিছুর থেকে সে শুধু এক সুখকর আবেগ প্রত্যাশা করত, আত্মনিরপেক্ষ বা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কোন কিছু উপভোগ করতে পারত না সে।

এম্মা যখন কনভেন্টে থাকত তখন এক মেয়ে দর্জি প্রতি মাসে এক সপ্তার জন্য এসে তাদের বোর্ডিংএ থাকত। তাদের পোষাক তৈরি বা মেরামতের জন্য আসতে হত তাকে। সেই মেয়ে দর্জিটি ছিল বড় ঘরের মেয়ে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ফলে তাদের সর্বনাশ হয়। সে কিন্তু কনভেন্টের মেয়েদের বিশেষ করে বড় বড় মেয়েদের বড় প্রিয় ছিল। পড়তে পড়তে মেয়েদের অনেকেই লুকিয়ে সরে পড়ত সেই দর্জির সঙ্গে কথা বলার জন্য। সে ওদের অনেক গল্প বলত, শহরের নূতন নূতন কথা শোনাত। তার পর এক ফাঁকে তার পোষাকের আঁচল থেকে একটা উপন্যাস বার করে মেয়েদের কারো হাতে গুঁজে দিত। মাঝে মাঝে নরম সুরে পুরনো দিনের প্রেমের গান গাইত সে।

সেই মেয়ে দর্জিটি যে সব উপন্যাস পড়তে দিত এম্মাদের সেই সব বইএ থাকত অনেক প্রেমের কাহিনী। তাছাড়া থাকত বীরের বীরত্ব প্রকাশের কাহিনী। এম্মার বয়স যখন পনের তখন সে ওয়ালটার স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ে তার ভক্ত হয়ে পড়ে। তার প্রায়ই ইচ্ছা হত সে যেন কোন পুরনো আমলের প্রাসাদে বাস করে। আর সেই প্রাসাদের গবাক্ষ পথ হতে দূরাগত কোন সাদা পালকওয়ালা শিরস্ত্রাণপরিহিত কোন নাইটকে কালো ঘোড়ায় চড়ে আসতে দেখে। এই সব ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়েই সে মেরি কুইন অফ স্কটকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। দুর্ভাগ্যবতী হলেও এই সব নারীদের শ্রদ্ধা করত সে। জোয়ান অফ আর্ক, হেলয়, এ্যাগনিস সোরেল, লা বেল ফেরোনীয়ের ও ক্লীমেন্স ইসাউর প্রভৃতি মেয়েরা ইতিহাসের ছায়াচ্ছন্ন

প্রেক্ষাপটের বিশালতায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। ইতিহাসের সেই সুবিশাল প্রেক্ষাপটে এদের থেকে কম উজ্জ্বল কয়েকটি ঐতিহাসিক পুরুষ ও ঘটনার ছবি ভেসে ওঠে তার সামনে। সে ছবি হলো সেণ্ট লুই ও তাঁর ওক গাছ, মুমূর্ষু রোয়াডে, একাদশ লুইএর কিছু নিষ্ঠুরতা, বার্থোলোমিউতে অনুষ্ঠিত ব্যাপক নরহত্যা, প্রভৃতির। এছাড়া ছিল চতুর্থ হেনরি ও চতুর্দশ লুইএর ছবি।

তার গানের ক্লাসে যে সব গান গাইত এম্মা সে গানের বিষয়বস্তু ছিল সোনালি পাখাওয়ালা দেবদূতদের কাহিনী। গানের রচনা তেমন ভাল নয়। তবু সেই সব গানের সুর ও বাণীর সমবেত প্রভাবের স্তরগুলোকে পার হয়ে তার মন চলে যেত এক রহস্যময় অনুভূতির জগতে। তার ক্লাসের মেয়েরা তাদের নববর্ষের উপহার হিসাবে পাওয়া অনেক এ্যালবাম আনত। সেগুলোর বাঁধাই বড় সুন্দর বলে রাত্রিবেলায় নির্জনে খুব সাবধানে দেখতে হত। সেই এ্যালবামে ছিল কত নাম না জানা কাউণ্ট ভিসকাউণ্টের ছবি। আর সেই ছবিগুলো অবাক বিস্ময়ে দেখত এম্মা।

কত দেশের কত রকমের ছবি। একটা ব্যালকনিতে রেলিং-এর ধারে একটি যুবক সাদা পোষাকপরিহিতা একটি তরুণীকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অপরিচিতা কত সুন্দরী সুন্দরী ইংরেজ মহিলা। তাদের মাথায় ছিল কুঞ্চিত চুলের রাশ। কয়েকজন মহিলা গ্রেহাউণ্ড কুকুর নিয়ে পার্কে বেড়াতে যাচ্ছে। আবার কিছু মহিলা ঘরের ভিতর সোফার উপর বসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে আছে। তাদের পাশে পড়ে থাকত খোলা চিঠি। আর একটি ছবিতে দেখল পাখির খাঁচার তারের ভিতর দিয়ে একটি যুবতী অশ্রুপূর্ণ চোখে একটি কপোতকে চুম্বন করছে। আবার কোন কোন যুবতী ফুল ছিঁড়ছে আপন মনে। আবার একটি ছবিতে প্রাচ্যের কোন সুলতান লম্বা পাইপে করে হুঁকো থেকে তামাক খাচ্ছে। এ ছাড়া আছে এক অদ্ভুত দেশের ছবি। সেখানকার বিশাল অরণ্যে একদিকে বাঘ আর একদিকে সিংহ ঘুরে বেড়ায়। দূরে রোমনগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। আবার একটি জায়গায় দেখা গেল এক বনের ধারে অবস্থিত কোন এক জলাশয়ের স্বচ্ছ জলে সূর্যের কয়েকটি রশ্মি লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছিল।

ছবি দেখতে দেখতে রাত বাড়ত। তার মাথার উপর ব্রাকেট ল্যাম্পের আলোটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলত। পৃথিবীর দূরতম বিভিন্ন দেশের এই সব বিচিত্র ছবি দেখতে দেখতে মনে কেমন নেশা ধরে যেত তার। দেখতে দেখতে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে উঠত নিশুতি রাত। মাঝে মাঝে রাত করে ফেরা দু-একটা ভাড়ার গাড়ির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যেত না।

এম্মার মা যখন মারা যায় তখন সে বেশ কয়েকদিন ধরে কেঁদেছিল। তার মা মারা গেলে এম্মা মার চুলসমেত একটা ছবি ঝুলিয়ে রাখে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য। তার বাবা বুঝতে পেরেছিলেন তার মা ভয়ঙ্কর রকমের অসুস্থ হয়ে

উঠবে। এম্মাও বুঝতে পেরেছিল, বুঝতে পেরে মনে মনে খুশি হয়েছিল একথা জেনে যে এক আধ্যাত্মিক অবসাদ ও বিষাদ মার ভিতরটাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে খাক করে দিয়েছে। তার মার রোগটা কি তা তাঁর দেহের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি কখনো লেকের জলে বীণার বাজনা অথবা মুমূর্ষু হাঁসের গান ও পাতা ঝরার শব্দ শোনেন। আবার কখনো বা পূতচরিত্রা কুমারী মেয়েদের স্বর্গারোহণের এক অশ্রুত ধ্বনি শুনতে পান। শুনতে পান নির্জন উপত্যকায় এক রহস্যময় আকাশবাণী। তিনি যখন এসব কথা কারো কাছে বলতেন তখন তাঁর কথা কেউ বুঝত না। কিন্তু কেউ বুঝুক না বুঝুক তা তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু এম্মার মা হঠাৎ দেখলেন তিনি আর কোন ঐ সব রহস্যময় শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। অনুভব করলেন, মনের মধ্যে আর সেই অবসাদ বা বিষাদ নেই। ভ্রূযুগলের উপর নেই কোন উদ্বেগের কুঞ্চন।

কনভেন্টের শিক্ষয়িত্রীরা প্রথম প্রথম এম্মার উপর অনেক আশা রাখত। তাকে অনেক কিছু ধর্মশিক্ষা দান করত। কিন্তু পরে তারা বুঝল এম্মা তাদের হাতের মুঠো থেকে চলে গেছে। বুঝল ধর্মের বাণী বা নীতি উপদেশে তার মতিগতি নেই। শেষের দিকে তারা এম্মার উপর এত সব নীতি উপদেশের বোঝা চাপিয়ে দেয় যাতে অতিরিক্ত বোঝাভারে আক্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন অশ্বের মতই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার মন। বিক্ষুব্ধ অশ্বের মুখ থেকে পড়ে যাওয়া লাগামের মত যত সব ধর্ম ও নীতি উপদেশের বোঝা আপনা থেকে ঝরে যায় তার সংক্ষুব্ধ মন থেকে। প্রথমে অতটা বুঝতে পারেনি এম্মা। সে এমন একটা কিছু চাইছিল যা তার মনকে স্পর্শ করবে। প্রথমে সে ধর্মের দিকে সত্যিই কিছুটা প্রবণতা দেখিয়েছিল। কিন্তু সেটা ধর্মের খাতিরে নয়। সে চার্চ ভালবাসত, কিন্তু সে শুধু তার বাগানে ফুলের সমারোহের জন্য। চার্চে যে সব ধর্মসঙ্গীত গাওয়া হত তা ভালবাসত কারণ সে গানের বাণীর মধ্যে অনেক রোমান্টিক শব্দ ছিল। সে চার্চের প্রচারিত নীতি উপদেশগুলো শুনত কারণ সে নীতি উপদেশের মধ্যে এমন এক সাহিত্য রস আছে যা মনকে নাড়া দেয়। কিন্তু যেখানে নৈতিক শৃংখলার কড়াকড়ি সেখানে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার মন। সেটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরাও বুঝতে পেরেছিল। তাই যখন এম্মার বাবা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে তখন কেউ আশ্চর্য হয় নি। ওদের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মাদার সুপীরিয়র মন্তব্য করেন সম্প্রতি এম্মা তার স্বধর্মের প্রতি সব শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে।

বাড়িতে ফিরে এসে এম্মা শুধু ঝি চাকরদের বিভিন্ন কাজকর্মের হুকুম দেয়। যেন তার করার মত কোন কাজ নেই। বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য জীবনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। আবার শহরে যাবার ইচ্ছা হলো তার। কিন্তু চার্লস তাদের বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শহর সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়ে উঠল সে।

তার মনে হলো শহরে গিয়ে নূতন আর কিছু শেখার নেই তার। সেখানে গিয়ে কোন বড় কিছু লাভ করার কোন প্রয়োজন নেই তার।

তবু এম্মা জীবনে একটা পরিবর্তন চাইছিল। চার্লস-এর আবির্ভাবটাকে সেই পরিবর্তন লাভের একটা উপায় হিসাবে গ্রহণ করল সে। সে ভাবতে লাগল প্রেম নামে যে গোলাপী পাখাওয়ালা উড়ন্ত পাখিটা শুধু কবিতা আর কল্পনার আকাশের সীমাহীন ঐশ্বর্যে স্নাত হয়ে উড়ে বেড়ায় সেই সুদূরের পাখিটা তার হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে। তবু সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে বৈচিত্র্যহীন জীবন সে যাপন করছে বর্তমানে সেই জীবনের মধ্যেই আছে তার কল্পিত সুখ।

*

৭

অবশ্য মাঝে মাঝে সে ভাবত নব বিবাহিত এই দিনগুলো বড় মধুর, বড় সুখের। এই সব দিনগুলোকে লোকে বলে মধুচন্দ্রিমা। তবে এই দিনগুলোর মাধুর্য ঠিকমত উপভোগ করতে হলে দূরে কোথাও যেতে হবে, কোন সুন্দর নির্জন একটা দূর দ্বীপে গিয়ে বিয়ের পর কয়েকটা সপ্তা কাটাতে হবে। এ পরিবেশে ঐ দিনগুলোর আস্বাদ ঠিকমত পাওয়া কখনই সম্ভব নয়।

সেই মায়াবী দ্বীপের নির্জন পার্বত্য পথে ঘাটে ও পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় নিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে পাখিদের গান। সে গানের ধ্বনির সঙ্গে মিশ্রিত হবে জলপ্রপাতের একটানা শব্দ। সূর্যাস্তের সময় কোন উপসাগরের কূলে বসে তারা লেমন গাছের সুগন্ধ উপভোগ করবে উতল বাতাসের মধ্যে। রাত্রিকালে দুজনে হাতে হাত দিয়ে পাশাপাশি বসে আকাশের তারার পানে তাকিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কত জল্পনা কল্পনা করবে। তার প্রায়ই মনে হত তার আকাঙ্খিত সুখ যেন পৃথিবীর কোন এক বিশেষ অংশেই পাওয়া যায়। সে সুখ যেন এক আশ্চর্য সুখী গাছ যা কোন এক বিশেষ মাটিতেই ভাল ফল দান করে; অন্য মাটিতে শুকিয়ে যায়। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করত প্রায় কেন সে সুইজারল্যাণ্ডের কোন এক সুন্দর বাড়ির ব্যালকনির উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সামনের শোভা দেখছে না অথবা স্কটল্যাণ্ডের কোন এক সাজানো কটেজে কালো মখমলের কোট, নরম চামড়ার জুতো আর উঁচু টুপীপরা এক স্বামীর সঙ্গে বাস করতে করতে এক অব্যক্ত বিষাদকে লালন করছে না বুকের মধ্যে।

তার এই সব ঈপ্সিত সুখ কেবল একটিমাত্র লোকই দিতে পারত যে লোক নিয়ত পরিবর্তনশীল, যে লোক মেঘের মতো ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ আর বাতাসের মত নিরন্তর গতি পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু এমন লোক কোথায় পাবে সে, কার কাছে বলবে তার কথা। তাই কোন কথা বাইরে প্রকাশ না করে চুপ করে রইল সে। যে দুর্লভ বস্তু লাভ করার কোন ঘটনাগত সুযোগ নেই অথবা তা লাভ করার মত কোন সাহস নেই সে বস্তুর কথা ধীরে

ধীরে ভুলে যাওয়াই ভাল।

তবু চার্লস যদি এম্মার দুঃখ কিছুটা বোঝবার চেষ্টা করত, তার দরদী দৃষ্টি দিয়ে এম্মার চোখের তারায় যদি তার মনোবেদনার কিছু আভাস পেত তাহলে পাকা ফলের গায়ে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ফলটা ঝরে পড়ে তেমনি এম্মার মন থেকে নিমেষে ঝরে পড়ত দুঃখের বোঝাভার। তা না হওয়ার জন্ম দৈনন্দিন জীবনের নানা রকম খুঁটিনাটির মধ্য দিয়ে তারা দুজনে পরস্পরের খুব কাছে এলেও ওদের দেহগত পার্থিব ঘনিষ্ঠতার অন্তরালে বয়ে যাওয়া এক মানসিক অনাসক্তির গোপন নিবিড়তা ওদের যেন পৃথক করে রেখেছিল।

চার্লস-এর কথাবার্তা ছিল খুবই সাধারণ ধরনের। সে কথা ছিল আটপৌরে পোষাকের মত অতি সাধারণ। সে কথা শুনে হাসি বা স্বপ্ন কিছুই জাগত না। যখন সে রুয়েনে থাকত তখন সে থিয়েটার দেখতে যেত না। প্যারিসীয় কোম্পানির অভিনয় দেখায় তার কোন আগ্রহই ছিল না। সে সাঁতার জানত না। ফেনস্ খেলতে পারত না। একদিন এম্মা একখানা উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘোড়ায় চাপা সম্বন্ধে কি একটা শব্দের সম্মুখীন হয়ে তার মানেটা জানতে চায় চার্লস-এর কাছে। চার্লস্ তা বলতে পারল না।

একটা মানুষ কখনো সব কিছু জানতে পারে না। কিন্তু একটা মানুষ সব দিকে কুশলী হতে পারে, জীবনের সূক্ষ্ম ও মার্জিত দিকে আমাদের মনটাকে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের মধ্যে প্রেমাবেগকে ঘনীভূত করে তুলতে পারে। কিন্তু চার্লস কোন দিকেই কুশলী নয়। তার কাছ থেকে কোন কিছু শেখার নেই। সে কোন কিছু চায় না। কোন দিকে কোন উচ্চাভিলাষ নেই তার। সে এটা ধরে নিয়েছিল যে তার স্ত্রী তাকে পেয়ে খুশি এবং তৃপ্ত। এই ভেবে সে নিজেও খুশি হত তৃপ্ত হত। তার এই অসঙ্গত তৃপ্তির জন্ম রাগ হত এম্মার। এই ভেবে এম্মার রাগ হত যে চার্লস আপাত প্রশান্ত মনের অন্তরালে একটা বিরাট নির্বুদ্ধিতাকে পুষে রেখেছে। সে মূঢ়, অপরিণামদর্শী। তাকে পেয়ে চার্লস যে সুখে সুখী সে সুখটাকেও ঘৃণার চোখে দেখে এম্মা।

সে মাঝে মাঝে চার্লসকে তার কাছে ডাকত। একসঙ্গে বেড়াতে যেত। সে যখন চার্লসএর পাশে হাঁটত তখন চার্লস যেন হাতে চাঁদ পেত। চার্লস ভাবত জীবনে সে সবচেয়ে সুখী। এম্মা যখন কিছু করত, যখন সে একমনে ছবি দেখত অথবা রুটিগুলো টুকরো করে তার হাতে গুঁজে দিত অথবা দ্রুত আঙুলগুলো সঞ্চালিত করে পিয়ানো বাজাত তখন সে একমনে তাকিয়ে থাকত এম্মার দিকে।

এম্মা যখন পিয়ানোতে গান বাজাত দ্রুত লয়ে আর ঘরের জানালাটা খোলা থাকত তখন সারা গাঁয়ের লোক তা শুনত মুগ্ধ হয়ে। কেউ তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াত। একজন মুহুরী ডাকে চিঠি ফেলতে গিয়ে এম্মার বাজনা শুনতে শুনতে চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকত হাঁ করে।

শুধু ছবি আর গান বাজনা নয়। ঘর সংসারের দিকেও তার লক্ষ্য ছিল। চার্লসএর কাছে যে সব রোগী আসত তাদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলত, তাদের অনেক সময় সান্ত্বনা দিত এম্মা। অনেক সময় তাদের কাছে চিঠি লিখত ভাল ভাষা দিয়ে। কোন প্রতিবেশী তাদের বাড়িতে রবিবারে খেতে এলে তাকে বিশেষভাবে যত্ন করত এম্মা। তার জন্য নূতন এক মনোরম ডিশের ব্যবস্থা করত। তাকে এক সুন্দর প্লেটে করে জেলি দিত। এম্মার এই ধরনের মিষ্টি সুন্দর আচরণের জন্য চার্লসএর সুনাম বেড়ে যেত।

এই রকম এক স্ত্রীরত্ন লাভ করার জন্য নিজেকে ভাগ্যবান ভাবত চার্লস। এম্মার নিজের হাতে আঁকা দুটো পেন্সিল-স্কেচ কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে বৈঠকখানা ঘরের একটি দেওয়ালে সবুজ দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল সে।

বিকালের দিকে বেরিয়ে কাজ সেরে ফিরতে রাত প্রায় দশটা বেজে যেত। চার্লসএর তখন খুব ক্ষিদে লাগত। কিন্তু বাড়ির চাকর তখন চলে যাওয়ায় এম্মাই তাকে খেতে দিত। চার্লস তখন খাওয়ার টেবিলে আরাম করে বসার জন্য কোটটা গা থেকে খুলে ফেলত। তারপর খেতে খেতে গল্প করত। অবশ্য সবই নিজের কথা। পথে কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, কোন কোন গাঁয়ে রোগী দেখতে গেছে। কোন কোন রোগীর জন্য কি কি ব্যবস্থাপত্র লিখেছে তা সব বলত এম্মাকে। তাকে যা দেওয়া হত তার সবকিছু নিঃশেষে খেয়ে মদের সবটুকু পান করে উঠে পড়ত। হাত মুখ ধুয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত। একবার শুলেই ঘুমিয়ে যেত। তার নাক ডাকত।

নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় যত সব পোষাক আশাক কম দামে কিনত চার্লস। রাত্রিতে মাথায় সুতীর টুপী পরত সে। পায়ে পরত ভারী বুট জুতা। জুতোগুলোর উপর দিকটা ছিল কাঠের মত শক্ত। চার্লস বলত গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত করতে এই সব জুতোই ভাল।

মিতব্যয়িতার নামে চার্লসএর এই সব কৃপণতা সব সময় সমর্থন করতেন তার মা। তাঁর নিজের সংসারে কোন অশান্তি বা গোলমাল হলেই ছেলের সংসারে চলে আসতেন তিনি। অথচ পুত্রবধূকে মোটেই দেখতে পারতেন না। তিনি বলতেন এম্মার রুচি এতই উন্নত যে তাঁদের মত এই সব গরীব সংসারে তা মোটেই খাপ খায় না। তাঁর উপদেশ অনুসারে সংসারের খরচ বাঁচাবার জন্য কম দরে কাঠ, চিনি আর বাতি কেনার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াত চার্লস। তারপর সংসারের খরচ কমাবার জন্য নানা রকমের উপদেশ দিত। যেমন বলত যে কয়লা তাদের রোজ খরচ হয় তাতে পাঁচ দিন চালাতে। এম্মার পোষাকের খরচ কিভাবে কমানো যায় সে বিষয়েও উপদেশ দিত। এম্মা এই সব উপদেশাত্মক বক্তৃতা মন দিয়ে শুনত।

চার্লসএর প্রথমা স্ত্রী মাদাম ডুবাক থাকাকালে চার্লসএর মার আধিপত্য ছিল এ সংসারে। তখন চার্লস মার ভালবাসার ছোঁয়া একটুখানি পেলেই বিশেষ

অনুগৃহীত বোধ করত। কিন্তু তার দ্বিতীয়া স্ত্রী এম্মা আসার পর থেকে চার্লস আর মার ভালবাসা চায় না। মার প্রতি চার্লসএর বেশীর ভাগ ব্যবহার তাঁর প্রতি অনাসক্তিরই পরিচয় দান ধরে। চার্লসএর সুখটাকে তার মা সুখ বলে মনেই করেন না। কোন সর্বস্বান্ত মানুষ যেমন কোন এক প্রাসাদের দিকে হাত বাড়িয়ে একজনকে বলে, দেখতে পাচ্ছ? তোমার জন্যই আমি ঐসব হারিয়েছি, তেমনি আজ চার্লসএর মাও প্রায়ই তাঁর ছেলেকে বলেন, তোমার জন্য একদিন অনেক সুখ স্বার্থ ত্যাগ করেছি, অথচ আজ তুমি স্ত্রীকে পেয়ে সব ভুলে গেছ, মাকে পর্যন্ত ভুলে গেছ। বুঝতে পারছ না এই স্ত্রী তার অমিতব্যয়িতার দ্বারা তোমাকে পথে বসাচ্ছে।

এ কথার কি উত্তর দেবে তা ভেবে পেত না চার্লস। মাকে সে শ্রদ্ধা করে। আবার এম্মার প্রতি তার ভালবাসাও অপরিসীম। তার মার অভিমতটাকে তার অসম্ভ্রান্ত বলে মনে হয়, আবার এম্মার কাজকর্মও সঠিক বলে মনে হয়।

বাড়ি থেকে মা চলে যাবার পর মার প্রতি শ্রদ্ধার বশে চার্লস তার মার একটা কথা মার ভাষাতেই এম্মার কাছে তুলে ধরেছিল। কিন্তু এম্মা অল্প দু এক কথায় অকাট্য যুক্তিতে সে কথা খণ্ডন করে চার্লসকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সে ভুল বলছে। আর কিছু না বলে রোগীদের কাছে চলে গিয়েছিল চার্লস।

ঘর-সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটির থেকে তাদের মনটাকে সরিয়ে এনে ভালবাসার আবেগে সিক্ত করে রাখতে চাইত এম্মা। চার্লসএর মনটাকে মুক্ত করতে চাইত। এর জন্য দিনকতক ধরে কয়েকটি উপায়ও পরীক্ষা করে দেখল। রাত্রিবেলায় বাগানবাড়িতে গিয়ে চাঁদের আলোয় গা ডুবিয়ে চার্লসএর পাশে বসে চার্লসকে প্রেমের কবিতা শোনাত। কখনো বা প্রেমের সকরুণ গান শোনাত। কিন্তু এত সব কবিতা ও গানের রসেও মনটা ভিজত না তাদের। ভালবাসার জন্য মোটেই পাগল হত না সে মন। আগের মতই বাস্তবসচেতন এবং সংকীর্ণ রয়ে যেত তাদের মন দুটো।

এইভাবে নিজের মনে বা চার্লসএর মনে কোন সঠিক প্রেমাবেগ জাগাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো এম্মা। এর পর এম্মা একদিন বুঝল তার প্রতি চার্লসএর কোন বিশেষ আসক্তি নেই। তার প্রতি তার ভালবাসায় কোন গম্ভীরতা নেই। সে তাকে কয়েকটি বিশেষ সময়ে শুধু আলিঙ্গন করে। এটা যেন তার একটা অভ্যাসগত আচরণে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে কোন প্রাণ নেই।

একজন খেলোয়াড়কে চার্লস সারিয়ে তোলে এক কঠিন রোগ থেকে। সে সেরে উঠে চার্লসকে একটা গ্রেহাউণ্ড কুকুর উপহার দেয়। সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে এম্মা সেই কুকুরটাকেই একমাত্র সঙ্গী করে তুলল। কোথাও বেড়াতে গেলেই সে কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে যেত। কিছুক্ষণের নির্জনতার জন্য প্রায়ই বাইরে বেড়াতে যেত সে। তাছাড়া বাড়ির পিছনের দিকে বাগান আর সামনের দিকের ধুলোভরা রাস্তাটা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তার চোখ।

হাঁটতে হাঁটতে এম্মা চলে যেত বেনভীলের সমুদ্র তীরের পথে। সে চলে যেত মাঠের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পরিত্যক্ত নির্জন বাড়ির কোণটায়। মাঝে মাঝে পাশের খালটায় তাকাত এম্মা। তাতে লম্বা লম্বা তীক্ষ্ণ পাতা-ওয়ালা ঘাস জন্মে ছিল। একবার সেখানে গিয়ে পরলে এম্মা চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখত। দেখত যেদিন সে প্রথম এই সব দেখেছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত কিছু বদলে গেছে কি না। দেখত যেখানে আগে ফুল ফুটতে দেখেছিল এখনো সেখানেই ফুল ফুটেছে। পাথরের উপর তখনও মাটির চাপড়া জমেছিল। দেখত বাড়িটার তিনটে বড় বড় জানালার পাল্লাগুলো বরাবর বন্ধ আছে। তার লোহার রডগুলোতে মরচে ধরেছে। দেখতে দেখতে মাঠের হলুদ প্রজাপতি আর ইঁদুরের পিছনে চক্রাকারে ছুটে বেড়াতে থাকা তার গ্রে-হাউণ্ড কুকুরটার মত এম্মার অশান্ত অস্পষ্ট চিন্তাগুলো ঘুরপাক খেত তার মাথায়। তখন ঘাসের উপর বসে তার ছাতাটা রেখে আপন মনে প্রশ্ন করত নিজেকে, কেন, কেন আমি বিয়ে করলাম?

এম্মা ভাবত চার্লস্-এর পরিবর্তে যদি তার প্রথমে অন্য লোকের সঙ্গে দেখা হত। এবং যদি তার সঙ্গে বিয়ে হত তার তাহলে হয়ত তাকে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হত না। সে মানুষটি নিশ্চয় চার্লসএর থেকে হত আরো সুদর্শন, আরো বুদ্ধিমান, আরো খ্যাতিমান, আরো আকর্ষণীয় আর এই ধরনের পুরুষকেই নিশ্চয় তার কনভেন্টের পুরনো সহপাঠিনীরা বিয়ে করেছে। তার সেই সব বান্ধবীরা এখন কি ধরনের জীবন যাপন করছে? নিশ্চয় তারা ঘর করছে কোন জনবহুল শহরে যার প্রশস্ত রাজপথে আছে কর্মব্যস্ত জনতার ভিড়, আছে কত কলগুঞ্জন-পূর্ণ রঙ্গালয়, কত নাচের আসর, আছে কত আনন্দের গভীর আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টির কত উপকরণ। আর আজ সে সেই সব আমোদপ্রমোদের উপকরণ থেকে শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। আজ সে উত্তরমুখী শৈত্য-তাড়িত কোন পরিত্যক্ত প্রাসাদশীর্ষের মত এক হিমশীতল নিঃসঙ্গতায় গুমরে মরছে ভিতরে ভিতরে। আজ সে নিঃসঙ্গ নীরব কোন মাকড়শার মত সীমা-হীন ব্যর্থতার জাল বুনে যাচ্ছে তার চারদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই সুন্দর স্কুল জীবনের হারানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় এম্মার। মনে পড়ে যায় পারিতোষিক বিতরণী উৎসবের কথা। বিজয়গর্বে উল্লসিত হয়ে মঞ্চে গিয়ে নিয়ে আসত পুরস্কারের মালা। তখনকার সেই পোষাকে তাকে দেখতে চমৎকার লাগত। পুরস্কার নিয়ে সে যখন তার আসনে ফিরে এসে বসত তখন চারদিক হতে কত ভদ্রলোক তার দিকে ঝুঁকে কৌতূহল দেখাত তার প্রতি। কত রং বেরঙের গাড়িতে ভর্তি হয়ে যেত স্কুলের উঠোনটা। গাড়ি করে মাননীয় অতিথিরা চলে যাবার সময় তাকে হাত নেড়ে বিদায় জানাত তারা। সঙ্গীত শিক্ষক তাঁর বেহালাটা খাপে ভরে রাখতে রাখতে তাকে সম্ভাষণ জানাতেন। হায়, কোথায় গেল সেই সব দিন।

মনের এই হিমশীতল নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য তার কুকুরটার নাম ধরে ডাকত এম্মা। দুটো হাঁটুর মধ্যে জালিকে ধরে তার নরম মাথায় হাত বুলোত। বলত, হে নিশ্চিন্ত সুখী প্রাণী, তোমার মনিবকে চুম্বন করো। জালি তখন মুখখানা একটু ফাঁক করে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে তাকাত। এম্মার তখন মনে হত ও যেন তার মতই বিষণ্ণ। বিষণ্ণ জালিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই যেন তার সঙ্গে কত কথা বলত এম্মা।

মাঝে মাঝে মাঠে ঠাণ্ডা হাওয়া বইত। সমুদ্র থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বয়ে যেত প্রান্তরের উপর দিয়ে। জলাশয়ের নলখাগড়া গাছগুলো শুয়ে পড়ত বাতাসের ঘায়ে। আন্দোলিত বীচ গাছগুলো মাথা নত করে কেমন যেন মর্মর ধ্বনি করত। গায়ের উপর শালটা জড়িয়ে উঠে পড়ত এম্মা।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পথের দুধারে লম্বা গাছের সারি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সবুজ আলোর একটা রশ্মি এসে পড়েছিল। কেমন লাল হয়ে উঠেছে আকাশের প্রান্তভাগগুলো। আলোছায়ার কম্পিত দ্বন্দ্বে সারবন্দী গাছের গুঁড়িগুলোকে তামাটে দেখাত। পথ চলতে চলতে কেমন যেন ভয় হত এম্মার। পথে যেতে যেতে ভয় লাগত এম্মার। জালিকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি তোস্তের পথে রওনা হত এম্মা। সেখানে গিয়ে সারা সন্ধ্যেটা একটা আর্মচেয়ারে একা বসে কাটাতে হবে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ এক নিমন্ত্রণ পেল এম্মা। আন্দারভিলের মার্কুইএর বাড়ি লা ভবিসেয়ার্দে যেতে হবে তাকে।

মার্কুই একজন মন্ত্রীসভার সদস্য। রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর তিনি আবার রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসতে চান। ডেপুটিদের চেম্বারের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে চান। শীতকালে তিনি গরীবদের অনেক জ্বালানি কাঠ দান করেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন রাস্তাঘাটের দাবি জানান। গত গ্রীষ্মের সময় মার্কুইএর মুখের ভিতর একটা ফোঁড়া হয়। চার্লস সেটা রহস্য-জনকভাবে সারায়। একদিন মার্কুই তাঁর একজন লোককে ডাক্তারের বিল মেটাবার জন্য তোস্তের বাড়িতে পাঠান। লোকটি ডাক্তারের বাগানে অনেক চেরী ফল দেখে তা মার্কুইএর কাছে বলে। মার্কুইএর বাড়ির বাগানে চেরী ফল মোটেই ফলছিল না ভাল। মার্কুই তখন চার্লসএর কাছে কিছু ফল চান। চার্লস তা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়ায় মার্কুই একদিন নিজে ধন্যবাদ দিতে আসেন চার্লসএর বাড়িতে। এম্মাকে দেখে খুশি হন, কারণ এম্মা দেখতে ভাল এবং তার আচরণ ভদ্র, চাষীদের মত নয়। বাড়ি গিয়ে মার্কুই ঠিক করে ডাক্তার ও তার যুবতী স্ত্রীকে একদিন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। তাতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা লঙ্ঘিত হবে না এবং অভিজাত সমাজের লোকদের মতই ডাক্তার দম্পতিকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

কোন এক বুধবার বিকাল তিনটের সময় তাদের ঘোড়ার গাড়িতে করে লা ভবিসেয়ার্দের পথে রওনা হলো মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারী। তাদের সঙ্গে ছিল তিন তিনটে বাক্স।

তারা যখন তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছল তখন রাত্রি হয়ে গেছে। লণ্ঠনের আলো জ্বালা হচ্ছে।

৮

মার্কুইএর প্রাসাদটা ইতালীয় ধাঁচের হলেও কালানুক্রমিকতার দিক থেকে আধুনিক। প্রাসাদটা দুভাগে বিভক্ত। সব মিলিয়ে তিনটে সদর দরজা। কিছু কিছু গাছের জটলাঘেরা ঘাসে ঢাকা এক বিরাট প্রান্তর পার হয়ে বাড়িটায় ঢুকতে হয়। সেই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে গরু চরে। লম্বা লম্বা ঘাসের চাপড়া আর কাঁটাগাছের মাঝে মাঝে রডোডেনড্রন ও স্নোমল ফুল ফুটে আছে। দুদিকে সারবন্দী ফুলগাছে ঘেরা শানবাঁধা পথ প্রান্তরের সবুজ বুক চিরে প্রাসাদের সদর দরজা পর্যন্ত চলে গেছে। প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে একটা ছোট নদী। প্রান্তরটার এক প্রান্তে প্রাসাদ আর এক প্রান্ত যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে জঙ্গলাকীর্ণ দুটো গ্রস্ত উপত্যকা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠে গেছে। সেখানে পুরনো প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়।

চার্লস্এর গাড়িটা সোজা মাঝের দরজাটার সামনে গিয়ে থামল। গাড়িটা থামতেই বাড়ির চাকরেরা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। মার্কুই নিজে এসে ডাক্তারের স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন হলঘরের দিকে।

সেই হলঘরের মেঝেটা শ্বেতমর্মরে গাঁথা। তার ছাদটা খুব উঁচু। চার্চের মতই সেখানে প্রতিটি কথা ও শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। ঘরটার একদিক থেকে শুরু হয়ে একটা সিঁড়ি খাড়া হয়ে দোতলায় উঠে গেছে। বাঁ দিকে একটা গ্যালারী। তার ওদিকে বাগান। গ্যালারীর একদিকে বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। সেখানে হাতীর দাঁতের বলের ঠুং ঠাং আওয়াজ হচ্ছিল। বিলিয়ার্ড রুমের ভিতর দিয়ে বৈঠকখানা যাবার পথে এম্মা দেখল যারা খেলছে তারা সবাই সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন লোক। তাদের গলবন্ধগুলো মুখের চোয়াল পর্যন্ত উঠে গেছে। তাদের কোটের উপর বুকের কাছে কত সব কারুকার্য করা। তারা বল খেলতে খেলতে হাসিমুখে তাকাচ্ছিল। দেওয়ালের উপর টাঙ্গানো গিল্টের ফ্রেমে গাঁথা বড় বড় ছবি। ছবিগুলি সব এ বাড়ির পূর্বপুরুষদের। প্রতিটি ছবির তলায় নাম লেখা আছে। প্রথমে আছে জঁ আঁতোনে দ্য আন্দারভিলার্স দিনেরনভিল, কোঁৎ দে লা ভবিসেয়ার্দ, ব্যারণ দে লা ফ্রেসবায়ে যিনি কঁত্রাসের যুদ্ধে ১৫৮৭ সালের অক্টোবর মাসে নিহত হন।

আরো অনেক ছবি ছিল। কিন্তু বাতির আলোতে সে সব ছবি দেখা

যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে চকিত এক ঝলক আলোতে ছবির এক একটা অংশ চকচক করে উঠছিল। বিশেষ করে ছবির চারপাশের সোনালি ফ্রেমগুলোকে সেই চকিত আলোতে বেশী করে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বাতির আলোগুলো খেলার সবুজ টেবিলের উপর কেন্দ্রীভূত করে রাখায় ঘরের দেওয়াল ও কোণ-গুলো আলো অন্ধকার দেখাচ্ছিল।

মার্কুই বৈঠকখানার দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলতেই ঘরের ভিতর থেকে একজন মহিলা উঠে এলেন। তিনি হলেন মার্কুইপত্নী। তিনি সোজা চলে এলেন এম্মার কাছে। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে বসালেন এবং এমন সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যাতে মনে হবে এম্মা যেন তাঁর অনেক দিনের পরিচিত। মার্কুইপত্নীর বয়স চল্লিশ। দেহের গঠন ভাল। কাঁধ চওড়া, বাঁকা নাক, আর মাথার চুলগুলো সোনালি। তাঁর পাশে বসেছিল এক সুন্দরী মহিলা। আগুনের পাশে বসে পুরুষ অতিথিরা বোতামে ফুল গুঁজে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছিল।

সাতটার সময় খাবার দেওয়া হলো। পুরুষ অতিথিরা সংখ্যায় বেশী থাকায় তাদের হলঘরে খাবার ব্যবস্থা করা হলো। মেয়েরা মার্কুই ও মার্কুই-পত্নীর সঙ্গে খেতে বসল খাবার ঘরে।

এখানে বাতাসটা ছিল বেশ ঈষদুষ্ণ আর সুগন্ধি। বিচিত্র ফুলের গন্ধ ও অতিথিদের পোষাকের গন্ধ রাঁধা মাংসের গন্ধের সঙ্গে মিলে মিশে ঘরের বাতাসটাকে ভারী করে তুলেছিল। খাবারের ডিশগুলোর উপর যে সব রূপোর ঢাকনা ছিল সেগুলোর উপর বাতির আলোর লম্বা লম্বা ছটা পড়েছিল। টেবিলের ধারে ধারে প্লেটের উপর গামছাগুলো ভাঁজ করা ছিল। প্লেটের মাঝে মাঝে খোলা ঝুড়িতে বড় বড় আকারের অনেক ভাল ফল ছিল। হোটেলের লোক অর্ডার দেওয়া ভাল মাংস এনে পরিবেশন করতে লাগল। চামচ হাতে প্রত্যেকের ডিশে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পছন্দ ও চাহিদামত মাংস পরিবেশন করতে লাগল।

এম্মা আশ্চর্য হয়ে দেখল যে খুব কম মেয়েরই মদের গ্লাসে হাতের দস্তানা ভিজে যাচ্ছিল।

মেয়েদের খাবার টেবিলের একধারে একজন বৃদ্ধ বসে ছিল। তার গলার গামছাটা ছেলেদের মত করে বাঁধা ছিল। প্লেটের উপর স্তূপাকৃত খাবারের উপর সে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে বসেছিল। তার মুখ থেকে লালা ঝরছিল। তার চোখের ঢাকনাগুলো নামানো ছিল এবং চোখের ভিতরটা লাল দেখাচ্ছিল। তার মাথার চুল শূয়োরের লেজের মত কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। ইনি ছিলেন মার্কুইএর শ্বশুর। তাঁর নাম ছক দ্য ল্যাভিয়ের। তিনি নাকি একদিন ভাল শিকারী ছিলেন। লোকে বলে তিনি ছিলেন মেরি আঁতানেতের প্রেমিক। মঁসিয়ে দ্য কগনে ও মঁসিয়ে দ্য লজান এই দুজন তাঁর প্রেমের দাবিদার থেকে

মেরি আঁতোনেত্‌ নাকি এই ল্যাভিয়েরকেই বেছে নেন তাঁর প্রেমিক হিসাবে। তিনি একদিন উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করতেন। পরিবারের সকলে তাঁকে ভয় করত। তিনি ইচ্ছামত টাকা ওড়াতেন। জুয়ো খেলতেন ও নারী অপহরণ করতেন। আজ সেই লোকের কি অবস্থা! আজ তিনি ভোজসভায় এক টেবিলে বসে বিড়বিড় করে আপন মনে বলছেন আর খাবারের ডিশগুলোর দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ভৃত্যেরা চিৎকার করে সেই ডিশের খাবারের নামগুলো উচ্চারণ করে তাঁকে জানাচ্ছে। এম্মার চোখদুটো ঘুরে ফিরে বারবার সেই বৃদ্ধের দিকেই যাচ্ছিল। যে ব্যক্তি একদিন রাজসভায় প্রচুর প্রতাপের সঙ্গে বাস করেছেন, খাস রাণীকে অঙ্কশায়িনী করে রাত্রিযাপন করেছেন আজ তিনি বৃদ্ধ হলেও যেন নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ লোক।

সকলকে বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলো। ঠাণ্ডা মদের স্পর্শে একটা তীক্ষ্ণ শিহরণ খেলে গেল এম্মার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সে জীবনে কখনো ডালিম বা আতাফল খায়নি। ধূলোর মত মসৃণ চিনিগুলো আরও সাদা ও সূক্ষ্ম মনে হচ্ছিল।

খাওয়ার পর মেয়েরা নাচের জন্য পোষাক পাল্টাবার জন্য আপন আপন ঘরে চলে গেল।

এম্মা একজন সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত মাথার চুল বিন্যাস করতে লাগল। তারপর প্রসাধন সেরে গাউন পরল।

চার্লসএর পায়জামাটা কোমরের কাছে খুব আঁটসাট লাগছিল। সে বলল তাছাড়া আমার জুতোর ফিতেগুলো নাচতে দেবে না। বাধা সৃষ্টি করবে।

এম্মা তখন বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি নাচবে?

চার্লস বলল, নিশ্চয় নাচব।

এম্মা বাধা দিয়ে বলল, পাগল হয়েছ? লোকে হাসবে। ডাক্তারের পক্ষে এটা মোটেই মানায় না।

চার্লস আর কোন কথা না বলে এম্মার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এম্মার জন্য অধৈর্য হয়ে পায়চারি করতে লাগল।

এম্মা একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তাকে পিছন থেকে দেখতে লাগল চার্লস। তার চোখগুলো আগের থেকে আরো কালো দেখাচ্ছিল। তার নীলাভ ও মোলায়েমভাবে বিন্যস্ত চুলগুলো মাথার দুপাশে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। মাথার পিছনে চুলের উপর শোভা পাচ্ছিল পাতা ও বোঁটা সমেত একটা গোলাপ। তার গাউনটা ছিল বাদামী রঙের। তার উপর একগুচ্ছ গোলাপ ফুলের কারুকার্য খচিত ছিল।

চার্লস এম্মার কাছে সরে গিয়ে তার ঘাড়ের উপর চুম্বন করার চেষ্টা করল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে এম্মা বলল, না না, ওসব করো না। আমার পোষাক নষ্ট

হয়ে যাবে।

এমন সময় নীচের তলা থেকে বেহালার সুর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্কেতধ্বনি। এম্মা একরকম ছুটতে ছুটতে নিচের তলায় নেমে গেল।

বাজনা থামতে দেখা গেল নাচঘরের মেঝের উপর পুরুষ অতিথিরা এক একটা দলে বিভক্ত হয়ে জটলা করছে। মেয়েরা এক জায়গায় সার দিয়ে বসে আছে এবং তাদের আপন আপন ভক্তরা তাদের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। সারা ঘরময় হীরে, সোনা, মুক্তো প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর গয়নার উজ্জ্বলতা, নানা গন্ধদ্রব্য ও যুঁই, ভুলো-না-আমায়, ডালিম কুঁড়ি প্রভৃতি ফুলের ছড়াছড়ি। মাথায় চুলের উপর পাগড়ীর মত এক ধরনের পোষাক এঁটে ধনী বিধবারা এক দিকে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে।

এম্মার নাচের অংশীদার যখন আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মৃদু স্পর্শ করে তাকে নিয়ে গেল তার বুকটা একবার কেঁপে উঠল। ওরা উঠে গিয়ে নাচ শুরু করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বেহালার সুর বেজে উঠতেই ওরা শুরু করবে। দেখতে দেখতে এম্মার সেই ভয়টাও কেটে গেল। অর্কেষ্ট্রা বাজতেই সে লঘুপদে নাচ শুরু করে দিল। বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে দুলে দুলে সে নাচতে লাগল। যখন অন্যান্য বাজনা থেমে গেল এবং শুধু বেহালা বাজতে লাগল দক্ষ নাচিয়ের মত এম্মা নাচতে লাগল। তারপর যখন আবার সব বাজনাগুলো বাজতে বাজতে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের একটি ঐক্যতানকে গড়ে তুলল তখন আবার সকলে তালে তালে দ্বৈত নাচ নাচতে শুরু করল। তারা কখনো পরস্পরের হাতদুটো ধরে নাচতে লাগল, কখনো বা ছেড়ে একা নাচতে লাগল, কখনো তাদের চোখ নিচের দিকে নামিয়ে রাখলো, কখনো বা পরস্পরের চোখ মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

ছড়িয়ে থাকা নৃত্যরত অতিথিরা ছাড়াও একদল লোক দরজার কাছে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। তারা সকলেই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। তাদের পোশাক আশাক ও চেহারা দেখলেই সাধারণ লোক থেকে তাদের পার্থক্য বোঝা যায়।

তাদের কোটগুলোর কাটছাঁট খুবই উন্নত ধরনের এবং সেই সব কোটের কাপড়ও খুব ভাল। তাদের মাথার চুলগুলো মসৃণভাবে বিন্যস্ত। তাদের গায়ের রং তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচায়ক। সে রঙের উজ্জ্বলতা তাদের পোষাকের উজ্জ্বলতার সঙ্গে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। এই সব অভিজাত অতিথিরা মাঝে মাঝে অবাধে নড়াচড়া করছিল এবং সুগন্ধি রুমালে মুখ মুচছিল। সেই সব রুমালে তাদের নামের আদি অক্ষরগুলি বড় বড় করে সেলাই করা ছিল। তাদের মধ্যে যাদের বয়স বার্ধক্যের স্তরে উঠে গেছে তাদের যুবক দেখাচ্ছিল, আবার যারা বয়সে যুবক, তাদের এক শান্ত বিচক্ষণতার জন্য পরিণতবয়স্ক মনে হচ্ছিল। জীবনের যাবতীয় চাহিদা ও কামনা বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য এক

প্রশান্ত ও উদাসীন ভাব তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তবে উপরে তাদের খুব ভদ্র, মার্জিত ও শান্ত দেখালেও সেই আপাত ভদ্রতার অন্তরালে একটা প্রভুত্বমূলক কঠোরতার আভাস পাওয়া যায় খুঁটিয়ে দেখলে। কারণ তাদের অনেকেরই অবাধ্য ঘোড়া আর ছলনাময়ী নারীকে পোষ মানানোর অভিজ্ঞতা আছে আর সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে তাদের কঠোর হতে হয়েছে।

এম্মার কাছ থেকে কয়েক পা দূরে নীল কোটপরা এক ভদ্রলোক মুক্তোর গয়নাপরা এক যুবতীর সঙ্গে ইতালির সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিল। তারা সেণ্ট পীটার, ত্রিডলি, ভিসুভিয়াস, কেসিন, জেনোয়ার গোলাপ প্রভৃতি বিষয়ে গল্প বলছিল। তাদের সব কথার অর্থ বুঝতে পারছিল না এম্মা।

নাচঘরের বাতাসটা ভারী হয়ে উঠেছিল। বাতিগুলোর উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে আসছিল। অতিথিদের অনেকেই বিলিয়ার্ড খেলতে চলে গিয়েছিল। জানালার কাচের শার্সির ওদিক থেকে বাগানে দাঁড়িয়ে চাষীদের অনেকে উঁকি মেরে দেখছিল তার জন্য ঘরের এদিক থেকে একজন চাকর একটি চেয়ারে দাঁড়িয়ে একটি জানালার শার্সি ভেঙ্গে ফেলল। তার শব্দে এম্মা সেদিকে তাকিয়ে দেখল কয়েকজন চাষী ছেলেমেয়ের মুখ। সেই সব মুখ দেখে তার হঠাৎ লে বুরোর খামারের কথা মনে পড়ে গেল। সে যেন খামারটাকে তার চোখের সামনে দেখতে লাগল। সেই জমি, কর্দমাক্ত পুকুর, আপেল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা তার বাবা আর সবশেষে নিজেকে। মনে হলো সে যেন আগের মতই এখন দুধ থেকে মাখন তুলছে। কিন্তু এ দেখা শুধু ক্ষণিকের জন্য। কারণ আজকের রাত্রির এই ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মাঝে অভিজাত মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোকদের মাঝে তার অতীত গ্রাম্যজীবন কোথায় বিলীন হয়ে গেল। সে যে একদিন সেই খামারে মানুষ হয়েছে এবং সেই গ্রাম্য কৃষকসুলভ জীবন যাপন করেছে এটা সে ভুলেই যেতে লাগল। এখন তার উজ্জ্বল নাচঘরের আশেপাশে যে ছায়াটা ঘুরঘুর করছে সেই কালো কুলিশ ছায়াটাই তার গোটা অতীতটাকে যেন গ্রাস করে ফেলেছে নিঃশেষে। এখন ঠিক এই মুহূর্তে এম্মা নামে যে মেয়েটি বাঁ হাতে একটি পাত্র ধরে ম্যারাশিনো আইসক্রীম খাচ্ছে, তার ডান হাতের চামচটা এখনো তার দাঁতে লেগে আছে। তার সঙ্গে অতীতের সেই লে বুরোর খামারের কৃষককন্যা এম্মার কোন সম্পর্ক নেই। তার চোখটা আরামে অর্ধমুদ্রিত হয়ে আসছিল।

এম্মার কাছে বসে থাকা এক ভদ্রমহিলার হাত থেকে হঠাৎ হাত-পাখাটা পড়ে গেল। একজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে ভদ্রমহিলা বলল, দয়া করে মঁসিয়ে আমার পাখাটা যদি তুলে দেন তাহলে বড় ভাল হয়। ঐ দেরাজটার পাশেই পড়ে গেছে পাখাটা। ভদ্রলোক পাখাটা কুড়িয়ে যখন নত হয়ে দিচ্ছিলেন ভদ্রমহিলাকে, ভদ্রমহিলা কাগজে মোড়া কি একটা জিনিস ভদ্রলোকের টুপীর মধ্যে ফেলে দিল। ভদ্রমহিলা

তখন ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে হাতের ফুলের তোড়াটা শুঁকতে লাগল।

নৈশভোজের সময় ভাল স্প্যানিশ মদ ও রাইনের মদ পরিবেশন করা হয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বাদামের ঝোল আর ট্রাফালগার পুডিং। ভোজন-পর্ব শেষ হলে অতিথিরা একে একে চলে যেতে লাগল গাড়ি করে। বাতিগুলো নিভে আসছিল একে একে। দু এক জন তাস খেলার লোক থেকে গিয়েছিল প্রায়ান্ধকার হল ঘরটায়। বাদকরাও ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল। চার্লস-এর চোখ দুটো ঘুমে ঢুলছিল।

রাত্রি তিনটের সময় আবার নাচের বাজনা বেজে উঠল। আবার নাচ শুরু হলো। এবার হবে ওয়ালৎস নৃত্য। এ নাচের অনুষ্ঠানে গৃহস্বামীরাও যোগ দিল। মার্কুই, মার্কুইপত্নী ও তাঁদের মেয়েও নাচতে লাগল। নিচুকাটের ওয়েস্টকোট পরা একজন ওয়ালৎস নাচিয়ে সোজা এম্মার কাছে এসে তার নাচের অংশীদার হবার জন্য অনুরোধ করল। বলল, আপনি খুব ভাল নাচেন। সবাই সে ভদ্রলোককে ভিকোঁতে বলে ডাকছিল। এম্মা তাকে চেনে না।

প্রথমে খুব ধীরে নাচ শুরু করল তারা। তারপর বাড়িয়ে দিল নাচের গতি। তারা লাট্টুর মত ঘুরছিল। অথবা তাদের মনে হচ্ছিল নাচঘরের বাতি, আসবাবপত্র, দেওয়াল, মেঝে সব ঘুরছে। সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। নাচতে নাচতে ঘরের দরজার কাছে চলে যেতে এম্মার গাউনের আঁচলটা ভিকোঁতের পায়জামাতে লেগে গেল।

কিছুক্ষণের জন্য তাদের পা দুটো জড়িয়ে গেল। তারা দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। তারপর তারা আবার ঘুরে ঘুরে নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে তারা গ্যালারীর ওদিকে চলে গেল এবং সেখানে ওরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। ক্লান্ত হয়ে একবার এম্মা তার মাথাটা ভিকোঁতের বুকের উপর রাখল। তারপর ধীরে ধীরে আবার ওরা নিজেদের জায়গায় চলে এল। এর পর যেখান থেকে ওরা প্রথম নাচ শুরু করেছিল সেখানে এসে এম্মা তার নিজের আসনে বসে পড়ল। চোখদুটো হাত দিয়ে ঢেকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল এম্মা।

চোখ খুলে এম্মা দেখল একজন মহিলা ঘরের মধ্যে এক জায়গায় বসে আছে আর তিনজন ওয়ালৎস নাচিয়ে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে তাকে নাচের অংশীদার হিসাবে পাবার জন্য। মহিলাটি তাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সুর বেজে উঠল বেহালায়। এম্মা দেখল মহিলাটি যাকে বেছে নিল সে হচ্ছে তারই ভূতপূর্ব অংশীদার ভিকোঁতে। বুঝল ভিকোঁতে একজন ভাল ওয়ালৎস নাচিয়ে এবং এতক্ষণে সে তার নাচের উপযুক্ত অংশীদার পেয়েছে। যখন অন্যান্য নাচিয়েরা ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে নাচ শেষ করে বিশ্রাম নিচ্ছে ভিকোঁতে ও সেই মহিলাটি তখনও নেচে

চলেছে অক্লান্ত ভাবে।

অতিথিরা আরো কিছুক্ষণ থেকে শুতে চলে গেল সবাই। আসর ভেঙ্গে গেল।

চার্লস এতক্ষণ অর্থাৎ এই চার পাঁচ ঘণ্টা অতি কষ্টে কাটিয়েছে। সে নাচতে পারে না। আবার কোন খেলাও জানে না। তবু ভদ্রতার খাতিরে শুধু তাস খেলা দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে সারা সময়টা। অবশেষে সব কিছুর অবসান ঘটলে সে হাঁপ ছেড়ে শুতে গেল উপরে।

এম্মা কিন্তু শুল না। গায়ে একটা শাল জড়িয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে জানালার ধারে বসে রইল চুপচাপ। তখনো অন্ধকার জমে আছে বাইরে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তবু সেই বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এম্মা। নাচের বাজনাটা তখনো বাজছিল তার কানে। জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রাখল এম্মা। না শুয়ে বসে বসে পূর্ব মুহূর্তের সুখস্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে লাগল। জীবনের যে ঈপ্সিত সুখ ও ঐশ্বর্য ক্ষণকালের জন্য পেয়েছিল ঘটনাক্রমে, যা তাকে একটু পরেই ছেড়ে চলে যেতে হবে তার মধুর আবেশটা দীর্ঘায়িত করে রাখতে চাইছিল তার মনে।

পূর্ব আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছিল একে একে। এম্মার খুব শীত করছিল। তবু সে বসে বসে অন্যান্য ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। অন্য সব অতিথিদের কে কোন ঘরে শুয়েছে, তারা কে কোথায় থাকে তাদের পরিচয় জানতে ইচ্ছা করছিল এম্মার।

আর থাকতে না পেরে পোষাক খুলে বিছানায় গিয়ে ঘুমন্ত চার্লসএর পাশে শুয়ে পড়ল এম্মা।

সকালে অতিথিরা সবাই নিচের তলায় খাবার ঘরে জড়ো হলো প্রাতরাশের জন্য। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই ওদের প্রাতরাশ খাওয়া হয়ে গেল। তারপর গৃহস্বামীর কন্যা ম্যাদমোজেল দ্য আণ্ডারভিলার্স একটা ঝুরিতে করে হাঁসের খাবার নিয়ে এসে তাদের খাওয়াতে গেল। অতিথিদের অনেকে ম্যাদমোজেলের সঙ্গে পশুশালা দেখতে গেল। মার্কুইপত্নী নিজে এম্মাকে আস্তাবল দেখাতে নিয়ে গেলেন। বিরাট আস্তাবলে নানা রঙের নানা রকমের ঘোড়া ওদের দেখে জিব দিয়ে শব্দ করতে লাগল। ঘরের একদিকে জিন লাগাম প্রভৃতি গাড়ি জোড়া ও ঘোড়ায় চাপার নানা রকমের সরঞ্জাম।

এদিকে চার্লস বাড়ির একজন ভৃত্যকে তার গাড়ি তৈরির জন্য অনুরোধ করল। চার্লসএর গাড়ি জোড়া হয়ে গেলে তা দরজার সামনে আনা হলো। চার্লস ও এম্মা মার্কুই ও মার্কুইপত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলো।

চার্লস চালকের আসনে বসে গাড়ি ছেড়ে দিল। এম্মা নীরবে বসে গাড়ির চাকা ঘোরা দেখতে লাগল। প্রসারিত হাতে লাগাম ধরে গাড়ি চালাতে লাগল চার্লস একমনে। ছোট ঘোড়াটা ছন্দায়িত ধীর গতিতে চলতে লাগল।

ঘোড়ার ঘামে লাগামটা ভিজে যেতে লাগল।

থিবোরভিনের কাছে এসে একটা চড়াইএর উপর উঠছিল যখন গাড়িটা তখন দেখা গেল একজন অশ্বারোহী বিপরীত দিক থেকে এসে সিগার মুখে হাসতে হাসতে চলে গেল তাদের পাশ দিয়ে। তাদের মধ্যে ভিকোঁতেকে দেখে চিনতে পারল এম্মা। কিন্তু দেখতে দেখতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

আরও আধ মাইল এগিয়ে গেলে ওদের একবার থামতে হলো। কি একটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। চার্লস তা মেরামত করল। মেরামত হয়ে গেলে চার্লস দেখল ঘোড়ার পায়ের কাছে সবুজ সিল্কে মোড়া একটা সিগার রাখার কৌটো পড়ে রয়েছে। চার্লস সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, এতে অনেকগুলো সিগার আছে। আমি খাবার পর এগুলো একে একে খাব।

এম্মা জিজ্ঞাসা করল, তুমি ধূমপান করা ধরেছ নাকি?

চার্লস বলল, সুযোগ পেলে কখনো কখনো খাই। এই বলে কৌটোটা পকেটে রেখে দিল চার্লস। তারপর ঘোড়াটার গায়ে চাবুক মেরে গাড়ি ছেড়ে দিল।

বাড়ি পৌছে ওরা দেখল তখন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য কোন কিছুই তৈরি হয়নি। এম্মার মেজাজটা বিগড়ে গেল। নাস্তেসীও রেগে তার কথার কড়া উত্তর দিল। তখন এম্মা আরো রেগে গিয়ে বলল, আমি অনেক সহ্য করেছি, আর না। তুমি চলে যাও। তুমি কাজ দেখে নাও, সাবধান করে দিচ্ছি।

দুজনে সামনাসামনি টেবিলে বসে দুপুরের খাওয়া খেল। চার্লস তার হাত দুটো ধরে এক সময় বলল, বাড়ির মত আরাম কোথাও নেই।

ওরা শুনতে পেল নাস্তেসী ঘরের বাইরে কাঁদছে। এই গাঁয়ে প্রথম আসার দিন থেকে মেয়েটা এই বাড়িতেই থাকে। বিপত্নীক অবস্থায় চার্লস যখন এ বাড়িতে একা ছিল তখন এই মেয়েটাই ওর একমাত্র সঙ্গী ছিল। মেয়েটার প্রতি একটা মমতা গড়ে উঠেছিল চার্লসএর। চার্লস তাই এম্মাকে বলল, তুমি কি ওকে সত্যিই যেতে বলছ?

এম্মা বলল, না বলার কারণ?

এরপর ওরা খাওয়ার ঘর থেকে শরীরটাকে গরম করার জন্য রান্নাঘরে গেল। সেখানে গিয়ে একটা সিগার ধরাল চার্লস। কিন্তু খাওয়ার অভ্যাস না থাকার জন্য মুখটা বিকৃত করে প্রায় থুথু ফেলতে লাগল। এম্মা তা দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি শুধু শুধু সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে তুলছ।

চার্লস তখন মুখ থেকে সিগারটা ফেলে দিয়ে জল খেতে গেল। এই অবকাশে সিগারের কৌটোটা তুলে নিয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিল এম্মা।

পরের দিনটা অন্তহীন বলে মনে হতে লাগল এম্মার কাছে। দিন যেন কাটতে চায় না। সময় কাটাবার জন্য সে বাগানে গিয়ে একই পথে বারবার

আনাগোনা করতে লাগল। একই গাছ একই ফল একই ফুল বারবার দেখতে লাগল। আগে কতবার এসব জিনিস দেখেছে। তবু আজ যেন কেমন নতুন নতুন মনে হচ্ছে ওদের। গতকালের নৈশ অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে গেলে মনে হয় এম্মার আজকের দিনের সঙ্গে তার কত তফাৎ। প্রবল ঝড়ের আঘাতে কোন এক পাহাড়ের গায়ে এক রাতের মধ্যে হঠাৎ এক বিরাট খাদ সৃষ্টি হওয়ার মত তার জীবনেও যেন এক বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেছে একটি রাতের মধ্যে। কিন্তু কিছু করার নেই। সেদিন আর ফিরে পাবে না। শুধু সেদিনের সুখস্মৃতিটা অক্ষয় করে রাখার জন্য নাচের আসরে পরা পোষাকগুলো আলাদা একটা ড্রয়ারে যত্ন করে রেখে দিল। সামান্য একটি রাতের উজ্জ্বলতা ও ঐশ্বর্যের মধুর সমারোহ যে স্মৃতির ছাপ রেখে গেছে তার মনে তা কোনদিন মুছে যাবে না। সে কথা কোনদিন ভুলে যাবে না সে।

প্রতি বুধবার সকালে ওঠার সময় মনে মনে বলত এম্মা, মাত্র একসপ্তা আগে এমনি এক বুধবার···দুসপ্তা আগে···তিন সপ্তা আগে আমি ছিলাম সেখানে। কিন্তু দিনে দিনে সেই নাচের আসরে দেখা মানুষ ও বস্তুগুলোর স্মৃতি অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। কোয়াড্রিল নাচের সময় কি বাজনা বাজানো হয়েছিল তার সুরটা আর তার মনে নেই। সেখানে যাদের সঙ্গে নেচেছিল আর মনে পড়ে না তাদের মুখ। সেই সুসজ্জিত ঘরগুলোর ছবিও ম্লান হয়ে আসতে লাগল ক্রমশঃ। তবু আনুষঙ্গিক খুঁটিনাটিগুলো ভুলে গেলেও সব মিলিয়ে একটি সুখের দিনের অতিবাহিত মধুর স্মৃতি এক ব্যাকুল কামনার রূপ ধরে চিরদিন জেগে থাকবে তার মনে।

৯

চার্লস যখন বাড়িতে থাকত না তখন বাক্স থেকে সেই কৌটোটা জামা কাপড়ের ভিতর থেকে বার করে সেটা খুলত এম্মা। সেটা শুঁকত বারবার। সিগারের তামাক ও সিল্কের সৌখীন কাপড়টার এক মিশ্রিত মধুর গন্ধ বড় ভাল লাগত তার। এটা কার? এটা কি তবে ভিকোঁতের? এটা কি তার প্রণয়িণী উপহার দিয়েছে? একটা গোলাপ কাঠের উপর সযত্ন খচিত সিল্কের কারুকার্য। প্রণয়বিধুরা কোন এক তরুণী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে কত যত্নে খচিত করেছে এই সুন্দর কারুকার্য সমৃদ্ধ সূচীশিল্প তার সুঁচের প্রতিটি আঘাতে মূর্ত হয়ে ওঠে এক অব্যক্ত আশা অথবা স্মৃতি। সিল্কের প্রতিটি সূতোয় গাঁথা আছে এক অক্ষয় কামনার আবেগ। তারপর একদিন হয়ত ভিকোঁতে এই কৌটোটা নিয়ে যায়। সেদিন মেয়েটির সঙ্গে তার কি হয়েছিল? তখন কি ওরা তোস্তেতে ছিল? তবে কি এখন ভিকোঁতে প্যারিসে চলে গেছে? প্যারিস! কী অদ্ভুত নাম। নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন এক বিশাল নগরীর একটা মনোরম ছবি ফুটে ওঠে তার সামনে। এই নামের শব্দটা বড়

গীর্জায় গম্ভীর দীর্ঘায়িত ঘণ্টাধ্বনির মত এক রোমাঞ্চ জাগিয়ে দিল তার মধ্যে।

রাত্রিতে মাছের কারবারীরা যখন গাড়িতে করে প্যারিসে যায় তখন উঠে পড়ত এম্মা। পথের উপর চাকার ঘর্ঘর আওয়াজ শুনেই জেগে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনে মনে বলে উঠত, ওরা কাল প্যারিসে যাবে। গাড়িগুলোর সঙ্গে এম্মার মনটাও প্যারিসে ছুটে চলে যেত। প্যারিস যাবার গোটা পথটা কল্পনায় এঁকে নিত এম্মা। কত পাহাড় উপত্যকা ও গ্রাম পার হয়ে তবে সেখানে যেতে হবে।

প্যারিসের একটা মানচিত্র কিনেছিল এম্মা। তাতে সারা শহরের পথঘাট কোথায় কি আছে তা দেখানো আছে। সেই সব পথঘাটগুলো খুঁটিয়ে দেখত এম্মা। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে প্যারিসের কথা ভাবতেই সে দেখতে পেত কোন এক শান্ত নরম সন্ধ্যায় মিটমিট করে গ্যাসের আলো জ্বলছে আর প্যারিসের রঙ্গালয়গুলির সামনে ক্রমাগত ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

প্যারিস থেকে প্রকাশিত মেয়েদের একটা পত্রিকার গ্রাহক ছিল এম্মা। সেটা নিয়মিত তার বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়ত সে। কোথায় কোন্ অশ্বপ্রতিযোগিতা হচ্ছে, কোথায় গানবাজনার আসর বসছে, কোথায় কোন্ গায়ক নাম করেছে, কোথায় কোন্ নতুন দোকানের উদ্বোধন হচ্ছে, পোষাক আশাকের সবচেয়ে নূতন ফ্যাশন কি উঠেছে, সবচেয়ে ভাল দর্জিদের ঠিকানা কি, কোনদিন কোন অপেরায় যেতে হবে এই সব কিছুরই বিবরণ খুঁটিয়ে দেখত।

শুধু পত্র পত্রিকা নয়, সে উপন্যাসও পড়ত। বালজ্যাক ও জর্জ স্যাণ্ডের উপন্যাস পড়তে ভাল লাগত তার। এই সব উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী পড়ে তার নিজের অতৃপ্ত ভালবাসা একটা তির্যক তৃপ্তি লাভ করত। পড়তে পড়তে এমন নিবিষ্ট হয়ে পড়ত যে হাতের বইটা খাবার টেবিলেও নিয়ে আসত। খেতে খেতেও পড়ত। কিন্তু চার্লস কাছে এলে বইটা বন্ধ করে দিত। কিন্তু যখনি যে উপন্যাস পড়ত তার বিভিন্ন কাল্পনিক চরিত্রের মধ্যে সে শুধু ভিকোঁতেকে খুঁজে যেত। তার সঙ্গে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের সাদৃশ্যের খোঁজ করত। এইভাবে ভিকোঁতের ভাবমূর্তিটাকে দিনে দিনে বেশী করে উজ্জ্বল করে তুলতে লাগল। আর সেই উজ্জ্বলতা দিয়ে তার জীবনের অন্যসব স্বপ্নগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলত। এই ভাবে ভিকোঁতেকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে যে জীবনবৃত্ত রচনা করেছিল এম্মা তার কেন্দ্র যেন প্রসারিত হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে।

সমগ্রভাবে প্যারিস শহরটাই এক অত্যুজ্জ্বল রূপ ধরে প্রায় ভাসতে লাগল এম্মার চোখের সামনে তবু সমস্ত শহরের মধ্যে দু তিনটে জায়গাই তার আদর্শ জীবনযাপনের উপযোগী। এম্মার মতে প্রথম আদর্শ জায়গা হলো রাষ্ট্রদূতদের পল্লী। সে এক অদ্ভুত জগৎ। প্রতিটি বৈঠকখানায় আয়না আঁটা দেওয়াল

আর চকচকে মেঝে। মেঝের উপর পাতা টেবিলে সোনার জরির কাজ করা মখমলের কাপড়। তবে সে জগতের মধ্যে অনেক দুশ্চিন্তাও আছে। সেইসব সুদৃশ্য সুসজ্জিত বাড়ির ঘরগুলোতে সুন্দরী মেয়েরা লুটিয়ে পড়া আঁচলওয়ালা শাড়ী পরে ঘুরে বেড়ায়। আবার সেই সব ঘরে অনেক গোপন তথ্য আনাচে কানাচে জমা হয়ে থাকে। সেখানে যারা বাস করে, তাদের আপাত হাসির উচ্ছ্বলতার মধ্যে দুঃসহ উদ্বেগের কালো ছায়া লুকিয়ে থাকে স্বচ্ছন্দে। এরপর আছে ডিউকদের বাড়ি। সেখানকার লোকরা বেলা চারটে পর্যন্ত ঘুমায়। সে বাড়ির মেয়েরা তাদের পেটিকোটের উপর ইংরেজদের মত ফিতে পড়ে। ডিউকরা বড় উচ্ছ্বল প্রকৃতির। তারা বাজী ধরে কৌতুক করে ঘোড়ায় চড়ে অনেক সময় জীবন পর্যন্ত দান করে। চল্লিশ বছর বয়সে কোন ধনী বয়স্কা উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করে। আবার এই প্যারিস শহরেই মধ্যরাত্রির পর যত সব লোক আর অভিনেত্রীরা বেরিয়ে এসে কোন এক হোটেল বা রেস্তোরাঁয় এক একটি বাতিজ্বলা ঘরে নৈশ ভোজন সারতে আসে। আদর্শবাদী উচ্চাভিলাষের বশে তারা অনেক সময় নিজেদের রাজা মহারাজা ভাবে। অনেক অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় দেয়। স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি এমন একটা স্তরে তারা বাস করে যেটা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে। এছাড়া শহরে আর যারা থাকে তাদের কথা বলার নয়। তাদের যে কোন অস্তিত্ব আছে তা বোঝাই যায় না। এই সাধারণ মানুষের দুঃসহ জগৎটা এম্মার অনেক কাছের বস্তু হলেও এম্মা সে জগৎটাকে ভুলে থাকতে চায়। যে সমাজ প্রতিবেশ এম্মার জীবনটাকে ঘিরে আছে যেমন এই দুঃসহ গ্রাম্য পরিবেশ, পেটিবুর্জোয়া চিন্তাধারায় ভর্তি তথাকথিত ভদ্রলোকগুলো, বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবন—এই সব কিছুই অবাঞ্ছিত ও অবাস্তব মনে হয় তার কাছে। মনে হয় এগুলো নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। এগুলো ঘটনাক্রমে দৈবাৎ এসে পড়েছে তার জীবনে। তার বিশ্বাস এসব স্থায়ী ঘটনা নয় তার জীবনে। এই অবাঞ্ছিত জীবনবৃত্তের বাইরেই আছে অনন্ত প্রেম, সৌন্দর্য ও আনন্দভরা এক বিশাল জগৎ। এম্মার কামনার প্রবলতায় ও আবেগের আতিশয্যে বিলাসব্যসনের পার্থিব আনন্দ ও হৃদয়ের অপার্থিব আনন্দ মিলে মিশে এক হয়ে যায়। ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক পূর্ণ জীবনযাত্রা আর সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা বা আবেগানুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কোন কোন ভারতীয় বৃক্ষের মত মানুষের প্রেম প্রণয়ও কি তাদের ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধির জন্য এক ধরনের বিশেষ মৃত্তিকা আর আবহাওয়া চায়? পর্যাপ্ত চন্দ্রালোকতলে ভাসমান দীর্ঘায়িত আলিঙ্গন ও অশ্রুসিক্ত হাত-গুলো যেন সেই প্রেমের এক একটি অঙ্গ। দেহগত কামনার উত্তাপ আর প্রেম-বিধুর অন্তরের এক অভীপ্সা কেমন যেন এক হয়ে যায়। রেশমী যবনিকা আর পুরু কার্পেট ঢাকা ঘর, মণিমুক্তো প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর উজ্জ্বলতা, বিশাল প্রাসাদের অলস নির্জন আনন্দ আর কুসুমিত আরামশয্যা প্রেমালাপের জন্য

যেন একান্ত প্রয়োজনীয়।

চার্লসএর ঘোড়ার গা ঘষার জন্য এক চাকর ছিল। সে রোজ সকালে একবার করে আস্তাবলে এসে ঘোড়াটার গা ধুয়ে ঘষে চলে যেত। সে এক জোড়া কাঠের জুতো পড়ে হলঘরের ভেতর দিয়ে যেত। জুতোটায় কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। তার মোজা ছিল না পায়ে। এই ছিল চার্লস-এর চাকরের হাল। তাও দিনের মধ্যে একবার এসেই চলে যেত। চার্লস তার বাইরের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে গাড়ি থেকে নেমে নিজে ঘোড়ার জিন খুলে যেখানে যা রাখার রেখে দিত। তখন বাড়ির ঝি আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াকে খেতে দিত।

নাস্তেসী তোস্তে থেকে কাঁদতে কাঁদতে একদিন চলে যায়। সে চলে গেলে এম্মা চোদ্দ বছরের এক অনাথা মেয়েকে নিয়ে আসে বাড়িতে। এম্মা তাকে দিনের বেলায় রাতের টুপী পড়তে নিষেধ করে দিয়েছিল। তাছাড়া তাকে আরো অনেক আদব কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল গুরুজনদের তৃতীয় পুরুষে সম্বোধন করতে হয়। কেউ জল চাইলে তা ট্রেতে করে দিতে হয়। ঘরের ভিতরে লোক থাকলে দরজায় টোকা দিয়ে তবে ঘরে ঢুকতে হয়। এ ছাড়া তাকে ইস্ত্রি করতে ও তাকে পোষাক পরার সময় সাহায্য করতে শিখিয়ে-ছিল। মোট কথা একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার ব্যক্তিগত ঝি হতে হলে যা যা শেখা দরকার তা সব শিখিয়ে দিয়েছিল এম্মা। মেয়েটিও তাকে ভয় করত এবং ভয়ে ভয়ে তার সব কথা মেনে চলত, কারণ সে জানত মাদামের কথা না শুনলে তাকেও চলে যেতে হবে। তবে সে রোজ রাতের বেলায় শুতে যাবার সময় কিছু চিনি চুরি করে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসে খেত। আর রোজ বিকালে এম্মা যখন তার ঘরে বসে থাকত তখন সে রাস্তার ওপারে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া বা গাড়িতে করে যাওয়া লোকদের সঙ্গে কথা বলত।

এম্মা রোজ বিকেলের দিকে তার সোনার বোতাম দেওয়া ড্রেসিং গাউন পরে বসে বই পড়ত। তার চিঠি লেখার কেউ ছিল না, তবু সে চিঠি লেখার সব সরঞ্জাম কিনে এনেছিল; কলম, কাগজ, কালি, খাম। আয়নার সামনে বসে একটা বই হাতে তুলে নিত। কিন্তু সেটা পড়ত না। বইটা হাতে নিয়ে আনমনে কিসের যেন স্বপ্ন দেখত। হাত থেকে বইটা কিছু পরে তার কোলের উপর পড়ে যেত।

মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছা হত। তার ইচ্ছা হত সে যেন আবার কনভেন্টে ফিরে যায়। এক একসময় মৃত্যু কামনা করত সে। এক একসময় প্যারিসে গিয়ে বসবাসের স্বপ্নও দেখত।

চার্লস গাঁয়ের পথে বরফে ও বৃষ্টিতে যাওয়া আসা করত। সে বাইরে রোগী দেখতে গিয়ে রোজ খামারে অমলেট খেত। যে কোন রোগীর স্যাঁতসেঁতে বিছানায় বিনা দ্বিধায় হাত ঢুকিয়ে দিত। অনেক সময় কোন রক্তাক্ত রোগীর

রক্ত তার মুখে লাগত। অনেক সময় সে মুমূর্ষু রোগীর কথা শুনত মন দিয়ে। রোগীর মলমূত্র পরীক্ষা করত, তাদের নোংরা জামাকাপড় নাড়াচাড়া করত। কিন্তু নানা জায়গায় নানা রোগী দেখে আসার পর যখন বাড়ি ফিরত তখন দেখত তার পরিচ্ছন্ন ঘরে আগুন জ্বলছে, একটি আরামপ্রদ চেয়ার তার জন্য প্রতীক্ষা করছে, তার সুসজ্জিতা সুবাসিতা সুন্দরী স্ত্রী বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু চার্লস জানত না তার স্ত্রীর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত এই সুবাস কোথা থেকে আসছে। তার মনে হত হয়ত তার স্ত্রীর গায়ের চামড়া বা ত্বক থেকেই সুবাসটা বেরিয়ে আসছে।

চার্লস বাড়ি ফিরলে তাকে বিভিন্নভাবে আনন্দ দিত এম্মা। অনেক সময় সে এক ধরনের কাগজ দিয়ে বাতি হতে গলে যাওয়া মোমটাকে ধরার চেষ্টা করত, অনেক সময় তার পোষাকের উপর নানা কারুকার্য করে দেখাত। অনেক সময় এমন কিছু নতুন খাবার করে চার্লসকে খাওয়াত, যা তাদের ঝি তৈরি করতে পারত না। রুয়েনে কোন এক বাড়িতে এম্মা একবার দেখে কাঁচের ফুলদানি কিনেছিল। হাতীর দাঁতের ছোটখাটো বাক্সও কিনেছিল। এইভাবে কত শৌখীন জিনিস কিনে এনে ঘর সাজিয়েছিল এম্মা। চার্লস বুঝত না এ সব কোথা হতে কে আনছে। বুঝত না বলেই এই সব দেখে বেশী মুগ্ধ হত সে। ঘরগুলোকে বেশী ভাল লাগত তার। তার জীবনের ধূলোভরা পথে যেন ছড়ানো স্বর্ণভস্ম।

চার্লসএর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। মুখে হাসিখুশি লেগে থাকত। ডাক্তার হিসাবে নাম যশ ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ গ্রামাঞ্চলের লোকেরা তাকে পছন্দ করত। তার প্রধান কারণ, চার্লসএর মনে কোন অহঙ্কার ছিল না; তার ব্যবহার ছিল খুব সরল আর সাদাসিদে। সে রোগী দেখতে গিয়ে ছেলেপুলেদের আদর করত। সে কোন চায়ের দোকানে যেত না। তার নীতিজ্ঞান প্রখর ছিল। তাতে তার উপর সকলের বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। সর্দি ও বুকের রোগে চার্লস বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। পাছে তার হাতে কোন রোগীর মৃত্যু ঘটে এই ভয়ে সে কোন তীব্র ওষুধ দিত না রোগীদের। সার্জারি বা শল্য চিকিৎসাতেও চার্লসএর পারদর্শিতা ছিল না তা নয়। কোন রোগীর রক্তপাতে তার কোন স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিত না। কোন অপারেশানের সময় সে যখন কোন রোগীকে শক্ত হাতে ধরত তখন তা কেউ ছাড়াতে পারত না।

চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক একটা নূতন পত্রিকার গ্রাহক হয়েছিল চার্লস। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সে রোজ বাড়িতে বসে পত্রিকাটা পড়ার চেষ্টা করত। কিন্তু খাওয়ার পর ঘুম আসত। পত্রিকাটা কোলের উপর পড়ে যেত। আর পড়া হত না। এম্মা তখন তার তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামীর পানে তাকিয়ে ভাবত তার কেন অন্য কোন লোকের সঙ্গে বিয়ে হলো না। এম্মা চায় তার স্বামী সারারাত বই এর মধ্যে ডুবে থেকে অনেক নাম যশ অর্জন করুক। তার লেখা বই বইএর

দোকানে দোকানে বিক্রি হবে এবং খবরের কাগজে যার নাম প্রায়ই প্রকাশিত হবে। চার্লসএর কিন্তু কোন উচ্চাভিলাষ নেই। বড় হবার কোন চেষ্টা নেই। কিছুদিন আগে ইভেতভের এক ডাক্তারের কোন এক রোগীর বাড়িতে কয়েক জন আত্মীয়ের সামনে তর্ক হয়। সেখানে চার্লসকে সে প্রকাশ্যে অপমানিত করে। সে কথা চার্লস নিজে এম্মাকে বললে এম্মা সেই ডাক্তারটার উপর দারুণ রেগে যায়। এম্মা তারই জন্য অপরের উপর রেগে গেছে বলে আবেগে চার্লস এম্মাকে চুম্বন করে তার কপালে। কিন্তু এম্মার রাগের আসল কারণ কোথায়, তার লজ্জা কতখানি তা সে বুঝতে পারেনি। এম্মার ইচ্ছা হচ্ছিল চার্লসকে আঘাত করবে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে গিয়ে জানালা খুলে দিয়ে প্রাণ-ভরে বাইরের বাতাস হতে নিঃশ্বাস নিল। সে মনে মনে বলল, সত্যিই কি দুঃখের। কী অদ্ভুত অপদার্থ লোকটা।

ক্রমশই চার্লস অসহ্য হয়ে উঠছিল এম্মার কাছে। যত বয়স বাড়ছিল চার্লস-এর ততই সে দেখতে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। সে যখন একমুখ ঝোল খেত বাটি থেকে তার মুখে প্রতিবার একটা করে অদ্ভুত শব্দ হত। সে কোন ভারী জিনিস তুললে তার চোখ দুটো কপালে উঠে পড়ত আর তার গালগুলো ফুলে উঠত।

চার্লস যখন পোষাক পরত বাইরে যাবার জন্য তখন এম্মা তার হাতের কাছে দস্তানাদুটো ছুঁড়ে দিত অথবা তার গলবন্ধটা সোজা করে দিত। কিন্তু এগুলো চার্লসএর প্রতি ভালবাসার জন্য করত না, করত তার নিজস্ব ক্রোধ আর অহঙ্কারের বশে।

কখনো কখনো বই পড়তে পড়তে যে সব ঘটনা বা চরিত্র তার ভাল লেগেছে তার বিষয় বলত চার্লসএর কাছে। বলত এই জন্য যে চার্লসএর মত অমন নির্বোধ শ্রোতা পাবে না কোথাও। সে বোকার মত নীরবে সব শুনে যায়, কোন প্রশ্ন বা তর্ক করে না। এম্মার কাছে মনে হয় তার পোষা কুকুর, আগুনের কাঠ আর ঘড়ির দোলকের মত চার্লস এক বস্তু।

তবু অন্তরের সুগভীর তলদেশে আর এক আশা জেগে থাকত এম্মার। সে ভাবত এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে তার জীবনে। কোন জাহাজডুবি বিপন্ন নাবিকের মত তার প্রতিহত পরিত্যক্ত জীবনের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি কাটাতে কাটাতে দূর কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে ছড়িয়ে দিত তার শূন্য দৃষ্টি। ভাবত সীমাহীন ব্যর্থতার এই তরঙ্গায়িত জলরাশি দূরে যেখানে নিচু-হয়ে-আসা নীল আকাশের প্রান্তরেখায় মিলিত হয়েছে সেখান থেকে যে কোন মুহূর্তে হয়ত সাদা পাল তোলা একটা জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য। ঠিক কখন কোন অনুকূল বাতাসে ভর করে সে জাহাজ আসবে, সে জাহাজ কেমন এবং কোথায় তাকে নিয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই তার।

তবু রোজ সকালে উঠেই তার মনে হয় আজ বুঝি আসবে সেই জাহাজ। সারাদিন সচকিত হয়ে থাকে এম্মা। প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শোনে। মাঝে মাঝে চমকে ওঠে। মনে হয় কেউ যেন ডাকছে। অথচ কেউ ডাকে না। কিছু না ঘটলেও মনে হয় যেন কিছু ঘটছে। এইভাবে দিনটা কেটে গেলে পরের দিনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে।

আবার বসন্ত এল। পীয়ার গাছে যখন কুঁড়ি ধরল তখন তার মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। জুলাই মাস পড়তেই কবে অক্টোবর আসবে তার জন্য দিন গুণতে লাগল। ভাবল আণ্ডারভিলার্স-এর মার্ক‌ুই হয়ত এবার আবার এক ভোজসভা ও নাচের আসরের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস কেটে গেলেও কোন চিঠি এল না। এই ভাবে হতাশার বেদনাটাও মন থেকে চলে গেলে অন্তরটা একেবারে শূন্য হয়ে গেল এম্মার। তখন তার মনে হলো আশা নিরাশায় আবদ্ধ বেদনা কোন কিছুই নেই তার মনে। এখন সে একেবারে মুক্ত, সম্পূর্ণ হালকা। আবার চলতে লাগল সেই একই রকমের দিনের দুঃসহ পুনরাবৃত্তি।

এইভাবে অসংখ্য দিন একের পর এক করে কেটে যেতে লাগল। অথচ কোন পরিবর্তন এল না। অন্য সব লোকের জীবন আপাততঃ দুর্বিসহ হলেও সে জীবনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। একটা পরিবর্তন ধীরে ধীরে তাদের ভাগ্যের গোটা কাঠামোটাকেই বদলে দেয়। কিন্তু তার জীবনে সে সম্ভাবনা নেই। এটা ঈশ্বরের অমোঘ বিধান। তার ভবিষ্যৎ হচ্ছে অন্ধকার এক সুড়ঙ্গ, অর্গলবদ্ধ এক দ্বারপ্রান্তে ঘটেছে যার নিঃশেষিত আত্মলোপ।

গান বাজনার চর্চা ছেড়ে দিয়েছে এম্মা। কি হবে আর গান বাজনা শিখে? কে শুনবে? সে ত কখনো এমন কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারবে না যার মধ্যে মখমলের গাউন পরে অসংখ্য আগ্রহী শ্রোতাদের সামনে এক সুন্দর পিয়ানোর রীডগুলোর উপর তার চাঁপার কলির মত আঙুলগুলো দ্রুত সঞ্চালিত হবে। সে অনুষ্ঠানের আয়োজন কখনো সে করতে পারবে না। সে দিন কখনো আসবে না। সুতরাং এত খেটে শিখে কি হবে? সে আঁকা ও সূচীশিল্পের সাজ-সরঞ্জামগুলোও বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে। এখানেও সেই এক কথা। শিখে কি হবে?

একদিন নিজের মনে মনে বলত এম্মা, আমি এমন অনেক কিছু পড়েছি যা পড়া দরকার। অথচ কি হবে? এক একদিন ঘরের আগুনের সামনে বসে জলন্ত কাঠের একটা অংশ ধরে থাকে। বাইরে বৃষ্টি পড়ে। আর জলন্ত আগুনের কাঠ ধরে সে বৃষ্টি পড়া দেখতে থাকে।

রবিবারটা তার সবচেয়ে খারাপ লাগত। খারাপ লাগত যখন সান্ধ্য উপাসনার জন্য ঘণ্টাধ্বনি হত চার্চে। এক নীরস সচেতনতার সঙ্গে সে ধ্বনি শুনত এম্মা। একটা বিড়াল পিঠ বাঁকিয়ে শেষ বিকালের একফালি রোদ

উপভোগ করত। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে ধুলো উড়ে আসত। কোথায় একটা কুকুর ডাকত। এই সব শব্দ দৃশ্যের মাঝে চার্চের ঘণ্টাটা একটানা বেজে চলত আর তার শব্দটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত গাঁয়ের শেষ প্রান্তে।

ক্রমে প্রার্থনার পর চার্চ থেকে লোকরা বেরিয়ে আসত। মেয়েরা পালিশ করা জুতো পরে থাকত। চাষী পুরুষরা থাকত সাদাসিদে পোষাক পরে। তাদের সামনে ছেলেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে আসত। এইভাবে গ্রাম্য চাষী মেয়ে-পুরুষরা চার্চ থেকে বাড়ি ফিরে যেত। এর পর শূন্য হয়ে পড়ত জনবিরল গ্রাম্য পথ। শুধু পান্থশালার সামনে পাঁচ ছ জন লোক জটলা করে কি খেলত।

অবশেষে শীত এল। এবার যেন শীতটা বেশী। প্রতিদিন সকালে জানালার সার্সিগুলো বরফে ঢেকে যেত এবং সূর্যের যে আলো সেই সার্সির ভিতর দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে আসত তার রংটা বরফের মতই সাদা এবং সারাদিন তার রংটা সেই রকমই থাকত। বেলা চারটে বাজতে না বাজতে আলো জ্বালতে হত।

কোন এক সূর্যালোকিত দিনে এম্মা গিয়েছিল তাদের বাগানে বেড়াতে। গিয়ে দেখল সকালের শিশির তখনো জড়িয়ে আছে বাঁধাকপির গাছগুলোতে। ঠিক যেন রূপালি সূতো। দারুণ শীত আর তুষারপাতের ফলে সব কিছু যেন জমে গেছে। সব কিছু স্তব্ধ হয়ে আছে। কোন পাখি গান গাইছে না। আঙুর গাছের লতাগুলো সাদা সাদা বড় বড় সাপের মত দেখাচ্ছিল।

বাগানে বেশীক্ষণ থাকতে না পেরে উপরতলায় নিজের ঘরে চলে গেল এম্মা। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আগুন জ্বালাল। কিন্তু আগুনের তাপের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির বোঝাটা আরো ভারী হয়ে উঠল তার বুকে। তার প্রায়ই ইচ্ছা জাগত নিচে গিয়ে ঝিটার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধে বাধত। তাই যেতে পারত না।

প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে স্কুলমাস্টার মাথায় সিল্কের টুপী পরে তার ঘরের দরজা খুলত। প্রতিদিন ঠিক এক সময়ে গাঁয়ের পুলিশ রাস্তা পার হত। তার তরোয়ালটা চকচক করত তার কোমরের পাশে। সকালে বিকালে তিনটে ঘোড়া নিয়মিত পুকুরে জল খেতে আসত। একটা কাফের দরজা খোলার সময় প্রায়ই টিংটিং শব্দ হত। আর চুলকাটার সেলুনটা দিনরাত চোখে পড়ত এম্মার। দমকা হাওয়ায় একবার সেলুনের জানালাটা খুলে গেলেই তার থেকে দেখতে পেয়েছিল ঘরের ভিতরে কোন সাজসজ্জা বা আসবাবপত্র বিশেষ নেই। পুরনো আমলের এই দোকানটাতে মোটেই বেশী খরিদ্দার আসে না। এম্মা দেখে এর দোকানদার তাই প্রায়ই মোড়ের মাথায় রাস্তার উপর খরিদ্দারের আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে হয়ত প্রায়ই দুঃখ করত এই জায়গায় তার কর্মদক্ষতা সব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। আজ যদি সে এই দোকানটা রুয়েন শহরে নদীর ধারে বা কোন রঙ্গালয়ের কাছে তুলে নিয়ে যেতে পারত তাহলে আমূল পাল্টে যেত তার ভাগ্যটা।

বিকালের দিকে বৈঠকখানার জানালা দিয়ে একটা মুখ যেন উঁকি মারে। সে মুখের দুধারে কালো গালপাট্টা। সে মুখে শান্ত সংযত অথচ বিস্তৃত এক হাসি। তারপর সঙ্গে সঙ্গে সেই ওয়ালৎস নাচের সুর বেজে ওঠে আর মনে হয় এক সুসজ্জিত ঘরে একদল মেয়ে পুরুষ নাচতে শুরু করে দেয়। লোকটা হাসি-মুখে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে তার হাঁটুটা উঠিয়ে বাদ্য-যন্ত্রটা তুলে তার দড়িটা আলগা করে নেয় গলায়। তারপর কখনো ধীর লয়ে কখনো দ্রুত লয়ে, কখনো বিষাদকরুণ, কখনো আনন্দোচ্ছল সুর বাজতে থাকে। এ সুর সাধারণতঃ যত সব নাচের অনুষ্ঠানে শোনা যায়। তবু সেই সুর অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকে এম্মার মাথায়। আর তার ভাবনাগুলো লঘু পদক্ষেপে নৃত্যরতা মেয়েদের মত একটা দুঃখ অন্য একটা দুঃখে লাফিয়ে যাওয়া আসা করতে থাকে। তারপর এম্মা একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিতে লোকটা তা তার টুপীর ভিতর ভরে নিয়ে বাদ্যযন্ত্রটা পিঠের উপর ফেলে চলে যায় ধীর পায়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অদৃশ্য হয়ে যায় পথের প্রান্তে এম্মা তাকিয়ে থাকে তার পানে।

তবে সবচেয়ে খারাপ লাগে এম্মার খাবার সময়ে। স্টোভের ধোঁয়ায় নিচের তলার এই ছোট্ট ঘরটা, ঝুল ও তেলকালি ভরা দেওয়াল, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দওয়ালা দরজা, স্যাঁতসেঁতে টালি দেওয়া মেঝে—সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তি-কর পরিবেশ। তার সামনে প্লেটের গরম মাংস হতে যখন ধোঁয়া ওঠে তখন তার মনে হয় তার অশান্ত আন্দোলিত অন্তরের তলদেশে যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে এ ধোঁয়া সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে ঘৃণার বাস্পধারা তাড়িত হয়ে। চার্লসএর খেতে রোজ দেরী হয়।

সহসা ঘর সংসারের উপর তার কর্তৃত্বের রশিটা আলগা করে দিল এম্মা। কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে কিছুই তার দেখত না, কোন দিকে কিছু খেয়াল করত না। চার্লসএর মা এবার তোস্তের বাড়িতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। পুত্রবধূর মনের এই আকস্মিক পরিবর্তনে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। এখন পোষাক আশাকের প্রতিও কোন মোহ নেই তার। আজকাল সারা দিনের মধ্যে একবারও পোষাক পাণ্টায় না। ধূসর রঙের সুতোর মোজা পরে। আজকাল ঘরে সস্তা বাতি জ্বালায়। আজকাল সে প্রায়ই বলে যেহেতু তারা ধনী নয়, সেইহেতু তাদের অনেক সাবধানে চলতে হবে। এখন সে বলে, তোস্তে জায়গাটা তার ভাল লাগছে, এখন সে সুখী সে তৃপ্ত। তবে তার শাশুড়ীর কোন উপদেশ আগের মতই মানত না এম্মা। একদিন চার্লসএর মা তাকে বললেন, ঝি চাকরদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে মালিকদের খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু এম্মা এ কথা সমর্থন করল না। উল্টে এমনভাবে তাকাল এবং এমনভাবে হাসল যাতে তার শাশুড়ীর সব উৎসাহ হিম হয়ে জমে গেল মুহূর্তে। সেই দিন হইতে পুত্রবধূকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে আসতেন না।

তবে আজকাল এম্মার মেজাজটা কেমন যেন খিটখিটে হয়ে গেছে। কোন কিছুতেই খুশি হতে চায় না সে। কোনদিন সে হয়ত ঝিকে কোন বিশেষ খাবার তৈরি করতে বলল তার জন্য, কিন্তু খাবার দিলে দেখা গেল সে তার কিছুই খেল না। কোনদিন সে টাটকা গরম দুধ খায়, আবার কোনদিন বারো কাপ চা খায়। আজকাল সে বাড়ি থেকে মোটেই বার হতে চায় না। এক একদিন অকারণে ঝিকে বকাবকি করে। কিন্তু পরক্ষণেই তাকে কিছু উপহার দেয়। অথবা কোথাও বেড়াতে যাবার অনুমতি দেয়। মাঝে মাঝে সে কোন ভিখারিকে তার রূপোর জিনিসপত্র যা আছে দিয়ে দেয়।

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে মঁসিয়ে রুয়ালত্ এলেন জামাইকে নিতে। তিনি তাঁর রোগ নিরাময় বার্ষিকী পালন করতে চান। আজ হতে এক বছর আগে চার্লস তাঁর ভাঙা পা জোড়া লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে প্রায় নতুন জীবন দান করে। তাই সেই বার্ষিকী তিনি পালন করতে চান। তোস্তের বাড়িতে তিন দিন থেকে গেলেন মঁসিয়ে রুয়ালত্। চার্লস দিনের প্রায় সব সময় রোগী দেখে বেড়ায়। তাই এম্মাই বেশীর ভাগ সময় তার বাবাকে সাহচর্য দান করত। মঁসিয়ে রুয়ালত্ তার মেয়ের ঘরে যখন তখন ধূমপান করতেন, যেখানে সেখানে থুথু ফেলতেন, সব সময় জমি ফসল, গরু ভেড়া মুরগীর কথা বলতেন যা মোটেই ভাল লাগত না এম্মার। তাই মঁসিয়ে রুয়ালত্ যখন বিদায় নেন, এবং তাঁকে বিদায় দিয়ে যখন বাড়ির সদর দরজা বন্ধ করে দেয় এম্মা তখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। নিজের এই স্বস্তিতে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায় এম্মা। শুধু নিজের বাবা নয়, এবার থেকে সব কিছুই ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে সে। সব কিছুতে প্রতিবাদ করা তার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। যে বিষয় সকলে সমর্থন করে ও তার প্রতিবাদ করে, আর কেউ যা সমর্থন করে না ও তা সমর্থন করে। তার রকম দেখে চার্লস এক একসময় তাঁর মুখপানে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

এই অবস্থা কি দীর্ঘদিন চলবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল এম্মা। আসলে তার দোষ কোথায়? সে ত সম্ভ্রান্ত মহিলার মতই রূপে গুণে সমৃদ্ধ। সে ত অনেক ডিউকপত্নী ও মার্কুইপত্নীকে দেখেছে। তবে তার ভাগ্য এমন হলো কেন। এক এক সময় এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পেয়ে দেওয়ালের উপর মুখ রেখে কাঁদে এম্মা। যারা উচ্ছৃংখল অমিতব্যয়ী জীবন যাপন করে, যারা প্রায়ই নাচের আসরে যোগ দেয়, হৈ-হুল্লোড় করে তাদের প্রতি ঈর্ষা হয় এম্মার।

দিনে দিনে শরীরটা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল এম্মার। তার হৃৎপিণ্ডের গতিটা বেড়ে গেল। দেখে মনে হল গায়ে রক্ত নেই। চার্লস তাকে ওষুধ দিল। খাওয়ার ওষুধ ছাড়া কর্পূর জলে চান করতে বলল।

কোন কোন দিন সে অতিশয় বক বক করে কথা বলে যেত। কথা বলতে

বলতে খুব বেশী রকমের উত্তেজিত হয়ে পড়ত। কিন্তু এই ধরনের ঘটনার পরেই সে মৌন হয়ে পড়ত। সে কারো সঙ্গে কোন কথা বলত না, অথবা নড়াচড়া করত না। এইসব ক্ষেত্রে সে নিজেই ওডী কোলনের সাহায্যে নিজেকে সারিয়ে তুলত।

যেহেতু এম্মা প্রায়ই এর আগে তোস্তের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলত, জায়গাটা সম্বন্ধে নানা অসুবিধার কথা বলত তাই চার্লস ভাবল এ জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে সে। এই জায়গাটাই এম্মার অসুখের কারণ। সুতরাং অন্য জায়গায় গিয়ে বসবাস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভিনিগার খেতে লাগল এম্মা তার পানীয়ের সঙ্গে। তাতে তার ওজন কমে গেল, শুকনো কাশি দেখা দিল। খিদেটাও একেবারে কমে গেল।

চার বছর তোস্তেতে বাস করার পর যখন ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে উঠছিল ঠিক তখনি এ জায়গা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হয়নি চার্লসএর। তবু চার্লস এটা কি করে ফেলল। সে প্রথমে তার স্ত্রীকে সোজা রুয়েনে নিয়ে গেল। তার এক শিক্ষক ডাক্তারের কাছে দেখাতে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, এটা স্নায়বিক দৌর্বল্য। বায়ু পরিবর্তন করলেই ভাল হয়ে যাবে।

এখানে সেখানে কাজের জন্য চেষ্টা করে অবশেষে জানতে পারল এম্মা নফশাতেন জেলার অন্তর্গত ইয়নভিল নামে একটা জায়গায় এক পোল্যাণ্ড-দেশীয় ডাক্তার থাকতেন। মাত্র এক হপ্তা আগে তিনি চলে গেছেন সে জায়গা থেকে। চার্লস তাই সেখানকার এক ওষুধের কারবারীকে সব ঘটনা জানতে চেয়ে চিঠি দিল। ও-অঞ্চলের লোকসংখ্যা কত, ওখান থেকে কত দূরে আর ডাক্তার আছে। এবং আগের ডাক্তার বছরে কত টাকা রোজগার করতেন এই সব জানতে চাইল। সে যখন এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেল তখন সে ঠিক করে ফেলল আগামী বসন্তকালেই সেখানে চলে যাবে এম্মার শরীরের কোন উন্নতি না হলে।

একদিন তার ড্রয়ারটা ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ তার আঙুলে কাঁটার মত কি বিঁধল। দেখল রূপোর তার দিয়ে বাধা তাদের বিয়ের ফুলের তোড়া অর্থাৎ কাগজের কমলালেবু ফুল।

ফুলের তোরা জলন্ত আগুনে নিয়ে গিয়ে তাতে ফেলে দিল এম্মা। তার চোখের সামনে সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কালো প্রজাপতির কাগজের ফুলের পোড়া পাতাগুলো বাতাসে উড়ে গেল চিমনি দিয়ে।

মার্চ মাসে চার্লস যখন সপরিবারে তোস্তে ত্যাগ করল তখন মাদাম বোভারী অন্তঃসত্ত্বা।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

ইয়নভিল লাভারে রুয়েন থেকে কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত একটি বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক আধা শহর। রীউল নদীর উপত্যকার মাঝে বড় রাস্তার উপর আব্বেভিল ও বোভয়ের মাঝখানে অবস্থিত জায়গাটা। রীউল আঁদেল নদী হতে বেরিয়ে অন্য এক বড় নদীতে গিয়ে পতিত হয়েছে।

ইয়নভিল যেতে হলে বড় রাস্তা ধরে লা বোসিয়ের পর্যন্ত গিয়ে অন্য এক পথ ধরতে হয়। লে লো পাহাড়ের আগে পর্যন্ত পথটা সমতল। তারপর পথটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে। কিন্তু পাহাড়টা পার হলেই উপত্যকার দৃশ্যটা চোখে পড়ে। এই উপত্যকার বিশাল দৃশ্যপটটাকে রীউল দুভাগে ভাগ করেছে। বাঁদিকে যতদূর দেখা যায় সব পশুচারণ ক্ষেত্র আর ডান দিকে সব কৃষিযোগ্য ভূমি। বাঁদিকের পশুচারণক্ষেত্রটা ব্রে প্রান্তর পার হয়ে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড়ে গিয়ে উঠে গেছে। এদিকে নদীর এধারে অর্থাৎ পূর্বদিকে মাঠটা ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে এদিকে গেছে। সারা মাঠটা ভর্তি সোনালি ফসলে। পাকা ফসলেভরা সোনালি মাঠ আর সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটা রূপালি সুতোর মত দেখাচ্ছিল। মাঠ নদী উপত্যকা সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল একখানা বিচিত্র বর্ণের কাপড় যার জমিটার উপর সোনালি সবুজ ও রূপালি পাতার কাজ করা।

ইয়নভিলের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আর্গুয়েলের বিশাল অরণ্য শুরু হয়েছে। ধূসর পাহাড়ের পটভূমিকায় সবুজ বন আর সেণ্ট জাঁ চার্চের লাল ইটের বাড়িটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে।

এখানে নর্মাণ্ডি, পিকার্ডি, ও হে দে ফ্রান্স এই তিনটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে যেসব অধিবাসী থাকে তাদের ভাষার মধ্যে কোন লালিত্য নেই। এখানকার বন্ধুর পার্বত্যভূমির মতই এখানকার ভাষাও কর্কশ। এখানে চাষ আবাদ ভাল হয় না। এখানকার মাটি শক্ত এবং অমুর্বর বলে এখানে কৃষিকার্য করতে হলে প্রচুর টাকা দরকার। এখানকার মাটিতে বালি আর পাথরই বেশী।

১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ইয়নভিল যাবার কোন বাঁধা বা পাকা রাস্তা ছিলনা। সেই সময় আব্বেভিল আমিয়েন্স পর্যন্ত বড় রাস্তা হয় এবং সে রাস্তা দিয়ে রুয়েন ও ফ্যাণ্ডার্সেও যাওয়া যায়। সেই রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ইয়নভিল। ব্যবসা বাণিজ্যের উপযুক্ত পরিবহনব্যবস্থা ও কৃষিকার্যের উন্নততর পদ্ধতি হাতের কাছে পেয়েও ইয়নভিল তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। আগের মতই অনুন্নত রয়ে গেছে সেখানকার লোকগুলো। তারা আগেকার পশুপালনকেই জীবিকার্জনের

একমাত্র উপায় হিসাবে আঁকড়ে ধরে আছে। ইয়নভিল গাঁটা অবশ্য নদীর ধারেই বেশী বেড়ে উঠেছে। নদীর ওপার থেকে নদীতীরবর্তী গাঁটা দেখতে মনে হয় একপাল গরু দুপুরের কোন এক মাঠে চরতে চরতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঝিমোচ্ছে।

পাহাড়ের উপর পৌছে রীউল নদীটা পার হয়েছে গাঁয়ের রাস্তাটা। নদীর সেতুটা পার হওয়ার পর থেকে রাস্তার দুধারে শুরু হয়েছে গভীর বন। মাঝে মাঝে দু-একটা বাড়ি ছড়িয়ে আছে বনের মাঝে। প্রথম প্রথম পথের ধারে বনের মাঝে মাঝে কিছু খড়ের ঘর দেখা গেল। তারপর কিছু পাকা বাড়ি দেখা গেল। বন জঙ্গল অদৃশ্য হয়ে গেল এবং বাড়িগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট দেখা যেতে লাগল। অবশেষে একটা রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা বাড়ি। এদিকে একটা কামারশাল। রাস্তার খানিকটা অংশ জুড়ে অবস্থিত এই সাদা বাড়িটা হচ্ছে এই শহরের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাড়ি। এ বাড়ির মালিক হচ্ছে সুদবন্ধকী কারবারের মালিক।

সাদা বাড়িটা ছাড়িয়ে কিছুদূর গেলেই গাঁয়ের চার্চ পাওয়া যায়। চার্চের চারদিকে ঘিরে আছে এক কবরখানা এবং তার চারদিকে আছে একটা বুকভোর দেওয়াল। কবরখানা অনেক কালের পুরনো। এত পুরনো যে সমাধি স্তম্ভগুলো ভেঙ্গে গিয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। চার্চটা আগে দশম চার্লসএর রাজত্বকালের শেষের দিকে মেরামৎ করা হয়। কিন্তু কাঠের ছাদটায় পলকা পড়ে গেছে এবং তাতে কালো কালো ফুটো দেখা যাচ্ছে। চার্চের মধ্যে হলঘরে একটা বসার গ্যালারী আছে এবং কাঠের জুতো পরে গাঁয়ের নরনারীরা প্রার্থনা করার জন্য যখন সে ঘরে ঢোকে তখন তাদের সেই পদশব্দটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় সারা ঘরখানায়। চার্চের মধ্যে এক জায়গায় একটা মেরির মূর্তি আছে। মূর্তির গাটা লাল রঙে রাঙানো। মাথায় তারকাখচিত এক অবগুণ্ঠন এবং পরণে একটা গাউন।

গাঁয়ের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বাজার। বাজারের কাছেই টাউন হল। টাউন হলটা দেখে সবাই বলবে নিশ্চয় প্যারিসের কোন স্থপতি এসে এটা করেছে। দেখে মনে হবে যেন এক গ্রীসদেশীয় মন্দির। এর নিচের তলায় আছে বিরাট বড় বড় থাম আর কতকগুলো বড় বড় জানালা। তার মাথার উপর একটা মোরগের মূর্তি। তার একটা পায়ে শাসনতন্ত্রের একটা বই আর একটা পায়ে ন্যায়বিচারের দণ্ড।

বাজারের পরেই যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সকলের সেটা হলো মঁসিয়ে হোমা-র ওষুধের দোকান। হোমা-র ওষুধের দোকানটা সবচেয়ে ভাল দেখায় রাত্রিবেলায় যখন আলোয় আলো হয়ে ওঠে দোকানটা আর সেই আলোয় দোকানঘরের জানালাগুলোতে সাজিয়ে রাখা নীল লাল কাচের জারগুলো বড় সুন্দর দেখায়। সেই আলোয় ডেস্কের উপর ঝুঁকে বসে থাকা

দোকানের মালিক ছোটখাটো মানুষ হোমাকেও উজ্জ্বল দেখায়। দোকানের সামনে সোনালি অক্ষরে লেখা আছে 'হোমার' ফার্মেসী।' কাউণ্টারের কাছে একটা ওষুধের বিভিন্ন উপাদান, ওজন করার একটি দাঁড়িপাল্লা আছে। তার পিছনে 'লেবরেটারী' এই কথাটা লেখা আছে। আবার তার পিছনে সোনালি অক্ষরে 'হোমা' এই কথাটা লেখা আছে।

এ ছাড়া ইয়নভিল গাঁয়ে আর কিছু দেখার নেই। রাস্তার দুপাশে শুধু পর পর কয়েকটা দোকান। তারপর রাস্তাটা সরু হয়ে একদিকে মোড় ফিরে চলে গেছে চার্চের দিকে।

আগে একবার যখন কলেরা মহামারীরূপে দেখা দেয় তখন এই পুরনো আমলের চার্চটার সংস্কার হয়। এই চার্চের দেখাশোনা করত যে লোকটি সে আবার চার্চের ছোট হয়ে যাওয়া কবরখানার একধারে কিছু আলুর চাষ করত। এক একবার মহামারী হয় আর তাতে বহু লোক মারা যাওয়ার ফলে কবরখানাটা ছোট হয়ে যায়।

মঁসিয়ে লে কুরে একদিন চার্চের সেই প্রহরীটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মৃতদের কথা ভাবছ ?

প্রহরী লেস্তিবুদয় তখন বুঝতে পারেনি লে কুরের কথাটা। লে কুরের কোন কথায় কান না দিয়ে আলু বসিয়ে যায়। আর লোকের কাছে বলে ওগুলো আপনা থেকে গজিয়ে উঠেছে।

বোভারী পরিবার ইয়নভিলের হোটেলে যে সন্ধ্যায় আসার কথা সেই সন্ধ্যায় হোটেলের মালিক বিধবা লা ফ্রাঁসোয়া দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার সসপ্যানটা নিয়ে অনবরত ঘোরাফেরা করছিল। আগামী কাল হাটবার গাঁয়ে। কিন্তু আজ রাতেই তাকে মাংস তরিতরকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে ঠিক করে রাখতে হবে। মাংস কিনে ছাড়িয়ে সব ঠিক করছে। হোটেলে যে সব বাসিন্দা আছে তাদের ছাড়াও,আজ রাতে ডাক্তার দম্পতি আসবে। তাদের জন্য সব নৈশভোজের ঠিক করতে হবে।

হোটেলের বিলিয়ার্ড খেলার ঘর থেকে হাসির শব্দ আসছিল। ছোট খাবার ঘরটাতে তিনজন লোক ব্রাণ্ডি খাচ্ছিল। আগুনে কাঠ পুড়ছিল, কয়লা পুড়ছিল উনোনে। আর রান্নাঘরের লম্বা টেবিলটায় কাঁচা ভেড়ার মাংসের কাছে অনেক প্লেট জড়ো করা ছিল। হোটেলের উঠোন থেকে মুরগীর বাচ্চাগুলোর ভীত সন্ত্রস্ত আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কারণ হোটেলের ঝি ওদের মারার জন্য ওদের ধরতে যাচ্ছিল।

মাথায় টুপী আর পায়ে সবুজ চামড়ার চটি পরে একজন ভদ্রলোক আগুনের দিকে পিঠটা দিয়ে আরাম করে বসেছিল। তার মুখে ছিল গুটি বসন্তের দাগ। কিন্তু সে মুখে ছিল আত্মতৃপ্তির ছাপ। তাকে দেখলেই বোঝা যায় জীবনে সে সুখী, খাঁচার পাখির মতই সুখী। ভদ্রলোক হলো সেই ওষুধের

দোকানের মালিক হোমা।

হোমাকে দেখে হোটেলের মালিকগিন্নী তার ঝিকে ডেকে বলল, আর্তেমিসে কিছু মাংসের চপ করো, মদ আনো। তাড়াতাড়ি করো।

হোটেলের মালিক গিন্নী তারপর হোমাকে বলল, দেখুন মঁসিয়ে হোমা, আপনি যাদের জন্য অপেক্ষা করছেন সেই লোকগুলিকে নিয়ে আমি যে কি করব বুঝতে পারছি না। আবার একবার খেলা। ওরা ভ্যান গাড়িটা কোথায় ফেলে এসেছে, কেন ওরা ত সেটা গাড়ি রাখার চালায় রাখতে পারে। বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে হোমা, আজ সকাল থেকে ওরা পনের বার বিলিয়ার্ড খেলেছে আর আট পাত্র মদ খেয়েছে। কিন্তু তারা আবার খেলার টেবিলটা নষ্ট করে দিচ্ছে।

খেলোয়াড়দের পানে একবার তাকিয়ে চামচ মুখে কথাটা হোমাকে বলল মালিকগিন্নী।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল বিধবা মালিকগিন্নী, আবার একটা টেবিল।

হোমা বলল, কিন্তু এটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া, আমি আবার বলছি। আমি বলছি নতুন একটা বিলিয়ার্ড টেবিল না কেনা তোমার ভুল হচ্ছে। এটা পরিষ্কার দূরদর্শিতার অভাব। তোমার ভাবা উচিত আজকের খেলোয়াড়রা আগেকার যুগের মত বিলিয়ার্ড খেলে না। সব কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের অবশ্যই বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। একবার টেনিয়ারের দিকে নজর দিয়ে দেখ।

হোটেলওয়ালী রাগে লাল হয়ে উঠল।

দোকানদার হোমা বলল, যা বলবে বল, তার বিলিয়ার্ড টেবিল কিন্তু তোমার টেবিলের থেকে অনেক ভাল। যদি কোন টুর্ণামেণ্ট খেলা হয়, তা সে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বা লায়ন্সএর বন্যাত্রাণ যার জন্যই হোক না কেন—

তার ভারী কাঁধটা দুলিয়ে হোটেলগিন্নী বলল, তার জন্য আমরা ভয় করি না। কিছু ভেবো না মঁসিয়ে হোমা। যতদিন আমাদের লায়ন দ্য ওর থাকবে আমাদের খরিদ্দারের কোন অভাব হবে না। আমাদের এই হোটেল পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত। আর কাকে ফ্রান্সের কথা বলছ? দেখবে কোন একদিন সকালে নোটিশ ঝুলছে দোকানের জানালায়। তাতে লেখা থাকবে দোকান বন্ধ। আর নতুন বিলিয়ার্ড টেবিলের কথা বলছ? ভাল কথা। কিন্তু আসল কথা কি জান? বর্তমানে যে টেবিলটা রয়েছে তা যেমন নাড়া-চাড়া করতে সুবিধাজনক, তেমনি ধোয়ার পক্ষেও ভাল। আর শিকারের সময় এই টেবিলটায় ছয়জন ভালভাবে শুতে পারে। কিন্তু হিভার্তের ব্যাপারে কি করা যায় বলত?

হোমা বলল, ওকে আগে আসতে দাও? ও এসে তোমার হোটেলের

লোকদের সব খাওয়াবে।

তারপর মঁসিয়ে বিনেটকে নিয়ে কি করবে? ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে এসে হাজির হবে। মনে হয় তার মত নিয়মানুবর্তী লোক জগতে দেখতে পাবে না। সে প্রায় সব সময় এক জায়গায় বসে থাকবে ছোট ঘরখানায়, সে মরবে তবু অন্য কোন জায়গায় বসে খাবে না। আবার মদের প্রতি সে বেশ সচেতন। সে মঁসিয়ে লীয়ঁর মত হতে পারল না। মঁসিয়ে লীয়ঁ সাতটা সাড়ে সাতটার আগে আসে না। খাওয়ার দিকে খেয়াল নেই। যা পায় তাই খায়। এমন ভাল যুবক দেখাই যায় না।

হোমা বলল, হ্যাঁ মাদাম তা বটে। ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়ার একটা দাম আছে। একমাত্র সেনাদলে যেটুকু শিক্ষা হয়েছে এমন এক কর-আদায়কারী আর ভাল বংশের ছেলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

এমন সময় ঘড়িতে ছটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে বিনেট হোটেলে ঢুকল। বিনেটের চেহারাটা রোগা। সে একটা নীল ফ্রক কোট পরে ছিল। মাথায় ছিল একটা চামড়ার টুপী। তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় সে খুব চালাক। সে খুব ভাল তাস দেখতে পারে। শিকারী হিসেবেও ভাল। তার হাতের লেখা ভাল। সে আবার ছবি আঁকতেও পারে। তার হাতের নানারকমের কাজ দিয়ে সে ঘর সাজিয়ে রেখেছে।

বিনেট হোটেলে ঢুকে সোজা তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঘরের কাছে গিয়ে দেখল তিনজন লোক আগে থেকে বসে আছে সে ঘরে। ও এই ঘরের এক কোণে বসে খাবে। কিন্তু এই তিনজন লোক বেরিয়ে না এলে ও ঢুকতে পাবে না। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল বিনেট। লোকগুলো বেরিয়ে এলে ঘরে ঢুকে মাথার টুপীটা খুলে রাখল এক জায়গায়।

হোমা হোটেলওয়ালীকে বলল, লোকটা ভদ্রতা বা সৌজন্যের খাতিরে একটা কথাও বলতে জানে না।

হোটেলওয়ালী বলল, দরকারের বেশী একটা কথাও বলে না লোকটা। গত সপ্তায় দুটো লোক কাপড় বিক্রী করতে এসেছিল। দুজনই খুব মজার লোক। সে আমাকে যে সব গল্প বলছিল তা শুনতে শুনতে আমি ত হেসে খুন হয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে হোমা, বিনেট সর্বক্ষণ পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল। একটা কথাও বলল না।

হোমা বলল, বলবে কি করে, লোকটার মধ্যে কোন কল্পনা, বুদ্ধি বা ভদ্রতা জ্ঞান বলে কোন জিনিসই নেই।

হোটেলগিন্নী বলল, তবু লোকে বলে লোকটার নাকি এক বিশেষ গুণ আছে।

হোমা বিরক্ত হয়ে বলল, ওর মধ্যে কি যে আছে তা শুধু ও-ই জানে।

হোটেলমালিক-গিন্নীকে চুপ করে থাকতে দেখে হোমা নিজেই বলে চলল,

যারা বড় কাজ করে তারা অবশ্য মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আমার সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের জানাশোনা আছে। যেমন ধরো ডাক্তার, উকীল, দোকানমালিক। তারা সবাই ভারী কাজ করতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। যেমন ধরো আমিই সেদিন ওষুধের শিশির উপর লেবেল লিখতে গিয়ে কলমটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ইতিমধ্যে মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়রা চলে গেছে কি না। এমন সময় কালো পোষাকপরা একজন লোক রান্নাঘরে ঢুকতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া। বলল, আপনাকে কিছু দেব মঁসিয়ে লে কুরে? এক গ্লাস পানীয়?

লে কুরে ভদ্রভাবে আপত্তি জানিয়ে বললেন, তার কোন দরকার হবে না। বললেন, তিনি তাঁর ছাতাটা আনিমঁতের কনভেণ্টে ফেলে এসেছেন। ভেবেছিলেন, হর্ণদেল হয়ত তাঁর ছাতাটা হোটেলে নিয়ে যাবে। যাই হোক, ছাতাটা যেন আজ সন্ধ্যের মধ্যে তাঁর চার্চে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া।

লে কুরে চার্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। চার্চে তখন ঘণ্টা বাজছে।

লে কুরের পদশব্দটা উঠোনে মিলিয়ে যেতেই হোমা টিপ্পনি কেটে বলল, লে কুরের আচরণটা আপত্তিজনক, মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়। তিনি কেন পানীয় গ্রহণ করলেন না? অথচ অন্যান্য যাজকরা এই সব পানীয় খায়, তাই এটা অন্যান্য যাজকদের বিরুদ্ধে একরকম যুদ্ধ ঘোষণা। আমরা আবার পুরনো সেই দিনগুলো ফিরিয়ে আনব।

মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া কুরের স্বপক্ষে কিছু বলল। বলল, কুরের গায়ে শক্তি আছে। সে তোমার মত চারটে লোককে জব্দ করে রাখবে। গত বছর উনি একা দুটো খড়ের বাণ্ডিল বয়ে আনেন।

'ব্রাভো!' বলে চিৎকার করে উঠল হোমা। বলল, বল বল, তাহলে ত তোমার মেয়েদের এর কাছে স্বীকারোক্তির জন্য পাঠাতে হয়। কিন্তু আমার হাতে যদি শাসনক্ষমতা থাকত তাহলে প্রতি মাসে আমি একজন করে যাজকের রক্তপাত ঘটাতাম। নীতি আর শালীনতার খাতিরে এ কাজ আমায় করতেই হত।

খুব হয়েছে মঁসিয়ে হোমা। আমাদের ধর্মের উপর আপনার কোন শ্রদ্ধা নেই।

আমি বরং একজন পরম ধার্মিক লোক। তবে আমি অবশ্য আমার নিজের মত করে ধর্ম মেনে চলি। তবে জেনে রাখবে আমি এই সব চালবাজ বুজরুকি-ওয়ালা লোকদের থেকে বেশী ধার্মিক। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমিও ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি তাঁকে বিশ্বের পরম স্রষ্টা হিসাবে মানি। তিনি যেই হোন। তিনি আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন নাগরিক ও পিতা-

মাতারূপে আমাদের আপন আপন কর্তব্য পালন করার জন্য। কিন্তু আমি চার্চে যাবার কোন প্রয়োজন মনে করি না। যে সব বাজে লোকগুলো তোমার আমার থেকে অনেক বেশী ভাল খায় টাকা খরচ করে তাদের খাইয়ে মোটা করে কি হবে বলতে পার? ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি জাগাবার জন্য মানুষকে চার্চে যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। অরণ্যে মাঠে প্রান্তরে যে কোন জায়গায় থেকে মানুষ তা করতে পারে। এমন কি শুধু শূন্য আকাশের পানে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও মানুষ ঈশ্বরকে স্মরণ করতে পারে, তাঁর উপাসনা করতে পারে। প্রাচীন কালের লোকেরা তাই করত। আবার ঈশ্বর হচ্ছে সক্রেটিস, ফ্রাঙ্কলিন, ভলতেয়ার ও বিরেঞ্জারের ঈশ্বর। আমার ধর্ম হচ্ছে রুশোর ধর্ম। আমার নীতি সমাজসম্মত নাও হতে পারে। আমি এমন কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি তাঁর বন্ধুদের হাঙ্গরের পেটে বাস করতে পাঠিয়ে নিজে ছড়ি ঘুরিয়ে বাগানে বেড়াতে থাকেন এবং তিন দিন পরে প্রেতাত্মাকে ত্যাগ করে আবার জীবনের মাঝে ফিরে আসেন। এগুলো শুধু অবাস্তর নয়। এগুলো প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। এর দ্বারা একথাই প্রমাণ হয় যে পুরোহিত ও যাজকরা নিজেদের সীমাহীন অজ্ঞতার প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে। তারা জগতের সবাইকে নিজেদের সেই অজ্ঞতার স্তরে নামিয়ে আনতে চায়।

কথা শেষ করে হোমা চারদিকে চাইল। কেউ তার কথা শুনছে কি না একবার দেখে নিল। আবেগের সঙ্গে সে যখন কথা বলছিল তখন তার মনে হচ্ছিল সে যেন গ্রামের কোন সভায় ভাষণ দিচ্ছে। কিন্তু হোমা দেখল তার কাছে কেউ নেই। হোটেলওয়ালী গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেয়ে চলে গেছে।

দেখতে দেখতে হলদে রঙের একটা বড় দুচাকাওয়ালা গাড়ি এসে থামল হোটেলের উঠোনে। গাড়িটা ছিল তিন ঘোড়ায় টানা। সামনে একটা ও তার পিছনে দুটো।

গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সব লোক হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল। গিয়ে আগন্তুকদের একসঙ্গে নানা রকমের প্রশ্ন করতে লাগল। কেন এত দেরী হলো আসতে, কি কি মালপত্র আছে ইত্যাদি। হোটেলের কর্মচারি হিভার্ত একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর কি করে দেবে তা বুঝে উঠতে পারল না। সে গাড়িতে উঠে একে একে সব মালগুলো উঠোনে ফেলতে লাগল।

একটা দুর্ঘটনার জন্য ওদের দেরী হয়ে যায়। গাড়িতে আসতে আসতে মাদাম বোভারীর গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা মাঠের মাঝে কোথায় পালিয়ে যায়। পথের মাঝে গাড়ি থামিয়ে প্রথমে ওরা শীষ দিয়ে কুকুরটাকে ডাকতে থাকে পনের মিনিট ধরে। তারপর হিভার্ত গাড়ি চালিয়ে ওদের আসার সময় গাড়িটাকে এদিক ওদিক প্রায় মাইল খানেক ঘুরিয়ে খোঁজ করে কুকুরটার। কিন্তু কোথাও

পাওয়া যায়নি। তখন এম্মা কাঁদতে থাকে। সব দোষ চার্লসএর উপর চাপিয়ে দেয়। মঁসিয়ে লেহুড়ে নামে ইয়নভিলের এক দোকানদার গাড়িতে ওদের সঙ্গে ছিল। লেহুড়ে সান্ত্বনা দিতে লাগল এম্মাকে। কত হারানো কুকুর বহু বছর পর তাদের প্রভুদের কাছে ফিরে আসে—তার উদাহরণ দিলে। একবার একটা হারানো কুকুর কনস্তান্তিনোপল থেকে প্যারিসে ফিরে আসে হেঁটে। আর একটা হারানো কুকুর চারটে নদী সাঁতারে পার হয়ে একশো পঁচিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে ফিরে আসে তার প্রভুর কাছে। তাছাড়া তার বাবার একটা হারানো কুকুর বারো বছর পর তার বাবা যখন কোন এক রাত্রিতে রাস্তা দিয়ে তার বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিল তখন হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

২

মাদাম বোভারী প্রথমে বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। তারপর এল ফেলিসিতে লেহুড়ের একজন ধাত্রী। গাড়ির এককোণে বসে থাকা চার্লস সন্ধ্যে হতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল পথে। তাকে ডেকে জাগাতে হলো।

হোমা নিজে এসে তাদের সঙ্গে পরিচয় করল। ভদ্রভাবে সৌজন্যের সঙ্গে মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারীকে বলল, সে তাদের সেবা করার জন্য প্রস্তুত। তারপর আন্তরিকতার সুরে বলল, সে নিজে নিজেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে অযাচিতভাবে, সে তাদের নৈশভোজনে অংশগ্রহণ করবে। তার স্ত্রী আজ গাঁয়ে নেই।

মাদাম বোভারী রান্নাঘরে ঢুকেই সোজা আগুনের কাছে চলে গেল। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে তার পোষাকের আঁচল ধরে জলন্ত কাঠের আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সেই আগুনের আভায় তার গোটা চেহারাটাকে দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে চোখ দুটো বন্ধ করছিল সে। মাঝে মাঝে রান্নাঘরের আধ খোলা দরজা দিয়ে দমকা বাতাস এসে তার চেহারাটাকে উজ্জল করে তুলছিল। আগুনের অন্য দিক থেকে একটি যুবক নীরবে লক্ষ্য করছিল মাদাম বোভারীকে।

এই যুবকের নাম মঁসিয়ে লীয়ঁ দুপুই। কোন এক সোনা রূপোর দোকানের কেরাণী সে। সে এই হোটেলে নিয়মিত খেতে আসে। তবে সে রোজ রাত করে খায়। সন্ধ্যে থেকে ইয়নভিল শহরটাকে বড় বৈচিত্র্যহীন লাগে তার। তাই সে রোজ সন্ধ্যের পর বেশী রাত করে খায়। কারণ সে ভাবে, যদি কোন নতুন লোক হোটেলে আসে তাহলে তার সঙ্গে কিছু কথা বলা যাবে। গল্প গুজব করা যাবে। এক একদিন যখন তার অফিসে কোন কাজ থাকে না তখন সকাল করে চলে আসে হোটেলে। বিনেটের সঙ্গে খেতে খেতে দু একটা কথা বলে।

আজ হোটেলে নতুন লোক আসবে বলে মাদাম লেফ্রাঁসোয়া দুপুইকে বলেছিল আজ সে একসঙ্গে নৈশভোজন করবে।

তাই নৈশভোজনের সময় খাবার ঘরে চারজনের খাবার জন্য টেবিল সাজানো হলো। মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারী, হোমা আর দুপুই। হোমা খেতে বসে প্রথমে অনুমতি চেয়ে নিল সে মাথায় টুপীটা পড়ে থাকবে, কারণ তার মাথায় ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে। তারপর সে এম্মার পানে তাকিয়ে বলল, মাদামকে দেখে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। হোটেলের পুরনো গাড়িটা এমন লাফায় যে গায়ে ব্যথা হয়ে যায়।

এম্মা বলল, তা হয়ত হয়। কিন্তু তবু আমি কোথাও যাওয়া আসা করতে ভালবাসি। নতুন জায়গার দৃশ্য দেখতে ভালবাসি।

কেরাণী লীয়ঁ বলল, এক জায়গায় বেশীদিন থাকা যে কি কষ্টকর!

চার্লস বলল, আমার মন অনবরত ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়াতে—

লীয়ঁ এম্মাকে লক্ষ্য করে বলল, ঘোড়ায় চাপার থেকে আনন্দদায়ক ব্যাপার আমার কাছে আর কিছু নেই। তবে অবশ্য যদি আপনার সময় ও সুযোগ থাকে।

হোমা বলল, আমাদের এ অঞ্চলে অবশ্য ডাক্তারি করাটা খুব একটা কষ্টকর হবে না। কারণ এখানে রাস্তাঘাট ভাল। চাষীদের অবস্থাও ভাল বলে টাকা পয়সাও ঠিকমত দেবে। এখানে খুব একটা জটিল রোগ পাবেন না। এখানকার লোকদের যে সব রোগ বেশী হয় তা হলো আমাশয়, ব্রঙ্কাইটিস, লিভারের রোগ আর ফসল ওঠার সময় একজ্বরী জ্বর। গ্রামাঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা বড়ই খারাপ। এই গ্রামাঞ্চলে রোগী দেখতে গিয়ে আপনাকে গ্রামের কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। বুঝলেন মঁসিয়ে বোভারী, আপনার চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত অনেক প্রচেষ্টা প্রাচীনপন্থী গ্রাম্য লোকদের কুসংস্কারের চাপে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারা গোঁড়ামির সঙ্গে প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এখনো প্রচুর লোক রোগ হলে ডাক্তারের কাছে না এসে যাজক বা পুরোহিতদের কাছে যায়। নানারকম টোটকা ওষুধ ব্যবহার করে। আমাদের এখানকার জলবায়ু খুব একটা খারাপ নয়। তবে শীতকালে তাপমান যন্ত্রের মাত্রাটা চার ডিগ্রী নেমে যায় আর গ্রীষ্মের সময় তাপমানটা চব্বিশ পঁচিশ সেন্টিগ্রেডে উঠে যায়। আপনি দেখুন একদিকে আগুয়েল অরণ্য উত্তরের হিমেল বাতাস থেকে আমাদের রক্ষা করছে আর একদিকে পশ্চিমাবায়ুর ঝড় থেকে আমাদের রক্ষা করছে সেন্ট জঁ। পাহাড়। তবে আমাদের এই শহরটায় ভাপসা গরম দেখা যায় কারণ হলো ঐ নদীটা আর পশুচারণ ক্ষেত্র। পশুর পাল থেকে প্রচুর হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বার হয়।

মাদাম বোভারী যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা কাছাকাছি কোথাও বেড়াবার জায়গা আছে?

মঁসিয়ে লীয় উত্তর করল, নেই বললেই চলে। বনটার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের উপর একটা জায়গা আছে। আমি রবিবার দিন সেখানে একটা বই নিয়ে বেড়াতে যাই। একা একা সূর্যাস্ত দেখি।

এম্মা বলল, সূর্যাস্ত দেখতে আমি খুব ভালবাসি, কিন্তু সমুদ্রের ধারে বসে। মঁসিয়ে লীয় বলল, সত্যিই সমুদ্র আমার বড় প্রিয়।

এম্মা বলল, আচ্ছা, এই ধরনের একটা আকুতি জাগে না মনে যে সমুদ্রের বিশালতার সামনে গেলেই মনে হয় কে যেন আমাদের অন্তরাত্মাকে মুক্ত করে দিল সহসা। সমুদ্রের বিশালতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার আত্মাটা যেন অনেক উপরে উঠে যায়। মনে হয় আমি অনন্তের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছি। এই ধরনের কত আশ্চর্য জিনিস মনে হয়।

লীয় বলল, পার্বত্য দৃশ্যও এই ভাবই জাগায়। আমার এক জ্ঞাতি ভাই গত বৎসর সুইজারল্যাণ্ড বেড়াতে গিয়েছিল। সে বলছিল সেখানে যে কখনো যায়নি তারা হ্রদ, জলপ্রপাত ও হিমবাহের মধ্যে কি আছে, কতখানি কবিতার উপাদান আছে তা বুঝতেই পারবে না। যখন দেখবে বিরাট বিরাট গাছগুলো নদীর ধারে ঢালু হয়ে নেমে গেছে তখন চোখকে বিশ্বাস করতেই পারবে না। আনন্দে দুচোখ জুড়িয়ে যাবে। সেখানে গেলে ভাবে মন এমন বিভোর হয়ে যায় য নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে ইচ্ছা যায়। এইসব জায়গায় বসে যদি কোন প্রসিদ্ধ গায়ক গান গায় তাহলে সে গানের প্রেরণা পাবে এখানে।

এম্মা প্রশ্ন করল, আপনি কি গান জানেন?

মঁসিয়ে লীয় বলল না, আমি গান ভালবাসি।

বাধা দিয়ে হোমা তার উপর ঝুঁকে বলল, ওর গান শুনবেন মাদাম বোভারী। একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। ও শুধু সৌজন্যের খাতিরে বলছে গান জানে না। সেদিন কি হচ্ছিল বন্ধু? সেদিন তুমি সেই গানটা গাইছিলে আর আমি আমার ল্যাবরেটারী থেকে শুনছিলাম। চমৎকারভাবে গাইছিলে, মনে হচ্ছিল ঠিক যেন কোন সুনিপুণ অভিনেতা গাইছে।

লীয় হোমার বাড়ির চারতলার একটা ঘরে ভাড়া থাকে। তার বাড়িওয়ালার মুখ থেকে তার গানের প্রশংসা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সে। হোমা অবশ্য সে প্রসঙ্গ থেকে ডাক্তারের প্রসঙ্গে চলে গেল। সে ডাক্তারকে একে একে জানাল ইয়নভিলের মধ্যে ধনী নাগরিক কারা, তাদের যত সব খবরাখবর দিয়ে তাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প বলল। অবশেষে একটা কথা স্বীকার করল একমাত্র সোনা রূপোর দোকানের মালিক ও সুদবন্ধকীর কারবারীর সম্বন্ধে সব কিছু জানা যায়নি। লোকটা ভারী চাপা। আর এক পরিবার আছে তুভাশে পরিবার। তাদের সম্বন্ধেও বেশী কিছু জানা খুবই কঠিন।

এম্মা সে কথায় কান না দিয়ে লীয়কে বলল, আপনি কি ধরনের গান

ভালবাসেন ?

লীয়ঁ বলল, আমার ভাল লাগে জার্মানি গান। এ গান আমার দারুণ প্রেরণা দেয়।

আপনি ইতালীয় অপেরার গান জানেন ?

হোমা মাঝখান থেকে বলল, আমি আপনার স্বামীকে বলছিলাম আপনার থাকার উপযুক্ত জায়গা ইয়নভিলের মধ্যে মাত্র একখানা বাড়িই আছে। সেটা হলো থানোজার বাড়ি। ডাক্তারির পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। তার উপর দরজাটা গলির ভিতর। তার মানে কারা বাড়িতে আসছে যাচ্ছে তা কেউ দেখতে পাবে না। রান্নাঘর, কাপড় ধোয়ার জায়গা, ফল রাখার জায়গা প্রভৃতি সংসারের পক্ষে যা যা দরকার তা সব আছে বাড়িটাতে। থানোজা টাকার মায়া না করে নদীর ধারে বাগানের কোলে বানিয়েছিল বাড়িটা। ওর একমাত্র বাসনা ছিল গ্রীষ্মকালে বাড়িটাতে বসে মদ খাবে। মাদাম যদি বাগানের কাজ করতে চান তাহলে আপনি তা ভালভাবেই করতে পারবেন।

চার্লস বলল, আমার স্ত্রী বাগানের কাজ ভালবাসেন না। তাঁকে অবশ্য ব্যায়াম করতে বলা হয়েছে অবসর সময়ে। তবু তিনি বই পড়তেই সবচেয়ে ভালবাসেন।

লীয়ঁ বলল, আমিও তাই ভালবাসি। সন্ধ্যেবেলায় আগুনের ধারে একটি বই নিয়ে বাতির আলোয় তা পড়ার মত আনন্দ আর কিছুতে থাকতে পারে না। বই পড়া আর জানালার সার্সির উপর আছাড় খেয়ে পড়া বাতাসের গান শোনা।

লীয়ঁর উপর তার বিস্ফারিত দুচোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে এম্মা বলল, একথা কত সত্য।

বই পড়তে পড়তে আমার মনটা যেন এ জগৎ থেকে কোথায় চলে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। তবু আমি কিছুই জানতে পারি না। আমার মনে হয় কাহিনীর মধ্যে আমিও যেন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। আমিও যেন বইটার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের একজন হয়ে উঠি। তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠি।

এম্মা বলল, আমারও তাই মনে হয়।

লীয়ঁ আরও বলল, আচ্ছা বই পড়তে পড়তে কখনো কি অনুভব করেছেন, একটা অস্পষ্ট ধারণা, একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি মনের পশ্চাৎপটে সব সময় ঘোরাফেরা করে। অথচ সেটা বুঝিয়ে বলা যায় না।

এম্মা বলল, হ্যাঁ, এটা আমারও মনে হয়েছে।

লীয়ঁ বলল, এই জন্যই আমার কবিতা ভাল লাগে বেশী। গদ্য রচনার থেকে তা বেশী মুগ্ধ করে আমাকে। কবিতা পড়ে আমার কান্না পায়।

এম্মা বলল, তবু কবিতা পড়তে পড়তে শেষে বিরক্ত লাগে। আজকাল

আমি আবার রহস্যের কাহিনী পড়তে ভালবাসি। যা পড়তে পড়তে ভয় লাগে। যে সব নায়ক অতি বাস্তব ও সাধারণ তাদের আমার মোটেই ভাল লাগে না।

লীয় বলল, মাদাম ঠিকই বলেছেন। যে সব দরিদ্র অতি সাধারণ, যাদের সংসারে সমাজে সচরাচর দেখা যায় সেই চরিত্র সৃষ্টি করা শিল্পের কাজ নয়। মহান চরিত্র পরিপূর্ণ ও পবিত্র ভালবাসা ও মনোরম দৃশ্যাবলী সবচেয়ে আনন্দ দেয় আমাকে। জীবনে মোহমুক্তির বিষাদ থেকে এ আনন্দ মুক্তি দেয় মনকে। এই ইয়নভিলে আমি সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বৈচিত্র্যহীন দুঃসহ জীবন যাপন করি সে জীবন থেকে সেই আনন্দই আমাকে মুক্তি দিতে পারে।

এম্মা বলল, আপনার কাছে যেমন এই ইয়নভিল, আমার কাছে তেমনি ছিল তোস্তে। এই জন্যই আমি স্থানীয় গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে নিয়মিত বই এনে পড়তাম।

হোমা তখন বলল, মাদাম যদি কোন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে চান, আমি একটা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করে দিতে পারি যেখানে বড় বড় লোকদের বই— যেমন, ভলতেয়ার, রুশো, ওয়ালটার স্কট। আমি কতকগুলো সাময়িক পত্র-পত্রিকারও গ্রাহক আছি। ফেনাল দ্য রুয়েল আসে, পথে আমি ওদের এ অঞ্চলের প্রতিনিধিও বটে।

কথা বলতে বলতে ওরা আড়াই ঘণ্টা ধরে খাচ্ছিল। হোটেলের ঝি আর্তেমিসে অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। তাকে যে যা বলছিল তা ভুলে যাচ্ছিল।

কথা বলতে বলতে লীয় মাদাম বোভারীর চেয়ারের নিচের কাঠটায় পা রেখে দিল। এম্মার গায়ে ছিল ছোট নীল সিল্কের একটা ওড়না। কথা বলার ঝোঁকে এম্মাও অনেকখানি সরে এসেছিল লীয়র কাছে। তারা পাশাপাশি দুজনে বসে কথা বলছিল এক মনে। ওদিকে চার্লস বসেছিল হোমার পাশে। তারাও দুজনে নানারকমের কথা বলছিল।

এদিকে এম্মা ও লীয় কথা বলতে বলতে যেন এক অজানা জগতে চলে গিয়েছিল। প্রতিটি বিষয়েই ওদের অদ্ভুত মনের মিল দেখা যাচ্ছিল। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে এগিয়ে চলেছিল ওদের কথাবার্তা। প্যারিসে কি কি নাটক অভিনীত হচ্ছে, কি কি উপন্যাস ওরা পড়েছে, কোন কোন নতুন অজানা জগতের আস্বাদ ওরা পেয়েছে—এই সব বিষয়ে কথা হয় ওদের মধ্যে। এম্মা বলল, যে তোস্তে ছেড়ে এসেছে তার কথা। লীয় বলল, যে ইয়নভিলে তারা বাস করে তার কথা।

ফেলিসিতে গিয়েছিল বিছানা পাততে হোটেলের বাসিন্দাদের জন্য। ওদের খাওয়ার পর ওরা উঠে পড়ল টেবিল থেকে। মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া ধূমায়িত আগুনের পাশে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আস্তাবলে যে ছেলেটা কাজ

করত সে অপেক্ষা করছিল দাঁড়িয়ে। সে মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারীকে তাদের নতুন বাড়িতে আলো হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সে লে কুরের ছাতাটাও নিয়ে যাবে চার্চে।

চার্লসদের নতুন বাড়িটা হোটেল থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে। ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখল রাত তখন নিশুতি। শহরের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাজারের স্তম্ভগুলো রাস্তায় ছায়া ফেলেছিল বড় বড়। আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাড়ির ভিতর হলঘরে ঢুকতেই এম্মার মনে হলো, প্লাস্টার করা দেওয়ালগুলো থেকে শীতের তীক্ষ্ণ তীর এসে তার গায়ে বিঁধছে। দেওয়ালগুলো নতুন।

ওরা উপরতলায় চলে গেল। সেখানেই শোবার ঘর। কাঠের সিঁড়িতে ওদের জুতোর আওয়াজ হচ্ছিল। শোবার ঘরের খোলা জানালা দিয়ে সাদা চাঁদের আলো আসছিল, জানালায় তখন পর্দা ছিল না। সেই আলোয় এম্মা দেখল বাড়ির বাইরে বড় বড় গাছের মাথা আর তার ওপারে কুয়াশাঘেরা উন্মুক্ত প্রান্তর। নদীর ধারে সারা মাঠময় কুয়াশা জমে আছে।

ঘরের মধ্যে সারা মেঝেটাতে বিছানা ও আসবাবপত্রগুলো ছড়ানো আছে। মালপত্রগুলো নামিয়ে চাকরে এইভাবে রেখে গেছে। এই নিয়ে চারবার সে নতুন জায়গায় রাত্রিবাস করল। প্রথমে সে বাড়ি থেকে কনভেণ্টে পড়তে গিয়েছিল তার স্কুলজীবনে। তারপর বিয়ের পর প্রথম রাত্রিবাস করে তোস্তের বাড়িতে। তারপর লা ভবিসেয়ার্দ গাঁয়ে এবং বর্তমানে এই ইয়নভিল গাঁয়ে। প্রতিবারই মনে হয়েছে এম্মার, সে যেন নতুন জীবন শুরু করছে। একথা বিশ্বাস করতে কিছুতেই তার মন চায় না যে বাসস্থানের ভিন্নতা সত্ত্বেও তার জীবন একই রয়ে যাবে।

তার আরও একটা জিনিস প্রতিবার নতুন জায়গায় রাত্রিবাস করার সময় মনে হয় যেহেতু এর আগে তার দিন খারাপ যাচ্ছিল সেইহেতু এবার থেকে অবশ্যই তার সুদিন আসবে।

পরদিন সকালে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে মঁসিয়ে লীয়ঁকে দেখতে পেল। তখন তার পরণে শুধু ছিল ড্রেসিং গাউন। জানালা দিয়ে এম্মাকে দেখতে পেয়ে লীয়ঁ মাথা নত করল। এম্মাও সামান্য একটু মাথাটা নেড়ে বন্ধ করে দিল জানালাটা।

কখন ছটা বাজবে তার জন্য সারাদিন ধরে অপেক্ষা করতে লাগল লীয়ঁ। ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে গিয়ে দেখল সেখানে একমাত্র মঁসিয়ে বিনেট ছাড়া আর কেউ আসেনি।

গতকাল নৈশ-ভোজনের সময় এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে

তার জীবনে। এর আগে তার সারা জীবনের মধ্যে একসঙ্গে পরপর দুঘণ্টা ধরে কখনো কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলেনি। এটা কেমন করে ঘটল, এতকথা কি করে সে বলল একসঙ্গে? এর আগে সে এটা কল্পনাও করতে পারেনি। সাধারণতঃ সে একটু ভীরু প্রকৃতির। সে কম কথা বলে, এর কারণ কিছুটা শালীনতাবোধ আর কিছুটা লজ্জা। ইয়নভিলে সকলেই জানে তার আচরণ ভদ্র ও শোভনীয়। সে বয়োপ্রবীণ লোকদের কথা মন দিয়ে শোনে। সে কোন রাজনীতির কথায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে না। আজকালকার যুবকদের মধ্যে এ গুণ দেখাই যায় না। তার প্রতিভা আছে। সে জলরঙের ছবি আঁকতে পারে। কোনদিন তাশ না খেললে সে বই পড়ে। মঁসিয়ে হোমা তাকে বিশেষভাবে পছন্দ করে। লীয় আবার হোমার অনেক উপকারও করে। সে প্রায়ই তার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে বাগানে খেলা করে তাদের ভুলিয়ে রাখে। হোমার ছেলেমেয়েরা খুব নোংরা, বড় অসভ্য। হোমার স্ত্রীর কোন ব্যবস্থা নেই। একজন ঝি ছাড়া হোমার এক জ্ঞাতিভাই তাদের বাড়িতে চাকরের মত থাকে ও ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে।

মাদাম বোভারীর প্রতিবেশীদের মধ্যে হোমাই সবচেয়ে ভাল। মাদাম বোভারীকে নানা বিষয়ে সে পরামর্শ দেয়। বিশেষ করে কার কাছ থেকে কি জিনিস কেনা উচিত সে বিষয়ে সে পরামর্শ দেয়। কিভাবে কার কাছ থেকে সুবিধাজনক দরে মাখন কিনতে হবে হোমা তা বলে দিয়েছে। সে আবার লেস্তিবুদয়ের সঙ্গেও মাদাম বোভারীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তার বাগান দেখাশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লেস্তিবুদর চার্চের কাজ ছাড়াও ইয়নভিল গাঁয়ের কেউ বললে তার বাগানের কাজও করে।

তবে হোমা যে পাঁচজনের উপকার করে এইভাবে তা শুধু দয়ামায়ার বশবর্তী হয়ে নয়, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে।

হোমা এর আগে চিকিৎসাব্যবসা সম্পর্কিত এক আইন ভঙ্গ করে। এই আইনে বলা হয় ডাক্তারীর ডিগ্রী না থাকলে কোন ব্যক্তি চিকিৎসা করতে পারবে না। হোমা কিন্তু ডিপ্লোমা ছাড়াই এই ব্যবসা করত। কোন এক অজ্ঞাতনামা লোক তা সরকারকে জানানোর ফলে রুয়েনের সরকারী উকিলের কামরায় তাকে ডাকা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হোমা। তখন সকালবেলা। তখনো আদালত খোলেনি। হোমা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল বারান্দায় ভারী বুট পরে পুলিশের লোকরা ঘোরাফেরা করছে, লোহার কড়া ও তালাচাবির শব্দও শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ হোমার চোখের সামনে তালাবদ্ধ এক অন্ধকার কারাগারের ছবি ভেসে উঠল। ভয়ে রক্ত শুকিয়ে গেল হোমার। যাই হোক, ছাড়া পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা একটা দোকানে গিয়ে কিছু কড়া মদ খেয়ে দুর্বল স্নায়ুগুলোকে একটু সতেজ করে নিল হোমা।

সেবার হোমাকে এই অবৈধ ব্যবসা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল জেলা-শাসক। কিন্তু সে সতর্কতার স্মৃতি ভুলে গেছে হোমা। আজও সে সকালে তার দোকান ঘরের পিছনের দিকের একটা ছোট্ট ঘরে চিকিৎসার কাজ করে। ডাক্তারদের মত রোগী দেখে। রোগ সম্বন্ধে পরামর্শ দেয়। গাঁয়ের মধ্যে হোমার কিছু প্রতিযোগী আছে যারা তার ঈর্ষা করে, তার ধ্বংস কামনা করে। তার উপর স্থানীয় মেয়রের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভাল যাচ্ছে না। তাই তাকে এখন খুব সাবধানে চলতে হয়। তাই সে মঁসিয়ে বোভারীর মন যুগিয়ে চলে, তাকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করে তাকে বাধিত করার চেষ্টা করে। রোজ সকালে সে খবরের কাগজ এনে পড়তে দেয় চার্লসকে। রোজ বিকালে দোকানের কাজ ফেলে আসে তার সঙ্গে কথা বলতে।

এদিকে চার্লস বেশ মুস্কিলে পড়ল। তার সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। এখানে আসার পর থেকে কোন কাজ নেই। কোন রোগী পাচ্ছে না। রোগী দেখতে যাবার কোন ডাক আসে না বাইরে থেকে আর তার ঘরে কোন রোগী আসে না রোগ দেখাতে। ফলে তার রোগী দেখার ঘরে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকতে হয় তাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে বসে সে ঝিমোয় অথবা তার স্ত্রীর সূচীশিল্পের কাজ দেখে। কাজ না পেয়ে অনেক সময় সে নিজে তার বাড়ির দরজা জানালায় রং লাগায়।

কিন্তু সবচেয়ে বেশী চিন্তা তার টাকা পয়সার জন্য। কারণ যা কিছু পুঁজি ছিল খরচ হতে হতে প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে। প্রথমতঃ তোস্তের বাড়ি মেরামতের কাজে অনেক খরচ হয়। তারপর তার স্ত্রীর পোষাক কেনাকাটিতেও বেশ কিছু খরচ হয়। তারপর তোস্তে থেকে এখানে মালপত্র নিয়ে বাসাবদলের ব্যাপারেও অনেক খরচ হয়েছে। এই সব নিয়ে গত দু বছরের মধ্যে তার পনের টাকা পয়সা ছাড়াও তিন হাজার টাকার মত বেশী খরচ হয়েছে। তার উপর তোস্তে থেকে আসার সময় অনেক জিনিস ভেঙ্গে গেছে। তোস্তের বাগানে তাদের যে পাথরের এক যাজকের মূর্তি ছিল সেটা পথে আসার সময় ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেক কাচের জিনিস, সখের জিনিস ওঠা নামা করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে।

তবে এই টাকার চিন্তার মাঝে তার স্ত্রীর গর্ভাবস্থার কথাটা তাকে আনন্দ দেয়। তার স্ত্রীর প্রসবকাল এগিয়ে আসছে একথা যতই ভাবে ততই তার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে ওঠে তার স্ত্রী। তাদের হৃদয়ের রক্ত-মাংসে গড়া যে সন্তান দিনে দিনে বেড়ে উঠছে তার স্ত্রীর গর্ভে সেই সন্তান তাদের বন্ধনকে আরো শক্ত করে তুলবে। তার স্ত্রীকে তার কাছে আরো নিবিড় করে টেনে আনবে। একথা ভাবতে খুব ভাল লাগে। তার স্ত্রীর মুখে ফুটে ওঠা এক আনন্দের হাসি, তার ক্লান্ত গতিভঙ্গি, তার বন্ধনহীন বক্ষের অবাধ স্ফীতি সব মিলিয়ে তাকে এখন দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি

অদম্য অবুঝ সুখের আবেগ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা অঙ্গে। এম্মাকে কাছে পেলেই উঠে গিয়ে তাকে চুম্বন করে, কত মিষ্টি কথা বলে আদর করে, তার হাতদুটো আলতোভাবে নিয়ে ঘরের মেঝের উপর নাচার চেষ্টা করে। সে সন্তানের জনক হতে চলেছে একথা ভাবতেই সৃষ্টির আনন্দ উত্তাল হয়ে ওঠে তার মধ্যে। সহসা তার মনে হয় সে এখন আরো অনেক কিছু আশা করতে পারে। মনে হয় মানুষ জীবনে যা যা চায় তা সব পেয়ে গেছে সে।

এদিকে এম্মা যখন তার গর্ভাবস্থার কথাটা প্রথম জানতে পারে তখন প্রথমে এক অপার বিস্ময় জাগে তার মনে। তার গর্ভস্থ সন্তানকে দেখতে ইচ্ছা করে। প্রসবের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে। মাতৃত্বের আনন্দ প্রথম আস্বাদন করার জন্য ব্যগ্রতা বেড়ে যায় দিনে দিনে। বেশী টাকা পয়সা খরচ করার সামর্থ্য নেই বলে গাঁয়ের দর্জিকে দিয়ে নৌকোর মত এক কাপড়ের দোলনা তৈরি করায়। দোলনার চারিদিকে সোনালী রঙের রেশমী পর্দা। টাকার অভাবে প্রথম মা হবার প্রস্তুতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক সাধ আহ্লাদ অপূর্ণ রয়ে গেল এম্মার। সেগুলো ত্যাগ করতে বাধ্য হলো সে। এতে তার রাগ ও দুঃখ হলো। এই ভাবে মাতৃস্নেহের প্রথম অভিব্যক্তির সমস্ত উচ্ছ্বাস উদ্গমনিরুদ্ধ কুসুমকোরকের ব্যর্থ উচ্ছ্বাসের মত প্রথমেই বাধা পেল। কিন্তু প্রতিবার খাবার সময় চার্লস তাদের সন্তানের কথা বলত এবং ক্রমে এম্মাও ভুলে যেতে লাগল তার ব্যর্থতার কথা।

এম্মা চেয়েছিল তার পুত্রসন্তান হোক। তার চেহারা হবে বলিষ্ঠ, রংটা একটু কালো কালো। তার নাম রাখবে জর্জ। তার এই পুত্রকামনা তার অতীত জীবনের মত সব ব্যর্থ প্রতিহত কামনা বাসনার ক্ষতিপূরণের এক বর্ণোজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি হিসাবে দেখা দেয়। একমাত্র পুরুষরাই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বাধা বিপত্তি জয় করে স্বাধীনভাবে তাদের প্রেমপ্রীতির আবেগগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। জীবনে এক বিরল আনন্দ আস্বাদন করতে পারে। কিন্তু মেয়েদের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি চিরদিনই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের শারীরিক দুর্বলতা আর আইনগত বশ্যতার বিরুদ্ধে চিরকাল সংগ্রাম করে যেতে হয়। নারীর ইচ্ছা তাদের মাথা হতে বার হয়ে তাদের মাথার টুপীর মধ্যেই লেগে থাকে, সে টুপীর সীমানা পার হয়ে সার্থকতার পথে এগিয়ে যেতে পারে না। তাদের জীবনে যখনি কোন বাসনা তাদের প্রলুব্ধ করে তখনি কোন না কোন প্রথা সে বাসনার বল্গাটিকে কঠোরহস্তে টেনে ধরে।

কোন এক রবিবার সকালবেলায় সন্তান প্রসব হলো এম্মার। তখন সকাল ছ'টা। সবেমাত্র সূর্য উঠছে।

চার্লস বলল, মেয়ে হয়েছে।

এম্মা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মাদাম হোমা ছুটে এসে এম্মার ঘরে ঢুকে তাকে চুম্বন করল। তারপর এল হোটেলওয়ালী মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া। আধখোলা দরজাটার বাইরে দাঁড়িয়ে হোমা অল্প কথায় সম্বর্ধনা জানাল।

প্রসবের পর যতদিন বিছানায় শুয়ে রইল এম্মা ততদিন শুধু একটা কথাই ভাবতে লাগল। তা হলো মেয়ের নামকরণ কি হবে। প্রথমে ইতালীয় শব্দ দিয়ে শেষে কতকগুলো নাম মনে মনে খাড়া করল এম্মা। কিন্তু কারো পছন্দ হলো না। চার্লস-এর ইচ্ছা মেয়ের নামকরণ হোক তার মার নামে। তারা তখন সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

হোমা একদিন বলল, মঁসিয়ে লীয় বলছিল ম্যাদলেন নামটা ত ভাল। এটা কেন রাখেননি?

কিন্তু চার্লসএর মায়ের এ নামে দারুণ আপত্তি। কারণ এ নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক পাপকাজ। হোমা চায় ছেলেমেয়ের নাম রাখা হোক সেই সব মহাপুরুষদের নাম অনুসারে যাঁরা কোন মহৎ কর্ম বা চিন্তার দ্বারা জগতের কল্যাণ করে গেছেন। হোমা তাই তার চারটি ছেলেমেয়ের নাম রেখেছে মহাপুরুষদের নাম অনুসারে। তার কাছে নেপোলিয়ন যশের প্রতীক, ফ্রাঙ্কলিন স্বাধীনতার প্রতীক, ইর্মা রোমান্টিক কল্পনা আর এ্যাথেলি নাট্যজগতের চূড়ান্ত সার্থকতার প্রতীক।

হোমা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে তার মধ্যে দুটো মন আছে—দার্শনিক মন আর শিল্পী মন, আছে চিন্তা আর অনুভূতি। তবে তার দার্শনিক প্রত্যয় কখনো কোন আবেগ বা অনুভূতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে না। তার মধ্যে যে দার্শনিক মানুষটি আছে সে মানুষ অনুভূতির মানুষটিকে ঘৃণা করে না কখনো। তাছাড়া তার প্রকৃত কল্পনা আর উদ্ভট কল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি তা সে জানে। ট্রাজেডীর ভাববস্তু কি হবে সে বিষয়ে মাথা ঘামাত না হোমা। বরং তা তুচ্ছ করত; ট্রাজেডীতে সে দেখত শুধু সংলাপ রচনার ভঙ্গিমা। ট্রাজেডিতে সে রূপকল্পনার থেকে অপ্রধান চরিত্র ও খুঁটিনাটি ঘটনাগুলোকেই বড় করে দেখত। চরিত্রগুলোকে অবাস্তব মনে হত তার, কিন্তু তাদের কথাগুলোকে তার ভাল লাগত। কোন নাটকের কোন প্রসিদ্ধ সংলাপ পড়তে খুব ভাল লাগত তার। কিন্তু যখন সে ভাবত এই সংলাপটি বক্তৃতা হিসাবে কোন যাজক বা ধর্মপ্রচারক ব্যবহার করেছে ধর্ম প্রচারের কাজে। তখন তার মনে সত্যিই ব্যথা পেত সে। তখন তার মনে এমনই রাগ হত যে তার ইচ্ছা হত সে মুহূর্তেই রেসিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে কিছু কথা বলবে তাঁর সঙ্গে।

অবশেষে এম্মার একটা কথা মনে পড়ে গেল। ভবিসেয়ার্দের মার্কুই-এর বাড়িতে ভোজসভায় গিয়ে সে মার্কুইকে বার্থে নামে এক তরুণীকে ডাকতে

শুনেছিল। নামটা পছন্দ হয়ে গেল তার এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নামটিই রেখে দিল তার মেয়ের জন্য। মঁসিয়ে রুয়ালত্‌ আসতে না পারার জন্য উৎসব উপলক্ষে হোমাকে ধর্মপিতা হবার জন্য অনুরোধ করা হলো। চার্লসএর মা হবেন ধর্মমাতা। এই উপলক্ষে হোমা প্রচুর মিছরিসহ অনেক উপহার নিয়ে এল শিশুর জন্য।

উৎসবের দিন সন্ধ্যার সময় এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো। হোমা প্রচুর মদ খেল। মঁসিয়ে লাঁয় একটি গান গাইল। চার্লসএর মাও একটা গান গাইল। অবশেষে চার্লসএর বাবা বললেন শিশুকে নামিয়ে এনে তার মাথায় এক গ্লাস মদ ঢালা হোক। কিন্তু যাজক আব্বে বুনিসিয়েন বলল এটা ধর্মীয় আচারসম্মত কাজ নয়। বৃদ্ধ মঁসিয়ে বোভারী তখন একটা বই থেকে এক দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন। আব্বে চেয়ার ছেড়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন হোমার মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর তিনি আবার বসে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম সব করতে থাকেন।

উৎসব শেষে বৃদ্ধ মঁসিয়ে বোভারী একমাস ইয়নভিলে থেকে গেলেন। তিনি রোজ সকালে বেড়াতে যাবার সময় মাথায় জাঁকজমকপূর্ণ পুলিসের টুপী পরে সবাইকে অবাক করে দিতেন। তিনি প্রচুর ব্রাণ্ডি খেতেন এবং প্রায়ই তিনি বাড়ির ঝিকে হোটেলে পাঠিয়ে তার ছেলের নামে খরচ লিখিয়ে ব্রাণ্ডি আনাতেন। তিনি সুগন্ধি আতর মাখতেও ভালবাসতেন।

এম্মা কিন্তু তাকে খুব একটা অপছন্দ করত না। বরং তার সঙ্গ ভালই লাগত। কারণ অতীতে তিনি একদিন একজন সামরিক অফিসার হিসাবে বহু জায়গায় বেড়িয়েছেন। তিনি প্রায়ই বার্লিন, ভিয়েনা, স্ট্যানবার্গ প্রভৃতি শহরের নাম করতেন। কত বড় বড় ভোজসভায় যোগদান করেছেন, কত সৌখীন মেয়ের সঙ্গে মিশেছেন। মাঝে মাঝে তিনি আনন্দের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় অথবা বাগানে বেড়াবার সময় তার পুত্রবধূর কোমরে হাত দিয়ে বীর নায়কের মত চলাফেরা করতেন। তাঁর রকমসকম দেখে চার্লসএর মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্বামীকে তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে বললেন। কারণ তিনি জানেন বৃদ্ধ মঁসিয়ে বোভারী এমন এক লোক যার কোন কিছু আটকায় না, এবং কোন বিষয়েই ভয় পান না।

হঠাৎ একদিন এম্মার তার মেয়ের কথা মনে পড়ল। তাকে দেখতে ইচ্ছা হলো। মেয়েটি তখন ধাত্রীর বাড়িতে ছিল। ছয় সপ্তাহ কেটেছে কি না তা হিসাব করে দেখে এক সময় রুলেতের বাড়ির দিকে রওনা হলো সে। বাড়িটা ছিল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের ধারে, বড় রাস্তা আর মাঠের মাঝখানে।

তখন দুপুরবেলা। সব বাড়ির জানালা বন্ধ। নীল আকাশ থেকে সূর্য যেন আগুন ছড়াচ্ছে বাড়ির ছাদগুলোর উপর। গুমোট গরমে মাঝে মাঝে

বাতাস বইছিল। এম্মা ভেবে ঠিক করতে পারল না সে কোথাও দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করবে না কি বাড়ি ফিরে যাবে।

এমন সময় কাছাকাছি একটা বাড়ির দরজা থেকে মঁসিয়ে লীয়ঁ বেরিয়ে এসে এম্মাকে সম্ভাষণ জানাল। ওরা দুজনে তখন কিছুক্ষণের জন্য লেহুরের দোকানের চালটার তলায় দাঁড়াল।

এম্মা বলল, সে তার শিশুকন্যাটিকে দেখতে যাচ্ছে তার ধাত্রীর বাড়িতে।

লীয়ঁ ইতস্ততঃ করে বলল, ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই।

মাদাম বোভারী তখন বলল, আপনার কি কোন কাজ আছে?

লীয়ঁ যখন বলল, এখন তার কোন কাজ নেই তখন তার সঙ্গে তাকে যেতে অনুরোধ করল মাদাম বোভারী। লীয়ঁ তাই করল।

সন্ধ্যের সময় কথাটা প্রচারিত হয়ে গেল সারা ইয়নভিল গাঁয়ে। কথাটা শুনে মেয়রের স্ত্রী মাদাম তুভাশে তাঁর ঝির কাছে স্পষ্ট বললেন, মাদাম বোভারী তাঁর সুনাম নষ্ট করছেন।

ধাত্রীর বাড়ি যাবার জন্য তাদের গাঁয়ের বড় রাস্তাটা ছেড়ে বাঁ দিকে একটা সরু পথ ধরতে হয়েছিল। পথটা ধরে কতকগুলো ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি পার হয়ে কিছু বন জঙ্গল পেল ওরা। সে বনে ফুল ফুটেছে কত রকমের, জাম ধরেছে। বনের ফাঁকে ফাঁকে খামার দেখা যায়। দেখা যায় শূয়োরগুলো গোবরের গাদায় শুয়ে আছে। গরুগুলো গাছের গুঁড়িতে উঠে সিং ঘষছে। ওরা চলেছিল ধীর গতিতে। এম্মা কিছুটা হেলে পড়েছিল লীয়ঁর হাতের উপর। লীঁয় তার গতিটা ধীর করে তুলেছিল। ওদের সামনে গরম বাতাসে কিছু মাছি উড়ছিল ভন ভন করে।

বাদাম গাছের তলায় বাড়িটা দেখেই ওরা চিনতে পারল। বাড়িটা নিচু, ছাদটা বাদামী রঙের টালি দিয়ে ঢাকা। জানালার ধারে দড়িবাঁধা পিঁয়াজ ঝুলছিল। বাড়িটার উঠোনে কাঁটা ঝোপ বেড়ার কাজ করছিল।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই ধাত্রী বেরিয়ে এল। তার কোলে একটি শিশু ঘুমোচ্ছিল আর একটি ছেলে তার একটা হাত ধরে ছিল। ধাত্রী মাদাম বোভারীকে বলল, আসুন, আপনার মেয়ে ভিতরে ঘুমোচ্ছে। যে ছেলেটি ধাত্রীর একটা হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল তার মুখে ময়লা দাগ। সে ছেলেটি রুয়েনের কোন এক ব্যবসায়ীর। ছেলেটির বাবা মা সব সময় এতই ব্যস্ত যে তাদের ছেলের পানে তাকাবার কোন সময় নেই।

নিচের তলার ঘরেই শোবার ঘর। বাড়ির মধ্যে শোবার ঘর একটাই। বিছানায় মশারি নেই।

এম্মা দেখল তার মেয়েটি একটা কাপড়ের দোলনায় ঘুমোচ্ছে। সে তাকে দোলনা থেকে একটা কাঁথায় জড়িয়ে তুলে কোলে নিল। গান গেয়ে দোলাতে লাগল।

লীয় ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। মাদাম বোভারীর মত এক সৌখিন মহিলা এই ঘরে তার শিশুকন্যাকে আদর করছে এতে কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল লীয়। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মাদাম যদি অস্বস্তি বোধ করে তাই সে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। এম্মা তার শিশুটিকে আবার দোলনায় রেখে দিল।

ধাত্রী তাকে বলল, আপনি মুদী কামুকে একটু বলে দেবেন আমার দরকার মত একটা করে সাবান যেন দেয়।

এম্মা বলল, ঠিক আছে বলে দেব। বিদায় মাদাম রুলেত

ধাত্রী তবু বিদায় দিল না এম্মাকে। বলল, রাত্রিতে উঠতে বড় কষ্ট হয়। তাই বলছিলাম কি আপনি যদি আমাকে এক পাউণ্ড শুকনো কফি দেন তাহলে আবার একমাস চলে যাবে।

ধাত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে এম্মা এগিয়ে চলল। কিছু দূর গিয়ে দেখল ধাত্রী আবার তার দিকে ছুটে আসছে। এম্মার কাছে এসে ধাত্রী তার স্বামীর কথা বলতে শুরু করল। ধাত্রী বলল, তার স্বামী সারা বছরের মধ্যে মাত্র ছয় ফ্রাঁ রোজগার করেছে। এই তার কারবার।

এম্মা বিষণ্ণ হয়ে বলল, কি বলবে বল।

ধাত্রী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, তার স্বামী তাকে একা কফি খেতে দেবে না। তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে এম্মা বলল, ঠিক আছে যাতে তোমরা দুজনে কফি খেতে পাও তার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু এতেও পরিত্রাণ পেল না এম্মা। ধাত্রী আবার তাকে বানিয়ে বলতে লাগল, আমার স্বামী সেই আঘাতটা পাবার পর থেকে বুকের ভিতরটা আলগা হয়ে গেছে। ও বলছিল বাজে মদ খেয়ে ওর শরীর আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এম্মা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি আমাকে যেতে দেবে কি?

এম্মার পানে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ধাত্রী বলল, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে কিছু ব্রাণ্ডি কিনে দেবেন আমার স্বামীকে। আমি আপনার মেয়ের গাটাকে মালিশ করব তাই দিয়ে।

ধাত্রীর কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে আবার এগিয়ে চলল এম্মা তার পথে। আবার লিয়র হাতটা ধরল। তার ঘাড়ের উপর বিন্যস্ত বাদামী চুলগুলো দেখতে বড় ভাল লাগছিল তার। এম্মা দেখল লীয়র হাতের নখগুলো আর পাঁচজনের থেকে লম্বা এবং সে নখের জন্য প্রচুর যত্ন নেয়।

ওরা আবার ইয়নভিল গাঁয়ের নদীর ধারে ফিরে এল। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে নদীর জল অর্ধেক শুকিয়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে তার ধারা। তীরের লম্বা লম্বা ডালগুলো ঝুলে পড়েছে নদীর নিঃশব্দ স্রোতের উপর। এখানে সেখানে দু'একটা জলপোকা উড়ে বেড়াচ্ছিল। সূর্যের কতকগুলো শান্ত রশ্মি

নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলোর উপর ঝরে পড়ছিল। শাখাহীন উইলো গাছের গুড়িগুলো প্রতিফলিত হচ্ছিল নদীর জলে। তারা যখন ধীর গতিতে হাঁটছিল দুজনে তাদের চারদিকে ফাঁকা মাঠ এক শব্দহীন স্তব্ধতায় জমাট বেঁধে ছিল। মাঠের ওধারে দূরে দু'একটা খামারবাড়ি ও চাষার ঘর দেখা যাচ্ছিল।

ওরা যখন দুজনে হাঁটছিল তখন ওরা শুধু পথের মাটির উপর ওদের পদশব্দ আর এম্মার পোষাকের খসখস শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। আর শুনতে পাচ্ছিল ওদের পরস্পরের কথা বলার শব্দ। অদূরে একটা বাগানে প্রাচীর দেখা যাচ্ছিল। বাগানের কোন গাছ থেকে প্রাচীরের পাশে হলদে ধুলোর উপর ফুল ঝরে পড়ছিল।

কিছুদিনের মধ্যে রুয়েন শহরে একদল স্পেনদেশীয় নাচিয়ে আসবে। ওরা সেই সম্বন্ধে কিছু কথা বলছিল। এম্মা লীয়ঁকে বলল, আপনি যাবেন নাকি?

লীয়ঁ বলল, যদি পারি তাহলে যাব।

কিন্তু এ ছাড়া কি বলার মত অন্য কোন কথা নেই? কিন্তু তারা দুজনেই বেশ বুঝতে পারছিল তাদের চোখের তারায় ভাসছিল অনেক অর্থপূর্ণ কথা। কিন্তু ওরা সেকথা বলতে পারছিল না। এক গভীর অথচ অব্যক্ত এক ক্লান্তি আর জড়তা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ওদের। তাই ওদের মধ্যে বিরাজ করছিল না-বলা-কথার এক বিরাট নৈঃশব্দ্য আর সেই নৈঃশব্দ্য ভেদ করে বেরিয়ে আসছিল ওদের আত্মার এক মধুর কলতান যা ওরা ওদের বলা কথার থেকে অনেক স্পষ্ট করে শুনতে পাচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে যে মাধুর্যের আস্বাদ উপভোগ করছিল ওরা তা ওরা জীবনে এই প্রথম পেল। এ মাধুর্যের আস্বাদনে ওরা এমনই বিভোর ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে ওরা এখন কি অনুভব করছে সেটা পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করার কোন প্রয়োজনই বোধ করল না। পথের উপর প্রবাহিত সুবাসিত বাতাসে মাতোহারা হয়ে কোন পথিক যেমন দিগন্তে কি আছে তাকিয়ে দেখে না, ওরাও তেমনি ভবিষ্যৎ বুঝে সুখের কোন কথা ভাবছিল না। সেই সুখ যদি সমুদ্রের মত অন্তহীন প্রসারতায় ছড়িয়ে থাকে ওদের সামনে ওরা তাহলে তার উপকূলে দাঁড়িয়ে থেকেই সন্তুষ্ট ছিল। ওরা শুধু এই নিবিড় মুহূর্তে মাধুর্যের মধ্যে ওদের চেতনাকে নিঃশেষে বিলীন করে দিয়ে এক পরম পুলক অনুভব করছিল মনে মনে।

পথে এক জায়গায় কাদার মধ্যে বড় বড় পাথর পাতা ছিল। সেই পাথরের উপর পা রেখে সাবধানে এগিয়ে যেতে হচ্ছিল এম্মাকে। হঠাৎ তাই খুব বাস্তবসচেতন হয়ে উঠতে হলো তাকে।

ওদের বাগানবাড়িটা আসতেই এম্মা তার দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লীয়ঁ তার কাজের জায়গায় ফিরে গেল। গিয়ে দেখল তার মালিক অফিসঘরে নেই। সেও তখন হাতের কাজগুলো রেখে তার টুপীটা

নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

অফিসঘর থেকে বেরিয়ে লীয়ঁ সোজা চলে গেল আর্গুয়েলের বন পার হয়ে পাহাড়ের উপর। সেখানে গিয়ে একটা ফার গাছের তলায় পা ছড়িয়ে শুয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে রইল। এক সময় আপন মনে বলে উঠল, হা ভগবান, কী অস্বস্তিকর দুঃসহ জীবনই না যাপন করছি। সে বেশ অনুভব করল হোমার মত বন্ধু আর গিলোমিনের মত মালিক পাওয়া দুটোই দুঃখজনক ব্যাপার। তার মালিক গিলোমিনকে দেখে তার বৃটিশ সুলভ আচার আচরণ সেটা যদিও প্রথম প্রথম তার ভাল লাগে তবু কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহ ভঙ্গ হয়। গিলোমিনকে বিরক্ত লাগে তার। হোমাদের বাড়িতে থাকে, তাদের পাশের ঘরেই সে ঘুমায়, তবু মাদাম হোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে আনন্দ পাবে তার উপায় নেই। অথচ তার বয়স এমন কিছু হয়নি, মাত্র তিরিশ আর তার নিজের কুড়ি। মাদাম হোমা এমনিতে মানুষ ভাল, বড় সৎ প্রকৃতির এবং পরোপকারী। কিন্তু কথা বলে কোন সুখ নেই। সে যে মেয়ে মানুষ তা তার পোষাক আশাক ছাড়া বোঝাই যায় না। নারীসুলভ কোন আকর্ষণ তার চেহারায় বা কথাবার্তায় নেই।

মেয়র মঁসিয়ে তুভাশে ও তার দুটি ছেলে নিজেদের বাড়ির কাজ আর খাওয়া ছাড়া অন্য কিছু জানে না। চাষের কাজ, খাওয়া আর নিয়মিত চার্চে যাওয়া—এই নিয়েই তাদের জীবন। তাদের কাছে কোন কিছুই আশা করা যায় না। বিনেটও একেবারে আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। আর যারা আছে তারা হলো কিছু হোটেল মালিক আর দোকানদার। সবাই আপন আপন কাজে সদাব্যস্ত।

এদের সকলের মধ্য থেকে মাদাম বোভারীর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। এ গাঁয়ের সকলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মাদাম বোভারী যার সাহচর্য তার সবচেয়ে বেশী কাম্য। হোমার সঙ্গে তাদের বাড়ি দুএকবার সে গিয়েছে এর আগে। তবে তার স্বামী তাকে খুব একটা আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেনি। তাই ভয় হয় লীয়ঁর, মাদাম বোভারীর কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা কামনা করতে যাওয়াটা বুঝি বা অশালীন ব্যাপার না হয়ে পড়ে। তাছাড়া এটা সম্ভব বলেও মনে করে না সে।

৪

শীত আসতেই তার শোবার ঘর থেকে বাড়ির বৈঠকখানায় আশ্রয় নিল এম্মা। জানালার ধারে একটা আর্মচেয়ারে বসে বাড়ির সামনের পথ দিয়ে গ্রামবাসীদের আনাগোনা দেখত।

প্রতিদিন দুবার করে লীয়ঁ এম্মাদের পাড়ায় একটা দোকানে কাজে আসে। এম্মা তাকে দূর থেকে দেখতে পায়। ও তখন সেলাইএর কাজ

সবেমাত্র সেরে আর্মচেয়ারটায় বাঁহাতের তালুতে থুতনিটা রেখে বসে থাকে। ও ভাবে লায় হয়ত আসবে তাদের বাড়িতে। কিন্তু আসে না। কাজ সেরে পথে পথেই নিঃশব্দে চলে যায়।

হোমা আসে রোজ রাতে খাবার সময়। যতদূর সম্ভব পায়ে শব্দ না করে আসার চেষ্টা করে হোমা যাতে কারো অসুবিধা না হয়। এসেই সে এক কথা বলে, সকলকেই নৈশ নমস্কার। খাবার সময় চার্লসএর সঙ্গে নানা রকমের কথা বলে। প্রথমে সে চার্লসকে তার রোগীদের খবর জিজ্ঞাস করে, চার্লস আবার জিজ্ঞাসা করে কোন্ রোগীর কাছ থেকে টাকা পাওয়া যাবে এবং কার কাছে পাওয়া যাবে না। তারপর তারা খবরের কাগজে প্রকাশিত নানা খবরাখবর নিয়ে কথা বলে। হোমার তখন গোটা খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য সমেত। তারপর সে ফ্রান্সে বা পাশাপাশি কোন রাজ্যে কোথায় কি কি ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে তার কথা বলে। এই সব কিছু কথা শেষ হয়ে গেলে হোমা সেখানের খাদ্যতালিকা নিয়ে মন্তব্য করে। কোন্ মাংসের টুকরোটা তাকে দিতে হবে তা সে বসে বসেই দেখিয়ে দেয়। বলে কি করে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে স্টু তৈরি করতে হয়। সেবিষয়ে ঝিকে পরামর্শ দেয়। কিভাবে জেলি তৈরি করতে হয় হোমা তাও জানে।

রাত্রি আটটার সময় রোজ একবার করে হোমার কাছে জাস্টিন আসে। তখন হোমার দোকান বন্ধ করার সময়। হোমা এই সময় তার দিকে একবার অর্থপূর্ণ কটাক্ষে চায়। অর্থাৎ সে দেখে হোটেলের ঝি ফেলিসিতে আছে কিনা তা দেখা। সে বুঝতে পেরেছে ফেলিসিতের প্রতি এক দুর্বলতা আছে জাস্টিনের।

ছেলেটার আর একটা দোষ আছে। সে পরের কথা আড়িপেতে শোনে। অনেক সময় এই সব করতে তার কাজে ফাঁকি দেয়। এক রবিবার মাদাম হোমা জাস্টিনকে বৈঠকখানা ঘরে ডাকতে থাকেন। ঐ ঘরে সন্ধ্যের সময় তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো আর্মচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তিনি জাস্টিনকে ডেকে ছেলেমেয়েগুলোকে সেখান থেকে শোবার ঘরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু জাস্টিন তা করেনি। সে যে ঘরে দাঁড়িয়ে অন্য লোকের কথা শুনছিল সে ঘর থেকে বার হয়নি।

মাঝে মাঝে খেলাধুলোর আসর বসাত হোমা তার বাড়িতে। কিন্তু তার নিন্দুক স্বভাব আর রাজনৈতিক মতামতের জন্য গাঁয়ের অভিজাত শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একের পর এক করে চটে উঠেছিল তার উপর। শুধু লায় আর বোভারী দম্পতি ছাড়া আর কেউ আসত না।

দরজায় ঘণ্টা বাজার শব্দ হতেই হোমা ছুটে গিয়ে মাদাম বোভারীর শালটা গা থেকে নিয়ে রেখে দিল এক জায়গায় আর বরফের উপর হাঁটার বাড়তি জুতোজোড়াটা দোকান ঘরের ডেস্কের তলায় রেখে দিল।

প্রথমে হোমা এম্মার সঙ্গে একার্তে খেলত। লায় তখন এম্মার চেয়ারের

পিছনে দাঁড়িয়ে এম্মার তাসের দিকে তাকিয়ে থাকত। এম্মা যতবারই একটা তাস টানত ততবারই তার পোষাকটা একটু উঁচু লীয়ঁর হাতে ঠেকত অথবা তার পোষাকের নিচের দিকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ত আর লীয়ঁ তা বুঝতে না পেরে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিত অনেক সময়। পরে সে তা বুঝতে পারলে তার মনে হত সে যেন একটা মানুষকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে।

এম্মার সঙ্গে খেলা হয়ে গেলে হোমা চার্লসএর সঙ্গে ডোমিনো খেলত। ও খেলায় ওরা যখন মশগুল হয়ে থাকত তখন এম্মা আর লীয়ঁ পাশাপাশি বসে থাকত। এম্মার অনুরোধে লীয়ঁ তাকে কবিতা পড়ে শোনাত। সে কবিতায় প্রেমের ছত্রগুলো পড়ার সময় গলার স্বরটা অনেক নামিয়ে পড়ত। কেমন যেন ভাবময় এক বিষাদ ফুটে উঠত সে কণ্ঠে।

এদিকে ওদের তাসখেলা যখন হয়ে যেত তখন ওরা ঘুমিয়ে পড়ত আর সেই অবকাশে এরা অর্থাৎ লীয়ঁ আর এম্মা নিচু গলায় অনেক গোপন কথা বলাবলি করত। সে কথা কেউ শুনতে পেত না।

এইভাবে বই দেওয়া নেওয়া আর কথা ও কাহিনী বলাবলির মধ্য দিয়ে পরস্পরের অনেক কাছে চলে আসে দুজনে। মঁসিয়ে বোভারী কোন সন্দেহ করেনি, কোন ঈর্ষা বোধ করেনি। সে এটা সহজভাবেই গ্রহণ করে। তার জন্মদিনে দামী উপহার দেয় লীয়ঁ। আবার রুয়েন শহর থেকে অনেক ফরমাসী জিনিস এনে দেয়।

একদিন বাসায় ফিরে লীয়ঁ দেখতে পায় তার ঘরের মধ্যে মখমলের কাপড়ঢাকা একটা সুন্দর ছবিওয়ালা খাতা। এটা এম্মার উপহার। উপহারটা সে সঙ্গে সঙ্গে হোমাদের বাড়ির সকলকে ও তাদের ঝি চাকরদের পর্যন্ত দেখায়। এতে গাঁয়ের অনেকের মনেই সন্দেহ জাগে, এত লোকের মধ্যে বেছে বেছে লীয়ঁকেই বা মাদাম বোভারী এ উপহার দিল কেন? নিশ্চয় তাহলে ওদের মধ্যে একটা ভালবাসাবাসির খেলা চলছে।

তাছাড়া এম্মার রূপলাবণ্য ও বুদ্ধির প্রশংসা বোকার মত যেখানে সেখানে করে গাঁয়ের লোকের মনে এই সন্দেহকে বাড়িয়ে দেয় আরও। একদিন বিনেটকে একথা বলতে গেলে সে পরিষ্কার বলে দেয় তার মুখের উপর, একথা শুনে আমার কি হবে? সে ত আমাকে তার গলা জড়িয়ে ধরতে দেয় না।

দিনে দিনে মনের দুঃখ বেড়ে যায় লীয়ঁর। সে বুঝতে পারে না কিভাবে সে তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করবে মাদাম বোভারীর কাছে। একথা প্রকাশ করলে মাদাম রেগে যেতে পারে। আবার প্রকাশ না করাটাও তার পক্ষে কাপুরুষতার কাজ হবে—এই চিন্তাটা এক প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল তার মনে। তার এই অতৃপ্ত বাসনা আর অন্তহীন হতাশার কথাটা যতই ভাবত সে ততই চোখে জল আসত তার। এক নীরব বেদনায় গুমরে মরত। প্রায়ই মাঝে মাঝে সে সাহস করে কথাটা এম্মাকে জানাবার জন্য চিঠি লেখার

চেষ্টা করত। কিন্তু চিঠি লিখে আবার সেটাকে ছিঁড়ে ফেলত। ভাবত এটা ঠিক হলো না। এক একবার এম্মার মুখের সামনে সরাসরি কথাটা বলার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠত সে। কিন্তু তার মুখের সামনে বলতে গিয়ে বলতে পারত না। সব সাহস হারিয়ে ফেলত। আবার যদি সেই সময় ঘটনাক্রমে চার্লস এসে পড়ত সেখানে এবং তাকে তার সঙ্গে কোথাও যাবার কথা বলত তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেত সেখানে। ভাবত তার স্বামীর সাহচর্য মানেই এম্মার সাহচর্য, কারণ তার স্বামী ত তারই সত্তার একটা অংশ।

এদিকে এম্মা তখনো পর্যন্ত কোনদিন ভেবে দেখেনি ব্যাপারটা। লীয়ঁকে সে ভালবাসে কি না তা সে কখনো ভেবে দেখেনি। তার কাছে ভালবাসার ব্যাপারটা বিদ্যুৎ চমকের মতই আকস্মিক। ভালবাসা হচ্ছে আকাশ থেকে সহসা জীবনে নেমে আসা এক ঝড় যা গোটা জীবনটাকেই উৎপাটিত করে তার সমস্ত কামনা বাসনা ও আবেগ অনুভূতিকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। ভালবাসা কোন দীর্ঘায়িত ব্যাপারের এক প্রলম্বিত পরিণতি একথা কোনদিন মনে মনে স্বীকার করেনি সে। সে বুঝতে পারেনি ভালবাসার আবেগ একে একে অভিব্যক্ত না করলে তা একদিন অকস্মাৎ ফেটে পড়ে যেমন ছাদের জলবাহী নালীগুলি কোনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে ছাদে জল জমতে জমতে দেওয়ালে ফাটল দেখা যায়।

তখন ফেব্রুয়ারি মাস। সেদিন ছিল তুষারাচ্ছন্ন এক অপরাহ্ণ। সেদিন মঁসিয়ে হোমা, মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারী আর লীয়ঁ ইয়নভিল থেকে এক মাইল দূরে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিল। একটা নির্জন ফাঁকা উপত্যকার মাঝে একটা নতুন মিল নির্মিত হচ্ছিল।

হোমা তার সঙ্গে দুটো ছেলেকে নিয়ে যায়। হাঁটাটা ব্যায়ামের কাজ করবে। ওরা গিয়ে দেখল উপত্যকাসংলগ্ন ফাঁকা প্রান্তরের উপর আয়তক্ষেত্রাকার এক বিরাট মিল তৈরি হচ্ছে। এখনো কাজ সব শেষ হয়নি। কয়েকটি জায়গায় বালি, চুণ, পাথরকুচি প্রভৃতি স্তূপাকার করা আছে। মিলের বাড়ি কত মজবুত হবে, মিলটা হলে কত কাজে লাগবে স্থানীয় লোকদের তা সবাইকে বুঝিয়ে দিল হোমা।

এম্মা লীয়ঁর সঙ্গে পথে যেতে যেতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। লীয়ঁর একটা হাত ধরে তার কাঁধের উপর অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছিল এম্মা। তার চোখদুটা ছিল আকাশের পানে নিবদ্ধ। অপরাহ্ণের ম্লান সূর্যের রশ্মিগুলো কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল কুয়াশার উপর তা দেখছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখল চার্লস অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে তাদের। তার মাথার টুপীটা চোখের কাছ পর্যন্ত টানা। শীতে জড়োসড়ো অবস্থায় তাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছিল।

চার্লসকে যত খারাপ দেখাচ্ছিল ততই মনের মধ্যে এক বিকৃত আনন্দ পাচ্ছিল এম্মা, ততই তার প্রতি বিতৃষ্ণাটা বেড়ে যাচ্ছিল। আর চার্লসকে যতটা খারাপ লাগছিল দেখতে লীয়ঁকে ঠিক ততটা ভাল লাগছিল। শীতে মুখখানা লীয়ঁর আগে সাদা দেখাচ্ছিল। তার আবেদনটা বেড়ে গিয়েছিল আগের থেকে। তার কানের পাশে চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। জামার ফাঁক দিয়ে তার ঘাড়ের একটা অংশ উঁকি মারছিল। আকাশের দিকে নিবদ্ধ লীয়ঁর শান্ত চোখের দৃষ্টিটা আকাশের ছবি ভাসতে থাকা সকালের শান্ত সরোবরের থেকে সুন্দর মনে হচ্ছিল এম্মার চোখে।

হঠাৎ 'থাম, থাম' বলে হোমা চিৎকার করে উঠল। সকলে সচকিত হয়ে দেখল হোমার একটা ছেলে চূণের গাদার মধ্যে তার পাটা ডুবিয়ে দিয়েছে তার জুতো সাদা করার জন্য। জাস্টিন তার জুতোটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না, একটা ছুরি চাই। চার্লস তখন কাছে এসে গেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছুরি বার করে দিল।

তা দেখে নিজের মনে মনে চমকে উঠল এম্মা। সামান্য চাষীর মত সে পকেটে ছুরি নিয়ে বেড়ায় একথা মনে করে রাগ হলো চার্লসএর উপর। ক্রমে শীত বাড়তে থাকায় ওরা বাড়ি ফিরল।

সেদিন সন্ধ্যায় পাড়ায় একটা নিমন্ত্রণ ছিল এম্মাদের। চার্লস চলে গেল সেখানে। কিন্তু এম্মা গেল না। বিছানায় বসে রইল একা একা। বসে রইল আগুনের দিকে তাকিয়ে।

আজ প্রথম তার স্বামী চার্লসএর সঙ্গে লীয়ঁর চেহারাগত পার্থক্যটা স্পষ্ট করে খতিয়ে দেখল এম্মা। এই নিষিদ্ধ গোপন কথাটা আজ প্রথম এক দুঃসাহসিক স্পর্ধায় তার চেতনার স্বচ্ছতায় এসে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ঘরের জ্বলন্ত আগুনের সামনে এম্মার মনে হল যেন স্পষ্ট ফুটে উঠল দুটি পুরুষের ছবি। তখন মনে হলো লীয়ঁ যেন একটা বেতের ছড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই আগুনের সামনে। তার আর এক হাতে হোমার একটা ছেলে। এর আগে কখন কোথায় লীয়ঁকে কিভাবে দেখেছে, সে কি কি বলেছে, তার কণ্ঠস্বর কেমন তা সব একে একে মনে পড়ে গেল তার। আরো মনে হলো লীয়ঁর সুন্দর ঠোঁট দুটো চুম্বনের জন্য যেন ফুলে উঠছে এক রক্তিম উচ্ছ্বাসে। তার কণ্ঠটা যেন তার কানে বাজছে। অপূর্ব! আপন মনে বলে উঠল এম্মা। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করল, সে কি কাউকে ভালবাসে? তবে সে কাকে ভালবাসে? কে সে? না, না, সে নিশ্চয় আমাকেই ভালবাসে।

একথা যতই ভাবতে লাগল এম্মা তার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি খুঁজে পেল একে একে। মনের মাঝে জ্বলতে থাকা আগুনের যে কম্পিত আলোটা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ঘরখানায় সে আলো বড় মধুর মনে হলো তার। সে তার দুহাত বাড়িয়ে দিল। হায়, যদি তার সঙ্গে আমার ভাগ্যটা এক হয়ে জড়িয়ে

পড়ত? কিন্তু কেন তা হয়নি? কিসের বাধা?

চার্লস যখন ঘরে এল তখন রাত্রি দুপুর। এম্মা তাকে জিজ্ঞাসা করল কেমন ভোজসভা হলো? চার্লস বলল, লীয় আসেনি। সে সন্ধ্যে হতেই তার ঘরে চলে যায়। এম্মা একথা শুনে নীরবে হাসল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় লেহুড়ে এল এম্মার কাছে বেড়াতে। লেহুড়ে ইয়নভিলের এক দোকানদার। তার জন্ম গ্যাসকনে হলেও এখন সে নর্মাণ্ডিতে বসবাস করছে। তার চেহারাটা বেশ মোটা। মাথার চুলগুলো সাদা আর তার চোখগুলো বেশ কালো। অনেকে বলে আজ সে দোকানদার হলেও একদিন সে ছিল ফেরিওয়ালা। আবার কেউ বলে সে নাকি আগে সুদবন্ধকীর কারবার করত। তবে সে যাই হোক লেহুড়ের হিসাবকার্যে দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে যায় সকলে।

লেহুড়ে এসেই তার টুপীটা খুলে তার কালো ফিতেটা দরজার উপর আটকে রাখল। তারপর একটা সবুজ কৌটো টেবিলের উপর রেখে অনুযোগের সুরে বলল, মাদামের মত একজন সম্ভ্রান্ত ও সুক্ষ্মরুচিসম্পন্না মহিলার করুণা হতে তার ছোট্ট দোকানটি আজও বঞ্চিত হয়ে আছে। মাদাম যদি অনুগ্রহ করে কোন জিনিসের অর্ডার দেন তাঁর পছন্দমত তাহলে সে পরম যত্ন সহকারে তা সরবরাহ করবে সঙ্গে সঙ্গে। সে বড় বড় কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত আছে এবং ভাল ভাল মাল কিনে আনে।

এম্মা বলল তার এখন কোন জিনিসের দরকার নেই।

লেহুড়ে কিন্তু কিছুমাত্র দমে না গিয়ে তিনটে আলজীরিয় স্কার্ফ বা ওড়না বার করে টেবিলের উপর রাখল। সেগুলো ছিল জরির কাজ করা। আর কিছু বিলাতী সূচ, এক জোড়া সৌখীন চটি বার করল। ওড়নাগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছিল, তার সোনার জরিগুলো মিটমিট করছে থাকা আকাশের তারার মত চিকচিক করতে লাগল।

এম্মা জিজ্ঞাসা করল, এগুলোর দাম কত?

লেহুড়ে বলল, দাম এত সস্তা যে বললে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। তাছাড়া তাড়াতাড়ি কিছু নেই। আপনি সময় মত—আমি ইহুদীদের মত নই।

এম্মা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, না আমার দরকার নেই।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। মঁসিয়ে লেহুড়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল। ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে পরে ব্যবসা হবে আমার। মেয়ে খরিদ্দারদের মন কিভাবে জয় করতে হয় তা আমি জানি। শুধু নিজের স্ত্রীর মন পেলাম না।

এম্মা হাসল।

হঠাৎ গলার স্বরটা নামিয়ে এনে লেহুড়ে মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আসল কথা কি জানেন? টাকার জন্য আমি কখনো ভাবি না। এমন কি

আপনার যদি কখনো টাকার দরকার হয়ত বলবেন।

এম্মা নীরবে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করল।

মঁসিয়ে লেহুড়ে তেমনি নিচু গলায় বলল, বিশ্বাস করুন, আমাকে টাকার জন্য বেশী দূরে যেতে হবে না।

তারপর লেহুড়ে প্রসঙ্গটা পাল্টে মঁসিয়ে টেলিয়ারের কথা বলতে লাগল। মঁসিয়ে টেলিয়ার হচ্ছে কাফে ফ্রাঁসোয়ার মালিক। মঁসিয়ে বোভারী এখন তার চিকিৎসা করছে।

লেহুড়ে বলে চলল, ওর রোগটা কি জানেন? তার কাশি হয়েছে। বুকে সর্দি জমেছে। তার কাশির চোটে গোটা বাড়িটা কাঁপতে থাকে। এত শীত লাগছে যে আমার মনে হয় ওর জন্যে একটা কাঠের কোট চাই। একদিন কিন্তু ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। প্রচুর ব্রাণ্ডি খেত। কিন্তু যাই হোক, যতই হোক, একজন পুরনো বন্ধু তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটা দেখা সত্যিই কষ্টকর।

তার বাক্সর মধ্যে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখে মঁসিয়ে লেহুড়ে আবার বলল, যা আবহাওয়া চলছে। জানালার কাঁচে বরফ পড়ছে। এত ঠাণ্ডায় সকলেরই অসুখ করছে। আমার নিজের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। একদিন মঁসিয়ের কাছে আমাকে আসতে হবে। আমার পিঠে একটা ব্যথা হচ্ছে। তাহলে মাদাম, আমি যাচ্ছি। দরকার হলে বলবেন। আপনার সেবার জন্য আমি সব সময় প্রস্তুত।

লেহুড়ে চলে গেলে এম্মা তার ঝিকে তার ঘরে খাবার দেবার জন্য বলল।

ঝি খাবার দিয়ে গেলে খেতে খেতে ভাবল এম্মা, ওড়নার ব্যাপারে সে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। হঠাৎ সিঁড়িতে কার পদশব্দে চমকে উঠল এম্মা। দেখল লীয়ঁ আসছে।

ব্যস্তভাবে খাওয়াটা শেষ করে তোয়ালেতে হাত মুখ মুছল এম্মা।

লীয়ঁ এসে আগুনের কাছে একটা ছোট চেয়ারে বসল। খাওয়ার টেবিল থেকে সরে এসে সেলাই করতে মন দিল এম্মা।

কোন কথা বলার ওদের ছিল না। লীয়ঁ দু একটা কথা বলল। কিন্তু এম্মা সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে একমনে সেলাই করে যেতে লাগল।

এম্মা মনে মনে বলল, আহা, বেচারা, বড় ভাল মানুষ।

লীয়ঁ মনে মনে ভাবল, ও কি আমাকে অপছন্দ করে? যদি তা করে তাহলে কি জন্য? কি আমার দোষ?

লীয়ঁ একসময় বলল, আমি দিন কতকের মধ্যে অফিসের কাজে রুয়েন যাচ্ছি। আপনার সেই পত্রিকার গ্রাহককাল শেষ হয়ে গেছে। আমি কি আপনার গ্রাহকের চাঁদাটা দিয়ে দেব?

এম্মা বলল, না।

কেন না ?

কারণ ····

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে ঠোঁটটা চেপে দিল। শেষ করল না এম্মা। আবার একটা নতুন সুতো এনে সেলাইয়ে মন দিল।

এম্মার এই একটানা সেলাই-এর কাজ দেখে রাগ হলো লীয়ঁর। এই সেলাই-এর কাজ শুধু এম্মার মনটাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, তার আঙুলের ডগাগুলোকেও শক্ত ও কর্কশ করে দিচ্ছে।

আপনি তাহলে ছেড়ে দিচ্ছেন ? লীয়ঁ জিজ্ঞাসা করল।

এম্মা বলল, কি ছাড়ব ? গান ? হ্যাঁ, ছাড়ছি। আমার এখন অনেক কাজ। আমি এখন স্বামী সংসার কত কি পেয়েছি। কত কর্তব্য আমাকে পালন করতে হয়।

এম্মা দেওয়াল ঘড়িটার পানে তাকাল। চার্লস আজ আসতে দেরী করছে। সে লীয়ঁকে দেখিয়ে ক্লান্তির ভাণ করল। তাঁর স্বামীর উদ্দেশ্যে বলল, সত্যিই উনি বড় ভাল লোক।

লীয়ঁ ব্যক্তিগতভাবে সত্যিই ভালবাসত চার্লসকে। তাই এম্মার কথাটা সমর্থন করে চার্লসএর প্রশংসা করতে লাগল। সে আরো বলল সে গাঁয়ের সকলের মুখেই একথা শুনেছে। বিশেষ করে শুনেছে মঁসিয়ে হোমার কাছে।

এম্মা এখন বলল, না।

লীয়ঁ বলল, হ্যাঁ, মানুষ হিসাবে হোমার সত্যিই ভাল। কিন্তু মাদামের পোষাক আশাকের অবস্থা ভাল নয়।

এম্মা বলল, যে নারী, স্ত্রী ও মাতা হিসাবে যত নিষ্ঠাবান ততই সে পোষাক আশাকের প্রতি অগোছাল হয়ে পড়ে।

তারপর আবার চুপ করে রইল এম্মা। এর পরও এম্মা ঠিক এইভাবে চলতে লাগল। তার কথাবার্তা বলার ভঙ্গিমা ও আচরণপদ্ধতি সব বদলে গেল কেমন যেন। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল লীয়ঁ। আজকাল এম্মা আশ্চর্যভাবে সংসারের কাজে মন দিয়েছে। সে আজকাল নিয়মিত চার্চে যায়। বাড়ির ঝি-এর প্রতি কঠোর হয়ে উঠেছে আগের থেকে।

এরপর তার মেয়ে বার্থেকে ধাত্রীর ঘর থেকে নিয়ে এল এম্মা। ফেলিসিতে তাকে নিয়ে এল। এম্মা তার পা ও হাতদুটোর ঢাকা খুলে দেখল মেয়েটার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতিই হয় নি। শিশুদের এমনিতেই ভালবাসত সে। শিশুরাই তার জীবনে ছিল পরম সান্ত্বনার স্থল এবং কোন শিশুকে কাছে পেলে এমনভাবে সে আদর ও চুম্বন করত যাতে মনে হত সে একজন আদর্শ স্নেহময়ী মমতাময়ী মা।

আজকাল চার্লসএর প্রতি সে অনেকটা নজর দিয়েছে। চার্লস কাজ থেকে বাড়ি ফিরে দেখে তার ঠাণ্ডা চটি জোড়াটা আগুনের কাছে রেখে গরম করা

হয়েছে। সে দেখে তার পোষাকে ঠিক সময় লাইনিং লাগানো হয়ে থাকে। তার জামায় কখনো বোতাম না-থাকা হয় না। আজকাল চার্লস যদি কখনো একসঙ্গে বাগানে বেড়াবার কথা বলে তাহলে রেগে যায় না। তার রাত্রিতে পরার টুপীগুলো একজায়গায় ভালভাবে জড়ো করা থাকে। চার্লস কোন কিছু করতে বললে আজকাল আর তর্ক করে না এম্মা। তার কারণ বা তার মধ্যে কি যুক্তি আছে তা জানতে না চেয়েই নির্বিবাদে তা করে বা মেনে নেয়।

আজকাল এম্মাকে যতই দেখে ততই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় লীয়ঁ। খাবার সময় আজকাল এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক সুখের ছবি ফুটে ওঠে বোভারীদের বাড়িতে। ওদের শিশুকন্যাটা মেঝের উপর পাতা কার্পেটে হামাগড়ি দিয়ে বেড়ায়। ওরা খেতে খেতে গল্প করে আর মাঝে মাঝে এম্মা তার স্বামীর কপালে পিছন থেকে চুম্বন করে। এই সব দেখে লীয়ঁ ভাবে এ-ধরনের গুণবতী রমণীকে কাছে পাওয়া সত্যিই এক দুরূহ ব্যাপার।

এম্মাকে যতই গুণবতী মনে হয় লীঁয়র ততই তাকে পাওয়ার আশা দুরাশায় পরিণত হয়। এইভাবে দিনে দিনে এক আদর্শ নারীত্বের ভূষণে ভূষিত হয়ে লীয়ঁর চোখে অসাধারণ হয়ে ওঠে এম্মা। মনে হয় সে যেন রক্ত মাংসের গড়া কোন সাধারণ মর্তমানবী নয়। ফলে তার প্রতি ভালবাসার ভাবটা অতি সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। তার প্রতি তার এই প্রেমানুভূতি এত সূক্ষ্ম এত পবিত্র হয়ে ওঠে যে এতে তার দৈনন্দিন জীবনের কোন ভারসাম্য নষ্ট হয় না। এ অনুভূতি এমনই জিনিস যে এতে পাওয়ার আনন্দের থেকে না পাওয়ার বেদনাকে অনেক বড় বলে মনে হয়। এম্মা তার কাছে এক অপার্থিব মানসী প্রিয়া। তাই তাকে পাওয়ার কোন আশা না করে না পাওয়ার এক সূক্ষ্ম মধুর বেদনাকে বুকের মাঝে লালন করে যায় লীয়ঁ।

এম্মা এখন অনেকটা রোগা হয়ে গেছে আগের থেকে। তার মুখখানা ম্লান ও শীর্ণ দেখাচ্ছে। তার মোলায়েম কালো চুল, তার বড় বড় সুন্দর চোখ, টিকল নাক, উড়ন্ত পাখির মত লঘু অথচ ছন্দায়িত গতিভঙ্গি সব মিলিয়ে তাকে দেখে মনে হয় বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। সে যেন বিরল অমানবিক ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। একই সঙ্গে আজকাল তাকে বড় বিষণ্ণ ও বিনম্র দেখায়। মনে হয় যে কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সে সততই প্রস্তুত। একই সঙ্গে বড় মধুর ও উদাসীন। আজকাল তাই এম্মার কাছে এলে লীয়ঁর মনে হয় চার্চের ভিতর মাঝে মাঝে যেমন ফুলের গন্ধে ও মর্মরপ্রস্তরের শীতলতায় এক কাঁপন জাগে বুকের মাঝে তেমনি এম্মার কাছে গেলেও কেমন এক শিরশিরে কাঁপন জাগে। শুধু লীয়ঁ নয়, অন্য যে কোন লোকেরও তাই মনে হয়।

হোমা ও গাঁয়ের লোকেরা তার প্রশংসা করে। বলে মাদাম বোভারী খুব কমে সংসার চালায়। চার্লসএর রোগীরা তার ভদ্রতার সুখ্যাতি করে

আর গরীবরা তার দানশীলতার প্রশংসা করে।

বাইরে যে যাই মনে ভাবুক, পাওয়া না পাওয়ার এক বিরাট দ্বন্দ্ব চলছিল এম্মার অন্তরে। তার পোষাকের অন্তরালে ঢাকা পড়ে ছিল তার বিক্ষুব্ধ অন্তরের কুটিল তরঙ্গলীলা। তার অন্তরের মধ্যে যে ঝড় বইছিল তার কথা কিছুই বলল না তার ঠোঁট। সে লীয়ঁকে ভালবাসে। সে এক সুযোগ খুঁজছিল, এমন এক নির্জনতার অবকাশের প্রত্যাশায় ছিল যেখানে সে অবাধে তার মনের কথা ব্যক্ত করতে পারবে লীয়ঁর কাছে। লীয়ঁ যখন তাদের বাড়িতে আসে তখন পদশব্দে বুকটা কেঁপে ওঠে। সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার কল্পনা ও দিবাস্বপ্নে বাধা পড়ে। ক্রমে উত্তেজনাটা মিলিয়ে যায়। একে একে সমস্ত বিহ্বলতা পরিণত হয় বেদনায়।

লীয়ঁ কিন্তু এম্মার এই মনের কথা জানত না। লীয়ঁ জানত না সে যখন এম্মাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় এম্মা তখন দোতলার জানালায় উঠে যায়, তার পানে তাকিয়ে থাকে, যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টিতে দেখে।

লীয়ঁর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করত এম্মা। সে যতক্ষণ থাকত তার মুখের ফুটে ওঠা প্রতিটি অনুভূতির রেখাচিত্র লক্ষ্য করত খুঁটিয়ে। মাঝে মাঝে এমন এক অজুহাত আবিষ্কারের কথা ভাবত যার দ্বারা সে স্বচ্ছন্দে লীয়ঁর ঘরে যেতে পারে। লীয়ঁ যে বাড়িতে থাকে সেই বাড়ির মধ্যেই মাদাম হোমা থাকে বলে তার ভাগ্যে ঈর্ষা হয় তার। কিন্তু এম্মা তার প্রেমের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যতই সচেতন হয়ে উঠতে লাগল ততই সে প্রেমকে অবদমিত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। সকলের কাছে ভাল হওয়ার, এক গুণবতী রমণী হিসাবে পরিগণিত হওয়ার অহঙ্কার পেয়ে বসে তাকে। সে যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে এক নির্বিকার ঔদাসীন্যে জমাট বাঁধা চেহারাটার পানে দেখে তখন ত্যাগের জন্য মনে মনে এক সান্ত্বনা পেয়ে যায় আপনা হতে।

তার অতৃপ্ত দেহগত কামনা বাসনা ও টাকার চাহিদা, প্রেমগত দুশ্চিন্তা সব মিলিয়ে একটা তীব্র দুঃখ ও বিষাদে পরিণত হয়। আর এই দুঃখটাকে জোর করে চেপে রাখে সে। কিন্তু যে কোন ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাঝে মাঝে এই অবদমিত দুঃখ ফেটে পড়ত ক্রোধের আকারে। তার খাবারের পরিবেশন যদি ঠিকমত না হত অথবা তার ঘরের দরজাটা যদি কেউ খুলে রেখে যেত তাহলে সে রেগে উঠত। অথচ বাইরে সে রাগ প্রকাশ না করে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে যায় সেই তিনটি মখমলের ওড়নার কথা যা একদিন লেহড়ে বেচতে এসেছিল, যা সে টাকার অভাবে কিনতে পারেনি। এইভাবে ছোটবড় কত চাহিদা তার অতৃপ্ত রয়ে গেছে, কত সুখের স্বপ্ন ব্যর্থতায় বিলীন হয়ে গেছে।

তার সবচেয়ে রাগ হয় চার্লসএর উপর। কারণ চার্লস তার দুঃখের কথা কিছুই বোঝার চেষ্টা করে না। সে সবদিক দিয়ে সুখী করতে পেরেছে তার

স্ত্রীকে, চার্লসএর এই মিথ্যা আত্মপ্রসাদ যে এক বিরাট আত্মঅবমাননারই নামান্তর এটা বোঝার ক্ষমতা নেই তার। কার জন্য সে এত গুণবতী হবার চেষ্টা করছে? কার জন্য সে এত ত্যাগ এত তিতিক্ষা করে চলেছে? অথচ এই চার্লসই তার সকল সুখের পথে একমাত্র ও অলঙ্ঘনীয় অন্তরায়। যে বন্ধনী তার জীবনটাকে চার দিক থেকে ঘিরে আছে, চার্লসই হলো সে বন্ধনীর কড়া।

তাই চার্লসই হয়ে উঠল তার রাগের একমাত্র কারণ। এই ক্রোধের আবেগকে সে যতই জয় করতে গেল, অপসারিত করতে গেল, ততই তা বেড়ে যেতে লাগল। এই ব্যর্থতা আরো তিক্ত করে তুলল তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কটাকে। মাঝে মাঝে নিজের উপরও রাগ হয় এম্মার। তার নিজের দুর্বলতার জন্য ঘৃণা হয় নিজের উপর। এই অবাঞ্ছিত গৃহপরিবেশের অস্তিত্বটাকে এড়াবার জন্যই মাঝে মাঝে সে দিবাস্বপ্নের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। তার স্বামীকে ভাল লাগে না বলেই ব্যভিচারের বাসনাকে প্রশ্রয় দেয় মনে মনে। এক একবার তার মনে হয় চার্লস তাকে প্রহার করুক। তার উপর অত্যাচার করুক। তাহলে সে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার যুক্তি খুঁজে পাবে। তা-হলে তাকে ঘৃণা করার একটা কারণ খুঁজে পাবে। আবার সে মাঝে মাঝে লোককে দেখাতে চায় সে সুখী।

কিন্তু তার শত চেষ্টা সত্ত্বেও এক একসময় তার ভণ্ডামিকে নিজেই সহ্য করতে পারত না। লীয়ঁর সঙ্গে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়। মনে হয় দূরে কোথাও গিয়ে তারা নতুন করে জীবন শুরু করবে। কিন্তু একথা স্পষ্ট করে ভাবতে গিয়ে সে নিজেই কেঁপে ওঠে ভয়ে। মনে হয় যেন কোন খাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, যে কোন সময়ে পড়ে যেতে পারে।

এক একসময় এম্মার মনে হয় লীয়ঁ আর তাকে ভালবাসে না। তার কি হবে? তাকে আর কেউ চায় না। কি হবে তার পরিণতি?

আর এই ধরনের চিন্তা মনে এলেই বিছানায় সটান শুয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এম্মা। দু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তার এই অবস্থা দেখে বাড়ির ঝি ফেলিসিতে বলে, আপনি মঁসিয়েকে এই রোগের কথা বলেন না কেন?

এম্মা বলে, এসব স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপার। ডাক্তারবাবুকে বলো না। তা হলে ভয় পাবেন।

ফেলিসিতে বলল, আমি আপনার কাছে আসার আগে যখন দিয়েপ্পিতে ছিলাম তখন বুড়ো গুরেনিয়র নামে এক জেলের মেয়ের এই রকম রোগ হয়। বিয়ের পর রোগটা তার সেরে যায়।

এম্মা বলল, আমার ক্ষেত্রে আলাদা ব্যাপার। এ রোগ আমার বিয়ের পর থেকেই শুরু হয়।

৬

সেদিন গোধূলিবেলায় জানালার ধারে বসেছিল এম্মা। হঠাৎ চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠল।

তখন সবেমাত্র বসন্তকাল এসেছে। এপ্রিল মাস। প্রতিটি বাগানে ফুল ফুটে উঠেছে। চারদিকে উৎফুল্ল নরনারীর ভিড়। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিল এম্মা, গাঁয়ের নদীটা ভবঘুরের মত এঁকে বেঁকে ঘাসে ঢাকা প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। সন্ধ্যার কুয়াশা গাঁয়ের পপলার গাছগুলোর শাখা প্রশাখায় জড়িয়ে ছিল। দূরে একপাল গরু দেখা যাচ্ছিল, হয়ত বাড়ি ফিরছিল। তাদের কোন ডাক শোনা যাচ্ছিল না। ঠিক এমন সময় চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠল। সন্ধ্যার শান্ত বাতাস তার ধ্বনিটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল চারদিকে।

চার্চের ঘণ্টাটা যখন একটানা বেজে চলেছিল এম্মার হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বাল্যজীবনের কথা। বিশেষ করে সে যখন কনভেণ্ট থাকত সেই সব দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

কনভেণ্টের চার্চে বেদীর উপর ফুলে ভরা ফুলদানির পাশে বড় বড় বাতিগুলো জ্বলত। এম্মার এখনও সব মনে আছে। আরো মনে আছে রবিবার প্রার্থনার দিন সে যখন প্রার্থনার শেষে মুখ তুলে তাকাত তখন উর্ধায়িত ধূপের ধোঁয়ার মাঝে যেন মেরির মূর্তিটি সে দেখতে পেত। ধোঁয়াটার রং কেমন যেন নীলচে ছিল—তাও মনে আছে তার। এই সব কথা স্মরণ করতে গিয়ে আবেগে ভরে উঠল তার মনটা। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে হঠাৎ নেমে পড়া পাখির মত সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। চার্চের দিকে পা বাড়িয়ে দিল। চার্চের ভক্তিমূলক পরিবেশে তার মনটা কিছুটা শান্ত হতে পারে।

পথে বেরিয়ে লেস্তিবুদয়ের সঙ্গে দেখা হলো। ঘণ্টা বাজিয়ে গাঁয়ের ছেলেদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে চার্চে ধর্ম ও নীতি উপদেশের কাজ শুরু হবে। এম্মা গিয়ে দেখল এর মধ্যেই গাঁয়ের অনেক ছেলে চার্চের মাঠে জড়ো হয়ে মার্বেলের গুলি খেলছে। অনেকে চার্চের পাঁচিলে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

ঘণ্টার মন্দীভূত ধ্বনির সঙ্গে ছেলেদের চেঁচামিচি শোনা যাচ্ছিল। মাথার উপর কতকগুলো চাতক পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। চার্চের এক প্রান্তে একটা বড় বাতি জ্বলছিল।

মাদাম বোভারী একটা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, পুরোহিত কোথায়?

ছেলেটা বলল, তিনি এখনি আসবেন।

এমন সময় দরজা খুলে একটি ঘরের ভিতর থেকে আব্বে বুর্নিসিয়েন বেরিয়ে এলেন। ছেলেরা তাঁকে দেখে ছোটাছুটি করতে লাগল। এম্মাকে দেখে আব্বে বললেন, মাপ করবেন মাদাম, আপনি এসেছেন আমি বুঝতেই পারিনি।

আব্বের দাড়িতে পাক ধরেছে। তিনি কিছু আগে খাওয়া শেষ করে হাঁপাচ্ছিলেন। এম্মাকে বললেন, তারপর কেমন আছেন?

এম্মা বলল, ভাল নেই।

আব্বে বললেন, আমিও তাই। যা গরম পড়েছে তাতে কারো শরীর ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু কি করব, নীরবে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? আপনার স্বামী কোন রোগের কথা বলেছেন?

'আমার স্বামী'—কথাটা শেষ করল না এম্মা।

গ্রাম্য যাজক কিছুটা বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনার স্বামী আপনাকে পরীক্ষা করে কোন ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দেননি?

এম্মা বলল, কোন পার্থিব ওষুধ আমি চাই না।

ছেলেদের দিকে একবার তাকিয়ে যাজক বুর্নিসিয়েন বললেন, ঐ যে ছেলেটা দেখছেন ও হলো কাঠের মিস্ত্রী বুদতের ছেলে। ছেলেটা বুদ্ধিমান, কিন্তু বড় দুষ্টু। ওর বাবা মা কোন নজর দেয় না। যাই হোক মঁসিয়ে বোভারী কেমন আছেন?

এম্মা সে কথায় কান দিল না। আব্বে বললেন, মঁসিয়ে বোভারী আর আমি দুজনেই এ অঞ্চলে সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ। তিনি মানুষের দেহগত রোগ দেখে বেড়ান আর আমার লক্ষ্য হলো মানুষের আত্মিক রোগের প্রতিকার।

এম্মা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, মানুষের মানসিক জ্বালা যন্ত্রণার উপশম ঘটানোই হলো আপনার কাজ।

যাজক বললেন, হ্যাঁ, দেখুন না এই সেদিন সকালে একটা গাঁয়ে একটা গরুর পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল। এখনকার চাষীদের নানারকম সমস্যা।

এম্মা বলল, চাষী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর লোকদেরও সমস্যা আছে।

আব্বে বললেন, হ্যাঁ, যেমন ধরুন কারখানার শ্রমিকরা।

এম্মা বলল, আমি তাদের কথা ভাবছি না।

আব্বে বললেন, আমি জানি অনেক সংসারে সন্তানের মারা এক টুকরো রুটিও পায় না।

এম্মা বলল, কিন্তু আমি ভাবছি যে সব মায়েদের রুটির কোন অভাব নেই। যাদের অন্য অভাব আছে—

যাজক মঁসিয়ে লে কুরে বললেন, হ্যাঁ আছে, যেমন জ্বালানী কাঠের।

এম্মা হতাশ হয়ে বলল, হা ভগবান! -

যাজক বললেন, আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন? আপনার শরীরে যা হোক একটা গোলমাল হয়েছে। আপনি বাড়ি ফিরে যান। বাড়ি গিয়ে এক কাপ চা অথবা বাদামী চিনি ফেলে দিয়ে এক গ্লাস জল খান। সব ঠিক হয়ে যাবে।

'কি জন্য?' এম্মা যেন একটা স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে কোন রকমে বলল।

আপনি কপালটা হাত দিয়ে ধরেছিলেন। তাই ভাবলাম আপনি হয়ত মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। আপনি আমাকে কি প্রশ্ন করছিলেন না?

এম্মা বলল, না, কিছু না।

এবার আব্বে আশ্চর্য হয়ে এম্মার পানে তাকাল। তারপর বলল, ঠিক আছে মাদাম বোভারী, মাপ করবেন। ছেলেগুলোর দিকে আমাকে নজর দিতে হবে। এখন আমার অনেক কাজ। আমার কথা আপনার স্বামীকে বলবেন।

আব্বে চার্চের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলে গেল। এম্মা তাঁর দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পিছন ফিরে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল। তার পিছনে যাজক ও ছেলেদের কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছিল।

বাড়ি ফিরে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে চেয়ারের উপর বসে পড়ল এম্মা। জানালার কাচের সার্সির ভিতর থেকে বাইরে থেকে যে ক্ষীণ আলো আসছিল তা বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠতে লাগল ঘরের ভিতর আর সেই অন্ধকারে ঘরের আসবাবপত্রগুলো জমাটবাঁধা অস্পষ্ট এক একটা বস্তুর মত দেখাতে লাগল। ঘরের আগুনটা নিবিয়ে গেছে। শুধু বড় ঘড়িটা টিক টিক শব্দ করে চলেছে।

এম্মার মনে হলো এই শান্ত সন্ধ্যার প্রাক্কালে সব কিছুই স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে আসে, একমাত্র তার অন্তরেই রয়েছে দারুণ বিক্ষোভ। এমন সময় এম্মা দেখল তার বাচ্চা মেয়ে বার্থে হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে আসছে। এম্মা বলল, আমাকে একা থাকতে দাও।

কিন্তু বার্থে সে কথার অর্থ বুঝতে পারল না। সে আবার ঘুরে এল তার মার কাছে। তার পোষাকের আঁচলটা জড়িয়ে ধরল।

এম্মা তার হাত ধরে সরিয়ে আবার বলল, আমাকে একা থাকতে দাও।

কিন্তু বার্থেকে জোর করে সরিয়ে দিতে গেলে টেবিলের ড্রয়ারের কাণায় লেগে তার পায়ের কাছটা কেটে গেল। রক্ত বেরোতে লাগল ক্ষত থেকে। এম্মা ব্যস্ত হয়ে ঝিকে ডাকতে লাগল। নিজেকে আপন মনে ভর্ৎসনা করতে লাগল। এমন সময় চার্লস এসে ঘরে ঢুকল।

এম্মা বলল, দেখ ত কি হয়েছে। বাচ্চাটা খেলতে গিয়ে লাগিয়েছে।

চার্লস বলল, এমন কিছু হয়নি। এই বলে সে ক্ষতস্থানটায় একটা প্লাসটারের পটি লাগিয়ে দিল।

সেদিন এম্মা নৈশভোজনের জন্য নিচের তলায় গেল না। ঘুমন্ত মেয়েটার কাছে একাই রয়ে গেল। ঘুমন্ত মেয়েটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার উদ্বেগ ক্রমশই কমে যেতে লাগল। এই ছোট্ট ব্যাপারটায় এতখানি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার জন্য নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে লাগল সে। বার্থে এখন ঘুমোচ্ছে। তার কান্না থেমে গেলেও তার চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু জল জমে রয়েছে। তার গালে প্লাসটার। দেখতে দেখতে হঠাৎ আপন মনে বলে উঠল এম্মা, কি আশ্চর্য, মেয়েটা কি কুৎসিত!

আবার চলে গিয়েছিল চার্লস। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় ফিরে এল।

এসে দেখল এম্মা তখন মেয়েটার দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লস ভাবল মেয়েটার জন্য উদ্বেগের আতিশয্যেই এম্মা এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাই ব্যস্ত হয়ে তাকে আশ্বাস দিয়ে তার কপালে চুম্বন করল। বলল, এর জন্য তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিকে হোমা ও মাদাম হোমা চার্লসকে বহু দৃষ্টান্ত সহযোগে ছেলেমানুষ সম্পর্কে সাবধান করে দিল। মাদাম হোমার ছেলেবেলায় তার উপর একটা জ্বলন্ত কয়লা পড়ে যায়। ঝি চাকরদের অন্যমনস্কতায় অনেক সময় বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের জীবনে অনেক অঘটন ঘটে।

হোমার উপদেশ এতই দীর্ঘ হয়ে উঠল যে সে প্রসঙ্গটা পাল্টাবার জন্য চার্লস লীয়ঁকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। এতে লীয়ঁ ভয় পেয়ে গেল মনে মনে। তবে কি চার্লস তার স্ত্রীর প্রতি তার গোপন আসক্তির কথা কিছু বুঝতে পেরেছে ?

কিন্তু চার্লস বলল একটা সাধারণ ও সামান্য কথা। সে লীয়ঁকে বলল আপনি যখন রুয়েনে যাবেন তখন আমার নিজের একটা ফটো তোলার খরচ কত পড়বে তা জেনে আসবেন।

লীয়ঁ অবশ্যই তা করবে। এ এমন কিছু বেশী কথা নয়। ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে হোমা কিন্তু ভাবল অন্য কথা। শহরের মধ্যে লীয়ঁর সঙ্গে মাদাম বোভারীর যে প্রেমসম্পর্কের গুজব রটে গেছে চার্লস কি সেই সম্বন্ধেই গোপনে কিছু বলল লীয়ঁকে ?

এদিকে লীয়ঁকে দেখলে সত্যিই অনেকের মনে হয় সে অতৃপ্ত প্রেমের বেদনায় ভুগছে। তার মুখে সব সময় বিষাদ লেগে আছে। তার খাওয়া কমে গেছে। হোটেলে মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া নিজে দেখেছে এবং এ নিয়ে কর আদায়কারি বিনেটের সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু বিনেট তাকে কোন নতুন খবর দিতে পারেনি। তার প্রেমাস্পদের কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে তার প্রেমের ব্যাপারে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ে লীয়ঁ। বৈচিত্র্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনযাত্রার একঘেঁয়েমিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সে। সারা ইয়নভিল গাঁ আর তার ঘরবাড়ি, মানুষ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সব বিসদৃশ ঠেকে তার কাছে। রোজ সেই এক দৃশ্য এক মানুষ দেখতে আর ভাল লাগে না তার।

এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্যারিসে চলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করার কথা ভাবে লীয়ঁ। আইনের পড়াটা তাকে শেষ করতেই হবে এবং এজন্য তাকে রুয়েনে যেতে হবে। সেখানে সে আইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প চর্চা করবে। গিটার বাজাতে শিখবে। সৌখীন শিল্পীদের মত সে ড্রেসিং গাউন আর মখমলের চটি পরে বেড়াবে। কিন্তু এ বিষয়ে তার একমাত্র ভাবনা মার জন্য। মা হয়ত তাকে মত দেবেন না প্যারিসে যেতে।

তার মালিকও বলল, অন্য কোথাও গিয়ে তার কাজের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ানো উচিত।

অবশেষে লীয়ঁ প্যারিসে যাবার জন্য এক দীর্ঘ চিঠি লিখে পাঠাল মার কাছে। মার সম্মতি এসে গেল।

লীয়ঁ যাবার জন্য খুব একটা তাড়াতাড়ি করল না। ঠিক করল এক মাস পর সে রওনা হবে। হিভার্ত তার মালপত্র একে একে ইয়নভিল থেকে রুয়েন ও রুয়েন থেকে প্যারিসে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল। সব মালপত্র চলে গেলে একটা দিন ঠিক করে রওনা হলো লীয়ঁ। মঁসিয়ে ও মাদাম হোমা মাদাম লে ফ্রঁসোয়া প্রভৃতি সকলেই তার চলে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল।

সবার সঙ্গে দেখা হলো। এবার বাকি শুধু মঁসিয়ে বোভারী। লীয়ঁ বোভারীদের বাড়ি গিয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেল। এম্মা এগিয়ে এল। বলল, মঁসিয়ে বাড়ি নেই।

লীয়ঁ বলল, বাড়ি নেই?

এম্মা তার ঠোঁট কামড়ে ধরল। তার দেহের সব রক্ত যেন মুখের ঠোঁটে এসে জমা হল। লীয়ঁ বলল, আমি বার্থেকে একটা চুম্বন করব।

এম্মা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হুকুম করতেই ফেলিসিতে বার্থেকে কোলে করে নিয়ে এল। লীয়ঁ তাকে কোলে নিয়ে তার ঘাড়ে চুম্বন করল।

ফেলিসিতে বার্থেকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। একই বেদনায় ক্ষত বিক্ষত দুটি অন্তর পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করল। এম্মা বলল, বৃষ্টি হবে।

লীয়ঁ বলল, আমার কোট আছে।

এম্মা পিছন ফিরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লীয়ঁ তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, করমর্দন—ইংরাজী কায়দায়।

এম্মা নীরবে তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। লীয়ঁ তা ধরল। তার মনে হলো, এই নরম হাতের ঘর্মাক্ত তালুটাতে তার সারা জীবনের সুখ শান্তির সব রহস্য নিহিত আছে।

লীয়ঁ বলল, তাহলে বিদায়।

হাত তুলে এম্মা বলল, হ্যাঁ বিদায়, তুমি যাও।

লীয়ঁ বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। বাজারের কাছে এসে পথের উপর দাঁড়িয়ে সে একবার বোভারীদের সাদা বাড়িটার পানে পিছন ফিরে তাকাল। তার মনে হল দোতলার শোবার ঘরের জানালার ধারে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সামনেই একটা পর্দা সারা জানালাটা ঢেকে দিল। লীয়ঁ চলে গেল।

গাঁয়ের শেষে এক জায়গায় পথের ধারে গিলমিন ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে

অপেক্ষা করছিল। হোমা তার কোটটা হাতে নিয়ে কথা বলছিল গাঁয়ের প্যাকরার সঙ্গে। লীয়ঁ যেতে হোমা তাকে জড়িয়ে ধরল বুকে। তার চোখে জল।

গাড়ি ছেড়ে দিল লীয়ঁ তার ভিতরে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে। হোমা ফিরে এল।

মাদাম বোভারী বাগানের দিকের জানালাটা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। আকাশে মেঘ জমছিল। কিন্তু সারা আকাশের মাঝে শুধু পশ্চিম দিগন্তেই মেঘ জমছিল। হঠাৎ দমকা বাতাস বইতে শুরু করল। এক পশলা বৃষ্টি এল। কিন্তু পরক্ষণেই বৃষ্টি থেমে গেল। রোদ উঠল আকাশে। মাদাম বোভারী আপন মনে বলে উঠল, এতক্ষণে সে হয়ত রুয়েনে পৌছে গেছে।

সাড়ে ছটা বাজতেই অন্য দিনকার মত হোমা এসে হাজির হলো। এসে বলল, ছোকরা তাহলে চলে গেল।

মঁসিয়ে বোভারী বলল, তাই ত দেখছি। তারপর হোমাকে বলল, আপনার বাড়ির খবর কি?

হোমা বলল, ভালই তবে আমার স্ত্রীর মনটা আজ ভাল নেই। মেয়েদের স্নায়ুযন্ত্রটা পুরুষমানুষদের থেকে বড় সূক্ষ্ম। অল্পতেই মমতায় জড়িয়ে থাকে। সে কাতর হয়।

চার্লস বলল, বেচারা লীয়ঁ। প্যারিসে গিয়ে ও কেমন কাটাবে মনে হয়?

এম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হোমা বলল, ও কিছু ভাববেন না। সেখানে কত রকমের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। ভাল রেস্তোরাঁয় কত রকমের লোক, মুখোসপরা বলনাচ, ভাল মদ। কত সব ফূর্তির জিনিস।

চার্লস বলল, ও আবার কিছু ভুল করে বসবে না ত?

আমার অবশ্য তা মনে হয় না। তবে তাকে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে হলে কিছুটা খারাপ হতেই হবে। আপনি জানেন না লাতিন কোয়ার্টারে এই সব অবিবাহিত যুবকরা অভিনেত্রীদের নিয়ে কি ধরনের উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করে। আপনি হয়ত জানেন প্যারিসে ছাত্রদের খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। অভিজাত সমাজে তারা সহজেই স্থান পায়। অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাদের প্রেমে পড়ে এবং এই প্রেম অনেক সময় পরিণয়ে পরিণত হয়।

ডাক্তার বলল, কিন্তু আমিও ভাবছি ও হয়ত শহরের কোন প্রলোভনে ধরা দিতে পারে—

হোমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আপনি ঠিক ধরেছেন। ঐ ধরনের শহরে আপনার মনটাকে ঘড়ির পকেটে সব সময় সাবধানে ভরে রাখতে হবে। মনে করুন আপনি কোন পার্কে বেড়াতে গেলেন। কোন লোক ভদ্র বেশে ভাল

সাজ-পোষাক পরে আপনার কাছে বসে ভাল কথা বলে ভাব করল। আপনাকে নস্যি দিল, আপনার টুপীটা কুড়িয়ে দিল। আপনি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বসলেন। সে আপনাকে কোন কাফেতে নিয়ে গেল। আরো দু একজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিল। পরে দেখা গেল হয় তারা আপনার টাকা মেরে দিল অথবা আপনাকে কুপথে নিয়ে গেল।

চার্লস বলল, আমি ভাবছি অসুখ বিসুখের কথা। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চল থেকে যে সব ছাত্র সেখানে পড়তে যায় তারা প্রায়ই টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়।

এম্মা ভয়ে শিউরে উঠল।

হোমা বলল, ওটা খাওয়ার দোষে হয়। ওখানে হোটেল রেস্তোরাঁয় যে সব খাবার দেয় তাতে রক্তকে অতিশয় গরম করে তোলে। তার থেকে বাড়ির রান্না অনেক ভাল। আমি রুয়েনে পড়ার সময় বোর্ডিং হাউসে থাকতাম আমার শিক্ষকদের সঙ্গে।

এর পর হোমা তার যত সব ব্যক্তিগত মন্তব্য ও ভাললাগার কথা বলতে শুরু করল। সে হয়ত আরো অনেক কিছু বলত। কিন্তু জাস্টিন এসে তাকে দোকান বন্ধ করার আগে হিসাবপত্রের কাজ সারার জন্য ডাকতে এল।

হোমা বিরক্তির সঙ্গে উঠে পড়ল। বলল, কিছুক্ষণ একটু শান্তিতে থাকব তার উপায় নেই। সব সময় দোকানের কাজ। যেন লাঙ্গলের ঘোড়া। সব সময় দেহের রক্ত ঘাম হয়ে ঝরছে।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে হোমা বলল, একটা খবর শুনেছেন? এবার নাকি বাৎসরিক কৃষি উৎসব এ জেলার মধ্যে আমাদের এই গাঁয়েই হচ্ছে। আজকের খবরের কাগজে নাকি খবরটা দিয়েছে। যাই হোক এ নিয়ে পরে আলোচনা হবে।

৭

পরের দিনটা এক শোকসন্তপ্ত দিবস হিসাবে দেখা দিল এম্মার কাছে। যেদিকেই তাকায় সব কিছু কালো বলে মনে হয় তার। একটা কৃষ্ণকুটিল বিষাদ তার অন্তরের উপর ভারী হয়ে চেপে বসল। কোন পরিত্যক্ত প্রাসাদের মধ্যে বসে শীতের হিমেল বাতাসের মত সকরুণ এক অব্যক্ত বিষাদের ধ্বনি তার অন্তরাত্মার মধ্যে যেন ঢুকে পড়ল। সব কিছু হিম করে তুলল। কোন প্রিয়জনের সঙ্গে হঠাৎ চিরদিনের মত যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে অথবা প্রথাগত কোন দৈনন্দিন প্রিয় অভ্যাসের স্রোত সহসা প্রতিহত হয়ে গেলে অথবা দীর্ঘায়িত কোন সুরের অনুরণন স্তব্ধ হয়ে পড়লে যে বিষাদের কবলে পড়ে যায় মানুষ, এম্মা ভুগতে লাগল সেই বিষাদে।

ঠিক এই রকম তার আগে আর একবার হয়েছিল। লা ভবিসেয়ার্দের

সেই আনন্দোচ্ছল ভোজসভা আর নাচের আসর থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর ঠিক এই রকম এক বিষাদে ভুগেছিল এম্মা।

লীয়ঁ তার স্বামীর থেকে আরো লম্বা, আরো সুন্দর। তার স্বভাব মনোরম এবং সে স্বল্পভাষী। লীয়ঁ চলে গেলেও এম্মার মনে হচ্ছে সে এখনো আছে। তাদের ঘরের দেওয়ালে যেন তার ছায়াটা এখনো লেগে আছে। যে চেয়ারটায় সে বসত সেটাতে তার স্পর্শ এখনো লেগে আছে। সেই চেয়ারটার পানে তাকিয়ে রইল এম্মা। তাদের বাগানের ভিতর দিয়ে যে ঝর্ণাটা বয়ে চলেছে, যার ধারে একদিন তারা বেড়াত শ্যাওলাঢাকা পাথরের উপর দিয়ে সে ঝর্ণাটা আরও ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে আগের মত। ঐ বাগান থেকে তারা অপরাহ্নের আলোছায়া কত উপভোগ করেছে। সেই বাগানে একটা বেঞ্চের উপর বসে লীয়ঁ তাকে কতদিন বই পড়ে শোনাত আর দূর প্রান্তর থেকে ছুটে আসা শীতল বাতাসে বইএর পাতাগুলো উড়ত। আজ সে দূরে চলে গেছে। তার অন্ধকার জীবনের মধ্যে একটিমাত্র উজ্জ্বল দিক তাও ম্লান হয়ে গেল। তার একটিমাত্র সুখের সম্ভাবনা তাও চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু এম্মা ত আগেই সাবধান হতে পারত। তার সুখের সম্ভাবনা যখন হাতের মুঠোর মধ্যে প্রায় এসেও চলে যাবার ভয় দেখাচ্ছিল তখন ত সে দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে পারত। লীয়ঁর কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানাতে পারত। লীয়ঁকে সে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসার কাছে নিঃশেষে অকুণ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ না করার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল এম্মা। লীয়ঁর অবরোধ চুম্বন করার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল তার মন, ছুটে গিয়ে তার বাহুবেষ্টনীর মধ্যে ধরা দেবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে তার কামনা। বলতে ইচ্ছা করে, 'আমাকে নাও আমি তোমার। শুধু তোমার।' কিন্তু এখন আর এটা সম্ভব নয়। এখন আর লীয়ঁকে পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব নয় বলেই না পাওয়ার ক্রমবর্ধমান বেদনা তার কামনাকে বাড়িয়ে তোলে, ভয়ঙ্কর করে তোলে।

এর পর থেকে লীয়ঁর ছবিটাই হয়ে উঠল তার জীবনের সকল দুঃখের মূল। রাশিয়ার তুষারাবৃত স্টেপ বনভূমিতে পথিকের দ্বারা জ্বালানো আগুন যেমন হাওয়ায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তেমনি লীয়ঁর ছবিটা ম্লান হওয়ার পরিবর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আজও। মাঝে মাঝে ছবিটার কাছে ছুটে যায় এম্মা। ছবিটা যেন জীবন্ত মানুষ। বর্তমান ঘটনার বাস্তব অভিজ্ঞতা, অতীত সুখের স্মৃতি, ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা যা দমকা হাওয়ায় ঝরে যাওয়া শুকনো বৃক্ষশাখার মত মনের বৃন্ত হতে ঝড়ে যায়, তার ব্যর্থ গুণানুশীলন, তার সকরুণ আশাভঙ্গ, তার সাংসারিক জীবনের ব্যর্থতা সব মিলিয়ে তার দুঃখের আগুনে আহুতির মত কাজ করে।

তবু সে আগুন দিনে দিনে নিবে যেতে থাকে। জ্বালানির অভাবে অথবা উপাদানের আতিশয্যে সে আগুন নিবিয়ে যায়। প্রেমাস্পদের অনুপস্থিতিতে

প্রেমের পিপাসা ধীরে ধীরে উবে যায়, দৈনন্দিন কর্মচক্রের তাড়নায় সকল অনুশোচনা স্তব্ধ হয়ে যায়, বেদনার যে জ্বলন্ত আগুনের লাল আভাটা তার শূন্য ম্লান অন্তরের আকাশটাকে রাঙিয়ে তুলেছিল সে-আভা ধূসর হয়ে ওঠে এবং ক্রমে সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। এইভাবে যখন অপরিসীম নৈরাশ্যে নিবিড় হয়ে অকালে সায়াহ্ন নেমে আসে তার জীবনে তখন এম্মা তার স্বামীর প্রতি তার ঔদাসান্য ও ঘৃণাটাকে তার প্রথাগত এক উচ্চাভিলাষের নামান্তর বলে মনে ভাবে। ভাবে তার নিবিয়ে যাওয়া মনে প্রেমের আগুনটা আবার জ্বলে উঠবে। কিন্তু প্রতিকূলতার ঝড় বয়ে যেতে থাকে সমানে। তার সকল প্রেমানুভূতি আপন কামনার আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবু কোন দিগন্ত থেকে কোন সাহায্যের সূর্য নেমে আসে না, ফলে অন্ধকার রাত্রি ঘন হয়ে ওঠে তার চারদিকে আর এক ভয়ঙ্কর শীতার্ত শূন্যতার মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে থাকে।

ফলে আবার সেই তোস্তের দিন ফিরে আসে। সেই ভয়ঙ্কর হতাশা আর দুঃখের দিন। তবে সে দুঃখ সে বিষাদ আজ আরো ভয়ঙ্কর মনে হয় কারণ তার মনে হয় এর কোন শেষ নেই, সীমা নেই।

একদিকে যেমন ত্যাগের পরিচয় দিচ্ছিল এম্মা অন্য দিকে তেমনি কিছু সখের জিনিস কেনাকাটা করতে গিয়ে কিছু অমিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়ে ফেলল। প্রথমে সে একটা গথিক মূর্তি কিনল। তারপর চোদ্দ ফ্রাঁ খরচ করে একটা সৌখীন নখপালিশ কিনল। এরপর লেছড়ের দোকানে গিয়ে সবচেয়ে ভাল একটা সিল্কের ওড়না কিনল। এইভাবে নখ পালিশ করে তার ড্রেসিং গাউনের উপর কোমরে সিল্কের ওড়নাটা জড়িয়ে ঘরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে একটা বই নিয়ে বিছানায় বসে পড়ল এম্মা।

চুলবাঁধার রীতিটা পাল্টে দিল এম্মা। মাথার একদিকে সিঁথি করে পুরুষদের মত চুলটা ছড়িয়ে দিল। হঠাৎ কি খেয়াল হলো ইতালীয় ভাষা শেখা শুরু করে দিল। এর জন্য কিছু বইপত্র ও অভিধান কিনল। একদিন চার্লসএর কাছে আধ গ্লাস ব্রাণ্ডি চাইল এবং চার্লসও বোকার মত তা দিয়ে দিল।

কিন্তু এইভাবে আপন খেয়ালখুশিমত চলে ও পোষাক আশাক কিনলেও এম্মার চেহারার মধ্যে লালিত্য দেখা দিল না। তার মুখের কোণটায় বুড়ী মানুষের মত দু একটা রেখা ফুটে উঠেছিল। তার দেহের ত্বকটা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। কথা বলতে বলতে তার দৃষ্টিটা কেমন শূন্য উদাস হয়ে যায়। একদিন তার মাথায় তিনটে পাকা চুল দেখতে পেয়ে প্রায় বলতে লাগল সবার কাছে সে বুড়ো হয়ে গেছে।

আবার তার মধ্যে একটা ঝিমুনি ভাব দেখা দিল। একদিন থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠল। চার্লস ঝুঁকে পড়ে তা দেখতে থাকায় এম্মা বলল, এতে কি হয়েছে?

এদিকে চার্লসএর মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে তার রোগী দেখার ঘরে

গিয়ে দরজা বন্ধ করে টেবিলের উপর কনুই রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সে তার মাকে কথাটা জানিয়ে চিঠি দিল। মা এলে এম্মার শরীরের অবস্থা নিয়ে আলোচনা হল। সবারি মুখে এক কথা, কি করা যায়? কোন চিকিৎসাতেই রাজী নয় এম্মা।

চার্লসকে তার মা বললেন, তোমার স্ত্রীর সব রোগ কিসে সারবে জান? তাকে সব সময় হাতেকাজে রাখতে হবে। কঠোর শ্রমের কাজ। আর পাঁচ জনের মত যদি খেটে খেতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যত সব অলস চিন্তা থেকে এই সব হচ্ছে।

চার্লস বলল, সে ত সব সময় ব্যস্ত থাকে। কিছু না কিছু একটা করে।

তার মা বললেন, কিন্তু কাজটা কি করে? কাজ মানে ত উপন্যাস আর বাজে বই পড়া। এ সব বইয়ে যত সব নাস্তিকতার লেখা আছে। এ সব বইয়ে যাদের কথা লেখা আছে তারা কথায় কথায় যাজকদের উপহাস করে আর ভলতেয়ার উদ্ধৃত করে। এ বড় বিপজ্জনক বাছা। যাদের ধর্মের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই তাদের পরিণাম বড় দুঃখজনক।

সুতরাং ঠিক হলো এম্মাকে নিষেধ করে দেওয়া হবে সে যেন আর উপন্যাস বা বাজে বই না পড়ে। কিন্তু কাজটা কঠিন এবং কিভাবে তা করা হবে? চার্লসএর মা বললেন, তিনি রুয়েনে গিয়ে শহরের গ্রন্থাগারিককে বলে দেবেন, মাদাম বোভারী তার গ্রাহককার্ড খারিজ করে দিয়েছেন। এর পরেও যদি তিনি জোর করেন তাহলে উনি পুলিশে খবর দেবেন।

চার্লসএর মা এবার তিন সপ্তাহ মত ছেলের বাসায় ছিলেন। কিন্তু এতদিনেও প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া একটা কথাও হয়নি শাশুড়ী-পুত্রবধূর মধ্যে। এ ছাড়া খাবার সময় ও শোবার সময় সৌজন্যমূলক সামান্য কথা হত। তিন সপ্তাহ পর চার্লসএর মা বুধবার বিদায় নিলেন। সেদিন ছিল ইয়নভিলের হাটবার।

হাটবার বাজারে দারুণ গাড়িঘোড়া ও লোকজনের ভিড়। এদিন হোমার ওষুধের দোকানটাতে দারুণ ভিড় হয়। কিন্তু এ ভিড় ওষুধ কেনার ভিড় নয়। হোমাকে রোগ দেখানোর ভিড়। বেশীর ভাগ লোক হোমার সঙ্গে তাদের রোগের বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। এ অঞ্চলে হোমার খুব নাম। সবাই বলে ডাক্তারদের থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় তার জ্ঞান বেশী।

খোলা জানালাটার ধারে দাঁড়িয়ে এম্মা বাইরে তাকিয়েছিল। বাজারের চারদিকে মানুষের ভিড় দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ সবুজ মখমলের ফ্রককোট পরা এক ভদ্রলোককে দেখতে পেল এম্মা। তার হাতে ছিল হলুদ দস্তানা। তার পিছনে একজন চাষী লোক ছিল। ভদ্রলোক ডাক্তার বোভারীর বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছিল। চাষীটির মুখখানা নত এবং বিষাদে ভরা ছিল।

বোভারীদের বাড়ির সদর দরজায় তখন জাস্টিন ফেলিসিতের সঙ্গে কথা বলছিল। ভদ্রলোক এসে জাস্টিনকে বলল, ডাক্তারকে গিয়ে আমার নাম বল,

বল, মঁসিয়ে রুডলফ, বুলেঞ্জার অ লা হুশেত্তে।

ভদ্রলোক সম্প্রতি ইয়নভিলের কাছে ছুটো খামারসমেত এক বিরাট ভূসম্পত্তি কিনেছে। তার এক চাষীকে রোগ দেখাতে এনেছে চার্লসএর কাছে। ভদ্রলোক অবিবাহিত এবং তার আয় বার্ষিক পনের হাজার ফ্রাঁ।

খবর পেয়ে চার্লস বৈঠকখানা ঘরে এসে বসল। রুডলফ, ডাক্তারের কাছে তার লোকটির পরিচয় দান করল।

চার্লস তার ঝিকে একটা গামলা আর ব্যাণ্ডেজের সরঞ্জাম আনতে বলল। লোকটি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সে ভয় পায় না।

চার্লস জাস্টিনকে বলল, ভাল করে গামলাটা ধর।

চাষীর হাতটায় ছুরি বসাতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বার হতে লাগল। সে বলল, দেখুন আমার রক্ত কত খাঁটি আর লাল।

রুডলফ, বলল, এরা প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না, পরে টের পায়।

এই কথায় চাষীটা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা চেয়ারের উপর পড়ে গেল। এদিকে গামলার মধ্যে অনেক রক্ত দেখে তা ধরে থাকতে থাকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল জাস্টিন। চার্লস তখন বলল, আমার স্ত্রী কোথায়? চিৎকার করে ব্যস্ত হয়ে তার স্ত্রীকে ডাকতেই এম্মা ছুটে এল। চার্লস তাকে ভিনিগার আনতে বলল।

রুমালে ভিনিগার দিয়ে ওর কপালের কাছে হাওয়া করতে লাগল এম্মা। জাস্টিসের ঘাড়ের কাছটা একটু হাত দিয়ে আলগাভাবে মালিশ করে দিল। চাষীটির তাড়াতাড়ি জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু জাস্টিনের তখনও পর্যন্ত চেতনা ফিরে এল না।

ঝি হোমাকে ডাকতে গিয়েছিল। হোমা এসে দেখল তখন জাস্টিন সবেমাত্র চোখ মেলে তাকিয়েছে। তখন হোমা তার সামনে পায়চারি করতে করতে তার দিকে তাকিয়ে ভৎর্সনার স্বরে বলতে লাগল, তুমি একটি আস্ত অপদার্থ, একটুখানি রক্ত দেখেই এই অবস্থা। এদিকে ত গাছের শির ডগায় উঠে বাদাম পাড়তে পার। একদিন তুমি না ওষুধের দোকানদার হবে। ভবিষ্যতে তোমাকে হয়ত একদিন আদালতে কোন বড় মামলায় সাক্ষ্য দান করতে হতে পারে।

তখন বিপদের সময় মাথাটা কত ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তা না হলে লোকে বোকা বলবে।

জাস্টিন চুপ করে সব শুনল। কোন কথা বলল না। হোমা আবার বলতে লাগল, কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে? তুমি জান তোমাকে আমার সব সময় দরকার হয়। বিশেষ করে আজ বুধবার, হাটের দিন। বিশটা লোক দোকানে দাঁড়িয়ে আছে। যাও, আমি না আসা পর্যন্ত দোকান থেকে একপাও নড়বে না।

জাস্টিন চলে গেলে মূর্ছা সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। মাদাম বোভারী বলল, সে কখনো মূর্ছিত হয়ে পড়েনি। মঁসিয়ে রুডলফ্ বুলেঞ্জার বলল, এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে সত্যিই এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। কত পুরুষ মানুষ একটুতেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আমি জানি এক ডুয়েল লড়ার সময় একপক্ষের সেকেণ্ড বা সহকারী পিস্তলের গুলিভরার আওয়াজেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

হোমা বলল, পরের রক্ত যতই দেখি কিছু হবে না আমার। কিন্তু নিজের রক্ত দেখলে মাথার কিছু ঠিক থাকে না।

মঁসিয়ে রুডলফ্ বুলেঞ্জার এম্মার পানে তাকিয়ে বলল, লোকটা যা চেয়েছিল তা হয়ে গেল। এর জন্য আমার এখানে আসা হলো এবং আপনার সঙ্গে আলাপ হলো।

এই বলে টেবিলের উপর তিনটে ফ্রাঁ রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রুডলফ্। গাঁয়ের শেষে পপলার গাছের ছায়াঘেরা প্রান্তরের উপর দিয়ে রুডলফ্ যখন ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এম্মা তখন তার দোতলার ঘরের জানালা থেকে তার সেই পথপানে তাকিয়ে ছিল। যেতে যেতে কি যেন ভাবছিল রুডলফ্।

রুডলফ্ ভাবছিল এম্মারই কথা। ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী। চমৎকার ঝকঝকে দাঁত, কালো চুল, সুন্দর পা। যেন খাস প্যারিস শহরের মেয়ে। ভূতের মত লোকটা এত সুন্দরী বউ কোথা হতে পেল?

রুডলফের বয়স চৌত্রিশ। সে কূট এবং বর্বর প্রকৃতির। বহু মেয়ে তার জীবনে এসেছে। সে যেখানেই যায় এইভাবে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখে, মেয়েদের রূপ বিচার করে। আজ মাদাম বোভারীকে সত্যিকারের সুন্দরী রমণী বলে মনে হলো তার। তাই মাদাম ও মঁসিয়ে বোভারীর কথা ভাবতে লাগল সে।

আমার মনে হচ্ছে লোকটা বাজে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভদ্র-মহিলা মোটেই সন্তুষ্ট নয় তার স্বামীকে পেয়ে। লোকটার নখগুলো ময়লা, তিন দিন দাড়ি কামায়নি। সে প্রায়ই যখন তখন তার স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে রোগী দেখতে যায়। আমি বেশ বুঝছি মহিলা বিরক্ত হয়ে পড়েছে। শহরে যাবার জন্য তার মন ছটফট করছে। বেচারা কখনো নাচতে যায় না। দু-একবার তার কাছে গেলেই সে আমাকে লুফে নেবে। তখন আমিই তার কবল থেকে মুক্ত করতে পারব না নিজেকে। সে তার বর্তমান প্রেমিকার কথা ভাবল।

মেয়েটি একজন অভিনেত্রী। তাকে রুয়েন শহরে রেখেছে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হলো মাদাম বোভারী সেই অভিনেত্রীর চেয়ে আরো সুন্দরী। অভিনেত্রী মেয়েটা ক্রমশই মোটা হয়ে যাচ্ছে। তাকে আর ভাল লাগছে না।

জনহীন শূন্য মাঠটা খাঁ খাঁ করছে। পথের ধারে ঝোপে ঝাড়ে ঝিঁ ঝিঁ

ডাকছে। এম্মার কথাটা আবার মনে পড়ল রুডলফের। সে তার ছড়িটা একটা মাটির ঢিপির উপর ঠুকে বলল, তাকে আমার পেতেই হবে। এবার সে উপায় খুঁজতে লাগল।

কিন্তু কোথায় কিভাবে দেখা হবে? সব সময় তার কাছে কাছে তার বাচ্চাটা থাকবে। তার উপর থাকবে তার স্বামী, ঝি, তার পাড়াপড়শী তবু তা হোক। ঐ রকম ফ্যাকাশে গায়ের রং-ওয়ালা মেয়েমানুষই তার ভাল লাগে।

পাহাড়ে উঠেই তার মন স্থির করে ফেলল। এখন সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। সে মনে মনে বলল, আমি মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি যাব। ওদের আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করব। আমি বিভিন্ন সময়ে খেলার সরঞ্জাম, মুরগীর ছানা প্রভৃতি উপহার নিয়ে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ—হাতের কাছেই ত একটা সুযোগ এসে গেছে। ইয়নভিলে কৃষি প্রদর্শনীর দিন ও নিশ্চয়ই ওখানে যাবে। সরাসরি প্রেম নিবেদন করাই হলো সবচেয়ে ভাল পন্থা।

৮

অবশেষে প্রদর্শনীর দিন এসে গেল। সারা গাঁয়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। গাঁয়ের প্রতিটি বাড়ি উৎসবের আগের দিন ধোয়া মোছা হয়ে গেছে। তিন রঙা পতাকা উড়ছে ঘরে ঘরে। আকাশ পরিষ্কার থাকায় রোদটাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। চাষীদের মেয়েরা আশেপাশের গাঁ থেকে ঘোড়ায় চেপে আসছিল। তাদের মাথায় নানারকমের পোষাক, তাদের গলায় সোনার ক্রশগুলি চকচক করছিল।

গাঁয়ের দুটি প্রান্ত থেকেই লোক এসে বড় রাস্তায় জড়ো হচ্ছিল। গাঁয়ের টাউন হলটাকে চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল। তার সামনে চারটি বাঁশের উপর চারটি কাপড়ে চারটি কথা লেখা ছিল। একটিতে ছিল বাণিজ্য, একটিতে কৃষি, একটিতে শিল্প আর একটিতে ছিল বিশুদ্ধ কলা। বাড়ির মেয়েরা দরজায় দাঁড়িয়ে উৎসব দেখার চেষ্টা করছিল।

কৃষি প্রদর্শনীর উৎসব উপলক্ষে গাঁয়ের সব লোক যখন মেতে উঠেছে তখন একমাত্র মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে তার হোটেলের সামনে। তার রাগের কারণ হলো, যে সব উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার আসবে তাদের জন্য হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা না করে তাঁবু খাটিয়ে রাঁধুনি আনিয়ে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হোমা আজ অসময়ে দোকান থেকে একটা লম্বা ঝুলওয়ালা কোর্ট, পায়জামা আর নতুন টুপী ও জুতো পরে বেরিয়ে এসেছে। মাদাম লে ফ্রাঁসোয়াকে দেখে সে বলল, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন বোধ হয়। ভাবছেন ভাঁড়ার ঘর থেকে হঠাৎ আসা ইঁদুরের মত লোকটা এল কি করে দোকান ছেড়ে।

লে ফ্রাঁসোয়া বলল, আপনি নিশ্চয় ওখানে যাচ্ছেন না ?

হোমা বলল, হ্যাঁ, ওখানেই ত যাচ্ছি। আমি যে উপদেষ্টা কমিটিতে সদস্য আছি।

লে ফ্রাঁসোয়া বলল, আপনি চাষবাসের কিছু বোঝেন যে কৃষি প্রদর্শনীর কমিটিতে সদস্য হয়েছেন ?

হোমা বলল, আপনি কি মনে করেন, কৃষিবিদ হতে হলে নিজের হাতে জমি চাষ করতে হবে অথবা মুরগী পালতে হবে ? না, তার কোন প্রয়োজন নেই। আমি রসায়নবিদ, এবং চাষের কাজটা এই রসায়ন বিদ্যারই অন্তর্গত। রসায়নবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই। বিভিন্ন বস্তুর ধর্ম, তাদের আনবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, রাসায়নিক সংমিশ্রণ, বায়বীয় পদার্থের বিশ্লেষণ, ভূমির প্রকৃতি ও মাটির গুণাগুণ বিচার প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কৃষিবিদ ও রসায়নবিদ উভয়কেই জানতে হয়। আবার আমাদের উদ্ভিদবিদ্যাও জানতে হয়। জানতে হয় বিভিন্ন গাছপালার প্রকৃতিগত তারতম্যের কথা।

লে ফ্রাঁসোয়ার এত সব কথা শোনার সময় নেই। সে কাফের দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। তবু হোমা আপন মনে বলে চলল, ঈশ্বর করুন, চাষীরা যেন বিজ্ঞানীর মত রসায়নবিদ্যার দিকে মন দেয়। আমি এ বিষয়ে সত্তর পাতার এক প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধটা রুয়েনে পাঠিয়ে দিতেই সরকারী কৃষিবিভাগ আমাকে ওদের সদস্য করে নেয়।

মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া বলল, সম্প্রতি যে হোটেলটা খুলেছে তার হাল দেখেছ। আজ ওখানে গানের রেকর্ড বাজছে। কিন্তু বেশীদিন এ জৌলুস থাকবে না। অল্পদিনেই সব শেষ হয়ে যাবে।

লে ফ্রাঁসোয়া হঠাৎ হোমার কানের কাছে মুখটা এনে তার কানে কানে কি একটা গোপন কথা বলল। হোমা বলল, কি সর্বনাশ! কোন ঘটনা ঘটলেই সব ক্ষেত্রেই হোমা এই একটা কথা বলে তার বিস্ময় প্রকাশ করে।

হঠাৎ কি একটা জিনিস চোখে পড়ায় চমকে উঠল লে ফ্রাঁসোয়া। বলল, ঐ দেখুন মাদাম বোভারী মাথায় সবুজ টুপী পরে বাজারে বেরিয়েছে। উনি এখন মঁসিয়ে বুলেঞ্জারের বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছেন।

হোমা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, মাদাম বোভারী! তাহলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। সামনের দিকের একটা আসনে তাঁর একটা ভাল জায়গায় বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই চলে গেল হোমা। দূর থেকে মাদাম বোভারীকে দেখেই হোমা মৃদু হেসে নানাভাবে অভিবাদন করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। মাদাম বোভারী রুডলফের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে হোমাকে দেখতে পেয়ে রুডলফ্ তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। রুডলফ্ একসময় মাদাম বোভারীর দিকে

তাকিয়ে বলল, আপনি ঐ লোকটাকে চেনেন ?

মাদাম বোভারী তার কনুই দিয়ে রুডলফের বগলের কাছে চাপ দিয়ে তাকে সাবধান করে দিল। তাদের কাছাকাছি লেহুড়েও পথ হাঁটছিল। নানা কথা বলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল লেহুড়ে। লেহুড়ে কাছে এসে তাদের সামনে দাঁড়াতেই রুডলফ্ বলল, মাপ করবেন মঁসিয়ে লেহুড়ে। পরে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।

এই বলে মাদাম বোভারীকে সঙ্গে করে রুডলফ্ সামনে দিয়ে না গিয়ে একটা পাশ পথ ধরে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে গিয়ে পৌছল। সেখানে ছিল ডেইজি ফুলের গাছ।

মাদাম বোভারী রুডলফ্কে বলল, স্পষ্ট বোঝা গেল আপনি ওকে এড়িয়ে গেলেন।

রুডলফ্ বলল, আজ সৌভাগ্যের ফলে আপনাকে পেয়েছি, ওকে এড়িয়ে যাব না ?

একটু থেমে ফোটা ডেইজী ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, গ্রাম্য বালিকারা প্রেমে পড়লেই এই ফুল নিয়ে আসে। আমি একটা ফুল তুলে আপনাকে দেব ?

এম্মা বলল, আপনি প্রেমে পড়েছেন ?

রুডলফ্ বলল, কি জানি ?

ফাঁকা প্রান্তরটা ক্রমশ ভরে উঠছিল লোকের ভিড়ে। বেশীর ভাগ আসছিল মেয়েরা। ছাতা মাথায় চাষী মেয়েরা ঝুড়ি ও শিশু কোলে আসছিল ক্রমাগত।

প্রান্তরটার একদিকে সার দিয়ে ঘোড়া বলদ প্রভৃতি অনেক পশু দাঁড় করানো ছিল। একজন ভদ্রলোক সেই সব পশু দেখতে দেখতে এগিয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে একজন একটা খাতায় কি সব লিখছিল, তাঁর নাম মঁসিয়ে প্যানভিল, তিনি নাকি কমিটির সভাপতি। প্যানভিল রুডলফ্কে দেখতে পেয়েই হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, কি মঁসিয়ে বুলেঞ্জার, আপনি যে আমাদের ভুলেই গেছেন।

রুডলফ্ বলল, আমি শীঘ্রই আপনাদের ওখানে যাচ্ছি।

প্যানভিলরা অন্যত্র চলে গেলে রুডলফ্ এম্মার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আসলে আমি কিন্তু যাব না ওদের কাছে। আমি ওদের থেকে আপনার সাহচর্য অনেক বেশী পছন্দ করি।

সমগ্রভাবে প্রদর্শনীর নিন্দা করলেও সে তার নীল পাশটা গেটে দেখিয়ে ঢুকে পড়ল এবং মাঝে মাঝে প্রদর্শনীর মাঝখানে কোন ভাল জিনিস দেখলেই তার সামনে দাঁড়াচ্ছিল। মাদাম বোভারীর কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল ছিল না। সে শুধু ইয়নভিলের মেয়েদের পোষাকের সমালোচনা করছিল। তার

সেই সমালোচনা শুনে রুডলফের খেয়াল হলো, সে নিজেও এক অদ্ভুত পোষাক পরেছে। আটপৌরে ও সৌখীনের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ছিল তার পোষাকে। তার রুচির মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সঙ্গে প্রচলিত প্রথাগত সামাজিক রীতির প্রতি এক অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠেছিল। তার পরনে ছিল ঢিলা শার্ট আর ঢিলা পায়জামা। প্রতিটি দমকা বাতাসে তা দুলছিল। পায়ের জুতো ছিল এমনই চকচকে যে তাতে পথের ধারের লম্বা ঘাসগুলো পর্যন্ত প্রতিফলিত হচ্ছিল।

রুডলফ্ বলল, গাঁয়ে যারা থাকে—

এম্মা বলল, ভাল পোষাক পরার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় সেখানে।

রুডলফ্ বলল, একেবারে। তুমি যতই ভাল পোষাক পরো, একটা লোকও তা বোঝার নেই।

এইভাবে তারা কিছুক্ষণ গ্রাম্যজীবনের অসুবিধা নিয়ে দুজনে কিছু কথা বলল। স্বপ্নপূরণের পথে এই গ্রাম্যজীবন কত মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করে চলে তার ইয়ত্তা নেই।

রুডলফ্ বলল, তাই ত যত দিন যায় আমি বিষাদে ডুবে যাই।

মাদাম বোভারী আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি? আমি ত আপনাকে দেখে ভাবতাম, আপনি খুব সুখী মানুষ।

রুডলফ্ বলল, আমি যখন আর পাঁচজন মানুষের কাছে থাকি তখন আমি হাসিখুশির একটা মুখোশ পরে থাকি। কিন্তু অনেক দিন নির্জন চন্দ্রালোকে একা একা বসে থাকার সময় কত দিন মনে হয়েছে আমি যদি ঐখানে শুয়ে থাকতে পারতাম···

মাদাম বোভারী বলল, কিন্তু আপনার বন্ধুদের কথা মনে হয় না তখন?

আমার বন্ধু? কোন বন্ধু আমার আছে নাকি? আমার কথা কে ভাবে?

শেষের কথাগুলো বলার সময় তার কণ্ঠে একটা হতাশার স্বর ছিল। ওরা হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ একগাদা চেয়ার ঘাড়ে করে চার্চের লোক লেস্তিবুদয় ওদের মাঝখানে এসে পড়ায় হাত ছেড়ে তাকে পথ করে দিতে হলো। লেস্তিবুদয় খবর খোঁজে। সে চার্চের চেয়ারগুলো এই উৎসবের জন্য এখানে নিয়ে এসেছে।

সে চলে যেতে আবার মাদাম বোভারী রুডলফের হাতটা ধরল। রুডলফ্ আপন মনে বলে যেতে লাগল, কত ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেল, অথচ আমি নিঃসঙ্গ রয়ে গেলাম। যদি আমি আমার সত্যিকারের ভালবাসার মানুষ, মনের মানুষের একবার দেখা পেতাম তাহলে আমি কোন বাধাই মানতাম না। চেষ্টার কোন ত্রুটি করতাম না।

এম্মা বলল, আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনাকে করুণা করার কোন অর্থই হয় না।

রুডলফ্ অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনি তাই ভাবেন আমার সম্বন্ধে ?

এম্মা বলল, হ্যাঁ আমি তাই ভাবি, কারণ আপনি স্বাধীন, তাছাড়া আপনি ধনী।

রুডলফ্ বলল, আপনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন।

এম্মা শপথ করে বলল, সে মোটেই ঠাট্টা করছে না। এমন সময় একটা পিস্তলের আওয়াজ হতে জনতা সচকিত হয়ে উঠল। হয়ত প্রিফেক্ট এসে গেছে।

অবশেষে দূরে একটা গাড়ি দেখা গেল। দুটো রোগা রোগা ঘোড়ায় টানা গাড়িটা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল হাঁক দিল আর পাহারাদারেরা রাইফেল নিয়ে কুচকাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। কর আদায়কারী নিজেই এসে তদারক করতে লাগল। প্রিফেক্টের গাড়িটা এসে দাঁড়াল টাউন হলের গাড়ি বারান্দার নিচে। গাড়ি থেকে রূপোর জরির কাজ করা ছোট সাইজের এক কোট পরে চওড়া কপাল আর বড় বড় চোখওয়ালা এক ভদ্রলোক নামতেই মেয়র এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। ভদ্রলোক জনতার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, তিনি প্রিফেক্ট নন, প্রিফেক্ট আসতে পারেননি। তিনি হচ্ছেন প্রিফেক্টের পরিষদের সদস্য; তাঁকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। মেয়র তুভাশে রাজকর্মচারিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, ইয়ানভিল গাঁয়ে এই কৃষিপ্রদর্শনীর আয়োজন করে এই গাঁকে যে সম্মান দান করা হয়েছে তার জন্য প্রতিটি গ্রামবাসী কৃতজ্ঞ সরকারের কাছে। রাজকর্মচারি উত্তরে বললেন, তিনি এই সম্মানের যোগ্য নন।

হিপ্পোলিতে এসে গাড়ির ঘোড়াদুটোকে খাওয়াবার জন্য নিয়ে গেল। গাড়িটার চারদিকে চাষীরা ভিড় করে দাঁড়াল। মাননীয় অতিথিরা সামনে পাতা আর্মচেয়ারে বসলেন। নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলারা গাড়ি বারান্দার নিচে চেয়ারে বসল। বাকি সব দর্শকরা কেউ দাঁড়িয়ে রইল কেউ বসে রইল।

লেহুড়ে যেখানে বসেছিল তার পাশ দিয়ে হোমা বসতে যাচ্ছিল। লেহুড়ে তখন তাকে ডেকে বলল, দুটো ভেনিশীয় পর্দা এনে টাঙিয়ে দিলে ভাল হত। হোমা বলল, তা ত হত। কিন্তু মেয়রের রুচি বলে কোন জিনিস আছে? তার কোন শিল্পবোধ নেই।

এদিকে রুডলফ্ তখন মাদাম বোভারীকে নিয়ে টাউন হলের তিনতলায় পরিষদভবনে চলে গেছে। সে ঘরটা তখন একেবারে ফাঁকা। রুডলফ্ জানালার ধারে দুটো টুল এনে বলল, এখান থেকে আমরা সব কিছু সুন্দরভাবে দেখতে পাব।

এবার প্রিফেক্টের লোক বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তিনি বললেন, আজকের সভার উদ্দেশ্যের কথা আপনারা সকলে জানেন। প্রথমেই আমি আমাদের দেশের জাতীয় সরকার ও আমাদের প্রিয় রাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব যে

রাজা ও তাঁর সরকার সুযোগ্য হাতে যথোচিত বিজ্ঞতার সঙ্গে এদেশের জনগণের ধনসম্পদ রক্ষা করে চলেছেন এবং নানা বিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্য দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন যার ফলে দেশের জনগণের মনে শান্তি এবং শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও কলাবিদ্যার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জেগে উঠেছে।

এই সময় রুডলফ্ এম্মাকে বলল, আমি একটু পিছনের দিকে বসছি।

প্রিফেক্টের লোক আবার বলতে লাগলেন, সেই সব বিভীষিকার দিন চলে গেছে যখন জমিদার, ব্যবসাদার, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষ সারারাত্রি কোন না কোন এক ভয়ঙ্কর ঘটনার আশঙ্কায় যাপন করত।

এদিকে এম্মা রুডলফ্‌কে বলল, কেন পিছনে বসতে চাইছেন?

রুডলফ্ বলল, তা না হলে নিচের থেকে ওরা আমাকে দেখে ফেলবে আর ছ সপ্তাহ ধরে আমাকে ক্ষমা চেয়ে বেড়াতে হবে। এ বিষয়ে আমার একেই ত দুর্ণাম আছে।

এম্মা বলল, আপনি নিজেই নিজের নিন্দা করছেন শুধু শুধু।

না, না, সত্যিই আমার দুর্ণাম আছে। বিশ্বাস করুন।

ওদিকে প্রিফেক্টের লোক তখন বলছিল, কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে কি দেখছি? শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হচ্ছে। দেশের চারদিকে রাস্তাঘাট প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। পণ্যবাহী জাহাজে পূর্ণ আমাদের বন্দর। অবশেষে আশা ও আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষের মনে। ফ্রান্স নবজীবন লাভ করেছে।

রুডলফ্ বলল, সমাজের দিক থেকে একথা ঠিক।

এম্মা বলল, একথার মানে?

রুডলফ্ বলল, কত রকমের লোক আছে পৃথিবীতে। একদল মানুষ আছে যাদের চিত্ত সব সময় বিক্ষুব্ধ। তারা কখনো স্বপ্ন দেখে, কখনো কাজ করে, কখনো তারা বিশুদ্ধ প্রেমাবেগে হয় অভিভূত, আবার কখনো হয়ে ওঠে পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত। এইভাবে মাঝে মাঝে যত সব নির্বুদ্ধিতা আর উদ্ভট কল্পনার শিকার হই।

এম্মা বলল, আমরা নারীরা কিন্তু এ সুযোগ পাই না।

রুডলফ্ বলল, কিন্তু এ সুযোগ বৃথা, কারণ এ সুযোগ কোন সুখ এনে দেয় নি জীবনে।

এম্মা বলল, কিন্তু সুখ কি জীবনে পাওয়া যায়?

রুডলফ্ বলল, এ সুখ একদিন সবার জীবনে আসে।

প্রিফেক্টের লোক বলে যাচ্ছিল, আপনারা যাঁরা শ্রমিক, কৃষক, যারা নীতি ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তাঁদের হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ঝড়ঝঞ্ঝা যতই প্রচণ্ড হোক না কেন, তা কেটে গেছে এবং তাকে ভয় করার আর কোন কারণ নেই।

রুডলফ্ বলল, যখন আমরা সুখের সব আশা ছেড়ে দিই, তখন হঠাৎ সে সুখ এসে পড়ে জীবনে। তখন এক নতুন দিগন্ত খুলে যায় আমাদের সামনে। তখন মনে হয় আমাদের সেই মনের মানুষের কাছে অন্তরের সব কথা খুলে বলি, এই ধরনের মানুষকে কাছে পেলে কথা বলার কোন প্রয়োজন হয় না। একে অন্যের মুখপানে তাকালে তার মনের কথা বুঝতে পারে। মনে হয় সারা জীবন ধরে যা খুঁজে চলেছি, তা পেয়ে গেছি। বহু আকাঙ্খিত সেই রত্ন তাদের চোখের তারায় জ্বলতে থাকে আর আমাদের তখন মনে হয় আমরা যেন সবেমাত্র অন্ধকার হতে আলোয় বেরিয়ে এসেছি।

এই সময় রুডলফ্এর হাতটা তার মুখ থেকে এম্মার হাতের উপর ঢলে পড়তে এম্মা তার হাত সরিয়ে নিল।

প্রিফেক্টের লোক বলতে লাগল, এমন কে আছে যে দেশের এই উন্নতির কথা শুনলে খুশি না হবে। আর যারা গাঁয়ে থাকে তাঁরা যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। বুদ্ধিমত্তা বলতে আমি অলস অকর্মণ্য মনের অকারণ অনুকরণ বলতে চাই না। আমি বলছি সেই বুদ্ধিমত্তার কথা যা দিয়ে মানুষ শ্রম ও সাধনার সঙ্গে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করে যায়। যে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে মানুষ আইন শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধা ও উন্নততর কর্তব্যবোধের পরিচয় দেয়।

রুডলফ্ বিরক্ত হয়ে বলল, শুধু কর্তব্য আর কর্তব্য। কথাটা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। যত সব বুড়ো-হাবড়া চার্চের ইঁদুরের দল শুধু কর্তব্য কর্তব্য বলে চিৎকার করে। আমার মতে আমাদের একমাত্র কর্তব্য হলো সুন্দরকে ভালবাসা।

মাদাম বোভারী আপত্তির সুরে বলল, তবু...

রুডলফ্ বলল, কেন তবে ওরা মানুষের সকল প্রেমাবেগকে অস্বীকার করে? অথচ এই প্রেমাবেগই জগতে ও জীবনে সবচেয়ে সুন্দর বস্তু। বীরত্ব, দায়িত্ব-বোধ, সঙ্গীত, শিল্প ও কাব্যকলার উৎস হচ্ছে এই প্রেম।

এম্মা বলল, তবু সমাজের মতামত আমাদের মেনে চলা উচিত। সমাজে প্রচলিত নৈতিক মান আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

রুডলফ্ বলল, নীতির কথা যদি বলেন তাহলে বলব, দুরকমের নীতি আছে। এক ধরনের নীতি হলো প্রথাগত নীতি যা মানুষের সৃষ্টি, যা যুগে যুগে বদলায়। কিন্তু আর একটি নীতি আছে যা চিরন্তন, যা আমাদের চার-দিকের প্রকৃতির মত মাথার উপরের আকাশের মত অনন্তকাল ধরে বিরাজ করছে।

প্রিফেক্টের লোক আবার বলতে শুরু করল, কৃষির উপকারিতার কথা নূতন

করে প্রমাণ করার কি আছে ? চাষীরা যদি না থাকে তাহলে কারা আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু, উপাদান যোগাবে ? আমরা শহরে বসে যে রুটি খাই সেই রুটির জন্য চাষীরাই মাঠে মাঠে গম চাষ করে। কোথাও আঙুর, কোথাও আপেল প্রভৃতি যে সব ফল ফলে তাও কৃষকদের চেষ্টায়।

কথাগুলো যাই হোক, প্রতিটি দর্শক বক্তৃতার প্রতিটি কথা যেন গিলে খাচ্ছিল। চারদিকের বাড়ির দরজা ও বারান্দায় তিল ধারণের জায়গা ছিল না।

মঁসিয়ে লিউডেলের বক্তৃতার সবটুকু শোনা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে তার স্বর কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ বড় রাস্তার ধার থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো গরু ও ভেড়ার শব্দ আসতে লাগল। রাখালরা দিনের শেষে গরুর পাল নিয়ে বাড়ি ফিরছিল মাঠ থেকে। যেতে যেতে প্রদর্শনীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা।

রুডলফ্ এম্মার কাছে সরে এসে ঘন হয়ে বসে নিচু গলায় বলতে লাগল, ওরা যেভাবে সব কিছু নষ্ট করে দেয়, সেটা সত্যিই বিরক্তিকর। এমন কোন আবেগ বা অনুভূতি আছে যা সমাজ নিন্দার চোখে না দেখে ? মানুষের কত মহৎ প্রবৃত্তি কত পবিত্র সহানুভূতি এই সমাজ ঘৃণাভরে ধূলোয় লুটিয়ে দেয়। যদি কখনো কোন রকমে দুটি অন্তরাত্মা পরস্পরকে খুঁজে পায় অনেক সাধনার দ্বারা, এই নির্মম সমাজ তখন তাদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য সর্ব রকমে চেষ্টা করবে। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, তারা পরস্পরকে ভালবেসে যাবেই। যারা আপন আপন মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছে তারা ছমাস অথবা এক বছর পরেও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবেই। কারণ তারা পরস্পরের জন্যই জন্মেছে।

রুডলফ্ তার হাঁটুর উপর হাত দুটো রেখে এম্মার মুখপানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এম্মা তার চোখের তারায় সহসা কয়েকটা সোনালি রেখায় আঁকা একটা মুখের ছবি ফুটে উঠল। তার মাথায় যে পমেভোর গন্ধ পেল তাতে এক পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল এম্মার। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার লা ভবিসেয়ার্দ গাঁয়ে একদিন এক ভোজসভায় যার সঙ্গে সে ওয়ালয়ৎস নাচ নেচেছিল যে সেই ভিকোঁতে যেন তার সামনে বসে রয়েছে। তার মাথায় একদিন গন্ধ পেয়েছিল আজ হঠাৎ ঠিক সেই গন্ধ পাচ্ছে রুডলফ্এর মাথায়। সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত হারিয়ে যাওয়া গন্ধটা হঠাৎ পেয়ে গিয়ে আরো গভীরভাবে প্রাণভরে উপভোগ করার জন্য তার নাসারন্ধ্রটা যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল এম্মা। বহুদিন আবার সেই গন্ধে প্রাণমন মাতোয়ারা হয়ে উঠল তার।

আর ঠিক সেই সময় দূর দিগন্তে সহসা একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেল এম্মা। যে গাড়িতে করে এ গাঁয়ে প্রথম আসার দিন লীয়ঁর সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং যে গাড়িতে করে লীয়ঁ চিরদিনের জন্য এ গাঁ থেকে চলে যায়। এম্মার মনে হলো সে যেন ভিকোঁতের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এখনো ওয়ালৎস

নাচ নেচে চলেছে। নাচতে নাচতে তার মাথাটা ঘুরছে। আরো মনে হলো লীয় দূরে চলে যায়নি, সে তার কাছেই রয়েছে। কিন্তু রুডলফের মাথার চুল থেকে যে গন্ধ বেরিয়ে আসছিল সেই গন্ধের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ে উড়ন্ত বালুকার মত তার আগেকার কতকগুলি অতৃপ্ত কামনার কথা যেন অশান্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছিল। জানালার বাইরে আইভিলতা দিয়ে সাজানো তোরণদ্বার হতে ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করার জন্য নাসারন্ধ্রটা উঁচু করে তুলে ধরল এম্মা। তখনও সমানে কলগুঞ্জন ও মঁসিয়ে লিউডেনের বক্তৃতা শোনা যাচ্ছিল।

মঁসিয়ে লিউডেন বলছিলেন, উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করে যান। পুরনো প্রথাগত পথে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই আবার যে কোন হঠকারীর পরামর্শ মেনে চলারও কোন অর্থ হয় না। মাটির উন্নয়ন, উন্নততর সার প্রয়োগ, প্রযোজনব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আপনারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে চলবেন। সারা দেশের মধ্যে আপনারাই অবহেলিত ও অজ্ঞাত শ্রেণী। কোন সরকারই আপনাদের দিকে উপযুক্ত নজর দেয় না। আপনাদের নীরব নিরুচ্চার বীরত্বের কোন মূল্য দেয় না। কিন্তু আপনারা আজ এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আজ আমাদের রাষ্ট্র আপনাদের উপর সুনজর দান করেছেন। আপনাদের স্বার্থ রক্ষা ও উৎসাহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আপনাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিয়ে আপনাদের ত্যাগের বোঝাভার কমাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মঁসিয়ে লিউডেনের পর মঁসিয়ে ডিরোজিরেজ বক্তৃতা দিতে উঠলেন। ডিরোজিরেজের বক্তৃতা লিউডেনের মত আবেগপ্রবণ নয়। তিনি ধর্ম ও কৃষির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে এই দুই-এর উপর আরো স্পষ্ট ভাষায় জোর দিলেন।

এদিকে রুডলফ্ তখন মাদাম বোভারীকে প্রেমের ব্যাপারে যত সব স্বপ্ন আর আশঙ্কার কথা শোনাচ্ছিল। সে বলল, উদাহরণস্বরূপ এই আমাদের কথাই ধরুন না কেন। এই যেমন ধরুন, কেন আমাদের দেখা হলো দুজনের মধ্যে? কি করে এটা ঘটল? যে দূরত্ব আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, আমাদের নিবিড়তম ইচ্ছাশক্তিই সে দূরত্বের সব ব্যবধানকে লুপ্ত করে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসে আমাদের।

এই বলে মাদাম বোভারীর একটা হাত টেনে নিল রুডলফ্। এবার কিন্তু আগের মত হাতটা সরিয়ে নিল না মাদাম বোভারী।

ওদিকে প্রদর্শনীর মূল সভায় পারিতোষিক বিতরণের কাজ শুরু হলো। ভাল চাষ, ভাল সার প্রয়োগ ও বেশী ফসল উৎপাদন প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন চাষীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

রুডলফ্ মাদাম বোভারীকে বলল, আজ সকালে যখন আমি আপনার কাছে আসি তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম যে আমি আপনার সঙ্গে এই প্রদর্শনীতে আসতে পাব?

রুডলফ্ একটু চুপ করে থেকে নিজে নিজেই উত্তর করল, আমি ত চলেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু তবু রয়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত এবং আপনার সঙ্গে চলে এলাম। মনে হচ্ছে আমি আপনার সঙ্গে আজকের রাত্রি বাস করি। আপনার সঙ্গে আগামী কাল, প্রতিদিন ও সারাজীবন কাটাই।

রুডলফ্ আরও বলল, জীবনে আমি এর আগে কখনো আর কাউকে দেখে এতখানি মুগ্ধ হইনি। কেউ আমাকে এতখানি মুগ্ধ করতে পারেনি। আপনাকে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। চিরকাল আমি আপনার স্মৃতি বহন করে বেড়াব সারাজীবন ধরে। অথচ আপনি আমাকে ভুলে যাবেন। আমার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আপনার মন থেকে। কিন্তু একবার বলুন, তা হবে না। আপনার মনের মধ্যে আমার একটি স্থায়ী আসন রয়ে যাবে এ কথা একবার স্বীকার করুন।

এবার মাদাম বোভারীর হাতটা ধরে চাপ দিল রুডলফ্। সে হাতটা কাঁপতে লাগল। আকাশপিপাসু কোন বনকপতকে যেমন পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাখলে তা ছটফট করতে থাকে তেমনি মাদাম বোভারীর হাতটা রুডলফের হাতের মধ্যে তাই করতে লাগল। নিজের হাতটাকে মুক্ত করার জন্য অথবা রুডলফের আবেদনে সারা জাগাবার জন্য সত্যিই তার হাতটা নাড়ছিল মাদাম বোভারী।

রুডলফ্ এতে উৎসাহিত হয়ে আবেগের সঙ্গে বলল, তুমি তাহলে আমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছ না। আমি তাহলে একান্তভাবে তোমার।

জানালা থেকে এক ঝলক দমকা বাতাস এসে টেবিলের কাপড়টাকে দুলিয়ে দিল।

ওদিকে সরকারী খামারে পঞ্চাশ বছর ধরে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার জন্য ক্যাথারিন এলিজাবেথ নামে এক কৃষক রমণীকে কি একটা পুরস্কার দেবার জন্য তোড়জোড় করছিল ওরা।

রুডলফ্ আর কোন কথা বলল না। তারা শুধু পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের কামনার তপ্ত আতিশয্যে তার ঠোঁটগুলো কাঁপছিল। তাদের আঙ্গুলগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছিল।

চাষী মেয়েটি মঞ্চের দিকে যেতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। তাতে মেয়র তুভাশে রেগে যায়। অনেক করে বলার পর সে যায়। এরপর সভা শেষ হয়ে যায়। একে একে জনতা চলে যায়।

মাদাম বোভারী আবার রুডলফের হাত ধরল। রুডলফ্ তাকে তার বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিল। মাদাম বোভারী তাকে দরজার কাছে বিদায় দিল।

রুডলফ্ কিন্তু বাড়ি গেল না। সে মাঠের ধারে ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রির ভোজসভার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধ্যের সময় যে ভোজসভা বসল তাতে প্রচুর ভিড় দেখা গেল। সে ভোজসভা অনেকক্ষণ ধরে চলল। দারুণ গোলমাল হচ্ছিল। প্রচুর খাওয়া

দাওয়া হলো। অনেকে অনেক মিষ্টি খেল। রুডলফ্ কিন্তু তাঁবুর মধ্যে অনুষ্ঠিত সেই বিরাট ভোজসভায় বসে বসে এম্মার কথাই ভাবছিল। এত গোলমালের মাঝেও মনের মধ্যে তার বিরাজ করছিল এক আশ্চর্য স্তব্ধতা। সে স্তব্ধতার মাঝে একমাত্র এম্মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এম্মা তাকে যা যা বলেছিল তা তার কানে বাজছিল। তার অধরোষ্ঠের আকার ও রংটাও চোখের সামনে ভাসছিল। এম্মার সুন্দর মুখখানা যেন কোন এক ঐন্দ্রজালিক দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে অসংখ্য হয়ে স্থিরভাবে বিরাজ করছিল রুডলফের সামনে। মনে হলো তার পোষাকগুলো ঝুলছে সামনের তাঁবুর দেয়ালে। তার আরো মনে হলো সামনে প্রসারিত ভবিষ্যতের অন্তহীন পটভূমিকায় তাদের রাগ অনুরাগের অবিচ্ছিন্ন ধারাটা বয়ে চলবে যুগ যুগ ধরে।

সন্ধ্যের সময় বাজী পোড়ানোর উৎসব ছিল। এম্মাকে আবার দেখতে পেল রুডলফ্। কিন্তু কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। এবার এম্মা তার স্বামী, হোমা আর মাদাম হোমার সঙ্গে আসে। হোমা প্রায়ই ওদের দল থেকে বেরিয়ে বিনেটকে কি বলছিল। বাজী পোড়ানোর সময় এম্মা তার স্বামীর কাঁধের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নানারকমের রং মশালের আলোয় তার মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বাজীগুলো তুভাশের কাছে গচ্ছিত ছিল। তার অনেকগুলো স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকায় ভিজে যায়। সেই জন্য সব বাজী ভাল জ্বলছিল না।

এই সময় এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এম্মা তার মাথার উপর স্কার্ফটা জড়াল। প্রিফেক্টের দু ঘোড়ায় টানা গাড়িটা বেরিয়ে গেল। গাড়ির চালকটা প্রচুর মদ খেয়ে তার সীটে ঢলে ঢলে পড়ছিল।

তা দেখে হোমা বলল, মানালামির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। মাত্রা রেখে মদ খেতে হবে। কেউ যেন মদ খেয়ে মাতাল না হয়। আমি শাসনভার পেলে প্রতি সপ্তায় যারা যারা মদ খেয়ে মাতলামি করবে তাদের নামের একটা তালিকা টাউন হলে টাঙিয়ে দেব।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ হোমা চলে গেল বিনেটের কাছে। বিনেট বিরক্ত হয়ে তাকে বলল, তুমি যাও, সব ঠিক আছে। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

হোমা তার দলের লোকদের কাছে ফিরে এসে বলল, আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। কোন জ্বলন্ত বাজীর একটা স্ফুলিঙ্গও পড়েনি কোথাও। আমরা নিশ্চিন্তে বিছানায় যেতে পারি।

মাদাম হোমা একটা হাই তুলে বলল, আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে। এখনি শুয়ে পড়তে পারলে খুব ভাল হয়। আজকের দিনটা ভালই গেল।

রুডলফ্ নিচু গলায় কথাটার প্রতিধ্বনি করে বলল, সত্যিই দিনটি বড় সুন্দর।

এবার তারা পরস্পরকে বিদায় জানিয়ে বাড়ি চলে গেল।

দুদিন পর রুয়েনের একটা কাগজে ইয়নভিল গাঁয়ে অনুষ্ঠিত কৃষি প্রদর্শনী সম্বন্ধে হোমার একটা লেখা প্রকাশিত হলো। হোমা লেখাটা প্রদর্শনীর পর দিনই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হোমা প্রথমে দেশের সরকারকে সমর্থন করেছে। বলেছে সরকারের নীতি ভালই। সরকার দেশে কৃষির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করেছে। কিন্তু কৃষকদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরো অনেক কিছু করতে হবে। এখনো বহু সংস্কার সাধন করতে হবে।

এদিকে মঁসিয়ে লাইগীয়ার্দের বাড়িতে প্রদর্শনীর কার্যকরী সমিতির সদস্যরা এক ভোজসভায় মিলিত হয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। তাতে মেয়র মঁসিয়ে তুভাশেও ছিলেন। একমাত্র গাঁয়ের যাজক তাতে যোগদান করেননি এবং সেটা সবার চোখে পড়ে। দেশের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা হয়ত স্বতন্ত্র।

৯

পর পর ছ সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু রুডলফ্ এর মধ্যে একদিনও আর আসেনি মাদাম বোভারীর কাছে। তারপর একদিন সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ এসে হাজির হলো সে।

প্রদর্শনীর পরদিন সে একবার ভেবেছিল আজই সে যাবে। কিন্তু আবার পরক্ষণে ভাবে অন্য কথা। সে ভাবে এখনি মাদাম বোভারীর কাছে গেলে ভুল করা হবে। তাই সে তখন এক শিকার অভিযানে যাবার ঠিক করে।

শিকার থেকে রুডলফ্ ফিরে এসে ভাবে অনেক বেশী অপেক্ষা করা হয়ে গেছে। ভাবল মাদাম বোভারী যদি তাকে ভালবাসে তাহলে সে তাকে দেখার জন্য নিশ্চয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে। সে নিশ্চয় আমাকে ভালবাসে। এই কথা ভাবতে ভাবতে বোভারীদের বাড়ি গিয়ে হাজির হলো রুডলফ্।

বৈঠকখানা ঘরে ঢুকেই রুডলফ্ দেখল তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এম্মার মুখখানা কেমন যেন মলিন ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

এম্মা তখন ঘরে একাই ছিল। তখন গোধূলিবেলা। জানালার ছাই-রঙা পর্দাটা গোধূলির ছায়াকে আরো ঘন করে তুলেছে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তাপমান যন্ত্রটার উপর অস্তমান সূর্যের এক ফালি রশ্মি পড়ায় সেটা চকচক করছিল।

রুডলফ্ দাঁড়িয়ে রইল। রুডলফ্এর কথার প্রথমটায় কোন উত্তর দিতে পারল না। সে বলল, আমি ত নানা বিপদে পড়েছিলাম। আমি অসুখে পড়েছিলাম।

এম্মা বলল, সঙ্কটজনক হয়নি ত?

রুডলফ্ বলল, না ঠিক তা নয়। আসলে আমি এখানে আসতে চাইনি।

কেন?

তুমি তা বুঝতে পারছ না?

এই বলে এম্মার মুখপানে রুডলফ্ এমন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যার ফলে এম্মার মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। রুডলফ্ বলল, এম্মা!

এম্মা কিছুটা সরে গিয়ে বলল, মঁসিয়ে।

রুডলফ্ শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি নিজেই এটা বুঝতে পারবে যে আমি এখানে এতদিন না এসে ঠিকই করেছি। তোমার নাম তোমার কথা আমার সাড়া অন্তর জুড়ে বিরাজ করছে। মনে হচ্ছে মাদাম বোভারী তোমার নাম নয়, ও অন্য কারো নাম। তুমি আমার। তোমার চিন্তা আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। আমাকে ক্ষমা করবে, আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না। আমি এখানে থাকব না, অনেক দূরে চলে যাব। এত দূরে যাব যাতে আর কখনো দেখা না হয় আমাদের। কিন্তু আজ আমাকে কোন্ শক্তি যে এখানে নিয়ে এল তা বলতে পারব না। মানুষ কখনো ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হতে পারে না। তোমার অন্তরে এমন একটা সৌন্দর্য এমন একটা শক্তি আছে যা আমাকে টেনে এনেছে।

আজ জীবনে প্রথম এম্মা এই ধরনের কথা শুনল। এত সব প্রশংসার কথায় তার বুকটা গর্বে ফুলে উঠল।

রুডলফ্ আবার বলতে লাগল, আমি কয়েক সপ্তাহ এখানে আসিনি, আসতে পারিনি এটা ঠিক। আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক বস্তুই আমি এতদিন দেখে এসেছি এখানে না এলেও। কতদিন নীরব সন্ধ্যার শান্ত আকাশে আমি তোমার এই বাড়ির কাছে এসে ফিরে গেছি। আমি তোমার বাড়িটার দিকে কতবার তাকিয়ে থেকেছি। চাঁদের আলোয় তোমাদের বাড়ির ছাদটা চকচক করত আর আমি সেই দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তোমাদের বাগানের গাছগুলো দুলত বাতাসে। তাদের ডালগুলো দুলতে দুলতে প্রায় তোমার শোবার ঘরের জানালার কাছে চলে আসত। তোমার ঘরের জানালা দিয়ে বাড়ির আলোটা বেরিয়ে আসত। অন্ধকারে দূর থেকে দেখা যেত। কিন্তু তুমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতে না একজন হতভাগ্য লোক কত কাছে থেকে তোমাকে দেখার চেষ্টা করছে অথচ সে কত দূরে।

এম্মা রুডলফের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আপনি কত দয়ালু।

রুডলফ্ বলল, আমি দয়া করি না, আমি শুধু ভালবাসি। আর তুমি শুধু একবার বল আমায় তুমিও ভালবাস।

টুলের উপর বসে থাকতে থাকতে রুডলফ্ নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন টুল থেকে নেমে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। তার চোখে পড়ল ঘরের দরজাটা খোলা আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে রুডলফ্ বলল, তুমি যদি আমার মাত্র একটা খেয়াল চরিতার্থ করো তাহলে আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহের পরিচয় দেওয়া হবে।

রুডলফের খেয়ালটা আর কিছু নয়। শুধু সে বোভারীদের বাড়ির ভিতরটা ঘুরে দেখবে। এম্মা দেখল এটা এমন কিছু কঠিন কাজ না। তাই সে নিজে রুডলফ্কে সঙ্গে নিয়ে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল। তারা বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলে চার্লস এসে ঘরে ঢুকল।

চার্লসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রুডলফ্ ব্যস্তভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল, সুপ্রভাত ডাক্তার।

এই সম্মান প্রদর্শনে চার্লস আত্মপ্রসাদ লাভ করল। রুডলফ্ বলল, মাদাম তাকে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বলছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে চার্লস বলল, সে তার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে চিন্তিত। রুডলফ্ তখন চার্লসকে জিজ্ঞাসা করল, নিয়মিত ঘোড়ায় চড়াটা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে কি না।

চার্লস তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, খুব ভাল হবে প্রিয়তমা। এ পরামর্শটা খুবই ভাল এবং এটা তোমায় অনুসরণ করা উচিত।

এম্মা বলল তার কোন ঘোড়া নেই। রুডলফ্ তখন তাকে একটা ঘোড়া দিতে চাইল। কিন্তু এম্মা তা নিতে চাইল না। রুডলফ্ও আর সাধাসাধি করল না। এর পর রুডলফ্ চার্লসকে তার আসার কারণটা বলল। সে বলল, যে লোকটার চিকিৎসার জন্য সে প্রথম এসেছিল তার কাছে সে লোকটা এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। তার একটা ঝিমুনি ভাব আছে।

চার্লস বলল, সে একবার দেখতে যাবে লোকটাকে।

রুডলফ্ বলল, তাকে যেতে হবে না। সে নিজে লোকটাকে নিয়ে আসবে।

চার্লস বলল, বিশেষ ধন্যবাদ।

রুডলফ্ চলে গেলে চার্লস তার স্ত্রীকে বলল, তুমি মঁসিয়ে বুলেঙ্গারের প্রস্তাবে রাজী হলে না কেন?

এম্মা তখন একের পর এক যুক্তি দেখিয়ে পরিশেষে বলল, এটা অদ্ভুত লাগবে।

চার্লস বলল, আমি ও সব গ্রাহ্য করি না। সবচেয়ে আগে হচ্ছে স্বাস্থ্য। তুমি ভুল করছ।

এম্মা তখন বলল, কিন্তু আমার ঘোড়ায় চাপার অভ্যাস না থাকলে আমি কি করে ঘোড়ায় চাপব?

চার্লস বলল, তার জন্য তুমি একজনকে ঠিক করতে পার।

এইভাবে সব ঠিক হয়ে গেলে চার্লস একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল রুডলফ্কে। তার প্রস্তাবে তার স্ত্রী রাজী হয়েছে। আরো লিখল তার এই

দয়ার জন্য তারা দুজনেই কৃতজ্ঞ।

পরদিন দুপুরের দিকে রুডলফ্ দুটো ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হলো চার্লসদের বাড়ির সামনে। তাদের মধ্যে একটা ঘোড়া গোলাপী রঙের এবং তার উপর মেয়েদের চাপার উপযুক্ত এক জিন।

রুডলফ্ মনে মনে ঠিকই ভেবেছিল, এমন সব সাজানো ঘোড়া সে কখনো দেখেনি। রুডলফ্ যখন মখমলের কোট পরে এই দুটো সাজানো ঘোড়া নিয়ে এল তখন তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল এম্মা। সে যেন তারই পথ চেয়ে বসে ছিল।

ওরা দুজনে দুটো ঘোড়ায় চেপে যখন বার হলো তখন সবাই ওদের দেখতে লাগল। রুডলফ্ই এম্মাকে ঘোড়ায় চাপা শেখাবে। জাস্টিন কাজের ফাঁকে এক একবার উঁকি মেরে দেখতে লাগল। হোমা দোকান থেকে দেখতে দেখতে রুডলফ্কে কিছু উপদেশ দিল। বলল, দেখবেন, খুব সাবধান, দুর্ঘটনা ঘটতে দেরী লাগে না। আপনার ঘোড়া খুব তেজী মনে হচ্ছে।

এম্মা তার মাথার উপরে একটা শব্দ শুনতে পেল। দোতলার ঘরে ফেলিসিতে তার মেয়ে বার্থেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য জানালার সার্সিটা জয়ঢাকের মত বাজাচ্ছিল। মঁসিয়ে হোমা তার হাতের খবরের কাগজটা নেড়ে বলল, আপনার যাত্রা শুভ হোক। সাবধানে পথ চলবেন, এইটাই হলো বড় কথা।

নরম মাটি পেয়ে এম্মার ঘোড়াটা ছুটতে লাগল। রুডলফের ঘোড়াটা পাশাপাশিই যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলছিল তারা। ঘোড়ার চলার তালে তালে এম্মার দেহ ও হাতগুলো দুলছিল।

একটা পাহাড়ে উঠছিল ওরা। পাহাড়টার উপরে গিয়ে ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিল রুডলফ্। দুটো ঘোড়াই থেমে গেল একসঙ্গে।

তখন অক্টোবর মাসের প্রথম। গ্রামাঞ্চলে কুয়াশা পড়ে এই সময়। কিছু কুয়াশা দিগন্তে পাহাড়ের ধারে জমে ছিল আর কিছু কুয়াশা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক এক ঝলক সূর্যরশ্মি বেরিয়ে আসায় তার আলোতে দূরে ইয়নভিল গাঁয়ের বড় বড় বাড়ির মাথাগুলো চকচক করছিল। ওরা এত উঁচুতে উঠে এসেছিল যে সেখান থেকে গোটা নদী প্রান্তরসহ গোটা গাঁটাকে এক বিরাট কুয়াশাঘেরা হ্রদের মত দেখাচ্ছিল। তার মাঝে পপলার গাছগুলো হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছিল।

ওরা দুজনে একটা বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিল ধীর গতিতে। রুডলফ্এর দৃষ্টি সারাক্ষণ নিবদ্ধ ছিল এম্মার উপর। এম্মা সে দৃষ্টি এড়াবার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। ওরা এবার একটা বনের মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য দেখা গেল আকাশে। রোদের ক'টা রশ্মি এসে পড়ল বনভূমিতে। রুডলফ্ বলল, ঈশ্বর আমাদের লক্ষ্য করছেন।

এম্মা বলল, তুমি তাই মনে করো নাকি ?

রুডলফ্ বলল, যাই হোক এগিয়ে চল।

রুডলফ্ মুখের উপর জিভ দিয়ে একটা শব্দ করতেই ঘোড়া দুটো হালকা চালে এগিয়ে যেতে লাগল। ওরা পাশাপাশি দুজনে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ওদের পথে ডালপালা এসে পড়ছিল। রুডলফ্ এম্মার দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই সব ডালপালা সরিয়ে দিচ্ছিল। তখন তার হাঁটুটা এম্মার পায়ে ঠেকছিল।

এরপর ওরা একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে থামল। মনে হচ্ছিল আগাছা-গুলোকে কেটে সাফ করে রেখেছে জায়গাটাকে। এম্মা আগে আগে যাচ্ছিল। তার পোষাকের আঁচলটা লুটিয়ে পড়ছিল। রুডলফ পিছনে যেতে যেতে তা লক্ষ্য করছিল এক দৃষ্টিতে। এম্মার পায়ের সাদা মোজাগুলোকে তার নগ্ন পায়ের মাংস বলে মনে হচ্ছিল।

এক সময় থেমে এম্মা বলল, আমি ক্লান্ত।

রুডলফ্ বলল, আর কিছুটা, এস আমার সঙ্গে।

এর পর একশো গজ দূরে গিয়ে এম্মা থেমে গেল একেবারে আর সঙ্গে সঙ্গে যে নীল ওড়নার পাতলা অবগুণ্ঠনটা তার মাথা ও মুখের উপর ঝুলছিল সেটা খসে পড়ল নিচেতে। সেই পাতলা রেশমী ওড়নাটা যখন তার মুখের উপর দুলত বা কাঁপত তখন মনে হত সে যেন নীল জলে সাঁতার কাটছে।

এম্মা হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

রুডলফ্ তার উত্তর দিল না। সে শুধু এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। মনে হচ্ছিল সে যেন তার মোচটা কামড়াচ্ছে। ওরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছিল। একটা কাঠের উপর দুজনে পাশাপাশি বসল। রুডলফ্ খুব নিচু গলায় কথা বলছিল। এম্মা যাতে ভয় পেয়ে যায় এমন কোন দুঃসাহসী কথা সে বলেনি। এ বিষয়ে সতর্ক ছিল সে। রুডলফের মুখটা কেমন যেন এক স্তব্ধ বিষাদে ঢাকা ছিল। এম্মা পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে রুডলফের সব কথা শুনছিল। নিজে বিশেষ কিছু বলছিল না।

রুডলফ্ এক সময় আবেগের সঙ্গে বলল, আমাদের জীবন একসূত্রে গাঁথা। এ বন্ধন বিধিনির্দিষ্ট। তাই নয় কি?

এম্মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল, না না, কিছুতেই না। তুমি জান, তা কখনই হতে পারে না।

এম্মা উঠে দাঁড়াল। সে চলে যেতে চাইছিল। রুডলফ্ তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল দুহাত দিয়ে। এম্মা তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল রুডলফের দিকে। তারপর বলল, দয়া করে এ বিষয়ে আর কোন কথা বলো না। আমাদের ঘোড়া কোথায়? চল আমরা ফিরে যাই।

এম্মার কথায় ও হাবেভাবে একটা চাপা রাগ ও অসন্তোষ ছিল। সে আবার বলল, ঘোড়াগুলো কোথায়?

রুডলফ্ দাঁতে দাঁত চেপে এক অদ্ভুত হাসি হাসল। সে তার হাত বাড়িয়ে

আলিঙ্গনের জন্য এগিয়ে গেল এম্মার দিকে। এম্মা কাঁপতে কাঁপতে পিছিয়ে গেল কিছুটা। এম্মা আমতা আমতা করে বলল, তুমি আমাকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছ। কি করছ তুমি? আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

রুডলফের মুখের ভাবটা পাল্টে গেল। বলল, ঠিক আছে, তুমি যখন জেদ ধরছ তখন চল।

আবার সহজ ও ভদ্র হয়ে উঠল রুডলফ্। এম্মা তার একটা হাত ধরল। রুডলফ্ বলল, কি ব্যাপার বল ত? তোমার কি হয়েছিল বুঝতে পারলাম না আমি। নিশ্চয় একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে তোমার মনে। আমি তোমার মূর্তিটিকে প্যাডোগার মত আমার অন্তরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তবু তোমার দেহগত সাহচর্য আমি চাই। বাঁচার জন্য তাতে আমার প্রয়োজন আছে। তোমার কণ্ঠ, তোমার চোখের দৃষ্টি এ সবে আমার দরকার আছে। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি আমার বন্ধু হয়ে ওঠ, আমার বোন হয়ে ওঠ, আমার দেবদূত হয়ে ওঠ।

এই বলে রুডলফ্ আবার হাত বাড়িয়ে এম্মার কোমরটা জড়িয়ে ধরল। এম্মা তাকে মুক্ত করার জন্য ক্ষীণভাবে একটু চেষ্টা করল। কিন্তু রুডলফ্ তা শুনল না। ওরা অবশ্য তখন ঘোড়াগুলোর কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

রুডলফ্ বলল, আর একটু দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি যেও না।

এই বলে রুডলফ্ তাকে একটা পুকুরের ধারে নিয়ে গেল। পুকুরটা পদ্মফুল আর জলজ আগাছায় ভর্তি। ওরা তার ধারে যেতে ব্যাঙগুলো জলে লাফিয়ে পড়ল।

এম্মা বলল, তোমার ও সব কথা শোনা আমার পক্ষে অন্যায়। আমি তা হলে আত্মহারা হয়ে পড়ব!

রুডলফ্ জিজ্ঞাসা করল, কেন এম্মা?

এম্মা বলল, 'ও রুডলফ্!' কথাটা ধীরে উচ্চারণ করে তার কাঁধের উপর মুখটা রাখল। দেখতে দেখতে এম্মার দেহটা যেন অবশ ও শিথিল হয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে হাতে মুখ ঢেকে অবশেষে রুডলফের বাহুবন্ধনে ধরা দিল সম্পূর্ণরূপে, অকুণ্ঠভাবে।

তখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছিল। অস্ত যেতে থাকা সূর্যের যে শেষ রশ্মিগুলো গাছের ফাঁক দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে বসে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল এম্মার সে রশ্মিগুলো মিলিয়ে গেল। এম্মা যেন একটা ঘোর কাটিয়ে উঠল। যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠল ধীরে ধীরে। তার মনে হলো চারদিকের শান্ত গাছ-গুলোর থেকে মধু ঝরে পড়ছে। যেন তার বুকের ভিতর অনুভব করল তার নিস্পন্দপ্রায় ম্রিয়মান হৃৎপিণ্ডটা, আবার যেন প্রাণ ফিরে স্পন্দনশীল হয়ে উঠল। তার মনে হলো যেন তার শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে এক দুধের নদী। হঠাৎ দূরাগত এক ধ্বনি এসে কানে বাজল এম্মার। সে শব্দ শোনার জন্য নীরবে কান

পেতে রইল এম্মা। তার নিঃশব্দ স্নায়ুস্পন্দনের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল যেন সে শব্দের অশ্রুতপ্রায় সুরটা।

একটা সিগার দাঁতে চেপে ধরে রুডলফ্ তখন একটা ছিঁড়ে যাওয়া লাগাম জোড়া লাগাচ্ছিল।

একই পথ দিয়ে গাঁয়ে ফিরল ওরা। পথের কাদার উপর ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখতে পেল ওরা। ওরা দেখল পথের ধারে যে সব ঝোপঝাড়, ঘাসের উপর যে সব পাথরখণ্ড দেখেছিল তা সব ঠিক আছে। ভাল করে চারদিকে খুঁটিয়ে দেখল এম্মা কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। যেখানে যা ছিল তা সব ঠিক আছে। শুধু তার মধ্যে ঘটে গেছে এমনই এক পরিবর্তন যে পরিবর্তন কোন পর্বতের পতন থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। রুডলফ্ তার পাশে ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে অনেক কাছে এসে পড়ছিল তার আর যখনি তার কাছে এসে পড়ছিল তখনি তার হাতটা টেনে নিয়ে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরছিল।

ঘোড়ার উপর এম্মাকে সত্যিই খুব ভাল দেখাচ্ছিল। তার ছিপছিপে সুন্দর চেহারাটা খাড়া হয়ে বসেছিল ঘোড়ার জিনের উপর। প্রায়সন্ধ্যার লালাভ আলোটা তার মুখটাকে আরো রাঙা করে তুলে তার হাঁটু দুটো ঘোড়াটার কেশরের উপর চেপে বসেছিল।

এম্মার ঘোড়াটা ইয়নভিল গাঁয়ের ভিতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের অনেক লোক জানালার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল।

খাবার সময় চার্লস লক্ষ্য করে দেখল এম্মাকে ভাল দেখাচ্ছে আগের থেকে। কিন্তু সে যখন তাকে তাদের বেড়ানো সম্বন্ধে প্রশ্ন করল তখন সে চুপ করে রইল। যেন সে শুনতেই পায়নি তার স্বামীর কথাটা। সে তখন টেবিলের উপর দুটো হাতের কনুই রেখে কি ভাবছিল।

চার্লস আবার ডাকল, এম্মা!

এম্মা এবার উত্তর দিল, কি?

আমি আজ বিকালে মঁসিয়ে আলেকজান্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলাম। উনি বছর কয়েক আগে একটা ঘোড়ার বাচ্চা কেনেন। এখনো বাচ্চাটা দেখতে খুব ভাল আছে। শুধু তার হাঁটুটার কাছটা একটু ভাঙ্গা। আমার মনে হয় আমি সেটা একশো টাকায় কিনতে পারি।

চার্লস আরও বলতে লাগল, আমি ভাবলাম তোমার ওটা ভাল লাগবে। তাই কিনে ফেললাম। বল, আমি ঠিক করেছি কি?

এম্মা ঘাড় নেড়ে পূর্ণ সম্মতি জানাল। তার বেশ কিছুক্ষণ পর এম্মা বলল, আজ রাত্রে তুমি বাইরে কোথাও যাচ্ছ?

হ্যাঁ, যাব, কিন্তু কেন?

ও কিছু না, কিছু না প্রিয়তম।

চার্লস বাইরে চলে গেলে উপরতলায় নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল

এম্মা। ঘরের ভিতর ঢুকে প্রথমটায় তার মনে হলো সে যেন এখনো সুখঘোর ঘেরা এক স্বপ্নের আবেশের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এখনো সে যেন রুডলফের সঙ্গে পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। সে দেখছে সেই পথ, পথের ধারে সেই সব গাছ, খাল। মনে হলো রুডলফের হাতদুটো শক্তভাবে এখনো তার সেইটাকে জড়িয়ে ধরে আছে আর আশপাশের গাছের পাতাগুলো কাঁপছে তার মৃদুবিকম্পিত দেহলতার মত।

তারপর আয়নার উপর নিজের প্রতিফলনটাকে দেখল এম্মা। নিজেকে দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। তার চোখদুটো এর আগে কখনো এত বড় বড়, এত কালো আর এত গভীর দেখায়নি। তাব সমগ্র সত্তাটার মধ্যে কোথায় যেন এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আমি একজন প্রেমিক পেয়ে গেছি। একজন প্রেমিক। নিজের মনে মনে কথাটা বারবার বলতে লাগল এম্মা। প্রথম রজঃস্বলা নারীর মত এক নূতন অভিজ্ঞতার পুলকিত অভিঘাতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার সারা দেহ মন। অবশেষে সে সত্যিকারের প্রেমের আনন্দ লাভ করতে চলেছে, জীবনে যে সুখের আশা ত্যাগ করেছিল সে চিবতরে সে সুখ তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। সে আজ এমন এক আশ্চর্য রাজ্যে চলে এসেছে যেখানে আছে শুধু বিশুদ্ধ প্রেমের অনাবিল আবেগ আর আনন্দ। সে যেন আজ তার প্রেমাবেগে উজ্জ্বল পাহাড়টার সমস্ত শৃঙ্গগুলো একে একে পার হয়ে চলে এসেছে নীল আকাশের সীমানায়। দিনে দিনে সে যতই উপরে উঠে যাচ্ছে জীবন তত দূরে সরে যাচ্ছে, তার সেই পর্বতপ্রমাণ প্রেমাবেগের বিশাল ছায়ার অন্তরালে তলিয়ে যাচ্ছে যেন ফেলে আসা জীবনেব সব দিনগুলো।

একদিন যে সব উপন্যাস পড়ত এম্মা আজ তার নায়িকাদের কথা একে একে মনে পড়ল তার। সেই সব ব্যভিচারিণী নায়িকারা যেন সহসা তার স্মৃতির সুবাসিত কুঠরিটার মধ্যে এসে ফেটে পড়ল এক নীরব গুঞ্জরণে। আজ সে সেই সব প্রেমিকাদের যাদের একদিন ঈর্ষা করত তাদেরই একজন হয়ে গেছে। আজ সে নিজেই সেই সব কল্পিত নায়িকাদের একজন। তার যৌবনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। একদিন সে বহু কষ্ট করেছে, আজ তাই এক সূক্ষ্মমধুর প্রতিশোধ-বাসনার বশবর্তী হয়ে সেই সব কষ্টের প্রতিশোধ নিতে চলেছে। আজ সব বাধাকে জয় করে তার প্রতিহত অবরুদ্ধ প্রেমাবেগ শতধারায় প্রবল বেগে উৎসারিত হচ্ছে। আজ সব কুণ্ঠা, অনুশোচনা, উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে সে ধারায় অভিস্নাত হয়ে তার আস্বাদ প্রাণভরে গ্রহণ করবে।

পরের দিন এম্মা পেল নূতন এক আনন্দ। পরের দিন দেখা হতেই ওরা শপথ করতে লাগল ওদের পরস্পরের ভালবাসার ব্যাপারে। এম্মা তার জীবনের যত সব দুঃখের কথা বলতে লাগল। রুডলফ্ তার মুখচুম্বন করে সে কথা বলায় বাধা সৃষ্টি করল। এম্মা অর্ধমুদ্রিত চোখে তার পানে তাকিয়ে থেকে বলল,

তুমি যে আমায় ভালবাস একথাটা আমার নাম ধরে আমায় বল।

আগের দিনের মত ওরা আবার সেই বনে গেল। কিন্তু আজ ওরা খড় দিয়ে তৈরি একটা কুঁড়ে পেল। তার মধ্যে ওরা শুকনো পাতার উপর তুজনে পাশাপাশি বসল।

পরদিন থেকে ওরা রোজ রাত্রিবেলায় পরস্পরকে চিঠি লিখত। এম্মা তাদের বাগানে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রুডলফের জন্য তার লেখা চিঠিটা রেখে দিত। রুডলফ্ এসে সেই চিঠিটা নিয়ে এম্মাকে লেখা তার চিঠিটা সেখানে রেখে দিত।

একদিন সকালবেলায় উঠে এম্মা দেখল সূর্য ওঠার আগেই চার্লস বেরিয়ে গেছে। এমন সময় হঠাৎ তার রুডলফের কথা মনে পড়ে গেল। মনে হলো এখনই তার কাছে গিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।

সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ল এম্মা। দ্রুত পায়ে পিছনের দিকে একবারও না তাকিয়ে না ছুশেত্তে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। অর্ধেক পথ গিয়েই এম্মা দূর থেকে রুডলফের খামারবাড়িটা দেখতে পেল।

খামারের এক প্রান্তে বাড়িটা। এম্মা সোজা উপরতলায় উঠে গেল। রুডলফের ঘরে দেখল সে তখনো ঘুমোচ্ছে। এম্মা তাকে দেখে চিৎকার করে উঠতেই রুডলফ্ উঠে আশ্চর্য হয়ে গেল তাকে দেখে। আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি! তুমি এখানে এলে কি করে? তোমার পোষাক ভিজে গেছে।

এত কথার উত্তরে এম্মা শুধু একটা কথা বলল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি।' এই বলে সে রুডলফের গলাটা তুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

এরপর ক্রমশই সাহস বেড়ে যেতে লাগল এম্মার। যেদিন সকালে এম্মা দেখত চার্লস আগেই বেরিয়ে গেছে সেইদিনই সে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে বেরিয়ে পড়ত রুডলফের খামারবাড়িতে যাবার জন্য।

এর জন্য অনেক কষ্ট করতে হত তাকে। তাদের বাগানের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদীটা চলে গেছে তার পিচ্ছিল পাড় দিয়ে তাকে এক একদিন অতি কষ্টে পার হতে হত। চষা জমির নরম মাটিতে তার হালকা জুতো বসে যেত। তার ওড়নাটা হাওয়ায় উড়ত। মাঠ পার হবার সময় এক একদিন ষাঁড়ের ভয়ে তাকে ছুটতে হত। সকালের বাতাসে কেমন একটা বুনো গাছপালার গন্ধ।

এত কষ্ট করেও এম্মা গিয়ে দেখত রুডলফ্ তখনও ঘুমোচ্ছে। এম্মা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রুডলফের মনে হত যেন বসন্তের এক সকাল হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকল তার। তার ঘরের জানালায় টাঙানো নতুন পর্দাগুলোর মধ্য দিয়ে এক ঝলক সোনালি আলো এসে ঘরে ঢুকছিল। তাকে দেখে রুডলফ্ হেসে তাকে কাছে টেনে নিত, বুকের কাছে চেপে ধরত।

এদিকে এম্মা ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকত না। রুডলফের চিরুণী নিয়ে নিজের মাথা আঁচড়াতে শুরু করে দিত। তার মাথার চুলে শিশিরের ফোঁটা

লেগে থাকত। রুডলফের দাড়ি কামানোর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। তার পাইপটা নিজের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দাঁতের মধ্যে চেপে থাকত।

বিদায় নেবার সময় এম্মার প্রায় পনের মিনিট লেগে যেত। বিদায় নেবার সময় মনে বড় কষ্ট পেত এম্মা। সে কাঁদত। তার ইচ্ছা হত সে যেন রুডলফের কাছে স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

এইভাবে দিনের পর দিন চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এই দৈনন্দিন ধারাবাহিকতার ছন্দপতন ঘটল। একদিন সকালে এম্মাকে দেখেই রুডলফ্ যেন অবাক হয়ে গেল। মনে হলো সে যেন প্রথম এম্মাকে আসতে দেখল এভাবে। এম্মাকে দেখে ভ্রূ দুটো কুঁচকে রুডলফ্ বিরক্তি প্রকাশ করল।

এম্মা অবাক হয়ে বলল, কি এমন অন্যায় হয়েছে? তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

বেশ কিছুক্ষণ পর রুডলফ্ গম্ভীরভাবে বলল, এভাবে রোজ রোজ তার আসা উচিত হচ্ছে না। এটা বোকামির কাজ হচ্ছে এবং এতে তার সুনাম খারাপ হচ্ছে।

১০

দিন যত যেতে লাগল রুডলফের ভয়টা ততই মনের মধ্যে ঢুকে পড়ল এম্মার। ভালবাসার আবেগ উন্মাদ করে তুলেছিল তাকে। ভালবাসা ছাড়া আর কিছু সে ভাবতেই পারত না। আজ সে এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে যাতে তার মনে হয় ভালবাসা ছাড়া সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে ভালবাসার একটা অংশও সে ছাড়তে পারবে না।

তবে রুডলফ্ যে কথাটা বলেছে সেটাও উড়িয়ে দিতে পারে না। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে সে। সে যখন রুডলফের বাড়ি থেকে ফেরে তখন পথের চারদিকে ভয়ে ভয়ে চকিত হরিণীর মত তাকাতে থাকে। কে কোথায় আসছে তা লক্ষ্য করে। প্রতিটি পদশব্দে সচকিত হয়ে ওঠে। দূরে দিগন্তে মাঠের ওপারে কোন লোক দেখলেও ভয় পায়। মুখখানা মলিন হয়ে ওঠে তার। ঝরে পড়তে থাকা বৃন্তচ্যুত শুকনো পপলার পাতার মতই কাঁপতে থাকে মনটা।

একদিন সকালে কিছু বেলার পর এম্মা যখন রুডলফের বাড়ি থেকে ফিরে আসছিল তখন মাঠের ধারে এক জায়গায় এক বন্দুকের মুখ দেখে দারুণ ভয় পেয়ে যায় সে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় পথের ধারে একটা খালের মধ্যে বসে কে যেন তার দিকে বন্দুক ধরে কি লক্ষ্য করছে। এম্মা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে তার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। তবু সাহস করে সে কিছুটা পথ এগিয়ে যেতেই খাল থেকে শিকারীর বেশে একজন উঠে এল। তার মাথার টুপী চোখের উপর পর্যন্ত টানা ছিল বলে চেনা যাচ্ছিল না তাকে। পরে কাছে এলে দেখা গেল কর-আদায়কারী বিনেট।

বিনেট বেরিয়ে এসে এম্মাকে বলল, বন্দুক দেখলেই সাড়া দিতে হয়। তারপর বলল, বুনোহাঁস মারা একমাত্র নৌকো থেকে ছাড়া নিষিদ্ধ হলেও সে নিষেধ লঙ্ঘন করে সে শিকার করতে এসেছে। তবে আবহাওয়াটা খারাপ হওয়ার জন্য কোন শিকার পাওয়া যাচ্ছে না। এম্মা বলল, সে ধাত্রীর বাড়িতে তার মেয়েকে দেখতে গিয়েছিল।

আর না দাঁড়িয়ে 'বিদায় মঁসিয়ে বিনেট' বলে চলে গেল এম্মা। বিনেটও শুধু নীরসভাবে 'বিদায় মাদাম' কথাটা বলল।

এম্মা এইভাবে হঠাৎ চলে আসার পর কিন্তু অনুশোচনা করতে লাগল। ভাবল যে তার এভাবে বিনেটের কাছ থেকে চলে আসা উচিত হয়নি। এর থেকে সে যাই ধারণা করুক না কেন, সেটা তার অবশ্য প্রতিকূলে যাবে এবং তাতে তার অপযশ হবে। তাছাড়া কোথায় সে গিয়েছিল সে সম্বন্ধে যে কথা বানিয়ে বলেছে বিনেটকে সেটা যে একটা অসম্ভব এবং মিথ্যা কথা এটা গাঁয়ের সবাই জানে। সবাই জানে তার মেয়ে বার্থে ধাত্রীর ঘর থেকে প্রায় এক বছর হলো তার বাবা মার কাছে ফিরে এসেছে। আর বিনেটও এটা নিশ্চয় জানে যে পথ দিয়ে সে আসছিল সে পথ একমাত্র লা হুশেত্তের দিকেই গেছে। এ নিয়ে বিনেট নিশ্চয় তার মুখ বন্ধ করে রাখবে না ; পরচর্চা পরনিন্দার একটা ভাল উপাদান হিসাবে ব্যবহার করবে ব্যাপারটাকে। সারাদিন ধরে এই কথাটা ভাবতে লাগল এম্মা। সব সময় চিন্তা করতে লাগল, কথাটা কখনো উঠলে অন্য কোন্ মিথ্যা কথা বলে সেটা ঢাকবে। তাই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা করতে লাগল।

দুপুরে খাওয়ার সময় চার্লস লক্ষ্য করল এম্মার মুখখানা কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। বেশ ভার-ভার। সে তাই খাওয়ার পর এম্মাকে নিয়ে হোমার ওষুধের দোকান দিয়ে বেড়াতে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে এম্মা আরো মুস্কিলে পড়ল। দোকানের সামনে গিয়েই দেখল বিনেট দাঁড়িয়ে আছে কাউণ্টারের সামনে। বিনেট চাইছিল আধ আউন্স সুগার এ্যাসিড।

এম্মা ভিতরে গিয়ে মাদাম হোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। হোমা বলল, কষ্ট করে তাঁকে যেতে হবে না। আমি খবর দিচ্ছি সেই আসবে। সে তাই জাস্টিনকে ডেকে চেয়ার এনে ওদের বসার ব্যবস্থা করে দিতে বলল। চার্লসকে 'শুভদিন' বলে অভিভাদন জানাল।

হোমা এবার বিনেটের দিকে নজর দিল। বিনেট তার বন্দুকের নল পরিষ্কার করবে। হোমা বলল, বিনেট ভুল বলেছে। সুগার এ্যাসিড বলে কোন জিনিস নেই।

এদিকে বিনেটের যেতে দেরী হচ্ছিল দেখে অস্বস্তিবোধ করছিল এম্মা। হোমা বলল, স্টোভের উত্তাপে গাটা গরম করে নিন।

দোকানের পিছনে বসার ঘরে মাদাম হোমা তিনটে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

ঘরে ঢুকল। ঈর্মা ছিল কোলে। এছাড়া তার দুপাশে ছিল নেপলিয়ন আর এ্যাথেলি। ওদের বাবা কিভাবে ওষুধ ওজন করছিল তা দেখতে লাগল ছেলেগুলো।

মাদাম হোমা এম্মাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার বাচ্চা মেয়েটি কেমন আছে?

হোমা একটা কাগজে কি সব সংখ্যা লিখতে লিখতে বলল, ভালই আছে, খুব শান্ত।

মাদাম হোমা আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাচ্চাটাকে আনলেন না কেন?

এম্মা একবার দেখল বিনেট তখনো আছে কি না। বিনেট তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। সে এদিকে খেয়াল করেনি। একটু পরে সে চলে গেল দোকান থেকে। এম্মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এম্মা যেন হাঁপাচ্ছিল। তার যেন শ্বাস কষ্ট হচ্ছিল। তাই দেখে মাদাম হোমা জিজ্ঞাসা করল, আপনাব কি শীত করছে খুব?

পরের দিন একথাটা নিয়ে এম্মা আলোচনা করল রুডলফের সঙ্গে। কিভাবে এর থেকে নিরাপদে তাদের দেখাসাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা যায় সেই নিয়ে যুক্তি করল দুজনে মিলে। এম্মা বলল সে তার বাড়ির ঝিকে কোন উপহার দিয়ে বশীভূত করবে। তাহলে তাদের বাড়িতেই দেখা হবে দুজনের। কিন্তু পরক্ষণেই ঠিক হলো ইয়নভিল গাঁয়ের মধ্যেই একটা জায়গা দেখতে হবে। কারণ বাড়িতে ঝিকে বশ করলেও যে কোন সময় যে কোন লোক বাড়িতে আসতে পারে। তাই সেখানে বেশীক্ষণ থাকা চলবে না। রুডলফ্ বলল সে একটা সুবিধামত জায়গার খোঁজ করবে।

কিন্তু সে রকম কোন জায়গা না পেয়ে রুডলফ্ সারা শীতকাল ধরে সন্ধ্যের পর রোজ একবার করে এম্মাদের বাগানবাড়িতে আসত। এম্মা বাগানের গেটের চাবিটা খুলে রাখত। রুডলফ্ এসে তাব আসার কথাটা এম্মার উপরতলার ঘরের জানালায় একমুঠো কাঁকর ছুঁড়ে জানাত, এই সংকেত শুনে এম্মা বুঝতে পারিত। কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারত না। চার্লসএর জন্য অনেকক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হত। রাতে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে চার্লস তাকে শুতে ডাকত। এম্মা বই পড়ার ভাণ করত। তারপর চার্লস দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নিচে নেমে যেত এম্মা। তাড়াহুড়ো করে পোষাকটাও ভাল করে পরত না। সে ছুটে গিয়ে রুডলফের কোলের মধ্যে ধরা দিত; রুডলফ্ তার বড় ক্লোকটার মধ্যে এম্মাকে ঢুকিয়ে নিত। তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে তাকে বাগানের একপ্রান্তে নিয়ে যেত। সেখানে বাগানের মালীর জন্য যে একটা ঘর ছিল তার মাঝে বসত ওরা ঘন হয়ে।

শীতের যুঁইগাছের পাতাঝরা শাখার ফাঁক দিয়ে আকাশের তারা দেখা

যেত। তাদের পিছনে বয়ে যাওয়া ছোট্ট নদীটার কলতান শুনতে পেত ওরা। বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে ওদের মনে হত একটা বিশাল ছায়া ঘন হয়ে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, ঠিক যেন একটা বিশাল ঢেউ গ্রাস করতে আসছে ওদের। ওরা অকারণে চমকে উঠে মুখ বাড়িয়ে দেখে আবার সহজভাবে বসত। শীত যত বাড়ত ওরা তত বেশী জোর করে জড়িয়ে ধরত পরস্পরকে। এইভাবে ঘন হয়ে ওঠা দুটি দেহের মিলিত উত্তাপের কাছে হার মানত নৈশ বনভূমির মাঝে বয়ে যাওয়া শীতের কনকনে হাওয়া। ওদের নিঃশ্বাসগুলো যেন আরো গভীর হয়ে এক একটা দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হত। ওদের আধো দেখা চোখের দৃষ্টিগুলো যেন অনেক বড় বড় দেখাত। চারদিকের স্তব্ধতার মাঝে অনেক স্পষ্ট শোনাত ওদের মৃদু উচ্চারিত কথাগুলো।

কোন রাতে যদি ঝড়বৃষ্টি আসত তাহলে ওরা আশ্রয় নিত চার্লসএর রোগী দেখার ঘরটায়। এম্মা তখন একটা ছোট বাতি জ্বালত। বাতিটা সে লুকিয়ে রাখত আগে থেকে। সে ঘরে রুডলফ্ এমন সহজভাবে ঘোরাফেরা করত যাতে মনে হত এঘর তার। চার্লসএর বইপত্র ও রোগী দেখার সাজ-সরঞ্জাম নাড়াচাড়া করতে করতে মাঝে মাঝে আজেবাজে কথা বলে ঠাট্টা করত। এম্মা সেটা ঠিক পছন্দ করত না। তাদের এই দুঃসাহসিক অবৈধ মিলনটাকে কেন্দ্র করে এক নাটকীয় পরিস্থিতির কল্পনা করত এম্মা। অনেক সময় অনেক মিথ্যা অলীক ঘটনা সত্যের রূপ ধরে আসত তার শঙ্কাকাতর মনে। একদিন রাতে সে বলল তাদের দিকে এগিয়ে আসা কার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। সে চুপিচুপি রুডলফকে বলল, কে যেন আসছে। রুডলফ্ নীরবে তার হাতের আলোটা জ্বালল।

দেখা গেল কেউ নয়। তবু এম্মা তাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে পিস্তল আছে?

রুডলফ্ পাল্টা প্রশ্ন করল, কি জন্য?

এম্মা বলল, কেন, নিজেকে রক্ষা করতে তোমার লাগবে না?

তুমি বলছ তোমার স্বামীর কথা—ঐ বেচারী—

রুডলফ্ শেষের কথাগুলো এমন তুচ্ছভাবে বলত যাতে মনে হবে সে তার আঙুলের ডগা দিয়েই মেরে ফেলতে পারবে চার্লসকে। যদিও রুডলফের কথাটার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর কদর্যতার রোমাঞ্চ ছিল তবু তার নির্ভীকতার এই ভাবটা ভাল লাগত এম্মার।

এম্মার পিস্তলের কথাটা নিয়ে ভাবত রুডলফ্। তবে এম্মা যাই ভাবুক তার স্বামীকে নিয়ে কোন ভাবনাই ভাবে না সে। কারণ চার্লসএর মনে কোন ঈর্ষা প্রবেশ করেনি এখনো।

তবে রুডলফের এখন যা কিছু ভাবনা তা এম্মাকে নিয়ে। এম্মা বড় ভাবপ্রবণ। সে প্রায়ই তাকে মনে করিয়ে দেয় তারা এখনো পরস্পরে ছোট মূর্তি

ও একমুঠো করে কাটা চুল বিনিময় করেনি। রুডলফ্ তাকে এখনো তাদের অনন্ত মিলনের প্রতীক হিসাবে একটা আংটি দেয়নি। এম্মা আবার মাঝে মাঝে ওদের মৃত মার কথা বলে। রুডলফের মা আজ হতে কুড়ি বছর আগে মারা গেলেও এমনভাবে তাকে সান্ত্বনা দেয় যাতে মনে হয় সে যেন কোন শোকাহত শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সে ভাবালুতার সঙ্গে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে ঐ চাঁদের মধ্যে তোমার আমার দুজনেরই মা আছেন। ওখান থেকে তাঁরা আমাদের প্রেমকে আশীর্বাদ করছেন।

রুডলফ্ ভাবে মেয়েটা যাই বলুক বা যাই করুক সে সুন্দরী। তাছাড়া তার ভালবাসায় কোন খাদ নেই। এর আগে সে অনেক মেয়ের সংস্পর্শে এলেও এমন খাঁটি ভালবাসা কারো কাছে পায়নি। এম্মার প্রেমাবেগের মধ্যে কিছু অহেতুক আতিশয্য, কিছু উচ্ছ্বাস থাকলেও রুডলফ্ তাকে এক ধরনের জয়ের গৌরব, পৌরুষের গর্ব অনুভব করত। তাতে তার কামনা উদ্দীপিত হত।

দিনে দিনে তার প্রতি এম্মার ভালবাসার ব্যাপারে যত নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল রুডলফ্ ততই এক পরিবর্তন দেখা যেতে লাগল তার আচরণের মধ্যে। আগে যে সব মিষ্টি কথা বলত এম্মাকে এখন তা আর বলে না। আগে যে নিবিড়তার সঙ্গে আলিঙ্গন করত তাকে এখন তা আর করে না। এম্মা তা লক্ষ্য করে ব্যথা পেল মনে। তার মনে হতে লাগল তাদের প্রেমের যে নদীটির বেগবান স্রোতে এতদিন সে সব কুণ্ঠা ও কাণ্ডজ্ঞান ঝেড়ে ফেলে অবগাহন করে এসেছে প্রাণ ভরে, যার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে আজ সে নদীটি কেন স্বল্পসলিলা ও ক্ষীণস্রোতা হয়ে উঠেছে সহসা। আজ সে নদীর বুকে গভীর জলস্তম্ভের পরিবর্তে দেখা যায় শুধু ক্লেদাক্ত পঙ্কশয্যা। সেই শুষ্ক-প্রায় ক্ষীণকায়া প্রেমের নদীটিকে আবার জলবতী ও বেগবতী করে তোলার জন্য বেশী করে আদর করতে লাগল রুডলফ্‌কে। তার চুম্বন ও আলিঙ্গনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিল।

এম্মা ভেবে কিছু ঠিক করতে পারল না কি সে করবে। সে কি এমন করে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে ভুল করেছে? সে কি ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেবে নিজেকে না আরো বেশী করে ভালবাসবে রুডলফ্‌কে? তার মনের দুর্বলতা ক্রমশই রাগে পরিণত হয়। তবু রুডলফ্ যখন তাকে আলিঙ্গন করে তখন সব ভুলে যায় এম্মা। তার সব রাগ ও দুঃখের পাথরটা গলে জল হয়ে যায়।

তবু উপর থেকে কিছু বোঝা যায় না। তার অন্তঃস্রোতের মধ্যে নেমে আসা সব ঘাত প্রতিঘাত কাটিয়ে তাদের প্রেমসম্পর্কটা আবার শান্ত ও সহজ হয়ে ওঠে। রুডলফ্ ইচ্ছামত সে সম্পর্কটাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে যাতে মনে হবে তারা দুজনে স্বামী স্ত্রী।

বাবার একটা চিঠি পেল এম্মা। মঁসিয়ে রুয়ালত্ বছরের এই দিনটি পালন করেন। এই দিন তিনি তাঁর ভাঙ্গা পা আবার ফিরে পান। এই দিনটি

স্মরণ করে তিনি চার্লসকে কিছু না কিছু উপহার দেন। মঁসিয়ে রুয়ালত্ চিঠিতে লিখেছেন, আশা করি তোমরা ভালই আছে। দিনকতক আগে রাত্রিবেলায় এক ঝড় হয়। সেই ঝড়ে আমাদের পশুশালার কিছু ক্ষতি হয়। তার উপর এবার ফসল ভাল হয়নি। তোমাদের একবার কখন দেখতে যাব তা বলতে পারছি না। কারণ এখন আমি একা। আমার শরীর মোটামুটি ভালই আছে। তবে ইভেততের মেলায় একটা রাখালের খোঁজ করতে গিয়ে আমার সর্দি লাগে এবং শরীরটা কিছু খারাপ হয়। এক ফেরিওয়ালার সঙ্গে আমার দেখা হয় সম্প্রতি। তার কাছ থেকে তোমার খবর জানতে পারি। সে তোমাদের আস্তাবলে দুটি ঘোড়া দেখে। তাছাড়া আর একজন লোক বলছিল চার্লস আজকাল সব সময় ব্যস্ত থাকে কাজে। তাতে মনে হয় তোমাদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এতে আমি সুখী। তবে আমার একটা দুঃখ আমি আমার নাতনী বার্থে বোভারীকে দেখিনি। আমি তোমার ঘরের নিচে একটি গাছের চারা পুঁতেছি। আমি ও গাছে কাউকে হাত দিতে দেব না। আমি শুধু ওর থেকে জ্যাম তৈরি করে রেখে দেব। একদিন ও নিজে এসে তা খাবে।

চিঠিখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল এম্মা। তার মনে হলো চিঠিটা লেখার কালি শুকোবার জন্য জলন্ত আগুনের চুল্লী থেকে ছাই নিয়ে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চিঠির উপর। সহসা অতীতের সেই সব সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে গেল তার যখন সে বাড়িতে তার বাবার কাছে বসে সেই জলন্ত আগুনের ধারে চমৎকার সন্ধ্যাগুলো কাটাত। তখন সে কত সুখী ছিল। কত নিরুদ্বেগ ছিল তার অন্তর। ভবিষ্যতের স্বপ্নে কত সমৃদ্ধ ছিল তার মন। কি কুমারী হিসাবে কি প্রেমিকা হিসাবে কত পবিত্র ও বিশুদ্ধ ছিল তার জীবন।

কিন্তু আজ? আজ জীবনের পথে চলতে গিয়ে সেই বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা সব হারিয়েছে। প্রতিটি পান্থশালায় পথের সব সম্বল ফেলে যাওয়া উদাসীন পথিকের মত সব হারিয়ে চলেছে সে। কিন্তু হঠাৎ তার এই অনুশোচনার কারণ কি? তার আসল দুঃখের কারণ কি! হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন তার চেহারার মধ্যে তার মনের দুঃখের কারণ খুঁজতে লাগল।

তখন এপ্রিল মাস। আকাশে কোন মেঘ না থাকায় সূর্যালোক ছিল পর্যাপ্ত। আবহাওয়াটা যেমন নাতিশীতোষ্ণ তেমনি বাতাস ছিল শান্ত আর নিস্তরঙ্গ। এম্মা শুনতে পাচ্ছিল তার বাচ্চা মেয়েটা আনন্দে হাসছিল। ও দেখল বাড়ির উঠোনে মালী যে ঘাসগুলো কেটে জড়ো করছিল সেই ঘাসের স্তূপের উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিল বার্থে। মাঝে মাঝে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। ফেলিসিতে তার জামার আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল পাশে।

এম্মা হঠাৎ ওকে কাছে আনার জন্য ফেলিসিতেকে হুকুম করল। বার্থে কাছে এলে এম্মা দেখল তার কানের কাছে ময়লা জমেছে। সঙ্গে সঙ্গে গরম জল

আনার জন্য হুকুম করল এম্মা। গরম জল আনা হলে নিজের হাতে ধরে নিয়ে বাথেকে আদর করল, বুকে টেনে নিয়ে চুম্বন করল। তারপর এক সময় কেঁদে ফেলল। পাশ থেকে দাঁড়িয়ে ফেলিসিতে দেখতে দেখতে অবাক হয়ে গেল। এম্মার এধরনের মাতৃসুলভ উচ্ছ্বাস সে কখনো দেখেনি।

সে রাতে রুডলফ্ এসে দেখল এম্মার মুখখানা ভারী হয়ে আছে। অথচ তার কারণ কিছু জানতে পারল না। সে ভাবল এটা এক সাময়িক বিষাদ। দুদিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এর পর তিন দিন রুডলফ্ এল না তার দৈনন্দিন অভিসারে।

এদিকে অনুশোচনার আবেগটা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠল এম্মার মধ্যে। সে এক সময় ভাবতে ভাবতে বুঝতে পারল না কেন সে চার্লসকে এতদিন ঘৃণা করে এসেছে। তার সঙ্গত কারণটা আসলে কি তা খুঁজে পেল না। কিন্তু সে আবার চার্লসএর এমন কোন গুণও খুঁজে পেল না যার জন্য তার বহির্মুখী প্রেমাবেগ সহসা প্রত্যাবৃত্ত হয়ে অন্তর্মুখীন হয়ে উঠতে পারে। সহসা একদিন একটা সুযোগ এনে দিল হোমা।

১১

হোমা খোঁড়া পা আরোগ্য করার ব্যাপারে একটা রচনা পড়ছিল। লেখাটা পড়ে তার মনে একটা কথা জাগে। তাদের গাঁ ইয়নভিলেও খোঁড়া পায়ের উপর সার্থক অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা থাকবে।

হোমা একদিন এম্মাকে বলল, এতে ঝুঁকি কি আছে? আমি যে বইটা পড়েছি তাতে সব লেখা আছে কিভাবে কি করতে হবে। মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার হোটেলের আস্তাবলে খোঁড়া হিপ্পোলিতে কাজ করে। ও পায়ের পাতাটা পাততে পারে না। ওর পাটা অপারেশন করলেই ও হোটেলে যারা আসবে তাদের কাছে প্রচার করবে।

এরপর গলার স্বরটা নিচু করে হোমা এম্মার কাছে সরে এসে বলল, তাছাড়া রুয়েনের কাগজে আমাকে দিয়ে একটা লেখা পাঠালেই ত হলো। লেখা বেরোলে কত প্রচার হবে। সবাই বলাবলি করবে। কিসের থেকে কি হয় কে জানে?

এম্মার মনে হলো হোমা ঠিকই বলছে। তার স্বামী বোভারী অবশ্যই সফল হবে এ কাজে এবং তার দক্ষতায় সন্দেহ করার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে। বোভারীকে বলে কয়ে যদি কোন রকমে রাজী করাতে পারে এ কাজে সে কাজে সফল হলে যশ অর্থ একই সঙ্গে আসবে তাহলে কত সুখী হবে এম্মা।

একই সঙ্গে হোমা আর তার স্ত্রীর পরামর্শে ও প্রেরণায় রাজী হলো চার্লস। আপাতত সে রুয়েনে লোক পাঠিয়ে ডাক্তার দুভালের বইটা আনতে পাঠাল। রোজ রাত্রিবেলায় এক মনে পড়তে লাগল বইটা।

কিভাবে কত রকমে পা খোঁড়া হয়, পায়ের পাতাটা কোন কোন ক্ষেত্রে কিভাবে খারাপ থাকে এবং তার আলাদা আলাদা নাম সব জেনে নিল চার্লস।

এদিকে হোমা হিপ্পোলিতেকে অনেক করে রাজী করাল। বলা হল তার পা অপারেশন করে ভাল করে দেওয়া হবে। হিপ্পোলিতের পায়ের পাতাটা লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে, পাততে পারে না। কিন্তু অপারেশনে রাজী হচ্ছিল না। হোমা একে একে বিভিন্ন যুক্তি খাড়া করল। প্রথম কথা সে আবার সহজ ভাবে হাঁটতে পারবে। তার বিয়ে হবে।

হোমা বলল, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে। বিজ্ঞানের এই সুযোগটা গ্রহণ করতে কেন রাজী হচ্ছে না হিপ্পোলিতে তা বুঝতে পারছে না হোমা।

অবশেষে পাড়ার সব লোকই বোঝাতে লাগল হিপ্পোলিতেকে। বিনেট, মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া, এমন কি মেয়র তুভাশে সবাই ভাল করে বোঝাতে অবশেষে রাজী হলো হিপ্পোলিতে। তার রাজী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই যে তাকে একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না। পয়সা খরচ ত হবেই না, উল্টে মঁসিয়ে বোভারী অপারেশনের পর ভর দিয়ে হাঁটার জন্য একটা ক্রাচের ব্যবস্থা করে দেবে।

অপারেশনের আগে চার্লস প্রথমে হিপ্পোলিতের পায়ের পাতাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। হিপ্পোলিতের এই খোঁড়া পাটাতেই জোর বেশী। চার্লস পরীক্ষা করে দেখল এটা ইকুইনাস, অপারেশন করতে হবে। কিন্তু একসঙ্গে দুটো অপারেশন করতে সাহস পেল না চার্লস। একবারে একটা অপারেশনই করল।

প্রথম প্রথম ভয় করছিল চার্লসএর। সে যখন অপারেশনের ছুরি নিয়ে হিপ্পোলিতের কাছে এল তখন বুকটা দুর দুর করতে লাগল। হাতটা কাঁপতে লাগল। এতখানি ভয় এর আগে কোন অপারেশনের সময় সে পায়নি। এদিকে হোমা সকাল থেকেই সব জোগাড় করে রেখেছে। ব্যাণ্ডেজের কাপড় যোগাড় করে স্তূপাকৃত করে রেখেছে।

অপারেশন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। হিপ্পোলিতে বুঝতেই পারল না। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় চার্লসএর হাতটা চুম্বন করল। চার্লস তাকে বলল, এখন উত্তেজিত হয়ো না।

হোমা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হোমা বলল, তোমার উদ্ধারকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার পরে অনেক সময় পাবে। এখন ব্যস্ত হতে হবে না।

বাইরে উঠোনে অনেক লোক অপেক্ষা করছিল। হোমা ছুটে গিয়ে বেছে বেছে পাঁচজন লোককে খবরটা দিতেই তারা সারা গাঁয়ে প্রচার করল সঙ্গে সঙ্গে। চার্লস রোগীর পা ব্যাণ্ডেজ করে তাকে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে শিখিয়ে বাড়ি চলে গেল।

বাড়ি যেতেই এম্মা তার গলাটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তারপর ওরা দুজনে খেতে বসল। তৃপ্তি সহকারে খেল চার্লস।

সেদিনকার সন্ধ্যাটা বড় মনোরম মনে হলো চার্লসএর। সারাক্ষণ স্ত্রীর কাছে বসে গল্প করতে লাগল। তারা দুজনেই কত স্বপ্ন দেখল তাদের রঙীন ভবিষ্যতের। কত নাম, কত যশ, কত অর্থ, প্রতিপত্তি পাবে চার্লস। সঙ্গে সঙ্গে তারা বাড়িটার কিভাবে সংস্কার করবে তখন তাও ঠিক করে ফেলল এবং সে বিষয়ে আলোচনা করল। এতদিন পরে তার স্বামীর ভালবাসার আজ কিছু প্রতিদান দিতে পারায় মনে মনে দারুণ খুশি হলো এম্মা।

মাঝখানে একবার রুডলফের কথাটা মনে এল। কিন্তু তখন এম্মা সঙ্গে সঙ্গে চার্লসএর পানে তাকাল। তার মনটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল। সে দেখল চার্লসএর দাঁতগুলো আগে যত খারাপ ভাবত ততটা খারাপ নয়।

ওরা বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে হোমা এসে ওদের ঘরে ঢুকল। ফেলিসিতের কথা সে শোনেনি। ফেলিসিতে তাকে বলেছিল, আপনি দাঁড়ান, আমি খবর দিই। কিন্তু হোমা শোনেনি। জোর করে ওদের ঘরে ঢুকে পড়ে। তার হাতে একটা লেখা কাগজ ছিল। সেই লেখাটা সে রুয়েনের একটা খবরের কাগজে পাঠাবে। চার্লস বলল, কি লিখেছেন পড়ে শোনান।

হোমা লেখাটা পড়তে লাগল: আজও পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ কুসংস্কারের জটিল অন্ধকার জালে আচ্ছন্ন থাকলেও আমাদের কয়েকটি গ্রামে ধীরে ধীরে আলো প্রবেশ করছে। এই গত মঙ্গলবার আমাদের ইয়নভিল গাঁয়ে শল্য চিকিৎসার ব্যাপারে এক পরীক্ষা নীরিক্ষা চলে। নিছক পরোপকারের খাতিরেই এই অস্ত্রোপচার কার্য সাধিত হয়। প্রখ্যাত চিকিৎসক মঁসিয়ে বোভারী……

বাধা দিয়ে চার্লস আবেগের সঙ্গে বলল, এ কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

হোমা বলল, মোটেই না। এক খোঁড়া পায়ের উপর অস্ত্রোপচার করেছেন। আমি এর বৈজ্ঞানিক নামটা দিলে লোকে বুঝবে না বলে দিইনি।

চার্লস বলল, ঠিক করেছেন।

হোমা আবার পড়তে লাগল লেখার বাকি অংশটা: আমাদের এ অঞ্চলের প্রখ্যাত ডাক্তার মঁসিয়ে বোভারী এক খোঁড়া পায়ের উপর অস্ত্রোপচার করেন। যার পায়ের উপর অস্ত্রোপচার করা হয় সে ব্যক্তি হলো হিপ্পোলিতে নামক এক যুবক। সে মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার আস্তাবলে অস্তরালে কাজ করে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের অস্ত্রোপচার এই প্রথম বলে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য চিকিৎসালয়ের বাইরে প্রচুর জনসমাগম হয়। এই অস্ত্রোপচার কার্য যেন ঐন্দ্রজালিকভাবে সাধিত হয়। শুধু চামড়ার উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখা দেয়, দেখে মনে হয় যেন খোঁড়া পায়ের বিদ্রোহী

টেণ্ডনটি শল্যচিকিৎসকের দক্ষতার কাছে মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে রোগী বিশেষ কোন যন্ত্রণাই অনুভব করেনি। এই রকম লেখার সময় পর্যন্ত রোগীর অবস্থা সর্বতোভাবে ভাল দেখা যায় এবং এর থেকে যথেষ্ট সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যাচ্ছে রোগী দ্রুত আরোগ্যলাভের পথে এগিয়ে যাবে। কে জানে পরের বছর গ্রাম্য মেলা ও উৎসবের সময় হয়ত এই হিপ্পোলিতে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে নিপুণ ভাবে নাচতে শুরু করে তার পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভের পরিচয় দেবে। আজকের এই কৃতিত্বের জন্য সমগ্রভাবে বিশ্বের সকল বিজ্ঞানসাধক ও সেই সব পরোপকারী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যাঁরা অতন্দ্রভাবে মানবজাতির উন্নতি ও উদ্ধারের জন্য সেবা করে যাচ্ছেন। এই ভাবে আমরা আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন অন্ধরা চোখে দেখতে পাবে, বধির ব্যক্তিরা কানে শুনতে পাবে এবং খঞ্জ ব্যক্তিরা স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারবে। অতীতে বিজ্ঞান যে অসাধ্য সাধনের প্রতিশ্রুতি দান করে আজ তা সত্যে পরিণত হয়। এই উল্লেখযোগ্য আশ্চর্য আরোগ্যলাভের পরবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে আমাদের পাঠকবর্গকে যথাসময়ে অবশ্যই অবগত করাব আমরা।

কিন্তু হোমা আবেগের উচ্ছ্বাসে যাই বলুক, যাই লিখুক ঘটনার গতি কিন্তু সহসা অন্য দিকে মোড় নিল। পাঁচ দিন পর হঠাৎ একদিন মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া ছুটতে ছুটতে ডাক্তার বোভারীর বাড়িতে এসে 'বাঁচান বাঁচান' বলে চিৎকার করে উঠল।

চার্লস ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। তাকে ঐ ভাবে বেরিয়ে যেতে দেখে দোকান ছেড়ে দিয়ে হোমাও তার পিছু পিছু ছুটে গেল। আরো অনেক লোক ছুটে যাচ্ছিল মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার হোটেলে। হোমা কিছু বুঝতে না পেরে তার পাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি ব্যাপার গো সব, তোমরা সব হিপ্পোলিতেকে দেখতে যাচ্ছ?

হোটেলের একটি ঘরের মেঝের উপর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠছিল হিপ্পোলিতে। তার পায়ে ক্রাচটা তখনো ফিট করে আঁটা ছিল। সেইটা নিয়েই সে পাটা ঠুকছিল দেওয়ালে। চার্লস ও হোমা দুজনে মিলে প্রথমে ক্রাচটা খুলে দিল তার পা থেকে। দেখল তার পায়ের পাতাটা ভীষণ ভাবে ফুলে উঠেছে। পায়ের পাতাটা এমন ফুলে উঠেছে যে চামড়াটা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে। তার উপর কয়েকটা ফোস্কা পড়ায় তার থেকে একটা কালো রস বার হচ্ছিল।

ক'দিন ধরেই হিপ্পোলিতে যন্ত্রণার কথা বলছিল। কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয়নি। প্রথমে তার ক্রাচ থেকে পাটা খুলে দেওয়া হয়। ক্ষত পাটা এইভাবে বাইরে থাকায় ক্ষতি হয়। তারপর তার যন্ত্রণা বাড়লে আবার সেটাকে ক্রাচের ভিতর ঢুকিয়ে বেশী জোড় করে এঁটে দেওয়া হয়। তাতে তার ফুলোর উপর আরো চাপ পড়ে। হিপ্পোলিতে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে থাকায় মাদাম

লে ফ্রাঁসোয়া তাকে প্রথমে বিনেটের খাবার ঘরে ও পরে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে তার থাকার ব্যবস্থা করে।

সেই ঘরে একা একা শুয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করত হিপ্পোলিতে। তার মুখে দাড়ি গজিয়ে উঠেছিল। মুখখানা ম্লান ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। চোখগুলো যেন কোটরে ঢুকে গেছে। মাদাম বোভারী মাঝে মাঝে তার কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দিত। তার পায়ের ক্ষততে মলমের পুলটিস লাগিয়ে দিত। তাকে ঢাকা দেবার কম্বল দিয়েছিল। তবে হাটবারে আশপাশের চাষীরা হোটেলে এসে তার কাছে একবার বসত। কেউ বলত, তুমিই ভুল করেছ। কেউ বলত অপারেশন না করেও অন্য উপায়ে ভাল হত। আসলে হিপ্পোলিতের পায়ের ক্ষততে গ্যাংগ্রীন শুরু হয়ে গেছে। সেটা ক্রমশই পায়ের পাতা থেকে উপরে উঠছিল। ডাক্তার বোভারীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল হিপ্পোলিতে। কাতরভাবে বলল, আমি কখন ভাল হব ডাক্তারবাবু? হে ভগবান, আর পারছি না।

চার্লস যতবার তাকে দেখতে যেত শুধু কম খাবার পরামর্শ দিত। কিন্তু মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া তা শুনত না। সে তাকে নানারকম খাবার কিছু কিছু করে খেতে দিত। বলত, ওরা তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। ওদের কথা আর শুনিস না।

এই সুযোগে গাঁয়ের যাজক বুর্নিসিয়েন আসা যাওয়া করতে লাগল হিপ্পোলিতের কাছে। তার কষ্টে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বুর্নিসিয়েন বলল, তুমি এতদিন ধর্মীয় কাজকর্ম মোটেই করনি। ঈশ্বরকে স্মরণ করনি। তাই তোমার এই শাস্তি। এর মধ্য দিয়ে তুমি ঈশ্বরের মহিমাকে বুঝতে পারবে। ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে। তুমি প্রার্থনাসভায় মোটেই যোগ দিতে না। যোগ-অনুষ্ঠানেও তুমি যোগ দিতে না। যে মোক্ষলাভের কথা তুমি ভুলেই গিয়েছিলে আজ তার কথা ভাবার সময় এসেছে তোমার। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সমীপে যাবার সময় অবশ্য তোমার এখনো হয়নি। তবে এবার হতে কিন্তু ধর্মীয় কাজকর্ম ঈশ্বরের সেবা হিসাবে করতে হবে। অবশ্য সেটা এমন কিছু বেশী নয়।

বুর্নিসিয়েন তার পর থেকে রোজ আসতে লাগল। হিপ্পোলিতের খাবার কাছে বসে ধর্মের কথা শোনাত। তার সামান্য কিছু ফলও হলো। হিপ্পোলিতে বলল, সে ভাল হলে বঁ-সেকুবের তীর্থক্ষেত্রে যাবে।

যাজকের এই সব কাজকর্ম দেখে হোমা চটে গেল। সে স্পষ্ট বলল, যাজকের কাজকর্ম হিপ্পোলিতের আরোগ্যলাভের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। মাদাম লে ফ্রাঁসোয়াকে নিষেধ করে দিল যাজক যেন তার কাছে না আসে। কিন্তু মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া তার কথা শুনল না। সে উল্টে হিপ্পোলিতের মাথার উপর দেওয়ালে একটা ধর্মীয় ছবি টাঙিয়ে দিল।

শল্যচিকিৎসার মত যাজকের ধর্মীয় চিকিৎসাতেও কোন ফল হলো না। গ্যাংগ্রীন অর্থাৎ ক্ষতস্থানের অসুস্থ পচনক্রিয়া ক্রমশই উপরের দিকে উঠতে লাগল নির্মমভাবে। অবশেষে একদিন চার্লস মাদাম লে ফ্রাঁসোয়াকে স্পষ্ট করে নিউফশ্যাতেলের নামকরা সার্জেন মঁসিয়ে ক্যানিভারকে ডাক দিতে বলল।

এম ডি ডিগ্রীধারী পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞ সার্জেন মঁসিয়ে ক্যানিভার হিপ্পোলিতের পা দেখে তার উপর অনুষ্ঠিত শল্যচিকিৎসার কথা শুনে ঘৃণাভরে হাসতে লাগল। দেখল গ্যাংগ্রীন হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। বলল, হাঁটু পর্যন্ত পা টা কেটে বাদ দিতে হবে।

এরপর ক্যানিভার হোমার দোকানে গিয়ে হিপ্পোলিতের মত একজন গরীব খেটে খাওয়া লোকের এই অবস্থার জন্য তাকে দায়ী করল। তার একটা বোতাম ধরে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে বলল, এই সব হাতুড়ের বোকামির কাজ সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এই সব অবিমৃষ্যকারী লোক যারা পরিণামের কথা চিন্তা না করেই কাজ করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমরাও ত চিকিৎসক। একটা সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে তুললে। খোঁড়া হলেও যার পাটা শুধু পাতা ছাড়া গোটা আছে তাকে কেন এমন করতে গেলে? তোমাদের কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে তোমরা কুঁজো লোকের পিঠটাও সোজা করে দেবে।

কথাগুলো চাবুকের মত আঘাত দিল হোমাকে। তবু চুপ করে সব সহ্য করল হোমা। হোমা দেখল তার ব্যবসার খাতিরেই ক্যানিভারকে চটানো চলবে না। ডাক্তার ক্যানিভারের অনেক ব্যবস্থাপত্রসহ ইয়নভিলের অনেক লোক তার দোকানে ওষুধ কিনতে আসে। ক্যানিভার চটে গেলে তিনি তা নিষেধ করে দিতে পারেন। তাই সে নীরবে সব অপমান হজম করে ক্যানিভারকে সম্মান দেখাল।

ক্যানিভার যেদিন হিপ্পোলিতের পা অপারেশন করতে এল সেদিন সারা গাঁয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। মাদাম তুভাশে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন একটা মাদী ঘোড়ায় টানা ক্যানিভারের ছোট্ট গাড়িটার দিকে।

মঁসিয়ে ক্যানিভার হোটেলের উঠোনে নেমেই হাঁকডাক শুরু করে দিল। চিৎকার করে বলল, আমার গাড়িটা খুলে দাও। ঘুড়ীটাকে খেতে দাও।

এদিকে হোমা এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল ক্যানিভারের সামনে। কিন্তু ক্যানিভার হোমাকেই খুঁজছিল। কারণ আজকের এই অপারেশনে তাকে সাহায্য করার মত আর কেউ এখানে নেই। হোমাকে দেখেই ক্যানিভার তাই বলল, আমি ত তোমারি উপরে নির্ভর করে আসছি। চল তৈরি ত?

হোমা লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করল, এই অপারেশনে তাঁর সামনে থাকতে ভয় পাচ্ছে।

ক্যানিভার হোমাকে সাহস দিয়ে বলল, ওষুধ নিয়ে তোমরা কারবার

করো। তোমাদের ত ভয় থাকা উচিত নয়। হবে না কেন, তোমরা সব সময় রান্না ঘরে বসে আছ। ফলে যেমন চেহারার অবস্থা তেমনি মনের অবস্থা। আর আমাকে দেখ দেখি। আমি রোজ ভোর চারটের সময় উঠি। বারো মাস ঠাণ্ডা জলে দাড়ি কামাই। কখনো ঠাণ্ডা লাগে না বা সর্দি করে না। আমার খাওয়ারও কোন বাছবিচার নেই। যেদিন যখন যা পাই তাই খাই। ফলে দেখ এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমি ঘণ্টার মত শক্ত। আমি কখনো কোন অবস্থার মধ্যেই ভয় পাই না। যখন যা অপারেশনের জন্য আমার টেবিলে আসে আমি তাই করি।

এই বলে হোটেলের যে ঘরে হিপ্পোলিতে ছিল সেখানে হোমাকে সঙ্গে করে গেল ক্যানিভার। হোমা প্রথম অপারেশনের দিন যে ব্যাণ্ডেজের স্তূপ ঠিক করে রেখেছিল আজও রেখেছে ঠিক করে। অপারেশনের সময় সে কিন্তু ঘরের বাইরে দরজার কাছে আর্তেমিসে ও মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে ডাক্তার বোভারী তখন তার ঘরে অশান্তভাবে পায়চারি করছিল। কয়েকদিন ধরে সে লজ্জায় ঘর থেকে বেরোতে পারেনি। দিনরাত শুধু আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে। সে ভাবে সে ত রোগীর অবস্থা যাতে খারাপের দিকে না যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করেছিল। এ রকম যে হবে সে তা ভাবতেই পারেনি। এটা শুধু ভাগ্যের চক্রান্তে ঘটেছে।

সবচেয়ে লজ্জার কথা এই যে তার কাছে সাধারণতঃ যারা রোগ দেখায় তারা তাকে এ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে সে। অনেক ডাক্তার তাকে প্রশ্ন করতে পারে। খবরের কাগজে তার এই ব্যর্থতার কথা প্রকাশিত হতে পারে। হয়ত তারই কোন ত্রুটি থেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দু দিন পরে যদি হিপ্পোলিতের মৃত্যু ঘটে তাহলে তার জন্য সে-ই হবে নীতিগতভাবে দায়ী। তাছাড়া সে কোনরকমে বেঁচে উঠলেও পরে দেখা হলে সে যখন তাকে প্রশ্ন করবে, ভৎর্সনা করবে তখন সে কি উত্তর দেবে? গাঁয়ের সবাই তাকে ঠাট্টা করবে।

এমনি করে চার্লসএর মনে একে একে অসংখ্য আশংকা ভিড় করে আসতে লাগল। অসংখ্য তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে দোদুল্যমান এক শূন্য পিপের মত তার মনটা দুলতে লাগল।

এম্মা চার্লসএর উল্টোদিকে বসেছিল। চার্লস একা একা তার মনে যে অপমানের বোঝা বহন করছিল সে বোঝার কিছু মাত্র অংশ নেয়নি এম্মা। এম্মা সম্পূর্ণ অন্য এক ধরনের অপমান অনুভব করছিল। তার অপমানবোধের কারণ এই যে সে চার্লসকে যতটা যোগ্য ভেবেছিল ততটা যোগ্য সে নয়। আসলে তার কোন যোগ্যতাই নেই। তার প্রায়ই মনে হতে লাগল চার্লসএর অযোগ্যতার কথা সে যেন আগেই জানত। তাই তার উপর এতটা আশা করা উচিত হয়নি। আশাভঙ্গজনিত অপমানের তীব্রতাটা তাই এত বেশী করে

আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

একজোড়া ভারী বুট জুতো পরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল চার্লস। এম্মা তাতে বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি বস।

চার্লস বসল। এম্মাও বসে ভাবতে লাগল। সে বুঝতে পারল না তার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে কিভাবে চার্লসকে এতখানি বিশ্বাস করে এই ভুল করে বসল। বিয়ের পর থেকে একে একে সব কথা, তার ত্যাগের কথা মনে পড়ল তার। কোন স্বপ্নই পূরণ হয়নি তার। তার স্বপ্নের পাখিটা ব্যর্থতাব এক বিরাট পঙ্কশয্যায় আহত অবস্থায় শুধু লুটোপুটি খেয়েছে।

গ্রামটা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছিল। সহসা একটা চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল গ্রামটা। চার্লসএর মুখটা আরো বেশী মলিন হয়ে গেল ভয়ে। এম্মার চিন্তাটা বাধা পেল। তার ভ্রূদুটো একবার কুঁচকে উঠল। তারপর আবার সে ভাবতে লাগল। সে যা কিছু করেছিল এই অপদার্থ লোকটার জন্যই করেছিল। অথচ আজ এই অপদার্থ লোকটার নামের সঙ্গে যে বিদ্রূপ যে অপমান জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্যভাবে সে বিদ্রূপ সে অপমানের অংশ তাকেও নিতে হবে। দুদিন আগে এই লোকটাকেই সে ভালবাসার কত চেষ্টা করেছে। অন্য পুরুষকে ভালবাসার জন্য সে অনুশোচনায় অশ্রু বর্ষণ করেছে।

ভাবতে ভাবতে চার্লস আনমনে একটা কথা বলে ফেলল, বোধহয় এ রোগটা ভ্যানগ্যাস।

এম্মা কিছু বুঝল না। চার্লসএর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। চার্লসও শূন্য দৃষ্টিতে এম্মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার সে দৃষ্টিতে ছিল মদমত্ত ব্যক্তির দৃষ্টির অস্বচ্ছতা। হোটেল থেকে সেই আর্ত চিৎকারটা আবার কানে এসে বাজল তার। একই কণ্ঠ হতে নিঃসৃত একই চিৎকার থেমে থেমে ককিয়ে উঠতে লাগল। শুনে মনে হতে লাগল যেন কোন এক পশুকে তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে। এম্মা তার ফ্যাকাশে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল। তার চোখ দুটো দেখে মনে হলো যেন দুটো জ্বলন্ত তীর বেরিয়ে আসছে। চার্লসএর সব কিছুই বিসদৃশ ও বিতৃষ্ণ লাগছিল তার চোখে। তার মুখ, পোষাক-আশাক, তার কথাবার্তা, তার চেহারা, তার সমগ্র অস্তিত্বই এখন ঘৃণ্য তার কাছে। হঠাৎ মনে হলো তার আগে সে নারীজীবনের গুণ বলে যে আদর্শকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে আসলে সেটা দোষ ভয়ঙ্কর অন্যায়। তার মনে হলো চার্লসএর মত অপদার্থ স্বামীকে ভালবাসা বা তার বশ্যতা স্বীকার করা একটা পাপ। এই স্বামীকে ছেড়ে পরপুরুষকে ভালবাসা বা তার প্রতি আসক্ত হওয়া ব্যভিচার বলে মনে হলেও আসলে তাতে কোন অন্যায় নেই। এম্মার মনে হলো চার্লস তার কাছে বসে থাকলেও আসলে সে অনেক দূরের মানুষ। মনে হলো সে আর জীবন্ত নেই, আসলে কোন মুমূর্ষু যেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায়

আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিত প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে আছে।

বাড়ির বাইরে একসঙ্গে কতকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। জানালার ফাঁক দিয়ে চার্লস দেখল মঁসিয়ে ক্যানিভার রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে হোমার সঙ্গে তার ওষুধের দোকানের দিকে যাচ্ছে। হোমার হাতে ছিল একটা বড লাল বাক্স।

নিবিড় হতাশার ভারে ভারাক্রান্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে সহসা স্নেহ মমতার কাঙাল হয়ে উঠল চার্লসএর মনটা। সহসা সে এম্মার কাছে গিয়ে আকুল হয়ে বলে উঠল, আমাকে চুম্বন করো, আমাকে চুম্বন করো প্রিয়তমা।

রাগে লাল হয়ে এম্মা ধমক দিয়ে উঠল, খবরদার আমাকে ছুঁয়ো না।

কিছু বুঝতে না পেরে চার্লস আমতা আমতা করে বলল, কি হলো, কি অন্যায় আমি করেছি? তোমার শরীর মন কি ভাল নেই? তুমি জান আমি তোমাকে কত ভালবাসি?

আবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল এম্মা, থাম। খুব হয়েছে। এই বলে ঘরের ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গিয়ে তার পিছনে দরজাটা এতজোরে বন্ধ করে দিল যাতে ঘরের দেওয়ালে টাঙানো তাপমান যন্ত্রটা মেঝের উপর পড়ে গিয়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

চার্লস তার চেয়ারে অনড় হয়ে বসে রইল। সে ভাবল এম্মার হয়ত আবার সেই স্নায়বিক দুর্বলতার অসুখটা বেড়েছে। এক দুর্বোধ্য রহস্যের সকরুণ ভারে তার ঘরের বাতাসটা ভারী হয়ে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যায় রুডলফ যখন কয়েকদিন পর আবার এল তখন সে দেখল এম্মা তারই জন্য অপেক্ষা করছে বাগানে। সে নদীর ঘাটের শেষ সিঁড়িটায় বসেছিল। তারা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল আর সেই আলিঙ্গনের উত্তাপে গত কয়েকদিনের হিমশীতল বিরাগটা গলে জল হয়ে গেল মুহূর্তে।

১২

আবার জোয়ার এল তাদের প্রেমের নদীতে।

আজকাল এম্মার কি হয়েছে প্রায়ই চিঠি লেখে রুডলফকে। লেখার কারণ না থাকলেও লেখে। দিনের বেলায় যে কোন সময় খেয়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা লিখেই সে জানালা থেকে জাস্টিনকে ইশারায় ডাকে। জাস্টিন এসে চিঠিটা তার কাছ থেকে নিয়েই এক ফাঁকে ছুটে লা হুশেত্তের খামার বাড়িতে চলে যায়।

তার উত্তরে রুডলফ এসে সেই একই কথা শোনে। এম্মা সেই একই কথা বলে। বলে তার জীবন দুঃখে বিষাদে ভারী হয়ে উঠছে। তার স্বামী তার কাছে অসহ্য ঘৃণ্য। তার জীবনের যন্ত্রণা আর সে সহ্য করতে পারছে না।

রুডলফ একদিন এম্মার এই সব কথার উত্তরে বলল, আমি তোমার জন্য

কিছু করতে পারি?

এম্মা বলল, তুমি যদি কিছু পারতে···

এম্মা তখন রুডলফের দুটো হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা রেখে বসেছিল। রুডলফ্ আবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। বলল, আমি কি করতে পারি? এম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমরা যদি এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে পারতাম।

রুডলফ্ হাসতে হাসতে বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তুমি জান এটা অসম্ভব।

এম্মা আবার কথাটা তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু রুডলফ্ তা শুনেও শুনল না। রুডলফ্ অন্য কথা বলতে লাগল প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে। সে বুঝতে পারল না প্রেমের মত একটা সহজ সাধারণ ব্যাপার নিয়ে এত হৈচৈ করার কি আছে।

কিন্তু রুডলফের কাছে যা অপ্রয়োজনীয় এম্মার কাছে তার একটা প্রয়োজন আছে। তার আবেগের পিছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। একটা কারণ ছিল। তার স্বামীর প্রতি ঘৃণা বিতৃষ্ণা যত বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে ততই বেড়ে যেতে লাগল রুডলফের প্রতি তার ভালবাসাটা।

রুডলফের কাছে যত নিবিড়ভাবে আত্মসমর্পণ করত এম্মা ততই দূরে সরে যেত চার্লসএর কাছ থেকে। রুডলফ্ তার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর সে যখন ঘরে ফিরে এসে চার্লসএর কাছে বসত তখন সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগত চার্লসকে। এত কুৎসিত, এত মাথামোটা, এত নির্বোধ তাকে এর আগে কখনও মনে হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে রুডলফের চেহারাটা মনে পড়ে যায় তার। তার তামাটে কপালের উপর কোঁকড়ানো চুলের গোছা, তার শক্তি ও সৌন্দর্যের সমন্বয়ে গড়া সবল সুগঠিত চেহারা, তার উত্তপ্ত আবেগের সঙ্গে শান্ত শীতল বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি সব মিলিয়ে অস্বাভাবিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল তার দেহমন। এই রুডলফের পরামর্শেই সে তার নখ পালিশ করে তাতে রং লাগিয়েছে। ঠাণ্ডা ক্রীম দিয়ে সে তার গায়ের চামড়া মালিশ করে। তার রুমালে আতর ঢেলে সেটাকে সুগন্ধি করে। রুডলফের যখন আসার কথা থাকে তখন তার বসার ঘরে তার দুটো কাচের ফুলদানি গোলাপ ফুলে ভরে দেয়। রুডলফের জন্য ব্রেসলেট, আংটি আর গলায় হার পরে নিজের দেহটাকে সাজায় এম্মা। এইভাবে তার ঘরখানা ও সে নিজে রাজাগমনপ্রত্যাশী সভাসদের মত প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বসে থাকে।

ফেলিসিতেকে নিয়ে আজকাল কোন ভাবনা নেই এম্মার। সে সব সময় রান্নাঘরেই ব্যস্ত থাকে। আর জাস্টিন ছেলেটা সব সময় তার কাছে ঘুরঘুর করে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় তাদের রান্নাঘরের চৌকাঠে এসে বসে থাকে।

রান্নাঘরের বাইরে বক্ষাবরণী, অন্তর্বাস, নিম্নবাস প্রভৃতি মেয়েদের

গোপনাঙ্গের যে সব কাচা পোষাক শুকোতে দেওয়া থাকে সেগুলোর দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জাস্টিন। এক সময় ফেলিসিতেকে বোকার মত জিজ্ঞাসা করে, এগুলো কি ?

ফেলিসিতে উত্তর দেয়, তুই ন্যাকা সাজছিস ? তুই যেন কিছু জানিস না। তোদের মাদাম হোমা ওসব পড়ে না ?

জাস্টিন বলে, মাদাম হোমাকে ত মেয়ে বলে মনেই হয় না। মেয়ের মত মেয়ে হচ্ছে তোমাদের মাদাম।

তার প্রতি জাস্টিনের আসক্তিটাকে মোটেই ভাল লাগে না ফেলিসিতের। কারণ সে জাস্টিনের থেকে বয়সে ছ বছরের বড়। প্রেম করার বয়স জাস্টিনের এখনো হয়নি। তবু সে যখন তখন এসে তাকে বিরক্ত করে। ফেলিসিতে তাকে স্পষ্ট বলে, আগে দাঁড়া, তোর মুখে দাড়ি গজাক। তারপর প্রেম করতে আসবি।

এদিকে ফেলিসিতেকে খুশি করার জন্য এম্মার জুতোগুলো পরিষ্কার করার জন্য ছুটে যায় জাস্টিন। মাঠের কাদা শক্ত হয়ে শুকিয়ে গেছে এম্মার জুতোগুলোতে। তাই পরিষ্কার করতে থাকে জাস্টিন।

জাস্টিনের জুতো পরিষ্কারের ধরণ দেখে ফেলিসিতে বলে, তুই এমন ভাবে ভয়ে ভয়ে পরিষ্কার করছিস যাতে জুতোর কোন ক্ষতি না হয়। মাদাম নিজেও মোটেই ভাল করে পরিষ্কার করে না। উনি কোন জুতোর মধ্যে একটুও খুঁত বা ছেঁড়া দেখলে তা ফেলে দেন না হয় রেখে দেন।

সত্যিই এম্মার অনেক জোড়া জুতো আছে। সামান্য মাত্র অজুহাতে বহু জুতো সে ত্যাগ করে নূতন জুতো কিনেছে। চার্লস কখনো এর জন্য একটা কথাও বলেনি।

শুধু তাই নয়, হিপ্পোলিতের অপারেশনের পর তার জন্য তিনশো টাকা খরচ করে একটা কাঠের পা কিনে দিতে হয় চার্লসকে। কাঠের পাটার সঙ্গে একজোড়া চামড়ার জুতো আর একটা পায়জামার সঙ্গে ফিট করা ছিল যাতে স্বাভাবিক পা মনে হচ্ছিল। হিপ্পোলিতে কিন্তু এত সুন্দর পা সব সময় ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করছিল। সে তাই মাদাম বোভারীকে অন্য একটা সাধারণ কাঠের পা কিনে দিতে বলল এবং মাদাম বোভারীর কথায় চার্লস আবার একটা পা কিনে দেয়।

হিপ্পোলিতে কাঠের পা দিয়ে আবার কাজকর্ম শুরু করল। সে আবার গাঁয়ের সর্বত্র হাঁটা চলা করতে লাগল আগের মত। কিন্তু চার্লস যখনি হিপ্পোলিতের কাঠের পায়ের শব্দ পেত তখনি সে অন্য দিকে চলে যেত। হিপ্পোলিতেকে সব সময় এড়িয়ে যেত চার্লস।

হিপ্পোলিতের কাঠের পায়ের জন্য লেহুড়েকে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগ লেহুড়ে মাদাম বোভারীর কাছে এসে নূতন করে কথা বলার

সুযোগ পায়। সে প্যারিসের অনেক নূতন নূতন ফ্যাশনের কথা বলে। মেয়েদের ব্যবহার্য খুঁটিনাটি কত জিনিস। এম্মা তার যত সব সখের জিনিস লেহুড়েকে দিয়েই আনায়। লেহুড়ে বড় বিনয়ী এবং টাকার জন্য খুব একটা পীড়াপীড়ি করে না কখনও। এম্মা রুয়েনে গিয়ে একবার রূপোর হাতলওয়ালা একটা ঘোড়ার চাবুক দেখতে পায়। সেটা দেখে রুডলফ্‌কে সেই ধরনের একটা চাবুক উপহার দেবার সাধ হয় তার। সে লেহুড়েকে তার জন্য অর্ডার দেয়। লেহুড়ে ভাবে এই চাবুক চার্লসএর। এক সপ্তাহের মধ্যে লেহুড়ে চাবুকটা এনে এম্মার সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখে।

পরের দিনই অবশ্য লেহুড়ে তার বিলটাও নিয়ে আসে। দুশো সত্তর ফ্রাঁ তার দাম। কি করে এত টাকা দেবে এম্মা তা ভেবে পায় না। সব ড্রয়ারগুলো শূন্য। কোথাও কিছু টাকা পয়সা নেই। তার উপর লেস্তিবুদয় কাজ করেছিল। দু সপ্তার বেতন পাবে। তাদের রাঁধুনি ফেলিসিতে পাবে ছ মাসের মাইনে। এ ছাড়াও আরও বিল আছে যা শোধ করা হয়নি। চার্লসএর একমাত্র ভরসা ডিরোজিরে নামে এক রোগীর টাকা। তাদের বাড়ির ডাক্তার সে এবং ডিরোজিরে সারা বছরের মধ্যে যা বাকি হয় তা একবারে শোধ করে। তার টাকা জুন মাসের মধ্যেই এসে পড়বে।

লেহুড়েকে কিছুদিন বুঝিয়ে রাখল এম্মা। কিন্তু বেশী দেরী হওয়ায় সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। সে একদিন এসে এম্মার কাছে জোর তাগাদা করতে লাগল। বলল, তার এখন টাকার বিশেষ দরকার। এখন লাভ ত দূরের কথা তার দোকানের মূলধন পর্যন্ত খোয়া যাচ্ছে। সব একসঙ্গে এখন শোধ না করলেও সে যদি এখন কিছু টাকা না দেয় তাহলে সে যে সব মাল দিয়েছে তা নিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

এম্মা বলল, ঠিক আছে নিয়ে যান।

লেহুড়ে বলল, না না, আমি তা বলিনি। আপনি হয়ত চাবুক ছাড়া অন্য সব জিনিসের কথা বলছেন? চাবুকটার টাকার জন্য আমাকে হয়ত মঁসিয়েকে বলতে হবে।

এম্মা তাড়াতাড়ি বলল, না না। তা বলতে হবে না।

বলব না? লেহুড়ে মনে মনে ভাবল, আমি এবার তোমাকে হাতে পেয়ে গেছি। সে বুঝতে পারল মাদাম বোভারীর গোপন দুর্বলতার কথাটা জেনে গেছে। একটা তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরল লেহুড়ে।

এমন সময় ডিরোজিরের একটা পার্সেল এসে গেল। সেটা এম্মার হাতেই পড়ল। খুলে দেখল পনের নেপলিয়ঁ আছে। এম্মা দেখল চার্লস বাড়িতে এসেছে। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে তার একটা ড্রয়ারে স্বর্ণমুদ্রাগুলো রেখে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে দিল।

লেহুড়ে যথাসময়েই এল। এসে একটা পরামর্শ দিচ্ছিল, যদি আপনি টাকা

শোধ দিতে না পারেন—

এম্মা সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দটা নেপলিয়ঁ লেছরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। লেছরে অবাক হয়ে তার সব ধার বাকি কেটে নিয়ে পাঁচ ফ্রাঁ ফেরৎ দিল। লেছরে তখন এম্মার কাছে ক্ষমা চাইল। বারবার জিজ্ঞাসা করল তার আর কোন জিনিসের দরকার আছে কি না। কিন্তু এম্মা কোন কিছুই চাইল না। লেছরে চলে গেলে এম্মা ভাবল তার কাছে মাত্র এই পাঁচ ফ্রাঁ পুঁজি আছে। সে ঠিক করল এবার হতে সে খুব কম খরচ করবে। এবং কিছু কিছু করে জমিয়ে এই টাকা চার্লসকে একদিন দিয়ে দেবে। ধরে নিল এটা সে ধার হিসাবে নিয়েছে চার্লসএর কাছ থেকে। আবার ভাবল, চার্লসএর এ বিষয়ে কোন খেয়ালই নেই। এদিকে সে কোন নজরই দেবে না।

রূপোর হাতলওয়ালা একটা চাবুক ছাড়াও আরো তিনটি জিনিস উপহার দিয়েছিল রুডলফকে। তা হলো একটা আংটি, তাদের ভালবাসার স্মারকচিহ্ন। একটা সিগার কেস আর একটা স্কার্ফ যেটা মাফলার হিসাবে ব্যবহার কবত রুডলফ্। ভিকোঁতের যে রূপোব সিগার কেসটা একদিন পথে কুড়িয়ে পেয়েছিল চার্লস এবং যেটা আজও সে রেখে দিয়েছে যত্ন করে ঠিক সেই ধরনের একটা সিগার কেস কিনে উপহাব দিয়েছিল রুডলফ্‌কে।

রুডলফ নিতে চাইত না এই সব উপহার। সে পুরুষ মানুষ, প্রেমিকার কাছ থেকে একের পর এক এই সব উপহার গ্রহণ করা অপমানজনক তার পক্ষে। তবু এম্মা ছাড়ত না এবং তার পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে এই সব নিত। শুধু উপহার দিত না, অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত আবদার করত এম্মা রুডলফের কাছে। একদিন তাকে হঠাৎ বলে বসল, রাত দুপুর হলেই রোজ আমাব কথা ভাববে।

পরে আবার এম্মা জিজ্ঞাসা করল তাকে রুডলফ্ তা করেছিল কিনা। রুডলফ্ যদি তাব কাছে স্পষ্ট স্বীকার করে বলত সে তার কথা মনে করেনি তাহলে তাকে ভৎর্সনা করত নানা কথায়। শেষে বলত, তুমি আমাকে ভালবাস?

হ্যাঁ অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি।

খুব বেশী ত?

নিশ্চয়।

তুমি আর কাউকে ভালবাসনি নিশ্চয়, বেসেছ কি?

একথায় হেসে উঠত রুডলফ্। বলত, তুমি কি ভাব তুমিই প্রথম নারী যাকে আমি প্রথম স্পর্শ করি?

কথায় কথায় এম্মা রেগে গেলে তাকে আবার নানারকম ভালবাসার কথা বলে থামাতে হত রুডলফকে। তার মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করত। অবশেষে এম্মা বলত, আমি এই সব বলি তার কারণ আমি তোমাকে ছাড়া চলতে পারি না। থাকতে পারি না। তুমি তা জান। এক এক সময়

তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় সে কোথায় এখন? সে কি অন্য কোন মেয়ের কাছে আছে? বল তুমি, তুমি অন্য কোন মেয়ের কাছে যাও কি না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার থেকে সুন্দরী হতে পারে কিন্তু আমার মত তোমাকে ভালবাসতে তাদের কেউ পারবে না। আমি তোমার ক্রীতদাসী, তোমার রক্ষিতা আর তুমি আমার রাজা। আমার জীবনের পরম ধন। তুমি সুন্দর, তুমি সদাশয়, তুমি শক্তিমান।

কিন্তু এম্মা এসব কথা রুডলফ্‌কে এতবার এর আগে বলেছে যে এসব কথার মধ্যে আর কোন গুরুত্ব খুঁজে পায় না রুডলফ্‌। সে ভাবে এম্মা তার অন্যান্য প্রেমিকাদেরই একজন। তার মধ্যে যেটুকু অভিনবত্ব ছিল তা সব ক্রমে উবে গেছে। রুডলফের মত বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের পক্ষে এটা বুঝতে দেরী হলো না যে সব প্রেমাবেগেরই এক চিরন্তন একরূপতা আছে। সব ক্ষেত্রেই সব প্রেম একই আবেগ প্রকাশ করে, একই ভাষায় কথা বলে। আবার অল্প দিনের মধ্যে তাদের সব অভিনবত্ব সব মনোহারিত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কারো মধ্যে কোন পার্থক্য সে খুঁজে পায় নি। তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে বারবনিতাদের মুখ থেকে এবং ভাল গৃহস্থ মেয়েদেব মুখ থেকেও অনেক প্রেমেব কথা শুনেছে। কিন্তু তাব শুধু এই কথাই মনে হয়েছে সেই সব কথা শুনে যে, যে কথার অলঙ্কার যত বেশী, যে প্রেমে যত রঙীন প্রতিশ্রুতির সংখ্যা বেশী, সেই প্রেমের অনুভূতি ও সততা তত বেশী সন্দেহজনক। কারণ আমাদের অন্তরাত্মার আসল ভাব, আসল কথা ও ঐশ্বর্য কোন ভাষায় ঠিকমত প্রকাশ করা যায় না। সব ভাষারই একটি স্বাভাবিক দীনতা বা অপূর্ণতা আছে যা আত্মার গভীরতার কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

আমাদের ভাষা হচ্ছে ফাটা কেটলির গানেব মতই অকিঞ্চিৎকর। সে গানে কোন তৃপ্ত থাকে না, তা দিয়ে নক্ষত্রকে নড়ানো যায় না।

কিন্তু এম্মার সঙ্গে প্রেম সম্পর্কের ক্ষেত্রে রুডলফ্‌ যতই উদাসীন থাকাব চেষ্টা করুক না কেন, সে একটা জিনিস ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে, এম্মার দেহটাকে তার এখনো প্রয়োজন আছে। এম্মার মনটা অর্থহীন আবেগের উচ্ছ্বাসে যতই ফানুসের মত ভরা থাক না কেন, তার দেহ সৌন্দর্যে তার অনেক জারজ লালসা তৃপ্ত হয়। আজকাল তার এই দেহতৃপ্তির ব্যাপারে আগের থেকে আরো তৎপর হয়ে ওঠে রুডলফ্‌। আগে যেটুকু লজ্জা বা কুণ্ঠার ভাব ছিল আজ তা ঝেড়ে ফেলে এম্মাকেও ক্রমশ ব্যভিচারিণী করে তুলছে। এদিকে রুডলফের প্রতি এম্মার আসক্তিও ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার অবৈধ প্রেমাবেগ ও অসৎ প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। আজ এমন এক মমতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে যার থেকে সে ক্রমাগত এক অবৈধ আবিল আনন্দ আকণ্ঠ পান করে যাচ্ছে, অথচ যার মধ্যে তার অন্তরাত্মা ডুবে আছে, বলির পশুর মত কাঁপছে।

এম্মার এই অবৈধ প্রেমাসক্তির আতিশয্য তার দৈনন্দিন আচরণের উপর

রীতিমত প্রভাব বিস্তার করল। তার চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল উজ্জ্বল, তার ভাষা হয়ে উঠল অকুণ্ঠ। সে আজকাল পাঁচজন লোকের সামনে ও রুডলফের সামনে সিগারেট খেতে লাগল। তাকে দেখে লোকে বলাবলি করত, মাদাম বোভারী ইচ্ছা করে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করছে। একদিন পুরুষের টাইটফিট পোষাক পরে এম্মা ঘোড়ার গাড়ি করে বেড়াতে যায়।

এম্মার ধরন ধারণ দেখে অনেকদিন পর চার্লসএর মা ছেলের বাড়িতে এসে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি চার্লসকে বকতে লাগলেন। কারণ তিনি অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন স্ত্রীর স্বাধীনতা খর্ব করতে হবে, তার উপন্যাস পড়া বন্ধ করতে হবে। বাড়ির চাকরদের মত স্বাধীনতা দিলেও চলবে না। কিন্তু তার মার এই সব উপদেশের কোনটিই মেনে চলেনি চার্লস।

অবশেষে একদিন ফেলিসিতেকে নিয়ে বাধল এক তুমুল ঝগড়া। আগের দিন রাত্রে চার্লসএর মা কি দরকারে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পায় তার পায়ের শব্দ পেয়ে প্রায় চল্লিশ বছরের একটা লোক হঠাৎ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। এম্মাকে তিনি এ খবরটা দিয়ে ফেলিসিতের নামে অভিযোগ করতেই এম্মা তাচ্ছিল্যভরে হাসতে লাগল। চার্লসের মা বললেন, যার নিজের নীতির কোন ঠিক নেই সে ঝি চাকরদের নীতির উপর নজর রাখবে কি করে?

একথায় এম্মাও রেগে গিয়ে বলল, আপনি কোন সমাজে ঘোরাফেরা করেন?

এম্মা এমন বেয়াদবি ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাকিয়ে রইল তার শাশুড়ীর দিকে যে চার্লসএর মা দারুণ রেগে গেল। বলল, ঝিএর দুর্নীতি সমর্থন করতে গিয়ে সে প্রকারান্তরে নিজের দুর্নীতিকেই সমর্থন করছে, তার সপক্ষে কথা বলছে।

চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ রাগের মাথায় উঠে পড়ল এম্মা এবং চিৎকার করে বলল, বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

চার্লস ঝগড়া শুনে ছুটে এসে এম্মাকে থামাবার চেষ্টা করল। বলল, এম্মা, চুপ করো।

তখন রাগের বশে এম্মা ও তার শাশুড়ী দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরে এম্মার কাছে চার্লস গেলে এম্মা তাকে রেগে বলল, কি সভ্যতা? অসভ্য চাষা কোথাকার।

এরপর চার্লস তার মার কাছে ছুটে গেল। তার মা তখন চিৎকার করে বলছে, ও মেয়ে দায়িত্বহীন, সংসারের অনুপযুক্ত।

অবশেষে চার্লসএর মা ঘোষণা করলেন তাঁর পুত্রবধূ তার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা না চাইলে তিনি তাদের বাড়ি থেকে এখনি চলে যাবেন। চার্লস তখন নিরুপায় হয়ে আবার গেল তার স্ত্রীর কাছে। তাকে বারবার তার মার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। একবার এম্মার সামনে নতজানু হয়ে

অনুনয় বিনয় করল। অবশেষে এম্মা বলল, ঠিক আছে, চাইব।

এম্মা এসে কোন জমিদার গৃহিণীর আত্মমর্যাদা ও গম্ভীর্যের সঙ্গে হাতটা তার শাশুড়ীর দিকে বাড়িয়ে দিল। কোন রকমে বলল, আমাকে ক্ষমা করুন মাদাম। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার উপর শুয়ে কাঁদতে লাগল বালিসে মাথা গুঁজে।

এর আগে তার সঙ্গে রুডলফের একটা কথা হয়। হঠাৎ যদি কখনো তাকে দরকার হয় তাহলে সে একখানা সাদা কাগজ তার ঘরের বা জানালার বাইরে সার্সির উপর ঝুলিয়ে দেবে। সে ইয়নভিলের বাজারে প্রায়ই আসে এবং এলে তা যদি দেখে তাহলে সে সোজা তাদের বাগানবাড়িতে চলে আসবে। বিছানায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে রুডলফের কথা মনে পড়ে গেল তার। এই দুঃসহ দুঃখের পরিবেশ হতে একমাত্র রুডলফ্‌ই তাকে উদ্ধার করতে পারে। একমাত্র রুডলফ্‌ই তার পরিত্রাতা। সেই কথামত এম্মা সেই সংকেতটা তার জানালায় টাঙিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। কিছু কম ঘণ্টাখানেক পর সত্যিই তাদের বাগানে এসে হাজির হলো রুডলফ্‌। সে গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল।

এম্মা ছুটে গিয়ে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রুডলফ্‌ তাকে সাবধান করে দিল, বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

এম্মা তখন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি যদি কি অবস্থার মধ্যে আজ আমাকে পড়তে হয়েছিল তা জানতে। এই বলে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা এবং তার সঙ্গে কিছু অতিশয়োক্তি মিশিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করল এম্মা।

অতশত কথা মনে রাখতে পারল না রুডলফ্‌। প্রায়ই মূল ঘটনার সুতোটা হারিয়ে যেতে লাগল। এম্মাকে সে উপদেশ দিল, ধৈর্য ধরো, প্রিয়তমা, সাহস অবলম্বন করো। আনন্দ করো। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি ত চার বছর ধরে ধৈর্য ধরে আসছি। আর কত ধৈর্য ধরব? কত কষ্ট করব? আমি সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছি। আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আমাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করো।

রুডলফ্‌কে জড়িয়ে ধরল এম্মা। তার জলভরা চোখ দুটো সমুদ্রগর্ভস্থ আগুনের মত জলজল করছিল। তার দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ওঠানামা করছিল। এ অবস্থায় এম্মাকে দেখতে সত্যিই খুব ভাল লাগছিল রুডলফের। রুডলফ্‌ তাকে বলল, এখন বল কি করতে হবে। কি করতে হবে আমায়?

এম্মা বলল, আমাকে উদ্ধার করো। আমার অনুরোধ, আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

এই কথা বলে এম্মা তার ঠোঁটদুটো রুডলফের ঠোঁটের উপর জোরে চেপে ধরল। রুডলফের যে সম্মতি সে সহজভাবে পাচ্ছে না সে সম্মতি যেন সে চুম্বনের মাধ্যমে তার মুখ থেকে বার করে নিতে চায়।

রুডলফ্ এবার বলল, কিন্তু…

এম্মা বলল, কিন্তু কিসের ?

তোমার বাচ্চা মেয়েটার কি হবে ?

কিছুক্ষণ ভেবে এম্মা বলল, ওকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। এইটাই হলো একমাত্র পথ।

এমন সময় এম্মাকে কে ডাকতে সে তাড়াতাড়ি রুডলফের কাছ থেকে চলে গেল। এম্মা চলে গেলে রুডলফ্ ভাবতে লাগল, কি অদ্ভুত মেয়ে !

এরপর কয়েকদিন ধরে এম্মাকে লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল চার্লসএর মা। এম্মার কোন কাজে মন নেই, উৎসাহ নেই। সে যেন ঔদাসীন্যের এক মূর্ত প্রতীক।

কিন্তু তার এই ঔদাসীন্য কি নূতন কোন ছলনা, তার কোন গোপন মতলবকে ঢেকে রাখার এক কৌশলমাত্র ? অথবা এ এক বৈরাগ্যের প্রস্তুতি যে সুখ যে দুঃখ সে ত্যাগ করে দূরে চলে যেতে চাইছে সেই সব সুখ দুঃখের এক তিক্তমধুর আস্বাদন সে কি এক নীরব অবকাশের মধ্য দিয়ে শেষবারের মত গ্রহণ করতে চাইছে ? অথবা সে তার কল্পিত ভবিষ্যৎ সুখের আস্বাদনে আগে থেকেই বিভোর হয়ে উঠতে চায়। আজকাল রুডলফের সঙ্গে দেখা হলে সে কোন কথা বলে না, শুধু তার ঘাড়ের উপর মাথা রেখে কি যেন ভাবতে থাকে। এক অলস চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে।

এক এক সময় আপন মনে এক স্বপ্নাবেশের সঙ্গে বলতে থাকে, একবার ভেবে দেখ দেখি যখন আমরা ঘোড়ার গাড়িতে করে এখান থেকে চলে যাব তখন কি মনে হবে। যখন আমাদের ঘোড়ার গাড়িটা চলতে থাকবে তখন আমার মনে হবে আমরা যেন বেলুনের উপর ভর করে আকাশে মেঘের মধ্য দিয়ে উড়ে চলেছি। সেদিন কবে আসবে তার জন্য মুহূর্ত গণনা করছি আমি। তুমি তা করছ না ?

মাদাম বোভারীকে এত সুন্দর এর আগে কখনো দেখায়নি। বাইরের বাস্তব অবস্থার ও মানুষের চিত্তাবস্থার সহজ সাযুজ্যজনিত সুখবোধ হতে যে সৌন্দর্য স্বাভাবিক ভাবে স্ফুরিত হয় আজ সেই সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এম্মার দেহমন। সেই অবর্ণনীয় সৌন্দর্য যতই দেখে রুডলফ্ ততই অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। রোদ বৃষ্টি আলো হাওয়া ও বিভিন্ন রকমের সার প্রভৃতি বিচিত্র উপাদানের সুষম সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ফুল্ল কুসুমিত কোন গাছের মতই সুখ দুঃখ ও কামনা বাসনার বিচিত্র আবেগ অনুভূতির সমন্বয়ে এক পুষ্পিত পূর্ণতায় ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এম্মার সমগ্র সত্তাটি।

চকিতমদির কোন দৃষ্টিক্ষেপণকালে এম্মা যখন তার চোখের পাতাগুলোকে অর্ধমুদ্রিত করে তখন তা অপূর্ব লাগে। তার নাসারন্ধ্র হতে স্ফুরিত গভীর দীর্ঘশ্বাসগুলো আলতো ছায়ায় ঢাকা তার ঠোঁটের কোণগুলোকে বড় সুন্দরভাবে

বুলিয়ে দেয়। তার ঘাড়ের পাশে বিন্যস্ত চুলের গোছাগুলোকে দেখে মনে হয় যেন প্রণয়কলানিপুণ কোন শিল্পী এই এম্মার কেশপাশকে এভাবে বিন্যস্ত করে এক ছলকলাবিলাসজাল বিস্তার করে রেখেছে। আগের থেকে অনেক মেদুর হয়ে উঠেছে তার কণ্ঠস্বর। তার পোষাকের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে তার অঙ্গলাবণ্যের এক সূক্ষ্ম গভীর আবেদন ঢেউএর মতই উত্তাল হয়ে ওঠে।

চার্লসএর কাছেও এ আবেদন অনিবারণীয় হয়ে ওঠে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম এম্মাকে যেমন সুন্দর দেখাত আজ তাকে আবার তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছে। সেদিন রাত্রি প্রায় দুপুরের সময় চার্লস বাড়ি ফিরে দেখল এম্মা তখন ঘুমোচ্ছে। তা দেখে এম্মাকে আর জাগাল না চার্লস। বিছানার পাশে তার বাচ্চা মেয়ের দোলনাটার উপর দৃষ্টি পড়ল তার। পোর্সিলেন লাইটের এক আলোকবৃত্ত দোলনার মশারিটার উপর পড়ায় সেটাকে অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা এক ফুলে ওঠা সাদা কুঁড়েঘরের মত দেখাচ্ছিল। চার্লস তার মেয়ের চটি জোড়ার দিকে তাকাল। তার মনে হলো সে তার মেয়ের মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এবার সে তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছে। প্রতিটি ঋতুতেই এবার থেকে তার দেহের এক একটি পরিবর্তন দেখা দেবে। এখন সে গ্রাম্য স্কুলে পড়ে। রোজ বিকালে এক কলহাস্যে মুখর হয়ে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে। এরপর তাকে বাইরের কোন বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে হবে। কিন্তু তার খরচ কি করে বহন করবে কিছু ভেবে পেল না চার্লস। একবার সে ভাবল শহরের একপ্রান্তে ছোটখাটো একটা খামার ভাড়া নেবে। সেটা সে রোজ সকালে রোগী দেখতে বেরিয়ে সেই পথে গিয়ে দেখাশোনা করবে। তার আয় থেকে যা পাবে তা পাঠিয়ে দেবে তার মেয়ের পড়ার জন্য। তার আয়টা সে আলাদা করে ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখবে। তাছাড়া তার চিকিৎসা ব্যবসায়ও পরে আরো উন্নতিলাভ করবে। সে যেমন করে হোক বার্থেকে সুশিক্ষা দান করবেই। তাকে পিয়ানো বাজানো শেখাবে। পনের বছর বয়সে বার্থেকে সত্যিই কত সুন্দর দেখাবে। সত্যিই সে তার মার মতই সুন্দরী হয়ে উঠবে। তারা মা ও মেয়েতে যখন পাশাপাশি হাঁটবে তখন দূর থেকে তাদের দুই বোন বলে মনে হবে। সে বড় হয়ে রাত পর্যন্ত সেলাই করবে। সে ঘর সংসারের কত কাজ করবে। বাড়িঘর দেখাশোনা করবে। তাদের জীবনকে মধুর করে তুলবে তার গুণের দ্বারা। তারপর বার্থের বিয়ের কথাটাও ভাবল চার্লস। একদিন এক ভাল ছেলে দেখে তার বিয়ে দিতে হবে যে তাকে সুখী করবে। এক স্থায়ী সুখে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তার জীবন।

এম্মা কিন্তু ঘুমোয় নি। এরকম সময় সে ঘুমোয় না। সে শুধু ঘুমোবার ভাণ করে শুয়ে ছিল। চার্লস ভাবতে ভাবতে তার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগল এম্মা।

এ স্বপ্ন এক সপ্তাহ ধরে দেখে আসছে এম্মা। স্বপ্ন দেখে চারটি ঘোড়ায় টানা

একটি গাড়ি তাকে ও রুডলফ্‌কে এমন এক দুর অজানা দেশে নিয়ে যাচ্ছে যেখান থেকে কোনদিন আর ফিরবে না তারা। গাড়ি ক্রমাগত ছুটে চলেছে আর তার মধ্যে তারা দুজনে বসে আছে হাত ধরাধরি করে। মুখে কেউ একটা কথাও বলছে না। মাঝে মাঝে সে গাড়ি যখন কোন পাহাড়ের উপর দিয়ে যায় তখন সেখান থেকে কত অট্টালিকা, সেতু, জাহাজ, বন্দর সমন্বিত এক একটা সুন্দর সাজানো শহর দেখতে পায় তারা। দেখতে পায় লেমন বনে ঘেরা বড় বড় গীর্জার মর্মর প্রস্তর মণ্ডিত চূড়া। এখানে গাড়ির গতিটা সহসা মন্দীভূত হয় কারণ পথ সেখানে উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। সে পথে ছড়িয়ে আছে কত ফুল। তাদের আগমন উপলক্ষে এই সব ফুলের অঞ্জলি দিয়ে তাদের বরণ করছিল লাল বক্ষাবরণী পরিহিত মেয়েরা। গাড়ির ঘণ্টাধ্বনি ও ঘোড়াদের হ্রেষারবের সঙ্গে এক গীটারের সুর ও পথের ধারের ঝর্ণার গান মিলে মিশে অদ্ভুত এক সুর সমন্বিত ঝঙ্কারের সৃষ্টি হবে। এইভাবে তারা এক জেলেদের গাঁয়ে গিয়ে উঠবে যেখানে পাহাড়ের ধারে অসংখ্য জাল রোদে শুকোনর জন্য পাতা আছে। পাহাড়ের ধারে আছে সারবন্দী অনেক কুটির। এই ধরনের একটি কুটিরেই তারা থাকবে।

গাড়িটা গিয়ে যেন সেই কুটিরের সামনে গিয়েই থেমে গেল। একটি উপসাগরের ধারে এক পাহাড়ের কোলে থাকবে তাদের ছোট্ট কুঁড়েটা। তারা নৌকোয় করে হ্রদে প্রায়ই বেড়াবে। দুজনে সাঁতার কাটবে। রেশমী কাপড়ের মতই তাদের জীবন হবে মসৃণ। নক্ষত্রখচিত আকাশের দ্বারা আচ্ছন্ন এই রাত্রির মতই তাদের সেই নতুন জীবন হবে মধুর উত্তাপে নিবিড়। সে জীবনের সামনে কোন বাধা থাকবে না। সে জীবনের দিনগুলো হবে সমুদ্রতরঙ্গের মতই সমান, তারতম্য বিহীন। দিগন্তব্যাপী নীল সমুদ্রের মতই তাদের সে জীবনের প্রসারিত ভবিষ্যতের সব কিছুই হবে মুক্ত, অবাধ, সঙ্গতিপূর্ণ ও উজ্জ্বল।

এই সময় বাধা পড়ে এম্মার স্বপ্নে। হয় বাচ্চাটা দোলনায় কাশতে থাকে অথবা চার্লসএর নাকটা ডাকতে থাকে। তবু কিন্তু ঘুম আসে না এম্মার। এইভাবে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভোর হয়ে আসে। জানালার কাচের সার্সিতে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। জাস্টিন ওষুধের দোকানের দরজা খোলে।

এম্মা একদিন মঁসিয়ে লেহুড়েকে ডেকে বলল তার একটা বড় ক্লোক চাই। ক্লোকটা বেশ লম্বা আর তার রংটা হবে ঘোরাল।

লেহুড়ে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা বোধহয় কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

এম্মা বলে, না···যাই হোক। আমি আশা করি শীগ্‌গির এটা পাব। আমি নির্ভর করতে পারি আপনার উপর?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল লেহুড়ে।

এম্মা বলল, আমার একটা বাক্সও চাই। বাক্সটা কিন্তু খুব ভারী হবে না।

লেহুড়ে বলল, আমি জানি আপনি কি চাইছেন।

এম্মা বলল, আর একটা হালকা ওভারনাইট ব্যাগ।

এরপর এম্মা তার হাতঘড়িটা চেন থেকে খুলে লেহুড়ের হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখুন, এটা থেকে যা পাবেন তাই দিয়ে যতটা পারেন জিনিসগুলোর দাম দিয়ে দেবেন।

লেহুড়ে প্রতিবাদ করল। বলল, এ আপনি কি করছেন মাদাম? এ ছেলেমানুষি করবেন না। আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের? আমি আপনাকে বিশ্বাস করি।

কিন্তু এম্মা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। অবশেষে বলল, ঘড়িটা না নেন ত চেনটা রেখে দিন।

চেনটা পকেটে পুড়ে নিল লেহুড়ে। লেহুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে তাকে আবার ডাকল এম্মা। ডেকে বলল, যে সব মালপত্রের অর্ডার দিলাম তা যেন এখানে আনা বা পাঠানো না হয়। এসব কিনে একটা দোকানে রেখে সেই দোকানের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাবেন। আমি নিজে না যাওয়া পর্যন্ত যেন কাউকে দেওয়া না হয়।

ঠিক হয়েছে ওরা পরের মাসেই এখান থেকে পালিয়ে যাবে। এম্মা বলবে সে রুয়েনে কিছু জিনিস কিনতে যাবে। বাকি সব ব্যবস্থা করে রাখবে রুডলফ্। সে পাসপোর্টের ব্যবস্থাও করে রাখবে এবং গাড়িতে সীট রিজার্ভ করে রাখবে। তাকে আগে থাকতে প্যারিসে চিঠি লিখে জানাতে হবে। প্যারিস থেকে মার্সাই পর্যন্ত একটা কোচ চাই তাদের। সেখান থেকে ওরা যাবে ইতালির জেনোয়া। প্রথমে এম্মা বাড়ি থেকে তার মালপত্র লেহুড়ের দোকানে আস্তে আস্তে পাঠিয়ে দেবে। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে রুয়েন। ফলে কারো কোন সন্দেহ হবে না। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনার মধ্যে বার্থের কোন উল্লেখ নেই। রুডলফ্ বার্থের কথাটাকে এড়িয়ে যেত বলে বোধহয় এম্মাও তার নাম আর আজকাল করে না। কিন্তু তাদের পরিকল্পনামত যাওয়া হয়নি। রুডলফ্ নির্দিষ্ট দিনের থেকে দু সপ্তা বেশী সময় চেয়েছিল। পরে তার কাজ সারতে দেরী হবে বলে আবার দু সপ্তার সময় নেয়। তারপর বলে তার শরীর খারাপ। তারপর সে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিল। এইভাবে আগস্ট মাস কেটে গেল। পরে ঠিক হলো ওরা ৪ঠা সেপ্টেম্বর সোমবার অতি অবশ্য রওনা হবে। সোমবারের আগে শনিবার একটু সকাল সকাল এল রুডলফ্।

এম্মা জিজ্ঞাসা করল, সব ঠিক আছে?

রুডলফ্ বলল, হ্যাঁ।

ওরা ফুলবাগানটা পার হয়ে গিয়ে বাগানের প্রাচীরের কাছে বসল। এম্মা বলল, তোমার মুখটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

না, বিষণ্ণ দেখাবে কেন?

রুডলফ্ এম্মার দিকে এমন করুণ ভাবে তাকাচ্ছিল যাতে তার মুখখানাকে

বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। এম্মা বলল, তুমি বিষণ্ণ কারণ তোমার প্রিয় সব কিছুকে ছেড়ে তোমায় চলে যেতে হবে। আমি তা বুঝি। আমার কিন্তু ছেড়ে যাবার মত কিছুই নেই। জগতে আমার কিছু নেই। তুমিই আমার সব। আর আমি হব তোমার। তোমার পরিবার, তোমার দেশ সব। আমি তোমার দেখাশোনা করব। তোমাকে ভালবাসব।

এম্মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রুডলফ্ বলল, সত্যিই তুমি কি সুন্দর!

এম্মা হেসে বলল, সত্যিই কি আমি তাই? শপথ করে বল ত তুমি আমায় ভালবাস কি না।

সত্যিই আমি তোমায় ভালবাসি প্রিয়তমা।

নদীর ওপারের প্রান্তরটার শেষ প্রান্তে ঘোর লাল একটা থালার মত মাটি থেকে হঠাৎ চাঁদটা বেরিয়ে এল যেন। কতকগুলো পপলার গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে চাঁদটা ওদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল আকাশে। পরে বাধামুক্ত হয়ে কিরণ দান করতে করতে উজ্জ্বল করে তুলল আকাশটাকে। তারপর চাঁদটা খণ্ড খণ্ডভাবে প্রতিফলিত হতে লাগল নদীর বীচিবিক্ষুব্ধ বুকে। নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলোর উপর চাঁদের রূপালি আলোকমালা ছড়িয়ে পড়ায় সেগুলোকে কিলবিল করতে থাকা অসংখ্য মুণ্ডহীন সাপের মত দেখাচ্ছিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে উঠতে লাগল তাদের চারদিকে। চারদিকের গাছের ছায়ায় জটিল হয়ে উঠল অন্ধকার। শান্তশীতল বাতাসে অর্ধমুদ্রিত চোখে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল এম্মা। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল যেন ওরা প্রবহমান নদীর মত এক নীরব পূর্ণতায় বয়ে যাচ্ছিল ওদের মন। ফুলের গন্ধ ভরা মন্দমন্থর বাতাসের মত অতীত সুখের মধুর অভিজ্ঞতাগুলো ঘুরতে ঘুরতে তাদের অন্তরে এসে অন্তরগুলোকে ভারী করে তুলল। শিশিরভেজা ঘাসের উপর নুয়ে পড়া উইলো গাছের ছায়ার থেকেও লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে সে অভিজ্ঞতার মাধুর্য আচ্ছন্ন করে ফেলল তাদের স্মৃতিকে।

রুডলফ্ এক সময় বলে উঠল, কি চমৎকার দৃশ্য!

এম্মা বলল, আমরা আরো অনেক এ ধরনের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করব।

তারপর আপন মনে বলতে লাগল এম্মা, সত্যিই ভ্রমণের ব্যাপারটা কত আনন্দের। কিন্তু আমার মনে দুঃখ কিসের? এটা কি অজানার ভয়, না অভ্যস্ত জীবনের সব কিছুকে ছেড়ে যাওয়ার একটা ব্যথা। না না, এসব কিছু নয়, এ দুঃখ আসন্ন সুখের আতিশয্য থেকে উদ্ভূত এক চেতনা ছাড়া কিছুই নয়। সত্যিই আমার মনটা কত দুর্বল। ক্ষমা করো আমায়।

রুডলফ্ বলল, এখনো সময় আছে, ভাল করে ভেবে দেখ। পরে তোমায় দুঃখ করতে হতে পারে।

এম্মা জোর দিয়ে বলল, কখনই না।

এম্মা তারপর রুডলফের আরো কাছে সরে এসে বলল, কি ক্ষতি আমার হতে পারে? কিসের দুঃখ? আমি ত কোন মরুভূমি, পাহাড় বা সমুদ্র পার হচ্ছি না তোমার সঙ্গে। আমরা শুধু দুজনে একসঙ্গে বাস করব। আমাদের সেই চির-মিলনাবদ্ধ জীবন অন্তহীন অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনের মত দিনে দিনে মধুর হতে মধুরতর হয়ে উঠবে। কোন দুঃখ বা জ্বালা যন্ত্রণা বা চিন্তাভাবনা বাধা সৃষ্টি করবে না আমাদের পথে। কেউ বিরক্ত করবে না আমাদের। আমরা দুজনে থাকব সম্পূর্ণ একা। বল প্রিয়তম, যা হোক কিছু বল।

এম্মার কথার ফাঁকে ফাঁকে রুডলফ্ শুধু 'হ্যাঁ,' 'হ্যাঁ,' বলে যাচ্ছিল। এম্মা তার আঙুলগুলো রুডলফের চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ছিল। তবু সে ছেলেমানুষের মত রুডলফের নামটা বারবার উচ্চারণ করে যাচ্ছিল। বলছিল, রুডলফ্—রুডলফ্। আমার প্রিয়তম রুডলফ্।

রাত্রি দুপুর হয়ে উঠল। এম্মা বলল, এখন মধ্যরাত্রি। আর শুধু কালকের দিনটা। মাঝখানে মাত্র একটা দিন।

রুডলফ্ যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে এম্মা জিজ্ঞাসা করল, পাস-পোর্ট যোগাড় করেছ?

হ্যাঁ।

কোন কিছু ভুলে যাওনি?

না।

এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

সম্পূর্ণ।

তুমি দুপুরবেলায় হোটেল দ্য প্রোভেন্সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে?

রুডলফ্ ঘাড় নাড়ল।

শেষবারের মত চুম্বন করে এম্মা রুডলফকে বলল, তার আগে আর আমাদের দেখা হচ্ছে না।

রুডলফ্ চলে গেল। এম্মা তার পথপানে তাকিয়ে রইল। নদীটা পার হয়ে ওপারের প্রান্তরটার উপর দিয়ে পিছন ফিরে না তাকিয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল রুডলফ্। কিছুক্ষণ পর একবার প্রান্তরের ধারে কয়েকটা গাছের কাছে একবার থামল। পিছন ফিরে দেখল, সাদা পোষাক পরা এম্মার চেহারাটা চাঁদের আলোর মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। হঠাৎ তার অন্তরটা এমন ভারী হয়ে উঠল যে রুডলফ্ একটা গাছকে ধরে না ফেললে পড়ে যেত। নিজের মনে সে বলতে লাগল, আমি কি বোকা! তবে মেয়েটা সত্যিই সব দিক দিয়ে ভাল স্ত্রী হিসাবে। এম্মার দেহসৌন্দর্য আর তাদের এতদিনের ভালবাসার আনন্দের কথা সব মনে পড়ল তার একে একে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারল রুডলফ্।

আপন মনে বলতে লাগল রুডলফ্, যাই হোক, আমি বিদেশে কখনো ওর সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে পারি না। সন্তানের বোঝায় ভারাক্রান্ত হতে চাই না আমি। তাতে কষ্ট আছে, টাকা খরচ আছে—দুটোরই ঝুঁকি আছে। না না তা কখনই হতে পারে না। এটা হবে একেবারে বোকামির কাজ।

১৩

বাড়িতে পৌছেই টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে লাগল রুডলফ্। কিন্তু হাতে কলম নিয়ে কি লিখবে ভেবে পেল না। তাই ভাবতে লাগল। সহসা তার মনে হলো এম্মা যেন অনেক দূরে চলে গেছে। সে তার মনে মনে এইমাত্র যে সংকল্প গ্রহণ করেছে সে সংকল্প এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তাদের দুজনের মধ্যে।

এম্মার কিছু স্মৃতির জন্য বিছানা থেকে উঠে একটা আলমারী থেকে একটা ছোট বাক্স বার করল। তার মধ্যে তার যত সব প্রেমিকাদের চিঠিপত্র ছিল। বাক্সটা থেকে স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ আসছিল। তার মধ্যে কিছু শুকনো গোলাপও ছিল। প্রথম যে জিনিসটার উপর চোখ পড়ল রুডলফের তা হলো এম্মার একটা রুমাল। রুমালটাতে ছিটে ফোঁটা রক্তের দাগ। একদিন ওরা যখন বেড়াচ্ছিল তখন হঠাৎ এম্মার নাক থেকে রক্ত পড়তে থাকে। তারই দাগ লাগে রুমালে। কিন্তু সেই ঘটনা সম্বন্ধে আর কিছু মনে নেই তার। এর পর এম্মার দেওয়া একটি ছোট প্রতিমূর্তি দেখতে পায় রুডলফ্। এর পর এম্মার একটা ছবি দেখতে পেল। ছবিটা কোন এক শিল্পীর হাতে আঁকা। সঙ্গে সঙ্গে এম্মার চেহারাটাও হুবহু মনে ভেসে উঠল তার। এম্মার কিছু চিঠি বাক্সটার উপরের দিকে ছিল। এগুলোতে আছে শুধু পালিয়ে যাবার পরিকল্পনার কথা। প্রথম দিককার চিঠিগুলো বাক্সের তলায় পড়ে আছে। সেগুলো বার করতে হলে অনেক কিছু সরাতে হবে। রুডলফ্ দেখল কত শুকনো ফুল, পিন, মেয়েদের উপহার দেওয়া মাথার চুলের গোছা ছড়িয়ে রয়েছে বাক্সটায়। অনেক মেয়ের চিঠিও রয়েছে। বিভিন্ন চিঠিতে বিভিন্ন রকমের হাতের লেখা। কোন চিঠিতে আছে উচ্ছ্বসিত প্রেমের কথা, কত আবেগের অভিব্যক্তি, কোন চিঠি সাধারণ মামুলি কথায় ভরা, কোন চিঠি আবার বিষাদ আর হতাশায় ভরা। কোন চিঠিতে কেউ তার প্রেম ভিক্ষা করেছে, কেউ কিছু টাকা চেয়েছে। কোন চিঠি দেখে তার কারো মুখ মনে পড়ল, কোন চিঠি দেখে কারো কণ্ঠস্বর ভেসে এল তার কানে। কোন চিঠি দেখে আবার কিছুই মনে হলো না।

এই সব মেয়েদের স্মৃতিগুলো তার মনের মধ্যে এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে গেল যে সবাইকে এক মনে হতে লাগল, কারো কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ল না তার। মনে হলো সব চিঠিই এক, সব মেয়েই এক। সব চিঠিতে আছে একই কথা, বিভিন্ন আবেগানুভূতির মাধ্যমে একই প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ। চিঠিগুলো

খেলাচ্ছলে এ হাতে ও হাতে লোফালুফি করতে লাগল রুডলফ্। তারপর নিজের মনে বলল, কি নির্বুদ্ধিতার কাজ!

এইভাবে তার সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে একটা মন্তব্যের মধ্যে তার আসল অভিমত ব্যক্ত করল। স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুলের মাঠে খেলা করতে করতে পায়ের চাপে যেমন মাঠের জমিটাকে ঊষর করে দেয় এবং সেখানে কোন ঘাস গজাতে পারে না তেমনি একসঙ্গে অনেক সঙ্গিনী রুডলফের অন্তরের জমিটা দাপাদাপি করে তার সবটুকু মেদুরতা ও উর্বরতা নষ্ট করে দিয়েছে এমনভাবে যে সেখানে কোন সবুজ ঘাস কোন দিন জন্মাতে পারবে না।

নিজেকে নিজে রুডলফ্ বলল, এবার এস, কাজের কাজ করো।

রুডলফ্ লিখতে বসল। লিখল, সাহস অবলম্বন করো এম্মা। তোমার জীবনকে এভাবে নষ্ট করো না।

এর পর নিজেকে নিজে বলল রুডলফ্, আমি সততার সঙ্গে তারই স্বার্থটা দেখছি। তুমি কি তোমার সিদ্ধান্তের কথাটা কখনো গভীরভাবে ভেবে দেখেছ? তুমি কি বুঝতে পারছ কোন অতল গর্ভে আমি তোমাকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম। তুমি তা বোঝনি। তুমি শুধু ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্নে বিভোর। অলীক আশা আর আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে এগিয়ে যেতে চাও।...হায়, সত্যিই আমরা কত অসহায় প্রাণী। কত নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

এইবার রুডলফ্ একটু থামল। এম্মাকে ঠেকিয়ে রাখার কোন অজুহাত খুঁজতে লাগল। একবার আপন মনে বলল, আমি তাকে বলতে পারতাম আমারও সব টাকাকড়ি খোয়া গেছে।...না, একথা তার মনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সব ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে হবে আমায়। তবে এই ধরনের মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়ে আনার কোন উপায় আছে কি?

রুডলফ্ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর লিখতে লাগল, বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে কখনো ভুলব না। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ বেড়ে যাবে ক্রমশঃ। গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠবে দিনে দিনে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন আমাদের প্রেমের সকল উত্তাপ শীতল হবেই। কে জানে হয়ত আমি আমার চোখের সামনে একদিন দেখব তুমি অনুশোচনা করছ এই প্রেমের জন্য এবং তা দেখে আমার মনেও দুঃখ জাগবে। কারণ তোমার সে অনুশোচনার মূল কারণ আমি। তোমার ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা আমার পক্ষে চিন্তা করাটাও দুঃখের। আমাকে ভুলে যেও এম্মা। কেন যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল? কেন তুমি এত সুন্দর হয়েছিলে? এ দোষ কি আমার? ঈশ্বরের নামে বলছি তা নয়। এই সব কিছুর জন্য একমাত্র দায়ী হচ্ছে ভাগ্য। আমাদের নিয়তি।

রুডলফ্ বলল, ভাগ্য বা নিয়তি, এইটাই চরম কথা। এর উপর আর কথা নেই।

রুডলফ্ লিখল, আর পাঁচজন মেয়ের মত তোমার অন্তরটা যদি অগভীর হত তাহলে ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দিতাম আমি, বাধা দিতাম না তাতে যা ঘটার ঘটত। কিন্তু আমি তোমার অন্তরের যে সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতির পরিচয় পেয়েছি তাতে জেনে শুনে তোমাকে এক অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারি না। প্রথম দিকে আমি কথাটা ভাল করে ভেবে দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন এক বিষবৃক্ষের ছায়ার তলে শুয়ে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখে-ছিলাম; কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা করিনি।

রুডলফ্ এবার নিজেকে বলল, হয়ত ও ভাববে আমি তাকে ত্যাগ করছি। ও যদি আমার কথা না বোঝে ত যা করে করবে। তাতে আমার কি?

রুডলফ্ আবার লিখতে লাগল, এ জগৎ বড়ই নিষ্ঠুর এম্মা। আমরা যেখানেই যাব এ নিষ্ঠুরতা নির্মম ভাবে অনুসরণ করবে আমাদের। তুমি হয়ত অবান্তর প্রশ্ন, প্রচুর ঘৃণা, অপমান ও দুঃখ বিপর্যয়ের শিকার হবে ভবিষ্যতে। তুমি অপমানিত হবে আর সে অপমানের কারণ আমি একথা ভাবতেই পারি না আমি। যাকে আমি রাণী করে বসাতে চেয়েছিলাম তার অপমান সহ্য করতে পারবনা আমি। তাই আমি সরে যাচ্ছি এম্মা। হ্যাঁ আমি শাস্তি দিচ্ছি নিজেকে এইভাবে। আমি স্বেচ্ছা নির্বাসন ভোগের জন্য দূরে চলে যাচ্ছি। কোথায়? তা ত জানি না। আমার উন্মত্ত মস্তিষ্ক কোন উত্তরই দিতে পারে না এ বিষয়ে। বিদায় এম্মা। তুমি সুখে থাক। যে হতভাগ্য ব্যক্তিটি আজ তোমাকে হারাচ্ছে তাকে যেন ভুলো না। তোমার শিশুকন্যাকে আমার নামটা বলো। সে যেন তার প্রার্থনায় আমার নামটা অন্তর্ভুক্ত করে।

দুটো বাতি কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছিল রুডলফের পাশে। সে একবার উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর আবার টেবিলে এসে বসল। নিজের মনে মনে বলল, তাকে ঠেকিয়ে রাখতে এটাই যথেষ্ট। আর সে আমার পিছনে ছুটবে বলে মনে হয় না।

রুডলফ্ আরো লিখল, তুমি যখন এ চিঠি পড়বে তখন আমি বহু দূরে চলে যাব। যদিও তোমাকে আবার দেখার লোভ দুর্দমনীয়, তথাপি আমি থাকব না। আর তোমায় দেখব না। এখন দুর্বলতার সময় নয়। একদিন আমি ফিরে আসব এবং হয়ত তখন আমরা আমাদের বিগত প্রেমের কথা বলব অনাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মধ্যে একটা ব্যবধানকে বজায় রেখে। আমাদের আজকের এই প্রেম তখন হয়ে উঠবে অতীতের ব্যাপার। বিদায়। চিঠিখানা লিখে তার তলায় লিখল, তোমার বন্ধু। চিঠিটা আর একবার পড়ে দেখল রুডলফ্। দেখল ঠিক আছে। সহসা আবেগের সঙ্গে একবার ভাবল, আহা বেচারী, ভাববে আমার অন্তরটা পাথরের মত শক্ত। আমার কোন অনুভূতি বলে জিনিস নেই। তাই এই চিঠিটার উপর দু এক ফোঁটা চোখের জলের চিহ্ন থাকা দরকার। কিন্তু কান্নাকাটি আমার পক্ষে অসম্ভব।

রুডলফ্ তখন একটা গ্লাসে কিছু জল ঢেলে তাতে একটা আঙুল ডুবিয়ে দু একটা ফোঁটা চিঠিটার উপর ফেলে দিল। যেখানে পড়ল সেখানে কালিটা ছেবড়ে গেল। এরপর চিঠিটা মুড়তে গিয়ে এম্মার দেওয়া অমর প্রেমের স্মারকচিহ্নস্বরূপ আংটিটার উপর চোখ পড়ল তার। কিন্তু এই অবস্থায় এসব তার ভাল লাগল না মোটেই।

এর পর চিঠিটা মুড়ে দু তিনটে পাইপ খেয়ে শুতে গেল রুডলফ্।

পরদিন বেলা দুটো পর্যন্ত ঘুমোল রুডলফ্, তারপর একটা ফলের ঝুড়ির তলায় চিঠিটা রেখে তার খামারের জিয়ার্ড নামে একটা ছেলেকে এম্মাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তাকে শিখিয়ে দিল এম্মা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে তার মালিক কোথায় তাহলে সে যেন বলে সে বাইরে দূর দেশে কোথায় চলে গেছে।

সঙ্গে ঝুরিটা মাথায় করে ইয়নভিলের পথে চলে গেল জিয়ার্ড। বোভারীদের বাড়ি গিয়ে দেখল, মাদাম বোভারী রান্নাঘরে ফেলিসিতেকে কি একটা কাজে সাহায্য করছিল। তার সামনে গিয়ে ঝুরিটা নামিয়ে রেখে জিয়ার্ড বলল, আমার মালিক এটা পাঠিয়েছে।

তাকে দেখেই ভয়ে মুখটা শুকিয়ে গেল এম্মার। তার বিহ্বল ভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল জিয়ার্ড। এত ভাল উপহার পেয়েও মানুষ কেন খুশি হয় না তা বুঝতে পারল না সে। যাই হোক সে চলে গেল।

এম্মা ঝুড়িটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কোন রকমে পাতাওয়ালা ফলগুলো নামিয়ে রেখে চিঠিটা বার করল। তারপর সে চিঠিটা নির্জন কোন জায়গায় পড়ার জন্য ছুটতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাবে এমন সময় চার্লস তাকে ডাকল। কি কথা বলল। কিন্তু এম্মা কিছুই শুনতে পেল না। সে সোজা ছাদের ঘরে চলে গেল। সেখানে দারুণ রোদ আর গরম। তবু অতি কষ্টে চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়ল এম্মা। তার মনে হলো তার সামনের মাটিটা ফাঁক হয়ে গেলে সে তাতে সব ফেলে ঢুকে যাবে। ভাবল তার বাঁচার আর কোন অর্থ হয় না। সে যেন রুডলফ্‌কে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল, তাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছিল।

চিলের ছাদটা অনেক উঁচু। তার সামনে দিগন্তপ্রসারিত মাঠ। নদীর ওপারের প্রান্তরটা এখন জনমানবশূন্য। অদূরের একটা লোহার কারখানা হতে একটা একটানা আওয়াজ আসছিল। এছাড়া সব চুপচাপ।

এম্মা একেবারে ছাদের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে এক বিরাট শূন্যতা। নীল আকাশটা খুব কাছে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল নীল আকাশ থেকে একটা প্লাবন ছুটে আসছে। একের পর এক করে বাতাসের ঢেউ এসে লাগছিল তার মাথায়। এখন শুধু একটু ঝুঁকে পড়লেই হলো। কেন সে এই মুহূর্তে এ জীবন শেষ করবে না। কোন কারণে এই মৃত্যু হতে প্রতিনিবৃত্ত হবে তার কিছু খুঁজে পেল না সে।

এমন সময় হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর কানে এল তার পিছন থেকে। সে বুঝতে পারল চার্লস ডাকছে। চার্লস ব্যস্ত হয়ে বলছে, ওখানে কি করছ? নেমে এস। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল এম্মা। মৃত্যুর গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে যেতে জীবনের সব চেতনা হারিয়ে ফেলতে ফেলতে সহসা তার মনে হলো সে এখনো বেঁচে আছে। আর এই বোধের ফলেই হঠাৎ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পড়ল। তবু সে মৃত্যুর নেশায় এমনভাবে তার সব চিন্তা চেতনা আচ্ছন্ন ও অভিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে সে আর সেখান থেকে ফিরে আসতে পারছিল না। তার দেহটা যেন অবশ হয়ে পড়েছিল এবং সে সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি সব হারিয়ে ফেলেছিল।

হঠাৎ কে তাকে টানতে লাগল। পেছন ফিরে দেখল এম্মা, ফেলিসিতে তার হাত ধরে তাকে ডাকছে। বারবার বলছে, আসুন মাদাম, মঁসিয়ে এখনো খেতে পাননি। আপনি খাবেন আসুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত ফেলিসিতের সঙ্গে ছাদ থেকে নেমে খাবার টেবিলে এসে বসল এম্মা। খাবার চেষ্টা করল সহজভাবে। কিন্তু মুখ দিয়ে যাচ্ছিল না কোন খাবার।

হঠাৎ চিঠিটার কথা মনে পড়ল তার। তার কোলের উপর পড়ে থাকা রুমালের ভাঁজটা খুলতে লাগল এম্মা অকারণে। সব কিছু সে গুলিয়ে ফেলে-ছিল। সে কিছুতে মনে করে উঠতে পারল না কোথায় ফেলেছে চিঠিটা। আবার সে টেবিল থেকে হঠাৎ কোন অজুহাতে উঠে যেতেও পারছিল না। চার্লসকে ভয় লাগছিল তার। তার কেবলি মনে হচ্ছিল চার্লস বোধ হয় সব জেনে গেছে। সব বুঝতে পেরেছে।

হঠাৎ চার্লস বলল, মঁসিয়ে রুডলফ্‌কে আমরা কিছুদিন দেখতে পাব না। উনি বাইরে কোথাও চলে গেছেন বা যাচ্ছেন।

এম্মা চমকে উঠে বলল, কে বলল তোমায় একথা?

চার্লস বলল, আমি বাড়ি ঢোকার সময় জিয়ার্ডের সঙ্গে আমার দেখা হলো। এতে এম্মার কান্না পাচ্ছিল।

একটু থেমে চার্লস বলল, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। মঁসিয়ে রুডলফ্ ত প্রায়ই বাইরে যায়। অবস্থা ভাল, অবিবাহিত মানুষ। কোন পিছুটান নেই। তার উপর রুচিবোধ আছে।

ফেলিসিতে ঘরে ঢুকতেই থেমে গেল চার্লস। রুডলফের পাঠানো যে ফলগুলি ঝুড়ি থেকে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে দেয় এম্মা সেই এ্যাপ্রিকট ফলগুলো ফেলিসিতে কুড়িয়ে জড়ো করে তাদের খাবার টেবিলে কিছু সাজিয়ে দেয়। তার থেকে চার্লস দু একটা খেয়ে এম্মার দিকে তা এগিয়ে দেয়। বলে, দেখ দেখ, কি সুন্দর গন্ধ।

এম্মা ফলের ঝুরিটা ঠেলে সরিয়ে দিল। চার্লস তখন বলল, কিন্তু এর গন্ধটা বড় সুন্দর। আস্বাদ নিয়ে দেখ।

এম্মা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এ গন্ধে আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। এম্মার সঙ্গে সঙ্গে চার্লসও উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এম্মা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, না, কিছু না। স্নায়বিক দুর্বলতামাত্র, তুমি বস। ফলগুলো তুমি যা পার খাও।

এম্মার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল এই যে চার্লস হয়ত তাকে তার এই ভাবান্তর সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তার জন্য কিছু না কিছু করার জন্য জেদ ধরবে। কিন্তু এম্মা যা ভয় করেছিল তা হলো না। চার্লস কিছু প্রশ্ন করল না। এম্মার কথামত সে তার আসনে বসে ফল চিবোতে চিবোতে তার ছিবড়েগুলো একটা প্লেটে রাখতে লাগল।

হঠাৎ বসে থাকতে থাকতে ঘরের খোলা জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তায় চলমান একটা গাড়ি দেখে মূর্ছিত হয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে গেল।

এম্মা ঠিকই দেখেছিল। গাড়িতে রুডলফ্ই যাচ্ছিল। লা হুশেত্তের খামারবাড়ি থেকে রুয়েন যেতে হলে-ইয়নভিল গাঁয়ের ভিতর দিয়েই যেতে হবে। তাকে যেতে দেখে হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ে এম্মা।

এম্মা পড়ে যেতে একটা গোলমাল সৃষ্ট হয় বাড়িতে। খাওয়ার টেবিলে ধাক্কা লাগায় তাব থেকে প্লেটগুলো ছিটকে পড়ে। চেয়ারগুলো উল্টে যায়। জোর শব্দ হয়। বার্থে জোর কেঁদে ওঠে। ফেলিসিতে ছুটে আসে। গোলমাল শুনে হোমা ছুটে আসে দোকান থেকে। এসে একবার ব্যাপারটা দেখেই সে আবার দোকানে ছুটে যায়। ভিনিগারের শিশিটা এনে এম্মার নাকের কাছে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ফিরে আসে তার। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায়। চার্লস বলে, দেখ প্রিয়তমা, আমি চার্লস, তোমায় ভালবাসি। তোমার মেয়ে বার্থে, তাকে চুম্বন করো।

বার্থে তার মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এম্মা তাকে সরে যেতে বলল। বলল, আমাকে এখন একা থাকতে দাও।

এই কথা বলে এম্মা আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তখন ওরা তাকে ধরাধরি করে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

মুখটা খুলে ও চোখ দুটো বন্ধ করে চিৎ হয়ে তার বিছানায় শুয়েছিল এম্মা। শ্বেত মর্মরের মত তার দেহটা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়েছিল। শুধু তার দুটো চোখ থেকে দুটি জলের ধারা বালিশের উপর গড়িয়ে পড়ছিল নিঃশব্দে।

চার্লস বিছানার তলার দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। নীরবে লক্ষ্য করছিল এম্মাকে। সবাই চুপচাপ। অথচ সকলেই ভাবছে। এই ভাষাময় চিন্তাপূর্ণ নীরবতাটাকে এই গুরুগম্ভীর ঘটনার উপযুক্ত মনে হলো হোমার। হোমা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সে কথা বলল, আমার মনে হয় এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। বিপদটা কেটে গেছে।

চার্লসও বলল, হ্যাঁ, এখন ও ঘুমোচ্ছে। সেই স্নায়বিক রোগটার পুনরাবৃত্তি

ঘটল আর কি।

হোমা এবার ঘটনার আনুপূর্বিক পূর্ণ বিবরণ চাইল। এর পর সে মন্তব্য করবে। কি করে কি হলো সে তা জানতে চায়। চার্লস তখন তাকে বলল, কিছু না। সামান্য একটা এ্যাপ্রিকট ফল খেতে গিয়ে এইরকম হয়।

হোমা বলে উঠল, আশ্চর্য! তাহলে এ্যাপ্রিকট থেকেই এটা হয়েছে। এক একজন মানুষ এক একটা বিশেষ গন্ধ সহ্য করতে পারে না। এটা মানবদেহ ও হৃৎপিণ্ডের গবেষণার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যাজকরা মানবমনের উপর গন্ধের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটিকে বেশ কাজে লাগায়। তারা ধর্মীয় উৎসবের সময় এমন সব গন্ধদ্রব্য কৌশলে ব্যবহার করে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে যা উপস্থিত জনতার যুক্তিবোধকে বিকল করে তাদের মনে এক আধ্যাত্মিক ভাব ও প্রবল আবেগ জাগায়। নারীদের সংবেদন শক্তি আরো সূক্ষ্ম, তাদের মন এই সব গন্ধে বেশী সাড়া দেয়। এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা গেছে যেখানে মেয়েরা পশুর শিং পোড়ার গন্ধে ও টাটকা রুটির গন্ধে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে…

চার্লস সাবধান করে দিল হোমাকে, দেখবেন যেন না জাগে।

হোমা তবু বলে চলল, শুধু মানুষ নয়, এক এক বিশেষ গন্ধের দ্বারা এক একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এক ধরনের গন্ধ আছে যা বিড়ালরা সহ্য করতে পারে না। আবার আমার এক বন্ধুর একটা কুকুর ছিল যাকে নস্যির শিশিটা দেখালেই রাগে কাঁপতে শুরু করত।

চার্লস হোমার কোন কথা না শুনেই বলল, হ্যাঁ।

হোমা তবু থামল না। আবার বলতে শুরু করল হোমা, আমাদের মাদামের সংবেদনশক্তি আবার বেশী সূক্ষ্ম। সুতরাং সাধারণ ওষুধ ওর রোগ সারাবার জন্য দেওয়া চলবে না। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ওর মধ্যে কল্পনার উদ্রেক করলে ভাল হবে না?

চার্লস বলল, কিন্তু কি করে তা সম্ভব?

হোমা বলল, সেইটাই হলো সমস্যা। তবে আমি একটা ইংরেজি বইয়ে পড়েছি।

এমন সময় এম্মা জেগে উঠেই, 'আমার চিঠি' 'আমার চিঠি' বলে চিৎকার করতে লাগল।

কিন্তু ওরা ভাবল ভুল বকছে এম্মা। ভাবল এটা ব্রেন ফীভার বা মস্তিষ্কের জ্বর।

সেদিন থেকে তেতাল্লিশ দিন চার্লস নড়তে পায়নি এম্মার বিছানা থেকে। সে কোথাও যায়নি। এই তেতাল্লিশ দিনের মধ্যে সে কোন রোগী দেখতে যায়নি, নিজে ভাল করে বিছানায় শোয়নি। সব সময় এম্মার পাশে বসে কখনো তার হাতের নাড়ী টিপে ধরে থেকেছে, কখনো ঠাণ্ডা সেক দিয়েছে। ডাক্তার ল্যারিভিয়ের, ক্যানিভার প্রভৃতি বড় বড় ডাক্তারদের শহর থেকে ডেকে

এনে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। জ্ঞান ফিরে এলেও এম্মা কোন কথা বলতে পারত না, কোন বোধশক্তির পরিচয় দিতে পারত না। অথচ তার শরীরে কোথাও ব্যথা বেদনা ছিল না। মনে হচ্ছিল এক বিরাট বিপর্যয়ের পর এম্মার দেহ এবং মন দুটোই যেন এক নিবিড় নিশ্চিন্ত বিশ্রামে ঢলে পড়েছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি এম্মা বিছানার উপর বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসতে পারল। এম্মাকে জ্যাম দিয়ে রুটি খেতে দেখে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল চার্লসএর।

এর পর একটু একটু করে শক্তি ফিরে পেল এম্মা। বিকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা বিছানা ছেড়ে বাইরে বসত। একদিন চার্লস তাকে ধরে ধরে বাগানে বেড়াতে নিয়ে গেল। শুকনো পাতাভরা কাঁকড়ঢালা পথের উপর দিয়ে চার্লসএর কাঁধের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল এম্মা।

ওরা ধীরে ধীরে বাগানের শেষ প্রান্তে চলে গেল। পাঁচিলের ওপারে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল এম্মা। কিন্তু সেখানে পাহাড়ের উপর শুকনো ঘাস পোড়ানোর আগুন ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না।

এম্মাকে দূরে এভাবে কষ্ট করে তাকিয়ে থাকতে দেখে চার্লস বলল, এতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে প্রিয়তমা। দেখতে হবে না।

বাগানবাড়ির মধ্যে ধরে ধরে এম্মাকে নিয়ে এসে বেঞ্চের উপর তাকে বসতে বলল চার্লস। আরাম লাগবে।

কিন্তু এম্মা বলল, না, ওখানে নয়।

হঠাৎ এম্মার শরীরটা আবার খারাপ হয়ে উঠল। আবার রোগ দেখা দিল। কিন্তু এবার রোগটা আগের মত স্পষ্ট নয়। তবে আগের থেকে আরো জটিল। কখনো এম্মা বলে তার হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা করছে, কখনো বলে বুকে ব্যথা করছে। কখনো বলে মাথা ধরেছে, আবার কখনো বা বলে হাত পায়ে ব্যথা করছে। তবে সব সময় তার একটা বমি-বমি ভাব দেখা গেল। চার্লসএর এ জন্য ভয় করতে লাগল, তার বুঝি ক্যানসার হয়েছে।

এতসব রোগের উপর অর্থাভাব দেখা দিল। টাকার জন্য বিব্রত বোধ করতে লাগল বেচারা চার্লস।

১৪

প্রথমে চার্লস ভাবতে লাগল হোমার কথা। হোমার কাছ থেকে প্রচুর ওষুধ আনা হয়েছে, অথচ তার দাম দেওয়া হয়নি। হোমা অবশ্য দাম চায়নি এবং ডাক্তার হিসাবে তার খাতিরে ওষুধগুলোর দাম ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে যে বাধ্যবাধকতার ব্যাপার আছে চার্লস তার মধ্যে যেতে চায় না। এর জন্য অস্বস্তিবোধ করে চার্লস। তার উপর রাঁধুনি ফেলিসিতেই বাড়ির গৃহিণীর মত সংসার চালাচ্ছে, কেউ কিছু দেখে না। ফলে সংসার প

আগের চেয়ে বেড়ে গেছে ভয়ানকভাবে। দিনের পর দিন ঋণ জমা হচ্ছে। যে সব ব্যবসাদাররা জিনিসপত্র ধারে দিয়েছে তারা সবাই তাগাদা করছিল। সবচেয়ে চাপ দিচ্ছিল মঁসিয়ে লেহুড়ে। এম্মার রোগটা যখন বাড়তির মুখে তখন লেহুড়ে তার অর্ডার দেওয়া সেই জিনিসগুলো বাড়িতে পৌছে দিয়ে তার বিল হাজির করে টাকা চাইতে লাগল। একটা ক্লোক, একটা হালকা বিছানা রাখা ব্যাগ, দুটো বাক্স এবং আরো কিছু জিনিসএর বিল নিয়ে এল লেহুড়ে। চার্লস তাকে বারবার বলল, এসব জিনিসের কোন দরকার নেই তার তবু লেহুড়ে শুনল না। বলল, মাদাম এসব জিনিস অর্ডার দিয়েছে তাকে নিজের মুখে। সুতরাং এসব জিনিস চার্লসকে নিতেই হবে এবং কোন মতেই সে এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না।

তাছাড়া লেহুড়ে বলল এই সময় মাদাম যখন ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন তখন যদি তাঁর অর্ডার দেওয়া জিনিসগুলো ফেরৎ দেওয়া হয় তাহলে তাঁর উত্তেজনা বেড়ে উঠবে এবং তাতে মাদামের ক্ষতি হবে। মোট কথা লেহুড়ে তার অধিকার থেকে এক চুল নড়বে না। সে টাকা না পেলে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে। চার্লস জিনিসগুলো লেহুড়ের দোকানে ফেরৎ পাঠাতে বলেছিল। কিন্তু ফেলিসিতে কাজের চাপে তা নিয়ে যেতে ভুলে যায়। ফলে জিনিসগুলো বাড়িতেই পড়ে আছে। ব্যাপারটা একদিন আবার তুলল লেহুড়ে এবং নানা তর্ক বিতর্কের পর চার্লসকে দিয়ে ছয় মাসের এক চুক্তিপত্রে সই করিয়ে নিল।

সই করার সঙ্গে সঙ্গে চার্লসএর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এই সুযোগে সে লেহুড়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করার কথা ভাবল। সে লেহুড়েকে বলল যে কোন সুদে এক হাজার ফ্রাঁ সে ধার দিতে পারবে কি না। এক বছরে সে শোধ করে দেবে সে টাকা। লেহুড়ে সঙ্গে সঙ্গে দোকানে চলে গিয়ে এক হাজার ফ্রাঁ নিয়ে এসে আর একটা কাগজে লিখিয়ে সই করিয়ে নিল চার্লসকে দিয়ে। এক বছর পর তাকে মোট এক হাজার সত্তর ফ্রাঁ দিতে হবে। লেহুড়েকে এছাড়া জিনিসের দাম হিসাবে দিতে হবে একশো আশী ফ্রাঁ। এই গোটা ব্যাপারটা হতে লেহুড়ের মোট লাভ হবে একশো তিরিশ ফ্রাঁ। লেহুড়ে বেশ বুঝতে পারল এত ঋণ সব এক বছরে শোধ হবে না। সুতরাং ঋণের বহর এবং তার সঙ্গে সুদের বহর ক্রমশই বেড়ে যাবে আর তার ফলে তার দেওয়া সামান্য মূলধনটা কোন স্বাস্থ্যনিবাসে আরোগ্যেলাভরত রোগীর মত মোটা হয়ে উঠবে।

আসল কথা লেহুড়ের এখন ভাগ্যটা ভাল। সে এখন যার সঙ্গে যে কারবারে হাত দিচ্ছে তাতেই তার লাভ হচ্ছে। সব ব্যাপারেই সে জিতে যাচ্ছে।

এদিকে বিহ্বল হয়ে ভাবতে থাকে চার্লস। কিন্তু শত ভেবেও কিছু ঠিক করতে পারে না, এত টাকা একবছরের মধ্যে কি করে শোধ করবে। মস্তিষ্কে

বারবার আঘাত দিয়ে সে কয়েকটা উপায়ও খাড়া করে। কিন্তু কোনটাই গ্রহণযোগ্য হয় না। একবার ভাবে সে তার বাবার কাছে কিছু টাকা চাইবে অথবা তার কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে। কিন্তু পরে বুঝতে পারে তার বাবা তার একথায় মোটেই কান দেবেন না। আর তার এমন কোন সম্পত্তি নেই যা বিক্রি করে সে তার সব ঋণ শোধ করতে পারবে। ব্যাপারটা ক্রমশই জটিল হয়ে ওঠে এবং তার মনটাকে এম্মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনে। এটা বুঝতে পেরে নিজেকে ধিক্কার দেয় চার্লস। তার মনে হলো তার এই চিন্তা ভাবনাগুলো যেন নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কিত যা সে লুকিয়ে রেখেছে তার স্ত্রী এম্মার কাছথেকে। তাই সেই সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে আবার ফিরে এল এম্মার কাছে।

এবার শীতটা যেন খুব বেশী করে পড়ল। এম্মার আরোগ্যলাভের গতিটা বড় শ্লথ হয়ে উঠল। যেদিন আকাশটা পরিষ্কার থাকে সেদিন আর্ম চেয়ারটা জানালার ধারে পেতে এম্মাকে বসানো হয়। বাগানের প্রতি যেহেতু তার একটা প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা গেছে সেই হেতু বাগানের দিকের জানালাটা বন্ধ করে রাখা হয় যাতে বাগানটা তার চোখে না পড়ে।

একদিন কথায় কথায় এম্মা তার ঘোড়াটাকে বিক্রি করে দেবার কথা বলল। একদিন যে বস্তু আনন্দ দিত তাকে আজ তা আর ভাল লাগে না। আজ তার একমাত্র চিন্তা তার নিজের স্বাস্থ্যের জন্য। আজকাল সে বিছানায় বসেই তার স্বল্প খাবার খেয়ে নেয়। আর প্রতি পদে পদে ঝিকে ডাকতে হয়। এক একবার কোন কাজ না থাকলেও কিছু একটা কথা বলার জন্যও ডাকতে হয় ঝিকে।

এম্মাদের বাড়ির কাছে বাজারটার ছাদে প্রচুর বরফ পড়েছে। তার একটানা তুষারশুভ্র প্রতিফলনটা সব সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছে এম্মার ঘরখানাকে। তার উপর মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসে।

এম্মা রোজ সেই একই তুচ্ছ ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশা করে। সেই সব ঘটনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। সকালে বেরিয়ে গিয়ে চার্লস দুপুরে বাড়ি আসে খাবার জন্য। লাঞ্চ খেয়ে আবার বেরিয়ে যায়। তারপর বেলা পাঁচটা বাজতেই স্কুলের ছুটি হয় আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা বাড়ি ফিরে যায় তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। কিছুক্ষণের জন্য তাদের কলরবে ভরে যায় আশপাশের পথঘাট। তারপর আবার সব চুপ।

আজকাল গাঁয়ের যাজক মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েন প্রায়ই খবর নিতে আসেন এম্মার। এদিকে কোথাও গেলেই তিনি এম্মাদের বাড়ি চলে আসেন। তাঁর পোষাক দূর থেকে চোখে পড়লেই এম্মারও ভাল লাগে। মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েন এসে এম্মাকে প্রায়ই ধর্মের কথা শোনান। ঈশ্বর বিশ্বাসের কথা শোনান। প্রার্থনা করার কথা বলেন।

একদিন এম্মার রোগ যখন খুব বেড়ে যায়, যখন তার মনে হয় আসন্ন মৃত্যুর

মধ্যে সে ক্রমশই ঢলে পড়ছে তখন হঠাৎ সে যোগানুষ্ঠানের কথা বলে। তার ঘরের মধ্যেই সে অনুষ্ঠান হবে। হঠাৎ ঘরটা যেন পূজার বেদীতে পরিণত হয়ে উঠল। ফেলিসিতে ফুল নিয়ে এল। ঘর থেকে রোগীর ওষুধের শিশি বোতল সব সরিয়ে ফেলা হলো। ফোটা ফুল আর গন্ধদ্রব্যে ভরে গেল ঘরটা। এম্মার হঠাৎ মনে হলো তার সকল ব্যথা, সব দুর্বলতা, সকল ব্যথা বেদনার অনুভূতি মুহূর্তে উবে গেছে তার দেহ থেকে। আশ্চর্যভাবে মুক্ত ও হালকা হয়ে উঠেছে তার দেহমন। এম্মার মনে হচ্ছিল তার আত্মাটা যেন ক্রমশই স্বর্গের দিকে ঈশ্বরের কাছে উঠে যাচ্ছে। সারা আকাশ পৃথিবী ও তার উর্ধ্বলোককে ব্যাস্ত করে তার ঈশ্বর প্রেমটা যতই আয়ত বিশাল হয়ে উঠছে ততই তার আত্মাটা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। সে বুঝল এইভাবে নিজেকে না হারালে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তার বিছানার চাদরটায় পবিত্র জল ছিটোন হলো। পুরোহিত তার ধর্মীয় ক্রিয়াকাজ করতে লাগল। সেই পরম পবিত্রতায় পবিত্র দেহটা চুম্বন করার জন্য যত এম্মা তার ওষ্ঠাধরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ততই এক আধ্যাত্মিক আনন্দের অন্তহীন মাধুর্যে তার চেতনাটা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। বাইরে তখন সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে। ঘরের ভিতর দুটি মোমবাতি জ্বলছিল। এম্মার বিছানার চারপাশে ফুলে ওঠা মশারির কাপড়টার ভিতর দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে আসতে থাকা সেই শান্ত আলোটা এক পরম স্বর্গীয় দ্যুতির মত মনে হচ্ছিল এম্মার। হঠাৎ এম্মা অনুভব করল তার মাথাটা বিশাল শূন্যমণ্ডলে ভাসছে। সে শুনতে পাচ্ছে দেবদূতদের দ্বারা বাজানো বীণায় স্বর্গীয় সঙ্গীত। এম্মা দেখল আকাশের ওপারে স্বর্গের সিংহাসনে সবুজ তালপাতাধারী সাধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ষড়ৈশ্বর্যবান ঈশ্বর উপবিষ্ট হয়ে আছেন। তিনি বিশ্বজগতের পরম পিতারূপে পূর্ণগৌরবে সমাসীন সেই ঈশ্বরের ইংগিতে জ্বলন্ত পাখনাধারী দেবদূতেরা তাকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করতে লাগল।

এম্মার দেখা এই ছবিটা তার সারা জীবনের সকল স্বপ্নের থেকে মধুর। এ ছবি অক্ষয় হয়ে রইল তার স্মৃতিতে। এ ছবি প্রথম দেখার সময় তার মনে যে সংবেদন যে অনুভূতির সঞ্চার হয় কষ্ট করে সেই অনুভূতিগুলো মনে ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল এম্মা। এক খৃস্টীয় নম্রতার মধ্যে এক পরম শান্তি খুঁজে পেল তার গর্বোদ্ধত আত্মা। যে দুর্বলতা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণেরই নামান্তর সে দুর্বলতাকে বড় মধুর মনে হলো তার। সহসা নিজের মনকে অন্তর্যামী করে অন্তরের অতল গভীরে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে এম্মা দেখল সেই তলহীন গভীরে তার কামনাবাসনাগুলি বিলীন হয়ে যাচ্ছে একে একে। আজ এক বিরাট বিস্ময়ের সঙ্গে এম্মা প্রথম অনুভব করল এতদিন যে সুখ যে কামনা করে এসেছে সেই পার্থিব সুখের থেকে অনেক বড় এক পরম আনন্দ আছে। সে আরও বুঝল পার্থিব যে কোন প্রেমের থেকে অনেক বড় এক মহৎ প্রেম আছে যে

প্রেমের অবিচ্ছিন্ন ধারাটি কোনদিন স্তব্ধ হয়ে যায় না, কোনদিন শুকিয়ে যায় না, যে প্রেম অনন্তকাল ধরে শুধু বেড়ে চলে। এক অলীক আশা ও বিশ্বাসের আতিশয্যের বশে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে সে এমন এক অপার্থিব পবিত্র জগতের কল্পনা করল যে জগৎ পৃথিবীর উপরে থেকে আচ্ছন্ন করে আকাশের সঙ্গে মিশে থাকবে, যে জগতে সে স্থায়ীভাবে বাস করবে এ জগৎ ছেড়ে। সেন্ট হবার বাসনা জাগল তার মনে। তার ইচ্ছা হলো তার কাছে পান্নাখচিত একটি ক্রস থাকলে ভাল হত যা সে রোজ রাতে শোবার সময়ে ভক্তিভরে একটি চুম্বন করবে একবার করে।

এম্মার অন্তরের এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তবে তার মনে হলো এ পরিবর্তনের মূলে কোন গভীর ধর্মবিশ্বাস নেই। এর মধ্যে আছে শুধু লোকমুখে শোনা কথা আর আবেগ। তবু তিনি আশান্বিত হয়ে মঁসিয়ে বুলার্ড নামক এক পুস্তকবিক্রেতাকে চিঠি দিলেন সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন মেয়েদের পড়ার কিছু বই বাছাই করে যেন পাঠিয়ে দেন।

এই চিঠি পেয়ে মঁসিয়ে বুলার্ড একরাশ বইএর একটা প্যাকেট পাঠিয়ে দিলেন। তাতে নানারকমের ধর্মপুস্তক ও কিছু রোমান্টিক উপন্যাসও ছিল।

কিন্তু এত সব বই পড়ার মত মাদাম বোভারীর মনের অবস্থাটা তখনও গড়ে ওঠেনি তবু বইগুলো একটু একটু করে পড়তে লাগল এম্মা। ধর্মের বইএ এত সব বিধিনিষেধ পড়ে মন তার বিরক্ত হয়ে উঠল। যে অহমিকার সঙ্গে এই সব বইএর লেখকরা জনগণের নৈতিক দিকগুলোকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন তা তার মোটেই ভাল লাগল না। এম্মা আরও দেখল যে সব বইয়ে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ গল্প আছে সেই সব বইএর লেখকদের বাস্তব জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তবু আজ এম্মা এটা বেশ বুঝতে পারল যে সব মিলিয়ে এক ধর্মীয় প্রবণতা ও পরিবেশ গড়ে উঠেছে তার মনের মধ্যে। দেখল এক আধ্যাত্মিক বিষাদ বেলাশেষের স্তব্ধ ধূসর কুয়াশার মত আচ্ছন্ন করে আছে তার অন্তরের পটভূমিটাকে।

রুডলফের প্রতি ভালবাসাটাকে তার অন্তরের গভীরে কাবাওর মমির মত কবর দিয়ে রেখেছে। সমাহিত সেই অমর প্রেমের এক মিষ্টি সুবাস মাঝে মাঝে কবর থেকে বেরিয়ে এসে তার মনে বর্তমান আধ্যাত্মিক আবহাওয়াটাকে বড় মধুর করে তোলে। আজ সে চার্চে গিয়ে যে ভাষায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বরের কাছে আধ্যাত্মিক প্রেম নিবেদন করে, একদিন রুডলফের প্রতি এক অবৈধ প্রেমের আবেগ ব্যক্ত করল। কিন্তু এত প্রার্থনা করেও মনে কোন শান্তি বা আনন্দ পায় না এম্মা। ঈশ্বর তাকে পরম আনন্দ দান করেন না। যে বিশ্বাস, যে আত্মিক প্রশান্তি সে কামনা করে ঈশ্বরের কাছে তা সে পায় না। ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তার মন। মনে হয় সব কিছুই এক বিরাট প্রতারণা। তার এই আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার জন্য গর্ব অনুভব করে এম্মা। যে গর্বের

আতিশয্যে সে নিজেকে লা ভ্যালিয়েরের মত সেই সম্ভ্রান্তবংশীয় ধর্মীয় মহিলার সঙ্গে তুলনা করে যাঁরা তাঁদের সারা জীবনের অন্তরের ক্ষতদেশনিঃসৃত সকল অশ্রু খৃস্টের চরণে ঢেলে দেন।

এরপর পাগলের মত পরোপকারে ও দানশীলতায় মন দিল এম্মা। সে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য জামা সেলাই করে দিত। গরীবদের বাড়িতে জ্বালানি কাঠ পাঠিয়ে দিত। একদিন চার্লস বাড়ি ফিরে দেখল তিনজন অপরিচিত ভবঘুরে রান্নাঘরের টেবিলে বসে খাচ্ছে। এম্মার অসুখ বাড়লে তার মেয়ে বার্থেকে ধাত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল চার্লস। কিন্তু এম্মা তাকে আবার আনাল। তাকে পড়া শেখাতে লাগল। বার্থে পড়ার সময় কাঁদত। কিন্তু কিছুতেই ধৈর্য হারাত না এম্মা। রাগ দুঃখ সব ঝেড়ে ফেলে সে যেন সকলের প্রতি অদ্ভুত এক ঔদাসীন্য নীতি অবলম্বন করে চলেছে।

এম্মার ব্যবহার এত ভাল হয়ে গেছে যে আজকাল চার্লসএর মাও কোন দোষ ধরতে পারেন না তার। তবে তাঁর শুধু একমাত্র অভিযোগ এম্মা নিজের বাড়ির খাবারের ডিশ ঢাকা দেওয়ার তোয়ালেগুলো মেরামত না করে সেগুলো দিয়ে গরীবদের জন্য জামা সেলাই করেছে। আজকাল চার্লসএর মার স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার জন্য প্রায়ই ছেলের সংসারে চলে আসেন। তাছাড়া এম্মার মনের পরিবর্তনের ফলে আগের মত আর অশান্তি নেই এ সংসারে।

আজকাল তার শাশুড়ীর কাছে গাঁয়ের অনেক ভদ্রমহিলা রোজ বেড়াতে আসেন এম্মাদের বাড়িতে। তাঁদের মধ্যে আছেন মাদাম লাংলয়, মাদাম ক্যারঁ, মাদাম দুবরিউল, মাদাম তুভাশে, মাদাম হোমা, এরা সবাই রোজ বেড়াতে আসে। এম্মার শরীরের খোঁজ খবর নেয়। এদের মধ্যে মাদাম হোমা একমাত্র হিতাকাঙ্খিনী এম্মার। সারা গাঁ জুড়ে যখন তার সম্বন্ধে কলঙ্ক রটে তখন একমাত্র মাদাম হোমাই তা বিশ্বাস করেনি। জাস্টিন হোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসত। এম্মার শোবার ঘরের দরজার বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকত জাস্টিন। এম্মা তার দিকে লক্ষ্য না করেই আপন মনে চুল আঁচড়াত অথবা প্রসাধন করত। এদিকে তার আজানুলম্বিত কালো চুলের লাবণ্য দেখে অবাক হয়ে যেত জাস্টিন। এম্মা বুঝতে পারত না তার প্রসাধিত অথবা প্রসাধনরত অঙ্গলাবণ্য কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে কখন কামনার রং জাগিয়েছে অর্বাচীন জাস্টিনের ভীরু অন্তরে। কামনার রং জাগলেও আজ যে এম্মাকে দেখবে তারই শ্রদ্ধা জাগবে তার প্রতি। তার অনাসক্তি ও ঔদাসীন্য এত গভীর ও ব্যাপক, তার কথা বলার ভাষা ও ভঙ্গিমা এত মধুর, তার আচরণ এত নম্রতর যে তাকে দেখে বোঝাই যায় না ঠিক কখন তার জীবন সব স্বার্থপরতা ও দুর্নীতি উচ্ছিন্ন হয়ে গেছে নিঃশেষে এবং তার জায়গায় বিরাজ করছে উদারতা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণগুলি।

সেদিন রাতে তাদের ঝি ফেলিসিতে রাতের জন্য মিথ্যা কথা বলে ছুটি

চাওয়ায় এম্মা রেগে যায়। তবু সে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ফেলিসিতেকে, তুমি তাকে ভালবাস?

ফেলিসিতে লজ্জায় লাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বলল না।

কিন্তু তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই এম্মা বলল, ঠিক আছে। চলে যাও। উপভোগ কর।

আবহাওয়াটা ভাল ছিল, গোটা বাগানটা খুঁড়িয়ে নতুন পরিকল্পনায় গাছ-পালা বসাতে বলল এম্মা। চার্লস প্রথমে কিছুটা বাধা দিয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল এম্মা ধীরে ধীরে দেহে শক্তি ফিরে পাচ্ছে এবং সংসারের বিভিন্ন বিষয়ে মন দিচ্ছে তখন সে চুপ করে গেল।

আজকাল সত্যি ঘর সংসারের দিকে নজর দিয়েছে এম্মা। প্রথমে সে ধাত্রী মঁসিয়ে রোলেতের এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। কারণ মাদাম রোলেত একপাল রাক্ষুসে ছেলেমেয়ে নিয়ে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে জ্বালাতন করে। হোমাদের ও অন্যান্য মহিলাদের খুব বেশী আসাটা বন্ধ করে দিল।

তবে যাজক বুর্নিসিয়েন রোজ বিকালে আসতে থাকেন আজও। উনি একেবারে সোজা বাগানবাড়িতে এসে বসেন। ঠিক সময় চার্লস বাড়ি ফেরে। দুজনে বসে কিছু কথাবার্তা বলে এবং দু গ্লাস মদ খায়। এক একদিন বিনেট এসে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে।

একদিন মঁসিয়ে হোমা চার্লসকে একটা উপদেশ দিল। বলল, রুয়েন শহরে একটা ভাল অপেরা হচ্ছে। মাদাম বোভারীকে নাটকটা দেখানো উচিত। এতে ফল ভাল হবে।

তার এই উপদেশের কথা শুনে চার্লসকে চুপ করে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল হোমা। যাজক বলল, সাহিত্যের থেকে গান বাজনা অনেক কম ক্ষতিকারক জানবেন। হোমা বলল, এই সব নাটক আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নীতিশিক্ষাও দান করে।

এর পর তার সপক্ষে আরো যুক্তি খাড়া করল হোমা। বলল, ভলতেয়ারের বিয়োগান্তক নাটকগুলোর কথাই ধরুন না কেন। লেখক কৌশলে সেই সব নাটকের মধ্যে দার্শনিক মন্তব্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন যা প্রত্যেকের শিক্ষার বস্তু।

বিনেট বলল, আমি একবার একটা নাটক দেখেছিলাম। নাটকটার নাম জেমিন অ প্যারিস। এই নাটকে দেখানো হয়েছে এক বৃদ্ধ সেনাপতি ছিলেন। তিনি খুব নীতিবান। একজন ধনী লোক এক শ্রমিক কন্যার শালীনতা হানি করে। তখন সেই সেনাপতি লোকটাকে এক চড় মারে এবং পরিশেষে···

হোমা বলল, কুসাহিত্য একেবারে নেই তা বলছি না, যেমন ডাক্তারও আছে। কিন্তু দু একটা খারাপের জন্য সাধারণভাবে সব মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির গুণাবলীকে অস্বীকার করা সেই অন্ধকার মধ্যযুগের উচিত কাজের সমান যে

যুগে মানুষ গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করে।

যাজক বলল, আমি তা জানি। জানি অনেক লেখক ভাল কথাই লেখেন। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে যে কোন নাটক দেখার সময় এক ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন সৌখীনমনা নরনারীর সমাগম হয়। তাদের আপন আপন বিলাস ব্যসনের প্রদর্শনীর চূড়ান্ত স্থান হলো এই প্রেক্ষাগৃহ।

অভিনেতা অভিনেত্রীদের রংমাখা মুখ, মঞ্চের আলো, নারীকণ্ঠের কত গুঞ্জন সব মিলিয়ে এক মায়াময় আবেশ সৃষ্টি হয় সারা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। এই পরিবেশ সহজেই মানুষের মনকে নিয়ে যায় ব্যভিচার আর দুর্নীতির পথে। কত অশুভ প্রলোভন তুলে ধরে সামনে। চার্চের যাজকরা অন্ততঃ তাই মনে করেন।

এক টিপ নস্য নাকে নিয়ে বুর্নিসিয়েন আবার বলল, চার্চ যদি খেলার মাঠে যেতে লোকদের নিষেধ করে তাহলে তা অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হবে।

হোমা জানতে চাইল, চার্চ কেন অভিনেতাদের বাতিল করবে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে? তারা ত অনেক সময় অনেক ধর্মীয় উৎসবে ও অনুষ্ঠানে যোগদান করে। যেমন প্রার্থনার স্তোত্রগানের মাঝখানে হঠাৎ তারা অনেক সময় ঢুকে পড়ে কোন এক হাস্যরসাত্মক অভিনয় শুরু করে দেয়। অবশ্য এর মধ্যে কোন কোন অভিনয় শ্লীলতার মানকে ছাড়িয়ে যায় এটা আমি স্বীকার করি।

যাজক বুর্নিসিয়েন কোন উত্তর দিল না। হোমা তবু বলে যেতে লাগল, বাইবেলেও দু এক জায়গায় এই ধরনের দুঃসাহসিকভাবে রসের বস্তু পরিবেশন করা হয়েছে।

মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েনের অঙ্গভঙ্গির মধ্যে এক তীব্র বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। হোমা বলে উঠল, তাহলে বলব বাইবেলও কোন ছোট ছেলে মেয়ের পড়া উচিত নয়। আমার মেয়ে এ্যাথেলি যদি এই বই পড়তে চায় তাহলে আমি—

যাজক রেগে বলল, কেউ কাউকে বাইবেল পড়তে বলে না। বলে শুধু প্রোটেস্ট্যান্টরা।

হোমা বলল, কথাটা হলো সেই একই। আমি একথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে আজকের এই যুক্তিবাদের যুগে মানুষকে এমন এক বুদ্ধিগত আনন্দ লাভের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হবে যা শুধু নির্দোষ নয়, যা নৈতিক মানকেও উন্নত করে এবং যা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।

চার্লস হালকাভাবে বলল, হ্যাঁ তা বটে। তার কণ্ঠে কিন্তু কোন দৃঢ়তা ছিল না। কারণ সে হোমাকে সমর্থন করলেও যাজককে চটাতে চাইছিল না।

যাই হোক আলোচনাটা যখন শেষ হয়ে আসছিল তখন হোমা শেষবারের মত একটা মোক্ষম কথা বলে দিল। সে বলল, আমি জানি আমার অনেক পরিচিত পুরোহিত সাধারণ মানুষের মত কাপড় চোপড় পরে পায়ের খেলার মত কত অনুষ্ঠান দেখতে যায়।

যাজক বলল, এখন এসব কথা বাদ দাও।

হোমা বলল, সত্যি বলছি, আমি তাদের জানি।

প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়ে হোমা আবার সেই কথাটা বলল, আমি জানি কয়েকজনকে।

বুর্নিসিয়েন ধৈর্য্য ধরে সেকথা শুনে বলল, তাহলে তারা অন্যায় করেছে।

হোমা বলল, আমিও তাই মনে করি তবে আরও কথা আছে, এইখানেই শেষ নয় এর।

এর পর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বুর্নিসিয়েন হোমার মুখপানে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু বলল, মঁসিয়ে!

হোমা তখন তার গলার স্বরটা নরম করে বলল, আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই চার্চের আত্মার মধ্যে একটু সহিষ্ণুতাগুণ সঞ্চারিত করা উচিত।

যাজক বলল, তা বটে, তা বটে।

এই বলে শান্ত হয়ে বসল যাজক। তার কিছু পরেই উঠে গেল।

যাজক উঠে গেলে হোমা চার্লসকে বলল, কেমন ওকে চেপে ধরেছিলাম? আপনার কেমন লাগল ব্যাপারটা? প্রায় ঝগড়ার মত হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, আমার পরামর্শ শুনুন, অন্ততঃ একবার মাদামকে অপেরাতে নিয়ে চলুন। অন্ততঃ জীবনে একবার যাজককে একটা শিক্ষা দিন। যদি আমি কাউকে দোকানে বসাতে পারি তাহলে আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। সময় নষ্ট না করে টিকিট যোগাড় করুন। লিগার্দি এখন ভাল নাটক করছে। ও বোধ হয় এর পর ইংল্যাণ্ডে চলে যাবে। ও যখন যেখানেই যায় ওর সঙ্গে তিনজন মেয়ে আর একজন রাঁধুনী থাকে। এই সব বড় বড় অভিনেতারা সারা রাত জাগে। অনেক কষ্ট করে কোথা থেকে কি জিনিস তাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তা বলা যায় না। কিন্তু শেষ জীবনটা ওদের বড় দুঃখের। ওরা দীন দুঃখী ভবনে মারা যায়। কারণ ওদের বয়স যখন কম থাকে তখন অর্থ সঞ্চয়ের কথা ভাবে না।

অপেরা দেখার কথাটা বোভারীর মনে ধরল। চার্লস যথাসময়ে তার স্ত্রীকে বলল কথাটা। এম্মা মাথা নাড়ল, যাওয়া আসা ও সেখানে থাকার ক্লান্তি ও কষ্টের অজুহাত দেখাল। খরচের কথাও বলল। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রমোদানুষ্ঠান দেখে এম্মার মনের অবশ্যই পরিবর্তন হবে। তাদের না যাওয়ার কোন কারণই খুঁজে পেল না চার্লস। তার মা এখান থেকে গিয়ে তিনশো ফ্রাঁ পাঠিয়ে দিয়েছেন। লেহুড়ের দেনাশোধের সময় আসতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আপাততঃ যে সব ঋণের খুব বেশী চাপ ছিল সেই সব ঋণের ততটা চাপ আর নেই। তাছাড়া চার্লস যখন বুঝতে পারল এম্মা তারই মুখ চেয়ে যেতে চাইছে না তখন সে তাকে নিয়ে যাবার আরো বেশী করে জেদ ধরল। অবশেষে রাজী হলো এম্মা। পরদিন সকালে আটটায় ওরা রওনা হলো হোটেলের হিরন্দেল নামে ঘোড়ার গাড়িটায় করে।

হোমা ইচ্ছা করলে যেতে পারে, কিন্তু তার ধারণা সে এক মুহূর্তের জন্যও গাঁ ছেড়ে গেলে তাঁর দোকান চলবে না। তাই যাব যাব করেও গেল না। শুধু ওদের গাড়িটা ছাড়ার সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদের বিদায় দিয়ে বলল, সবার সব ভাগ্য হয় না।

নীল সিল্কের পোষাকে এম্মাকে সত্যিই খুব বেশী সুন্দরী দেখাচ্ছিল। তাকে হোমা বলল, আপনাকে পটে আঁকা ছবির মত সুন্দরী দেখাচ্ছে।

গাড়িটা তাদের রুয়েন শহরের জুতসিনে অঞ্চলের এক হোটেলে নিয়ে গেল প্রথমে। হোটেলটায় ভীড় লেগেই আছে। তার সামনের দিকে একটা কাফে আর পিছনের দিকে একটা বাগান। চার্লস টিকিট কাটতে গেল। অনেক ঘোরাঘুরির পর অতি কষ্টে টিকিট কেটে হোটেলে ফিরে এল। এদিকে মাদাম বোভারী ততক্ষণে একটা টুপী, একটা দস্তানা আর একটা ফুলের তোড়া কিনে ফেলেছে।

১৫

প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশদ্বারের দুপাশে রেলিংএর ধার ঘেঁষে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঢোকার মুখে সামনে পোস্টারে নাটক ও অভিনেতাদের নাম লেখা। সেদিনকার সন্ধ্যার আবহাওয়াটা ছিল বেশ মনোরম। নদীর ধার থেকে মৃদুমন্দ বাতাস ছুটে আসছিল।

এম্মা বলল, এখনো নাটক আরম্ভ হতে দেরী আছে। সুতরাং নদীর ধার দিয়ে ঘুরে আসা যাক। তার ভয় হচ্ছিল এত আগে হতে হলে ঢুকলে লোকে তাদের গেঁয়ো বলবে। এদিকে হারিয়ে যাবার ভয়ে চার্লস টিকিটগুলো হাতের মুঠোয় টিপে ধরে সেই হাতটা পায়জামার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

প্রথমে হলে ঢুকেই এম্মার মনটা কেমন ভারী হয়ে ছিল। কিন্তু সে যখন দেখল নরনারী সাধারণ সীটের জন্য করিডরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অথচ সে যাচ্ছে বক্সের দিকে তখন এক আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে। সে বাক্সের দরজা খুলে কোন ডিউকপত্নীর মত গর্বভরে বসল।

প্রেক্ষাগৃহ একে একে ভরে গেল। দর্শকরা একে একে অপেরাগ্লাস বার করতে লাগল। পরিচিতরা পরস্পরকে চিনতে পেরে কথাবার্তা বলতে লাগল। বোঝা গেল দর্শকদের বেশীর ভাগ শহরের স্থানীয় ব্যবসায়ীর দল। নিরন্তর কেনাবেচার ভিড়ে মন বিষিয়ে যাওয়ায় একটু আনন্দ করতে এসেছে। কিন্তু তাদের কথাবার্তায় বোঝা গেল তারা থিয়েটার দেখতে এলেও ব্যবসার কথা ভুলতে পারেনি। তাই তারা এখানেও তুলো, স্পিরিট, নীল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের দরদাম নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। বৃদ্ধ দর্শকরা মাথায় একরাশ সাদা চুল নিয়ে শান্তভাবে বসে ছিল। যুবকরা ঘোরাঘুরি করছিল।

গায়করা যেখানে বসে ছিল সেখানে আলো জ্বলে উঠল। গায়ক ও বাদকরা

আপন আপন জায়গায় গিয়ে বসল। নানারকম যন্ত্রসঙ্গীতের ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। এমন সময় যবনিকা উঠে গেল।

প্রথম দৃশ্য হচ্ছে এক বনপথ। পথের ডানদিকে ওক গাছের ছায়াঘেরা একটি ঝর্ণা। সেখানে হঠাৎ এক শিকারীর দল এসে হাজির হলো। সে দলে কিছু গ্রাম্য চাষী ও সামন্ত ছিল। তারা শিকারের গান গাইছিল। এমন সময় এক ক্যাপ্টেন কোন এক অশুভ আত্মার সন্ধানে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে করতে আকাশে দু হাত তুলে কি বলছিল। আর একজন এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। তারপর তারা বেরিয়ে গেল মঞ্চ থেকে। তারা চলে যেতেই শিকারীর দল আবার শুরু করল তাদের সমবেত সঙ্গীত।

এম্মা তার ছেলেবেলায় কি একটা বইয়ে এ কাহিনী পড়েছিল। লেখাটা ছিল ওয়ালটার স্কটের। এম্মার মনে হলো স্কটল্যাণ্ডের কুয়াশাচ্ছন্ন বনভূমির মাঝে মধুর সুরে বাজতে থাকা বাঁশির শব্দ ও শুনতে পাচ্ছে। নাটকের কাহিনীটা এম্মার পড়া থাকার জন্য পরিষ্কার সব কিছু বুঝতে পারছিল। তবে গানের সংখ্যা বেশী থাকায় মাঝে মাঝে অসুবিধা হচ্ছিল বুঝতে। কিন্তু গান-গুলোও ভাল লাগছিল এম্মার। গানের সুরের স্রোতে মনপ্রাণ ঢেলে দিল এম্মা। তার সমস্ত সত্তাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছিল বেহালার ছড়-গুলো তার স্নায়ুতন্ত্রীর উপর বর্ষিত হচ্ছে। অভিনেতা অভিনেত্রীদের পোষাক আশাক, মঞ্চসজ্জা, পটে আঁকা গাছপালা, বীর চরিত্রদের তরবারি প্রভৃতি যে সব প্রয়োজনগত উপাদান সঙ্গীতের তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে দর্শকদের মনকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায় সে সব বস্তু খুব একটা ভাল লাগল না এম্মার। এর পর আবার শুরু হলো নাটকের কার্য। হঠাৎ এক যুবতী এসে সবুজ পোষাক পরা এক জমিদার বা সামন্তকে টাকার থলে দিয়ে গেল একটা। তারপর দেখা গেল মঞ্চের উপর একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁশির সুর ভেসে আসছিল। কখনো ঝর্ণার কলতান আবার কখনো বা প্রভাতী পাখির গানের শব্দ যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে শোনানো হচ্ছিল। এবার সেই যুবতী তার প্রেমিকের কাছে তার ব্যর্থ প্রেমের বেদনার কথা সব বলে শেষে উড়ে যাবার জন্য পাখনা চাইল। ঠিক এমন সময়ে এম্মার মনে হলো সেও এ জীবন ত্যাগ করে পাখায় ভর দিয়ে অন্য জগতে চলে যায়। সহসা লিগার্দি মঞ্চের উপর উপস্থিত হলো। লিগার্দির পরনে ছিল আঁট করে পরা বাদামী রঙের এক ঢিলা আলখাল্লা। তার বাঁদিকের পাছার কাছে একটা বড় ছোরা ছিল। তার চেহারাটা বেশ লম্বা চওড়া। সে তার চোখগুলো চারদিকে ঘোরাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার সাদা চকচকে দাঁত-গুলো দেখা যাচ্ছিল। লোকে বলে সে এক নাবিকের ছেলে। বিয়ারিৎস উপসাগরের বেলাভূমিতে কোন এক রাত্রিতে সে যখন এক মনে গান করছিল তখন তার সেই গান শুনে পোল্যাণ্ডের রাজকন্যা তার প্রেমে পড়ে যায়। রাজ-কন্যা তার কাছে কাতরভাবে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু সে অন্য সব মেয়ের

জন্য রাজকন্যার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়। এইভাবে সে এক কপট প্রেমের ছলনায় কোন নারীকে মুগ্ধ করার এক অভ্রান্ত কৌশল আয়ত্ত করে। বহুবল্লভ এক নায়ক হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তার কণ্ঠস্বর মিষ্টি, চোখে মুখে আত্মসংযমের ভাব। দেখে মনে হয় তার চরিত্রে বুদ্ধির থেকে আবেগের প্রকৃত অনুভূতির থেকে বাগাড়ম্বরের মাত্রা বেশী। সব মিলিয়ে কেমন যেন 'প্রতারক, প্রতারক' একটা ভাব।

এই নায়কই সারাক্ষণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল। এই নায়কই প্রথম দৃশ্যের সেই যুবতী মেয়ে লুসিরও প্রেমে পড়ল। তাকে আলিঙ্গন করল। তারপর তাকে ছেড়ে চলে গেল। আবার ফিরে এল। কখনো হতাশায় রাগে ও দুঃখে তার কণ্ঠস্বর চরমে উঠল, আবার পরক্ষণেই তার কণ্ঠস্বর অতিশয় নরম হয়ে পড়ল। তার কণ্ঠস্বর কখনো করুণ কখনো মধুর। খালি গলায় সে যখন গান করছিল তখন মনে হচ্ছিল কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে অথবা কারো চুম্বনের শব্দ হচ্ছে। এম্মা তার সীট থেকে এই নায়ককে দেখার জন্য সব সময় কষ্ট করে ঘাড়টা উঁচু করে রইল। মাঝে মাঝে তার আঙুলের নখগুলো বক্সের পালিশ করা কাঠের উপর বসে যেতে লাগল। সকরুণ বিলাপের ধ্বনিগুলি এম্মা গভীরভাবে উপভোগ করছিল। প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ের মধ্যে ডুবে যাওয়া তলিয়ে যাওয়া ভগ্নপোত কোন নাবিকের ডাকের মত সেই বিলাপের ধ্বনি, ব্যর্থ আশাহত প্রেমের সকরুণ সঙ্গীত এম্মার বুকের ভিতর সোজা এসে বিঁধছিল। যে প্রেমাবেগ, যে বেদনা তাকে মৃত্যুর প্রান্তসীমায় নিয়ে গিয়েছিল, এ নাটকেও সেই প্রেমাবেগেরই কথা, সেই বেদনারই গান। এ নাটকের মধ্যে নিজের মনের কথা খুঁজে পেল এম্মা। এ নাটকের নায়িকার কণ্ঠে যেন তারই অন্তরাত্মার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। তবে তাকে এমন করে কেউ কখনো ভালবাসেনি। নায়িকাকে ছেড়ে যাবার সময় নায়ক এডগার যেমন কাঁদছে সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে তাকে ছেড়ে যাবার সময় তার প্রেমিক কিন্তু এমনভাবে কাঁদেনি। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের দর্শকরা হাততালি ও হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ছিল মাঝে মাঝে। দর্শকদের উৎসাহে এক একটা দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল। প্রেমিক প্রেমিকারা যখন তাদের কবরের উপর কি ধরনের ফুল দেওয়া হবে সেই ফুল, তাদের প্রতিশ্রুতি, তাদের নির্বাসন, তাদের আশা নিরাশা, তাদের ভাগ্য প্রভৃতি বিষয়ে গান করছিল তখন তাদের সে গান এত ভাল লাগছিল দর্শকদের যে তা দুবার করে শোনানো হচ্ছিল। তাদের বিদায় দেখে এম্মা নিজে জোর চিৎকার করে ওঠে। গানের শব্দে তার সে চিৎকার ডুবে না গেলে অনেকেই তা শুনতে পেত।

চার্লস চুপি চুপি এম্মাকে জিজ্ঞাসা করল, ঐ লোকটা মেয়েটাকে কি বলছে ? মনে হয় অবিশ্বাস করছে ?

এম্মা বলল, না না, ও ওর প্রেমিক।

চার্লস বলল, কিন্তু ও লোকটা ত ওর পরিবারের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য শপথ করেছে। একটু আগে বরং যে এসেছিল সে বলছিল আমি লুসিকে ভালবাসি এবং যে লুসির বাবার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে গেল সেই হচ্ছে আসল প্রেমিক।

আসল কথা, এম্মা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে বা ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়া সত্ত্বেও চার্লস ঠিক বুঝতে পারছিল না। আগাগোড়া গুলিয়ে ফেলছিল। প্রথম দৃশ্যেই এক দ্বৈত আবৃত্তিতে বলে দেওয়া হয় লুসির আসল প্রেমিক এডগার। কিন্তু অন্য এক লোক শয়তানী করে মিথ্যা কথা বলে আংটি বিনিময় করতে আসবে। চার্লস মূল কাহিনীর সূতোটাকে প্রথম থেকে অনুসরণ করেনি। ফলে বুঝতে পারছে না মাঝে মাঝে।

সে অবশ্য তা স্বীকার করেছে তা নিজেই। সে বলেছে কথায় কথায় এত গানের ছড়াছড়ি যে কিছু বোঝাই যায় না।

এম্মা বলল, তাতে কি যায় আসে। চুপ করে শোন। সব বুঝবে।

চার্লস আবার বলল, কিন্তু কখন কি হচ্ছে সেটা ভালভাবে জানতে ও বুঝতে চাই। এই কথা বলে এম্মার কাঁধের উপর ঢলে পড়ল সে।

এম্মা অধৈর্য হয়ে বলল, চুপ কর।

এবার এল বিয়ের দৃশ্য।

নায়িকার চুলের খোপায় কমলালেবু ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে মেয়েরা এক রকম ধরাধরি করে নিয়ে এল তাকে। নায়িকার মুখখানা কিন্তু তার সাদা শাটিনের থেকেও সাদা ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। হয়ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় মন তার বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এ দৃশ্য দেখে এম্মার নিজের বিয়ের কথা সব মনে পড়ে গেল একে একে। তার মনে হলো সে চার্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তখন সে এই লুসির মত বাধা দিল না, কেন সে নীরবে অপ্রতিবাদে বিয়েতে মত দিল ? দিয়েছিল, কারণ সে তখন হালকামনা। অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখন কোন ভাবনাই ছিল না তার। এম্মার কেবলি মনে হতে লাগল, লুসি যদি বিয়ের আগে অর্থাৎ বিয়ের মধ্য দিয়ে অনাঘ্রাত পবিত্র যৌবনসৌন্দর্যকে কলুষিত করার আগে অথবা বিয়ের পর ব্যভিচারের মোহ থেকে মুক্ত হবার আগে তার সমগ্র নারীজীবনের ভিত্তিস্বরূপ কোন মহানহৃদয় পুরুষকে খুঁজে পেত! তাহলে কত ভাল হত। তাহলে প্রেম আর সদ্গুণাবলী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ এবং কর্তব্যপরায়ণতা এক হয়ে মহান করে তুলত তার চরিত্রকে। তাহলে তার উচ্চ আসন হতে সে কোনদিন বিচ্যুত হত না।

কিন্তু এই ধরনের সুখ কারো জীবনে ঘটে না। প্রেমের ক্ষেত্রে এ ধরনের অলীক সুখ কেউ প্রত্যাশা করলে সে ভুল করবে। এম্মা এবার বুঝতে পারল মানুষের প্রেমাবেগের অসারতা কোথায়। সে আরও বুঝতে পারল যে নাটক দেখতে দেখতে তারা ভাবে বিহ্বল ও বিভোর হয়ে পড়ে, অনেক সময় অভিভূত

হয়ে পড়ে, আসলে সে নাটক কতকগুলি আনন্দদায়ক দৃশ্যের সমন্বয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন সময় নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যবনিকার ওধার থেকে কালো পোষাকপরা একজন লোক এসে মঞ্চের উপর দাঁড়াল। সঙ্গে অন্য সব গায়ক ও অভিনেতারাও এসে জড়ো হল এবং সেই কালো পোষাকপরা লোকটার কথামত আপন আপন ভূমিকার অন্তর্গত এক একটা গান গেয়ে যেতে লাগল। হর্ষ বিষাদ, প্রেম প্রতিহিংসা, আশা বৈরাগ্য প্রভৃতি বিচিত্র ভাবের গানগুলো যেন এক বিশেষ উদ্দেশ্যে গীত হয়ে এক অদ্ভুত সমবেত সঙ্গীতে পরিণত হয়ে উঠেছিল। প্রতিটি অভিনেতাই কিন্তু আপন আপন ভঙ্গিমায় হাত পা নাড়ছিল, মুখ নাড়ছিল। সেই বীর প্রেমিক তার মুক্ত তরবারি সঞ্চালন করছিল।

এম্মা প্রথমে সংকল্প করেছিল নাটকে প্রদর্শিত এই সব মিথ্যা আবেগের ছলনায় আর সে মুগ্ধ হবে না কোনদিন। কিন্তু শেষ দৃশ্যে নায়কের বাগ্মিতার যাদুতে সে সংকল্প কোথায় ভেসে গেল তার। যে জীবনকাহিনীকে রূপায়িত করছিল সেই নায়ক তার সেই অভিনীত জীবন তার ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের দিকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করল এম্মাকে। এম্মা ভাবল, ভাগ্যে থাকলে ঐ রকম জাঁকজমকপূর্ণ উজ্জ্বল, অর্থসমৃদ্ধ ও আশ্চর্যজনক জীবন ও নিজেও যাপন করতে পারত। ভাগ্যে থাকলে তার সঙ্গেও তার ঘটনাক্রমে দেখা হতে পারত। তার সঙ্গে ভালবাসা হতে পারত। সে তাহলে তার এই নায়ক ও প্রেমিকের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের এক রাজধানী থেকে অন্য এক রাজধানী ও এক শহর থেকে অন্য এক শহরে ক্রমাগত তার জয়ের অংশ গ্রহণ করে ও তার গুণমুগ্ধ ভক্তদের শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসাবে দান করা ফুলের রাশি কুড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। সে নিজের হাতে তার প্রেমিকের পোষাকের উপর সূচীশিল্পের বিচিত্র কারুকার্য খচিত করে তুলত। আর প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সে গিয়ে বসত বক্সের একটি আসনে। সেখানে বসে সে একদৃষ্টিতে তার নায়ক প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বলা প্রতিটি কথা ও তার গাওয়া প্রতিটি গান একান্ত প্রার্থিত বস্তু হিসাবে শ্বাসবায়ুর মতই গ্রহণ করত।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো এম্মার ঠিক এই মুহূর্তে অপেরার নায়ক লিগার্দি তারই পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে এ বিষয়ে নিশ্চিত। হঠাৎ তার মনে হলো সে ছুটে যাবে এখনি তার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকে। তার ইচ্ছা হলো এখনি সে তার আদর্শ প্রেমের মূর্ত প্রতীক সেই নায়কের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সে চিৎকার করে বলে, আমাকে জোর করে নিয়ে যাও, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাও এখান থেকে অনেক দূরে। আমার সকল প্রেম তোমাকে কেন্দ্র করেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আমার জীবনের সকল স্বপ্ন তোমার জন্য মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে।

যবনিকা পড়ে গেল। আপাততঃ বিরতি। কিন্তু অসংখ্য মানুষের

নিঃশ্বাসে প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়াটা বেশ গুমোট ও গরম হয়ে উঠেছিল। বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই চারপাশে ভিড় বেড়ে ওঠে। এম্মার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। চার্লস-এর ভয় হচ্ছিল এম্মা মূর্ছিত না হয়ে পড়ে। এই ভয়ে চার্লস প্রচুর ভিড় ঠেলে একগ্লাস ঠাণ্ডা অর্গিয়েত আনতে ছুটে গেল।

আসবার সময় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে একজন রুয়েনের ভদ্রমহিলার চকচকে গাউনের উপর দাগ লেগে গেল। তার গায়ে ধাক্কা লেগে যাওয়ায় ও জামায় দাগ লেগে যাওয়ায় তার মিলমালিক স্বামী চার্লসএর পানে রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড় বিড় কি সব বলতে লাগল। যাই হোক, অতিকষ্টে চার্লস ফিরে এসে তার স্ত্রীকে একটা নতুন খবর দিল। সে ঐ ভিড় ঠেলে এখানে আসতে পারবে তা ভাবতে পারেনি।

তারপর চার্লস বলল, বল দেখি, কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল? মঁসিয়ে লীয়ঁর সঙ্গে দেখা হলো।

লীয়ঁ? এম্মা অবাক হয়ে গেল।

চার্লস বলল, দেখবে এখনি সে আসবে তোমাকে শ্রদ্ধা জানাতে।

চার্লসএর কথা শেষ না হতেই লীয়ঁ এসে বক্সের মধ্যে ঢুকল। লীয়ঁ এসে অভিজাত ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে দিল এবং মাদাম বোভারীও তার হাতটা বাড়িয়ে দিল। তবে এবার মাদামের কামনার আকর্ষণটা ছিল বেশী। কতদিন হয়ে গেল এ হাত স্পর্শ করেনি সে। এ হাত সে শেষবারের মত স্পর্শ করে সেই বসন্তসন্ধ্যায় যখন সে তার ঘরের জানালার ধারে বসেছিল, যখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল আর যখন লীয়ঁ রুয়েনে চলে আসার জন্য বিদায় নিতে আসে। স্মৃতির ঘোরে কেমন যেন বিভোর হয়ে পড়েছিল এম্মা। হঠাৎ বাস্তব অবস্থা ও সামাজিকতার কথা ভেবে সচকিত হয়ে উঠল সে। ভদ্রতার খাতিরে বলে উঠল, আপনি এখানে? সত্যিই বড় আশ্চর্যের।

কিন্তু অর্কেস্ট্রার ভিতর থেকে একজন ভদ্রলোক চুপ করার নির্দেশ দিল। কথা বলা নিষিদ্ধ। এবার তৃতীয় অঙ্ক শুরু হচ্ছে।

তবু এম্মা আবার জিজ্ঞাসা করল লীয়ঁকে, আপনি রুয়েনেই আছেন?

লীয়ঁ বলল, হ্যাঁ।

এম্মা বলল, কখন থেকে?

লীয়ঁ কিছু বলার আগেই দর্শকরা রেগে তাদের চুপ করতে বলল। ফলে বাধ্য হয়ে আর কোন কথা বলতে পারল না ওরা। কিন্তু এরপর থেকে মঞ্চে যা কিছু অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, গান বা অভিনয় যাই হোক না কেন, কিছুই দেখছিল না এম্মা। এ্যাশটন ও তার অনুচর যে সব কথা বলছিল, যে দ্বৈত সঙ্গীত গীত হচ্ছিল তা শুনেও শুনছিল না এম্মা। এম্মার মনে হচ্ছিল এসব গান বাজনা অভিনয় যেন অনেক দূরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই মঞ্চের সকল অনুষ্ঠান থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে অতীতের কথা ভাবতে লাগল এম্মা। ওষুধের দোকানে

সেই একসঙ্গে তাসখেলা, ধাত্রীর বাড়ি পর্যন্ত একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া, বাগান বাড়িতে দুজনে বসে বসে কবিতা পড়া, আগুনের পাশে সন্ধ্যায় কত সব আলোচনা করা, সব মিলিয়ে তাদের সেই দীর্ঘ নীরব প্রেমের অবহেলিত কাহিনীটি কিভাবে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায় মন থেকে তা বুঝতেই পারেনি এম্মা।

কিন্তু সেই লীয়ঁ এখন এতদিন পরে আবার ফিরে এল কি করে? কোন ঘটনা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাকে নিয়ে এল তার জীবনে? লীয়ঁ এখন তারই পাশে বক্সের মাঝে বসে আছে। তার একটা কাঁধ বক্সের একদিকের দেওয়ালের গা ঘেঁষে আছে। তার নিঃশ্বাসের গরম হাওয়াটা এম্মার চুলে এসে লাগছিল। সে হাওয়ার অতি মৃদু অথচ অতি তীক্ষ্ণ আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল এম্মা।

লীয়ঁ একবার এম্মার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার ভাল লাগছে এ নাটক দেখতে? কথা বলার সময় লীয়ঁর থুঁতনির দাড়িটা এম্মার গালে একবার ঠেকল।

এম্মা বলল, মোটেই না। খুব একটা ভাল লাগছে না।

লীয়ঁ বলল, এখানে বসে না থেকে বাইরে ঠাণ্ডা কোন জায়গায় বেরিয়ে আসা ভাল।

মঁসিয়ে বোভারী বলল, না এখন নয়। এখন এখানেই বসা যাক। এখন মনে হচ্ছে বিয়োগান্তক কোন পরিণতি ঘটতে চলেছে।

কিন্তু উন্মাদদৃশ্যটা মোটেই ভাল লাগল না এম্মার। তার মনে হলো সোপরানের অভিনয় অতি নাটকীয়তা দোষে দুষ্ট।

চার্লস কিন্তু সব মন দিয়ে শুনছিল। চার্লসএর দিকে ঝুঁকে এম্মা বলল, মেয়েটা দারুণ চেঁচাচ্ছে।

ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভাল লাগলেও স্ত্রীর অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ চার্লস বলল, হ্যাঁ কিছুটা হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

লীয়ঁ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এখন খুব গরম।

এম্মা বলল, গরম মানে, অসহ্য।

চার্লস স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার অস্বস্তি লাগছে?

এম্মা বলল, হ্যাঁ, বড় গুমোট লাগছে। চল, যাওয়া যাক।

মঁসিয়ে লীয়ঁ কায়দা করে এম্মার লম্বা শালটা তার কাঁধে ভাঁজ করে চাপিয়ে দিল। ওরা তিনজনে একসঙ্গে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে বেড়াতে চলে গেল। একটা কাফের বাইরের দরজার কাছাকাছি বসল ওরা। প্রথমে চার্লস তুলল এম্মার দীর্ঘ রোগভোগের কথাটা। কিন্তু এম্মা মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করছিল তার বলায়, কারণ তার ধারণা হচ্ছিল লীয়ঁর হয়ত এসব ভাল লাগছে না শুনতে। এর পর লীয়ঁ বলল, সে দু বছরের জন্য রুয়েনে

আছে, কারণ একটা ব্যবসার কাজ ও শিখে নিচ্ছে। এরপর তা শিখে নিয়ে চলে যাবে নর্মাণ্ডি, সেখানে এ কাজের কারবার খুব বড় আকারে হয়।

তারপর লীয়ঁ একে একে বার্থে, হোমা ও লে ফ্রাঁসোয়ার কথা জিজ্ঞাসা করল। চার্লসএর উপস্থিতিতে ওরা ওদের মনের কথা কিছু বলতে পারল না। তাই চুপ করে গেল ওরা।

এতক্ষণ থিয়েটার ভাঙায় দর্শকরা উঁচু ও ধীর গলায় কথা বলতে বলতে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। লীয়ঁ বলল, ইতিমধ্যে সে অনেক রকমের যন্ত্রসঙ্গীত শুনেছে। সেই সব কিছুর তুলনায় লিগার্দির হৈ হল্লা চেঁচামিচি কিছুই না।

চার্লস তার সরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, কিন্তু শেষ দৃশ্যে লোকটা চমৎকার অভিনয় করেছে। দর্শকরা যেতে যেতে বলছিল আমি না দেখে ভুল করেছি। শেষের দিকটাতেই আমার ভাল লাগতে শুরু করেছিল নাটকটা।

লীয়ঁ বলল, আবার খুব শীঘ্রই ত আর একটা অনুষ্ঠান হবে। ভাববার কিছু নেই।

কিন্তু চার্লস বলল তাদের পরের দিনই চলে যেতে হবে। কথাটা বলেই তার স্ত্রীর দিকে মুখ করে বলল, তুমি অবশ্য প্রিয়তমা যদি থাকতে চাও তাহলে একা থেকে যেতে পার।

লীয়ঁর মনে হলো হাতের কাছে সে যেন এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে গেল। সুযোগ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যেই সে হঠাৎ সুর পাল্টে লিগার্দির প্রশংসা করতে শুরু করে দিল। বলল, লিগার্দির অভিনয় সত্যিই বড় চমৎকার।

চার্লস তার স্ত্রীকে বলল, তুমি রবিবার বাড়ি ফিরতে পার। তুমি মনস্থির করে ফেল। যদি দেখ এতে তোমার কিছুমাত্র মনটা ভাল হয়েছে তাহলে এ সুযোগ ছাড়া অন্যায় হবে তোমার পক্ষে।

এমন সময় কাফের লোক এসে তাদের প্লেট সরিয়ে নিয়ে টেবিল পরিষ্কার করে দামের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। চার্লস তা বুঝতে পেরে ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় লীয়ঁ তার হাতটা ধরে ফেলে টাকা দিয়ে দিল এবং পরিশেষে থালার উপর একটা রূপোর মুদ্রা দিল লোকটিকে।

বোভারী বলল, এ আমার কেমন লাগছে, আপনি কেন দামটা দিয়ে দিলেন?

টুপীটা তুলে নিয়ে লীয়ঁ বলল, ও কিছু না। তাহলে কাল ছটায় দেখা হবে।

চার্লস তার উত্তরে আগের কথাটাই বলল, আমি কিন্তু থাকতে পারব না। তবে এম্মা ইচ্ছা করলে সহজেই থেকে যেতে পারে।

এক অদ্ভুত হাসি হেসে এম্মা বলল, আমি ত বুঝতেই পারছি না কি করব—

চার্লস বলল, ঠিক আছে আজ সারারাত ধরে ভাব। পরে কাল সকালে ঠিক করা যাবে।

লীয় তখনো তাদের সঙ্গেই আসছিল। তাকে চার্লস আহ্বান জানিয়ে বলল, দীর্ঘদিন পর যখন দেখা হলো আপনার সঙ্গে আপনি এবার মাঝে মাঝে আসবেন আমাদের বাড়িতে।

লীয় বলল, নিশ্চয়ই সে যাবে। তাছাড়া এবার তাকে ইয়নভিল গাঁয়ে মাঝে মাঝে কাজের ব্যাপারে যেতে হতে পারে। তারা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল তখন কোন এক বড় গীর্জার ঘড়িতে রাত সাড়ে এগারোটা।

তৃতীয় খণ্ড

১

রুয়েনে কাজ শিখতে এসে আইন পড়তেও শুরু করে লীয়ঁ। কর্মী বা কোন কাজের শিক্ষানবিশী হিসাবে সে যেমন অলস বা খারাপ নয় কোন দিকে, তেমনি ছাত্র হিসাবেও সে খারাপ নয়। তবে পড়াশুনোয় ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে সন্ধ্যের দিকে শহরের নানা জায়গায় নাচগানের আসরে যাওয়া আসাও করত।

যেদিন সন্ধ্যায় কোথাও যেত না লীয়ঁ, নিজের ঘরে বসে বই পড়ত আপন মনে সেদিন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এম্মার স্মৃতি হঠাৎ এসে যেত মনে।

কিন্তু আমোদ প্রমোদের অন্য সব উপাদানের চাপে অতীতের সে স্মৃতি, সে অনুভূতি স্থায়ী হত না মনে। তবু এম্মার স্মৃতিটা তার মনের পটভূমির পিছনেই ছিল। সে আশাটা একেবারে ত্যাগ করেনি। কোন এক মায়াময় গাছের উপর ঝুলতে থাকা সোনার ফলের মত এ আশাটাকে একটা প্রতিশ্রুতির ফল এক স্পর্শাতীত উচ্চতায় ঝুলিয়ে রাখত সব সময়।

তিন বছর পর সেই এম্মাকে দেখে ও কাছে পেয়ে তার প্রতি পুরনো প্রেমাবেগ আবার জেগে উঠল। এবার কিন্তু সে ঠিক করে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে ফেলবে তাকে। শহরে এসে বিভিন্ন সমাজে ও অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে মেলামেশার জন্য তার আগেকার সেই সব লজ্জা, জড়তা বা কুণ্ঠার ভাব আর নেই। এম্মাকে ভাল লাগার আর একটা কারণ ছিল লীয়ঁর। এম্মার কাছে যতটা সে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হতে পারত, শহরের কোন অভিজাত ধনী লোকের বাড়িতে কোন মহিলার কাছে তেমন সহজ হতে পারত না সে। আসলে পরিবেশই মানুষের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাছাড়া শহরের ধনী অভিজাত সমাজের মেয়েরা শুধু টাকার জন্য শ্রদ্ধা পেয়ে যায় সমাজে। আসলে কোন গুণ বা কোন সতীত্ব তাদের নেই।

গতকাল রাত্রে মাদাম বোভারীদের বিদায় দেওয়ার পর গোপনে তাদের অনুসরণ করে তাদের হোটেলটা চিনে নিয়েছে। তারপর সারারাত ধরে ভেবেছে কিভাবে কি করা যায়।

পরের দিন বেলা পাঁচটায় মুখটাকে ম্লান করে এবং ভয়ের একটা ভাণ ফুটিয়ে হঠাৎ সেই হোটেলে গিয়ে হাজির হলো লীয়ঁ। মঁসিয়ে বোভারীর নাম করতেই একজন চাকর বলল, মঁসিয়ে নেই।

এটাকে এক সুযোগ মনে ভেবে সোজা উপর তলায় চলে গেল লীয়ঁ। তারপর এম্মাদের ঘরে ঢুকে পড়ল।

এম্মা তাকে শান্ত ও উচ্ছ্বাসহীনভাবে অভ্যর্থনা জানাল। ঠিকানা দিতে ভুলে যাওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশও করল।

লীয়ঁ বলল, আমি এ বিষয়ে ঠিকই অনুমান করেছিলাম।

এম্মা বলল, কি করে?

লীয়ঁ বলল, আজ সারাদিন ধরে সকাল থেকে একটার পর একটা করে শহরের বহু হোটেল খুঁজতে খুঁজতে ঘটনাক্রমে এটা পেয়ে গেলাম।

এম্মার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

লীয়ঁ তার কথাটা বলা ভুল হয়েছে ভেবে লজ্জা পায়। তারপর বলে, তাহলে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ত?

এম্মা বলল, হ্যাঁ। কিন্তু এটা আমার ঠিক হয়নি। কোন লোকের যখন হাতে প্রচুর কাজ করার থাকে তখন এভাবে ইচ্ছা করে নিজেকে অলস করে রাখার কোন অর্থ হয় না।

লীয়ঁ বলল, হ্যাঁ বুঝেছি।

এম্মা বলল, না, আপনি বুঝতে পারেন নি। আপনি ত আর মেয়ে নন। পুরুষদেরও অনেক রকমের সমস্যা থাকতে পারে।

সুতরাং আলোচনার ধারাটা ধীর গতিতে এই খাতেই বইতে লাগল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু দার্শনিক কথাও এসে পড়ল প্রসঙ্গক্রমে। এম্মা মানুষের পার্থিব প্রেমাশক্তির অসারতা আর মানবাত্মার চিরন্তন বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিয়ে কথা বলতে লাগল।

এদিকে লীয়ঁ এম্মাকে খুশি করার জন্য ও তার ভাবময় বিষাদের অংশ গ্রহণ করার জন্য বলল, পড়াশুনো তার আর ভাল লাগছে না। আইন বিষয়ের নানা ধরাবাঁধা খুঁটিনাটি তার ভাল লাগছে না। এতে কোন রস পাচ্ছে না সে। কিন্তু এই সব আলোচনার সময় একটা কথা ওরা দুজনেই এড়িয়ে গেল। এম্মা একবারও বলল না, সে মাঝখানে আর একবার প্রেমে পড়েছিল। লীয়ঁও একথা বলল না যে নানা আমোদ প্রমোদের উপকরণ পেয়ে এম্মাকে একরকম ভুলেই গিয়েছিল সে।

লীয়ঁ যেমন এখন আর সেই সব উচ্ছ্বসিত সন্ধ্যার কথা স্মরণ করল না যখন সে হোটেলে বলনাচের আসরে যাবার জন্য তৈরি হত আর এম্মাও এখন আর সেই সব দুরন্ত সকালের কথা মনে আনল না যখন সে কুয়াশাঘেরা শিশির ভেজা মাঠ পার হয়ে যেত তার প্রেমিকের কাছে।

এ ঘরটা খুব নির্জন। শহরের গোলমালের কোন শব্দ এ ঘরে বিশেষ একটা আসে না। এই নির্জন ঘরে লীয়ঁর কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসে কথা বলতে ভাল লাগছিল এম্মার। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে এক একবার বড় আয়নায় প্রতিফলিত তার চেহারাটা দেখছিল। দুপাশের চুলের গোছা হতে কান দুটো দেখা যাচ্ছিল।

এম্মা এক সময় বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার যত সব ব্যক্তিগত অভিযোগের কথা বলে আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না।

শ্রদ্ধার সঙ্গে লীয়ঁ বলল, কি বলছেন আপনি? বিরক্ত?

এম্মার চোখদুটো জলে টলটল করছিল। সেই জলভরা চোখদুটো উপরে তুলে সে বলল, যে সব স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি তা যদি সব আপনি জানতেন।

লীয়ঁ বলল, আমারও ত সেই একই ব্যাপার। কী ভয়ঙ্কর সময়ই না আমার গেছে। প্রায়ই আমি কোন কাজই করতে পারিনি। সব কাজ ফেলে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেছি আমি। নদীর ঘাটে ঘাটে নির্জন প্রান্তরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি পাগলের মত। অবশেষে একদিন একটা দোকানের জানালার ধারে ইতালীয় কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজের একটি মূর্তি দেখতে পাই। সে মূর্তি দেখতে অনেকটা আপনার মত তাই আমি সে মূর্তি দেখার জন্য বারবার যেতাম সেখানে। কোন এক দুর্বোধ্য রহস্যময় আকর্ষণে আমি সেই জানালার ধারে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

তারপর একটু চুপ করে থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় লীয়ঁ বলল, মূর্তিটা দেখতে বেশ কিছুটা আপনার মত।

এম্মা তার মুখটা সরিয়ে নিল পাছে তার মুখের হাসিটা লীয়ঁ দেখতে পেয়ে যায়। হাসিটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না সে।

লীয়ঁ বলল, আমি ইতিমধ্যে কত চিঠি লিখেছি আপনাকে। আবার পরক্ষণেই সে সব ছিঁড়ে দিয়েছি।

এম্মা চুপ করে থাকায় লীয়ঁ আবার বলে চলল, আমার প্রায়ই মনে হত আপনার সঙ্গে নিশ্চয় শহরের রাজপথেই কোনদিন হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে। কতদিন তাই কোন ঘোড়ার গাড়ির জানালা দিয়ে শাল বা ওড়নার ঘোমটা দেওয়া কোন নারী দেখতে পেলেই ছুটে গেছি।

এম্মা চাইছিল লীয়ঁ অবিরাম এই সব কথা বলে যাক আর নীরবে বসে বসে সে তা শুনে যাক। আর্মচেয়ারে বসে তার বুকের উপর হাত দুটো আড়াআড়ি ভাবে রেখে মাথা নিচু করে নিজের পায়ের চটি জোড়াটার দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এম্মা বলল, সবচেয়ে খারাপ লাগছে এই ভেবে যে, যে জীবন আমি যাপন করে চলেছি তা অসার অর্থহীন। এই অসার অর্থহীন জীবন ত্যাগ করলে যদি কারো মঙ্গল হত তাহলে সে ত্যাগের মধ্যে অন্ততঃ একটা পরম সান্ত্বনা পেতাম।

লীয়ঁ তখন কর্তব্যপরায়ণতা ও নীরব ত্যাগের মহিমার খুব প্রশংসা করল। পরে বলল, তারও ঐ রকম পরের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের বাসনা জাগে

এম্মা বলল, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি ধাত্রীর কাজে যোগদান করি।

লীয় বলল, আমরা ত আর মেয়েদের মত এই সব সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে পারি না। আমরা পুরুষ মানুষ, চেষ্টা করলে বড়জোর ডাক্তার হতে পারি।

এরপর লীয়কে থামিয়ে দিয়ে এম্মা বলল, কেন যে ভাল হয়ে উঠলাম, সেই রোগে যদি আমার তখন মৃত্যু হত তাহলে কত ভাল হত। তাহলে আজ আমি সকল দুঃখবেদনার ঊর্ধ্বে চলে যেতাম।

তা শুনে লীয় সহসা মৃত্যু কামনা করল। বলল সমাধিগহ্বরই পরম শান্তির স্থান। একদিন রাত্রিতে নাকি তার শেষ ইচ্ছার কথা লিখে ফেলেছিল এক উইলে। সে লিখেছিল এম্মার দেওয়া সিল্কের ওড়নাটি যেন তার মৃত্যুর পর তার উপর ঢাকা দেওয়া হয়।

এইভাবে তারা কে কি হতে চায় তা বলল। তারা যেন দুজনে এক একটি স্বপ্নজাল রচনা করে তাদের সকল অতীতের সব কাজকে আচ্ছন্ন করে তাদের জীবনকে এক নতুনরূপ দিতে চাইছিল। এম্মা লীয়কে শেষে জিজ্ঞাসা করল তার দেওয়া ওড়নাটার কথা হঠাৎ কেন মনে হলো তার।

লীয় বলল, কারণ আমি ভয়ঙ্করভাবে আপনাকে ভালবাসি।

লীয় এবার এক কটাক্ষপাতে এম্মার মুখপানে তাকাল। দেখল আকস্মিক এক দমকা বাতাসে মেঘ উড়ে যাওয়া আকাশের মত সে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সহসা।

লীয় চুপচাপ বসে কিসের প্রতীক্ষা করতে লাগল। অবশেষে এম্মা বলল, আমারও তাই মনে হয়েছে।

তারপর তারা তাদের অতীত জীবনের যত সব খুঁটিনাটি কথা আলোচনা করতে লাগল। বর্তমান আবহাওয়া, এম্মার পরিহিত পোষাক, তার ঘরের আসবাবপত্র সব কিছুই নিয়ে আলোচনা করতে লাগল লীয়।

লীয় বলল, সেই ক্যাকটাস ফুলগুলোর কি হলো?

এম্মা বলল, গত শীতকালে শীতে মারা গেছে।

লীয় বলল, আমি তাদের নিয়ে কত কথা ভেবেছি, আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। আমি মনে মনে একটা ছবি আঁকতাম, গ্রীষ্মের সকালে যখন সূর্যের রোদ সবেমাত্র ছড়িয়ে পড়ছে জানালায় ও বারান্দায় তখন আপনার খালি হাতগুলো ফুলের মাঝে আপনি নাড়াচাড়া করছেন।

এম্মা এবার তার হাতটা লীয়র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বেচারা ছোকরা!

সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়ে তার ঠোঁটে ঠেকাল লীয়। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনি তখন আমার জীবনে এক বিরাট রহস্যময়ী মোহপ্রসারিণী শক্তি। আমি একদিন আপনাদের বাড়িতে ডাকতে গিয়েও

ডাকতে পারিনি। আপনার হয়ত তা মনে নেই।

এম্মা বলল, হ্যাঁ মনে আছে বলে যাও।

লীয়ঁ বলল, আপনি তখন নিচের তলায় হলঘরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোথাও যাবার জন্য হয়ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন ; আপনার টুপীর উপর ছিল একটা নীল ফুল। আপনি যখন বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে হাঁটতে শুরু করে দিলেন আপনার অলক্ষ্যে অগোচরে আপনার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করে দিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম আমি নির্বোধের মত কাজ করছি, তবু আমি না করে পারিনি। আপনি যখন একটা দোকানে ঢুকলেন আমি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে দোকানের জানালা দিয়ে দেখতে লাগলাম আপনাকে। তারপর আপনি মাদাম তুভাশের দরজার সামনে গিয়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। তারপর আপনি বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন আর আমার সামনে বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমি তখন বিহ্বল হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

লীয়ঁর এই সব কথা শুনতে শুনতে মাদাম বোভারীর মনে হলো, তার বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনেক আবেগ অনেক অনুভূতি অনেক অভিজ্ঞতা জমা হয়ে আছে তার জীবনে। চোখদুটো অর্ধমুদ্রিত করে গলাটা নিচু করে মাদাম বোভারী বলল, হ্যাঁ, আমার সব মনে আছে। সব মনে আছে।

হঠাৎ তারা শুনল কয়েকটা জায়গা থেকে আটটার ঘণ্টা বাজল। তার মধ্যে আছে চার্চ, বোর্ডিং স্কুল আর পুরনো আমলের প্রাসাদ। তারা আর কথা বলছিল না। শুধু দুজনে দুজনের পানে তাকাচ্ছিল। আর তাদের সেই পরস্পরের দৃষ্টির স্বরে পরস্পরের অন্তরগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তাদের মাথা ঘুরছিল। এখন তারা পরস্পরের হাত ধরেছে এবং আবেগের আতিশয্যে বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎকে একাকার করে অনেক কথা বলাবলি করছে। তাদের স্মৃতি তাদের স্বপ্ন নিয়ে অনেক কথা বলছে। এখন যে ঘরে তারা বসে আছে তার চারদিকের দেওয়ালের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। খোলা জানালাটা দিয়ে বড় বড় বাড়িগুলোর মাথার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার একফালি আকাশ দেখা যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালার জন্য উঠে গিয়ে এম্মা দুটো বড় বাতি জেলে ড্রয়ারের উপর তা রেখে আবার এসে তার জায়গায় বসল।

লীয়ঁ বলল, তারপর—?

এম্মাও বলল, তারপর ?

লীয়ঁ যখন আবার আলোচনা শুরু করার জন্য প্রসঙ্গ খুঁজছিল তখন এম্মা হঠাৎ বলে উঠল, এসব কথা আমায় আগে কেউ বলেনি কেন ?

তার উত্তরে লীয়ঁ বলল, আমাদের মত আদর্শবাদী চরিত্র বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি আপনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভালবেসে ফেলি। কিন্তু যখন ভেবেছি আরো কিছুদিন আগে দেখা হলে আমরা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত হতে পারতাম তখন হতাশায় ভরে গেছে মন।

এম্মা বলল, এ ভাবনা আমিও কতবার ভেবেছি।

লীয় আবেগের সঙ্গে বলল, একি স্বপ্ন!

তার লম্বা টুপীটার উপর নীল প্রান্তটায় আঙুল বুলিয়ে এম্মা সোজা হয়ে বসল।

লীয় বলল, কেন আমরা প্রথম থেকে সব কিছু শুরু করতে পারি না?

এম্মা বলল, না না, আর তা হয় না। আমার বয়স অনেক হয়েছে, এখন তোমার বয়স কম আছে। তুমি জীবনে অনেক ভাল মেয়ে পাবে। অনেক ভালবাসার জন পাবে।

লীয় চিৎকার করে বলল, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি।

এম্মা বলল, তুমি ছেলেমানুষ। ব্যাপারটা বুঝতে হবে আমাদের। আমরা আগেকার মতই পরস্পরকে বন্ধুভাবে ভাই বোনের মত ভালবাসব।

এসব কথা এম্মা কি মনের গভীর থেকে বলছে অথবা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বলছে কিনা সে নিজেই তা বলতে পারবে না। লীয়র প্রেম নিবেদনের কথাগুলোর মধ্যে একটা মোহ এবং আবেদন ছিল সে তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারছিল না, তেমনি তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষারও একটা তাগিদ অনুভব করছিল। লীয়র মৃদু কম্পিত ভীরু হাতখানা তাই সে সরিয়ে দিল।

'ক্ষমা করবে'। বলে সরে এল লীয়।

লীয়র এই ভীরুতার সামনে সেদিনকার সেই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসা দুর্ধর্ষ রুডলফের থেকে বড় রকমের এক বিপদের সম্ভাবনা খুঁজে পেল এম্মা। আজ লীয়কে যত সুন্দর দেখাচ্ছে এমন সুন্দর এর আগে কোন মানুষকে দেখায়নি। তার সুন্দর চুল, টানা টানা চোখ, মসৃণ গাল সব মিলিয়ে তার দেহসৌন্দর্যের অনিবারণীয় আবেদনের কাছে হার মানল এম্মা। তাকে চুম্বন করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল তার মধ্যে। তবু ঘড়ির দিকে তাকাল এম্মা। আশ্চর্য হয়ে বলল, হা ভগবান, কতক্ষণ আমরা গল্প করছি!

লীয় উঠে দাঁড়াল যাবার জন্য।

এম্মা বলল, আমি ত অপেরা যাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অথচ চার্লস বেচারা আমাকে অপেরা দেখার জন্যই রেখে গেল এখানে। ঠিক হয়েছিল আমি মাদাম নর্থের কাছে ক্য গ্রাঁজ পঁতে যাব। তাছাড়া এই সুযোগ। কালই আমাকে চলে যেতে হবে।

লীয় বলল, সত্যি কালই যাবেন?

এম্মা বলল, হ্যাঁ।

লীয় বলল, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমাকে আবার দেখা করতে হবে। আপনাকে বলার কিছু কথা আছে।

কি কথা?

লীয় আমতা আমতা করে বলল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা···তুমি এখন যাবে না···তুমি যদি জানতে···তুমি এখনো আমাকে বুঝতে পারনি।

এম্মা বলল, অথচ তুমি যে কোন কথা ত বেশ স্পষ্ট করে বোঝাতে পার।

লীয় বলল, তুমি আমাকে উপহাস করছ। আমাকে উড়িয়ে দিতে চাইছ। কিন্তু আমার উপর দয়া করো। আর একবার এইখানেই দেখা করতে দাও।

একটু ভেবে নিয়ে এম্মা বলল, ঠিক আছে। তবে এখানে নয়।

লীয় বলল, যেখানে তোমার খুশি।

এম্মা বলল, আগামীকাল বড় গীর্জায় বেলা এগারোটায়।

লীয় এম্মার হাত ধরে বলল, তুমি ঠিক ঐ সময় ওখানে থাকবে যেন।

কিন্তু এম্মা তার হাত ছাড়িয়ে নিল। ওরা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল লীয় ছিল পিছনে আর এম্মা সামনে। সেই সুযোগে লীয় সামনের দিকে ঝুঁকে এম্মার ঘাড়ের উপর চুম্বন করতে লাগল।

কিন্তু যতবার লীয় তার ঘাড়টা চুম্বন করতে লাগল ততবারই এম্মা হাসতে হাসতে বলতে লাগল, তুমি একটি পাগল। আস্ত পাগল।

এম্মার কাঁধের উপর মুখ রেখে আরো কি বলতে যাচ্ছিল লীয়। কিন্তু এম্মার হিমশীতল চোখ দেখে বলতে সাহস পেল না। শুধু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আগামী কাল।

শুধু ঘাড় নেড়ে পাখির মত পাশের ঘরে ঢুকে গেল এম্মা।

সে রাতে লীয়কে একখানা লম্বা চিঠি লিখল। লিখল তাদের দেখা হওয়া আর সম্ভব নয়, কখনই সম্ভব নয়। সব কিছুর এইখানেই শেষ। তাদের পরস্পরের সুখের কথা ভেবে তাদের আর দেখা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু চিঠিখানা শেষ করে এম্মা মুস্কিলে পড়ল, সে লীয়র ঠিকানা জানে না। তখন মনে মনে বলল, সে যখন আসবে আমি তার হাতে দেব।

পরদিন সকাল থেকে লীয় তার পোষাক আশাক ঠিক করে তা পরে জুতো পালিশ করে রুমালে আতর মাখিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। লীয় তখন ঘড়িতে দেখল মাত্র নটা বাজে। সে আপন মনে বলল, আমার অনেক আগেই সব কিছু সারা হয়ে গেছে। সময় কাটাবার জন্য একটা পত্রিকা পড়ল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একটা সিগার খেল। তারপর বেড়িয়ে পড়ল।

সেদিন গ্রীষ্মের সকালটা ছিল বড় মনোরম। পথে যেতে যেতে লীয় লক্ষ্য করছিল সোনারূপোর দোকানের জানালার রূপোগুলো চকচক করছিল। বড় গীর্জাটার মাথায় সূর্যের উজ্জ্বল আলো ঝড়ে পড়ছে। পথের ধারে মাঝে মাঝে নানারকমের ফুলের গন্ধ আসছিল। লীয় একটা ভায়োলেট ফুল তুলে নিল এম্মার জন্য। কোন মেয়ের জন্য সে এই প্রথম ফুল তুলল।

বাঁ দিকের দরজা দিয়ে চার্চের ভিতর ঢুকল লীয়ঁ। চার্চের একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। সে জিজ্ঞাসা করল, মঁসিয়ে কি আজ শহর থেকে চার্চে বেড়াতে এসেছেন?

লীয়ঁ বলল, না।

সে একধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিতরে ঢুকে গেল। দেখল এম্মার কোন চিহ্ন নেই। তখন সে নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে প্রার্থনাসভার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে মাথার উপর একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছিল। নীচে একটা রূপোর বাতি জ্বলছিল। চার্চের আশেপাশে চ্যাপেল ও গাছপালা থেকে ছুটে আসা বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাচ্ছিল।

লীয়ঁ গম্ভীরভাবে প্রার্থনাসভার দেওয়ালের দিকে চলে গেল। জীবনে এত আনন্দ কখনো পায়নি সে। যে কোন মুহূর্তে সে এসে যেতে পারে। তার চমৎকার চেহারা, সুন্দর পোষাক, সোনার চশমা, সৌখীন জুতো সব মিলিয়ে তার সেই অনিন্দ্য সুন্দর চেহারাটা আজও ভোগ করতে পায়নি সে।

সে চেহারা আজ প্রায় আত্মসমর্পণের মুখে। লীয়ঁর মনে হলো সমগ্র চার্চটা যেন ক্রমগন্ধমান ধূপের গন্ধ ও ফুলের সম্ভার নিয়ে, তার অন্তরের সমস্ত শুচিতা নিয়ে এম্মার জন্যই প্রতীক্ষা করছে। তার প্রতিটি জানালায় যে সব আলো জ্বলছে সে আলোর সকল ঐশ্বর্য শুধু এম্মার মুখমণ্ডলকে আলোকিত করার জন্য।

কিন্তু তখনো এম্মা এল না। প্রার্থনার ঘরে একটা চেয়ার টেনে লীয়ঁ বসে জানালার এক নীল সার্সির ভিতর দিয়ে বাইরে ঝুড়িকাঁধে জেলেদের দেখছিল। ঐ পথ দিয়েই হয়ত এম্মা আসবে।

হঠাৎ লীয়ঁ শুনতে পেল সিল্কের পোষাকের এক খসখস শব্দ। দেখল সত্যিই এম্মা। লীয়ঁ লাফিয়ে উঠে একরকম ছুটে গেল তার কাছে। কিন্তু এম্মা তার হাতে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে পড়তে বলে তাড়াতাড়ি চ্যাপেলের দিকে পা চালিয়ে দিল। সেখানে এক জায়গায় প্রার্থনা করতে বসল।

ধর্মীয় পবিত্রতার নামে এম্মার এই খামখেয়ালী ও হঠকারিতা মোটেই ভাল লাগছিল না লীয়ঁর। এম্মাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল সে।

লীয়ঁ দেখল একমনে প্রার্থনা করছে এম্মা। সে প্রার্থনার যেন শেষ নেই। এদিকে সত্যি সত্যিই আন্তরিকতার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করছিল এম্মা। প্রার্থনা করছিল যাতে ঈশ্বর তাকে উপযুক্ত আত্মশক্তি দান করেন, তার এই বিপদের সময়ে তিনি যাতে তাঁর ঐশ্বরিক সাহায্য সময় মত পাঠিয়ে দেন। প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে চার্চের নির্জন পরিবেশের শুচিশুভ্র স্তব্ধতা ও ফুলের গন্ধ প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল এম্মা।

এম্মা উঠে পড়ল। ওরা একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিল চার্চ থেকে। এমন সময় চার্চের সেই লোকটা এম্মার কাছে এসে বলল, মাদাম চার্চ ভাল

করে দেখবেন ?

লীয়ঁ বলল, না।

হঠাৎ এম্মা বলল, কেন নয় ?

তখন বাধ্য হয়ে সেই প্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে এম্মাকে নিয়ে ঘুরতে লাগল লীয়ঁ। এদিকে এম্মা তার চরিত্রের গুণাবলীকে যাতে ধরে রাখতে পারে দৃঢ় ভাবে, যাতে নূতন করে তার চরিত্রের অধঃপতন আর না ঘটে এজন্য যে কোন ধর্মীয় উপাদানকে সে মরীয়া হয়ে আঁকড়ে ধরতে লাগল।

প্রদর্শক বা পথপরিচালক সেই লোকটি ওদের নিয়ে চার্চের বাইরে থেকে শুরু করল। বলতে লাগল, ঐ সেই 'এ্যাম্বোসে' ঘণ্টা যার ওজন হলো চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। সারা ইউরোপের মাঝে এ ঘণ্টার তুলনা নেই। যে কর্মী এই ঘণ্টা তৈরি করে সে সাফল্যের আনন্দে মারা যায়—

লীয়ঁ বলল, এখান থেকে এবার যাওয়া যাক।

প্রদর্শক বলতে লাগল, এই সামান্য পাথরটি সেই বীর পুরুষের বিশ্রামের স্থানটিকে সূচিত করছে যার নাম পীয়ের দ্য ব্রেৎসে এবং তিনি ছিলেন ভ্যারেলীর লর্ড, যিনি ছিলেন নর্মাণ্ডির শাসনকর্তা এবং তিনি মন্তেনহেরির যুদ্ধে ১৪৬৫ সালের ১৬ই জুলাই মারা যান।

অধৈর্য হয়ে লীয়ঁ তার ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

এদিকে প্রদর্শক লোকটি আগেকার কথার জের টেনে বলে যেতে লাগল। এঁর ডান দিকে পূর্ণ অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত যে অশ্বারোহীকে দেখছেন তিনি এঁর পৌত্র লুই দ্য ব্রেৎসে। ইনি ছিলেন ব্রেভেলের লর্ড, উনি ১৫৩১ সালের ২৩শে জুলাই রবিবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মাদাম বোভারী তার চশমাটা তুলল। লীয়ঁ তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও বলল না। শুধু এম্মার পানে তাকিয়ে রইল। তার ঔদাসিন্যে সে একেবারে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিল।

এদিকে প্রদর্শক আবার বলে চলেছিল, তার পাশে নতজানু অবস্থায় ক্রন্দনরত যে মহিলাকে দেখছেন তিনি হচ্ছেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর নাম ডায়েন দ্য পয়তিয়ের। তাঁর স্বামী ছিলেন ব্রেৎসের কাউন্ট ও ভ্যালেন্টিনায়েরের ডিউক। তাঁর জন্ম হয় ১৪৯৯ সালে এবং মৃত্যু ঘটে ১৫৬৬ সালে। তাঁর পাশে ছেলে কোলে মেরির মূর্তি। আর এই সারির দিকে তাকিয়ে দেখুন, প্রথমে রয়েছে দশজনের সমাধি। তাঁরা ছিলেন রুয়েনের কার্ডিনাল ও আর্কবিশপ। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ত্রয়োদশ লুইএর মন্ত্রী।

তার কথার স্রোত বন্ধ না করেই প্রদর্শক তাদের একরকম জোর করে পাশের চ্যাপেলে নিয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রদর্শক বলল, এটা হচ্ছে সেই বীরপুরুষের সমাধি যিনি ছিলেন ইংলণ্ডের সিংহহৃদয় রাজা রিচার্ড কোয়ার দ্য লায়ন। তিনি নর্মাণ্ডিরও ডিউক। ক্যানভিলপন্থীরাই

হিংসাবশত তার এই অবস্থা করেছে। তারাই তাঁকে এমনি শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে।

লীয়ঁ আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে তার পকেট থেকে একটা রূপোর মুদ্রা বার করে প্রদর্শককে দিয়ে এম্মার একটা হাত ধরে ফেলল। প্রদর্শক তার কাজ শেষ না হতেই পয়সা পেয়ে অবাক হয়ে গেল। ওরা চলে যাচ্ছিল। সে ওদের পিছন থেকে ডাকল, মঁসিয়ে, শুনুন। গীর্জার গম্বুজ বা চূড়াটা।

লীয়ঁ বলল, না, ধন্যবাদ।

ভুল করছেন মঁসিয়ে। এর উচ্চতা হচ্ছে চারশো চুয়াল্লিশ ফুট। মিশরের পিরামিড থেকে মাত্র নয় ফুট কম। একেবারে খাঁটি লোহার ঢালাই করা।

লীয়ঁ যেন পালিয়ে যাচ্ছিল কোন ভয়ঙ্কর বস্তুর কাছ থেকে। তার মনে হচ্ছিল এই দুটি ঘণ্টা ধরে চার্চের শুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে এক প্রস্তরসুলভ কাঠিন্যে নিষ্প্রাণ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ। ধোঁয়ার মতই সে প্রেম উবে যাচ্ছিল।

এম্মা বলল, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?

লীয়ঁ একথার কোন উত্তর না দিয়েই দ্রুত চার্চ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল এম্মার একটা হাত ধরে। এদিকে তারা হঠাৎ কার হাঁপানির শব্দ শুনতে পেল। লীয়ঁ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সেই প্রদর্শক লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে বলল, মঁসিয়ে।

লীয়ঁ বলল, কি?

প্রদর্শক তার পেটের উপর প্রায় কুড়িখানা বইএর দিকে দেখিয়ে বলল, এই বইগুলো সব এই গীর্জা সম্বন্ধে।

লীয়ঁ বলল, বোকা কোথাকার।

লীয়ঁ পা চালিয়ে চার্চের বাইরে চলে এল। বাইরে এক অর্বাচীন ছেলে খেলা করছিল। লীয়ঁ বলল, আমাদের জন্য একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে দাও।

ছেলেটা এক দৌড়ে চলে গেল। ওরা দুজন ততক্ষণ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। কে কি বলবে তার কিছুই খুঁজে পাচ্ছিল না।

এম্মা এক সময় বলল, ও লীয়ঁ, আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব।

তারপর গলার স্বরটা আরো ভারী করে বলল, সত্যিই এটা কিন্তু অন্যায় ও অশোভন কাজ হচ্ছে।

লীয়ঁ বলল, অন্যায় ও অশোভন কি বলছ? প্যারিসে ত একাজ সবাই করে।

কিন্তু গাড়ির কোন চিহ্ন নেই। লীয়ঁ ক্রমশই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। সে ভয় করছিল, কত কষ্ট করে যে এম্মাকে ধরে এনেছে সেই এম্মা আবার চার্চের মধ্যে চলে না যায়।

অবশেষে গাড়ি এসে গেল। এদিকে প্রদর্শক লোকটাও কখন তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলল, উত্তরের এই গেটটা পার হয়ে চলে যান। কিন্তু বইগুলো একবার দেখবেন না? এটা হচ্ছে পুনরুত্থান, এটা হলো শেষ বিচার। স্বর্গ, রাজা ডেভিড, আর নরকের আগুনে জলতে থাকা অভিশপ্ত আত্মারা।

গাড়ির চালক বলল, মঁসিয়ে কোথায় যেতে চান?

লীয়ঁ এম্মাকে একরকম জোর করে গাড়ির ভিতর টেনে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, যেখানে হোক চল।

গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রথমে গাড়িটা ক্যু দ্য গ্রাঁদ পঁত ও প্লেস দে আর্তস্ পার হয়ে নেপলিয়ঁ ঘাট ছাড়িয়ে অবশেষে পীয়ের কর্ণেলের প্রতিমূর্তির সামনে একবার থামল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এগিয়ে চল।

গাড়িটা আবার ছেড়ে দিল। এবার গাড়িটা তার গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে রেল স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। আবার হুকুম এল, এগিয়ে চল।

স্টেশন গেটটা ছাড়িয়ে গাড়িটা ধীর গতিতে দুধারে সারবন্দী ঘন সন্নিবিষ্ট এলম্ গাছের ভিতর দিয়ে বুলভার্ডের মাঝে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল। গাড়ির চালক কপালের ঘাম মুছে বুলভার্ড ছাড়িয়ে গাড়িটা নদীর ধারে যাবার পথ ধরল।

নির্জন নদীর ধারে মাঠটায় অনেকক্ষণ গাড়িটা ঘুরে বেড়াবার পর ময়মেনের পথ ধরল। তারপর ময়মেনকে পিছনে ফেলে কোয়ার্তার মারের মধ্য দিয়ে বা দেলবোক্ষের প্রান্তরে গিয়ে জার্দিন দ্য প্রান্তের মাঝখানে গিয়ে তৃতীয়বারের মত থামল।

তবু গাড়ির ভিতর থেকে আরো জোর গলায় গাড়ির চালককে নির্দেশ দেওয়া হলো, গাড়ি চালাও। এগিয়ে চল।

গাড়িটা তখন আবার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে সেণ্ট সেভারের মধ্য দিয়ে ছুটতে লাগল। নদীর পুল পার হয়ে হাসপাতালের পিছনে বড় বাগানটায় গিয়ে পড়ল। সবুজ আইভি লতায় ভরা অপরাহ্ণের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়া বাগানটায় তখন কয়েকজন বৃদ্ধ লোক কালো পোষাক পরে বেড়াচ্ছিল।

সেই বাগানটাকে পেছনে ফেলে গাড়িটা এবার পাহাড়ের পথে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে চলল গাড়িটা। কিন্তু ঠিক পাহাড়ে গেল না। পাহাড়ী পথের দুধারে যে সব চার্চ পাওয়া যায় সেই সব চার্চ একটার পর একটা করে পার হয়ে ইতস্ততঃ এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে

এক একটা কাফে দেখতে পায় আর গাড়ির চালক সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থামার চেষ্টা করে। যখনি কোথাও থামতে যায় বা থামার চেষ্টা করে তখনি গাড়ির ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। তাকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গাড়ির চালক বুঝতে পারে না তার গাড়ির আরোহীরা হঠাৎ উন্মাদ হয়ে গেল কি না। বুঝতে পারে না কোন রহস্যময় কারণে তারা কোথাও থামতে চাইছে না বা নামতে চাইছে না গাড়ি থেকে। সব আরোহীরই একটা না একটা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু এদের কি কোন লক্ষ্য নেই, যাবার কোন জায়গা নেই ?

যাই হোক অনন্যোপায় হয়ে সে তখন তার ঘর্মাক্ত কলেবর ঘোড়া দুটোকে চাবুক মেরে চালাতে থাকে। সে নিজেও কম ক্লান্ত হয়ে পড়েনি। দারুণ পিপাসায় গলা শুকিয়ে আসছিল তার। ক্রমেই হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল তার মন।

আবার সেই নদীর ধার। চারদিক ঢাকা দেওয়া জোর করে সাঁটা জীবন্ত সমাধির মত গাড়িটা কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করল নদীর ধারে। তারপর এক সময়ে নদীর ধার থেকে একটু দূরে থামল গাড়িটা আর তখন অপরাহ্ণের হলুদ আলো গায়ে মেখে দুটি সাদা প্রজাপতির মত গাড়ি থেকে নামল দুটি মানুষ। জায়গাটা হলো বুভিসিনের কাছাকাছি। বড় রাস্তাটাও দূরে নয় এখান থেকে। একজন নারী সেই গাড়ি থেকে নেমেই পিছন ফিরে না তাকিয়ে সোজা এগিয়ে চলল।

২

মাদাম বোভারী সোজা তার হোটেলে চলে এল। এসে আশ্চর্য হয়ে গেল, তার গাড়ির তখনো কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু খোঁজ নিয়ে পরে জানল, হিভার্ত তার জন্য গাড়ি নিয়ে যথাসময়ে এসেছিল। কিন্তু তার দেখা না পেয়ে তিপ্পান্ন মিনিট অপেক্ষা করে চলে গেছে।

সেই সন্ধ্যায় মাদাম বোভারীর বাড়ি ফেরার কথা হলেও সে যদি না যায় তাহলেও কারো কিছু বলার নেই। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবু চার্লস তার জন্য অপেক্ষা করবে। তাছাড়া মাদাম বোভারীর মনটা স্বামীর প্রতি এক নম্রনীরব আনুগত্যে ভরে উঠেছিল। সে যেন তার অতীত ব্যভি-চারের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছিল এই আনুগত্যের মাধ্যমে। অনেক নারীরাই তাই করে।

মাদাম বোভারী তাড়াতাড়ি তার মালপত্র গুছিয়ে নিল। হোটেলের বিলের সব টাকা মিটিয়ে দিল। তারপর উঠোনে গিয়ে একটা গাড়িভাড়া করল। গাড়িতে উঠে গাড়ির চালককে ভালভাবে বুঝিয়ে বলে দিল মাদাম

বোভারী। বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি চালিয়ে তার গাড়িটাকে ধরতে হবে।

ইয়নভিল থেকে হিরণদেল নামে যে গাড়িটা নিতে এসেছিল মাদাম বোভারীকে সে গাড়িটাকে শহরের বাইরে গিয়েই ধরে ফেলল তার ভাড়া করা গাড়িটা। মাদাম বোভারী নিশ্চিন্তে হিরণদেলের ভিতর এককোণে বসে চোখ দুটো বন্ধ করে দিল।

সে চোখ খুলল ইয়নভিলের গাঁয়ের প্রান্তে গাড়িটা পৌছানোর পর। তাদের বাড়ির কাছে গিয়ে থামল গাড়িটা। ফেলিসিতে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। তারপর কাছে এসে মাদাম বোভারীকে বলল, মাদাম, আপনি সোজা মঁসিয়ে হোমার কাছে চলে যান। দরকারী কথা আছে।

গ্রামটা তখন শান্ত। তখন সাধারণতঃ জেলি তৈরির সময়। সারা বছরের মধ্যে এই সময় জেলি সরবরাহ করা হয় বিভিন্ন জায়গায়।

মাদাম বোভারী বাড়িতে না ঢুকে সোজা হোমাদের বাড়ি চলে গেল। গিয়ে হলঘরের দরজায় চাপ দিল। ঘরের ভিতর ঢুকেই অবাক হয়ে গেল এম্মা। দেখল ঘরের মধ্যে তুমুল কাণ্ড চলছে। আর্ম চেয়ারটা উল্টোন, কতকগুলো জিনিস এখানে সেখানে ছড়ানো। ছেলেমেয়েগুলো ঘোরাফেরা করছে ঘরের ভিতর আর জাস্টিন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মঁসিয়ে হোমা জাস্টিনের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে, কে তোমাকে যেতে বলল?

এম্মা কিছু বুঝতে না পেরে হোমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে, ব্যাপারটা কি?

হোমা বলল, ব্যাপার কি বলছেন? আমরা জেলি তৈরি করছি। জেলিটা এখন আগুনের উপর চাপানো আছে। এখনি উতলে উঠবে। পড়ে যাবে। আমি ওকে একটা প্যান আনতে বললাম। আর এই অপদার্থ ছেলেটা ল্যাবরেটারীতে গিয়ে কুঁড়েমি করে হুক থেকে ক্যাপারনামের চাবিটা নিয়ে এল।

ক্যাপারনাম হলো হোমার একটা ছোট ঘরের নাম যেখানে ওষুধপত্র রাখার বাসন ও নানারকমের পাত্র থাকে। হোমার কাছে এই ঘরটা সামান্য একটা ঘর নয়, এ এক পবিত্র স্থান। এ ঘরে সে প্রায়ই একা একা অনেক সময় বড়ী তৈরি করে, অনেক শিশিতে লেবেল দেয়। অনেক সময় প্যাকেট খুলে নতুন প্যাকেট করে। হোমা বলে এই ঘরে এমন অনেক বড়ী বা ওষুধের জন্ম হয় যা গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গায় ছড়িয়ে যায় আর তাতে তার নাম যশ বেড়ে যায়।

এই ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না হোমা। সে নিজেও দরকার না পড়লে যখন তখন যায় না। ঘরখানাকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। দরকার হলে সে একা এর ভিতর নির্জনে কাজ করে যায়। সকলকে ঢুকতে দিলে এ ঘরের

পবিত্রতা ও তার সুনাম আর থাকবে না। জাস্টিন সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে যাওয়ার জন্ম তার উপর ভয়ঙ্করভাবে রেগে যায়। যেন এক বিরাট অপরাধ করে বসেছে জাস্টিন।

হোমা বলল, হ্যাঁ, তুমি ক্যাপারনামে ঢুকবে। যে চাবি এই ঘরের মধ্যে এ্যাসিড, সোডা, এ্যালক্যালি প্রভৃতি দরকারী জিনিস রক্ষা করে চলে সেই চাবিতে তোমার দরকার পড়ল। কারণ সে ঘরে গিয়ে ঢাকনাওয়ালা ওষুধের প্যানটা না আনলে তোমার চলছিল না। এ প্যান আমি কখনো বাড়ির ব্যাপারে ব্যবহার করি না তা তুমি জান না? ওষুধের জিনিসপত্র কখনো কেউ ঘরসংসারের কাজে ব্যবহার করে? তার মানে অপারেশন ছুরি দিয়ে কি তুমি মুরগীর মাংস তৈরি করবে?

হোমার কথা শেষ হয়নি। সে আরো কত কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মাদাম হোমা বলল, যাক, আর মাথা খারাপ করো না। উত্তেজিত হয়ো না। তার এ্যাথেলি নামে মেয়েটা হোমার কোটের আঁচল ধরে টানছিল। 'বাবা' বলে ডাকছিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু শুনবে না হোমা। সে সবাইকে হুকুম দিল, আমাকে তোমরা একটু একা থাকতে দাও। আমি বুঝতে পারছি না আমাকে ওষুধের দোকানদার না করে ভগবান মুদির দোকানদার করল না কেন? আমি বলছি যাও, ওঘরের পবিত্রতা সব নষ্ট করে দাও। সব কিছু ভেঙে ফেল। জোঁক-গুলোকে সব ছেড়ে দাও। কাচের জারগুলোকে ফুটো করে দাও।

এবার এম্মা বলল, কিন্তু আমাকে আপনি কি বলবেন বলছিলেন?

হোমা বলল, এক মিনিট মাদাম। আপনি কি জানেন কি বিপদের ঝুঁকি আপনি নিতে যাচ্ছিলেন? আপনি জানেন না। কিন্তু আমি জানি। আপনি একটা কাচের শিশি দেখতে পাচ্ছেন যার মুখটা হলুদ মোম দিয়ে আঁটা, যার উপর 'বিপজ্জনক' এই কথাটা লিখে দিয়েছিলাম। ওর মধ্যে কি আছে জানেন? আছে আর্সেনিক। আর এটা নিয়ে ব্যবহার করতে যাচ্ছিল।

মাদাম হোমা চমকে উঠল, আর্সেনিক? তুমি ত আমাদের সকলকে খাওয়াচ্ছিলে?

এমন কি ছেলেগুলো পর্যন্ত বিষের কথা শুনে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। মনে হলো তারা যেন বিষ খেয়ে ফেলেছে এবং যন্ত্রণায় কাতরে উঠছে।

মাদাম হোমার কথাটার জের টেনে মঁসিয়ে হোমা বলল, আর তোমরা যে একটা রোগীকে বিষ দিয়ে মারতে বসেছিলে। তোমরা কি চাও একজন সাধারণ অপরাধী হিসাবে আদালতে আমার বিচার হোক? তোমরা কি চাও আমাকে ফাঁসির কাঠে ঝোলানো হোক? তোমরা জানো না আমি কত সাবধানে কাজ করি এই সব নিয়ে? কারণ আমার দায়িত্বের কথা আমি জানি। একটু কিছু হলেই সরকার আমাকে ধরবে। আমার মাথার উপর

সব সময়ের জন্য ঝুলছে ডেমোক্লস্‌-এর খড়্গ আমি তা জানি।

এম্মা আর কোন কথা বলার চেষ্টা করল না। তাকে কেন ডেকেছে হোমা সেকথা একবার তাকে জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগই পেল না সে।

এদিকে হোমা তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের লক্ষ্য করে সমানে বলে চলল, তোমাদের প্রতি এতদিন ধরে এত দয়ামায়া দেখানোর এই হলো প্রতিদান? এই তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতি? আমি তোমাদের এত যত্নে প্রতিপালন করে আসছি আর তার প্রতিদান দিচ্ছ তোমরা এইভাবে। আমি যদি না থাকি তাহলে কোথায় থাকবে তোমরা? কি করবে তোমরা? কে তোমাদের খাওয়াপরা যোগাবে। কোথায় থাকবে তোমাদের এই সামাজিক মর্যাদা আর খাতির।

আবেগের মাথায় হোমা একটা লাতিন প্রবাদবাক্য শোনাল। হোমা যখন রেগে যায় তখন এইভাবে সে একাধিক ভাষায় কথা বলে। সে যদি জানত তাহলে হয়ত চীনা ভাষাতেও কিছু বলত। ঝড়ের প্রহারে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তলদেশের আগাছা পর্যন্ত যেমন দেখা যায় তেমনি হোমা এইভাবে রেগে গেলে তার অন্তরের তলদেশ পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেয়।

হোমা আবার বলতে লাগল, এখন আমার অনুশোচনা হচ্ছে, আমি স্বীকার করছি আমি অন্যায় করেছি তোমাকে এনে কাজ দিয়ে। তোমাকে সেই অবস্থা থেকে না আনাই ভাল ছিল। কষ্টে মরাই তোমার ভাল ছিল। রাখালের মত গরু চড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ তোমার দ্বারা হবে না। বিজ্ঞানের কোন জিনিস বোঝাব মত ধাতু তোমাব মধ্যে নেই। শিশিতে একটা লেবেল বসাবার ক্ষমতাও তোমার নেই। অথচ তুমি আমার পয়সায় এখানে থেকে দিনের পর দিন শূয়োরের মত গিলে যাচ্ছ।

এম্মা এবার মাদাম হোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমাকে কি বলার জন্য ডাকা হয়েছিল।

মাদাম হোমা বলল, জানি, কিন্তু কি করব। কি বিপদ যাচ্ছে দেখুন।

মাদাম হোমার কথা শেষ না হতেই মঁসিয়ে হোমা বলতে লাগল, এটা খালি কর। ফিরিয়ে নিয়ে যা।

জাস্টিনের জামার কলার ধরে এই কথাগুলো বলতে গিয়ে তার পকেট থেকে একখানা বই পড়ে গেল। বইখানা জাস্টিন ঝুঁকে কুড়োতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই হোমা তা কুড়িয়ে নিল। বইটার উপর লেখা ছিল, দাম্পত্য প্রেম। প্রথমে বইটার নাম দেখে হোমা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর চিৎকার করে বলল 'দাম্পত্য প্রেম'। খুব ভাল কথা। চমৎকার। আবার ছবি। সবকিছু ছেড়ে এখন এই সব চলছে।

বইটা দেখার জন্য মাদাম হোমা এগিয়ে এল। কিন্তু মঁসিয়ে হোমা বলল, কেউ ছোঁবে না বা দেখবে না এ বই।

ছেলেগুলো ছবি দেখার জন্য ভিড় করছিল। কিন্তু হোমা চিৎকার করে ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলল। বলল, সব বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হোমা খোলা বইটা হাতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে পরে জাস্টিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তার সামনে হাত জোর করে বলল, তাহলে তলায় তলায় সব রকম পাপই চলছে। তুমি এখন অধঃপতনের পথে নেমে চলেছ। এটা কি তোমার মনে একবারও আসেনি যে এই বই আমার ছেলেমেয়েরা পড়তে পারত। এ্যাথেলি পড়তে পারত, নেপলিয়ন বড় হয়েছে সে পড়তে পারত। আচ্ছা তুমি কি শপথ করে বলতে পার এ বই ছেলেদের হাতে পড়েনি? এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?

এম্মা এবার অধৈর্য হয়ে বলল, মঁসিয়ে আমাকে কি বলবেন বলছিলেন।

হোমা বলল, হ্যাঁ মাদাম। আপনার শ্বশুড় মারা গেছেন।

কথাটা সত্যি, চার্লসএর বাবা বৃদ্ধ মঁসিয়ে বোভারী দুদিন আগে টেবিল থেকে উঠে যাবার সময় হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যান। চার্লস সেখানে চলে যাবার সময় হোমার উপর এম্মাকে খবর দেওয়ার ভার দিয়ে যায়। এম্মা শহর থেকে এসেই কথাটা শুনে যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য চার্লস তাকে খবরটা কৌশলে মিষ্টি করে ধীরে ধীরে বলতে বলে।

হোমাও এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করে। সে এই খবরটা কিভাবে দেবে, কথাটা কোন অলঙ্কারের সঙ্গে মিশিয়ে বলবে তা নিয়ে নিজের মনে মনে অনেক কিছু ভাবে। কিন্তু রাগের আবেগ আর আতিশয্য তার সব অলঙ্কার ভাসিয়ে দেয়। সে কথাটা সোজাসুজি বলে ফেলে।

মাদাম বোভারী দেখল যে ঘটনা ঘটে গেছে তার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে লাভ নেই। সে তাই সোজা তাদের বাড়ি চলে গেল। তাছাড়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগও পেল না। কারণ মঁসিয়ে হোমা আবার তার অভিযোগ অনুযোগগুলো উদ্‌গার করতে শুরু করেছে।

তবে আগের থেকে একটু নরম হলো হোমা। অভিভাবকের মত বলতে লাগল, আমি যে এ ধরনের বই একেবারে পড়তে নিষেধ করছি তা নয়। এ বইএর লেখক একজন ডাক্তার। এতে এমন কতকগুলো বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা প্রত্যেকেরই জানা উচিত। কিন্তু আরো পরে। আগে তুমি মানুষ হও। আগে তোমার চরিত্র গঠিত হোক, তারপর এসব পড়বে।

এদিকে চার্লস তার বাবার বাড়ি থেকে ফিরেই জানতে পারল এম্মা এসে গেছে। সে তখন দুহাত বাড়িয়ে এম্মার দিকে এগিয়ে এল। তার চোখে জল।

চার্লস মাথাটা নিচু করে এম্মাকে চুম্বন করতে গেল। কিন্তু চার্লসএর ঠোঁটের স্পর্শে লীয়ঁর কথা মনে হতেই মুখের উপর হাতটা বুলিয়ে এম্মা কেঁপে উঠল

মনে মনে। যাই হোক চার্লসএর কথার উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ জানতে পারলাম। সব শুনলাম।

চার্লস তাকে তার মার একখানা চিঠি দেখাল। তাতে লেখা আছে চার্লসএর বাবা বাড়িতে মারা যাননি। ত্নন্দেভিলের কাছে এক কাফের বাইরে ভূতপূর্ব সামরিক অফিসারদের এক ভোজসভায় তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়।

চিঠিখানা পড়ে চার্লসকে ফিরিয়ে দিল এম্মা। খাবার সময় এম্মা বলল তার ক্ষিদে নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে এই শোকাবহ ঘটনাটাকে গুরুত্ব দেবার জন্যই সে একথা বলল। কিন্তু চার্লস তাকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে সে গিয়ে খেতে বসল।

এম্মার উল্টোদিকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্তব্ধভাবে বসল চার্লস। করুণ দৃষ্টিতে কাঙালের মত তাকিয়ে রইল এম্মার মুখপানে। অবশেষে বলল, আর একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হলে ভাল হত।

এম্মা কিন্তু কোন কথা বলল না। পরে যখন বুঝল তার কিছু বলা উচিত এক্ষেত্রে সে বলল, তোমার বাবার বয়স কত হয়েছিল?

চার্লস বলল, আটান্ন।

এম্মা বলল, অঃ।

কিন্তু দুজনেই চুপচাপ। পরে চার্লস বলল, আমার মা। এবার তাঁর কি হবে?

এম্মা এমন একটা ভঙ্গি করল যাতে বোঝা গেল কি হবে তা সে জানে না। এম্মাকে নীরব দেখে চার্লস ভয় পেয়ে গেল। ভাবল তাদের শোকের আবেগ হয়ত তাকেও স্পর্শ করেছে। তাই সে তার দুঃখের কথা বলে এম্মার মধ্যে কোন দুঃখের আবেগ জাগাতে চাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রসঙ্গটাকে পাল্টে ফেলার জন্য চার্লস বলল, গতকাল তাহলে বেশ ভালই কাটালে?

এম্মা বলল, হ্যাঁ।

টেবিলের কাপড়টা সরানো হলেও ওরা দুজনের কেউ উঠল না। দুজনেই চুপচাপ বসে রইল। এম্মা চার্লসএর মুখপানে যতই তাকাতে লাগল ততই চার্লসএর প্রতি যেটুকু মমতা ও করুণা অবশিষ্ট ছিল তাও নিঃশেষে অপসারিত হয়ে গেল তার মন থেকে। চার্লসকে তার মনে হতে লাগল সে একটা দুর্বল, অপদার্থ, অতি তুচ্ছ এবং সবদিক থেকে ঘৃণ্য এক ব্যক্তি। কিভাবে সে মুক্তি পাবে তার হাত থেকে অন্ততঃ এই সন্ধ্যার মত। এই সন্ধ্যাটাকে দুঃসহ ও অস্বাভাবিক ভাবে দীর্ঘায়িত মনে হচ্ছিল তার।

এম্মার ব্যাগটা বাড়িতে দিয়ে যাবার জন্য হিপ্পোলিতে এল কাঠের ক্রাচে ভর দিয়ে। হিপ্পোলিতের কথাটা আজকাল তেমন আর ভাবে না চার্লস। তবু তার এই উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করতে লাগল। তাকে দেখে মনে হলো সে

যেন এক মূর্ত তিরস্কার।

হিপ্পোলিতে তাদের ঘরের দরজার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। চার্লস তাকে দেবার জন্য পকেটে একটা কিছু মুদ্রার খোঁজ করল। কিন্তু পেল না। না পেয়ে সে অবাঞ্ছিত এই পরিস্থিতির অপ্রীতিকর ভাবটাকে কাটাবার জন্য এম্মাকে বলল, চমৎকার ফুলের তোড়াটা ত। লীয়ঁ দিয়েছে বোধহয়?

এম্মা বলল, গতকাল এক ভিখারিণীর কাছ থেকে কিনেছি।

চার্লস তোড়ার ভায়োলেট ফুলগুলো নিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরল। ক্রমাগত চোখের জল ফেলে ফেলে চোখগুলো লাল করে তুলেছিল চার্লস। ফুলের শীতল পাপড়িগুলোকে তার তপ্ত লাল চোখের সামনে তুলে ধরল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এম্মা ফুলগুলো চার্লসএর হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে আবার সাজিয়ে রাখল একগ্লাস জলের মধ্যে।

পরের দিন চার্লসএর মা এসে হাজির হলেন। মা ও ছেলেতে মিলে প্রচুর কাঁদতে লাগল। ঘরসংসারের অজুহাত দেখিয়ে এম্মা ব্যস্ততার মধ্যে দূরে সরিয়ে রাখল নিজেকে। ওদের কান্নায় যোগ দিল না। কিন্তু পরের দিন ওরা তিনজনে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে করে নদীর ধারে শোক প্রকাশ করতে গেল।

চার্লস তার বাবার কথা ভাবতে গিয়ে বুঝল সে তার বাবাকে এমন করে কোনদিন ভালবাসেনি। তাঁর মর্ম আজকের মত এমন করে কোনদিন বোঝেনি। চার্লসএর মাও আজ বুঝল তাঁর স্বামীর মর্ম। তিনি তাঁর স্বামী জীবিতকালে কত ঝগড়া ও অশান্তি করেছেন। একমাত্র এম্মাই মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করল না। সে শুধু ভাবতে লাগল এখন থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে সে সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে আবদ্ধ ছিল। সে তার মনের মানুষের সঙ্গে দুজনে এমনভাবে আবদ্ধ ছিল, দুজনে দুজনকে প্রাণভরে উপভোগ করছিল যে বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কোথায় কি ঘটছে তারা তার কিছুই ঘুণাক্ষরে জানতে বা বুঝতে পারেনি। সেই বিগত দিনের মাধুর্যের প্রতিটি অংশ ও খুঁটিনাটি স্মরণ করে স্মৃতির মধ্য দিয়ে তা নতুন করে আস্বাদন করতে চাইল। কিন্তু চার্লস ও তার মার উপস্থিতির জন্য এম্মা তা পারল না। সে এই পরিবেশ তার বাড়ির পরিবেশ মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। তার যে প্রেম দৈনন্দিন এই অবাঞ্ছিত জীবনের চাপে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে, যার জন্য দিনে দিনে হতাশা নিবিড় হয়ে উঠছে তার মধ্যে সেই প্রেমকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করতে লাগল মনে।

সেদিন ওরা তিন জনে ঘরসংসারের কাজ করছিল। এম্মা একটা পুরনো পোষাক কাটছিল। চার্লসএর হাতেও কাঁচি ছিল। সে একটা ফ্রক কোটকে ড্রেসিং গাউন বানানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। তার মার হাতেও কাঁচি ছিল।

এমন সময় সদর দরজা ঠেলে লেহুড়ে তাদের বাড়ি ঢুকল। লেহুড়ে এসে চার্লসকে বলল, তাদের এই বিপদের দিনে তার যদি কিছু করার থাকে তা হলে

সে অবশ্যই তাদের সেবা করবে। এম্মা বলল, এ ব্যাপারে তার সেবার কোন প্রয়োজন নেই।

লেহুড়ে তখন বলল, এখন তারা যদি তার সেবা গ্রহণ না করে তাহলে সে তাদের সঙ্গে গোপনে একটু কথা বলবে এবং কি কথা বলবে বা স্মরণ করিয়ে দেবে তা হয়ত তারা জানে।

চার্লস একথার অর্থ বুঝতে পেরে এম্মাকে চুপ করতে বলল। এম্মাও তা বুঝতে পেরে অন্যত্র চলে গেল। এম্মা চলে গেলে চার্লস তার মাকে বলল, ও এমন কিছু না, সামান্য একটা পারিবারিক ব্যাপার। চার্লস চাইছিল লেহুড়ের সঙ্গে তাদের সুদবন্ধকীর ব্যাপারটা তার মা যেন জানতে না পারে। তার মা তাহলে কড়া মন্তব্য করবে সব কিছুর উপর।

চার্লসএর মা সেখান থেকে চলে গেলে লেহুড়ে সরাসরি তার টাকার কথাটা তুলল। তারপর নানা ধরনের কথা বলতে লাগল। ওদের শরীরের কথাও জিজ্ঞাসা করল। লেহুড়ে বলল, সে শুধু ক্রীতদাসের মত খেটে যায়। লোকে তার সম্বন্ধে যাই বলুক সে এত খেটেও এখনো রুটির উপর একটু মাখন জোটাতে পারে না।

এম্মা তখনো বসেছিল। লেহুড়ের কথা শুনতে তার ভাল লাগছিল না। তবু তার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য আছে। আজ গত দুদিন তার খুব খারাপ লাগছিল।

লেহুড়ে বলল এম্মাকে, আপনি তাহলে এখন ভালভাবেই সেরে উঠেছেন। আপনার স্বামী তখন আপনাকে নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছিলেন। আপনার স্বামী সত্যিই স্বামী হিসাবে যে খুব ভাল আমি তা বলতে পারি। তখন অবশ্য আমি একটু মুস্কিলে পড়েছিলাম।

এম্মা বলল, কি মুস্কিলে?

লেহুড়ে বলল, কেন, আপনি ত সব জানেন? আপনার সেই ট্রাঙ্ক। তবে অবশ্য আমরা সব ঠিক করে নিই। আমি আজ এসেছিলাম অন্য কোন একটা চুক্তি বা ব্যবস্থা করার জন্য।

ট্রাঙ্কের কথা শুনে এম্মা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল লেহুড়ে কি তার সেই গোপন পরিকল্পনার কথা কিছু বুঝতে পেরেছিল? কিন্তু দেখল তার ভয় নিতান্ত অমূলক।

লেহুড়ে বলল, ও সেই সুদবন্ধকীর কাগজটা এনেছে। আজ চার্লস সেটা নতুন করে লিখে সই করে দিতে পারে। সে যদি এ ব্যাপারে তার স্ত্রীকে তার ওকালতনামা দিয়ে দেয় তাহলে এখন থেকে লেহুড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলবে এবং এই সামান্য ব্যাপারটা তারা দুজনেই মিলেমিশে ঠিক করে নেবে।

এম্মা ব্যাপারটা তখনো বুঝতে পারেনি। এম্মা তার কাছ থেকে বুঝতে চায়ও না। এজন্য লেহুড়ে প্রসঙ্গ পাল্টে অন্য সব জিনিসের কথা বলতে লাগল। তার দোকানের পণ্যের কথা তুলল।

আপনার আর একটা পোষাক চাই। আমি দেখেছি একটা বাড়িতে ব্যবহারের জন্য আছে। আর একটা বাইরের জন্য দরকার। তাই আমি বারো মিটার কাপড় আপনার একটা পোষাক তৈরির জন্য পাঠিয়ে দেব।

কিন্তু লেহুড়ে কাপড়টা পাঠিয়ে না দিয়ে নিজে এসে দিয়ে গেল। তারপর একদিন মাপ নিতে এল। এর পর বিভিন্ন অজুহাতে প্রায়ই আসতে লাগল লেহুড়ে। এসে নরম স্বরে কথা বলত। কিছু না কিছু উপকার করার ভাণ করত। কিন্তু লেহুড়ে যতবার আসত ততবারই এম্মাকে তার স্বামীর কাছ থেকে ওকালতনামা নেবার জন্য পরামর্শ দিত। অবশ্য সে প্রমিশারি নোট বা সুদবন্ধকীর কাগজের কথাটা একবারও বলেনি।

কিন্তু লেহুড়ে না বললেও এ কথাটা বোঝা উচিত ছিল এম্মার। তার অসুখের সময় চার্লস একবার তাকে হয়ত বলেছিল। কিন্তু সে ভুলে গেছে। তার ঠিক মনে নেই। তাছাড়া টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে এমনই অনীহা দেখাত তখন যে চার্লস হয়ত ভাল করে বলার কোন সুযোগ পায়নি। আর তার এই অনীহাটাকে তার শাশুড়ী তার ধর্মপ্রবণতার ফল বলে বাইরে প্রচার করল। অসুখের সময় এম্মা ধর্মের প্রতি যে প্রবণতার পরিচয় দেয় তার ফলেই সংসারের আয়ব্যয় ও ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে একেবারে।

চার্লসএর মা বাড়ি থেকে চলে যেতেই এম্মা তার স্বামীর কাছে কাজের কথা তুলল। এম্মা বলল, এখন তাদের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। কোথায় কি আছে দেখা উচিত। তার কোন সম্পত্তি বন্ধক আছে কি না এবং তা নীলাম করতে হবে কি না দেখতে হবে। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের মত স্বামীকে উপদেশ দিতে নারাজ এম্মা। এর পর হঠাৎ একদিন ওকালতনামার এক ফরম দেখাল চার্লসকে। তার যাবতীয় সকল সম্পত্তি দেখাশোনা, তার ঋণপত্র ও সুদবন্ধকীর কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার ও টাকা পয়সা লেনদেন করার সব অধিকার তাকে দান করে এই ফরমে স্বাক্ষর দান করবে চার্লস। এম্মা ভাবল লেহুড়ের পরামর্শ থেকে সে সত্যিই লাভবান হতে চলেছে।

চার্লস শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করল এই ফরমটা কার কাছে পেল সে।

এম্মা মিথ্যা করে বলল, গিলমিনের কাছ থেকে।

তারপর যতদূর সম্ভব শান্তভাবে এম্মা বলল, তার উপর আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই। নোটারি বা বন্ধকীর ব্যাপারগুলো আমার কাছে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কারো কাছে ব্যাপারটা আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত। আমি ত এমন কাউকে দেখছি না—

চার্লস বলল, একমাত্র লীয়ঁ ছাড়া আর ত কাউকে—

কিন্তু চিঠিতে এত সব কথা জানানো সম্ভব নয়। এম্মা তাই নিজে যেতে চাইল। চার্লস তাকে এই প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু আবার বলল, তার যাওয়া উচিত হবে না। এম্মা তবু জেদ ধরল।

এই নিয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ চলল। অবশেষে শিশুর মত অবুঝ গোঁয়াতুর্মির সঙ্গে এম্মা বলল, আমি যাবই। চার্লস তার কপালে চুম্বন করে বলল, সত্যিই তুমি কত ভাল !

পরদিন সকালেই 'হিরণদেল' গাড়িতে করে রুয়েনের দিকে রওনা হলো এম্মা। সেখানে গিয়ে সে মঁসিয়ে লীয়ঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শ করবে। সেখানে তিন দিন রয়ে গেল।

৩

তিন তিনটি দিন তারা অবাধ ও পূর্ণ আনন্দের মধ্যে কাটাল। ঠিক যাকে বলে মধুচন্দ্রিমা।

এই তিনটি দিন তারা ছিল রুয়েন শহরের নদীর ধারে হোটেল দ্য বুলোনে। সারাদিন তারা একটি রুদ্ধ ঘরের মধ্যে কাটাত। দরজা জানালা বন্ধ করা সারা ঘরখানায় থাকত ফুল ছড়ানো। পানীয় হিসাবে প্রায়ই খেত ফলের রস।

বিকাল হতেই তারা একটা নৌকো ভাড়া করে কোন একটা দ্বীপে গিয়ে নৈশভোজন করত। শেষ অপরাহ্নের এক নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ত নদীর জলে। দ্বীপের গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠত।

তাদের নৌকোটা নোঙর করা থাকত দ্বীপের ঘাটে। তাদের শিকলবাঁধা নৌকোটা নদীর ঢেউএর আঘাতে দুলতে থাকত। শহরের যত সব কলরব, জনগণের গুঞ্জন, মালগাড়ির শব্দ, কুকুরের ডাক সব দূরাগত ধ্বনির মত ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত। ওরা নৌকো থেকে নেমে দ্বীপের একটা রেস্তোরাঁর ঘরে চলে যেত। সে ঘরের দরজায় মাছ ধরার জাল টাঙানো থাকত। ওরা সেখানে ভাজা মাছ, মাখন আর চেরী মদ খেত। তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনের এক নির্জন কোণে ঘাসের উপর পরস্পরের হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ত পপলার গাছের তলায়। ওদের মনে হত ওরা যেন এইভাবে দুজন রবিনসন ক্রুসোর মত একটি জনমানবহীন দ্বীপে যুগ যুগ ধরে বাস করে চলে। এই ছোট্ট স্থানটুকুতেই তারা যেন সারা জগৎ ও জীবনের সব আনন্দ পূর্ণ মাত্রায় খুঁজে পায়। জীবনে এই প্রথম যে তারা গাছ, নীল আকাশ, ঘাসে ঢাকা প্রান্তর দেখছে তা নয়, জীবনে এই প্রথম যে তারা নদীর কলতান শুনছে তাও নয়; কিন্তু তাদের আগের দেখার মধ্যে এমন এক বিপুল বিস্ময়ের রোমাঞ্চ ছিল না। তাদের মনে হলো হয় এর আগে প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই ছিল না অথবা তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি এই প্রথম সুন্দর হয়ে উঠল তাদের চোখে।

রাত্রি ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আবার শহরে ফিরে আসত। নৌকো ছেড়ে দিত। রাত্রির ছায়া নেমে আসত নৌকোর উপর। ওরা ঘন হয়ে বসত দুজনে। কিন্তু একটা কথাও বলত না। চারদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে

একমাত্র শুধু দাঁড় টানার ছল ছল শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একমাত্র নদীর কলতান আর নদীর জলের উপর দাঁড় পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

সেই তিন দিনের মধ্যে একদিন রাতে চাঁদ উঠল আকাশে। ছায়া-ছায়া এক ভাবমগ্ন বিষাদে ভরে উঠল চারদিকের প্রকৃতি। সমস্ত পরিবেশ হয়ে উঠল কাব্যময়। এম্মার মুখ থেকে আপনা হতে গান বেরিয়ে এল একটা। গুনগুন করে এম্মা একটি গানের দুটি কলি গাইতে লাগল।

তোমার কি মনে আছে,
কোন এক রাতে কেমন আমরা
নৌকোয় করে বেড়াচ্ছিলাম,
কেমন আমরা নদীর জলের উপর ভাসছিলাম।
তোমার কি মনে আছে সে কথা?

এম্মার ক্ষীণ কণ্ঠটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে মিলিয়ে যাচ্ছিল নদীর বুকের উপর। লীয়ঁর মনে হলো পাখার পত্ পত্ শব্দ করতে করতে একটা পাখি উড়ে গেল।

নৌকোর ছোট্ট কেবিনটার দেওয়াল ঘেঁষে লীয়ঁর উল্টোদিকে বসে ছিল এম্মা। কেবিনের খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরখানায়। সেদিন এম্মা পরেছিল ঢিলে কালো পোষাক। সে পোষাকের ভাঁজ করা আঁচলগুলো তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে এম্মাকে আরো লম্বা ও রোগা-রোগা দেখাচ্ছিল। তার মাথাটা উপরের দিকে তোলা ছিল, তার চোখগুলো ছিল আকাশের পানে নিবদ্ধ। তার হাতদুটো ছিল জড়ো করা। নৌকোটা তীরের ধার ঘেঁষে যাবার সময় মাঝে মাঝে উইলো গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল আর তখন এম্মার মুখখানাও সেই ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল আর ছায়াটা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলোয় এম্মার মুখখানা শুভ্র প্রেতাত্মার মত দেখাচ্ছিল।

লীয়ঁ এম্মার পায়ের তলায় বসেছিল। সে হঠাৎ মেঝের উপর থেকে একটা লাদা চকচকে ফিতে তুলে নিল। নৌকোর মাঝি তা দেখতে পেয়ে বলল, ওটা তাহলে সেই পার্টিটার হবে। সেদিন ওরা আমার নৌকোতে চেপেছিল। ওদের পার্টিতে ছিল একদল ছেলে আর একদল মেয়ে। হাসিখুশিতে ভরা ছিল ওদের মুখ। ওরা সঙ্গে করে এনেছিল খাবার আর স্যাম্পেন। ওদের মধ্যে একজন ছিল অল্প মোচওয়ালা সুদর্শন এক যুবক। এ্যাডলফে না ডোডোলফে কি যেন তার নাম।

এম্মা চমকে উঠল সে নাম শুনে।

লীয়ঁ তার কাছে সরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, তোমার শরীরটা ভাল আছে ত?

এম্মা বলল, ও কিছু না। শুধু একটু শীত শীত করছিল।

নৌকোর মাঝি তার আগেকার কথাটার জের টেনে বলল, লোকটা ছিল এমনই যে কোথা হতে কোন মেয়ে তার কাছে আসছে তার কোন খবর রাখতে চাইত না।

বুড়ো মাঝি এম্মার প্রতি লীয়ঁর মমতা দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই যেন কথাটা বলল। তারপর দাঁড়টা হাতে তুলে নিল।

অবশেষে তাদের বিদায় নিতে হলো পরস্পরের কাছ থেকে। সে বিদায়ের দৃশ্য বড় করুণ। ঠিক হলো লীয়ঁ মাদাম রোলেতের ঠিকানায় এম্মাকে প্রায়ই চিঠি দেবে। এম্মা লীয়ঁকে জোড়া খাম ব্যবহার করতে শিখিয়ে দিল। তা দেখে প্রেমের ব্যাপারে এম্মার অভিজ্ঞতার বহর দেখে অবাক হয়ে গেল লীয়ঁ।

শেষবারের মত পরস্পরকে চুম্বন করল ওরা। এম্মা বলল, তাহলে সব ঠিক আছে ত?

লীয়ঁ বলল, সব ঠিক।

কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে তার বাসায় যাবার সময় লীয়ঁ আপন মনে বলতে লাগল, মেয়েটা ওকালতনামা নেবার জন্য এত জেদ ধরছে কেন তা ত বুঝছি না।

৪

আজকাল লীয়ঁ অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে ভালভাবে মেশে না। গম্ভীরভাবে কি যেন সব সময় ভাবে। অফিসের কাজেও ভাল করে মন বসে না। প্রায়ই এম্মার চিঠির কথা ভাবে। এম্মার চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গে বারবার তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে। তার প্রেমাবেগের সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে এম্মার ভাবমূর্তিটা মনের মধ্যে খাড়া করে লীয়ঁ। তারপর সেটাকে তার স্মৃতির রস দিয়ে সিক্ত করে নেয়।

এম্মা কাছে না থাকলেও তাকে দেখার ইচ্ছাটা দিনে দিনে বেড়ে যায় লীয়ঁর। অবশেষে একদিন ইয়নভিল গাঁয়ের পথে রওনা হয়ে পড়ল। পাহাড়ের উপর ইয়নভিল গাঁয়ের উপত্যকাটা যখন দেখতে পেল লীয়ঁ, যখন গাঁয়ের চার্চের চূড়াটা স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল তখন তার প্রচুর আনন্দ হলো। ভাবালুতার সঙ্গে আত্মতৃপ্তির এক অনুভূতি মিশ্রিত হয়ে তার আনন্দকে বাড়িয়ে দিল।

লীয়ঁ প্রথমে এম্মাদের বাড়ির কাছে গেল। দেখল তাদের রান্না ঘরে একটা আলো জ্বলছে। এম্মার ঘরের জানালায় এম্মার দেখা পেল না।

এম্মার দেখা না পেয়ে লীয়ঁ মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার হোটেলে চলে গেল। বহুদিন পর লীয়ঁকে দেখে আবার বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া। বলল, লীয়ঁ আগের থেকে আরো লম্বা ও রোগা হয়ে গেছে।

কিন্তু আর্তেমিসে বলল, লীয়ঁ নাকি আগের থেকে মোটা ও কালো হয়ে যাচ্ছে।

আগে হোটেলের যে ছোট্ট ঘরটায় খেত লীয়ঁ আজ সেই ঘরেই তার নৈশ-ভোজন সারল সে। তবে আজ তার সঙ্গে বিনেট ছিল না।

আজকাল বিনেট এক ঘণ্টা আগে অর্থাৎ পাঁচটা বাজতেই খেয়ে নেয়।

খাবার পর সাহস করে লীয়ঁ ডাক্তার বোভারীর বাড়ি গেল। এম্মা তার ঘরেই ছিল। মঁসিয়ে বোভারীও বাড়িতেই ছিল। লীয়ঁকে দেখে খুশি হলো সে। তবে সে সন্ধ্যায় বা পরের দিন বাড়ি থেকে একবারও বার হলো না।

এম্মাকে একা পেল লীয়ঁ রবিবার বিকালের দিকে। এম্মাদের বাড়ির পিছনের দিকে বাগানের সেই গলিটায় যেখানে রুডলফের সঙ্গে একদিন প্রায়ই দেখা হত এম্মার। তখন ঝড়বৃষ্টি চলছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একটা ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ওরা দুজনে।

বিচ্ছেদের বেদনা অসহ্য এম্মার কাছে। এম্মা বলল, এর থেকে আমার মৃত্যুও ভাল ছিল। লীয়ঁর হাতটা আবেগের সঙ্গে ধরে কাঁদতে লাগল এম্মা। কাঁদতে কাঁদতে বলল, বিদায়, আবার কখন দেখা হবে?

তারা দুজনেই দুজনকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু আবার দুজনেই ফিরে এসে শেষবারের মত আলিঙ্গন করল আর সেই আলিঙ্গনের সময় এম্মা প্রতিশ্রুতি দিল, এবার থেকে যেমন করেই হোক সে সপ্তায় অন্ততঃ একবার করে নিয়মিত দেখা করবে লীয়ঁর সঙ্গে। এম্মার দৃঢ় বিশ্বাস সে এ বিষয়ে সফল হবেই। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অনেক আশা করে সে। উত্তরাধিকারসূত্রে যে টাকা তারা পেতে চলেছে তা শীঘ্রই এসে পড়বে।

সেই টাকার উপর নির্ভর করেই এম্মা তার শোবার ঘরের জন্য দুটো ভাল রঙের পর্দা কিনেছে। এছাড়া লেহুড়েকে একটা কার্পেটের অর্ডার দিয়েছে। লেহুড়েও তাকে বলেছে এটা এমন কিছু চাঁদ চাওয়ার কথা নয়—এবং সে তা এনে দেবে।

আজকাল লেহুড়েকে প্রায়ই ডেকে পাঠায় এম্মা। দিনে প্রায় কুড়িবার সে আসাযাওয়া করে। লেহুড়েও এব্যাপারে কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি অনুভব করে না বা প্রকাশ করে না। যখনি তাকে ডাকা হয় তখনি সে সব কাজ ফেলে ছুটে আসে। গাঁয়ের লোকে কেউ কিছুই বুঝতে পারে না। আর একটা জিনিস বুঝতে পারে না, মাদাম রোলেত কেন এম্মাদের বাড়িতে রোজ লাঞ্চ খায়। তাছাড়া মাদাম বোভারীর সঙ্গে গোপনে দেখা করারই বা কি থাকতে পারে।

তখন সবেমাত্র শীত পড়েছে। শীত শুরু হতেই এম্মার একটা নতুন বাতিক দেখা দিল। হঠাৎ গানের উপর তার নজর পড়ল। একদিন সন্ধ্যার সময় সে পিয়ানো বাজাতে শুরু করল। একই গান বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজাতে

লাগল। কিন্তু প্রতিবারই সে আপন মনেই বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল। অর্থাৎ সে নিজে নিজেই বলল, হচ্ছে না। অথচ চার্লস শুনতে শুনতে তাকে বাহবা দিয়ে বলল, বেশ হচ্ছে, বন্ধ করলে কেন?

এম্মা বলল, না, আমার বাজনা খুবই খারাপ হচ্ছে। আমার আঙ্গুলে যেন মরচে ধরে গেছে।

পরের দিন চার্লস এম্মাকে যা হোক কিছু একটা গান বাজাতে বলল।

এম্মা বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি একান্তই চাও বাজাচ্ছি।

কিন্তু এম্মা আজ প্রায়ই ভুল করতে লাগল। আজ মোটেই বাজাতে পারল না। চার্লস স্বীকার করতে বাধ্য হলো তার অভ্যাস না থাকার জন্য এমন হচ্ছে।

এম্মা বলল, আমার কিছু শেখা দরকার। কিন্তু—

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে এম্মা বলল, ঘণ্টায়, কুঁড়ি ফ্রাঁ। খুবই ব্যয়সাধ্য।

চার্লস বলল, হ্যাঁ, কিছুটা ব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু এর থেকে কম টাকায় নিশ্চ কোন লোক পেয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। এমন অনেক সঙ্গীতজ্ঞ আছে যাদের খুব একটা নাম না থাকলেও যাদের জ্ঞান বিদ্যা নামকরাদের থেকে কোন অংশে কম নয়।

এম্মা বলল, ঠিক আছে। এমন একজন কাউকে দেখ।

পরের দিন চার্লস বাইরে থেকে এসে এম্মাকে বলল, তুমি সব বিষয়ে এমন একটা ভবে দেখাও যাতে মনে হয় তুমি সবচেয়ে সে বিষয়ে বেশী জান। আজ মাদাম লিগার্দের সঙ্গে দেখা হলো। উনি বললেন ওর এক মেয়ে একজনের কাছে পিয়ানো শেখে। তার রেট হলো ঘণ্টায় আড়াই ফ্রাঁ।

এম্মা আর কোন কথা না বলে হতাশ হয়ে পিয়ানো বাজানো ছেড়ে দিল। কিন্তু যখনি পিয়ানোটার পাশ দিয়ে যেত এম্মা তখনই সে একটা করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত। মনে মনে বলত, হায় আমার হতভাগ্য পিয়ানো!

তারপর থেকে এম্মা সুযোগ পেলেই বাড়ির যে কোন অতিথিকে বলত, সে গান বাজনা ছেড়ে দিয়েছে। কোন অনিবার্য কারণবশতঃ তার দ্বারা এ শিক্ষা সম্ভব নয়। কি লজ্জার কথা! প্রত্যেকেই করুণা করত তাকে এ বিষয়ে। তার প্রতিভা ছিল। অনেকে বিশেষ করে হোমা এ বিষয়ে কথা বলল বোভারীর সঙ্গে।

হোমা একদিন চার্লসকে বলল, আপনি ভুল করছেন বন্ধু। মানুষের জন্মগত প্রতিভা কোন বিষয়ে থাকলে তার চর্চা না করে তাকে পতিত করে ফেলে রেখে দিতে নেই। তাছাড়া ভেবে দেখুন একবার আপনি আজ আপনার স্ত্রীর পিছনে যা খরচ করবেন পরে সে টাকা ত আপনার একদিন বেঁচে যাবে। কারণ আজ আপনার স্ত্রী এবিষয়ে শিক্ষা করে পরে আপনার মেয়েকে শিক্ষা দেবে। রুশো বলেছেন মায়রাই তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবে। কথাটা একটু নতুন মনে হলেও

এর সত্যতা একদিন বোঝা যাবেই।

সুতরাং চার্লস বাধ্য হয়ে একদিন পিয়ানোর কথাটা আবার তুলল।

এম্মা বলল, পিয়ানোটা আমাদের বিক্রি করে দেওয়া উচিত।

কিন্তু চার্লস অন্য কথা ভাবল। সে পিয়ানোটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, হায় হতভাগ্য পিয়ানো! এই পিয়ানোটা একদিন তার কাছে ছিল এক গর্বের বস্তু। এ পিয়ানোকে আজ বিক্রি করে দেওয়া মানে এম্মার আংশিক আত্মহত্যা করা।

চার্লস বলল, তুমি যদি মাঝে মাঝে এটা শেখ তাহলে আমরা একেবারে পথে বসব না।

এম্মা বলল, কিন্তু কোন জিনিস নিয়মিত না শিখলে সে জিনিস শেখার কোন অর্থ হয় না।

এইভাবে এম্মা সপ্তায় একদিন করে শহরে যাবার অনুমতি তার স্বামীর কাছ থেকে আদায় করল। সপ্তায় একদিন করে শহরে যাওয়া মানেই তার প্রেমিকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হওয়া। মাসের শেষে গাঁয়ের অনেকেই বলল এম্মার বাজনার সত্যিই বেশ উন্নতি হয়েছে।

৫

প্রতি বৃহস্পতিবার শহরে পিয়ানো শিখতে যেত এম্মা। এইদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠত সে। এত সকালে যে চার্লস তাকে তখন ওঠার জন্য বকাবকি করত। তাই চার্লস যখন ঘুমোয় এম্মা তখন নিঃশব্দে উঠে মুখহাত ধুয়ে পোষাক পরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে কিভাবে প্রথম সকালের স্নিগ্ধ আলো বাজারের থামওয়ালা ছাদের উপর ও হোমার ওষুধের দোকানের রুদ্ধ জানালার উপর ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

সওয়া সাতটা বাজলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এম্মা। হিভার্ত কখন হিরণদেল বার করবে তার জন্য হোটেলের উঠোনে অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রথম দিকে হিরণদেল গাড়িটা আস্তে চলে। প্রথম দুই এক মাইল এখানে সেখানে থামেও বেশী। গাড়ির ভিতর মোট চারটে বেঞ্চ। পথে অনেক যাত্রী ওঠে। আবার যাদের সীট আগের দিন থেকে সংরক্ষিত থাকে হিভার্ত পথে যেতে যেতে তাদের ঠিকানায় এসে গাড়ি থেকে ডাকতে থাকে। অনেক সময় তাদের ঘুম না ভাঙলে হিভার্ত গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে তাদের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। এইভাবে যাত্রী নিতে নিতে নিজেকে ভর্তি করে শহরের পথে এগিয়ে চলে হিরণদেল।

এর পর সারবন্দী আপেল গাছের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে গাড়িটা।

আপেলের ক্ষেত পার হলেই শুরু হয় দুধারে খাল। সে খাল দিগন্তপ্রসারী হলুদ জলে ভরা।

প্রায়ই যেতে যেতে এ সব পথ ঘাট চেনা হয়ে গেছে এম্মার। সে জানে কোন প্রান্তর পার হলে কি আসবে। মাঝে মাঝে চোখ দুটো বন্ধ করে এম্মা। কিন্তু আর কতটা পথ বাকি আছে তা তার সব জানা আছে।

ক্রমে দেখা যায় পথের দুধারে ইটের পাকা বাড়ি ঘন হয়ে ওঠে। রাস্তাটা আগের থেকে ভাল বোধ হয়। দুপাশে বড় বড় বাগান দেখা যায়। অবশেষে শহর এসে পড়ে।

পথের দুপাশের মাঠের প্রকৃতি সহসা পরিবর্তিত হয়ে ওঠে। অসংখ্য কল-কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া ওঠে। নদীটা শহরের ধার ঘেঁষে সোজা গিয়ে সবুজ পাহাড়ের কাছে বাঁক নিয়ে মোড় ফেরে। বন্দরে অনেক জাহাজ জমা হয়ে থাকে। নানারকম কাজ-কারবারের ও কল-কারখানার তুমুল শব্দের ঢেউ উত্তাল হয়ে ওঠে। গাড়িটা যতই শহরের ভিতর ঢুকতে থাকে, শহরটা যতই বড় হতে থাকে ততই সব কুয়াশা কেটে গিয়ে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক একটা দমকা হাওয়া এসে মেঘগুলোকে যেন সেণ্ট ক্যাথারিণ পাহাড়ের উপর উড়িয়ে নিয়ে যায়।

কি যেন একটা মত্ততা পেয়ে বসেছে এম্মাকে। এই মত্ততার বশেই সে একটানা একঘেঁয়ে জীবন থেকে দূরে সরে এসেছে। গাড়িটা যতই শহরের ভিতর ঢুকতে থাকে ততই অন্তরটা স্ফীত হতে হতে দ্রুত স্পন্দিত হতে থাকে। তার মনে হয় সে যেন তার একটি মাত্র অন্তরে অসংখ্য অন্তরের আবেগ অনুভব করছে। শহরের বিরাট পরিবেশে তার প্রেমাবেগ যেন এক অত্যাশ্চর্য প্রসারতা লাভ করে। শহরের অগণ্য মানুষের অশান্ত অবিরাম কলগুঞ্জনে সে প্রেম যেন আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় এম্মা। তিন ঘোড়ায় টানা গাড়িটা এগিয়ে চলে। তার গতিটা ক্রমশঃ শ্লথ হয়ে আসে। হিভার্ত কয়েকটা গাড়িকে ছাড়িয়ে যাবার জন্য উপর থেকে চিৎকার করতে থাকে।

নির্দিষ্ট জায়গা আসতে গায়ের শালটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে এম্মা। মাথাটা নিচু করে হাসিমুখে পথ হাঁটতে থাকে। পাছে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে সে সোজা পথে না গিয়ে গলিপথ ধরে ঘুরে ঘুরে তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে যায়।

লীয়ঁকে দূর থেকেই দেখতে পায় এম্মা। তার টুপীর নিচে লম্বা চুলগুলো দেখতে পেয়েই চিনে ফেলে তাকে। তারপর কাছে গিয়ে লীয়ঁর পিছুপিছু হোটেলে গিয়ে হাজির হয়। লীয়ঁ উপরতলায় গিয়ে ঘরের তালা খোলে। তারপর সে কী দীর্ঘ নিবিড় আলিঙ্গন। আলিঙ্গনের পর চুম্বনের পালা। তারপর আসে কথার বন্যা। তারা প্রথমে বলে তাদের সারা সপ্তার নানারকমের

অশান্তি ও দুশ্চিন্তার কথা। তারা পরস্পরকে যে সব চিঠি লেখে সে সম্বন্ধে তাদের ভাবনার কথা বলে। কিন্তু এখন সে সব কথা তারা ভুলে যায়। এখন শুধু দুজনে দুজনের মুখপানে চেয়ে থাকে, হাসিমুখে অনেক ভালবাসার কথা বলে।

তাদের বিছানাটা ছিল বড় এবং নৌকোর মত। উপর থেকে ঘোর লাল রঙের মশারি টাঙানো ছিল। এই বিছানার উপর এম্মা যখন মাথার কালো চুলের রাশ এলিয়ে সাদা অনাবৃত হাত দুটো মুখের উপর কপট লজ্জার ভঙ্গিতে চাপা দিয়ে শুত তখন অদ্ভুত এক রঙের খেলা চলত বিছানায়। ঘরের ঈষদুষ্ণ আবহাওয়া, মেঝের উপর বিছানো কার্পেট শান্ত মৃদু আলো সব মিলিয়ে তাদের প্রেমাবেগকে যেন গাঢ় করে তুলত। ঘরের ভিতর পিতল লাগানো আসবাবপত্রে মশারি খাটানোর রডগুলোতে, দেরাজের উপর রাখা দুটো বাতিতে যখন সূর্যের আলো জানালার ভিতর দিয়ে এসে পড়ত তখন সেগুলো চকচক করে ঘরখানার উজ্জ্বলতা যেন বাড়িয়ে দিত আরও।

সব মিলিয়ে এই ছোট্ট ঘরখানাকে ভালবাসত তারা। এ ঘরের প্রতিটি জিনিস যেন শুধু তাদের ব্যবহারের জন্য সেবার জন্য এক নীরব প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে থাকত সব সময়। এম্মা যদি তার কোন চুলের পিন এক বৃহস্পতিবার ফেলে যেত তাহলে পরের বৃহস্পতিবার এসে তা আবার সেইখানেই পেয়ে যেত। আগুনের পাশে যে ছোট্ট টেবিলটা সাজানো ছিল ওরা সেইখানে ওদের খাওয়া সারত। এম্মা যখন প্লেটের উপর খাবার সাজাত, যখন মদের গ্লাসে তার আঙুলের তলায় ফেনা উঠত, তখন সে হেসে হেসে কত ভালবাসার কথা বলত। পরস্পরকে পাওয়ার আনন্দে এমনভাবে ডুবে যেত তারা যে সেই ঘরখানাকে তারা তাদের নিজের বাড়ি বলেই মনে করত এবং ঘরের আসবাবপত্র ও জিনিসগুলোকে তার নিজের জিনিস ভাবত এম্মা। বলত, আমাদের চেয়ার আমাদের কার্পেট। তাদের ভালবাসার নিবিড় আশ্বাসে ও আবহাওয়ায় ভরা এই ঘরখানায় তাদের যৌবন চিরদিন অক্ষত ও অবরুদ্ধ রয়ে যাবে এবং অনন্ত যৌবনসমৃদ্ধ এক প্রেমিক-প্রেমিকারূপে তারা পরস্পরকে ভালবেসে যাবে চিরদিন। এম্মার সখ মেটাবার জন্য তাকে একজোড়া চটি কিনে দিয়েছিল লীয়ঁ। গোলাপী রঙের সেই সৌখীন চটি পরে এম্মা লীয়ঁর কোলে বসে পা দুটো ছড়িয়ে দিত। তার পা দুটো ঝুলতে থাকত। মার্জিত রুচিসম্পন্না এক নারীর সূক্ষ্মমধুর যৌবন সৌন্দর্যকে জীবনে প্রথম উপভোগ করত লীয়ঁ। কোন নারীর মুখ থেকে এর আগে এমন মধুর ভাষা কখনো শোনেনি, পোষাকের এমন উন্নত রুচি বা কপোতসুলভ এমন মৃদুমন্দ অঙ্গভঙ্গি কখনো দেখেনি। এম্মার পেটিকোটের ফিতেটা যেমন সুন্দর তেমনি তার অন্তরাত্মাটা এক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে সমুন্নত। তাছাড়া এম্মা পরিণতবয়স্কা নারী, সে বিবাহিতা, সুতরাং তার অনুরাগের প্রসারতাটাও উপেক্ষার বস্তু নয়।

এম্মার মনের অবস্থাটা বড় পরিবর্তনশীল। কখনো বিষাদে গম্ভীর হয়ে থাকে আবার কখনো বা হাসিখুশিতে উজ্জল হয়ে ওঠে। কখনো নীরব নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে; আবার কখনো কথায় কথায় ফেটে পড়ে। তার চিত্তের ক্ষণভঙ্গুর পরিবর্তনশীলতা ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র কামনা বাসনা ও স্ফূর্তির ঢেউ জাগায় লীয়ঁর মনে। লীয়ঁর মনে হয় এম্মা যেন বিশ্বের সকল শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, নাটক বা কাহিনীকাব্যের চিরন্তন নায়িকা, আদর্শ প্রেমিকার মূর্ত প্রতীক। তাকে দেখে মনে হয় যেন সে সাধারণ মানবী নয়, মনে হয় সে যেন স্বর্গের দেবদূত।

এম্মার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লীয়ঁর মনে হয় তার আত্মা যেন এম্মার খোঁজে তার নিজের দেহকে ত্যাগ করে প্রথমে এম্মার মাথার চারদিকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে ছড়িয়ে আছে, তারপর ধীরে ধীরে তার বক্ষস্থলের বক্রতার দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে দুর্বার বেগে।

লীয়ঁ এম্মার সামনে নতজানু হয়ে বসে থাকে মেঝের উপর। এম্মার হাঁটুর উপর হাত রেখে তার মুখপানে মুখ তুলে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে। এম্মা তাকে বলে, নড়োনা। একটা কথা বলো না। তোমার চোখের মধ্যে এমন এক রহস্য আছে যা আমার খুব ভাল লাগে।

এক এক সময় এম্মা লীয়ঁকে 'বাছা' বলে। বলে, আমার সন্তানকে তুমি ভালবাস?

কিন্তু লীয়ঁ কোন উত্তর দেয় না, তার ঠোঁটদুটো শুধু এম্মার মুখের উপর নিবিড় হয়ে নেমে আসে।

বড় ঘড়িটার উপর কামদেবতার একটা ছোট মূর্তি আছে। সে মূর্তি দেখে ওরা প্রায়ই হাসত। কিন্তু বিদায়ের সময় যা কিছু দেখত তাতেই গম্ভীর হয়ে উঠত। মুখোমুখি দুজনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বারবার দুজনে বলত, বিদায়। আবার আগামী বৃহস্পতিবার।

তারপর এম্মা হঠাৎ লীয়ঁর মুখখানা দুহাতের মধ্যে ধরে কপালে চুম্বন করেই সে চলে যেত। যাবার সময় শুধু বলে যেত, বিদায়।

এম্মা মাঝে মাঝে র্যু দ্য কমেডিতে গিয়ে মাথার চুলটা ঠিক করে নেয়। দোকানে তখন অন্ধকার নেমে আসার জন্য গ্যাসের আলো জ্বালতে হয়। থিয়েটারের গোলমাল। অভিনেতাদের অভিনয় শুরু করার জন্য ডাকা হচ্ছিল। রাস্তা পার হবার সময় এম্মা দেখল বাজে পোষাকপরা ফ্যাকাশে মুখওয়ালা কত মেয়েপুরুষ থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। থিয়েটারের কাছাকাছি জায়গাটা বড় ঘিঞ্জী। এখানটা বড় গরম। এখানে এলেই কেমন একটা ঝিমুনির ভাব ধরে এম্মার। এবং সে যখন চুল ঠিক করে নাপিতের কাছে তখন নাপিত তাকে বলনাচ দেখার জন্য টিকিট কিনতে বলে।

তারপর ঘোড়ার গাড়িতে করে রওনা হয়ে যায় এম্মা। পাহাড়ের কাছে

এসে ঘোড়াগুলোর খুব কষ্ট হয়। তখন অন্যান্য যাত্রীরা সব নেমে পড়ে। একমাত্র শুধু এম্মাই বসে থাকে গাড়ির মধ্যে। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে মোড়ে শহরের আলোগুলো চোখে পড়ে বেশী করে। এম্মা পিছনে গাড়ির জানালা দিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় তা দেখার চেষ্টা করে। বিচ্ছেদব্যথাটা ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে তার মধ্যে। বারবার লীয়ঁর নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছা করে। তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। মনে হয় অসংখ্য চুম্বন তার উদ্দেশ্যে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দেয়।

এই পাহাড়ী পথে ছেড়া কাঁথা জড়িয়ে একটা ভিখারি গান গাইছিল,

একটি উজ্জ্বল দিনের মেদুর উষ্ণতা
একটি তরুণীর মনটাকে নাড়িয়ে দিল,
তাকে প্রেমের স্বপ্নের পথে নিয়ে গেল।

তার গানের বাকি বাণীগুলো, সূর্য, পাখি আর গাছের পাতা নিয়ে লেখা। গাড়িটা যখন পাহাড়ের চড়াইএর পথে ধীর গতিতে চলতে থাকে তখন এক একসময় লোকটা পিছন দিক থেকে হঠাৎ সামনে এসে এম্মার সামনে হাজির হয়। গাড়ির মুখটার কাছে এসে পড়ে। এম্মা চিৎকার করে মুখটা সরিয়ে নেয়। হিভার্তে কিন্তু ভিখারিটার সঙ্গে ঠাট্টা করে। ঠাট্টা করে তাকে সেণ্ট রোমার মেলায় একটা ঘরভাড়া করতে বলে। কখনো তার প্রিয়তমার কথা জিজ্ঞাসা করে।

গাড়িটার গতি খুব ধীর হয়ে গেলে লোকটা এক একসময় গাড়িটার জানালা দিয়ে মুখ বাড়ায়, গাড়ির ফুটবোর্ডে উঠে তার হাতল ধরে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে আপন মনে চিৎকার করে ওঠে সে। তার করুণ সুরের সেই আর্তনাদটা পরে এক কর্কশ চিৎকারে পরিণত হয়। অন্ধকার বনপথে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত সেই চিৎকারের সঙ্গে ঘোড়ার ঘণ্টাধ্বনি, গাছের মর্মর আর খালি গাড়িটার ঘর্ঘর আওয়াজ মিশে কেমন যেন এক ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং এম্মার বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে এক অতিপ্রাকৃত ভয়ে। বিচিত্র শব্দের মিশ্রিত ধ্বনিটা শূন্য বিশাল এক খাদের অন্ধকার গভীরে প্রবাহিত ঘূর্ণিবায়ুর মত এম্মার অন্তরাত্মার গভীরে গিয়ে সেটাকে আলোড়িত করতে থাকে। এক অপরিসীম বিষাদে ভরিয়ে তোলে তার মনটাকে। এদিকে লোকটা গাড়িতে যেদিকটায় ওঠে সেদিকটা ভারী হওয়ায় হিভার্ত বুঝতে পারে আর তখন সঙ্গে সঙ্গে তার চাবুকের তীক্ষ্ণ আঘাত নেমে আসে লোকটার পিঠের উপর। আর্তনাদ করে পড়ে যায় লোকটা।

হিরণদেলের যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ে একে একে। কারো মুখটা খোলা থাকে, কারো মুখটা বুকের উপর নেমে আসে, কেউ তার পাশের যাত্রীর কাঁধের উপর ঢলে পড়ে। কিন্তু সব ঘুমন্ত যাত্রীগুলোই গাড়ির ঝাঁকুনির তালে তালে দুলতে থাকে। গাড়ির বাতির আলোটা চকোলেট রঙের পর্দার ভিতর

দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে যাত্রীদের উপর একটা লাল ছায়া ফেলে। দুঃখে ও বিষাদে মনটা ভারী থাকায় এম্মার যেন শীত বেশী লাগে। তার হাত পাগুলো ঠাণ্ডা বরফের মত হয়ে যায়।

প্রতি বৃহস্পতিবারই যেন হিরণদেল গাড়িটা ইয়নভিলে ফিরতে দেরী করে। চার্লস তার বাড়িতে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে এম্মা এসে পড়ে। এসেই সে তার মেয়েটাকে চুম্বন করে। রাতের খাওয়া তখনো তৈরি হয়নি। তবু ফেলিসিতের উপর রাগ করে না এম্মা। আজকাল সে তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে। সে প্রায়ই সব কাজই নিজের ইচ্ছামত করে যায়।

এম্মার মুখখানা শুকনো ও ম্লান দেখে তার স্বামী জিজ্ঞাসা করে, তোমার শরীরটা খারাপ নাকি?

এম্মা সংক্ষেপে উত্তর দেয়, না।

তবু চার্লস বলে, তোমার কাজকর্মগুলো আজ কেমন অদ্ভুত লাগছে।

এম্মা বলে, ও কিছু না, কিছু না।

এক এক বৃহস্পতিবার এম্মা বাড়িতে ঢুকেই সোজা তার শোবার ঘরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে এক নিপুণ পরিচারিকার মত সব কিছু ঠিক করে রেখেছে জাস্টিন। সব কিছু তার হাতের কাছে যুগিয়ে দিচ্ছে। তার জন্য দেশলাই, বাতি, বই, জ্যাকেট সব ঠিক করে রাখে। তার বিছানা ঠিক করে রেখে দেয়।

সব কাজ সারা হয়ে যাবার পরেও জাস্টিনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এম্মা বলে, খুব ভাল। কিন্তু চলে যাও। তবু যেন এক দিবাস্বপ্নের ঘোরে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখতে থাকে জাস্টিন। তারপর হঠাৎ এম্মার কথায় সে ঘোর কাটতে সে চলে যায়।

এর পরের দিনটা ও তার পরের দিনটা খুব খারাপ লাগে এম্মার। ক্রমে সে অধৈর্য হয়ে ওঠে। সব কিছু অসহ্য ঠেকে তার। গত বৃহস্পতিবারের আনন্দ সে আবার উপভোগ করতে চায়। এক সুবাসিত স্মৃতির আলো জ্বলতে থাকে তার মধ্যে। এইভাবে সাতটা দিন কোনরকমে কেটে যেতেই বৃহস্পতিবার এসে পড়ে। অবশেষে আবার ছুটে যায় লীয়ঁর কাছে। ফেটে পড়ে আদরে চুম্বনে। লীয়ঁ যে আনন্দ পায় সে আনন্দের সঙ্গে বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে থাকে। কিন্তু এম্মার আনন্দ উপভোগের মধ্যে নিবিড়তার সঙ্গে একটা সূক্ষ্মতা থাকে। নানারকমের প্রণয়কলার মাধ্যমে তার প্রণয়ীকে প্রীত করার চেষ্টা করে কৌশলে। কারণ তার মনের ভিতর সব সময় একটা ভয় খোঁচা দিতে থাকে। ভাবে একদিন না একদিন এ সুখের শেষ হবেই।

মাঝে মাঝে সে ভয়ের কথাটা বলে ফেলে এম্মা। বলে, দুদিন পরে না হয়ত দুদিন আগে, আজ না হয়ত কাল আমাকে তুমি ছেড়ে যাবেই। তুমি ঠিক বিয়ে করবে। আর পাঁচজন যা করে তুমিও তাই করবে।

লীয়ঁ জিজ্ঞাসা করে, আর পাঁচজন কারা?

কেন সব লোকেই তাই করে।

এম্মা একবার লীয়ঁকে কপট বিরক্তির সঙ্গে সরিয়ে দিয়ে বলে, যাও, তোমরা সবাই সমান। বিশ্বস্ততা বলে কোন জিনিস নেই তোমাদের।

একদিন ওরা যখন মানুষের যত সব পার্থিব মোহ ও মোহমুক্তি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করছিল তখন কথায় কথায় এম্মা বলে ফেলল সে এর আগে আর একজনকে ভালবেসেছিল। এম্মা লক্ষ্য করছিল এ কথায় বিশ্বস্ততা ও আসক্তির গভীরতাটা পরীক্ষা করতে চাইছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করল এম্মা সে লোকটা অবশ্য লীয়ঁর মত ছিল না। সে বলল, সে কিন্তু তোমার মত অত ভাল ছিল না। আর ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায়নি।

এম্মার কথা বিশ্বাস করল লীয়ঁ। তবু একবার জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কি ধরনের মানুষ ছিল ?

এম্মা মিথ্যা করে বানিয়ে বলল, সে ছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন।

একথা বলে এম্মা লীয়ঁর চোখে তার গুরুত্বটা বাড়াতে চাইল। সে দেখাল তার দেহসৌন্দর্যের মোহপ্রসারী আবেদনে তার থেকে বড় দরের মানুষ ধরা দেয়।

একথায় লীয়ঁ তার নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন হয়ে ওঠে। সে ভাবল এম্মা হয়ত উচ্চ পদ, ও জাঁকজমক ভালবাসে। এম্মার ধরন-ধারণ বা চালচলন দেখে তার তাই মনে হয়।

এম্মার মাথায় মাঝে মাঝে অনেক অদ্ভুত খেয়াল চাপে। একবার তার ইচ্ছা জাগে ইংল্যাণ্ডের ঘোড়ায় টানা এক নীল ঘোড়ার গাড়িতে করে সে রুয়েন শহরে যাবে প্রতি সপ্তায়। আর সেই গাড়ির পিছনে একজন ফুটম্যান বা চাকর দাঁড়িয়ে থাকবে।

অবশ্য এ খেয়ালটা জাস্টিন তার মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। জাস্টিন সখ করে একটা গাড়ি কিনতে বলেছিল আর তাকে সেই গাড়ির ফুটম্যান নিযুক্ত করতে অনুরোধ করেছিল। এম্মা যে গাড়িতে চেপে শহরে বা কোথাও বেড়াতে যাবে সেই গাড়িটার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে জাস্টিন।

কিন্তু এম্মার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জাস্টিনও তার আকাংখিত চাকরি পায়নি। তবু এম্মা প্রতি বৃহস্পতিবার নিয়মিত রুয়েন শহরে যায়। তার সাপ্তাহিক প্রমোদভ্রমণ পুরোমাত্রায় উপভোগ করে যায়। তবে ইয়নভিলে ফেরার পথে সারাদিনের আনন্দের পর একা একা বড় খারাপ লাগে। নিঃসঙ্গতা বড় তিক্ত ও অসহ্য মনে হয়। এই সময় জাস্টিন সঙ্গে থাকলে তবু দু একটা কথা বলা যেত তার সঙ্গে।

একদিন হঠাৎ প্যারিসের কথা মনে হলো এম্মার। সে লীয়ঁকে বলল, আমরা যদি দুজনে প্যারিসে থাকতে পেতাম তাহলে কত আনন্দ পেতাম।

লীয়ঁ বলল, কেন এখানে কি আমরা সুখে নেই ?

লীয় কথাটা বলার সময় এম্মার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে থাকে।

এম্মা বলল, না, আমরা অবশ্যই সুখে আছি। আমিই বোকামির কথা বলছি। আমাকে চুম্বন করো।

আজকাল স্বামীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে এম্মা। তার জন্য ভাল ক্রীম এনে দেয়। খাবার পর এক একদিন তার স্বামীর সঙ্গে ওয়ালৎস নাচ নাচত এম্মা। চার্লস নিজেকে স্ত্রীভাগ্যে ভাগ্যবান মনে করত। তার প্রতারণা ধরা না পড়ায় এম্মাও খুশি ছিল মনে মনে। পিয়ানো বাজনা শেখার নাম করে এম্মা যে সপ্তায় একদিন করে রুয়েন শহরে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমলীলা করতে যায় একথা চার্লস জানতে পারেনি এটা এক পরম সুখের কথা এম্মার কাছে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো এম্মার মাথায়। একদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ চার্লস তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি রুয়েনে মাদমোজেল· লেমপুরের কাছে পিয়ানো শেখ?

এম্মা উত্তর করল, হ্যাঁ।

চার্লস বলল, তার সঙ্গে আমার মাদাম লিগার্দের বাড়িতে হঠাৎ দেখা হয়। তাকে তোমার কথা বলতে সে বলল, সে তোমাকে চেনেই না।

মাথার উপর যেন বজ্রপাত হলো এম্মার। তবু ঘাবড়ে না গিয়ে বা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, তিনি হয়ত আমার নামটা ভুলে গেছেন। তাছাড়া এমনও হতে পারে রুয়েন শহরে ঐ নামে আর একজন মেয়ে আছে যে পিয়ানো শেখায়।

চার্লস বলল, তা অবশ্য হতে পারে।

এম্মা তখন তাড়াতাড়ি বলল, তাছাড়া তার মাইনের রসিদ আমার কাছে· আছে। এই দেখ।

এই বলে এম্মা রসিদের জন্য চারদিক আকাশ পাতাল খুঁজতে লাগল। ড্রয়ার, টেবিল, বাক্স, ব্যাগ, চারদিক ঘাঁটতে লাগল। কিন্তু কোথাও তা পেল না।· তবু সে খুঁজতে লাগল। তার অবিশ্রান্ত তৎপরতা দেখে চার্লস বলল, যাক, সামান্য রসিদের জন্য তোমাকে আর এত খোঁজাখুঁজি করতে· হবে না।

এম্মা বলল, আমি তা খুঁজে বার করবই।

পরের শুক্রবার চার্লস যখন বাইরে বেরোবার সময় জুতো পরছিল, তখন তার জুতোর মধ্যে একটা কাগজ পেয়ে তা কুড়িয়ে হাতে তুলে দেখে। পড়ে দেখে মাইনের রসিদ। এম্মা ঠিকই বলেছে। ফেলিসিতে লেমপুরের তার কাছ থেকে তিন মাসের বেতনস্বরূপ পঁয়ষট্টি ফ্রাঁ নিয়েছে এ হচ্ছে তারই রসিদ।

চার্লস ভাবল, কিন্তু আমার জুতোর ভিতর এল কি করে কাগজটা?

এম্মা বলল, হয়ত পুরনো বিলফাইল থেকে পড়ে গেছে।

এর পর থেকে মিথ্যা কথা বলাটা স্বভাবে ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল।

এম্মার। সে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে যেত অম্লান বদনে। মিথ্যা কথা বলে সত্যকে গোপন করে সে যেন আনন্দ পেত। কোন কারণ না থাকলেও অনেক সময় মিথ্যা বলত। সে যদি বলত গতকাল বিকালে কোন এক দিকে বেড়াতে গিয়েছিল তাহলে বুঝতে হবে আসলে সে গিয়েছিল অন্য দিকে।

সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। সকাল থেকে বরফ পড়ছিল। দারুণ শীত। এম্মা আগেই বেরিয়ে গেছে কিন্তু শালটা নিয়ে বেরোয়নি। এমন সময় চার্লস ভাবল শালটা তাকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। হঠাৎ সে দেখতে পেল মঁসিয়ে তুভাশের গাড়িতে যাজক বুর্নিসিয়েন কি একটা কাজে রুয়েন যাচ্ছেন। এম্মার ভারী শালটা নিয়ে চার্লস তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে গিয়ে বুর্নিসিয়েনকে শালটা দিয়ে ক্রয় রুজের হোটেলে গিয়ে এম্মাকে দিতে বলল।

বুর্নিসিয়েন শহরে গিয়ে আগে সেই হোটেলে গেল। কিন্তু এম্মাকে পেল না। খোঁজ করে হোটেলের মালিকের কাছ থেকে জানল এখানে এম্মা খুব কমই থাকে।

যাই হোক সেই রাতেই শহর থেকে হিরণদেলে করে ফেরার পথে এম্মার সঙ্গে দেখা হলো বুর্নিসিয়েনের। সে সব কথা বলল। অবশ্য কথাটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না বুর্নিসিয়েন।

কিন্তু এম্মা ভাবল, বুর্নিসিয়েন কোন গুরুত্ব না দিলেও ভবিষ্যতে এ নিয়ে গাঁয়ের লোকেরা কথা বলতে পারে। তাই সে ঠিক করল ক্রয় রুজ অঞ্চলে সে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রাখবে। বৃহস্পতিবার সে সেখানে থাকবে এবং গাঁয়ের কোন লোক শহরে গেলে তাকে সেখানে দেখতে পাবে।

সেদিন রুয়েনে হোটেল দ্য বুলোন থেকে লীয়ঁর হাতের উপর ভর দিয়ে বেরিয়ে আসছিল মাদাম বোভারী, এমন সময় মঁসিয়ে লেহুড়ে ছুটে এল তার কাছে। তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল এম্মা। ভাবল, অনেক বাজে কথা বলবে লেহুড়ে।

যাই হোক তাকে কোন রকমে কাটিয়ে উঠল এম্মা।

এর তিন দিন পর একদিন হঠাৎ লেহুড়ে এসে এম্মার ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, আমার কিছু টাকা চাই আজ।

এম্মা বলল, তার হাতে এখন কোন টাকা নেই।

লেহুড়ে তখন কাঁদুনি গাইতে লাগল। বলল, সে কতবার সাধ্যের অতীত হলেও মাদামের জন্য টাকার যোগাড় করেছে। আজ তার দরকার, টাকা চাই।

আজ পর্যন্ত চার্লসএর সই করা দুটি ঋণপত্র আছে। তার মধ্যে এম্মা মাত্র একটা ঋণপত্র শোধ করেছে। আর একটা বাকি আছে। এম্মা বলল, ওটা এখন থাক। লেহুড়ে বলল, এম্মার কথা মেনে নিলেও কতকগুলো জিনিসের দাম এখনো দেওয়া হয়নি। যেমন পর্দা, কার্পেট, আর্মচেয়ার, কিছু

পোষাক আশাক ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির দাম এখনো শোধ করা হয়নি। লেহুড়ে এই সব জিনিসের একটা তালিকা পকেট থেকে বার করে দেখাল এম্মাকে।

এম্মার মাথাটা ঢলে পড়ল হতাশায়।

লেহুড়ে বলল, আপনার হাতে নগদ টাকা নেই, কিন্তু সম্পত্তি আছে।'

তারপর লেহুড়ে বার্ণেভিলেতে একটা ভাঙ্গা বাড়ির কথা উল্লেখ করল। এখন সে বাড়িটা কারো কোন কাজে লাগে না। বাড়িটা ছিল আগে একটা খামারের অংশ। সে খামারটা ছিল চার্লসএর বাবার। পরে তিনি সেটা বিক্রি করেন। লেহুড়ে তার সব কিছু জানে।

লেহুড়ে বলল, আমি যদি আপনার মত এই অবস্থায় পড়তাম তাহলে আমি এটা বিক্রি করে সব দেনা চুকিয়ে দিতাম। সব দেনা শোধ করে কিছু টাকা আপনার বাঁচবে।

এম্মা তখন ক্রেতা পাওয়ার অসুবিধার কথা বলল। লেহুড়ে তখন বলল সে ক্রেতা খুঁজে দেবে। এম্মা তখন বলল, কিন্তু সে কি করে তা বিক্রি করবে? বিক্রি করতে হলে তাকে কি করতে হবে?

লেহুড়ে বলল, আপনার ওকালতনামা নেই?

সঙ্গে সঙ্গে এক শ্বাসরোধকারী গুমোটের মধ্যে হঠাৎ যেন একরাশ স্নিগ্ধ হাওয়া পেয়ে গেল এম্মা।

এম্মা বলল, আপনার বিলটা আমার কাছে রেখে যান।

লেহুড়ে বলল, ও এমন কিছু না। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।

লেহুড়ে আবার পরের সপ্তাতেই এল। এসে বলল, অনেক কষ্ট করে মঁসিয়ে ল্যাংলয় নামে একজন ক্রেতাকে পেয়েছি। সম্পত্তিটার উপর ভদ্র লোকের লোভ ছিল অনেকদিন ধরে। কিন্তু ভদ্রলোক কত দাম দিতে চেয়েছে তার কোন উল্লেখ করল না লেহুড়ে।

এম্মা বলল, দামের জন্য কিছু যায় আসে না।

লেহুড়ে বলল, একবার শুধু তার কাছে যাওয়া দরকার। একবার গিয়ে দেখা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু মাদামের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় তখন সে নিজে গিয়েই সব ঠিক করে আসবে।

লেহুড়ে তার কথামত যথাসময়ে মঁসিয়ে ল্যাংলয়ের কাছে গিয়ে সব ঠিক করে এল। ল্যাংলয় সম্পত্তিটার জন্য চার হাজার ফ্রাঁ দিতে চেয়েছে।

খবরটা শুনে খুশিতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এম্মার।

লেহুড়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কি, দামটা ভালই দিচ্ছে।

এম্মা বলল, সে যদি এখনই টাকাটা পায় তাহলে সে লেহুড়ের সব বিল এখনি মিটিয়ে দেবে।

লেহুড়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কি, এটা আমার খুব খারাপ লাগছে যে

আপনার ঐ সব টাকা দেনা শোধ দিতেই প্রায় চলে যাবে।

এম্মা বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন?

লেহ্‌রে বলল, আপাততঃ দু হাজার ফ্রাঁ আপনি দেনা শোধ দেবেন আর দু হাজার ফ্রাঁ আপনার থাকবে। তবে আপনি যাতে ভবিষ্যতে কথা উঠলে স্বামীকে দেখাতে পারেন তার জন্য আমি সই করে লিখে দেব আপনার কাছ থেকে চার হাজার ফ্রাঁ পেয়েছি ঋণ শোধ হিসাবে। এতে আপনার উপকার হবে।

কিন্তু টাকাটা দেবার সময় লেহ্‌রে এম্মাকে এক হাজার আটশো ফ্রাঁ দিল। দুশো ফ্রাঁ কেটে নিয়ে বলল তার এক বন্ধুকে টাকাটা দালালি স্বরূপ দিয়েছে। লোকটার নাম ভিনপার্ট।

এই টাকা নিয়ে এম্মা কি করবে তা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। প্রথমতঃ এক হাজার ফ্রাঁ সরিয়ে রাখল এম্মা। বাকি আটশো ফ্রাঁ দিয়ে সে লেহ্‌রের কিছু ঋণপত্র শোধ করল। দু হাজার ফ্রাঁ দিয়েছে সেই তালিকাভুক্ত জিনিসগুলোর দাম হিসাবে, কার্পেট, পর্দা, পোষাক প্রভৃতি যে সব জিনিসগুলো সে শেষের দিকে অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিল।

বাড়ি বিক্রির কথাটা কৌশলে এড়িয়ে গেল এম্মা। কিন্তু চার্লসকে একদিন লেহ্‌রের কাছে বাকি ঋণের কথাটা বলল। সে বলল, চার্লসকে সব কথা বলেনি তার কারণ সংসারের যত খুঁটিনাটি নিয়ে বিব্রত করতে চায়নি। তাছাড়া ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে লেহ্‌রে খুব একটা বেশী দাম ধরেনি বা বিলটা খুব একটা বেশী হয়নি।

চার্লসকে খুশি করার জন্য এম্মা তার কোলে বসে কত আদর করল তাকে। চার্লস কিছু বুঝতে না পেরে অনন্যোপায় হয়ে লেহ্‌রের শরণাপন্ন হলো। লেহ্‌রে বলল, কিছু ভাবতে হবে না। সে সব ঠিক করে দেবে। চার্লসকে শুধু সাতশো ফ্রাঁর একটা নতুন ঋণ পত্র লিখে তাতে সই করতে হবে। আর সেটা তিন মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

চার্লস তার মাকে সব জানিয়ে কাতরভাবে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একটা চিঠি লিখল। তার মা সে চিঠির উত্তর না দিয়ে নিজে এলেন।

এম্মা শাশুড়ীকে সোজাসুজি বলল তাঁর ছেলে কিছু সাহায্য তাঁর কাছ থাকে পাবে কি না। চার্লসএর মা জানালেন, হ্যাঁ পাবে, কিন্তু আমি সব বিল দেখতে চাই।

এম্মা লেহ্‌রের কাছে ছুটে গেল। তাকে এক হাজার ফ্রাঁর আলাদা একটা বিল করতে বলল। যে টাকাটা নিজের ব্যক্তিগত খরচের জন্য সরিয়ে রেখেছিল সেটাকেও খরচের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু বাড়ি বিক্রির কথাটা এম্মা ও লেহ্‌রে দুজনেই চেপে গেল।

বিল পরীক্ষা করে চার্লসএর মা দেখলেন দাম খুব একটা বেশী ধরা হয়নি।

কিন্তু এটা তিনি স্বীকার করলেনএই সব জিনিসের জন্য এত কিছু খরচ করা এম্মার উচিত হয়নি।

চার্লসএর মা এম্মাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, ঘরে কার্পেট না হলে চলছিল না? এত আর্মচেয়ার কেন? আমাদের আমলে বাড়িতে শুধু বুড়োদের জন্য একটা মাত্র আর্মচেয়ার থাকত। জানালার পর্দার জন্যই বা এত খরচ কেন? পোষাকের সিল্ক লাইনিংএর জন্য এত খরচ? তুমি যা করেছ তাতে আমার লজ্জা পাচ্ছে। এত সৌখীনপনা কেন? আমার বয়স হয়েছে, কে দেখবে আমাকে?

এম্মা চুপ করে এতক্ষণ ধরে সব কিছু শোনার পর বলল, খুব হয়েছে। যথেষ্ট বলেছেন মাদাম।

তবু চার্লসএর মা সমানে নীতিবাক্য শুনিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন এভাবে চললে তাদের পথে বসতে হবে। তবে এই সব কিছুর জন্য অবশ্য চার্লসই দায়ী। সে সংসার সম্বন্ধে কিছু দেখে না। যাই হোক, চার্লস অবশ্য তাকে কথা দিয়েছে এম্মার ওকালৎনামাটা বাতিল করে দেবে।

এম্মা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, কি?

চার্লসএর মা বললেন, হ্যাঁ, ও আমায় কথা দিয়েছে।

এম্মা সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চার্লসকে ডাকল। চার্লস এসে স্বীকার করল, সে সত্যিই তার মাকে কথা দিয়েছে। আসলে তার মা তার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে।

সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এম্মা। সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় কাগজ নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল।

চার্লসএর মা বললেন, ধন্যবাদ।

তারপর তিনি ওকালৎনামার কাগজটা আগুনে পুড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল এম্মা। সে হাসি আর থামতে চায় না। চার্লস বুঝল, এ হচ্ছে মৃগী রোগের আক্রমণ।

ভয় পেয়ে গেল চার্লস। বলল, হা ভগবান!

এরপর চার্লস তার মাকে বলল, তুমি সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করো। এভাবে এখানে এসে হুজ্জোত করার কোন অধিকার নেই তোমার।

চার্লস আজ প্রথম স্পষ্ট স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করে মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তার মা বলল, তিনি চলে যাবেন।

পরের দিন সত্যিই তার মা বাড়ি থেকে চলে গেলেন। চার্লস শেষবারের মত তাঁর কাছে তাঁর মত পরিবর্তন করার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি শুনলেন না। তিনি যাবার সময় বললেন, এখনো বলছি সাবধান হও। আমার করার কিছু নেই। তুমি দেখতে পাবে কি হবে। তবে আমি অবশ্য আর

হুজ্জোত করতে আসব না।

কিন্তু তার মার এত সব সতর্কবাণী সত্ত্বেও চার্লস তার স্ত্রীকে আবার দিল আগেকার সেই পূর্ণ স্বাধীনতা। এম্মা রাগ করেছিল। তাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছিল। তখন চার্লস তাকে নতুন করে ওকালৎনামা দিতে চাইল। সে নিজে শহরে গিয়ে গিলমিনের কাছে আবার একটা ওকালৎনামা করে দিল। গিলমিন বলল, বুঝেছি, যাঁরা ডাক্তার বা বিজ্ঞানের লোক তারা সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এ কথায় তুষ্ট হলো চার্লস। এম্মা আবার খুশি হলো।

পরের বৃহস্পতিবার রুয়েনে হোটেলে গিয়ে এম্মা উন্মাদের মত গান করতে লাগল। সে কখনো চিৎকার করতে লাগল, কখনো গান করতে লাগল, কখনো সিগারেট খেতে লাগল, কখনো নাচতে লাগল।

লীয়ঁ বুঝতে পারল না এম্মার এই মত্ততার কারণ কি। আজ পাগলের মত প্রতিটি আমোদ-প্রমোদের উপকরণকে উপভোগ করতে চাইছে এম্মা দ্বিগুণ আবেগের সঙ্গে। কথায় কথায় রেগেও যাচ্ছে। আবার লোভ ও নির্লজ্জতার পরিচয়ও দিচ্ছে। আজ তার সঙ্গে বড় রাস্তায় হাত ধরাধরি করে বেড়াল। আগে কিন্তু রুডলফের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে রাস্তায় বার হতে চাইত না।

এক বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় বাড়ি ফিরল না এম্মা।

চার্লস তার আশায় ঘর বার করতে লাগল। হোমা খবর পেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। জাস্টিন গাঁয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে অপেক্ষা করল। বার্থে তার মাকে না পেয়ে ঘুমোতে গেল না। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রাত্রি এগারটা পর্যন্ত দেখে আর থাকতে পারল না চার্লস। সে ঘোড়ার গাড়ি করে নিজে রুয়েনে চলে গেল। রাত্রি দুটোর সময় শহরে পৌছে প্রথমেই একা রুজে গেল। কিন্তু সেখানকার হোটেলে দেখতে পেল না চার্লস।

তারপর সে এখানে সেখানে লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে খোঁজ করল এম্মার। লোকের কাছ থেকে ভর্ৎসনাও শুনল। একবার লীয়ঁর কথা ভাবল। ম্যাদ-মোজেল লেমপুরেরের কথাও ভাবল। এইভাবে সকাল হবার পর চার্লস যখন লেমপুরেরের খোঁজে যাচ্ছিল তখন এম্মা রাস্তার ওপার থেকে তাকে দেখে নিজেই এল।

এম্মাকে দেখে তাকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল চার্লস। আকুল ভাবে বলল, গতকাল বাড়ি যাওনি কেন?

এম্মা বলল, আমার শরীর খারাপ করেছিল।

চার্লস ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল?

এম্মা তার কপালে হাতটা রাখল নীরবে।

চার্লস বলল, কোথায় ম্যাদমোজেল লেমপুরেরের বাড়িতে?

এম্মা শান্ত হয়ে বলল, আমি সেখানেই যাচ্ছিলাম।

চার্লস বলল, এখন সেখানে আর যেতে হবে না। সে এখন নেই।

চার্লস আরও বলল, কোন ব্যাপারে তুমি উত্তেজিত হয়ো না। তুমি স্বাধীনভাবে যা করার করবে। তোমাকে কেউ বাধা দেবে না।

যে ছাড়পত্র চাইছিল এম্মা তা সে সহজেই পেয়ে গেল। এই অবাধ স্বাধীনতার সে পূর্ণ সুযোগ নিতে লাগল। বৃহস্পতিবার ছাড়াও অন্য কোনদিন লীয়ঁকে দেখতে ইচ্ছা হলেই সে শহরে চলে যেত। তার আসার কথা লীয়ঁ কিছু জানত না বলে এম্মা সোজা চলে যেত তার অফিসে।

এইভাবে দু চারবার লীয়ঁর অফিসে এম্মা যাওয়ার পর লীয়ঁ প্রতিবাদ করল। প্রথম প্রথম সে কিছু মনে করেনি। কিন্তু পরে সে এম্মাকে একদিন স্পষ্ট বলল, আমার মালিক এতে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। তুমি প্রায়ই এখানে আস তা উনি চান না।

এম্মা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, চলে এস।

এম্মা একদিন লীয়ঁকে বলল, তুমি কালো পোষাক পড়বে আর একটু সুচালো দাড়ি রাখবে। তাহলে তোমাকে ঠিক ত্রয়োদশ লুইএর মত দেখতে লাগবে।

এম্মা লীয়ঁ যেখানে থাকে সেই ঘরটা দেখতে চাইল। দেখে মোটামুটি পছন্দ করল। পরে তাকে পর্দা কেনার উপদেশ দিল। লীয়ঁ খরচের কথা তুললে এম্মা হেসে বলল, তাহলে তুমি খরচ কমাচ্ছ।

লীয়ঁর সঙ্গে যখনি দেখা হত এম্মার, তার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর থেকে সে কি কি করেছে তার একটা ফিরিস্তি দিতে হত। প্রতিবারই একটা করে কবিতা চাইত এম্মা। বলত, তার উপর, তাদের প্রেমের উপর একটা করে কবিতা লিখতে হবে। লীয়ঁ প্রতিবারই প্রথম লাইনটা লেখার পর দ্বিতীয় লাইনটার ছন্দ মেলাতে পারত না। তখন সে এখান সেখান থেকে একটা লাইন টুকে নিয়ে কোন রকমে দুটো লাইন সম্পূর্ণ করত। এম্মাকে তুষ্ট করার থেকে এ ব্যাপারে তার কৃতিত্ব দেখাবার প্রয়াসটাই বড় ছিল। তার অহঙ্কারটা তৃপ্ত হত।

লীয়ঁ কখনো এম্মার কোন কথার বা মতামতের প্রতিবাদ করত না। তর্ক বিতর্ক করত না তার সঙ্গে কোন বিষয়ে। এম্মার যে কোন রুচিবোধকে মেনে নিত। দিনে দিনে সর্ব বিষয়ে এম্মাই তার কর্ত্রী হয়ে উঠছিল, সে এম্মার কর্তা হতে পারেনি। এম্মার মিষ্টি কথা আর চুম্বন লীয়ঁর সমস্ত সত্তাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। ছলবিলাসিনী এম্মার প্রণয়কলা এত নিপুণ এবং এত গভীর ছিল যে উপর থেকে তার স্বরূপ বোঝা যেত না। কোথা থেকে এ কলা সে শিখেছে কে জানে?

৬

মাঝে মাঝে ইয়নভিল গাঁয়ে এম্মাকে দেখতে যেত লীয় তখন সে হোমার বাড়িতে খেত। তাই হোমাকেও সে আমন্ত্রণ জানাত শহরে তার বাসায় যাবার জন্য।

হোমা তার উত্তরে বলত, সানন্দে। এই স্থান পরিবর্তনে আমার ভাল হবে। আমি যাব, কোন একটা নাটক দেখব। তারপর কোন রেস্তোরাঁয় খাব।

মাদাম হোমা আশ্চর্য হয়ে বলে, শহরে ঘুরে বেড়ানো! অনাগত বিপদের আশঙ্কায় ভীত হয়ে উঠত সে।

হোমা কিন্তু এ আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে বলত, কেন আমি শহরে যাব না? তোমরা জান না কিভাবে আমি ওষুধের ধোঁয়ায় ও গ্যাসে আমার শরীরটাকে নষ্ট করছি? আসল কথা মেয়েদের রীতিই হলো এটা। তারা বিজ্ঞানের প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন। আবার বিজ্ঞানের জগৎ থেকে দুদিন কোথাও সরে যাব তাও সহ্য করতে পারে না। তুমি যাই মনে করো আমি সেখানে যাব। এই দিনকতকের মধ্যেই আমি একদিন রুয়েনে চলে যাব এবং গোটা শহরটাকে চষে বেড়াব।

এর আগে হোমা এমন বেপরোয়া ভাষায় কথাবার্তা বলত না। কিন্তু আজকাল সে প্যারিসের চলতি রীতি অনুসরণ করতে চায়। সে মাদাম বোভারীর মত লীয়ঁকে শহরে কোথায় কি আছে তা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। প্যারিসের বুর্জোয়াদের মত দু একটা ভাষাও ব্যবহার করল।

কোন এক বৃহস্পতিবার শহরে যাবার জন্য গাড়ি ধরতে গিয়ে হোমাকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল এম্মা। হোমাকে এ বেশে কখনো দেখা যায় না। গায়ের পথিকের পোষাক, হাতে সুটকেশ। দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু সে যে শহরে যাচ্ছে একথা কাউকে বলেনি। কারণ হোমার ধারণা হয়েছিল সে একদিন দোকানে না থাকলে গাঁয়ের লোকের প্রচুর অসুবিধা হবে।

গাড়িতে সব সময় কথা বলতে লাগল হোমা। যে রুয়েন শহর তার যৌবনের লীলাভূমি সেই শহরে যাচ্ছে সে বহুদিন পর। পুরনো জায়গাগুলোতে সে আবার বেড়াতে যাচ্ছে। আনন্দের উত্তেজনায় সে ফেটে পড়ছে। কথাটা সবাইকে বারবার বলছে।

শহরে গিয়ে গাড়িটা কোনরকমে থামতেই নেমে পড়লে হোমা। লীয়ঁর খোঁজ করতে লাগল পাগলের মত। লীয়ঁর দেখা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই লীয়ঁকে জোর করে টানতে টানতে কাফে দ্য নর্মাণ্ডিতে নিয়ে গেল লাঞ্চ খাবার জন্য। হোমা মাথায় টুপী পরে গম্ভীরভাবে ঢুকল কাফেতে। কারণ তার ধারণা টুপী খুলে ঢুকলে লোকে গেঁয়ো বলবে তাকে।

এদিকে এম্মা লীয়ঁর অপেক্ষায় মুহূর্ত গণনা করতে লাগল অধীর আগ্রহে। সে তার ঘরের জানালার কাচের সার্সিতে মুখ ঘষে মাথা ঘষে সারা বিকেলটা কাটাল। দুপুরে একবার লীয়ঁর খোঁজে তার অফিসে গিয়েছিল এম্মা। কিন্তু পায়নি। তাকে না পেয়ে কি হলো কোথায় গেল তা বুঝতে না পেরে কত ভেবেছে সে।

এদিকে বেলা দুটো বেজে গেলেও হোমা লীয়ঁকে ছাড়েনি। ওদের খাওয়া তখনো শেষ হয়নি। অর্থাৎ টেবিলটার দুধারে দুজনে বসে তখনো মাঝে মাঝে কিছু খাচ্ছিল বা পান করছিল আর কথা বলছিল।

ঘরের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসছিল। জানালার বাইরে বাগানে একটা কৃত্রিম ঝর্ণা থেকে মার্বেল পাথরের চৌবাচ্চার উপর জল পড়ছিল। ভাল খাদ্য ও পানীয়র থেকে শহরের এই পরিবেশের মাঝে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই ছোঁয়াটুকু অনেক বেশী ভাল লাগছিল হোমার। সে কখনো ভাল মদ, কখনো ওমলেট, কখনো মুরগীর মাংস খাচ্ছিল আর নারীচরিত্র সম্বন্ধে নানারকমের মন্তব্য করছিল। তবে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের প্রসাধনের ব্যাপারটাকে সমর্থন করে সে।

লীয়ঁ হতাশ হয়ে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। হোমা তবু সমানে খেয়ে ও গল্প করে চলল।

হোমা লীয়ঁর অধৈর্য ভাবটা লক্ষ্য করে এক সময় বলল, এখন হয়ত তোমার খারাপ লাগছে, মনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কিন্তু তোমার প্রেমিকা ত খুব দূরে নেই।

লীয়ঁ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

হোমা বলল, কথাটা খোলাখুলি বলা ভাল। তুমি এটা অস্বীকার করতে পার না যে ইয়নভিলে···

লীয়ঁ আমতা আমতা করতে লাগল। স্পষ্ট করে কিছু বলল না।

হোমা বলল, বোভারীদের বাড়িতে নিশ্চয় তুমি কারো সঙ্গে প্রেম করতে।

লীয়ঁ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কার সঙ্গে?

হোমা বলল, ওদের বাড়ির ঝির সঙ্গে।

হোমা কিন্তু ঠাট্টা করছিল না। সে উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারেই কথাটা বলল।

এদিকে লীয়ঁর অনুভূতিতে আঘাত লাগল এ কথায়। সে অপমানবোধ করল মনে মনে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে রাগের সঙ্গে প্রতিবাদ করল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, সে পরিণত যৌবনা মহিলাদেরই পছন্দ করে।

হোমা বলল, আমি তোমার পছন্দর তারিফ করি। তাদের মেজাজটা আরো ভাল।

এরপর হোমা লীয়ঁর কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি মেয়েদের মন মেজাজের গতিপ্রকৃতির অভ্রান্ত লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগল। বলল,

জার্মাণ মেয়েদের মনটা বড় খেয়ালী হয়। ফরাসী মেয়েরা ব্যভিচারিণী হয়। ইতালীর মেয়েরা বড় আবেগপ্রবণ।

লীয় এক সময় জিজ্ঞাসা করল, আর নিগ্রো মেয়েরা?

হোমা বলল, শিল্পীরা নিগ্রো মেয়েদের পছন্দ করে।

লীয় এবার অধৈর্য হয়ে বলল, এবার ওঠা যাক।

হোমা ইংরাজি ভাষায় বলল, হ্যাঁ। ওঠা যাক।

কিন্তু হোটেল থেকে বেরোবার আগে হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে ধন্যবাদ জানাল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে হোমার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য কাজের অজুহাত দেখাল লিয়। বলল, আমার এখন বিশেষ কাজ আছে।

তবু কিন্তু হোমা ছাড়ল না তাকে। বলল, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সত্যিই লীয়র সঙ্গ ধরল হোমা। পথে যেতে যেতে এবার তার বাড়ির কথা শুরু করল হোমা। তার স্ত্রীর কথা, ছেলেমেয়েদের কথা, তাদের ভবিষ্যৎ ও দোকানের কথা একে একে সব বলতে লাগল হোমা। লীয় শুনতে না চাইলেও বলে যেতে লাগল সে। হোমা বলল, সে যখন ওষুধের দোকানটা হাতে নেয় তখন তার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। অথচ আজ সে দোকান উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে।

কথা বলতে বলতে ওরা যখন হোটেল ছ বুলোনে পৌছল, লীয় তখন হঠাৎ হোমাকে কিছু না বলার সুযোগ দিয়ে তার কাছে বিদায় নিয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লীয় এম্মার ঘরে ছুটে গিয়ে দেখল এম্মা তখন প্রায় মৃগী রোগে আক্রান্ত হবার মুখে।

লীয় ঘরে ঢুকেই হোমার নাম করল। কিভাবে তাকে সারাদিন আটকে রেখেছিল হোমা তা সব বলল। হোমার নাম শুনে রেগে গেল এম্মা।

লীয় তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলল, তার কোন দোষ নেই। সে নিজের নির্দোষিতাকে বারবার প্রমাণ করতে চাইল। বলল, হোমা কেমন মানুষ, তার স্বভাব কি তা তুমি জান। তুমি কি এক মুহূর্তও তার সঙ্গে থাকতে চাইবে?

এম্মা তবু মুখটা রাগে ফিরিয়ে নিল। লীয় তবু এম্মার কোমরটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নতজানু হয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। নানা কথায় এম্মার মান ভাঙাতে লাগল।

এত অনুনয় বিনয়েও মুখখানাকে গম্ভীর করে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এম্মা। তার জলন্ত চোখদুটো লীয়র সর্বাঙ্গকে বিদ্ধ করছিল যেন তীক্ষ্ণভাবে। হঠাৎ সে চোখে জল দেখা দিল। আচ্ছন্ন করে দিল তার দৃষ্টিকে।

এবার তার চোখের পাতাগুলোকে নরম করে নামাল এম্মা। তার হাতটা বাড়িয়ে দিল লীয়র দিকে। লীয় পাগলের মত সে হাত টেনে নিয়ে তার

মুখের উপর চেপে ধরল। এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দিল, একজন ভদ্রলোক লীয়ঁকে ডাকছে।

এম্মা জিজ্ঞাসা করল লীয়ঁকে, তুমি ফিরে আসবে ত?

লীয়ঁ বলল, হ্যাঁ, আসব।

এম্মা বলল, কখন?

এখনি।

লীয়ঁ নিচে গিয়ে দেখল, হোমা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। হোমা বলল, কেমন ঠকিয়েছি ত? আমি ভাবছিলাম তোমার আমোদ প্রমোদ ভাল লাগছে না, কাজ আছে। কিন্তু দেখছি তা নয়। তুমি আমার সঙ্গে একবার ব্রিদয়ের কাছে চল।

লীয়ঁ বলল, অফিসে আমার কাজ আছে।

হোমা অফিসের কাগজপত্র ও আইনের বই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করতে লাগল। ঈশ্বরের নামে বলছি, কিছুক্ষণের জন্য কুজো ও বার্থোলের কথা একেবারে ভুলে যাও। খেলার মনোভাব গড়ে তোল। চল ব্রিদয়ের কাছে। তার একটা কুকুর আছে। বড় মজার কুকুর সেটা। ভাল লাগবে।

লীয়ঁ বলল, অবসর সময়ে আমি খবরের কাগজ ও আইনের বই পড়ি।

তবু লীয়ঁ বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ল। এম্মার রাগ, হোমার পীড়াপীড়ি, বেশী খাওয়ার প্রভাব, সব মিলিয়ে কেমন এক আবেশ সৃষ্টি করল লীয়ঁর মনে।

এমন সময় হোমা তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করে বলল, চল, ব্রিদয়। এখান থেকে মাত্র এক পায়ের রাস্তা।

এ ব্যাপারে লীয়ঁর কিছুটা কাপুরুষতাও ছিল। আবার অনেক সময় আমরা যা চাই না, আমরা যা ঘৃণা করি তার একটা রহস্যময় প্রভাবে ধরা দিয়ে ফেলি। লীয়ঁরও তাই হলো। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হোমার সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চলল। ব্রিদয়ের বাড়িতে ওরা গিয়ে দেখল ব্রিদয় তার বাড়ির উঠোনে কতকগুলো লোককে খাটাচ্ছিল। ওরা জলের কল নিয়ে কি করছিল। হোমা প্রথমে সেই সব শ্রমিকদের কিছু উপদেশ দিয়ে তারপর ব্রিদয়কে আলিঙ্গন করল। তারপর কিছু মদ্যপান হলো।

লীয়ঁ যতবারই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়, বিভিন্ন কাজের অজুহাত দেখায়, ততবারই হোমা তার হাতটা ধরে বসিয়ে দিয়ে বলে, থাম থাম। এর পর আমরা ফানেল ছ রুয়েনে যাব। সেখানে সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। বিশেষ করে তমালিসের সঙ্গে ত বটেই।

যাই হোক, অবশেষে অতি কষ্টে হোমার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করল লীয়ঁ। কিন্তু হোটেলে ছুটে গিয়ে দেখল এম্মা চলে গেছে।

প্রচণ্ড রাগের বশবর্তী হয়ে একটু আগে ঘর থেকে চলে গেছে এম্মা। তার কথামত ফিরে আসতে না পারার জন্য লীয়ঁর প্রতি ঘৃণায় তার মনটা বিষিয়ে

গেছে। লীয় তাকে এইভাবে অপমান করার সঙ্গে সঙ্গে লীয়ঁকে ত্যাগ করার যুক্তিও খাড়া করে ফেলে। লীয় দুর্বল, কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন, মেয়েদের মত দুর্বলমনা।

ক্রমে বিক্ষুব্ধ মনটা শান্ত হলো এম্মার। পরে সে বুঝল যে লীয়ঁর উপর অবিচার করেছে। সে অকারণে অনেক বেশী রূঢ় হয়েছে। বুঝতে পারল, আমাদের প্রিয়জনের চরিত্র সম্পর্কে যখন তখন যা তা মনে করতে নেই। অকারণে তাদের নিন্দা করতে নেই। তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয় আমাদের। কোন বস্তু যত উজ্জ্বল বা চকচকে হোক না কেন, আমরা যদি তার উপর খুব বেশী করে হাত দিই তাহলে তার রং পালিশ সব উঠে যায়।

এর পর থেকে তাদের দেখা হলে প্রেম ছাড়া অন্য সব বিষয়ের কথা বেশী হয়। এম্মা যে সব চিঠি লিখত লীয়ঁকে সেই সব চিঠিতে কোন প্রেমের কথা থাকত না। থাকত যত সব ফুল, চাঁদ, আকাশের তারার কথা আর কবিতা। এই সব কথা লেখার কারণ ছিল। প্রেমের ক্ষেত্রে তার আবেগের জোয়ারে যতই ভাটা পড়ে আসছিল ততই সে নানা কৃত্রিম উপায়ে নিসর্গ সৌন্দর্যের কথা বলে সে আবেগের অভাবটাকে ঢাকবার চেষ্টা করত।

সেদিন লীয়ঁর উপর রাগ করে চলে যাওয়ার পরে নিজেকে প্রায়ই বোঝাত এম্মা, এর পর যেদিন দেখা হবে তাদের সেদিন তাদের মিলনটা হবে আগের থেকে অনেক নিবিড়, অনেক মধুর। সে মিলন তাকে নিয়ে যাবে এক বিরল সুখানুভূতির সর্বোচ্চ শিখরে। কিন্তু সে মিলন যখন শেষ হলো তখন এম্মা মনে মনে স্বীকার করল, এমন কিছু অসাধারণ হয়নি এ মিলন। কোন দিক থেকেই এমন কিছু বিশেষ আনন্দ সে পায়নি।

প্রতিবার প্রতিটি ছোটখাটো হতাশা নতুন আশার পথে নিয়ে যায় এম্মাকে। প্রতিটি অতৃপ্তি তাকে নতুন করে মাতাল করে তোলে তৃপ্তির আশায়। ফলে যখনি দেখা হয়, মিলন ঘটে লীয়ঁর সঙ্গে তখনি সে আরো বেশী কিছু পাবার আশায় আরো অসহিষ্ণু ও বদমেজাজী হয়ে ওঠে।

এম্মার এই অসহিষ্ণুতা তাদের দেহমিলনের সময়েও প্রকট হয়ে ওঠে। তার পোষাক ছাড়ার সময়টুকুও অপেক্ষা করতে পারে না সে। সে তার গায়ের পোষাকগুলো একে একে ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলে। শেষে তার অন্তর্বাসের দড়িটা ধরে জোরে টান দেয়। তারপর খালি পায়ে দরজার কাছে গিয়ে তাতে তালাবন্ধ আছে কি না তা দেখে নেয়। অবশেষে সে তার নগ্নগম্ভীর মূর্তিটা নিয়ে শায়িত লীয়ঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লীয়ঁর কিন্তু আগের মত আর এসব ভাল লাগে না। এম্মার এই ক্রমবর্ধমান কামোন্মত্ততা, তার ঘর্মাক্ত কপাল, তার তপ্ত ওষ্ঠাধর, তার তীক্ষ্মমদির কটাক্ষ, তার নিবিড়নির্মম বাহুবেষ্টনী—এই সব কিছু যেন তাদের প্রেমসম্পর্কের মধ্যে এক দুরপনেয় অন্তরায় সৃষ্টি করবে একদিন।

তবু এম্মাকে কোন কথা বলতে সাহস পায় না লীয়ঁ। তাছাড়া সেভাবে বলেও কোন লাভ হবে না। প্রেমের ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্না প্রণয়কলানিপুণা এম্মা সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার চরম অনুভূতিগুলিকে হাড়ে হাড়ে এর আগেই অনুভব করেছে।

লীয়ঁ বেশ বুঝতে পারল একদিন এম্মার যে সব দিক মোহমুগ্ধ করেছিল তাকে আজ সেই সব দিক দেখলে ভয় হয় তার। তার মধ্যে কোন মোহ খুঁজে পায় না। তার উপর আর একটা কারণে এম্মার বিরুদ্ধে মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তার। লীয়ঁর সমগ্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব এম্মা একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে নিঃশেষে। যে কোন দ্বন্দ্ব সংঘাতে সব সময় এম্মারই জয় হয়। লীয়ঁর কোন কথা টেকে না, শোচনীয়ভাবে সব বিষয়ে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয় সে।

এই সব কারণে এম্মাকে ভালবাসতে আর ইচ্ছা করে না লীয়ঁর। তার পদশব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। ভাল মন্দ দেখতে থাকা কোন মাতাল লোকের মত এম্মাকে আজকাল দেখেই এক অনীহা ও বিতৃষ্ণা প্রবল হয়ে ওঠে তার মধ্যে।

অথচ এদিকে লীয়ঁকে নানাভাবে প্রীত করার চেষ্টায় এম্মার তৎপরতার যেন কোন অন্ত নেই। লীয়ঁকে খুশি করার জন্য এম্মা নানাভাবে চেষ্টা করে। সে তার জন্য ভাল খাবার আনে। ইয়নভিল থেকে গোলাপ আনে অনেক ছলনাজাল বিস্তার করে, মদির কটাক্ষ হানে তার পানে। এম্মা আবার লীয়ঁর শরীর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগল। তার আচরণ সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতে লাগল।

তাদের বন্ধনটাকে আরো দৃঢ় করার জন্য একদিন কুমারী মেরির চিত্রাঙ্কিত একটা মেডেল এনে লীয়ঁর গলায় পরিয়ে দিল এম্মা। তারপর অভিভাবিকা মাতার মত সে কার কার সঙ্গে মেশে সে বিষয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ নিতে লাগল। তারপর বলতে লাগল উপদেশের ভঙ্গিতে, ওখানে আর যেও না। ওর সঙ্গে মিশো না। এম্মার ইচ্ছা হলো সে যেন সব সময় লীয়ঁর উপর খবরদারি করে। সে তার সব কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে চলে। সে কখন কোথায় কখন যায়, কি করে তা দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে সে একদিন রাস্তায় গোপনে তাকে অনুসরণ করার কথা ভাবল।

এম্মা লক্ষ্য করল একটা ভিখারি সামনের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তাকে কিছু দিলেই সে লীয়ঁর খোজখবর নিতে পারবে। কিন্তু একথা ভাবতে গিয়েই তার অহঙ্কারে আঘাত লাগল। তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

সে নিজের মনে মনে বলল, সে যদি আমাকে ঠকায়, আমার সঙ্গে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে ত করবে। আমি তা মোটেই গ্রাহ্য করি না।

সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লীয়ঁর কাছে বিদায় নিয়ে আপন মনে যখন

রাস্তায় হেঁটে চলেছিল এম্মা তখন হঠাৎ তাদের স্কুলটার উপর চোখ পড়ল তার। এই কনভেন্টে কতদিন পড়েছে সে। কতদিন বাস করেছে স্কুলবোর্ডিংয়ে। কত শান্তিতে কাটত সেই দিনগুলো। তখন যত সব গল্পের বই পড়ে সে অনন্ত অক্ষয় প্রেমানুভূতির কল্পনা ও কামনা করত সে. সে কামনা আজও পূরণ হয়নি।

তাদের বিয়ের অব্যবহিত পরের সেই দিনগুলো, বনপথে ঘোড়ায় চেপে যাওয়া, ভিকোঁতের সঙ্গে ওয়ালৎস নাচ নাচা, লিগার্দির গান—একের পর এক করে অতীতের সব ঘটনাগুলো ভেসে উঠল তার মনের পটে। আর সঙ্গে সঙ্গে লীয়ঁকে অনেক দূরের মানুষ বলে মনে হলো।

তবু সে মনে মনে বলল, আমি আজও তাকে ভালবাসি।

সহসা মনটা দৃঢ় হয়ে উঠল এম্মার। সে এখন সুখী নয়। কখনো সুখ পায়নি—তাতে কিছু যায় আসে না। কেন জীবন তার সন্তোষজনক হলো না কোনদিন? সুখের আশায় সে যা কিছু আঁকড়ে ধরছে কেন তা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে অচিরে? কিন্তু যদি কোথাও এমন কোন শক্তিমান ও সুদর্শন যুবক থাকে যে হবে কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন ও দেবদূতের মত দেখতে, ব্রোঞ্জের তারওয়ালা এক অদ্ভুত বীণার মত যে যুবক হবে একাধারে শক্তি, সৌন্দর্য ও সুরমাধুর্যে গড়া, যে তাদের বিয়ের বা প্রথম মিলনের গানকে এক স্বর্গীয় সুষমা দান করে তাদের প্রেমকে অক্ষয় করে রাখবে—এমন কোন আদর্শ যুবক যদি পৃথিবীতে কোথাও থাকে তাহলে কেন তার সঙ্গে দেখা হবে না তার জীবনে? তাছাড়া এই পৃথিবীকে দেখার মত কিছুই নেই, সব কিছু মিথ্যা। প্রতিটি হাসির পিছনে আছে এক বিষণ্ণ ক্লান্তি আর অবসাদ। প্রতিটি সুখ বা আনন্দের পিছনে আছে এক অভিশাপ, প্রতিটি চুম্বনের মাধুর্য ওষ্ঠাধরের উপর রেখে যায় আরও বেশী সুখলাভের এক তপ্ত তৃষ্ণা।

শান্ত বাতাসে এক যান্ত্রিক শব্দের ধ্বনি কানে ভেসে এল। কনভেন্টের বড় ঘড়িতে চারটে বাজল। মাত্র চারটে, এম্মার মনে হলো সে যেন এই বেঞ্চটায় অনন্তকাল ধরে বসে আছে। তার মনে হলো—স্বল্প পরিসরের মধ্যে অবরুদ্ধ এক বিরাট জনতার মত কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্ত এক প্রেমাবেগকে চেপে রাখা যায়। এম্মার কাছে প্রেমাবেগটাই সবচেয়ে বড়, সে এখন আর টাকার কথা চিন্তা করে না।

একদিন লালমুখো টাকওয়ালা এক অপরিচিত লোক এসে মাদাম বোভারীর খোঁজ করতে লাগল। এম্মার পরিচয় পেয়ে তার সবুজ ফ্রককোট থেকে একটা দলিল বার করে সে বলল সে মঁসিয়ে ভিনেপার্তের কাছ থেকে আসছে। এম্মা দলিলটা পড়ে দেখল সেটা তারই হাতে সই করা এক ঋণপত্র। টাকার পরিমাণ পাঁচশো ফ্রাঁ। কথা ছিল লেহ্‌রূড়ে সেটা তার কাছেই রাখবে, মঁসিয়ে ভিনেপার্তেকে দেবে না। কিন্তু সে কথা রাখেনি লেহ্‌রূড়ে। দিয়ে দিয়েছে।

লোকটাকে কি উত্তর দেবে কিছু খুঁজে পেল না এম্মা। সে তার ঝিকে লেহুড়ের কাছে পাঠাল। কিন্তু লেহুড়ে বলে পাঠাল সে আসতে পারবে না।

লোকটা তখনো বসেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। এক সময় সে অধৈর্য হয়ে বলল, আমি মঁসিয়েকে কি বলব?

এম্মা তখন আমতা আমতা করে বলল, বলবেন···এখন আমার কাছে নেই···আমি···এক সপ্তা পরে দেব।

লোকটা কোন কথা না বলেই চলে গেল।

পরের দিন দুপুরে টাকা শোধ না দেওয়ার জন্য এক প্রতিবাদপত্র পেয়ে ভয়ে লেহুড়ের কাছে নিজে ছুটে গেল এম্মা।

লেহুড়ে তার দোকানেই ছিল। তের বছরের যে মেয়েটা তার রান্না করে দেয় সেই মেয়েটা তাকে কি একটা প্যাকেট করতে সাহায্য করছিল।

এম্মাকে দেখে লেহুড়ে বলল, বলুন, আপনার কি সেবা আমি করতে পারি?

লেহুড়ে তার কাজ সেরে পাশের একটা ছোট ঘরে এম্মাকে নিয়ে গেল। একটা বড় আর্মচেয়ারে বসে লেহুড়ে বলল, কি খবর?

এম্মা নীরবে তার হাতের কাগজটা লেহুড়েকে দেখাল।

লেহুড়ে বলল, কিন্তু আমি কি করতে পারি?

এম্মা ভীষণ রেগে গেল। সে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে সে ঋণপত্র হাত ছাড়া করবে না, ভিনেপার্তেকে দেবে না বলে কথা দিয়েছিল।

লেহুড়ে বলল, কি করব? পাওনাদারেরা আমাকে দিতে বাধ্য করেছে। জোর করে নিয়ে নিয়েছে। তারা আমার গলায় ছুরি ধরেছিল।

এম্মা বলল, এখন কি হবে?

লেহুড়ে শান্তভাবে বলল, ব্যাপারটা খুব সোজা। প্রথমে কোর্ট থেকে পরোয়ানা আসবে। তারপর টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হবে।

এম্মার ইচ্ছা হলো সে লেহুড়েকে মারবে, জোর আঘাত দেবে। কিন্তু নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বলল, মঁসিয়ে ভিনেপার্তেকে শান্ত করার কোন উপায় আছে কিনা?

লেহুড়ে বলল, মঁসিয়ে ভিনেপার্তেকে শান্ত করা? আপনি জানেন না সে কি ধরনের লোক। সে আমার থেকেও ভয়ঙ্কর।

এম্মা বলল, লেহুড়েকে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

লেহুড়ে বলল, শুনুন আমি এতদিন আপনার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে এসেছি। কত নরম হয়ে চলেছি।

এরপর সে লেজার খাতাটা বার করে তাকে দেখাতে লাগল। বলল, দেখুন দেখুন—আগস্ট মাসে ৩২০০ ফ্রাঁ—১৭ই জুন ১৫০ ফ্রাঁ—আবার ৩০শে মার্চ ৪৬ ফ্রাঁ,—তারপর এপ্রিল—

বলতে বলতে থেমে গেল লেহুড়ে। ভাবল আর বলা যেন ঠিক হবে না। আপনার স্বামীর সই করা ঋণপত্রের কথাগুলো আর বললাম না। তাঁর নামে একটা সাতশো ফ্রাঁ আর একটা তিনশো ফ্রাঁ ঋণ আছে। এ ছাড়া আগেকার কত যে বাড়তি টাকা দেওয়া আছে তার শেষ নেই। কত সুদ আসল যে জমা হয়েছে তার হিসেব নেই। এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।

এম্মা নিরুপায় হয়ে কাঁদতে লাগল। একবার আবেগের মাথায় মঁসিয়ে লেহুড়েকে তার প্রিয় বলে সম্বোধন করল। কিন্তু লেহুড়ে কিছু করতে রাজী হলো না। সে শুধু মঁসিয়ে ভিনেপার্তের নামে দোস দিয়ে যেতে লাগল।

তাছাড়া সে নিজে একজন গরীব দোকানদার, তার হাতে একটা পয়সাও এখন নেই। সে যাদের কাছে পাবে তারা একটা পয়সাও দিচ্ছে না। অথচ তার পাওনাদারেরা পিছন থেকে তার পোষাক ধরে টানাটানি করছে। সুতরাং তার পক্ষে এখন কোন টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

এম্মা আর কোন কথা বলল না। তার কলমের পালকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল লেহুড়ে। এম্মার নীরবতায় সে অস্বস্তি অনুভব করে বলল, যদি আমাকে একান্তই কিছু করতে হয় তাহলে এই ক'দিনের মধ্যে একবার আসুন। দেখি যদি কিছু করতে পারি।

এম্মা বলল, মোটের উপর বার্নেভিল থেকে বাকি টাকা পেয়ে গেলেও—

লেহুড়ে বলল, সেটা কি?

লেহুড়ে যখন শুনল মঁসিয়ে ল্যাংলয় সেই বাড়ি বিক্রির বাকি টাকাটা তখনো পাঠায়নি তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বলল, আমাদের শর্ত হবে—

এম্মা বলল, যে কোন সর্ত আপনি বলবেন।

লেহুড়ে তার চোখ দুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর একটা কাগজের উপর কয়েকটা সংখ্যা লিখল। তারপর বলল সে একটা বড় ঝুঁকি নিয়ে নিজেকে বিপন্ন করে তুলছে। সে চারটে ঋণপত্র তৈরি করছে প্রত্যেকটা পত্র হবে একশো পঞ্চাশ ফ্রাঁর। এক মাসের মেয়াদ থাকবে তাতে।

তারপর লেহুড়ে একটু থেমে বলল, তবে দেখতে হবে ভিনেপার্তে আমাদের কথা শুনবে কিনা। যাই হোক, আমি কথা দিলাম। আমি কখনো দুকথা বলি না অথবা এক কথার দুটো মানে করি না। আমি হচ্ছি খোলাখুলি এবং সরল প্রকৃতির মানুষ।

এরপর কিছু পোষাক দেখিয়ে লেহুড়ে বলল, এসব পোষাক আপনাদের মত মহিলাদের চলবে না। কিন্তু এসব সস্তা পোষাকের কাপড় কেনারও লোক আছে। আমি যদি বলি এর রং উঠবে না তাহলে ওরা তা বিশ্বাস করে এবং ওরা ঠকেও না।

অর্থাৎ লেহুড়ে এর দ্বারা এই বোঝাতে চাইল যে সে অন্য সব খরিদ্দারদের

ঠকালেও তাকে কখনো ঠকায় না। তাকে যা বলে সব সত্যি কথা।

এম্মা উঠে যাচ্ছিল। লেছড়ে তাকে ডাকল। ডেকে একটা ফিতে দেখাল। নিজের মনে বলে যেতে লাগল, চমৎকার। এটা আপনার অনেক কাজে লাগবে।

তারপর কিছু না বলে বাজীকরদের মত ক্ষিপ্র হাতে ফিতেটা গুটিয়ে এম্মার হাতে গুঁজে দিল।

এম্মা শান্ত কণ্ঠে বলল, অন্ততঃ দামটা এর কত বলুন।

লেছড়ে বলল, সে সব পরে হবে।

লেছড়ে সেখানে আর না দাঁড়িয়ে অন্য কোথায় চলে গেল।

সেই সন্ধ্যাতেই এম্মা চার্লসকে দিয়ে তার মাকে চিঠি লেখাল। চার্লস তার মাকে লিখল তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওনা টাকা যেন তিনি পাঠিয়ে দেন। তার উত্তরে চার্লসএর মা জানালেন, এখন পাঠাবার মত কিছু নেই। তাদের পাওনা সব সম্পত্তি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। সেই সম্পত্তি থেকে তারা বছরে ছয়শো ফ্রাঁ করে পাবে।

সুতরাং সেখান থেকে কোন টাকা না পেয়ে অন্য উপায়ে টাকা যোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগল। প্রথমে সে চার্লসএর রোগীদের কাছে যেসব বাকি বিল ছিল তা তাদের কাছে আদায়ের জন্য পাঠিয়ে দিল। প্রতিটি বিলের শেষে লিখে দিল, মঁসিয়ে বোভারীকে বলবেন না। জানেন ত তিনি কত অহঙ্কারী।

এতে ভাল সাড়া পেল এম্মা। এর পর সে তার হাতের তৈরি টুপী প্রভৃতি পুরনো অনেক পোষাক ও সংসারের পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দল। বিক্রি করার সময় দরাদরি ভালই করতে পারত সে। তার গায়ে যতই হোক চাষীর রক্ত আছে।

এরপর সে ধার করতে শুরু করল যার তার কাছে। সে ফেলিসিতের কাছে টাকা ধার করল। তারপর মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া, রুয়েনের হোটেলের মালিকের কাছ থেকে একের পর এক করে টাকা ধার করে গেল। সে অতি কষ্টে মঁসিয়ে ভিনেপার্তের অর্ধেক টাকা শোধ করে দিল। বাকি টাকার জন্য ঋণপত্র লিখে দিল।

আজকাল বোভারীদের সারা বাড়িটা কেমন যেন ছায়া ছায়া এক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সব সময়। আজকাল পাওনাদার ব্যবসায়ীরা প্রায়ই বাড়িতে আনাগোনা করে। যাবার সময় তারা সবাই মুখখানাকে ভারী করে চলে যায়। আজকাল বাড়িতে যেখানে সেখানে কত সব জিনিস ছড়ানো থাকে। বাচ্চা মেয়ে বার্থেকে দেখে মাদাম হোমার বড় কষ্ট হয়। বার্থের মোজা দুটো ছিঁড়ে গেছে। চার্লস যদি ভয়ে ভয়ে এ নিয়ে কোন কথা বলে তাহলে এম্মা রেগে যায়। বলে তার কোন দোষ নেই এ ব্যাপারে।

এম্মার এত রাগের কারণ কি? চার্লস ভাবল তার সেই আগের মৃগী রোগের ফল অথবা পুনরাবির্ভাবের আভাস। অথচ সে রোগজনিত দুর্বলতাকে এম্মার দোষ বলে ভুল করেছে। তাই সে অনুতপ্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে চায়। কিন্তু যেতে গিয়েও পারে না। নিজের মনে মনে বলে, না না এতে ও বিরক্ত হবে।

চার্লস তাই কিছুই করত না।

খাওয়ার পর নিজেই একা একা বেড়াত চার্লস।

তারপর বার্থেকে কোলে নিয়ে পাশে ডাক্তারীর কোন পত্রিকা খুলে রেখে তাকে পড়াবার চেষ্টা করত। কিন্তু বার্থেকে মোটেই কিছু পড়ানো হয়নি। তাই বার্থে কিছুই পারত না। তার মুখখানা বিষাদে ভারী হয়ে উঠত। চোখে জল আসত। চার্লস তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করত। বাগানের পথে জল দিয়ে ছোট নদী করে দিত বার্থেকে ভোলাবার জন্য। গাছের ডাল ভেঙ্গে দিয়ে বলত, গাছ বসাও। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই অস্বস্তিবোধ করিত বার্থে এবং তার মার কাছে যেতে চাইত।

চার্লস তখন তাকে বলল, ফেলিসিতেকে ডাক। তুমি জান তোমার মাকে ডাকলে বিরক্ত হবে।

তখন হেমন্ত কাল। এরই মধ্যে গাছে গাছে পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। নিঃসঙ্গ চার্লস প্রায়ই বাগানে বেড়াতে বেড়াতে বিষণ্ণ মনে ভাবে, আজ হতে দুবছর আগে এম্মার অসুখ শুরু হয়। কিন্তু এ অসুখের শেষ কোথায়? বাগানে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে উঠেছে। বাগানটা অনেকদিন পরিষ্কার হয়নি। কারণ লেস্তিবুদয়ের অনেক বেতন বাকি। আর তাকে বলা যায় না।

মাদাম বোভারী আজকাল সব সময় নিজের ঘরের মধ্যেই থাকে। সে ঘরে কারো ঢোকার হুকুম নেই। সারাদিন সেই ঘরের মধ্যেই থাকে এম্মা। পোষাক আশাক বেশী কিছু পরে না। শুধু রুয়েনের এক দোকান থেকে কিনে আনা ধূপ জ্বালায়। রাত্রিবেলায় চার্লস বিছানায় তার পাশে শুলেই রেগে যায়। চার্লস একটা প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে পড়ে সারা রাত ঘুমোবে এটা সে চায় না। তার বারবার জোর আপত্তি করায় চার্লস বাধ্য হয়ে পাশের ঘরে শোয়। সারারাত এম্মা বই পড়ে। যত সব যুদ্ধ মারামারি আর রক্তপাতের বই।

এই সব কাহিনী পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ভয়ে আপন মনেই চিৎকার করে ওঠে এম্মা। তার সেই চিৎকার শুনে চার্লস যদি পাশের ঘর থেকে ছুটে আসত তার ঘরে তাহলে বলত, বেরিয়ে যাও।

যে কামনার আগুন শত ব্যভিচারেও তৃপ্ত হয়নি এম্মার, যে আগুন কোন দাহ্য বস্তু না পেয়ে আপনা থেকেই জ্বলতে থাকে, সেই গোপন আগুনে আজও জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয় এম্মা। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর ঘরের জানালাটা খুলে

দিয়ে দাঁড়ায়। বাতাসে তার মাথার ঘন চুলের রাশ উড়তে থাকে। আকাশের তারার পানে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবতে থাকে এম্মা যদি কোন রাজপুত্র তাকে ভালবাসত। আর ঠিক এই সময় লীয়ঁর কথাটা মনে পড়ে যায়। আবার যদি একবার আগের মত তাদের সেই গোপন মিলন ঘটত তবে তার সব কামনা তৃপ্ত হত।

সেই সব মিলনের দিন কত সুখের। অনাবিল আনন্দের গৌরবে দিনগুলোকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য কত চেষ্টা করত এম্মা। লীয়ঁ যখন কোন কিছুর দাম দিতে পারত না, তখন এম্মা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিত। তবে লীয়ঁ যখন তাকে মাঝে মাঝে আরো বড় ও ভাল হোটেলে একটা ঘর নেবার কথা বলত তখন সে বাধা দিত। আপত্তি তুলত।

একদিন তার ব্যাগ খুলে ছয়টা রুপোর চামচ বার করল এম্মা। এগুলো তার বাবার বিয়ের উপহার। সেগুলো লীয়ঁর হাতে দিয়ে সে তাকে তাড়াতাড়ি কোন সোনারুপোর দোকানে গিয়ে বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা আনতে বলল। লীয়ঁর মন চাইছিল না একাজ করতে। সে অপমান বোধ করছিল। তবু না গিয়ে পারল না।

লীয়ঁর তখনি একটা কথা মনে হয়েছিল, এম্মার আচরণটা কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছে। মনে হলো যারা তাকে মাদাম বোভারীর সঙ্গে তার সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলছে তারা ভুল বলেনি।

একজন লোক লীয়ঁর অবৈধ প্রেমের কথা সব জানিয়ে তার মাকে চিঠি লেখে। একটা লম্বা চিঠিতে জানায়, লীয়ঁ আজকাল এক বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে গভীর ভাবে মেলামেশা করছে। লোকটা আবার লীয়ঁর মালিক মাত্রে রুজকেও ব্যাপারটা জানাল। লিখল লীয়ঁ যার সঙ্গে প্রেম করছে সেই মহিলাটি ব্যভিচারিণী, মিথ্যা প্রেমের ছলনাময় শূন্যমণ্ডলে চিরদিন উড়ে বেড়ানোই হলো তার কাজ।

মাত্রে রুজও তাঁর যা করার করলেন। তিনি লীয়ঁকে ডেকে অনেক বোঝালেন। তিনি তার মোহবদ্ধ চোখ দুটো খোলার চেষ্টা করলেন। তাকে বোঝালেন এর পরিণতি বড় ভয়ঙ্কর। একদিন না একদিন এই প্রেমের প্রান্তভূমিতে এসে দাঁড়াতে হবেই। কিন্তু তখন কোন উপায় থাকবে না। কারণ লীয়ঁ তখন শুধু তার সামনে দেখবে এক বিশাল অতলগর্ভ খাদ সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত প্রসারিত হয়ে আছে তার সামনে। সব শেষে মাত্রে রুজ বললেন, যদি তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে না পার তাহলে অন্ততঃ আমার খাতিরে আমার দিকে তাকিয়ে তুমি এ কাজ করবে।

অবশেষে লীয়ঁ প্রতিজ্ঞা করল এম্মার মুখ সে আর দেখবে না। কিন্তু এম্মার রাগ ও শক্ত কথার ভয়ে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি সে। এই নিয়ে তার অফিস বন্ধুরা রোজ তাকে ঠাট্টা করত। তাছাড়া লীয়ঁ বুঝল তার

ভবিষ্যতের কথা ভেবেও এ সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত। এই সময় তার পদোন্নতির কথা হচ্ছে। সে হেড ক্লার্ক হতে চলেছে। এর জন্য তার অন্য সব বাতিক ও দিবাস্বপ্নের কথা ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্য তারা লীয়ঁকে বোঝায় তাদের ফরাসী দেশের প্রতিটি বুর্জোয়া বা অভিজাত সমাজের লোকেরই প্রথম যৌবনে এই ধরনের পদস্খলন হয়।

আজকাল তাদের মিলনের সময় এম্মা যখন বুকের উপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে তখন তার খুব খারাপ লাগে। আজকাল এম্মার প্রেমের কথা শুনতে ভাল লাগে না। তার আদর বা আলিঙ্গনে অস্বস্তি অনুভব করে সে। অন্তরে আসে বিরাগ, চোখে আসে ঝিমুনির ভাব আর কান দুটো হয়ে ওঠে বধির।

এখন যেন তারা পরস্পরকে ভালভাবেই জেনে ফেলেছে। তাদের পরস্পরের সবটুকু জানা হয়ে গেছে। আজকাল তারা যখন নিবিড় মিলনের মধ্যে পরস্পরকে পায় তখন আগের মত আর অনুভব করে না সেই মধুর বিস্ময়ের শিহরণ, তাদের অঙ্গে জাগে না সেই বিরল পুলকের রোমাঞ্চ। এম্মা আজ বেশ বুঝতে পেরেছে বিয়ের মত ব্যভিচারও এক সাধারণ ব্যাপার ও ব্যভিচারের আনন্দ যতই নিবিড় ও বেগবান হোক না কেন সে আনন্দেও ভাটা পড়ে একদিন।

কিন্তু এখন উপায়? কোন পথে যাবে সে? ক্রমহ্রাসমান আনন্দের এই নশ্বরতায় ক্রমশই অপমানিত বোধ করতে লাগল এম্মা। তবু কোন উপায় নেই। এ আনন্দ আর সে না চাইলেও তা ত্যাগ করতে পারল না। বরং আরো জোর করে আঁকড়ে ধরতে লাগল সে আনন্দের আবেগকে। কিছুটা অভ্যাসগত আচরণ, ও কিছুটা অবৈধ কামনার তাড়নার বশবর্তী হয়ে এম্মা দিনে দিনে আরো মরীয়া হয়ে আরো জোর করে সে আনন্দের ক্ষীয়মান আবেগটাকে জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সে আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে অতিরিক্ত তৃপ্তির লোভে তার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে তার স্বাভাবিক তৃপ্তিটুকুও হারিয়ে ফেলল।

এর জন্য সে লীয়ঁকেই দোষ দিত। এম্মা বলত তার এই আশাভঙ্গের জন্য সে-ই দায়ী। এমন একটা ভাব দেখাত যাতে বোঝাতে চাইত লীয়ঁ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার সঙ্গে। তাই মনে মনে এম্মা চাইত, এমন একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটুক যার ফলে তাদের এই অবাঞ্ছিত সম্পর্ক আপনা থেকেই ছিন্ন হয়ে যায়। এ সম্পর্কের সুতোটা ছিন্ন করার ক্ষমতা এম্মার ছিল না, সে নিজের হাতে সে সুতো ছিন্ন করতে পারবে না বলেই কোন দুর্ঘটনার প্রত্যাশা করত।

তবু লীয়ঁকে নিয়মিত চিঠি লিখত এম্মা। না লিখে পারত না। তার ধারণা প্রেমিকা তার প্রেমিককে অবশ্যই চিঠি লিখে যাবে।

কিন্তু এ চিঠি যখনি লিখত এম্মা, যখন কাগজের উপর তার কলম যত সব প্রেমের কথা লিখে যেত লীয়ঁকে, ঠিক তখনি তার আশেপাশে এক সুদর্শন

পুরুষমূর্তির আবির্ভাব হত। দেহ মনের দিক থেকে সর্বতোভাবে সুন্দর যে পুরুষপ্রবণের মূর্তিটি মনে মনে কল্পনা করে এসেছে এতদিন, যাকে সে বাস্তবে কোনদিন পায়নি, সেই পুরুষমূর্তি আজ যেন সশরীরে আবির্ভূত হলো তার সামনে। এম্মার মনে হলো সে মূর্তি যেন সত্যিই রক্তমাংসে গড়া মূর্তি। তার মনে হলো তার সেই বাঞ্ছিত ও বহুআকাঙ্ক্ষিত পুরুষ তাকে নিয়ে যাবে ফুলের গন্ধভরা এক চন্দ্রালোকিত রাজ্যে। সে পুরুষ যখন তার কাছে সত্যি সত্যিই আসবে তখন তার একটি চুম্বনের মাধ্যমেই প্রধর্ষিত হয়ে উঠবে তার নারীত্ব। সেই ভয়ঙ্করসুন্দর চুম্বনের মধ্য দিয়ে সে যেন নিঃশেষে শোষণ করে নেবে তার জীবনযৌবনের সব নির্যাসটুকু।

কিন্তু এই দিবাস্বপ্নে বেশীক্ষণ ভুলে থাকতে পারে না এম্মা। স্বপ্নের স্রোতটা শুকিয়ে যেতেই বাস্তব জীবনের কঠিন চরে আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। তখন তার মনটা বড় খারাপ করে। মারামারি কাটাকাটির বই পড়ে যেমন একটা অবসাদ বা ক্লান্তি আসে মনে তেমনি এই দিবাস্বপ্নের স্রোতের আঘাত বিবশ করে দেয় দেহমনকে।

আজকাল এম্মা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে তখন ভয়ে ভয়ে থাকে। অবিরাম আশঙ্কার নিবিড় আঘাতে অবসন্ন হয়ে থাকে সে। কোর্ট থেকে প্রায়ই সমন আসে, কত দলিলপত্র আসে। এম্মা সেগুলো ভাল করে দেখে না। তার মধ্যে কি সব লেখা আছে তা যেন সব তার জানা। তার মনে হয় সে যেন আর জীবিত নেই, সে মরে গেছে অথবা অভিভূত হয়ে আছে এক অবিচ্ছিন্ন নিদ্রায়।

এক বৃহস্পতিবার রাত্রিতে শহর থেকে আর ফিরল না এম্মা। লীয়ঁ ও তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এক বলনাচের আসরে গিয়ে সারারাত নাচল। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তার দিকে।

পরের দিন ভোরবেলায় একটা থিয়েটারের কাছে লীয়ঁর পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে এম্মাকে দেখা গেল। তারা কোন একটা কাফে বা রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খাবার কথা ভাবছিল।

কিন্তু আশপাশের সব কাফে ভর্তি ছিল লোকে। অবশেষে তারা নদীর ধারে একটা রেস্তোরাঁয় গেল। তার মালিক দোতলার একটা ঘরে তাদের যেতে বলল।

কে দাম দেবে এই নিয়ে প্রথমে তারা নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করল। তারপর তারা বসল। পাঁচজনের মধ্যে ছিল দুজন ডাক্তারির ছাত্র, একজন কেরাণী আর একজন দোকান কর্মচারী, আর একজন মেয়ে। এম্মা দেখল মেয়েটি নিম্নশ্রেণীর। এম্মা ভাবল কোন্ সঙ্গে সে মিশছে, কাদের সঙ্গে সে এখানে এসেছে?

অন্য সবাই যখন খেতে লাগল, এম্মা চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে রইল।

এম্মা কিছুই খেল না। বসে বসে ভাবতে লাগল। গতরাত্রির নাচের আসরের কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল অসংখ্য নৃত্যশিল্পীর পায়ের ছন্দায়িত আঘাতে নাচঘরের মেঝেটা কাঁপছে। সারা ঘরখানা সিগারেটের ধোঁয়ার উগ্র গন্ধে ভরে আছে। এম্মার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। এম্মা হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে তখন ধরাধরি করে ওরা জানালার ধারে নিয়ে গেল।

তখন সকাল হয়ে আসছে। দূরে দিগন্তের কাছে সেণ্ট ক্যাথারিণ গীর্জার উপর কুয়াশাম্লান আকাশখানায় লাল আলো ফুটে উঠেছে। সে আলোর লাল আভাটা ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। বাতাসে নদীর শান্ত বুকটা শিউরে উঠছে। নদীর পুলের উপর কোন লোক নেই। রাস্তার আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে একে একে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল এম্মা। জ্ঞান ফিরে এলে তার মনে হলো দূরে দিগন্তের ওপারে বার্থে ফেলিসিতের কোলে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ জোর শব্দ করে একটা মালগাড়ি চলে যাওয়ায় সে চিন্তায় বাধা পড়ল তার। সেই যান্ত্রিক শব্দের চাপ সব লণ্ডভণ্ড করে দিল তার মনের চিন্তাগুলোকে।

সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়ল এম্মা। লীয়ঁকে বলল, সে বাড়ি যাচ্ছে। অথচ বাড়ি গেল না সে। হোটেল ত্ম বুলোনে গিয়ে একা একা বসে রইল। কোন কিছুই ভাল লাগছিল না তার। সব কিছুকেই ঘৃণা করতে ইচ্ছা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিও ঘৃণা জাগছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল সে যেন এক আশ্চর্য পাখি হয়ে মহাশূন্যের ওপার থেকে তার পালিয়ে যাওয়া যৌবনকে ধরে আনে।

হোটেল থেকে একা একা উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল এম্মা। মাদামও একে একে শহরটা ছাড়িয়ে শহরের প্রান্তে একটা বাগানের ধারে সবুজ প্রান্তরে বসে রইল। এম্মা যেন দেখেও কিছু দেখছিল না। গোটা শহরটার এত সব লোকজন, পথ ঘাট, আমোদ প্রমোদের উপকরণ সব যেন জোর হাওয়ার আঘাতে উড়ে যাওয়া কুয়াশার মত কোথায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল।

আবার হোটেলেই ফিরে এল এম্মা। তার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল। বেলা চারটে পর্যন্ত তন্দ্রার ঘোরে ঝিমিয়ে ছিল এম্মা। বেলা চারটে বাজতে হিভার্ত এসে জাগাল তাকে।

বাড়ি ফিরতেই ফেলিসিতে এম্মাকে একটা আদালতের পরোয়ানা দেখাল। এর আগে আর একটা এই ধরনের কাগজ পেয়েছিল এম্মা কিন্তু সেটা ভাল করে পড়ে দেখেনি।

আজকের পরোয়ানাতে লেখা আছে, মাদাম বোভারী, আপনাকে রাজা বাহাদুর, দেশের আইন এবং মহামান্য আদালত এই মর্মে আদেশ দান করছে যে আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সর্বসাকুল্যে আট হাজার ফ্রাঁ আদায় না দেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং

আপনার বাড়ির আসবাবপত্র ও যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

এম্মা ভেবে পেল না কি করবে সে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ আগামী কাল।

এম্মা একবার ভাবল লেহুড়ে হয়ত তাকে এই সব কিছুর মাধ্যমে ভয় দেখাচ্ছে। এসব হয়ত আসলে তারই হাতে গড়া ষড়যন্ত্র। এম্মার এই ধরনের চিন্তার কারণ হলো টাকার মোটা অঙ্কটা। এত টাকা সবসুদ্ধ হলো কি করে তা বুঝতে পারল না এম্মা।

কিন্তু আবার ভাবল এত টাকা হলেও হতে পারে। বেড়ে বেড়ে এই রকম দাঁড়িয়েছে। কারণ সে ত আর কখনো টাকা শোধ দেয়নি, শুধু একের পর এক ধার নিয়েছে আর ঋণপত্রে সই করে গেছে। তাই হয়ত লেহুড়ে তার উপর এই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চলেছে।

লেহুড়েকে ডেকে পাঠাল এম্মা। নিতান্ত উদাসীনভাবে বলল, কি ঘটতে চলেছে আপনি তা জানেন? আমার মনে হচ্ছে এসব আপনার উপহাস।

লেহুড়ে বলল, না।

এম্মা বলল, কি বলতে চাইছেন আপনি?

তার মাথাটা সরিয়ে হাত দুটো জড়ো করে লেহুড়ে বলল, আপনি কি ভেবেছেন ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাবশতঃ আমি চিরকাল ধরে আপনাকে টাকা যুগিয়ে যাব। এ পথ থেকে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। আমি খোলাখুলি একথা বলে দিচ্ছি।

এম্মা রেগে গেল। বলল, এত টাকা হলো কি করে বলুন।

লেহুড়ে বলল, আমি তার কি করব বলুন। আদালত রায় দিয়েছে। একথা মেনে নিয়েছে। আপনাকে তা জানানো হয়েছে। আমার কিছু করার নেই। এ হচ্ছে ভিনেপার্তের দোষ।

এম্মা তবু বলল, আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?

লেহুড়ে বলল, কিছুই না।

কিন্তু যা হোক কিছু একটা করতেই হবে আলোচনার দ্বারা।

এর পর আমতা আমতা করে এম্মা স্পষ্টভাবে বলল, কি করে এ ব্যাপারটা ঘটল সে কিছুই জানে না। সে আশ্চর্য হয়ে গেছে।

লেহুড়ে বলল, কিন্তু সেটা কার দোষ। আমি চিরদিন আপনার ক্রীতদাসের মত কাজ করে যাব আর আপনি আনন্দ উপভোগ করে যাবেন।

এম্মা বলল, উপদেশ দেবেন না।

এ উপদেশে কারো কোন ক্ষতি হয় না।

এম্মা তখন তার সাদা ধবধবে ছিপছিপে সুন্দর হাতদুটো লেহুড়ের হাঁটুতে দিয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

লেহুড়ে বলল, ছলনার দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করতে চাইছেন ?

এম্মা দাঁত খিঁচিয়ে রাগের সঙ্গে বলল, আপনি একটা ঘৃণ্য জীব।

লেহুড়ে হেসে বল, আশ্চর্য ! আপনার চালচলন দেখলে অবাক হতে হয়।

এম্মা বলল, আপনি কি ধরনের লোক আমার স্বামীকে তা বলে দেব।

লেহুড়ে বলল, তাই নাকি ? আর আমি আপনার স্বামীকে একটা আঠারোশো ফ্রাঁর ঋণপত্র দেখাব যা আপনি সই করেছেন। আপনি কি ভেবেছেন লোকটা নিরীহ হলেও তিনি আপনার কারচুপি বা প্রতারণার কিছুই ধরতে পারবেন না ?

লেহুড়ে বারবার কথাটা বলতে লাগল, আমি ওটা দেখাব, দেখাবই।

যাবার সময় লেহুড়ে এম্মার কাছে এসে নরম গলায় বলল, এটা সত্যিই ঠাট্টা নয়। এখনো জানে না। আপনি আমার সব পাওনা মিটিয়ে দিন।

এম্মা বলল, কিন্তু কোথায় পাব এত টাকা ?

লেহুড়ে বলল, আপনার মত সুন্দরী মেয়ের আবার টাকার অভাব ? আপনার কত বন্ধুবান্ধব রয়েছে।

এম্মার দেহটাকে তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এমনভাবে বিদ্ধ করল এম্মার অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

এম্মা বলল, আমি কথা দিচ্ছি আপনি যা কাগজ দেবেন তাতে আমি সই করে দেব।

লেহুড়ে বলল, আপনার অনেক সই করা কাগজ জমেছে আমার কাছে।

এম্মা বলল, আমি আরো কিছু বিক্রী করব।

লেহুড়ে বলল, আপনার আর কিছুই নেই।

এম্মা বলল, আচ্ছা এখন মোট কত টাকা হলে আপনি এই সব কোর্ট কাছারির ব্যাপারগুলো বন্ধ করতে পারেন ?

লেহুড়ে বলল, এখন দেরী হয়ে গেছে।

এম্মা বলল, আমি যদি এখন মোট টাকার একের চার বা একের তিন ভাগ আপনাকে এনে দিই ?

লেহুড়ে বলল, তার আর দরকার হবে না।

লেহুড়ের পিছু পিছু সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল এম্মা। লেহুড়ে তাকে ঠেলে দিল। এম্মা কাতর ভাবে বলল, আর দিনকতকের সময় চাইছি আমি। মঁসিয়ে লেহুড়ে, মাত্র দিনকতক।

এম্মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

লেহুড়ে বলল, চোখের জল ! বাঃ বেশ বেশ।

এম্মা বলল, আপনি কিন্তু কিছু অঘটন ঘটাতে বাধ্য করবেন।

লেহুড়ে বলল, তাতে আমার ভারী বয়ে যাবে।

এই বলে তার পিছনে দরজা বন্ধ করে চলে গেল লেহুড়ে।

৭

পরদিন দুজন সাক্ষীসহ কোর্টের একজন লোক এসে এম্মাদের বাড়ির আসবাব ও অস্থাবর জিনিসপত্র কি কি বিক্রি করা হবে টাকা আদায়ের জন্য তার একটা ব্যবস্থা করতে এল।

চার্লসএর রোগী দেখার ঘর থেকেই কাজ শুরু করল তারা। সেখানে একটা মড়ার মাথার খুলি ছিল। কিন্তু সেটা পেশাগত প্রয়োজনের বস্তু বলে তারা সেটাকে তাদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করল না। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকে তারা সব প্লেট, প্যান, চেয়ার গণনা করে তালিকাভুক্ত করল। তারপর শোবার ঘরের সব আসবাবপত্রও তারা তালিকায় লিখে নিল। অবশেষে পোষাকগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অত সব পোষাক আশাক ও পোষাকের কাপড় দেখে মাদাম বোভারীর দেহের মধ্যে কোন কিছু লুকোন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখল। তারা মাদামের গোপনাঙ্গ পর্যন্ত পরীক্ষা করল। সেই তিনজন লোকের দৃষ্টির সামনে মাদামের দেহের কোন অংশ অনাবৃত রইল না।

বোতাম আঁটা কালো লম্বা কোটপরা মাত্রে হারেঞ্জ নামে কোর্টের লোকটা সব জিনিসের নামগুলো লিখছিল। মাদাম বোভারীর দেহটা খুঁটিয়ে দেখে বলল, খুব সুন্দর। সত্যিই চমৎকার।

কথাটা বারবার আপন মনে বলতে লাগল লোকটা।

অন্য সব ঘর পরীক্ষা করার পর তারা ছাদের ঘরটা দেখতে গেল। সে ঘরে একটা বাক্সের মধ্যে এম্মা রুডলফের চিঠিগুলো লুকিয়ে রেখেছিল। বাক্সটা খুলতে হলো এম্মাকে। মাত্রে বলল, আমরা দেখতে চাই। বাক্সের মধ্যে কোন জিনিস আছে কি না। অবশ্য এতে ব্যক্তিগত কাগজপত্রই রয়েছে।

মাত্রে একটা খাম নিয়ে এমনভাবে দেখতে লাগল উল্টেপাল্টে যাতে মনে হবে খামের মধ্যে সে যেন সোনার টুকরোর সন্ধান পেয়েছে। তা দেখে এম্মার প্রচণ্ড রাগ হলো। নিষ্ঠুর লোকটার লাল হাতগুলো সেই চিঠির পাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল যা একদিন হৃদয়কে স্পন্দিত করে তোলে তার।

ওরা চলে গেলে ফেলিসিতে এম্মার কাছে এল। এম্মা তাকে চার্লস আসছে কি না লক্ষ্য করার জন্য বলল। চার্লস যেন এসব কিছু জানতে না পারে। ওরা ছাদের ঘরের সামনে একজন পাহারাদারকে মোতায়েন করে গেছে। যাতে তালিকাভুক্ত কোন জিনিস স্থানান্তরিত করতে না পারে।

সন্ধ্যের সময় এম্মার মনে হলো চার্লসকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। চার্লসএর মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ হয় এম্মার। তার মুখের রেখায় যেন অনেক অভিযোগ অনুযোগ এক নিরুচ্চার ভীরুতায় স্তব্ধ হয়ে আছে।

এরপর ঘরে আসবাবপত্রগুলোর উপর যখন চোখ পড়ল এম্মার যখন সে দেরাজ, পর্দা, কার্পেট, আর্মচেয়ার প্রভৃতি তার সখের জিনিসগুলো একের পর

এক করে দেখল তখন বেদনায় মনটা ভরে উঠল তার। তার মনে একবার দুঃখ ও অনুশোচনা জাগল ঠিক। কিন্তু তাতে মনটা কিছুমাত্র নরম হলো না তার বরং আগের থেকে রাগের আগুনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে।

চার্লস শান্তভাবে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাতে লাগল।

এক সময় চার্লস বল, কে যেন ছাদের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে হচ্ছে।

এম্মা বলল, ও কিছু না, বাতাসের শব্দ।

পরের দিন ছিল রবিবার। এম্মা সকাল হতেই রুয়েন শহরে চলে গেল। ঠিক করল শহরের প্রতিটি সুদবন্ধকের কারবারীর কাছে সে যাবে। শহরে গিয়ে এম্মা দেখল অনেক কারবারী নেই, বাইরে বেড়াতে গেছে। যেসব কারবারীর দেখা পেল তাদের প্রত্যেকের কাছে টাকা ধার চাইল এম্মা। প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজনের গুরুত্বের কথাটা বলে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু তাদের কেউ টাকা দিতে রাজী হলো না। প্রত্যেকেই তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ তার মুখের সামনে উপহাসের হাসি হাসল।

বেলা দুটোর সময় এম্মা লীয়ঁর বাড়ি গেল। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর লীয়ঁ নিজে এসে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলে এম্মাকে অসময়ে দেখেই চমকে উঠল, একি তুমি কি ব্যাপার?

এম্মা বলল, আমাকে দেখে বিব্রত হয়ে পড়ছ?

না···তবে···

লীয়ঁ স্বীকার করল তার বাড়িওয়ালা চায় না এ বাড়িতে তার কোন ভাড়াটে মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করুক।

এম্মা বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

লীয়ঁ দরজা খুলে এম্মাকে ঘরের ভিতর নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এম্মা বলল, না, আমার ওখানে চল।

ওরা দুজনে হোটেল দ্য বুলোনে এম্মার ঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে এম্মা বড় এক গ্লাস জল খেল। তার মুখখানাকে বড় ম্লান দেখাচ্ছিল, এম্মা বলল, লীয়ঁ, আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে।

এরপর সে লীয়ঁর হাতদুটো ধরে সেগুলো নাড়িয়ে বলল, আমার কথা শোন লীয়ঁ, আমার আট হাজার ফ্রাঁ এখনি চাই।

লীয়ঁ বলল, কিন্তু আমার মনে হয় তোমার মাথার ঠিক নেই।

এম্মা বলল, এখনো ঠিক আছে। কিন্তু আর থাকবে না।

কি ঘটছে বা ঘটতে চলেছে একে একে লীয়ঁকে সব বলল এম্মা। সে এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে টাকার জন্য। চার্লসকে এখনো এসব কিছুই জানানো হয়নি। তার শাশুড়ী তাকে ঘৃণার চোখে দেখে। তার বাবার কিছু করার নেই। তাকে এখনি বাইরে গিয়ে যেমন করে হোক টাকার যোগাড় করতে

হবে। টাকা তাকে পেতেই হবে।

লীয় বলল, কিন্তু তুমি কি করে আশা করতে পার এত টাকা আমি যোগাড় করব ?

এম্মা রেগে বলল, যাও যাও, মেরুদণ্ডহীন নির্বোধের মত ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না।

লীয় বলল, তুমি ব্যাপারটাকে আরো বেশী খারাপ করে তুলছ। তুমি তিন হাজার ফ্রাঁ দিয়ে লোকটাকে শান্ত করতে পারতে।

লীয় সত্যিই চেষ্টা করতে পারত। চেষ্টা করলে তিন হাজার ফ্রাঁ যোগাড় করতে পারত না এটা ভাবাই যায় না। তাছাড়া সে কোন ঋণপত্রে স্বাক্ষর করতে পারত।

এম্মা বলল, যাও যাও, চেষ্টা করো। আমাকে টাকাটা পেতেই হবে। যাও, চেষ্টা করো। তারপর দেখবে আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

লীয় বাইরে চলে গেল। এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে এল। হতাশ হয়ে গম্ভীরভাবে এম্মাকে বলল, আমি তিনজনের কাছে গিয়ে দেখলাম। কিন্তু কিছু হলো না। কিছু করা গেল না।

জ্বলন্ত আগুনের দুধারে ওরা মুখোমুখি দুজনে বসে রইল নীরবে। কারো মুখে কোন কথা নেই। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায় এম্মা বলল, আমি যদি তুমি হতাম তাহলে আমি যেমন করে হোক টাকার যোগাড় করতাম।

লীয় বলল, কিন্তু কোথায় ?

তোমার অফিসে।

এম্মা লীয়র মুখপানে তাকিয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টির মধ্যে এক দানবিক বেপরোয়া ভাব ছিল। লীয়কে উত্তেজিত করার জন্য তার চোখের দৃষ্টিটাকে সংকীর্ণ করে এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষে পরিণত করল।

লীয় ভয় পেয়ে গেল। এই ভয়ঙ্করী মহিলার নীরব কটাক্ষের নির্বাক প্ররোচনার যে অপরিসীম শক্তি ছিল তার কাছে মনে মনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো সে। এম্মার সম্ভাব্য ভর্ৎসনার ভয়ে সে কপালে করাঘাত করে বলল, হ্যাঁ মোরেল। সে বোধ হয় আজ রাত্রেই ফিরবে। সে নিশ্চয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

লীয় বলছিল মোরেল নামে তার এক বন্ধুর কথা। মোরেল এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে। তার কথা ভেবেই লীয় আবার বলল, আমি কাল তোমাকে টাকাটা এনে দেব।

কিন্তু লীয় যা ভেবেছিল তা হলো না। সে ভেবেছিল কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে এম্মা খুশি হয়ে তা লুফে নেবে। কিন্তু এম্মা তার দেওয়া এই আশাকে স্বাগত জানাতে পারল না। তবে কি তার মিথ্যাটাকে ধরে ফেলেছে এম্মা ? একথা ভেবে লজ্জা বোধ করল লীয়।

লীয়ঁ বলল, আমি যদি তিনটের মধ্যে না ফিরি তাহলে আমার জন্য আর অপেক্ষা করবে না। এখন আমাকে বাইরে যেতে হবে। কিছু মনে করো না। বিদায়।

এই বলে এম্মার একটা হাত ধরে কিছুটা চাপ দিল। কিন্তু সে হাতটা অসাড় নিষ্প্রাণ বলে মনে হলো লীয়ঁর।

চারটে বাজতেই উঠে পড়ল এম্মা। নিতান্ত অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই তৈরি হলো ইয়নভিল যাবার জন্য।

সেদিন আকাশে কোন মেঘ ছিল না। তখন মার্চ মাস। মেঘহীন আকাশে সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল। হঠাৎ হোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হোমা শহরে এসেছিল কি সব জিনিস কিনতে। তাকে বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। ছুটির দিন বলে রাস্তায় কত লোক সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে বেড়াচ্ছিল। নদীর স্রোতের মত মানুষের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল রাস্তায়। পথের ধারের গীর্জা হতে সান্ধ্য প্রার্থনার গান শোনা যাচ্ছিল।

এম্মা বিষণ্ণ মনে পথ হাঁটছিল। তার কেবলি মনে হচ্ছিল, আজকের এই দিন যখন শুরু হয় তখন কত আশা ছিল তার মনে। চোখে জল আসছিল এম্মার।

হঠাৎ একটা গাড়ির চালকের জোর সতর্কবাণী শুনে চমকে উঠল এম্মা। দেখল একটা সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ি জোরে চলে গেল তার পাশ দিয়ে। তার মনে হলো গাড়ির ভিতর ভিকোঁতে বসে আছে।

এম্মা একবার পিছন ফিরে তাকাল ভাল করে দেখার জন্য। কিন্তু গাড়িটা মুহূর্তমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। হয়ত তার দেখার ভুল হয়েছে। তবু ভিকোঁতের কথাটা একবার মনে পড়তেই মনটা নতুন করে গভীরতর বিষাদে ভরে উঠল।

এম্মার মনে হলো তার অন্তর, বার, অতীত, বর্তমান সব একাকার হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছিল সে যেন এক শূন্যবিশাল খাদের অন্ধকার গহ্বরে ক্রমশঃ নেমে যাচ্ছে। সে খাদের অপরিমেয় গভীরতায় তলিয়ে যাচ্ছে সে। সে ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে নিজেকে। সে কোথা থেকে আসছে কোথায় যাচ্ছে তার যেন কিছুই জানে না।

হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে কোনরকমে ক্রয় রুজ অঞ্চলে এসে পৌঁছল এম্মা। এখান থেকেই সে হিরণদেলে উঠবে। সেখান থেকে সে সোজা ইয়নভিল গাঁয়ে যাবে।

মঁসিয়ে হোমাও এই গাড়িতেই যাবে। হোমা ওষুধের প্যাকেট বোঝাই করছিল গাড়িতে। তার হাতে একটা উপহারের জিনিস ছিল। উপহারটা তার স্ত্রীর জন্য কেনা। হোমার হাতে ছিল বড় বড় টুকরোওয়ালা মাংসের রোল। মাদাম হোমার দাঁতের অবস্থা খারাপ হলেও এগুলো খেতে ভাল-

বাসে। তাই হোমা যখনি শহরে আসে এগুলো কিনে নিয়ে যায় স্ত্রীর জন্য।

এম্মাকে দেখে হোমা বলল, আপনাকে দেখে খুশি হলাম। তার একটা হাতে ধরে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল হোমা।

এম্মার ওঠার পর হোমা গাড়িতে উঠে মালপত্র গুছিয়ে রেখে হাতদুটো জড়ো করে বিষণ্ণভাবে নেপোলিয়নের কায়দায় বসল।

তারপর গাড়িটা যখন পাহাড়ে উঠছিল তখন অন্য দিনকার মত সেই অন্ধ ভিখারিটা গাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তাকে দেখেই ঘৃণা-মেশানো রাগে ফেটে পড়ল হোমা। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, আমি বুঝতে পারছি না, কেন সরকার এই অসাধু পেশাকে অবাধে চলতে দিচ্ছে। এই সব হতভাগ্যদের নিয়ে গিয়ে তাদের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত করা উচিত। তা না হলে দেশের কোন উন্নতি হবে না। আর আমরা এইভাবে বর্বরতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাব।

অন্ধ লোকটা নির্বিকারভাবে তার টুপীটা হাতে নিয়ে গাড়ির জানালার ধারে ইতঃস্তত নাড়তে লাগল।

তা দেখে হোমা মন্তব্য করল, এ একটা ভয়ঙ্কর রোগ।

হোমা এর আগেও ভিখারিটাকে এই গাড়িতে যাবার সময় দেখেছে। তবু সে এমন একটা ভাব দেখাল যাতে মনে হবে সে তাকে এই প্রথম দেখছে। সে প্রথমে 'কর্ণীয়া', 'ওপেক কর্ণীয়া', সেনেরটিক' প্রভৃতি শব্দগুলোর নাম করল। তারপর উপদেশের ভঙ্গিতে ভিখারিকে বলল, তোমার এই রোগটা কি দীর্ঘদিন হয়েছে? তোমাকে তাহলে হোটেলে মদ খেয়ে মাতাল না হয়ে নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করতে হবে।

তারপর হোমা তাকে উপদেশ দিল, তাকে মদ ও ভাল মাংস খেতে হবে। কিন্তু ভিখারিটা আপন মনে গান গেয়ে যেতে লাগল। তার হাবভাব চালচলন সব পাগলের মতই অসংলগ্ন ঠেকছিল। তবু হোমা তাকে স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে করছিল। অবশেষে হোমা তার টাকার থলি বার করে একটা সু দিয়ে বলল, তুমি এর অর্ধেক নাও আর বাকিটা আমাকে ফেরৎ দাও। তবে আমার কথাগুলো ভুলবে না কিন্তু। এতে তোমার ভাল হবে।

হিভার্ত হোমার উপদেশ সম্বন্ধে কি বলতে যাচ্ছিল সাহস করে। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে হোমা বলল, সে তার অন্ধত্ব তার নিজের উদ্‌ভাবিত ও তৈরি ওষুধে সারাতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠিকানাটা অন্ধকে দিয়ে বলল, মঁসিয়ে হোমা; বাজারের কাছে যাকে জিজ্ঞাসা করবে সে বলে দেবে।

হিভার্ত ভিখারিকে ডেকে বলল, এবার তোমার উপকারীর কাছে তোমার

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

লোকটা তখন তার অন্ধ চোখগুলো ঘুরিয়ে হাতদুটো পেটের উপর ঘষে ক্ষুধার্ত কুকুরের মত আর্তনাদ করে উঠল। এম্মা সে আর্তনাদে কেঁপে উঠে বিরক্ত হয়ে পাঁচ ফ্রাঁর একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিল তার দিকে। এই মুদ্রাটাই তার ছিল একমাত্র সম্বল। মুদ্রাকে ছুঁড়ে দেবার সময় অদ্ভুত এক তৃপ্তি অনুভব করল এম্মা।

গাড়িটা আবার এগিয়ে যেতে লাগল। হোমা গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি দেখতে লাগল। দেখে বলল, কোন চাষের কাজ নেই, কোন দুধের প্রকল্পের কাজ নেই।

চারদিকের পরিচিত দৃশ্যপট দেখতে দেখতে নিজের দুঃখের কথা অভাবের কথা অনেকখানি ভুলে গেল এম্মা। দেহে মনে এক অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে বিবশ অবস্থায় বাড়ি ফিরল সে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে।

গাড়ি থেকে নেমে আপন মনে মনে বলতে লাগল এম্মা, যা হবার হোক। আর পারি না।

তাছাড়া সে আরও ভাবল, কে জানে শেষ মুহূর্তে হয়ত অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। হয়ত লেহুড়ে মারা যেতে পারে।

পরদিন সকাল নটায় কিসের শব্দে জেগে উঠল এম্মা। সমবেত বহু মানুষের কলগুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। ঘুম থেকে উঠে সে ঘর থেকেই দেখল বাজারে বহু লোকের ভিড় জমেছে। বাজারের একটা স্তম্ভের উপর একটা বড় নোটিশ চিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইটা পড়ার জন্যই এত ভিড়। সেই নোটিশটা থামের উপর উঠে জাস্টিন ছিঁড়ে ফেলে, তার জন্য তাকে গাঁয়ের পুলিশ ধরে। গোলমাল শুনে মঁসিয়ে হোমা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া বাজারে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ব্যাপারটা কি তা জানতে চাইল।

ফেলিসিতে ছুটে এসে এম্মাকে বলল, মাদাম, মাদাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে। কথাটা বলেই একটা হলুদ কাগজ এম্মার হাতে দিল। এই কাগজ তাদের বাড়ির সদর দরজায় চিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই কাগজটা ছিঁড়ে এনেছে ফেলিসিতে।

এম্মা পড়ে দেখল কাগজটা। তাতে লেখা আছে, এই বাড়ির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ও জিনিসপত্র বিক্রি করা হবে।

দুজনে দুজনের মুখপানে তাকাল। প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে এখন যেন কোন গোপনতার ব্যবধান নেই। অবশেষে ফেলিসিতে বলল, আমি হলে মাদাম, একবার মান্রে গিলমিনের কাছে গিয়ে দেখতাম। ওরা কেমন লোক তা ওদের চাকরের কাছ থেকেই শুনেছি।

এম্মা বলল, হ্যাঁ।

ফেলিসিতে বলল, একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। যাও।

একটা কালো পোষাক পরে বাড়ির পিছনের দিকে নদীর ধারের পথ ধরে ছুটতে লাগল এম্মা। আকাশটাকে মেঘে মেঘে অন্ধকার দেখাচ্ছিল। কিছু কিছু বরফ পড়ছিল।

গিলমিনের বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল থিওডোর। তাকে আপন জনের মত বসতে বলল। খাবার ঘরের টেবিলে প্রাতরাশ সাজানো হচ্ছিল। চমৎকার খাবার ঘর দেখে এম্মা ভাবল, একদিন আমাদেরও এই রকম সাজানো খাবার ঘর ছিল।

গিলমিন এসে এম্মাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকেও প্রাতরাশ খাবার জন্য আহ্বান করল। তার ধৃষ্টতা মার্জনা করতে বলল।

এম্মা বলল, মঁসিয়ে, আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

এই বলে এম্মা তার দুরবস্থার কথা সব বলল একে একে। কথাটা কিন্তু নতুন নয় গিলমিনের কাছে। কারণ লেহুড়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকায় সে আগেই সব শুনেছে। সুতরাং সে এ ব্যাপারে এম্মার থেকে সব ভাল জানে।

এম্মা তার কাহিনী আদ্যোপান্ত বলতে গিয়ে মাঝে মাঝে লেহুড়ের উপর দোষ দিচ্ছিল এবং খেতে খেতে গিলমিন এক একটা কথা বলে তার উত্তর দিচ্ছিল। সে কথার অর্থ সব বোঝা যাচ্ছিল না।

গিলমিন তার চপটা খেয়ে চা খেতে লাগল। তার মুখের উপর ফুটে উঠেছিল এক দ্ব্যর্থবোধক হাসি। সে হাসির অর্থ বুঝতে পারল না এম্মা। গিলমিন এক সময় লক্ষ্য করল এম্মার পাটা বরফে ভিজে গেছে। সে বলল, যান, স্টোভের কাছে গিয়ে পাটা সেকে নিন।

তার পায়ে পায়ে ঘরটা নোংরা হয়ে যাবে বলে ইতস্ততঃ করছিল এম্মা।

গিলমিন বলল, সুন্দর বস্তু কখনো কোন ক্ষতি করে না।

আগুনে পা সেকতে সেকতে এম্মা আবেগের সঙ্গে তার কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে করতে গিলমিনের মধ্যে সহানুভূতি জাগাতে চাইল। সে বলল, কিভাবে কত কম খরচের মধ্যে সংসার চালিয়েছে, কিভাবে একে একে দেনায় পড়ে গেছে।

গিলমিনের হাঁটুটা মাঝে মাঝে এম্মার পায়ে ঠেকছিল। অবশেষে এম্মা যখন আট হাজার ফ্রাঁ গিলমিনের কাছে চেয়ে বসল তখন ঠোঁট দুটো শক্ত করে গিলমিন বলল, সে খুব দুঃখিত। এ টাকা সে দিতে পারবে না। তারপর উপদেশের ভঙ্গিতে তাকে বলল, তার মত মেয়ে নানা উপায়ে কিছু টাকা লগ্নী করে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারত।

মনে মনে এসব কথা উড়িয়ে দিল এম্মা। এ উপদেশের কোন অর্থ হয় না।

গিলমিন বলল, কিন্তু আপনি এর আগে আমার বাড়িতে একদিনও আসেন নি কেন?

এম্মা বলল, আমি ঠিক জানি না—

গিলমিন বলল, কেন আসেননি? আমি কি ভয়াবহ আপনার কাছে? আমার কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। এখনো আমাদের পরস্পরের পরিচয়ই হয়নি। আপনি হয়ত এখন বুঝতে পারছেন। আপনার প্রতি আমার আন্তরিকতা কত গভীর।

গিলমিন হাত বার করে এম্মার হাতটা ধরে নিজের ঠোঁটের উপর চেপে পাগলের মত চুম্বন করতে লাগল। এম্মার দস্তানার ভিতর দিয়ে নিজের হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে তার আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল।

গিলমিনের একটানা কথাগুলো প্রবহমানা নদীর একটানা কলতানের মত শোনাচ্ছিল। তার চশমার কাচের ভিতর তার লোভাতুর দু চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিকভাবে জলজল করছিল। লোকটা সত্যিই অসহ্য এম্মার কাছে।

এম্মা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মঁসিয়ে, আমি আপনার অপেক্ষায় আছি।

হঠাৎ মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল গিলমিনের। সে বলল, কি জন্য?

এম্মা বলল, টাকা।

কিন্তু·········

তারপর নিজের দুর্বার কামনার ঢেউএর আঘাতে নত হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

এম্মার কাছে এগিয়ে গেল গিলমিন। তার কোমরে হাত দিয়ে বলল, আপনি যাবেন না। আমি আপনাকে ভালবাসি।

এম্মার সমস্ত মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে বলল, আমার এই দুরবস্থার সুযোগ নেওয়াটা আপনার পক্ষে লজ্জার বিষয়। আমি আপনার কাছে দয়াভিক্ষা করতে এসেছি ঠিক, কিন্তু নিজেকে বিক্রি করতে আসিনি।

এই বলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল এম্মা।

গিলমিন হতবুদ্ধি ও অবাক হয়ে বসে রইল। অবশেষে সে তার পায়ের চটি জোড়াটার পানে তাকিয়ে রইল। এটা তার কোন এক প্রেমিকা দিয়েছে। দেখতে দেখতে মনে কিছুটা সান্ত্বনা পেল সে। তাছাড়া সে নিজেকে বোঝাল এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে অনেক দায়দায়িত্ব ভোগ করতে হত তাকে।

এদিকে এম্মা যখন এ্যাসপেন গাছে ঘেরা পথ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল কাঁপতে কাঁপতে তখন ভাবল, লোকটা সত্যিই কত ঘৃণ্য। গিলমিন তার শালীনতা নষ্ট করতে যাওয়ায় যে রাগ তার হচ্ছিল ব্যর্থতাজনিত হতাশা সে রাগকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তার। তার মনে হলো শিকারী কুকুরের মত নিয়তির বিধান তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে নির্মমভাবে। সে যা করেছে তাতে সে

গর্ববোধ করতে লাগল। এতখানি আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় সে কখনো দেয়নি এর আগে। সমস্ত মানুষের প্রতি এতখানি ঘৃণা অনুভব করেনি কখনো সে। আজ সে সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল যেন। আর তার এই অনমনীয় মনোভাবটার কথা ভাবতে গিয়ে আনন্দ পেল সে। তার ইচ্ছা হলো সে যেন সব মানুষকে বেত মারে, সকলের মুখের উপর থুথু ফেলে, তাদের আঘাতে আঘাতে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। যাই হোক এইভাবে ম্লান মুখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল এম্মা। জলভরা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি মেলে শূন্য দিগন্তটাকে দেখতে দেখতে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল সে। ঘৃণার চাপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল তার।

দূর থেকে বাড়িটা চোখে পরতেই তার দেহটা যেন অসাড় হয়ে পড়ল সহসা। সে আর চলতে পারছে না। অথচ তাকে যেতেই হবে। কোন উপায় নেই।

ফেলিসিতে তার জন্য অপেক্ষা করছিল দরজার কাছে। এম্মা কাছে যেতেই বলল, সব ঠিক আছে?

এম্মা বলল, না।

এর পর প্রায় পনের মিনিট ধরে ওরা আলোচনা করতে লাগল ইয়নভিলে কার কার কাছে টাকার জন্য যাওয়া চলতে পারে। কিন্তু ফেলিসিতে যারই নাম করে এম্মা বলে, ও দেবে না। ওখানে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

ফেলিসিতে বলল, মঁসিয়ে এখনি এসে পড়বেন।

এম্মা বলল, আমি তা জানি। তুমি চলে যাও। আমাকে একা থাকতে দাও।

সে অনেক চেষ্টা করেছে। আর তার করার কিছুই নেই। সুতরাং চার্লস যখন বাড়িতে আসবে তখন একথা বলা ছাড়া কোন উপায় নেই যে এখানে থেকো না। এই বাড়ির একটা আসবাব বা একটা জিনিসও আর আমাদের নেই। একটুকরো বিচালিও তুমি আমার বলতে পারবে না।

একথা শুনে চার্লস হয়ত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে। তার দু চোখে হয়ত অশ্রুর বন্যা বয়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে আঘাতটা সয়ে গেলে সে তাকে ক্ষমা করবে।

দাঁতগুলো কড়মড় করে আপন মনে বলে উঠল এম্মা, হ্যাঁ, সে আমায় ক্ষমা করবে। কিন্তু ঐ লোকটাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। কারণ সে আমার উপর কড়া নজর রেখেছিল কারণ সে আমায় কখনো আমার দরকার মত টাকা পয়সা দিতে পারেনি।

বোভারী তাকে ক্ষমা করবে এই চিন্তাটা তাকে আরো অসহিষ্ণু ও অশান্ত করে তুলল। সে আরো ভাবল সে স্বীকার করুক বা নাই করুক, পরে একে

একে বোভারী সব জানতে পারবে এবং তখন তার ক্ষমার অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে।

এম্মা একবার ভাবল লেহুড়ের কাছে সে আর একবার চেষ্টা করে দেখুক। আবার ভাবল কি হবে তাতে?

তার বাবার কাছে চিঠি লিখবে? কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে।

এমন সময় বাড়ির পাশে গলিপথে গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেল। চার্লস এসে গেছে। এম্মা তখন দ্রুত পায়ে নিচের তলায় গিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বাজারের দিকে এগিয়ে গেল এম্মা। সেখানে মেয়রপত্নী মাদাম তুভাশে চার্চের কাছে লেস্তিবুদয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। তারা মাদাম বোভারীকে কর আদায়কারী বিনেটের ঘরে ঢুকতে দেখল।

এ কথাটা মাদাম তুভাশে মাদাম ক্যারঁকে জানাতে গেল। তারা মাদাম ক্যারঁদের বাড়ির ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে বিনেটের ঘরের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

বিনেট তার লেদ মেসিনের কারখানাটায় দাঁড়িয়ে কাজ দেখছিল। মেসিনের আওয়াজে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মাদাম তুভাশে বলল, ঐ দেখ, ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও।

মেসিনের ঘর্ঘর আওয়াজে কোন কথা শোনা না গেলেও মাদাম বোভারীর মুখ থেকে বেরোন 'ফ্রাঁ' কথাটা যেন স্পষ্ট শুনতে পেল মাদাম তুভাশে ও মাদাম ক্যারঁ।

মাদাম তুভাশে বলল, ও হয়ত বিনেটের কাছে কর আদায় স্থগিতের প্রার্থনা জানাচ্ছে।

মাদাম ক্যারঁ বলল, তাই মনে হচ্ছে।

ওরা আরো দেখল মাদাম বোভারী বিনেটের ঘরের বিভিন্ন জিনিসের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আর বিনেট তার দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে হাসিমুখে।

মাদাম তুভাশে চুপি চুপি বলল, ও কি কোন জিনিস কেনার জন্য অর্ডার দিচ্ছে?

মাদাম ক্যারঁ বলল, বিনেট ত কোন জিনিস বিক্রি করে না।

মাদাম বোভারী কি যেন বলছিল বিনেটকে। বিনেট তা দাঁড়িয়ে শুনছিল মন দিয়ে। কিন্তু তার ভাব দেখে বোঝা গেল সে যেন সে কথা বুঝতে পারছে না। তবু মাদাম বোভারী শান্তভাবে অনুনয় বিনয়ের ভঙ্গিতে কি বলে যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে সে বিনেটের আরো কাছে এগিয়ে গেল। তার বুকটা উত্তেজনায় দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছিল। তারপর মনে হলো ওরা কেউ কথা বলছে না।

মাদাম তুভাশে বলল, ও কি তবে কোন অগ্রিম টাকা দিচ্ছে কোন

কিছুর জন্য ?

কিন্তু দেখা গেল বিনেটের আপাদমস্তক যেন লাল হয়ে উঠল। আর মাদাম বোভারী তার একটা হাত ধরল।

তবে কি মাদাম বোভারী অপমানজনক কোন প্রস্তাব করল বিনেটের কাছে ? কিন্তু বিনেট সে রকম ধরনের লোক না। সে সাহসী। সে আগে দুবার যুদ্ধ করেছে। ফরাসী অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। তাকে 'লিজিয়ন অফ অনার' উপাধিতে ভূষিত করার কথা হয়। সেই বিনেট যেন হঠাৎ সাপ দেখে চমকে ওঠার মত একটা ভাব করল।

বিনেট মাদাম বোভারীকে এক সময় বলল, মাদাম, আপনি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছেন।

মাদাম তুভাশে মন্তব্য করল, এই ধরনের মেয়েকে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে মারতে হয়।

মাদাম ক্যারঁ হঠাৎ বলল, ও কোথায় চলে গেল ?

কথাটা ঠিক। বিনেটের কথা তখনো শেষ না হলেও মাদাম বোভারী হঠাৎ বেরিয়ে গেল তার ঘর থেকে। তারা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখল বিনেটের ঘর থেকে বেরিয়ে মাদাম বোভারী গ্রাঁদ র‍্যু হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনেটের ঘর থেকে বেরিয়ে এম্মা চলে গেল ধাত্রী মাদাম রোলেতের বাড়ি। সেখানে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মাদাম রোলেত, আমি কথা বলতে পারছি না, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমার জামার ফিতেগুলো খুলে দাও।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাদাম রোলেতের বিছানায় শুয়ে পড়ল এম্মা। মাদাম রোলেত এম্মার উপর একটা পেটিকোট চাপা দিয়ে তার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এম্মা কোন কথা বলছে না দেখে তার কাজে চলে গেল। চরকায় সুতো কাটতে লাগল।

এম্মা আপন মনে বলে উঠল, বিনেটের লেদ মেসিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মাদাম রোলেত কোন কিছু বুঝতে না পেরে নিজের মনে বলল, কি হয়েছে ওর ? আমার বাড়িতে কেন এল ?

এম্মা এসেছে ভয়ে। একটা প্রবল ভয় বাড়ি থেকে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে শুয়ে শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল এম্মা। কিন্তু শত মনোযোগ দিয়েও সব কিছুই অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখতে লাগল। ঘরের দেওয়ালের চুণকাম, জ্বলন্ত আগুনের ধূমায়িত কাঠ, দেওয়ালের উপর একটা মাকড়শা—এসব দেখেও দেখছিল না এম্মা। তারপর সে ভাবল একদিন সে ছিল লীয়ঁর কাছে কত সুখে...হায়, আজ সে কত দূরে··· ঝলকে ঝলকে সূর্যের আলো ঝরে পড়ছিল নদীর বুকের উপর...মন্থর বাতাসে

ছিল ফুলের গন্ধ। তারপর সে গত কালকার কথাটাও স্মরণ করল অথবা স্মৃতির একটা দুর্বার অপ্রতিরোধ্য ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাকে।

এম্মা জিজ্ঞাসা করল, এখন সময় কত ?

মাদাম রোলেত ঘরের বাইরে গিয়ে আকাশের যে দিকে সূর্য ছিল সেদিকে তাকিয়ে কি দেখে এসে বলল, এখন বেলা প্রায় তিনটে।

এম্মা বলল, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

সময় জানতে চাইল এম্মা কারণ এই সময় সে আসবে। গতকাল বলেছিল আজ এই সময় টাকার যোগাড় হয়ে যাবে। হয়ত এখন সে টাকার যোগাড় করে ফেলেছে। কিন্তু সে হয়ত তার বাড়িতে যাবে সোজা, কারণ সে ত আর জানে না ও এইখানে এসে বসে আছে।

এম্মা ধাত্রীকে বলল, তাড়াতাড়ি যাও। তাকে নিয়ে এস এখানে।

মাদাম রোলেত সঙ্গে সঙ্গে বলল, যাচ্ছি মাদাম। আমি এখনি যাচ্ছি।

এম্মা আশ্চর্য হয়ে গেল তার বিস্মরণের কথা ভেবে। গতকাল লীয়ঁ তাকে কথা দিয়েছিল। সে নিশ্চয় তাকে নিরাশ করবে না। সে হয়ত কিছু টাকার যোগাড় করবে আর বাকি টাকা লেহুড়ের কাছ থেকে সুদে ধার নেবে। এতক্ষণ হয়ত লেহুড়ের কাছে এসে ঋণপত্রে সই করছে। এইভাবে সব সমস্যা মিটে যাবে। শুধু বোভারীকে বোঝাবার জন্য কিছু একটা মিথ্যা কাহিনী খাড়া করতে হবে।

কিন্তু ধাত্রীর ফিরতে প্রচুর দেরী হচ্ছিল। মাদাম রোলেতের ঘরে ঘড়ি না থাকায় যত দেরী না হচ্ছিল তার থেকে বেশী দেরী মনে হচ্ছিল। সময় কাটাবার জন্য এম্মা বাড়ির ছোট্ট বাগানটায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। আর মাঝে মাঝে এক একবার বাড়িতে এসে দেখছিল সে ফিরেছে কি না।

অবশেষে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে এককোণে বসে পড়ল। তার অন্তর না চাইলেও সন্দেহ জাগছিল মনে, হয়ত ও তাকে দেখতে পায়নি। মনে হলো মাদাম রোলেত কয়েক মুহূর্ত আগে যায়নি, গিয়েছে এক যুগ আগে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ হলো। এম্মা কিছু বলার আগেই মাদাম রোলেত বলল, তিনি সেখানে নেই মাদাম।

কি ?

মাদাম রোলেত বলল, তিনি আসেন নি। মঁসিয়ে আপনার নাম ধরে কাঁদছেন। সকলেই আপনার খোঁজ করছে।

এম্মা কোন উত্তর দিল না। সে নীরবে তার চারপাশে এমনভাবে তাকাতে লাগল যার জন্য মাদাম রোলেত ভয় পেয়ে গেল। ভাবল তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হঠাৎ কপালে হাতটা চাপড়ে দিল এম্মা। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে একটা উপায়ের কথা। অন্ধকার রাত্রিতে চকিত বিদ্যুদ্দামস্ফুরণের মত রুডলফের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। রুডলফ উদার সংবেদনশীল। সে

নিশ্চয় তাকে সাহায্য করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করবে না। আর রুডলফকে কিভাবে বশ করতে হয় সে তা জানে। সামান্য এক কটাক্ষপাতের মাধ্যমে সে তাদের অমর প্রেমের অতলান্তিক গভীরতার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবে তাকে।

কিন্তু এম্মা বুঝতে পারল না, যে একদিন তাকে প্রতারিত করেছিল, যে তার মধ্যে কত ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার করেছিল আজ সে তারই কাছে আত্ম-বিক্রী করতে যাচ্ছে। বুঝতে পারল না তার এ আচরণ গণিকাবৃত্তিসুলভ। যাই হোক, লা হুশেত্তের পথে রওনা হয়ে পড়ল সে।

৮

পথে যেতে যেতে এম্মা বারবার ভাবতে লাগল সে গিয়ে কি বলবে? প্রথমে কথা কিভাবে তুলবে? যতই এগিয়ে যেতে লাগল সে ততই খামারের আশপাশের গাছপালা, দূরের পাহাড় স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে। এরপর খামারের মধ্যবর্তী সেই বড় বাড়িটা চোখে পড়ায় তার প্রথম প্রেমের সুখানুভূতিগুলো একে একে সব অনুভব করতে লাগল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানিত পুলকে ফুলে উঠতে লাগল তার বেদনার চিত্তটা। ঈষদুষ্ণ বাতাস বয়ে যাচ্ছিল তার মুখের উপর দিয়ে। গাছের কচি কচি পাতা হতে গলা বরফগুলো টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল ঘাসের উপর।

আগের মত ছোট পার্কের দিকের গেটটা দিয়ে বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল সে। বাতাসে দুলতে থাকা লিণ্ডেন গাছের কম্পিত ছায়াঘেরা সে প্রাঙ্গণের মাঝখানে এসে পড়ল। তাকে দেখে কুকুরগুলো একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে উঠল। তবু কোন লোক বেরিয়ে এল না।

সিঁড়ি বেয়ে হলঘরের বারান্দায় উঠে গেল এম্মা, কিছু কিছু ধুলো জমে আছে কাঠের রেলিং দেওয়া পাথরের সিঁড়িগুলোতে। বারান্দার এক ধারে পর পর অনেকগুলো ঘরের দরজা। বারান্দার বাঁ দিকের এক প্রান্তে শেষ ঘরখানায় রুডলফ্ থাকে। এম্মা ভাবছিল, রুডলফ্‌কে দেখতে পাবে না। সে হয়ত নেই। একবার তার মনে হলো রুডলফ্ না থাকলেই ভাল হয়। কিন্তু আবার ভাবল, একমাত্র রুডলফ্‌ই তার শেষ আশা, তার মুক্তির একমাত্র মূর্ত সম্ভাবনা। অবশেষে এলোমেলো চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে তার প্রয়োজনের কথা ভেবে সাহসে ভর করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এম্মা।

ঘরের মধ্যে আগুনের পাশে বসে পাইপ খাচ্ছিল রুডলফ্।

এম্মাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে রুডলফ্ বলল, একি, তুমি?

এম্মা বলল, হ্যাঁ আমি রুডলফ্...আমি চাই...আমি তোমার কাছ থেকে কিছু পরামর্শ চাই।

ইচ্ছা থাকলেও আর কিছু বলতে পারল না এম্মা।

রুডলফ্ বলল, তুমি কিন্তু তেমনিই সুন্দর আছে। আগের মতই সুন্দর।

এম্মা বিরক্তির সঙ্গে বলল, আবার রূপ! এ রূপের কোন দামই নেই, কারণ এ রূপ তুমি একদিন তুচ্ছ জ্ঞান করে চলে যাও।

রুডলফ্ ক্ষমা চাইল। তার সেদিনকার আচরণের জন্য যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে যুক্তি খাড়া করল। কিন্তু সে যুক্তি অস্পষ্ট ঠেকল এম্মার কাছে।

রুডলফের চেহারা ও কণ্ঠস্বরের মধ্যে আজও কেমন যেন একটা মোহ ছড়িয়ে আছে। সেই মোহের বশেই তাঁর কথা বিশ্বাস করল এম্মা। কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য না হলেও বিশ্বাস করার ভাণ করল এম্মা। তাদের বিচ্ছেদের কারণগুলো রুডলফ এমনভাবে বিশ্লেষণ করল যা এম্মা বিশ্বাস না করে পারছিল না। সবশেষে সে বলল, তাদের সেই পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটার সঙ্গে অন্য এক তৃতীয় ব্যক্তির সম্মান ও জীবন জড়িয়েছিল।

রুডলফের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এম্মা বলল, কারণ যাই হোক, এ বিচ্ছেদ আমার অন্তরটাকে ভেঙ্গে দেয়।

রুডলফ্ দার্শনিকের মত উদাসীনভাবে বলল, মানুষের জীবনটাই হলো এই।

এম্মা বলল, আমাদের ছাড়াছাড়ির পর থেকে তুমি কি ভালো আছ?

রুডলফ্ বলল, ভালো মন্দ কোনটাই ঠিক বলা যায় না।

এম্মা বলল, তবে আমরা একসঙ্গে থাকলেই ভাল হত।

হয়ত তাই।

এম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো? ও রুডলফ্, তুমি যদি জানতে আমি তোমাকে কত ভালবাসতাম।

এই বলে রুডলফের একটা হাত টেনে নিল এম্মা। কয়েক মুহূর্ত ধরে ওদের দুজনের হাতের আঙুলগুলো জড়াজড়ি হয়ে গেল, ঠিক যেমন ইয়নভিল গাঁয়ে কৃষি প্রদর্শনীর দিন হয়েছিল। আবেগের বশবর্তী হতে রুডলফের অহঙ্কারে কিন্তু বাধছিল। কিন্তু এম্মা রুডলফের কাছে সরে এসে তার উপর ঢলে পড়ছিল। সে বলল, তুমি এটা কি করে ভাবতে পারলে যে আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব? কোন মানুষই কখনো অভ্যস্ত সুখ শান্তি ছাড়তে চায় না। আমি মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম এ জীবন আমি আর রাখব না। অথচ তুমি আমার জীবন থেকে দূরে সরে গেলে।

এ কথা সত্য। আজ তিন বছর ধরে তার স্বভাবগত কাপুরুষতার বশবর্তী হয়ে এম্মাকে এড়িয়ে চলেছে রুডলফ্। অথচ এম্মা এখন নানাভাবে সেই রুডলফ্‌কেই ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগল।

এম্মা বলল, তুমি স্বীকার কর রুডলফ্, তোমার আরো অনেক প্রেমিকা আছে। আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না। তাদের উপর আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। ভালবাসা পাবার জন্য যা যা দরকার তা সব আছে তোমার। সে যাই হোক, আমরা আবার শুরু করব আমাদের ভালবাসাবাসি।

আমরা পরস্পরকে আবার পাব। আমি তোমাকে চাই, তোমাকে পেয়ে আমি সুখী। কথা বল।

সত্যিই এম্মার চোখে যখন জল আসে তখন তার দেহসৌন্দর্য বিস্তার করে এক অপ্রতিরোধ্য মোহজাল। ঝড়ের পর কোন নীল ফুলের পাপড়ির উপর ঝরে পড়া এক বিন্দু বৃষ্টিজলের মত এক অপূর্ব মাধুর্যে চকচক করতে থাকে এম্মার চোখের সে জল।

এম্মাকে কোলে বসিয়ে আদর করতে লাগল রুডলফ্। তার নরম সুন্দর চুলে হাত বোলাতে লাগল। শেষ অপরাহ্নের সূর্যরশ্মির একটা সোনালি তীর জানালা দিয়ে তাদের গায়ে এসে লাগছিল। এম্মা তার মুখ নামিয়ে আনতেই রুডলফ্ তার চোখের উপর চুম্বন করল। তার চোখের পাতার উপর তার ঠোঁট দুটো বুলিয়ে দিল।

রুডলফ্ বলল, কিন্তু তুমি কাঁদছ।

এম্মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রুডলফ্ ভাবল এম্মা তার অবরুদ্ধ প্রেমাবেগের আতিশয্য বশতঃই কাঁদছে। কিন্তু সে যখন কোন কথা বলল না তখন রুডলফ্ ভাবল, পরাজয়ের এক গ্লানির নিবিড়তার জন্যই কোন কথা বলতে পারছে না এম্মা।

রুডলফ্ বলল, আমাকে ক্ষমা করো তুমি। একমাত্র তোমাকেই ভালবাসি। আমি তোমার উপর হৃদয়হীন আচরণ করেছি। আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি। তোমাকে আমি চিরদিন ভালবেসে যাব। বল কি বলবে।

এম্মার সামনে নতজানু হয়ে বসেছিল রুডলফ্।

এম্মা সাহস পেয়ে বলল, ঠিক আছে। আমার সর্বনাশ হয়েছে রুডলফ্। তোমাকে আমার তিন হাজার ফ্রাঁ ধার দিতে হবে।

রুডলফ্ আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু ···। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রুডলফ্। তার মুখের উপর এক তীব্র অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল।

এম্মা বলল, আমার স্বামী এক সুদবন্ধকীর কারবারীর কাছে টাকা রেখেছিলেন। সে লোকটা পালিয়ে গেছে। তারপর আমরা ঋণ করতে বাধ্য হই। এখন তারা ঋণের দায়ে আমাদের অস্থাবর সম্পত্তি সব নিয়ে যাচ্ছে আদালতের সাহায্যে। তারা সব জিনিস বিক্রি করে দেবে এই মুহূর্তে। তাই তোমার বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করে আমি এখানে এসেছি।

রুডলফ্ মনে মনে বলল, এবার বুঝেছি ও কেন এসেছে।

কিছুক্ষণ পর রুডলফ্ বলল, আমার ত টাকা নেই প্রিয়তমা।

একথা মিথ্যা বলেনি রুডলফ্। সত্যিই তার টাকা ছিল না। টাকা থাকলে সে ঠিক দিত এম্মাকে সে বুঝল ভালবাসার ক্ষেত্রে টাকা চাওয়াটা সত্যিই বড় অস্বস্তিকর ব্যাপার।

এম্মা রুডলফের মুখপানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল,

টাকা নেই ?

কথাটা একবার নয়, বারবার বলতে লাগল এম্মা। বলল, টাকাটা পেলে চরম অপমান হতে নিষ্কৃতি পেতাম আমি। তুমি আমাকে কখনো ভালবাসনি।

যাবার জন্য তৈরি হলো এম্মা। সে কি বলছিল তা সে নিজেই জানে না।

রুডলফ্ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল, তার সময়টা সত্যিই খারাপ যাচ্ছে।

এম্মা বলল, আমার অনুরোধ আর বলতে হবে না। তোমার জন্য আমার সত্যিই দুঃখ হয়।

ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো রূপোর কাজ করা চকচক করতে থাকা রাইফেলটার উপর চোখ পড়তে এম্মা বলল, তুমি যদি গরীব হতে তাহলে তোমার বন্দুকের উপর রূপো লাগাতে না। তাহলে ঘড়িতে কাছিমের খোলা লাগাতে না। অথবা বাঁশিতে রূপোর হাতল লাগাতে না। তুমি স্বচ্ছলভাবে থাক, তোমার খামার আছে। বড় বাড়ি, তুমি মাঝে মাঝে শিকারে যাও। প্যারিসে বেড়াতে যাও।

হঠাৎ রুডলফের জামার হাতের দুটো সোনার বোতাম নিয়ে বলল, এমন কি এই সামান্য ব্যাপারেও তুমি কত টাকা খরচ করো। এই নাও।

এই বলে বোতাম দুটো দেওয়ালে এমন করে সজোরে ছুঁড়ে দিল যে বোতামগুলোর সংলগ্ন সোনার চেনটা ছিঁড়ে গেল।

এম্মা আরও বলতে লাগল, অথচ আমি তোমার মুখের সামান্য একটু হাসি, তোমার চোখের একটু সদয় দৃষ্টি বা ধন্যবাদের একটা কথা শোনার জন্য আমি আমার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে পারতাম। আমি আমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে পারতাম, অথচ আমাকে এত কষ্ট দিয়েও তুমি তোমার চেয়ারে শান্তভাবে আরামে বসে রয়েছ। যেন কিছুই হয়নি। তুমি আমার জীবনে না এলে আমি বেশ সুখে থাকতাম। তোমার জন্যই আজ আমার এই কষ্ট। কেন তুমি এমন করলে ? কারো সঙ্গে বাজী লড়তে গিয়ে ? অথচ একদিন তুমি আমায় ভালবাসতে একথা তুমি প্রায়ই বলতে। আজও একটু আগে তুমি বললে আমায় এখনো ভালবাস। আমার হাত এখনো তপ্ত হয়ে আছে তোমার চুম্বনে। তুমি নতজানু হয়ে একটু আগে শপথ করেছিলে তুমি চিরকাল আমায় ভালবেসে যাবে। আমাকে ত্যাগ করে ভালই করলে। দুটি বছর তুমি আমায় এক আশ্চর্য স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে মগ্ন করে রেখেছিলে। আমাদের পালিয়ে যাবার কথা মনে আছে তোমার ? যে চিঠি তুমি আমায় লিখেছিলে তাতে আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যায়, আজ আমি যখন ফিরে এসে তোমায় সুখে সমৃদ্ধিতে বাস করতে দেখলাম, এসে সাহায্য চাইলাম যে সাহায্য

যে কেউ যে কোন লোকের দুরবস্থায় দান করবে, যখন আমি আমার পুঞ্জীভূত সব ভালবাসা এনে তোমাকে উজাড় করে দিলাম তখন সামান্য তিন হাজার ফ্রাঁর ভয়ে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে আমার সকাতর অনুরোধ।

শান্তভাবে এবং এক চাপা রাগের সঙ্গে রুডলফ্ বলল, আমার কাছে টাকা নেই এখন।

ঘর হতে বেরিয়ে এল এম্মা। তার মনে হচ্ছিল তার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে, কড়িবরগাগুলো ভেঙ্গে পড়ছে। কোন রকমে নিচের তলায় নেমে এল সে। গেটের কাছে খালটার ধারে একবার থামল সে। এই সময় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তার পায়ের একটা আঙ্গুলের নখে আঘাত লাগল। যাবার আগে একবার পিছন ফিরে তাকাল এম্মা। দেখল পার্ক, বাগান, প্রাঙ্গণ পরিবৃত অসংখ্য জানালাওয়ালা বিরাট বাড়িটা যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত একবার সেখানে দাঁড়াল এম্মা। একমাত্র হৃৎস্পন্দন আর শিরার রক্ত চলাচল ছাড়া আর কিছুতে বোঝার উপায় নেই যে সে বেঁচে আছে। সহসা তার মনে হলো কোথায় দূর গ্রামাঞ্চলে কিসের কর্ণবিদারক এক জোর শব্দ হলো।

মাঠের উপর দিয়ে এম্মা যখন যাচ্ছিল তখন তার মনে হচ্ছিল তার পায়ের তলার মাটি ক্রমশই সরে সরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল চষা জমিগুলো উত্তাল ঢেউয়েভরা এক বিশাল সমুদ্র। অজস্র জ্বলন্ত রংমশালের মত তার স্মৃতিগুলো একসঙ্গে লনের উপর ঝরে পড়ল। সে যেন একসঙ্গে তার চোখের সামনে তার বাবা, লেহুড়ের দোকানঘর, রুয়েনের হোটেলে তার ভাড়াকরা ঘর, কত প্রাকৃতিক দৃশ্য একে একে সব মনে পড়ল তার। নিজের মানসিক অবস্থাতে নিজেই যেন ভয় পেয়ে গেল এম্মা, যেন সে পাগল হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অবশ্য কোন রকমে নিজেকে সামলে নিল সে। কিন্তু মূল বিপদ তার রয়েই গেল, কারণ টাকার যোগাড় তার হলো না। কিন্তু টাকার চিন্তাটা তার যেন উবে গেল হঠাৎ মন থেকে। টাকার পরিবর্তে এল ভালবাসার চিন্তা। রুডলফের কাছে টাকা চেয়ে সে পেল না এটা যেন বড় কথা নয়, কথা হলো এই যে তার কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসাও পেল না। আজ সে নিঃসংশয়িতরূপে একথা জানতে পারল যে রুডলফ্ তাকে আজ ভালবাসে না, শুধু আজ নয়, কোনদিন সে তাকে ভালবাসেনি। ভালবাসাসংক্রান্ত সেই পরাজয়ের গ্লানিময় বেদনাটা তার অন্য সব ভাবনা চিন্তাকে মন থেকে দূর করে একা বিরাজ করতে লাগল তার মনে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো তার আত্মা যেন তার দেহ ছেড়ে তারই চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন কোন ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত-দেহী ব্যক্তি দেখে তার ক্ষতমুখ হতে প্রবহমান রক্তের ধারার সঙ্গে তার প্রাণ-পাখিটা পালিয়ে যাচ্ছে তার ক্ষতমুখ দিয়ে।

তখন রাত্রি ঘনিয়ে আসছিল। মাথার উপর দিয়ে কাকেরা বাসায় ফিরছিল।

হঠাৎ এম্মার মনে হলো অসংখ্য আগুনের স্ফুলিঙ্গ আকাশ থেকে ঝরে পড়ে গাছেপালায় জমে থাকা বরফের মধ্যে পড়ে নিবে যাচ্ছে। প্রতিটি স্ফুলিঙ্গের মাঝে রুডলফের মুখখানা দেখা যাচ্ছিল। সেই একটামাত্র মুখ যেন অসংখ্য জ্বালাময়ী রূপ ধরে এক উত্তপ্ত ও অপ্রতিরোধ্য তীক্ষ্ণতায় ঢুকে যাচ্ছিল তার অন্তরের গভীরে। কিন্তু পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে গেল যেন সব কিছু। এম্মার মনে হলো দূরে ঘন কুয়াশা ভেদ করে কতকগুলো বাড়ির আলোকরশ্মি তীরের মত ছুটে আসছে তার দিকে।

সহসা তার নিজের অবস্থাটা নিজের কাছে শূন্য বিরাট খাদের রূপ ধরে এল তার কাছে। সে এমনভাবে হাঁপাতে লাগল যেন মনে হবে তার ফুসফুসটা ফেটে যাবে এখনি। তারপর মনটা জোর করে শক্ত করে তাড়াতাড়ি পাহাড়টা পার হয়ে নদীতীরের পথটা ধরে গাঁয়ের ভিতর এসে পড়ল সে। বাজারটা পার হয়ে সোজা একেবারে হোমার দোকানে এসে গেল।

দোকানে তখন কেউ ছিল না। সে দরজায় ঘণ্টা বাজাল না। ভাবল ঘণ্টা বাজলেই কেউ এসে পড়বে। সে হোমার বাড়ির ভিতর না গিয়ে দোকানের ভিতর অন্ধকারে দেওয়াল ধরে ধরে ঢুকে গেল। এম্মা উঁকি মেরে দেখল ওদের রান্নাঘরে একটা স্টোভ জ্বলছে। তার পাশে একটা বাতি জ্বলছে। ওরা নৈশভোজনে বসেছে আর জাস্টিন একটা ডিশ হাতে পরিবেশন করছে।

জাস্টিন একবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই এম্মা বলল, উপরতলায় যাব, একবার চাবিটা দাও যেখানে...

জাস্টিন বলল, কি ?

এম্মার ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল জাস্টিন। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের পটভূমিকায় এম্মার ফর্সা চেহারাটাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল তার চোখে, মনে হচ্ছিল স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক দেবদূত। এম্মা কি চায় তা বুঝতে পারল না জাস্টিন। শুধু এক অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠল।

এম্মা নিচু অথচ শান্ত ও সকরুণ কণ্ঠে বলল, তুমি চাবিটা দাও, আমার দরকার।

ওদের খাবার ঘর থেকে প্লেটের উপর কাঁটাচামচের ঠুংঠাং শব্দ হচ্ছিল।

এম্মা বলল, তাদের বাড়িতে অনেক ইঁদুর হয়েছে। ইঁদুরের জ্বালায় সে সারারাত ঘুমোতে পারে না। তাই মারতে হবে।

জাস্টিন বলল, আমি মঁসিয়েকে একবার শুধিয়ে আসি।

না, তার দরকার হবে না। তাঁকে বিরক্ত করার দরকার নেই। আমি বরং পরে তাঁকে বলব। আমাকে একটা আলো দাও।

একটা হলঘর পার হয়ে লেবরেটারীতে চলে গেল এম্মা। দরজা ঠেলে সেই ঘরের দেওয়ালে চাবিটা ঝোলানো ছিল। লেখা ছিল 'ক্যাপারনাম'।

হোমা খেতে খেতে একবার জাস্টিনকে ডাকল।

এম্মা বলল, চল উপরতলায় যাই।

জাস্টিন এম্মার পিছু পিছু যেতে লাগল।

চাবি লাগিয়ে দরজার তালাটা খুলে ঘরে ঢুকে এম্মা তৃতীয় তাকটার দিকে হাত বাড়াল। সেখানে নীল কাচের জারে একটা সাদা পাউডার ছিল। এর আগে একবার দেখে সব মনে রেখেছে সে। জারের ছিপি খুলে হাত ঢুকিয়ে যতগুলো পারল পাউডার নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগল এম্মা।

জাস্টিন তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিল। বলল, খাবেন না।

এম্মা তাকে সাবধান করে দিল, কথা বলো না, কেউ আসতে পারে।

জাস্টিন মরীয়া হয়ে লোক ডাকতে চাইছিল।

এম্মা বলল, একটা কথাও কাউকে বলো না। তাহলে সব দোষ তোমার মালিকের উপর পড়বে।

এরপর এম্মা সোজা বাড়ি চলে গেল। তাকে আশ্চর্যভাবে শান্ত দেখাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল জীবনের একটা বিরাট কর্তব্য যেন পালন করেছে।

এদিকে চার্লস বাড়ি এসে যখন সব ঘটনার কথা শুনল তখন দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল। তখন এম্মা বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। সে তখন এম্মার নাম ধরে অনেক ডাকল। অনেক কাঁদল। ফেলিসিতেকে তার খোঁজে গাঁয়ের সব জায়গায় খোঁজ করতে পাঠাল। কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

চার্লস বুঝতে পারল তার নাম যশ সব কলঙ্কিত হয়ে তার সর্বনাশ হয়ে গেল। বার্থের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার। তার বিষয় সম্পত্তি টাকা পয়সা আর কিছুই রইল না। কিন্তু এর কারণ কি?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বড় রাস্তা দিয়ে একবার ঘুরে এল চার্লস। কারো দেখা পেল না। সে ভাবল এম্মা রুয়েনে চলে গেছে।

বাড়ি ফিরে চার্লস দেখল এম্মা ফিরে এসেছে। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, কি হয়েছিল তোমার? বল আমাকে।

এম্মা তার চেয়ারে বসে একটা চিঠি লিখল। চিঠি লিখে একটা খামে ভরে খামটা এঁটে চার্লসকে বলল, চিঠিটা কাল পড়বে। আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না।

এই বলে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ল এম্মা।

চার্লস কিছু বুঝতে না পেরে বলল, কিন্তু···

কোন কথা নয়, আমাকে একা থাকতে দাও।

মুখে একবার অ্যাসিডের আস্বাদ পেয়ে চোখ মেলল এম্মা। দেখল চার্লস বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর আবার চোখ বন্ধ করল।

এম্মা বোঝার চেষ্টা করল কোথাও কোন যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা। কিন্তু দেখল

শরীরের কোথাও কোন যন্ত্রণা নেই। সে শুধু ঘড়িটার টিক টিক আওয়াজ আর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চার্লসএর শ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

এম্মা ভাবল, মৃত্যুটা এমন কিছু কষ্টকর নয়। এতে কিছু যায় আসে না। আমি ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ব আর সব শেষ হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এক গ্লাস জল খেল এম্মা। তারপর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল।

এম্মা একবার খুব আস্তে করে বলল, আমার বড় পিপাসা পাচ্ছে। বড় পিপাসা।

চার্লস তাকে জল দিয়ে বলল, কি কষ্ট তোমার হচ্ছে?

কিছু না। জানালাটা খুলে দাও। বড় গরম লাগছে।

হঠাৎ জোর বমিভাব এল এম্মার। চার্লস তাকে আবার তার কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু এম্মা কোন উত্তর দিল না। স্থির হয়ে শুয়ে রইল এম্মা। সে ভাবল, একটু নড়াচড়া করলেই তার বমি হতে থাকবে। হঠাৎ অনুভব করল এম্মা একটা হিম হিম ভাব তার পায়ের পাতা থেকে তার হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত উঠে আসছে ক্রমশঃ। নিজের মনে মনে সে বলল, এবার বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে।

চার্লস বলল, কি বলতে চাইছ?

এম্মা নীরবে তার মাথাটা এপাশ ওপাশ করে ঘোরাতে লাগল। সে মুখটা ফাঁক করে চোয়ালদুটো টান করে রাখল। তার মনে হচ্ছিল তার জিবের উপর কি একটা ভারী জিনিস চাপানো রয়েছে। রাত্রি আটটা থেকে বমি শুরু হলো।

চার্লস দেখল বমির গামলার তলায় সাদা কি একটা জিনিস লেগে রয়েছে। সে আপন মনে বলতে লাগল, একি অদ্ভুত ব্যাপার!

এম্মা জোর গলায় বলল, না না, তুমি ভুল করছ।

চার্লস একবার তার হাতটা এম্মার পেটের উপর দিয়ে আস্তে টিপল। এম্মা চিৎকার করে উঠল। চার্লস সরে গেল।

একটা মৃদু আর্তনাদের শব্দ বেরিয়ে এল। তার কাঁধদুটো কাঁপছিল। হাতের আঙুল দিয়ে বিছানার সাদা চাদরটা ধরে টানাটানি করছিল এম্মা। তার সারা গা সাদা চাদরটার থেকেও সাদা ও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তার নাড়ীর স্পন্দন অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। অনুভব করাই যাচ্ছিল না।

এম্মার মুখের উপর জপের মালার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। তার মুখখানা হয়ে উঠেছিল অস্বাভাবিকভাবে নীল আর শক্ত। তার দাঁতগুলো কড়মড় করছিল। তার ঝাপসা চোখগুলো নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। তাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল তার উত্তরে শুধু মাথাটা নাড়ছিল। এক একবার এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠছিল তার মুখে।

এম্মার আর্তনাদটা ক্রমে জোর হচ্ছিল। তবু সে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যাতে মনে হবে সে ভাল আছে এবং এখনি সব সেরে যাবে। কিন্তু কাঁপুনিটা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল তার।

এম্মা একবার চিৎকার করে বলল, হা ভগবান। কী ভয়ঙ্কর!

বিছানার ধারে নতজানু হয়ে বসে চার্লস এম্মাকে বলল, কথা বল, বল তুমি কি খেয়েছ। ঈশ্বরের নামে বল।

এম্মা তার ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে চার্লসএর চোখের তারায় যে প্রেমের ছবি দেখল সে ছবি জীবনে এর আগে কখনো কোনদিন দেখেনি সে।

এম্মা কোনরকমে বলল, ঐ ওখানে······

চার্লস ছুটে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বার করে পড়তে লাগল। তাতে লেখা আছে—'কেউ দায়ী না······' কথাটা বারবার পড়ল চার্লস। তারপর বলে উঠল, কি সর্বনাশ! বাঁচাও বাঁচাও! বিষ খেয়েছে! বিষ! ফেলিসিতে ছুটে হোমার কাছে চলে গেল। কথাটা শুনে হোমাও চেঁচাতে লাগল। ছুটে গিয়ে বাজারের সবাইকে বলল। মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া শুনল হোমার কাছ থেকে। এইভাবে গাঁয়ের লোকেরা কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যকে বলতে লাগল। গোটা গাঁটা সারারাত জেগে রইল।

চার্লস পাগলের মত ঘরটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল বৃত্তাকারে। ঘরের আসবাবপত্রের উপর যেখানে সেখানে পড়ে যেতে লাগল। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। হোমা এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য কখনো দেখেনি জীবনে।

হোমা একবার খবর নিয়ে বাড়িতে গিয়ে দুজন ডাক্তারের কাছে দুটো চিঠি লিখল। ডাক্তার ক্যানিভার আর একজন ডাক্তার ল্যারিভিয়ের। হোমারও মাথার ঠিক ছিল না বলে পনের মিনিট লাগল চিঠি দুটো লিখতে। তার চিঠি লেখা হয়ে গেলে হিপ্পোলিতে আর জাস্টিন দু জায়গায় দুটো চিঠি নিয়ে দুজন ডাক্তারের কাছে চলে গেল।

চার্লস ওষুধের অভিধানটা ঘেঁটে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। বইএর অক্ষরগুলো তার অশান্ত চোখের সামনে নাচতে লাগল।

হোমা বলল, মাথা খারাপ করবেন না। এমন কিছু জোর প্রতিষেধক দিতে হবে। বিষটা কি?

চার্লস নীরবে চিঠিটা দেখাল। বিষটার নাম আর্সেনিক।

হোমা বলল, এখন বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

হোমা শুনেছিল কোন লোক বিষ খেলে বিষটা বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়।

চার্লস কিছু বুঝতে পারল না কি সে করবে। সে কাতর কণ্ঠে বলল, যা হোক কিছু একটা করুন। ওকে বাঁচান।

চার্লস বিছানার ধারে কার্পেটের উপর বসে বিছানার উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এম্মা বলল, কেঁদো না, আর আমি তোমাকে কষ্ট দেব না।

চার্লস বলল, কেন একাজ তুমি করলে? কেন করলে?

এম্মা উত্তর করল, এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

চার্লস বলল, তুমি কি সুখী হতে পারনি? আমার কি কোন দোষ হয়েছে? আমি ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

এম্মা বলল, হ্যাঁ···আমি তা জানি, ··তুমি সত্যিই ভাল, তুমি অন্য মানুষ।

চার্লসএর মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল এম্মা। এম্মার এই মধুর প্রেমময় স্পর্শ আরো গভীর, আরো দুঃসহ করে তুলল চার্লসএর দুঃখকে। এম্মা যখন চার্লসকে আগের থেকে অনেক বেশী করে ভালবাসতে শুরু করেছে ঠিক তখনি তাকে সে হারাতে চলেছে একথা ভাবতে গিয়ে এক গভীর হতাশায় সারা অঙ্গ অবশ হয়ে পড়ল তার। সে কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না। আপাততঃ কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু এই প্রয়োজনীয়তার ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণতায় তার উপস্থিত বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল।

এম্মা ভাবছিল এখন সে সব পাপকর্মের ঊর্ধ্বে। যে বিশ্বাসঘাতকতা, অবিশ্বস্ততা, অসংখ্য অবৈধ উত্তাল কামনা বাসনা দূষিত জলের ঢেউএর মত তার জীবনকে এতদিন মথিত ও আন্দোলিত করে এসেছে আজ সে সব ঢেউ কাটিয়ে উঠেছে সে। এখন সে কাউকে ঘৃণা করে না। কারো প্রতি কোন বিতৃষ্ণা অনুভব করে না। ছায়াধূসর এক জটিলতা তার চিন্তা ভাবনা চেতনা ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল একেবারে। সেই অস্পষ্ট জটিল চেতনা ও অনুভূতির মাঝে এম্মা শুধু একটা জিনিসই শুনতে পাচ্ছিল তা হলো ক্রম-বিলীয়মান কোন ঐকতানের সুরের মত হতভাগ্য চার্লসএর সকরুণ বিলাপের অবিচ্ছিন্ন সুরের একটা ধারা তার কানে এসে লাগছিল।

কনুইএর উপর কোনরকমে ভর দিয়ে বসে এম্মা বলল, আমার মেয়েটাকে নিয়ে এস।

চার্লস বলল, তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?

না না।

বার্থেকে আনা হলো। রাত্রির পোষাক পরা থাকলেও বার্থের খালি পাগুলো দেখা যাচ্ছিল। এম্মাকে তখন স্তব্ধ ও অর্ধস্বপ্নাবিষ্ট দেখাচ্ছিল। এম্মা দেখল সারা ঘরখানায় এলোমেলোভাবে সব জিনিস ছড়ানো রয়েছে। বিভিন্ন আসবাবের মাথার উপরে বাতি জ্বলছিল। হঠাৎ এম্মার কোন এক নববর্ষের কথা মনে পড়ে গেল। সেদিনও এমনি বাতি জ্বলছিল এবং তাকে রাত্রিতে হঠাৎ উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তার মার কাছে। তখন সেও ছিল এমনি ছোট।

ফেলিসিতে বার্থেকে কোলে নিয়ে এম্মার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এম্মার দৃষ্টি সামনের দিকে ছিল বলে দেখতে পেল না। দেখতে না পেয়ে বলল, ওকে কি ধাত্রী নিয়ে গেছে?

ধাত্রীর কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এম্মার মনে তার সব ব্যভিচার ও বিপর্যয়ের কথা মনে পড়ল। অযাচিত স্মৃতির গরল পার্থিব বিষের থেকে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে এক নিদারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত করে দিল তার মনটাকে।

বার্থেকে ফেলিসিতে এম্মার সামনে আনলে বার্থে তার মাকে বলল, তোমার চোখগুলো অত বড় বড় দেখাচ্ছে কেন মা?

বার্থে বিছানার উপর বসে এম্মাকে বলল, তোমায় ভীষণ মলিন দেখাচ্ছে। তুমি ঘামছ। আমার ভয় পাচ্ছে।

এম্মা বার্থের হাতটা চুম্বন করতে সে সরে যেতে লাগল।

চার্লস বলল, ওকে নিয়ে যাও।

চার্লস তখন বিছানার নিচের দিকে বসে কাঁদছিল।

সাময়িকভাবে এম্মার উপসর্গগুলো কমল। সে শান্ত হলো আগের থেকে কথা বলার সময় তার শ্বাসকষ্ট কম হচ্ছিল। চার্লসএর কিছুটা আশা হলো।

ডাক্তার ক্যানিভার এলে চার্লস তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এসেছ ভাই? তুমি দয়ালু। তোমাকে ধন্যবাদ। তবে আমার মনে হচ্ছে সে একটু ভাল। ওকে দেখ।

কিন্তু চার্লসএর সহকর্মী ক্যানিভারের কিন্তু তা মনে হলো না। সে বলল, বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। তবে পেটটা ধুয়ে দেওয়া উচিত।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তবমি করতে লাগল এম্মা। তার ঠোঁটগুলো শক্ত করে চেপে ধরছিল। যন্ত্রণায় তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মোচড় দিয়ে উঠছিল। তার হাতের ক্ষীণ নাড়ীটা অবচ্ছিন্নপ্রায় বীণার তারের মত ধুক ধুক করছিল।

হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে জোরে চীৎকার করে উঠল এম্মা। যে বিষ সে খেয়েছে সে বিষকে অভিশাপ দিতে লাগল সে। তাড়াতাড়ি মৃত্যু কামনা করছিল। চার্লস তার মুখের কাছে যে পানীয় নিয়ে গিয়ে ধরছিল শক্ত কাঠ হয়ে যাওয়া হাত দিয়ে তা দূরে ঠেলে দিচ্ছিল এম্মা। এম্মার শারীরিক যন্ত্রণার থেকে চার্লস-এর মনোবেদনা কিছু কম ছিল না। সে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। সারা দেহটা তার কাঁপছিল। ফেলিসিতে ছোটাছুটি করছিল। হোমা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। মঁসিয়ে ক্যানিভার স্থির ধীর প্রকৃতির লোক হলেও বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়লেন। বেশ কিছুটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন।

হোমা বলল, কারণটা দূরীভূত হলেই কার্যটা আপনা হতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

চার্লস বলল, যা হোক একটা কিছু করুন।

হোমা বলছিল রোগীর খিঁচুনি ভাবটা তার ক্রমোন্নতির পরিচায়ক হতে পারে। ডাক্তার ক্যানিভার কিন্তু তা মনে করলেন না। তিনি থেরিয়াতা নামে

একটা ওষুধ এম্মাকে খাওয়াতে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিন ঘোড়ায় টানা এক গাড়িতে করে ডাক্তার ল্যারিভিয়ের এসে হাজির হলেন।

ল্যারিভিয়ের আসার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট উত্তেজনা দেখা দিল ঘরের মধ্যে। চার্লস দুহাত তুলে আনন্দ প্রকাশ করল। ক্যানিভার ওষুধ দিতে গিয়ে ওষুধ দেওয়া বন্ধ করে দিল। হোমা টুপী খুলে মাথা নত করল।

ডাক্তার ল্যারিভিয়ের এক বিরাট শল্য চিকিৎসক। হাসপাতালে তিনি একটু রেগে গেলে সবাই কাঁপতে থাকে ভয়ে। ছাত্রেরা তাকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে। সারা জেলার মধ্যে এমন একটি শহরও নেই যেখানে ল্যারিভিয়েরের একজন না একজন ছাত্র আছে এবং তাঁর মত পোষাক না পরে।

এম্মা তখন মুখটা খুলে হাঁ করে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। তার গোটা মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছিল। ক্যানিভার কি বলছিল আর ডাক্তার ল্যারিভিয়ের তাই শুনছিলেন। কিন্তু বোভারীকে দেখে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল। ব্যথাহত শোকার্ত ব্যক্তির মুখ দেখা তাঁর জীবনে এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। ডাক্তার হিসাবে তিনি এর আগে এ ধরনের মুখ অনেক দেখেছেন। তবু বোভারীর অবস্থা দেখে তাঁর মনে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। কোনমতেই তিনি অশ্রু রোধ করতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে দুফোঁটা জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ল তাঁর জামার সামনের দিকে।

ডাক্তার ল্যারিভিয়ের ক্যানিভারকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। চার্লসও তাদের সঙ্গে গেল। ল্যারিভিয়ের ক্যানিভারকে বললেন, রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ। আর কি করা যাবে? তুমি কি কিছু ভাবছ? তুমি ত কত প্রাণ বাঁচিয়েছ।

চার্লস তার বুকের উপর হাত রেখে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তাঁদের মুখপানে।

ল্যারিভিয়ের সান্ত্বনার ছলে চার্লসকে বললেন, সাহস অবলম্বন করো, ধৈর্য ধরো। এখন আর করার কিছু নেই।

ল্যারিভিয়ের যাবার জন্য মুখ ফেরালেন। চার্লস বলল, আপনি চলে যাচ্ছেন?

ল্যারিভিয়ের বললেন, আসছি।

তাঁর গাড়ির চালককে কিছু বলার অজুহাত দেখিয়ে ক্যানিভারকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তারা কেউই এম্মার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখতে চাইছিলেন না।

হোমাও তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে বাড়ির বাইরে চলে গেল। ডাক্তার ল্যারিভিয়েরকে তার বাড়িতে গিয়ে লাঞ্চ খাবার জন্য অনুরোধ করল হোমা। এই ধরনের লৌকিক রীতিনীতিতে সে অভ্যস্ত। এর থেকে কোন ক্ষেত্রেই বিচ্যুত হতে চায় না কোন কারণে।

একটা ছেলেকে বাজারের কশাইএর কাছে পাঠানো হলো। কিন্তু এ সময় কিছুই পাওয়া গেল না। অগত্যা এখান সেখান থেকে কিছু যোগাড় করা হলো। মঁসিয়ে তুভাশে কিছু মাখন আর লেস্তিবুদয় কিছু ডিম দিল। হোমা নিজেই তা দিয়ে কিছু বানাতে বসল। মাদাম হোমা চাদরটা টেনে বলল, মাপ করবেন। আমাদের যা হতভাগা গাঁ, একদিন আগে থেকে খবর না পেলে কিছুই যোগাড় করার উপায় নেই।

হোমা চুপি চুপি তার স্ত্রীকে বলল, মাংসগুলো নিয়ে এস।

তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, বলুন স্যার, এটা যদি শহর হত তাহলে দেখতেন কত কি যোগাড় করতাম।

খেতে খেতে হোমা চুপ করে বসে থাকতে পারল না। ঘটনার কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করল। এম্মার দেহের কোথায় কখন কিভাবে যন্ত্রণা দেখা দেয় তা বলল।

ল্যারিভিয়ের কম কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে মেয়েটি বিষ খেল ?

হোমা বলল, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ডাক্তারবাবু। কোথা থেকে যে এ বিষ যোগাড় করল তার কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।

জাস্টিন কতকগুলো প্লেট বয়ে নিয়ে আসছিল। কথাটা তার কানে যেতেই সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হোমা তার পানে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে ?

এ প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গেই জাস্টিনের হাত থেকে সব প্লেটগুলো পড়ে গেল জোর শব্দে।

হোমা চিৎকার করে উঠল, অপদার্থ কোথাকার! একটা আস্ত বোকা এবং বর্বর।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আমি বিষটা কি তা বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছিলাম। আমি একটা টিউবও ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

ডাক্তার ল্যারিভিয়ের বললেন, সবচেয়ে ভাল হত যদি আপনি আপনার আঙুল ঢুকিয়ে দিতেন রোগীর গলায়।

ক্যানিভার কোন কথাই বলছিল না। একটু আগে ল্যারিভিয়ের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার আজকের চিকিৎসার ত্রুটি সম্বন্ধে প্রচুর তিরস্কার করেন আর তাই সে চুপ করে বসে আছে। অথচ এই ক্যানিভার যেদিন হিপ্পোলিতের পা অপারেশন করে সেদিন সে অনেক হাঁক ডাক করে সারা গাঁ তোলপাড় করেছিল।

এদিকে দুজন ডাক্তার তার আতিথ্য গ্রহণ করায় এক সঙ্গতিসম্পন্ন গৃহস্বামী হিসাবে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল হোমা। বিশেষ করে চার্লসএর দুরবস্থার তুলনায় তার নিজের অবস্থা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা ভেবে মনে মনে খুশি হচ্ছিল সে। তাছাড়া ডাক্তারদের উপস্থিতিতে একটা উত্তেজনায়

অনুভব করছিল। কিভাবে সে তার সঞ্চিত জ্ঞানবিদ্যার কথা প্রকাশ করতে পারবে তাঁদের সামনে তার সুযোগ খুঁজছিল সব সময়।

এক সময় হোমা বলল, আমি বিষ খাওয়ার অনেক রোগী দেখেছি। এ বিষয়ে আমি অনেক পড়াশুনো করেছি। এ বিষয়ে গ্যাসিকোর্তের লেখাটা খুবই ভাল।

মাদাম হোমা কফি নিয়ে এল খাওয়ার পর। হোমা তাই বলেছিল।

কফি খাওয়ার পর হোমা তার সব ছেলেমেয়েদের ডাকিয়ে আনাল। সে তার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার ল্যারিভিয়েরের কিছু উপদেশ চাইল। সবশেষে মাদাম হোমা ডাক্তারকে বলল, তার স্বামী রাত্রিতে খাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ে। তার রক্ত ঘন হয়ে উঠছে।

ডাক্তার ল্যারিভিয়ের মৃদু হেসে বললেন, কিন্তু উনি ঘন রক্তের লোক নন। এই বলে তিনি যাবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু দরজা খুলতেই দেখলেন অনেকে তাঁর জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে তাঁর পরামর্শ নিতে এসেছে। মঁসিয়ে তুভাশে এসেছে তাঁর স্ত্রীর জন্য, মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া এসেছে তার হার্টের রোগের জন্য, লেহুড়ে তার স্নায়বিক দুর্বলতা আর লেস্তিবুদয় এসেছে তার বাতের জন্য। কিন্তু সকলকে খুশি করতে পারলেন না ডাক্তার ল্যারিভিয়ের।

সবাইকে পাশ কাটিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন ল্যারিভিয়ের। ওরা সবাই বলাবলি করতে লাগল ডাক্তারবাবু খুব কড়া লোক। এমন সময় ওরা দেখল গাঁয়ের যাজক মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েন পবিত্র ধর্মীয় তেল নিয়ে আসছেন, তিনি যাবেন মঁসিয়ে বোভারীদের বাড়ি। তখন সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। হোমা যাজকদের শকুনিদের সঙ্গে তুলনা করে। কারণ যাজকরাও ঠিক শকুনিদের মত মড়ার গন্ধ পেলেই সেখানে গিয়ে জড়ো হয়।

যাজকদের দেখতে না পারলেও তার পরোপকারের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না হোমা। এই ব্রতের বশবর্তী হয়েই সে ডাক্তার ক্যানিভারকে সঙ্গে করে চার্লসদের বাড়িতে ফিরে গেল। মাদাম হোমা আবার তার স্বামীকে তার দুটি ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলল। কারণ তারা এখন থেকে এই বিপদ আপদ ও দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাদের সম্মুখীন হবার শিক্ষা শিখুক।

ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল, একটা থমথমে বিষাদ জমে আছে সারা ঘরখানায়। সেলাইএর টেবিলের পাশে দুটো জলন্ত বাতির মাঝখানে একটা বড় ক্রস রাখা হয়েছে। এম্মার চোখের পাতাগুলো খোলা আছে, তার থুতনিটা বুকের উপর নেমে এসেছে। তার হাতদুটো বিছানার চাদরের উপর এলিয়ে আছে। কেঁদে কেঁদে চার্লসএর চোখগুলো লাল অঙ্গারের মত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখন সে আর কাঁদছে না। তার গোটা চেহারাটা পাথরের

প্রতিমূর্তির মত প্রাণহীন ও ম্লান দেখাচ্ছিল। সে বিছানার তলায় দাঁড়িয়ে এম্মার পানে তাকিয়েছিল। যাজক বুর্নিসিয়েন তার পাশে বসেছিলেন।

হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে সামনে তাকাল এম্মা। তার মনে হলো বাতিগুলির ধর্মীয় আলোর পবিত্র শিখা হতে এক পরম আনন্দের জ্যোতিকে জীবনে প্রথম বিচ্ছুরিত হতে দেখল সে। যে আনন্দের আস্বাদ কোনদিন লাভ করতে পারেনি সেই পরম আনন্দের বহুআকাঙ্ক্ষিত ভাবমূর্তিটিকে তার ক্ষীয়মান অনুভূতিশক্তির অবশিষ্টটুকু দিয়ে শেষবারের মত আস্বাদন করল এম্মা।

যাজক বুর্নিসিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে ক্রসটিকে তুলে এম্মার বিছানার উপর তার মুখের সামনে নিয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে এম্মা পরম আগ্রহের সঙ্গে মুখটা বাড়িয়ে ঈশ্বরপ্রেরিত সেই মহামানবের পবিত্র মূর্তিটিকে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে চুম্বন করতে লাগল বারবার। তারপর যাজক মন্ত্রপাঠ করলেন। মন্ত্রপাঠের পর পবিত্র তেলের মধ্যে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি ডুবিয়ে তা দিয়ে মর্দনকার্য শুরু করলেন। প্রথমে তিনি সেই ধর্মীয় তেল নিয়ে এম্মার চোখগুলোতে বুলিয়ে দিলেন। যে চোখদুটি সারা জীবন ধরে অসংখ্য পার্থিব বিলাসব্যসন ও ঐশ্বর্যের যত সব উপকরণের দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে কতবার দৃষ্টিপাত করেছে সেই অপবিত্র চোখদুটিকে ধর্মীয় তেল দিয়ে সিক্ত ও পবিত্র করে দিলেন যাজক। তারপর এম্মার যে নাসারন্ধ্রদুটি কতবার কত সুগন্ধি বাতাস ও প্রেমোদ্দীপক গন্ধদ্রব্যকে এক বিস্ফারিত আগ্রহের নিবিড়তায় বরণ করে নিয়েছে সেই নাসারন্ধ্র দুটিও তৈলসিক্ত করে দিলেন যাজক। এরপর তার যে অপবিত্র মুখগহ্বর কতবার কত মিথ্যা কথায় ফেটে পড়েছে, কত অহঙ্কারের দুর্বিনীত স্পর্ধায় উদ্ধত হয়ে উঠেছে, কত অবৈধ অসংযত কামনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে সেই মুখ পবিত্র হয়ে উঠল আজ ধর্মীয় তেলের স্পর্শে। তার যে হাতদুটি কত অবৈধ শৃঙ্গারস্পর্শের এক কলুষিত পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে কতবার সে হাত দুটিতে মন্ত্রঃপূত তেল মাখিয়ে দিলেন যাজক। সবশেষে তার যে পায়ের পাতা দুটি কত বাসনা পূরণের পঙ্কিল পথে ছুটে গেছে বারবার সে পায়ের পাতা দুটিতেও তেল মাখানো হলো।

এরপর যাজক লে কুরে তুলো দিয়ে তার তৈলাক্ত হাত দুটি মুছলেন। তারপর সেই তুলোগুলো আগুনে ফেলে দিয়ে মুমূর্ষু এম্মার বিছানায় এসে তার পাশে বসে বললেন, এবার সে তার সারা জীবনের সকল দুঃখকষ্ট খৃস্টের দুঃখকষ্টের সঙ্গে এক করে দেখতে পারে। এবার সে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের করুণার উপর নিজেকে সঁপে দিতে পারে।

নীতি উপদেশ দেওয়া শেষ হলে যাজক একটি ধর্মীয় বাতি নিয়ে এম্মাকে হাত দিয়ে ধরতে বললেন। তিনি চাইলেন এই পবিত্র ধর্মীয় বাতির আলো এক স্বর্গীয় জ্যোতির প্রতীকরূপে তার দেহটিকে ঘিরে থাক। কিন্তু এম্মার হাত দুটি এত দুর্বল যে বাতিটাকে ধরতে পারছিল না। যাজক ঠিক সময়ে

না ধরলে এম্মার হাত থেকে পড়ে যেত বাতিটা।

দুর্বল হলেও এম্মার মুখে তখন মালিন্য ছিল না। তার পরিবর্তে তার মুখের উপর ফুটে উঠেছিল এক স্নিগ্ধ শান্ত ভাব। দেখে মনে হচ্ছিল এই ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের ফলে তার সব রোগ যেন সেরে গেছে।

যাজক বুর্নিসিয়েন চার্লসকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অনেক সময় ঈশ্বর মানুষকে মোক্ষ দান করার জন্য তার আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেন। চার্লস তখন ভাবল এর আগেও একবার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। তার আশা সবাই ত্যাগ করে। যাজক বুর্নিসিয়েন এমনি করে ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড সব সম্পন্ন করেন। কিন্তু তার পরেও এম্মা সেরে ওঠে। মৃত্যুর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। তাই এবারও আশা করল চার্লস, হয়ত এবারেও এম্মা মৃত্যুর নিশ্চিত গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হতে হতে তার মধ্য থেকে ফিরে আসতে পারে আগের মত।

চার্লসএর সত্যি আশা হলো, এম্মাও তার চারদিকে তাকাতে লাগল যেন মনে হলো এক স্বপ্নময় সুখনিদ্রা হতে জেগে উঠেছে এইমাত্র। সে স্পষ্ট গলায় আয়নাটা চাইল। আয়নাটা তাকে দিলে সে তার উপর ঝুঁকে পড়ে কি একবার দেখে নিল। তার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালিশের উপর আবার ঢলে পড়ল এম্মা।

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা লাফাতে লাগল। তার জিবটা লম্বা হয়ে বেড়িয়ে এল মুখ থেকে। তার চোখদুটো ঘুরতে ঘুরতে নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মত ম্লান হয়ে উঠল। তার দেহের হাড়পাঁজরাগুলো এমন ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে লাগল যাতে মনে হতে লাগল তার আত্মা দেহের বন্ধনটাকে ভাঙ্গার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছে।

ফেলিসিতে ক্রসের সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। এখন হোমাও কিছুটা নত হলো ক্রসের সামনে। ডাক্তার ক্যানিভার বাইরে তাকিয়ে রইল। যাজক বুর্নিসিয়েন আবার প্রার্থনা করতে লাগলেন বিছানার দিকে তাকিয়ে। কালো গাউনের আঁচলটা পিছন দিকে লুটিয়ে পরছিল। বিছানার আর একদিকে চার্লস মেঝের উপর নতজানু হয়ে বসে তার হাত দুটো এম্মার দিকে ছড়িয়ে রেখেছিল। মাঝে মাঝে এম্মার হাতদুটো নিয়ে তার উপর চাপ দিচ্ছিল। হাতের নাড়ীর স্পন্দনের মধ্যে আসন্ন মৃত্যুর অভ্যগ্র পদধ্বনি শোনার চেষ্টা করছিল। সে ধ্বনি যতই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে ততই আরো জোরে প্রার্থনা করতে লাগলেন যাজক বুর্নিসিয়েন। ততই চার্লসএর কান্নার শব্দও বেড়ে যেতে লাগল। যাজকের মুখে উচ্চারিত প্রার্থনার লাতিন শব্দের ধ্বনিগুলো চার্চের মৃত্যুকালীন ঘণ্টাধ্বনির মত শোনাচ্ছিল।

হঠাৎ সকলকে সচকিত করে বাড়ির বাইরে গলিপথে একজোড়া কাঠের জুতোর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ঠোকার শব্দ আসতে লাগল। সেই আগন্তুকের কণ্ঠ হতে গান ভেসে এল। সে গাইছিল,

একটি নির্মল নির্মেঘ দিনের উত্তাপ
একটি তরুণীকে প্রেমের স্বপ্নসুখে বিভোর করে
দেয় বারবার।

আগুনের স্পর্শে হঠাৎ উঠে পড়া মৃতদেহের মত এম্মা উঠে বসল বিছানায়। তার মাথার চুল উড়ছিল। তার চোখদুটো স্থির হয়ে জানালার দিকে নিবদ্ধ ছিল। সে হাঁপাচ্ছিল।

আগন্তুক আবার গাইছিল,

তরুণীটি তখন মাঠে কাজ করছিল আপন মনে
কাটা গমগুলো এক জায়গায় জড়ো করার জন্য
তার কাস্তেটা পাশে নামিয়ে রেখেছিল সে।
তার স্বপ্নের স্বগত শব্দের সঙ্গে
এক হয়ে গিয়েছিল তার কাজের ছন্দ।

এম্মা চিৎকার করে বলল, সেই অন্ধ লোকটা।

এম্মা হাসতে লাগল জোরে। এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তার মনে হলো সেই অন্ধ ভিখারির বিকৃত অস্বাভাবিক মুখটা এক অন্তহীন অন্ধকারের রূপ ধরে দিগন্ত হতে তাকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে।

গানের শেষাংশের দুটো কলি তখনো শোনা যাচ্ছিল,

সেদিন এত জোরে বাতাস বইছিল যে,
তরুণীর পেটিকোটটা স্খলিত হয়ে পড়ছিল তার গা থেকে।

বিছানার উপর ঢলে পড়ল এম্মা। সকলে ছুটে গেল তার কাছে। তার প্রাণ আগেই বেরিয়ে গেছে।

৯

সব মৃত্যুই মানুষকে এমনভাবে অভিভূত করে দেয় যে সে মৃত্যুর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যে কিছু হারালাম তা বিশ্বাস করতেই পারি না।

কিন্তু চার্লস যখন বুঝল কি সে হারিয়েছে তখন সে এম্মার মৃতদেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাগলের মত। বারবার বলতে লাগল, বিদায় বিদায়।

হোমা ও ডাক্তার ক্যানিভার তাকে ধরে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। বলল, নিজেকে সংযত করো।

চার্লস তাদের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, আমি কিছু করব না। আমাকে শুধু ওর কাছে থাকতে দাও। ও আমার স্ত্রী। আমি ওর কাছে কাছে থাকতে চাই।

এই বলে কাঁদতে লাগল চার্লস।

হোমা বলল, কাঁদ কাঁদ। কেঁদে অন্তরটাকে খালি করে দাও। তাহলে

তোমার ভাল হবে। বুকটা হালকা হবে।

চার্লসকে যখন ধরে ধরে নিচের তলায় বসার ঘরে নিয়ে আসা হলো, তখন সে শিশুর মত তাদের সঙ্গে এল। কোন বাধা দিল না। মঁসিয়ে হোমা বাড়ি চলে গেল।

বাড়ির বাইরে রাস্তায় গিয়ে নামতেই সেই অন্ধ ভিখারির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হোমার। হোমা তাকে একদিন রুয়েন থেকে ইয়নভিল আসার পথে এক বিশেষ ওষুধ দিয়ে তার অন্ধত্ব সারিয়ে দেবার কথা বলে। তাকে তার দোকানের ঠিকানা দেয়। ইয়নভিল গাঁয়ে এসে সেই ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে। হোমার মন মেজাজ তখন ভাল না থাকায় বলল, এখন নয়, পরে আসবে। আমার এখন অনেক কাজ।

এই বলে নিজের দোকানে চলে গেল হোমা। তাকে দুটো চিঠি লিখতে হবে। তারপর বোভারীর সম্মানরক্ষার জন্য এক বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যা খাড়া করতে হবে যাতে করে এম্মার আত্মহত্যার ঘটনাটা এক স্বাভাবিক মৃত্যু হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এ নিয়ে ফেনাল পত্রিকায় সে লিখবে। তাছাড়া বাজারে অপেক্ষমান জনতাকেও তাকে এই কথা বলে বোঝাতে হবে।

হোমা বাজারে গিয়ে সত্যিই সকলকে বলল, এম্মা আসলে আত্মহত্যা করেনি। সে চিনি ভেবে আর্সেনিক পাউডার কাস্টার্ডের সঙ্গে খেয়ে ফেলেছে।

এই কথা সকলকে বলে আবার বোভারীর কাছে ফিরে এল হোমা। এসে দেখল ক্যানিভার চলে গেছে। চার্লস একা জানালার ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে বসে বাইরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

হোমা চার্লসকে বলল, এখন আপনাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়টা ঠিক করতে হবে।

চার্লস জিজ্ঞাসা করল, কেন? কিসের ক্রিয়া?

একটু পরে কথাটা বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে গেল চার্লস। আমতা আমতা করে বলল, না না, আমি তা পারব না। আমি তাকে রেখে দিতে চাই।

হোমা তার অস্বস্তিটা কাটাবার জন্য ফুলের টবে জল দিতে লাগল।

চার্লস তা দেখে বলল, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি সত্যিই বড় ভাল। হোমার এই কাজ দেখে আরো ভেঙে পড়ল চার্লস। পুরনো দিনের কত কথা মনে পড়ল তার। তার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

তার মনটাকে অন্য দিকে ঘোরাবার জন্য হোমা ফুল চাষ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল। তার কথায় অন্যমনস্কভাবে সায় দিয়ে যেতে লাগল চার্লস।

হোমা বলল, শীঘ্রই বসন্ত আসছে।

চার্লস বলল, হায়।

আর কোন কথা না পেয়ে হোমা বলল রাস্তা দিয়ে মঁসিয়ে তুভাশে যাচ্ছে।

চার্লসও যন্ত্রের মত বলল, মঁসিয়ে তুভাশে যাচ্ছেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথাটা চার্লসএর কাছে তুলতে সাহস পেল না হোমা। সে না বললেও যাজক বুর্নিসিয়েন কথাটা বুঝিয়ে বললেন চার্লসকে। বললেন, যা হোক কিছু একটা করতে হবে। চার্লস যেন ভেবে দেখে ব্যাপারটা এবং তারপর কিছু একটা স্থির করে।

চার্লস তখন তার রোগীর দেখার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে লিখতে লাগল একটা কাগজে। লিখল, আমি চাই আমার স্ত্রীকে তার বিয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় সমাহিত করা হোক। তার গলায় থাকবে বিয়ের মালা, পায়ে থাকবে সাদা জুতো আর তার আলুলায়িত কেশপাশ ছড়ানো থাকবে মাথার দুধারে। তিনটি কফিনের ব্যবস্থা করতে হবে—একটা ওক কাঠের, একটা মেহগনি কাঠের আর একটা সীসের। আর এক সবুজ মখমলের আবরণ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে তাকে। আমি এটা চাই। এ ব্যবস্থা করতেই হবে।

যাজক ও হোমা দুজনেই বোভারীর অবাস্তব রোমান্টিক মনোভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। হোমা দোষ দেখিয়ে অনুযোগের স্বরে বলল, খরচের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও মখমলের কাপড়টা বড় একটা বাড়াবাড়ির পরিচায়ক হবে।

চার্লস রেগে বলল, সেটা আপনাকে দেখতে হবে না। আমাকে একা থাকতে দিন। আপনি তাকে ভালবাসতেন না। চলে যান।

যাজক চার্লসকে বাগানে নিয়ে গেলেন। তার মনটার যাতে একটু পরিবর্তন হয় তার জন্য তাকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে লাগলেন। তিনি তাকে বোঝাতে লাগলেন পার্থিব বস্তু সব অসার অর্থহীন। একমাত্র ঈশ্বরই পরম সত্য, পরম মঙ্গলময়। তাঁর বিধানের কাছে আমাদের নির্বিবাদে অকুণ্ঠভাবে আত্মসমর্পণ করা উচিত। শুধু তাই নয় তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

নাস্তিকের মত এক উদ্ধত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে চার্লস বলল, আমি আপনার ঈশ্বরকে ঘৃণা করি।

যাজক বললেন, কারণ আপনার মধ্যে বিদ্রোহের সুর এখনো রয়েছে।

চার্লস যাজকের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে গাছগুলোর তলায় পায়চারি করছিল। সে দাঁত কড়মড় করে আপন মনে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তার কথার উত্তরে একটা গাছের পাতা একটুও নড়ল না।

তখন বৃষ্টি পড়ছিল। চার্লসএর জামার বোতাম খোলা থাকায় তার গায়ে ঠাণ্ডা লাগছিল, সে শীতে কাঁপছিল। সে তাই বাড়ির ভিতরে গিয়ে সোজা রান্নাঘরে চলে গেল।

ছ'টা বাজতেই বাজারে ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠল। হিরণদেল এসে গেছে শহর থেকে। জানালার ধারে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল চার্লস, একে একে গাড়ির সব যাত্রীরা নেমে গেল। ফেলিসিতে একটা তোষক এনে

বৈঠকখানা ঘরে পেতে দিল। তাতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল চার্লস।

হোমা যুক্তিবাদী হলেও মৃতকে সম্মান করত। তাই চার্লসএর কথায় কিছুমাত্র রাগ না করে সে আবার ফিরে এল তাদের বাড়িতে। রাত্রিতে সে মৃতের ঘরে জেগে পাহারা দেবে। তাই সে সারারাত জাগার জন্য তিনখানা বই আর নোট লেখার জন্য একটা প্যাড নিয়ে এল সঙ্গে।

এসে দেখল মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েন আগেই এসে গেছেন। দুটো বড় বাতি মৃতের মাথার কাছে জ্বলছিল। বাতিগুলি আসবাবের উপর থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে।

দুজনেই চুপচাপ থাকায় ঘরের মৃত্যুশীতল স্তব্ধতাটা অস্বস্তিকর লাগছিল হোমার। সেই অস্বস্তিটা কাটাবার জন্য সে এই হতভাগ্য মৃত মহিলার সম্বন্ধে কিছু শোকসূচক কথা বলল। যাজক বললেন, কিন্তু এখন শুধু তাঁর জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া তাদের বলার বা করার কিছু নেই।

হোমা তবু বলল, যাই হোক, দুটোর একটা করতেই হবে। হয় ধরে নিতে হবে উনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অথবা ধরে নিতে হবে উনি পাপাসক্ত অবস্থায় অনুতাপহীন চিত্তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমার প্রথম ধারণা সত্য হলে ওর জন্য আমাদের প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে···

বুর্নিসিয়েন তাকে বাধা দিয়ে বললেন, তা হলেও প্রার্থনার দরকার আছে।

কিন্তু হোমা বলল, যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সকল প্রয়োজনের কথা জানেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাবার কোন প্রয়োজন নেই। কি হবে তাতে?

যাজক বললেন, সেকি, আপনি খৃস্টান নন?

হোমা বলল, মাপ করবেন। আমি খৃস্টধর্মকে শ্রদ্ধা করি। এ ধর্ম ক্রীত-দাসদের মুক্তি দেয়, সারা বিশ্বে এক নৈতিক আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা করে।

যাজক বললেন, এটা কিন্তু আসল কথা নয়। সমস্ত শাস্ত্র···

হোমা বলল, শাস্ত্র! যে কোন ইতিহাস বইয়ে দেখুন। সকলেই জানে জেসুইট সে শাস্ত্রবাক্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

চার্লস এসে মৃতের বিছানার কাছে চলে গিয়ে মশারিটা তুলে দিল।

এম্মা ডান পাশ চেপে শুয়ে ছিল। তার খোলা মুখটা একটা কালো গর্তের মত মনে হচ্ছিল। সাদা পাউডারের মত কি একটা জিনিস তার চোখের পাতার উপর ছড়ানো ছিল যার ফলে তার চোখের রেখাগুলো চেনাই যাচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল এক মাকড়শার জাল দিয়ে তার চোখদুটো যেন ঢাকা। তার বুক থেকে পা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। চার্লসএর তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা বিরাট বোঝা এম্মার মৃতদেহের বুকের উপর চাপানো আছে।

চার্চের ঘড়িতে দুটো বাজল। বাগানের ধার ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীটার কলতান শোনা যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর ঘুমন্ত মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েনের নাক

ডাকছিল। আর মঁসিয়ে হোমা পড়তে পড়তে কাগজের উপর কি লিখছিল।

চার্লসএর দিকে একবার তাকিয়ে হোমা বলল, বিছানায় শোবেন যান। শুধু শুধু নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।

চার্লস চলে গেলে হোমা ও যাজকের মধ্যে তর্কটা আবার শুরু হলো। এক জন বলল, ভলতেয়ার পড়ুন।

অন্যজন বলল, হলবাক পড়ুন। বিশ্বকোষ পড়ুন।

একজন বলল, পর্তুগীজ ইহুদীদের লেখা পত্রগুলো পড়ুন।

আর একজন বলল, ভূতপূর্ব শাসনকর্তা নিকোলাসের লেখা খৃস্টধর্মের প্রমাণ বইখানা পড়ল।

তর্ক করতে করতে দুজনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। রাগে লাল হয়ে উঠল দুজনেই। হোমার স্পর্ধায় আঘাত পেলেন বুর্নিসিয়েন। বুর্নিসিয়েনের নির্বুদ্ধিতায় আশ্চর্য হয়ে গেল হোমা। উত্তেজনার বশেই দুজনেই দুজনকে অপমানের কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় চার্লস্ এসে আবার ঘরে ঢুকল। সে কিছুতেই এ ঘর থেকে দূরে থাকতে পারছিল না। কোন এক রহস্যময় কারণ যেন বারবার টেনে আনছিল তাকে এ ঘরের মধ্যে।

চার্লস বিছানার তলার দিকে দাঁড়াল যাতে সে এম্মার দেহটাকে ভাল করে দেখতে পায়। দেখতে দেখতে সে এমন তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে আর কোন ব্যথা বেদনা অনুভূত হচ্ছিল না তার মধ্যে।

মৃতের পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে কত কাহিনী মনে পড়ছিল তার। সে ভাবল যাদুমন্ত্রে অনেক সময় কত মৃত বেঁচে ওঠে। একবার ভাবল সে তার ইচ্ছাশক্তির অত্যধিক নিবিড়তার দ্বারা বাঁচিয়ে তুলতে পারবে এম্মাকে। একবার সে মুখটাকে এম্মার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে খুব নিচু গলায় 'এম্মা এম্মা' বলে ডাকতে লাগল। তার নিঃশ্বাসের আঘাতে বাতির আলোকশিখাগুলো কাঁপতে লাগল জোরে।

পরদিন সকাল হতেই চার্লসএর মা এসে হাজির হলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল চার্লস। হোমার মত চার্লসএর মাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়-বাহুল্য ও আতিশয্য নিয়ে কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করলেন। কিন্তু তাতে এমন রেগে গেল চার্লস যে তিনি চুপ করে গেলেন। চার্লস তাঁকে শহরে পাঠাল দরকারী জিনিসগুলো কিনে আনার জন্য।

সারা বিকেলটা একা একা কাটাল চার্লস। বার্থেকে মাদাম হোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। ফেলিসিতে উপরতলার ঘরে রইল মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে।

সন্ধ্যের সময় গাঁয়ের অনেকেই বাড়িতে এল। যে যখন এল চার্লস প্রতিবার উঠে গিয়ে তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক করমর্দন করল। কিন্তু কোন কথা বলল না। ঘরের জলন্ত আগুনের পাশে তারা সবাই অর্ধবৃত্তাকারে হাঁটু মুড়ে

বসল। সবাই চুপচাপ। মাঝে মাঝে তারা একটা করে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল। অতিথিরা সবাই অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু সৌজন্যের খাতিরে চলে যেতে পারছিল না।

রাত্রি নটার সময় হোমা এল। চার্লসএর মা ও মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া দুজনে মিলে এম্মার মৃতদেহটাকে সাজাতে লাগলেন শেষবারের মত। অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন।

ফেলিসিতে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, হায় গিন্নী-মা। আমার গিন্নীমা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া বলল, দেখ দেখ, এখনো তাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনি উঠে পড়বে বিছানা থেকে।

তারপর তারা এম্মার গলায় মালা পরিয়ে দিল। এম্মার মাথাটা একটু তুলতেই তার মুখ থেকে কালো একটা তরল পদার্থ বমির মত বেরিয়ে এল।

মাদাম লে ফ্রাঁসোয়া হোমাকে লক্ষ্য করে বলল, আমাদের তোমরা সাহায্য করো। না কি তোমরা ভয় পেয়ে গেছ ?

হোমা বলল, ভয়! মনে রাখবে, আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন হাসপাতালে এ ধরনের মৃত্যু কত দেখেছি। আমরা কত শব ব্যবচ্ছেদ করেছি। দার্শনিকদের কাছে মৃত্যু ভয় থাকতে পারে না। আমি প্রায়ই বলি, আমার মৃত্যুর পর আমার দেহটা যেন হাসপাতালে দান করা হয় যাতে তা বিজ্ঞানের সেবায় লাগে।

যাজক এসে মঁসিয়ে বোভারী কেমন আছে তা জিজ্ঞাসা করলেন। হোমার সে কথার উত্তর দিলে তিনি বললেন, উনি এখনো শোকের প্রথম আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

হোমা চার্লসকে বাহবা দিল। কারণ আর পাঁচজন লোক তাদের প্রিয়-তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে যেভাবে যতখানি ভেঙ্গে পড়ে চার্লস ততখানি পড়েনি। হোমা তারপর যাজকদের চরিত্র নিয়ে তর্ক শুরু করল।

হোমা বলল, নারীকে বাদ দিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যাপার। আমরা তাই যাজকদের কত অপরাধের কথা—

বুর্নিসিয়েন চিৎকার করে উঠলেন, রেখে দিন মশাই অপরাধের কথা। যারা বিবাহিত তাদের ক'জন তাদের বৈবাহিক বিশ্বস্ততা বজায় রেখে চলে? স্বীকারোক্তির কথা বলতে নেই তাই।

হোমা স্বীকারোক্তির কথাটাকেই আক্রমণ করল। বুর্নিসিয়েন এ প্রথার সপক্ষে জোরাল যুক্তি দেখাতে লাগলেন। তিনি বললেন স্বীকারোক্তির ফলে অন্তরের পরিশুদ্ধি ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। তিনি অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেন কত চোর স্বীকারোক্তির ফলে সৎ হয়ে গেছে। কত সৈনিক অনুতাপের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়েছে। ফিয়বুর্গের এক মন্ত্রী…

এদিকে বুর্নিসিয়েনের সঙ্গী অর্থাৎ হোমা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বুর্নিসিয়েন দেখলেন, ঘরের হাওয়াটা ভারী হয়ে উঠেছে, তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তাই তিনি একটা জানালা খুলে দিলেন। জানালা খোলার শব্দে হোমা জেগে উঠল।

যাজক তাকে বললেন, এক টিপ নস্যি নাও: মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। দূরে কোথায় একটানা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছিল।

হোমা যাজককে বলল, কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছেন?

যাজক বললেন, লোকে বলে, কুকুরেরা মৃত্যুর গন্ধ পায়। ওরা মৌমাছির মত কেউ মরলেই চাক ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

হোমা এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলল না। কারণ সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে যাজক বুর্নিসিয়েন কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার ঠোঁট শুধু নড়ে উঠল আর একটা অস্ফুট শব্দ হলো। তাঁর থুতনিটা বুকের উপর ঢলে পড়ল। কালো মোটা বইটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

ওরা দুজন দুদিকে বসেছিল। দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল মৃতের জন্য রাত জাগতে এসে। তাদের পেট দেখা যাচ্ছিল। মুখগুলো ফোলা ফোলা দেখাচ্ছিল। নাক ডাকছিল। অনেক তর্কবিতর্ক ও বাক্‌যুদ্ধের পর এই মানবিক দুর্বলতার ক্ষেত্রে তারা দুজনেই এক হয়ে একযোগে একই কাজ করে চলেছে। যে মৃতদেহটিকে তারা পাহারা দিতে এসেছিল সেই মৃতদেহের থেকে তাদের দেহ দুটো খুব একটা বেশী নড়ছিল না।

ঘরে জলন্ত কি সব গাছগাছড়ার ওষধি পুড়ছিল। সেই আগুন থেকে একরাশ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে জানালার কাছে বেরিয়ে যাবার জন্য জমা হচ্ছিল। ওদিকে খোলা জানালাটার বাইরে একরাশ কুয়াশা জমেছিল।

আকাশে অল্প কিছু তারা দেখা যাচ্ছিল। রাত্রিটা দারুণ ঠাণ্ডা। চার্লস এসে ঘরে ঢুকলেও হোমারের ঘুম ভাঙল না।

বিছানার ধারে মৃতের মাথার দিকে যে বাতি দুটো জলছিল তার থেকে গলা মোমের বড় বড় ফোঁটা পড়ছিল বিছানার উপর। চার্লস একদৃষ্টিতে জলন্ত বাতির হলুদ আভার দিকে তাকিয়ে ছিল। এম্মাকে শেষবারের মত দেখতে এসেছে সে এ ঘরে। কিন্তু শুভ্রধবল জ্যোৎস্নার আলোর মত সাদা ধবধবে সাটিনের চকচকে পোষাকে ঢাকা এম্মার দেহটাকে দেখাই যাচ্ছিল না। এম্মার দেহটা যেন গলে গিয়ে মিশে গিয়েছিল চারদিকের প্রকৃতির সঙ্গে। নিশীথ নীরব রাত্রির নিঃশব্দ অন্ধকার, প্রবহমান বাতাস, শিশির ও কুয়াশা ভেজা পৃথিবীর মাটির সোঁদা গন্ধ—এই সব কিছুর মধ্যে যেন ছড়িয়ে আছে এম্মা।

হঠাৎ তন্দ্রাহত চার্লসএর মনে হলো সে যেন তোস্তের বাগানে কাঁটাঝোপের পাশে এম্মাকে দেখতে পাচ্ছে। আবার তার মনে হলো এম্মা রয়েছে রুয়েনের রাজপথে অথবা তার বাবার খামারবাড়িতে। তাদের বিয়ের দিনটার কথাও মনে পড়ল। মনে হলো ও স্পষ্ট দেখছে আপেলগাছের তলায় ছেলেরা আনন্দে নাচছে। ওদের বাসর ঘরটা এম্মার চুলের গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে। ওর হাতে এম্মার পোষাকের আঁচলটা খসখস করছে ঠিক উড়ন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের শব্দের মত।

চার্লস সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। অতীত সুখের অসংখ্য স্মৃতিকথা একের পর এক করে মনে পড়তে লাগল তার। এম্মার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, তার কণ্ঠস্বর সব অবিকল মনে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কূলপ্লাবী জলস্রোতের মত হতাশার অসংখ্য উদ্বেল ঢেউ একের পর এক করে আঘাত হানতে লাগল তার মনে।

সহসা একটা ভয়ঙ্কর কৌতূহল পেয়ে বসল চার্লসকে। সে তার ডান হাতের একটা আঙুলের ডগা দিয়ে এম্মার মুখের কাপড়টা একবার সরিয়ে কি দেখে নিল। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে হোমা ও যাজক দুজনেই জেগে উঠল। তখন তারা চার্লসকে ধরে আবার একতলার বৈঠকখানায় নিয়ে গেল।

ফেলিসিতে একসময় এসে হোমাকে বলল, মঁসিয়ে তার স্ত্রীর দুগাছি চুল চাইছে।

হোমা বলল, কাঁচি দিয়ে কেটে নাও।

কিন্তু ফেলিসিতে তা কাটতে সাহস পেল না।

হোমা তখন নিজে এগিয়ে গেল কাঁচি হাতে। কিন্তু হোমার হাতটা এমনভাবে কাঁপছিল যে কাঁচির ডগাটা এম্মার কপালে ক'জায়গায় লেগে গেল। পরে হোমা নিজেকে শক্ত করে কাঁচিটা এম্মার মাথায় দুজায়গায় তাড়াতাড়ি একরকম চোখ বন্ধ করে চালিয়ে দিয়ে দুগোছা চুল কেটে মাথার দুটো জায়গা সাদা করে দিল।

হোমা ও যাজক আবার তাদের পাহারা দেওয়ার কাজে মন দিল। আবার তারা আগের মতই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঝিমোতে লাগল। অথচ যখনি তাদের দুজনের একজন জেগে উঠছিল তখনি অপরজনকে দোষ দিচ্ছিল ঘুমিয়ে পড়ার জন্য। জেগে উঠেই মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েন পবিত্র জল ছড়াচ্ছিলেন ঘরময় আর হোমা ছড়াচ্ছিল তার সঙ্গে করে আনা কিছু ক্লোরিন।

ফেলিসিতে এক সময় টেবিলের উপর কিছু খাবার ও ব্রাণ্ডি দিয়ে যায় ওদের জন্য। ভোর চারটে বাজতেই হোমা আর থাকতে পারল না। বলল, এবার কিছু খাওয়া দরকার।

যাজককে একবার ডাকতেই তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। তিনি একবার

বাইরে গিয়ে কোনরকমে প্রার্থনার কাজটা সেরে নিয়েই ফিরে এসে খেতে লেগে গেলেন। খাবার সময় ওদের মুখ নাড়ার শব্দ হতে লাগল। গ্লাসের ঠুংঠাং আওয়াজ হলো। দীর্ঘ কষ্টভোগের পর তৃপ্তির সঙ্গে কিছু খাবার সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত অনির্দেশ্য আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের মুখচোখ। গ্লাসের শেষ ব্রাণ্ডিটুকু শেষ করে যাজক হোমার পিঠ চাপড়ে বললেন, এবার থেকে আমরা বন্ধু হয়ে উঠব দুজনে।

ওরা নিচে যেতেই দেখল কফিন আঁটার লোকজন এসে গেছে। দুটি ঘণ্টা ধরে একটানা হাতুড়ি ঠোকার শব্দে পীড়িত হতে লাগল চার্লসএর মন। তিনটি কফিনের মধ্যে ওক কাঠের কফিনটিতে করে এম্মার মৃতদেহটাকে নামানো হলো উপর থেকে। বাকি দুটি কফিনের মধ্যে থাকবে এই কফিনটি। কফিন আঁটার কাজ শেষ হলে কালো কাপড়ে ঢেকে কাঁধের উপর তা চাপানো হলো। গাঁয়ের লোক সব জড়ো হয়ে দেখতে লাগল।

এমন সময় মঁসিয়ে রুয়ালত্ এসে পড়লেন। খামারের কাছে এসে শোক-সূচক কালো কাপড় দেখেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি।

১০

মঁসিয়ে রুয়ালতের দোষ নেই। তাঁকে হোমা যে চিঠি লেখে সে চিঠি তিনি সময়ে পান নি, পেয়েছিলেন ঘটনা ঘটার ছত্রিশ ঘণ্টা পরে। তার উপর হোমা তাঁর অনুভূতিতে আঘাত দেবার ভয়ে চিঠিখানা এমন কায়দা করে লেখে যে সে চিঠি পড়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারেন নি। অবশ্য তাতে দুর্ঘটনার কথাটা ছিল, কিন্তু মৃত্যুর কথাটা স্পষ্ট করে লেখা ছিল না।

তাই চিঠি পড়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে যান রুয়ালত্। কিন্তু পরে উঠে তাঁর মনে হয় এম্মা হয়ত বেঁচে আছে। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়ায় করে রওনা হন। ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। কিন্তু এক অব্যক্ত অন্তর্বেদনায় তার বুকটা এমন ভারী হয়ে যায় যে পথে একবার তাকে নামতে হয় ঘোড়া থেকে। তিনি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না; কানে কি সব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর চেতনা হারিয়ে ফেলবেন।

সকাল হতে তিনি পথের ধারে একটা গাছে তিনটে মুরগীকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেন। এটা কুলক্ষণ। তিনি মেরির কাছে মানত করেন। তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হলে তিনি চার্চে মেরির পুজো দেবেন। আর তাঁদের গাঁয়ের গীর্জা থেকে ভাসেনভিলের গীর্জায় পায়ে হেঁটে যাবেন।

পথে নিজেকে বারবার বোঝাতে থাকেন মঁসিয়ে রুডলফ্, তাঁর মেয়ে নিশ্চয় বেঁচে আছে। ডাক্তাররা নিশ্চয় এর একটা প্রতিকার বার করবে। তাছাড়া তিনি লোকমুখে শুনেছেন কত কঠিন ও দুরারোগ্য রোগের রোগী ঐন্দ্রজালিক ভাবে বেঁচে উঠেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো পথের উপর তাঁর সামনে এম্মা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে মড়ার মত। তিনি লাগাম ধরে ঘোড়াটা থামিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই অদ্ভুত দৃশ্য।

তারপর তাঁর মনে হলো এ চিঠির ঠিকানা ভুল হতে পারে। হয়ত অন্য কোন ভদ্রলোকের মেয়ে। তাঁর নামটা ঠিকানাটা ভুল লেখা হয়েছে। তাছাড়া এমন হতে পারে, আসলে ঘটনাটা মিথ্যা বানানো, সাজানো। আসলে তাঁকে কোন কারণে কাছে পেতে চায় এজন্য এই দুর্ঘটনার কথা সাজিয়ে লেখা হয়েছে। তাঁর মেয়ে নিশ্চয়ই মরেনি। তার মৃত্যু হলে তিনি নিশ্চয় জানতে পারতেন। কিন্তু না—প্রকৃতি যেখানে যেমন ছিল তেমনিই আছে। গাঁয়ের মাঠ ঘাট সব ঠিক আছে, আকাশ নীল, সবুজ গাছে গাছে তেমনি হাওয়া উঠেছে, একপাল ভেড়া সামনের রাস্তাটা পার হয়ে গেল।

ইয়নভিল গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখল। তারপর তাঁর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখলেন বোভারী তাঁকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার মেয়ে এম্মা কোথায়। আমাকে তা বল। বল সে কোথায়।···

চার্লস ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি জানি না। আমি তা জানি না। এ এক অভিশাপ।

হোমা তাঁদের দুজনকে সরিয়ে দিল। বলল, সে পরে সব বলবে। এখন লোক আসছে। এখন সৌজন্যের খাতিরে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বলল, দার্শনিকের মত এটা সহজ ভাবে গ্রহণ করুন।

চার্লস কথাটার প্রতিধ্বনি করে বলল, হ্যাঁ, সাহস অবলম্বন করুন,—মনটা শক্ত করুন।

বৃদ্ধ রুয়ালত্ বললেন, ঠিক আছে, আমি সাহস অবলম্বন করব। আমি তার কাছেই চিরদিন একসঙ্গে থাকব। আমাকেও কবর দাও।

চার্চে ঘণ্টা বাজছিল। সব ঠিকঠাক। এবার শোভাযাত্রা শুরু করতে হবে।

শোভাযাত্রা এগিয়ে যেতে লাগল সমাধিভূমির দিকে। যাজক বুর্নিসিয়েন কর্কশ কণ্ঠে শবযাত্রার গান গাইছিলেন। লেস্তিবুদয় তার জিনিসপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল কবরখানায়।

চার্লস এবার অনেকটা শান্ত হলো। মনটা আধ্যাত্মিক ভাবে ভরে তুলল। সে নিজেকে বোঝাল পরলোকে তার সঙ্গে আবার মিলন ঘটবে। আবার একবার ভাবল এম্মা দূরে কোথাও বেড়াতে গেছে। কিন্তু আবার যখন ভাবল এই কফিনের মধ্যেই আছে এবং তার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে এবং এখনই তাকে সমাহিত করা হবে তখন প্রচণ্ড অথচ নিষ্ফল এক ক্রোধের আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মন। সে ক্রোধের আবেগ তার আসল বস্তুকে না পেয়ে অন্তর্মুখী

হয়ে নিজেকেই আক্রমণ করল। নিজেকে কাপুরুষ বলে অভিশাপ দিতে লাগল চার্লস।

এমন সময় চার্চের অন্য এক প্রান্ত হতে পাথরের পথের উপর কাঠের পা ঠুকে ঠুকে হিপ্পোলিতে এসে হাজির হলো। এর পর শুরু হলো সমবেত প্রার্থনা। চার্লসএর মনে পড়ল তাদের বিয়ের সময় তারা দুজনে এমনি এক সমবেত প্রার্থনায় যোগদান করেছিল। তারা তখন দেওয়ালের গা ঘেঁষে বসেছিল দুজনে।

সমবেত প্রার্থনা হয়ে যেতেই শবাধার উঠিয়ে নেওয়া হলো। সকলে চার্চ ছেড়ে চলে গেল।

শবযাত্রীরা এগিয়ে চলল। অগ্রসরমান শবযাত্রা দেখার জন্য অনেকে দরজা ও জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। অনেকে এসে যোগদান করল। চার্লস পুরোভাগে চলছিল। পরিচিত কেউ কাছে এসে ঘাড় নেড়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল তাকে।

শবযাত্রার সামনে ছিল মেয়েরা। তাদের পরনে ছিল কালো পোষাক, হাতে জ্বলন্ত মোটা মোটা বাতি। তারপর দুদিকে তিনজন করে শবাধার বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ছিল যাজকগণ ও গায়করা। তারা গাইছিল 'দ্য প্রোফাণ্ডিস্'। তাদের গানের সুরটা ওঠানামা করছিল প্রায়ই। সে গানের ধ্বনি ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ছিল গাঁয়ের শেষে দু পাশের মাঠময়। এই শবযাত্রার মাঝে ফাঁকা মাঠ দিয়ে চলতে চলতে চার্লসএর মনটা কিছুটা পরিবর্তন হলো। সমবেত প্রার্থনার ছন্দান্বিত সুরলহরী, জ্বলন্ত বাতির আলো, ধূপ ও ফুলের ক্রমবিলীয়মান গন্ধ এই সব কিছুর দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েছিল ও। ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল মাঠে। পথের ধারে দুপাশের চষা জমিতে যবের সবুজ চারা বেরিয়েছিল। পথের ধারের কাঁটাঝোপে শিশিরের ফোঁটাগুলো চকচক করছিল। অদূরে পথের উপর চলমান চাকার শব্দ, মোরগ ও আপেল গাছের তলায় ঘোড়ার বাচ্চার ডাক প্রভৃতি চারদিকে যে সব শব্দ হচ্ছিল সে সব শব্দই আনন্দে উচ্ছল। নীল আকাশে ছিল গোলাপী মেঘের আভা। আইরিস লতায় ঢাকা খড়ের কুঁড়েগুলো থেকে বেরিয়ে আসছিল নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি খামার চেনা চার্লসএর। এ পথ দিয়ে কতবার সে রোগী দেখতে গেছে। রোগী দেখে বাড়ি ফিরে এম্মাকে দেখে কত শান্তি পেয়েছে।

কালো জমির উপর সূচীশিল্পখচিত যে কাপড়টি শবাধারটি আচ্ছাদন করে ছিল সেই কাপড়টি বাতাসে উড়ছিল আর কফিনটি তার তলায় দেখা যাচ্ছিল। ক্লান্ত অবসন্ন শববাহীরা তাদের গতি শ্লথ করে দিয়েছিল। আর শবাধারটি তরঙ্গতাড়িত নৌকোর মত দুলছিল।

অবশেষে তারা সমাধিভূমিতে পৌছল। যেখানে কবর খোঁড়া হয়েছিল

তার পাশে গিয়ে শবাধারটি নামানো হলো। কবরের ধারে কাটা মাটিগুলো জড়ো করে রাখা হয়েছিল। কফিনের চারদিকে দড়িগুলো ঠিকমত খাটানো হলে কবরের মধ্যে কফিনটি নামানো হলো। চার্লস শান্তভাবে তা দেখল। শান্ত হয়ে সে হয়ত বোঝার চেষ্টা করছিল যা হবার সব শেষ হয়ে গেছে।

এইবার কবরে মাটি দেবার পালা। যাজক বুর্নিসিয়েন লেস্তিবুদয়ের কাছ থেকে কোদালটা নিয়ে এত জোর শব্দ করে এক কোদাল মাটি কেটে কবরের মধ্যে দিলেন যাতে মনে হলো সেই দুরন্ত সর্বধ্বংসী শব্দটা অনন্তের গর্ত থেকে উঠে আসছে।

যাজক এবার পবিত্র জলের পাত্রটি তাঁর পাশের লোকের হাতে দিয়ে দিলেন। সে লোকটি হলো হোমা। হোমা আবার সে পাত্রটি চার্লসকে দিল। চার্লস তখন কবরের উপর চাপা দেওয়া মাটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন মাটিতে মিশে যেতে চাইছিল। তাকে ধরে উঠিয়ে দেওয়া হলো। অবশেষে সে হাতে করে একমুঠো মাটি কবরে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, বিদায় প্রিয়তমা।

এবার কিছুটা শান্ত হলো চার্লস।

ফেরার পথে পাইপ ধরিয়ে খেতে লাগল রুয়ালত্। এটা কিন্তু খারাপ লাগল হোমার। সে আরও দেখল বিনেট দল থেকে কোথায় সরে পড়েছে। মঁসিয়ে তুভাশে প্রার্থনার পরই চলে গেছেন। তুভাশের চাকর থিওডোর কালো কোটের পরিবর্তে একটা নীল কোট পরেছে। এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি সে সহ্য করতে পারছিল না। সে একে একে সকলের কাছে এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্বন্ধে তার ক্ষোভের কথা বলছিল। কিন্তু সকলেই তখন এম্মার মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছিল। লেহুড়ে খুব বেশী দুঃখ করছিল। সে শবযাত্রায় যোগদান করতে পারেনি।

হোমা বলল, গত শনিবার আমার দোকানে ওঁকে দেখেছি। কী ভাল মেয়েই না উনি ছিলেন। আমার হাতে সময় থাকলে আমি সমাধির পাশে পড়ার জন্য একটা বক্তৃতা লিখে ফেলতাম।

বাড়িতে ফিরে এসে চার্লস শবযাত্রার পোষাকটা ছেড়ে ফেলল। মঁসিয়ে রুয়ালত্ পরনের পোষাকটা ছেড়ে নতুন একটা নীল কোট পরলেন। আসার সময় সারা পথ উনি কেঁদেছেন। অনবরত কান্নাকাটি ও মূর্ছিত হওয়ার জন্য তাঁর পরনের কোটটা নোংরা হয়ে যায়।

বাড়িতে ফিরে ওরা তিনজন বসল এক জায়গায়—চার্লস, তার মা আর মঁসিয়ে রুয়ালত্।

মঁসিয়ে রুয়ালত্ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চার্লসকে বললেন, তোমার প্রথম স্ত্রী যখন মারা যায় তখন একদিন তোস্তে গিয়ে তোমাকে সান্ত্বনা দিই। কিন্তু আজ…

রুয়ালতের বুকটা ওঠানামা করছিল। তিনি বললেন, আজ আমার সব

শেষ হয়ে গেল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে হারাই। তারপর আমার ছেলে। আজ আমার মেয়ে। আর আমার কেউ রইল না।

মঁসিয়ে রুয়ালত্ সেই মুহূর্তেই তাঁর লে বার্তোর খামারে চলে যেতে চাইলেন। তিনি বললেন এ বাড়িতে তিনি রাত্রিবাস করতে পারবেন না। তাঁর ঘুম হবে না। এমন কি তিনি তাঁর নাতনিকে পর্যন্ত একবার দেখতে চাইলেন না। তিনি চার্লসকে বললেন, এতে আমি আরো কষ্ট পাব। তার চেয়ে বরং ওকে আমার তরফ থেকে একটা বড় চুম্বন দান করো। তুমি মানুষ হিসাবে ভাল। আমি তোমার কথা মনে রাখব।

মঁসিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেলেন। পাহাড়ের উপর গিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। এম্মা বেঁচে থাকতে যখন একবার এসেছিলেন তখনও যাবার সময় এমনি করে পাহাড় থেকে পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সেই অস্তগতপ্রায় সূর্যের শেষ রশ্মিতে আলোকিত হয়ে উঠছিল ইয়নভিলের প্রতিটি জানালা। তিনি হাত দিয়ে চোখদুটোকে তির্যক সূর্যরশ্মি থেকে আড়াল করছিলেন। তখন দূর দিগন্তে গাছগুলোর মাথায় ঘন হয়ে উঠছিল গোধূলির ছায়া। আবার যাত্রা শুরু করলেন মঁসিয়ে রুয়ালত্।

ক্লান্ত হলেও সেদিন চার্লস ও তার মা রাত পর্যন্ত বসে বসে অনেক কথা বলতে লাগলেন। তাঁরা প্রথমে অতীত সুখের দিনের কিছু কথা বললেন আপন আপন স্মৃতি থেকে। তারপর চার্লসএর মা ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা বললেন। তিনি বললেন এবার থেকে তিনি ইয়নভিলের বাড়িতেই থাকবেন। এখানকার ঘর সংসারের সব কিছু দেখাশোনা করবেন। মনে মনে এক পরম সন্তোষ ও এক সূক্ষ্ম আনন্দ অনুভব করছিলেন তিনি। এতদিন ধরে যে অবাঞ্ছিত অপরিহার্য শক্তি মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে আসছিল সে শক্তি আজ অপসারিত হয়েছে চিরতরে। তিনি আবার তাঁর হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন।

রাত নিশুতি হয়ে উঠেছে। গাঁয়ের সব লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। একা চার্লস শুধু জেগে জেগে তার স্ত্রীর কথা ভাবছে।

ওদিকে রুডলফ্ সারাদিন বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে রুয়েন শহরে লাঁয়ও ঘুমোচ্ছে গভীরভাবে।

কিন্তু চার্লস ছাড়া আর একজনের ঘুম ছিল না সে রাতে। আর একজন জেগে ছিল। ফার গাছের তলায় এম্মার সমাধির পাশে এক তরুণ যুবক নতজানু হয়ে অন্ধকারে কাঁদছিল। চাঁদের আলোর মত স্নিগ্ধ অথচ নিশীথ রাত্রির মত গভীর এক দুঃখে পরিপ্লাবিত হয়ে উঠেছিল তার অন্তর। লেস্তিবুদয় তার কোদাল ফেলে গিয়েছিল; তাই তার কোদালটা নিতে এসে সে জাস্টিনকে চিনতে পারল। লেস্তিবুদয় কিন্তু জাস্টিনের দুঃখের কথাটা বুঝল না। সে শুধু একটা কথাই বুঝল। বুঝল এতদিন ধরে কে তার আলু চুরি করে আসছে।

১১

পরদিন বার্থেকে বাড়িতে নিয়ে এল চার্লস। বার্থে তার মার খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু তাকে বলা হলো তার মা দূর দেশে বেড়াতে গেছে। পরে আসবে। প্রথম দিনকতক খুব খোঁজ করার পরে শান্ত হলো সে। ক্রমে ভুলে গেল মাকে। উৎফুল্ল হয়ে উঠল আবার। তার এই উৎফুল্লতায় বিরক্ত হয়ে উঠল চার্লস।

টাকার চাপটা নতুন করে দেখা দিল। লেহুড়ে ভিনেপার্তকে দিয়ে আবার চাপ দেওয়া করাতে লাগল। ফলে চার্লসকে আবার মোটা মোটা টাকার ঋণপত্রে সই করতে হলো। কিন্তু সে কোনমতেই এম্মার কোন আসবাবপত্র বিক্রি করতে রাজী হলো না। এতে রাগ করে তার মা বাড়ি থেকে চলে গেলেন একদিন।

এরপর অনেকে টাকার জন্য চাপ দিতে লাগল। মাদমোজেল তেলপুরের কাছে এম্মা কোনদিন পিয়ানো বাজনা না শিখলেও সে বেতনের জন্য চাপ দিতে লাগল চার্লসএর উপর। যে গ্রন্থাগার থেকে বই নিত এম্মা তার মালিক তিন বছরের চাঁদা চাইলেন। ধাত্রী মাদাম রোলেত কুড়িটা চিঠির স্ট্যাম্প খরচ চাইল। চার্লস তাকে এ ব্যাপারে কারণ জানতে চাইলে সে বলল এই সব চিঠি কোথায় কাকে পাঠানো হয়েছে তা সে জানে না।

এই সব দেনা চার্লস সব একে একে মেটাল। ভাবল এই শেষ। কিন্তু একটা দেনা শোধ করতেই আর একটা দেনার তাগাদা শুরু হয়।

ফেলিসিতে আজকাল এম্মার পোষাকগুলো পরে। সব নয়। এম্মার কিছু পোষাক চার্লস তার ঘরে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে দেখে সেগুলো। বাকি কিছু ফেলিসিতেকে দিয়েছে পরার জন্য। বাড়ি ঢুকে ফেলিসিতেকে দেখে এম্মা বলে ভুল হয়।

এই ফেলিসিতে একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে থিওডোরের সঙ্গে পালিয়ে গেল। তার সঙ্গে হাতের সামনে পাওয়া কিছু জিনিসপত্রও চুরি করে নিয়ে গেল।

ঠিক এমন সময়ে একদিন লীয়ঁর মা একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন চার্লসকে। লীয়ঁর বিয়ে হচ্ছে বন্দেভিলের মাদমোজেল লিওকাদি লেবুফের সঙ্গে।

চার্লস তার উত্তরে একখানি চিঠিতে লিখল, 'আজ তাঁর স্ত্রী থাকলে এ সংবাদে খুশি হতেন।'

একদিন চার্লস বাড়িতে ইতস্ততঃ এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে চিলের ছাদে চলে গেল। সেখানে এক টুকরো কাগজ দেখতে পেয়ে তা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগল। তাতে লেখা আছে, 'আমি তোমার জীবনকে কোনমতেই সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে পারি না।' এটা রুডলফের লেখা চিঠির একটা অংশ।

চিঠিটা বাক্স থেকে কোন রকমে পড়ে গিয়েছিল। রুডলফের নামটা চিঠির শেষে স্পষ্ট করে গোটাটা লেখা ছিল না। শুধু লেখা ছিল, 'আর' এই অক্ষরটা। তবু শুধু রুডলফের কথাটাই মনে পড়ল চার্লসএর। এম্মার প্রতি রুডলফের আগ্রহ, তার হঠাৎ অন্তর্ধান, চার্লসএর সামনে তার বিব্রত ভাব—সব মিলিয়ে তার সন্দেহকে বাড়িয়ে দিল। তবে চিঠিখানা বেশ সম্ভ্রম সহকারে লেখা। তাই চার্লসএর মনে হলো ওরা পরস্পরকে ভালবাসলেও সে ভালবাসা ছিল আত্মিক, ভাবগত।

যাই হোক, এ ব্যাপারের গভীরে যেতে চাইল না চার্লস। কোন ব্যাপারেই সে মূল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায় না। তাছাড়া শোকে দুঃখে মন তার এখনো ভরে আছে। তাই হাতের কাছে প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও তার সব ঈর্ষাবোধ শোক দুঃখের গভীরে তলিয়ে গেল।

চার্লস ভাবল, তার স্ত্রীকে সকলেই শ্রদ্ধা করত। যারাই দেখত তারাই তাকে পেতে চাইত। সকলেই তাকে ভালবাসত। তার বহুবাঞ্ছিতা স্ত্রী সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিল বলেই তার প্রতি দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল চার্লসএর ভালবাসা। প্রচণ্ড হয়ে উঠল এম্মার প্রতি তার আসক্তি। আর এই আসক্তির ক্রমবর্ধমান নিবিড়তা তার হতাশার অগ্নিশিখাটাকে বাড়িয়ে দিতে লাগল দিনে দিনে।

আজকাল চার্লসএর মনে হয় যেন এম্মা আজও বেঁচে আছে এবং এম্মা যা যা চাইত তা করে তাকে খুশি করার চেষ্টা করে। এম্মা তাকে যে জুতো যে পোষাক পরতে বলত এখন তাই পরতে লাগল সে। মোচে রং দিল। তার মত ঋণপত্র সই করতে লাগল। কবরে গিয়েও সেখান থেকে চার্লসকে দুর্নীতির পথে নিয়ে যেতে লাগল এম্মা।

বাড়িতে যা রূপো ছিল তা টুকরো টুকরো করে বিক্রী করল চার্লস। তারপর বৈঠকখানার আসবাসপত্র বিক্রি করে দিল। কিন্তু অন্যান্য সব ঘরের আসবাব সব বিক্রি করে দিলেও এম্মার ঘরের একটি জিনিসও বিক্রি করল না। সে ঘরে যেখানে যা ছিল আগের মত সব তা রয়ে গেল। সে ঘরে রোজ একবার করে গিয়ে বসত চার্লস। আগুনের কাছে গোল টেবিলটা আর এম্মার আর্মচেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর বসে থাকত। সেখানে বাতি জ্বলত আর বার্থে রং দিয়ে ছবি আঁকত।

বার্থেকে দেখে সত্যিই কষ্ট হত চার্লসএর। তার জুতোয় ফিতে নেই। জামাটা ছেঁড়া। তাছাড়া তার জামা ঠিকমত পরিষ্কার করা হয় না। কিন্তু মেয়েটা বড় শান্ত। তার চুলগুলো প্রায়ই গালের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং সেইভাবে সে যখন ঘাড় নাড়ে তখন তাকে খুব ভাল লাগে। তবে তাকে দেখে আনন্দ পেলেও সে আনন্দের মধ্যে একটা তিক্ততা মিশে থাকে।

আজকাল চার্লস নিজেই বার্থের খেলাগুলো ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে গেলে মেরামৎ

করে দেয়। তার কাপড়ের পুতুলের পেটটা ছিঁড়ে গেলে সে নিজে সেলাই করে দেয়। মাঝে মাঝে কোন কিছু কাটা ফাটা বা ছেঁড়া দেখতে পেলেই চার্লসএর মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে আর তার সেই বিষাদ দেখে বার্থেও বিষণ্ণ হয়ে যায়।

আজকাল চার্লসএর বাড়ি দিয়ে বড় কেউ আসে না। জাস্টিন রুয়েনে গিয়ে একটা মুদীর দোকানে চাকরি নিয়েছে। হোমার ছেলেরা বার্থের সঙ্গে খেলে না। মঁসিয়ে হোমা নিজেও আসে না এ বাড়ি দিয়ে। সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে সে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না এ বাড়ির সঙ্গে।

এ দিকে হোমা সেই অন্ধ ভিখারিটার চোখ সারাবার জন্য যে ওষুধ দিয়েছিল উপযাচক হয়ে সে ওষুধে কোন কাজ না হওয়ায় আবার সে সেই বয় গিলম পাহাড়ে ফিরে গেছে। আবার সে তেমনি করে ভিক্ষে করে যাত্রীদের কাছে এবং হোমার ব্যর্থতার কথা সকলকে ধরে ধরে বলে। হোমা যেদিন শহরে যায় সেদিন হিরণদেলের পর্দার আড়ালে মুখটা লুকিয়ে রাখে যাতে সেই অন্ধের সঙ্গে তার দেখা না হয়।

এবার থেকে হোমা সেই অন্ধ ভিখারিটার বিরুদ্ধে রীতিমত ঠাণ্ডা লড়াই শুরু করে দিল। সে রুয়েনের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ লিখে পাঠাতে লাগল এবং তা প্রকাশিত হতে লাগল। একবার হোমা মিথ্যা করে লিখল, বয় গিলম পাহাড়ের উপর কোন গাড়ি উঠলেই বিকৃত মুখবিশিষ্ট একটা লোক যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে পয়সা আদায় করে। এ যেন এক ধরনের কর। আমরা কি মধ্য যুগে বাস করছি?

আর একবার হোমা লিখল বড় শহরগুলোর ঢোকবার মুখে ভিখারিরা বড় জ্বালাতন করে। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ কি করছে?

আর একবার হোমা লিখে পাঠাল অমুক দিন একটা অন্ধ ভিক্ষুকের জন্য একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে বয় গিলম পাহাড়ে।

এই সব লেখার ফলে সেই অন্ধ ভিখারিকে একবার পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়। কিন্তু হোমা আবার লেখালেখি করায় অবশেষে কর্তৃপক্ষ সেই অন্ধকে একটা আশ্রমে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেয়।

এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হোমা যখনি কোন দুর্ঘটনা ঘটত, বিশেষ করে যাজক সম্প্রদায়ের কারো কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখত তখনি সে পত্র পত্রিকায় তার কথা প্রকাশ করত। তার ফলে যাজকরা তাকে ভয় করত।

হোমা এবার পত্র পত্রিকায় সংবাদ পাঠানোর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে ইয়নভিলের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটা বই লেখার কাজ শুরু করল। এই সময় সে এম্মার সমাধিস্তম্ভ কি রকম হবে তা নিজেও চিন্তা করতে লাগল। তার নানারকম উদ্ভট পরিকল্পনার কথা বলল চার্লসকে। কিন্তু চার্লসএর তা পছন্দ না হওয়ায় সে হোমা ও একজন শিল্পীকে সঙ্গে করে রুয়েনের এক সমাধিস্তম্ভ বিশারদের কাছে গেল নমুনা দেখার জন্য। অবশেষে একটা নমুনা পছন্দ

করল চার্লস। সমাধির দুদিকে দুটো মূর্তি দুটো নির্বাপিত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। সমাধির উপর কি লেখা হবে তা হোমা ঠিক করে দিল। লেখা হবে—'amnibilem conjugem calcas.'

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা ক্রমশই এম্মাকে ভুলে যেতে লাগল চার্লস। সে দেখল তার শত চেষ্টাতেও তার স্মৃতিকে আর জাগিয়ে রাখতে পারছে না মনের মধ্যে। অবশ্য রাত্রিকালে রোজ একবার করে স্বপ্ন দেখে চার্লস। স্বপ্ন দেখে এম্মার দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে আলিঙ্গন করতে গেলেই তার চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

এম্মার মৃত্যুর পর প্রথম প্রথম রোজ সন্ধ্যেবেলায় চার্চে যেত চার্লস। মঁসিয়ে বুর্নিসিয়েনও রোজ দু তিনবার চার্লসএর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু পরে তিনি আসা বন্ধ করে দিলেন। আসল কথা বুর্নিসিয়েন আধুনিক কালের সব কিছুই বিতৃষ্ণার চোখে দেখেন। তিনি কোন যুক্তির কথা সহ্য করতে পারেন না। এক পক্ষকাল অন্তর তিনি তাঁর নীতি উপদেশ প্রচার করার সময় আধুনিক যুগ ও ভলতেয়ারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার না করে ছাড়বেন না।

সংসার খরচ যথেষ্ট কমিয়ে দিলেও ঋণ শোধ করতে পারল না চার্লস। লেহুড়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এবার সে টাকা চায়। আর ঋণপত্রে সই করলে চলবে না।

নিরুপায় হয়ে চার্লস টাকার জন্য মার কাছে লিখল। মা জানালেন তিনি তাঁর বাড়িটা অগত্যা বন্ধক রেখে টাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে সে চিঠিতে তিনি এম্মার বিরুদ্ধে নানারকম নিন্দা করে তার শালটার জন্য অনুরোধ করলেন। ফেলিসিতে অন্য সব জিনিস চুরি করে নিয়ে যাবার সময় এই শালটা ফেলে যায়। কিন্তু ওটা এম্মার ব্যবহার্য ও একান্ত প্রিয় জিনিস বলে চার্লস ওটা দিতে চাইল না। তাতে চার্লসএর মা রেগে গেলেন।

এর পর চার্লসএর মা বার্থেকে চাইলেন। বললেন বার্থে তাঁর কাছে থাকলে তাঁর অনেক উপকার হবে। তাকে সাহায্য করতে পারবে নানা বিষয়ে। প্রথমে চার্লস মত দিল। কিন্তু পাঠাবার সময় বার্থেকে ছেড়ে দিতে পারল না চার্লস। সুতরাং মাতা-পুত্রে আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

একে একে অন্য সব বন্ধন ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে বার্থের প্রতি চার্লসএর টানটা বেড়ে গেল। বার্থে কাশত যখন তখন, গা হাত ময়লা করত। নানা ভাবে তাকে বিরক্ত করে তুলত। তবু চার্লস তাকে দারুণ ভালবাসত।

এদিকে সারা গাঁয়ের মধ্যে হোমা পরিবারটা দিনে দিনে ফুলে উঠতে লাগল সুখে সমৃদ্ধিতে। শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতা নয়, সন্তানভাগ্যেও সুখী হোমা। তার বড় ছেলে নেপোলিয়ন তাকে লেবরেটারীতে সাহায্য করে। ছোট ছেলে ফ্রাঙ্কলিন পড়ে। সে নামতা মুখস্থ করতে শিখেছে। দুই মেয়ে এ্যাথেলি ও ইর্মা

সূচীশিল্প ও ঘর সংসারের কাজকর্ম সব শিখে গেছে।

হোমা আজকাল সরকারী উপাধি 'লিজিয়ন অফ অনার'-এ ভূষিত হতে চায়। তার কারণও অবশ্য খাড়া করে রেখেছে। প্রথমতঃ একবার যখন দেশে কলেরা হয় তখন সে ব্যবসাগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে গিয়ে এক বেসরকারী মমতা ও মানবতার বশে বহু লোকের উপকার সাধন করে। তারপর সে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে জনগণের নানারকম অভাব অভিযোগের প্রতিকার সাধন করে। সে গাঁয়ের পরিসংখ্যানের উপর একটা বই লিখেছে। তার উপর সে নানা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। অথচ সে মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানেরই সদস্য ছিল।

একদিন চার্লসএর কি মনে হলো এম্মার ড্রয়ারের চাবি খুলে তার লেখা চিঠি সব খুলে দেখল। দেখল সেখানে লীয়ঁর লেখা অনেক চিঠি রয়েছে। আর একটি জায়গায় সে রুডলফের একটা ছবি ও তার অনেক চিঠি পেল।

এই সব পড়ে পাগলের মত হয়ে গেল চার্লস। সে বাইরে বেরোন একেবারে ছেড়ে দিল। বাড়িতে কেউ এলেও কারো সঙ্গে দেখা করত না। ডাক্তারি করাও ছেড়ে দিল। চুল দাড়ি পর্যন্ত কামাত না। শুধু মেয়েকে বিকালের দিকে একবার কবরখানায় নিয়ে যেত আর সন্ধ্যে হলে ফিরে আসত।

মনের কথা কাউকে বলতে পেত না, তার দুঃখের অংশ নেবার কেউ ছিল না বলে তার দুঃখ আরো বেড়ে যেতে লাগল। এক একদিন মাদাম লে ফ্রাঁসোয়ার কাছে গল্প করতে যেত চার্লস। কিন্তু চার্লসএর কোন কথা শোনার মত অবকাশ ছিল না লে ফ্রাঁসোয়ার। আজকাল মঁসিয়ে লেহুড়ে একটা যাত্রীবাহী গাড়ি করেছে শহরে যাবার। সুদক্ষ চালক হিসাবে নাম করে হিভার্ত বেশী মাইনে চাইছে লে ফ্রাঁসোয়ার কাছে। না দিলে অন্যত্র চলে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছে।

একদিন আর্গুয়েলের বাজারে একটা ঘোড়া কিনতে গিয়েছিল চার্লস। হঠাৎ রুডলফের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে সে একটা কাফেতে কিছু বীয়ার খাবার জন্য নিয়ে গেল চার্লসকে।

রুডলফের উল্টো দিকে বসল চার্লস। এম্মার প্রেমাস্পদকে দেখে এম্মার কথা সব মনে পড়ল। তার মনে হলো সে যেন এম্মার এক প্রিয়বস্তুকে দেখছে তার চোখের সামনে। সে যদি তার মত হতে পারত।

হঠাৎ চার্লসএর মুখখানা কেমন হয়ে গেল। তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। নাসারন্ধ্রগুলো বিস্ফারিত হলো। ঠোঁটগুলো কাঁপতে লাগল। রুডলফ্ ভয় পেয়ে গেল সে মুখ দেখে। ভাবল চার্লস হয়ত কিছু অপ্রিয় কথা বলবে।

কিন্তু শেষকালে দেখা গেল চার্লস বিশেষ কিছুই বলল না। শুধু বলল, না, আমি এর জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দায়ী করি না। সব ভাগ্যের দোষ।

দিন বিকালে চার্লস তার বাগানবাড়িতে বসে ছিল একা একা।

অপরাহ্নের শেষ কয়েকটা রশ্মি এসে পড়েছিল বাগানের মধ্যে। তার মাঝে আঙুর গাছের ছায়াগুলো কাঁপছিল। আকাশটা একেবারে নীল। বাতাসে ভেসে আসছিল যুঁই ফুলের গন্ধ। হঠাৎ প্রেমের অনেক অতীত স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল চার্লসএর। আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তার সারা অন্তর।

সন্ধ্যে সাতটার সময় বার্থে এল তার খোঁজে। সে বিকাল থেকে তার বাবাকে দেখতে পায়নি। সে প্রথমে হাত দিয়ে নাড়া দিতে লাগল চার্লসকে। ডাকতে লাগল 'বাবা' 'বাবা' বলে। সাড়া না পেয়ে ভাবল চার্লস রসিকতা করছে। পরে জোরে একবার ঠেলা দিতেই চার্লস মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দেখা গেল চার্লস মৃত।

হোমা খবর দিতে অনেক পরে ডাক্তার ক্যানিভার এল। কিন্তু এসে দেখল সব শেষ হয়ে গেছে।

দেনার দায়ে বাড়ির সব আসবাব ও জিনিসপত্র বিক্রি করে দেখা গেল মাত্র বার ফ্রাঁ অবশিষ্ট আছে। এই বারো ফ্রাঁ গাড়িভাড়া হিসাবে খরচ করে বার্থে তার ঠাকুরমার কাছে চলে গেল। এক বছর পর চার্লসএর মাও মারা গেলেন। তখন দেখা গেল মঁসিয়ে রুয়ালত্ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে আছেন। তখন বার্থেকে তার এক দূর সম্পর্কের পিসির কাছে পাঠানো হলো। পিসির অবস্থা খুব খারাপ বলে বার্থেকে এক সুতোকলে কাজ করতে যেতে হল।

চার্লসএর পর ইয়নভিলে এসেছিল দুজন ডাক্তার। কিন্তু এখন যেই আসুক তাকে হোমার মন যুগিয়ে চলতে হয়। কারণ হোমা এখন সরকারী 'লিজিয়ন অফ অনার' পেয়ে গেছে। তাছাড়া জনমত তার দিকে।

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কাঁদিদ
অথবা
আশাবাদী

CANDIDE
Or, The
OPTIMIST

ডক্টর র‍্যালফের জার্মানী ভাষায় লিখিত কাহিনী থেকে নেওয়া। তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছে ডক্টরের পকেট থেকে পাওয়া কিছু টুকরো টুকরো লিপি থেকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে র‍্যালফ ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে মিনডেন-এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছিলেন।

পরিচ্ছেদ —১

ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি দুর্গে মানুষ হয়েছিল কাঁদিদ; তারপরে, একদিন সে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

ওয়েস্টফালিয়ার একটি দুর্গ। দুর্গাধিপতি ছিলেন থানডার-টেন-ট্রনকের মহিমান্বিত ব্যারন। সেইখানে একটি যুবক বাস করত। প্রকৃতি তাকে স্বভাবটি দিয়েছিলেন বড় সুন্দর। তার মনের চেহারা মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছিল। যুবকটি ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। অত সরল মানুষ সেযুগে এক রকম ছিল না বললেই হয়। সেই নির্ভেজাল সরলতার সঙ্গে ছিল তার বিচার করার দক্ষতা। সে-দক্ষতা প্রধান মানুষদের মত একোরে নিখুঁৎ। যত দূর মনে হয়, এই যুবকটির নাম ছিল কাঁদিদ। এ-বাড়ির পুরানো চাকরবাকরদের ধারণা, সে হচ্ছে ব্যারনের বোনের ছেলে। ছেলেটির বাবা বলে যাঁকে তাদের সন্দেহ হতো তিনি ছিলেন বিরাট একটি ভদ্রলোক। পাশাপাশি অঞ্চলেই বাস করতেন তিনি। যুবতীটি, অর্থাৎ, কাঁদিদের মা, যে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেছিলেন তার কারণ হচ্ছে তিন কুড়ি এগার জন পূর্বপুরুষদের তালিকার বেশী কোন তালিকা যুবকটি তাঁর কাছে পেশ করতে পারেন নি। তাঁর বংশবৃক্ষের বাকি অংশটুকু মহাকালের করালগ্রাসে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ওয়েস্টফালিয়ার ব্যারন ছিলেন মহাপ্রতাপান্বিত জমিদার। তাঁর দুর্গের কেবল একটা দরজাই ছিল না; ছিল সাতটা জানালা। তাঁর যে বিরাট একটি হল-ঘর ছিল তার দরজার ওপরে টাঙানো থাকতো একটা পর্দা। গ্রেহাউণ্ড নিয়ে তিনি শিকার করতে বেরোতেন না। শিকার করার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন ঝুলন্ত কান-ওয়ালা কদাকার চেহারার বিরাট বিরাট কুকুর আর ঝলঝলে কান-ওয়ালা লোমে ঢাকা ছোট এক রকমের কুকুর। তাঁর সহিসরা শিকারীর কাজ করত, আর স্থানীয় গীর্জার যাজক ছিলেন সাহায্যদানের সরকারী কর্মচারী। তাঁর প্রজারা তাঁকে সম্বোধন করতেন 'মি লাড্' বলে। এমন একটা গল্পও তিনি বলতেন না যা শুনলে লোকে হেসে কুটি-কুটি না হতো। আড়ালে-আবডালে মানুষ যে তাঁকে কিছুটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ না করত একথাও একেবারে সত্যি নয়।

ব্যারনের পত্নী পরম শ্রদ্ধেয়া ব্যারনেস। তাঁর ওজন ছিল সাড়ে তিনশ' পাউণ্ড। এ থেকেই বুঝতে পারছেন তিনিও বড় একটা কেউকেটা ছিলেন না। তাছাড়া, তাঁর সারা সত্তায় এমন একটা সম্ভ্রান্ত আভিজাত্য মাখানো ছিল, চলনে-বলনে এমন একটা উঁচু মানের পরিচয় তিনি দিতেন যাতে সবাই তাঁকে

শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হতো। তাঁর মেয়ের নাম কুঁনিগুঁ। বয়স সতেরর কাছাকাছি—পূর্ণ যুবতী। রঙটি তাজা, শান্তশিষ্ট, মাংসল, হৃষ্টপুষ্ট, গোলগাল, পুরুষরা তাকে একটি আকাঙ্ক্ষার বস্তু বলে মনে করে। ব্যারনের যুবক পুত্রটি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্যানগ্লস ছিলেন গৃহশিক্ষক। এই পরিবারে তাঁর ছিল অখণ্ড প্রতাপ। সবাই তাঁর কথাকে দৈববাণী বলে মনে করতেন। বয়স আর চরিত্রধর্ম অনুযায়ী বাচ্চা কাঁদিদ প্যানগ্লসের সমস্ত শিক্ষা সহজ আর সরল ভাবেই শুনে যেত।

শিক্ষক প্যানগ্লস ছিলেন একেবারে পাণ্ডিত্যের জাহাজ। দর্শনশাস্ত্র থেকে সুরু করে ধর্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব কী যে তিনি শিক্ষা দিতেন না তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাঁর শিক্ষার কথা শুনে সকলের তাক লেগে যেত। তিনি প্রমাণ করতে পারতেন যে কারণ না থাকলে কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। তিনি বলতেন, এই পৃথিবীটাই হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; আর সেই সৃষ্টির মধ্যে ব্যারনের দুর্গটি সব চেয়ে সুন্দর এবং অভিজাত; আর 'আমার লেডী' হচ্ছেন বিশ্বের সমস্ত ব্যারন-পত্নীদের মুকুটমণি।

তিনি বললেন—'বস্তু যা রয়েছে তা থেকে সে যে অন্য কিছু হতে পার না তা প্রমাণ করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়; কারণ, সব জিনিসই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন; সেই জন্যে সেই উদ্দেশ্যগুলি সর্বোৎকৃষ্ট না হয়ে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নাকের কথা ধরা যাক। ঈশ্বর নাক সৃষ্টি করেছেন কেন? করেছেন, চশমা পরার জন্যে। সেই জন্যেই আমরা চশমা পরি। পা যে মোজা পরার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্য আমরা মোজা পরি। পাথর তৈরি হয়েছে কাটা আর দুর্গা তৈরি করার জন্যে; সেই জন্যেই আমাদের মহিমান্বিত ব্যারন এমন চমৎকার দুর্গ তৈরি করাতে পেরেছেন। কারণ, এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ব্যারন, তাঁর আবাসস্থলও সেই রকম শ্রেষ্ঠ হওয়া উচিৎ। শুয়োরের জন্ম হয়েছে খাওয়ার জন্যে; সেই জন্যেই, সারা বছর ধরে আমরা শুয়োরের মাংস ভক্ষন করি। যারা বলে, ঈশ্বর যা করেছেন তা ঠিক, তারা নির্ভুলভাবে নিজেদের ভাবটা প্রকাশ করতে পারে না। তাদের বলা উচিৎ, ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাই সর্বোৎকৃষ্ট।'

এই সব উপদেশ কাঁদিদ বেশ মন দিয়েই শুনলো, বিশ্বাসও করল সত্য বলে; কারণ কুমারী ব্যারন-কন্যাকে তার বেশ আকর্ষণীয়াই মনে হয়েছিল, যদিও সেই কথাটা তার সামনে বলার মত সাহস কোনদিন তার হয় নি। ফলে সে এই উপসংহারে এল যে থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারন হওয়ার সৌভাগ্য যখন তার হয় নি, তখন তার পক্ষে মিস কুঁনিগুঁ হতে পারলে ভাল হতো; তাও যখন সম্ভব নয়, তখন তাকে প্রতিদিন দেখার আনন্দ পেলে মন্দ

হতো না ; সেটাও যখন সম্ভব হচ্ছে না তখন গুরু প্যানগ্লসের মতবাদ শোনাই ভাল কারণ, সারা অঞ্চলে প্যানগ্লসই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, আর সেই জন্যে সারা বিশ্বেরও।

একদিন কুমারী কুঁনিগুঁ পাশাপাশি ছোট একটি বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই বনটিকে বলা হতো পার্ক'। ঝোপের মধ্যে দিয়ে সে দেখলো, বিজ্ঞ পণ্ডিত প্যানগ্লস তার মায়ের পরিচারিকাকে প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছে। পরিচারিকাটির রঙ কটা, খুবই চটুলা, আর চেহারাটিও তার খুবই খুবসুরৎ। মিস কুঁনিগুঁর মনটা ছিল বৈজ্ঞানিক; বিশেষ করে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের দিকে তার 'ঝোঁকটা ছিল খুবই প্রবল। তাই তার চোখের সামনে পণ্ডিত দার্শনিক প্যানগ্লস প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের যে পরীক্ষা বারবার করছিলেন সেইটিকে সে অভূতপূর্ব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। কার্য আর কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্যানগ্লস যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তার শক্তি যে কত এবার সে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলো। কোন কিছুই আর ঝাপসা রইলো না তার কাছে। মনের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য নিয়ে সে ফিরে গেল। মনটা তার খুবই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠলো তার হৃদয়। যুবক কাঁদিদের কথা মনে হল তার। ভাবলো, সে আর যুবক কাঁদিদ, দুজনেরই দুজনের প্রতি আকর্ষণ জমার যথেষ্ট কারণ থাকাটা বিচিত্র নয়।

ফেরার পথে অকস্মাৎ কাঁদিদের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সে লজ্জা পেল; লজ্জা পেল কাঁদিদও। দুজনেরই গাল লালিম হয়ে উঠলো। স্খলিত কণ্ঠে কুঁনিগুঁ তাকে বলল—সুপ্রভাত। কাঁদিদও তাকে প্রতি-অভিনন্দন জানিয়েছিল; কিন্তু কী বলেছিল সেকথা তার মনে ছিল না। পরের দিন ডিনার শেষ হওয়ার পরে দুজনেই টেবিল থেকে উঠে পড়লো; তারপরে, সকলের অলক্ষে তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। কুঁনিগুঁ তার রুমালটা ফেলে দিল; কাঁদিদ কুড়িয়ে নিল সেটা। নিরপরাধ মনে কুঁনিগুঁ তার হাতটা ধরলো; আর কাঁদিদও নিষ্পাপ মনে গভীর আবেগে, সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এবং বিশেষ সুচারু ভঙ্গিমায় তার হাতে চুম খেলো। তার প্রতিটি আবেদন ছিল অপরূপ, অথবা অভূতপূর্ব। দুজনেরই ওষ্ঠাধর মিলিত হল। চকচক করে উঠলো চারটি চোখ; কাঁপতে লাগলো চারটি জানু, ছড়িয়ে পড়লো চারটি হাত; কী ধরবে, কাকে ধরবে বুঝতে পারলো না কিছুই, ঠিক এমনি সময় থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারন সেই দিকে আসছিলেন। কার্য আর কারণের সম্পর্কটা কী, দাঁড়িয়ে একটু দেখলেন তিনি; তারপরেই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁদিদের তলপেটে কয়েকটি বেশ উল্লেখযোগ্য লাথি মেরে তাকে অভিনন্দন জানালেন তিনি; তারপরে তাকে দুর্গের বাইরে বার করে দিলেন। মিস কুঁনিগুঁ সেইখানেই মূর্ছা গেল। মূর্ছা

ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যারনেস তার কানের ওপরে বসিয়ে দিলেন কয়েকটা ঘুষি। তারপরে সেই সব চেয়ে সুন্দর এবং আরামদায়ক দুর্গের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো একটা কী হল, কী হল ভাব।

পরিচ্ছেদ—২

বুলগেরিয়ানদের হাতে পড়ে কাঁদিদের কী হল

এইভাবে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে, অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালো কাঁদিদ। কোথায় যাচ্ছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে বুঝতে না পেরে সামনের দিকে এগিয়ে চলল সে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে উপরের দিকে তাকালো। চোখ দুটি তার জলে ভরে গেল। যে অপরূপ দুর্গে তার অপরূপ যুবতী ব্যারনকন্যা রয়েছে সেই দিকে মাঝে মাঝে সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে চাইলো। ভগ্নহৃদয়ে অনাহারে একটা মাঠের আলের ওপরে ঘুমানোর জন্যে সে শুয়ে পড়লো। ঝাঁকে-ঝাঁকে বরফ পড়লো তার ওপরে। সকালে ঘুম ভাঙলো। দেখলো, ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে তার। আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকলেই সে মারা যেত। তাই সে উঠে পড়লো; তারপরে, হামাগুঁড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে পাশের শহরে এসে সে হাজির হল। শহরটির নাম ওয়াল্ডবারগফ-ট্রারবকডিকড্রফ। পকেটে তার তখন একটি পয়সাও ছিল না। ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে সে তখন অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়েছে। একটা সরাইখানার সামনে গিয়ে সে দাঁড়ালো। বেশীক্ষণ সেখানে সে দাঁড়ায় নি; এমন সময় নীল পোশাক-পরা দুটি লোক এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

একজন আর একজনকে বলল—সত্যি বলছি কমরেড, ওই যে যুবকটিকে দেখছো ও সত্যিই সুঠাম, স্বাস্থ্যবান; আর মাপটাও মানানসই।

তারপরে, তারা কাঁদিদের কাছে হাজির হয়ে যথেষ্ট ভদ্র আর নম্রভাবে তাকে তাদের সঙ্গে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালো।

মিষ্টি করে বিনীতভাবে কাঁদিদ তাদের বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, নিমন্ত্রণ করে আপনারা আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছেন। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার কাছে কোন টাকা নেই।

নীল পোশাক-পরা দুটি লোকের মধ্যে একজন বলল—টাকার কথা বলছেন স্যার! টাকা! আপনার মত সুঠাম চেহারার আর বুদ্ধিমান যুবকের কিছু খরচ করার দরকার হয় না। কী বলছেন, স্যার! আপনার উচ্চতা কি পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি নয়?

ঘাড়টা একটু নুইয়ে সে বলল—হ্যাঁ, ভদ্রমোহদয়গণ, আপনারা ঠিকই

বলেছেন। আমার উচ্চতা ওই।

তারা বলল—তাহলে, আসুন; আমাদের সঙ্গে খাবেন চলুন। আপনার খাওয়ার টাকা তো আপনাকে দিতে দেবই না; উপরন্তু আপনার মত চতুর যুবকের টাকার অভাব হবে এও আমরা হতে দেব না। পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যেই তো মানুষের জন্ম হয়েছিল।

কাঁদিদ বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। আমাদের গুরু প্যানগ্লসও ঠিক এই কথাই বলেন। আর সব কিছুর পরিণাম যে সর্বোৎকৃষ্ট সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই।

তারপরে, তার সেই উদার সঙ্গীরা কিছু স্বর্ণমুদ্রা নেওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ করল। সেগুলি কালবিলম্ব না করেই সে গ্রহণ করল; সেই সঙ্গে তাদের একটা হ্যাণ্ডনোট দেওয়ার প্রস্তাবও সে দিল। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করল। তারপরে সবাই মিলে খেতে বসলো টেবিলে।

—আচ্ছা, আপনার কি কোন কিছুর উপর প্রবল প্রীতি নেই—

সে বলল—আছে, আছে; নিশ্চয় আছে। সুন্দরী মিস কুঁনিগুঁর ওপরে আমার আকর্ষণ ভীষণ রয়েছে।

তাদের একজন বলল—তা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তা নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করছি বলুগেরিয়ার রাজার প্রতি আপনার কি কোন প্রীতি নেই? মানে, বেশ বড় রকমের?

কাঁদিদ বলল—কার ওপরে? বুলগেরিয়ার রাজার ওপরে? না না—তা থাকবে কেন! জীবনে তাঁকে আমি কোন দিন দেখিই নি।

এ-ও কি সম্ভব! তিনি হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে মনোহর রাজা! আসুন, সবাই মিলে তাঁর আমরা স্বাস্থ্য কামনায় মদ খাই।

কাঁদিদ বলল—সর্বান্তকরণে, ভদ্রমহোদয়গণ!

এই বলে মদের পেয়ালাটা সে গলার মধ্যে উজাড় করে দিল।

নীল পোশাকধারী দুটি লোক চমৎকৃত হয়ে বলল—ব্র্যাভো! এখন আপনিই হচ্ছেন বুলগেরিয়ার সাহায্যকারী, রক্ষাকর্তা, আর বীরযোদ্ধা। আপনার কপাল ফিরেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার দিকে মুখ তুলে হেসেছেন। এবার আপনি গৌরব অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছেন।

এই বলে শেকল দিয়ে বেঁধে তারা তাকে তাদের ব্যারাকে নিয়ে হাজির হল। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ডান-বাঁ করানো হল। একেই মিলিটারী পরিভাষায় বলা হয় কুচকাওয়াজ অর্থাৎ প্যারেড। কেবল ডান-বাঁ, আর বাঁ-ডান। বারুদগাদা শিক হাতে দেওয়া হল। সেই শিক নিয়ে সে বন্দুকের নলের মধ্যে একবার করে ঢোকায় আর একবার করে তোলে। তারপরে, তারা তাকে দিয়ে গুলি ছোঁড়ালো, মার্চ করালো। তারপরে দিল তিরিশটি বেত্রাঘাত। পরের দিন, প্যারেডটা সে একটু ভালভাবেই করল। ফলে,

বেত্রাঘাতের সংখ্যা নামলো কুড়িতে। পরের দিন, সেটা কমে এল দশে। তার সহকর্মীরা মন্তব্য করল এমন অদ্ভুত ধী-সম্পন্ন যুবক জীবনে তারা খুবই কম দেখেছে, দেখে নি বললেই হয়।

কাঁদিদ তো অবাক, একেবারে হতভম্ব! সে যে কেমন করে একজন বীরপুরুষ হয়ে উঠলো তা সে ভাবতেই পারলো না। এক বসন্তকালের প্রভাতে হঠাৎ তার মনে হল একটু বেড়িয়ে আসি। মনে হতেই সে সোজা বেরিয়ে গেল; ভাবলো, যেমন করে ইচ্ছে আর যখন ইচ্ছে পা দুটির সদ্ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার মানুষের রয়েছে, রয়েছে বন্য অসভ্য জন্তুদেরও। মাইল ছয়েকও সে হাঁটে নি, এমন সময় ছজন বীরপুরুষ তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ছ ফুট লম্বা তারা—পালোয়ান। তার গলা আর গোড়ালিকে শিকল দিয়ে বেঁধে. তারা তাকে একটা কারাগারে নিক্ষেপ করল। সামরিক আদালতের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে বলা হল, তার সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে: একটি হচ্ছে, তাকে সমস্ত বাহিনীর মধ্যে ছত্রিশবার ছুটে যেতে হবে আর আসতে হবে; আর সেই সময় সামরিক বিচার অনুসারে যে কোন সেনানী তাকে বেত, কিল, ঘুষি যা ইচ্ছে তাই মারতে পারবে। অথবা, বন্দুক ছুঁড়ে তার মাথার খুলিটি উড়িয়ে দেওয়া হবে। এই দুটির মধ্যে কোন্ পথ সে বেছে নেবে? প্রতিবাদ জানালো কাঁদিদ। সে বলল, মানুষের চিন্তা হচ্ছে স্বাধীন; আর সেই স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সে কোনটাই বেছে নিতে রাজি নয়। কিন্তু সেকথা আদালত শুনতে রাজি হল না। একটা পথ তাকে বেছে নিতেই হবে। সুতরাং স্বর্গীয় সেই স্বাধীন ইচ্ছার বলে সে প্রথম পথটাই বেছে নিল। দু বার সে ছুটে গেল আর ফিরে এল। তারপরে, আর সে পারলো না। বাহিনীতে সৈন্য ছিল প্রায় দশ হাজার। সুতরাং, এই যাওয়া আর আসায় তার ঘাড়ের ওপরে পড়লো প্রায় চার হাজার বেত। ঘাড় থেকে পাছা পর্যন্ত মাংস কেটে তার সব হাড় বেরিয়ে পড়লো। তারা যখন তৃতীয়বার মহড়া নেওয়ার জন্যে তাকে তালিম দিতে লাগলো তখন আমাদের এই যুবক বীরটি আর তাতে রাজি হল না। সে তাদের অনুরোধ জানালো তারা যেন দয়া করে তার মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেয়। এই দয়া তাকে দেখানো হল। তারা তার চোখ দুটো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল; তারপরে, তাকে নতজানু হয়ে বসালো। ঠিক সেই সময় বুলগেরিয়ার মহারাজ হঠাৎ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অপরাধী কী অপরাধ করেছে জানতে চাইলেন তিনি। এই রাজকুমারের অন্তর্দৃষ্টি ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। কাঁদিদের সম্বন্ধে তিনি যা শুনলেন তাতেই তিনি বুঝতে পারলেন যে কাঁদিদ একটি দার্শনিক যুবক। সংসারের জ্ঞান তার নেই বললেই হয়। তাঁর সহজাত দয়ার্দ্র চরিত্রের জন্য তিনি তার অপরাধ ক্ষমা করলেন। এই সৎ কাজের জন্যে প্রতিটি পত্রিকায় এবং প্রতি যুগে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। দায়োস-করিজের আবিষ্কার করা এক রকম মলমের সাহায্যে একজন দক্ষ শল্যবিদ

কাঁদিদকে তিন সপ্তাহে সুস্থ করে তুললেন। তার ক্ষতগুলি শুকিয়ে গিয়ে চামড়া দেখা গেল। তারপরে সে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারলো। ঠিক এই সময় বুলগেরিয়ার রাজা অ্যাবারেপের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

পরিচ্ছেদ—৩

বুলগেরিয়ানদের কাছ থেকে কাঁদিদ কী করে পালিয়ে গেল ; এবং তারপর

অনবদ্য! অপরূপ! এত বীরত্ব, এত সামরিক সাজশয্যা, এমন সুষ্ঠু সৈন্যবিন্যাস—এই দুটি বিবদমান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যা দেখা গেল এমনটি আর কোথাও দেখা যায় নি। তূরী-ভেরি, বাঁশী-সানাই, ঢাক-কামান—সব মিলে এমন একটি কর্ণতৃপ্তির মহাসঙ্গীতের সৃষ্টি যুদ্ধক্ষেত্রে হয়েছিল তেমনটি নরকেও শোনা যেত না। উৎসব শুরু হল কামান দাগার সঙ্গে-সঙ্গে। মুহূর্তের মধ্যে প্রতিটি দলে ছ'হাজার করে লোক মা ধরিত্রীর কোলে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই পৃথিবীতে যে সব বদমাইশের দল মাছির মত ভন্‌ভন্‌ করছিল, বন্দুকের গুলি তাদের মধ্যে নয় থেকে দশ হাজার লোককে পরলোকের পথে উড়িয়ে দিল। তারপরে সামনে এগিয়ে এল সঙ্গীনের ঝাঁক। তাতেও খতম হল কয়েক হাজার। হতাহতের সংখ্যা ত্রিশ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো। দার্শনিকের মত কাঁপতে লাগলো কাঁদিদ ; এই বীরত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সময় যতটা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রাখলো সে।

অবশেষে একদিন, দুটি দেশের দুটি রাজা ঈশ্বরের স্তোত্র গাইবার জন্যে নিজেদের তাঁবুতে ব্যবস্থা করালেন। সেই সুযোগে কাঁদিদ দৃঢ় সংকল্প করল যে সে পালিয়ে যাবে, এবং অন্য কোথাও গিয়ে কার্য আর কারণের মধ্যে যে গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে সেটাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করবে। রাশি রাশি মৃত আর মরণোন্মুখ মানুষের ওপর দিয়ে হেঁটে প্রথম যেখানে সে উপস্থিত হল সেটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রেরই একটি পাশাপাশি গ্রাম ; জায়গাটা অ্যাবারিয়েন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে বুলগেরিয়ানরা সেই গ্রামটিকে পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে দিয়েছে। সেখানে কয়েকজন বৃদ্ধ লোক আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। তারা তাকিয়ে রয়েছে তাদের মৃতপ্রায় স্ত্রীদের দিকে ; তাদের স্ত্রীদের গলা কাটা ; তারা শিশুদের বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। তাদের বুক রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি যুবতী পড়ে রয়েছে ; তাদের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে গিয়েছে। বুলগেরিয়ান বীর যোদ্ধারা তাদের প্রাকৃতিক আকাঙ্খা মেটানোর পরে সেই সব যুবতীদের পেট এফাল-ওফাল করে হত্যা করেছে। বাকি সকলের দেহ আধপোড়া অবস্থায়

পড়ে রয়েছে। এই পৃথিবী থেকে কেউ যদি তাদের সরিয়ে দেয় এই জন্যে করুণভাবে সকলের কাছে প্রার্থনা করছে তারা। তাদের চারপাশে মাটিতে ছড়ানো রয়েছে মড়ার মাথা, মড়া মানুষের হাত আর পা।

যত তাড়াতাড়ি পারে, কাঁদিদ সেখান থেকে চলে গেল; উপস্থিত হল বুলগেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি গ্রামে। সেখানেও সেই একই রকম করুণ দৃশ্য। এখানে যে কর্মযজ্ঞ হয়েছে তার হোতা হচ্ছে অ্যাবারেস বীর যোদ্ধারা। সেই মৃদু সঞ্চালিত মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর দিয়ে হেঁটে, অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির ভিতর দিয়ে অবশেষে সে যেখানে এসে পৌছলো সে জায়গাটা যুদ্ধসীমানার বাইরে। ছোট একটি থলির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ খাবার আর হৃদয়ের মধ্যে মিস কুঁনিগুঁর ছবি—এই সম্বল করে সে হেঁটে চলল। হল্যাণ্ডে পৌছানোর সঙ্গে-সঙ্গে তার খাবার গেল শেষ হয়ে। সে শুনেছিল সেখানকার মানুষেরা সব ধনী, খ্রীস্টের ওপরে তাদের বিশ্বাস অচল, এই শুনে সে নিশ্চিত হয়েছিল যে মিস কুঁনিগুঁর উজ্জ্বল চোখের চাহনির কবলে পড়ে ব্যারনের দুর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে সেখানে যেমন সে ভূরিভোজন করত এখানেও সে ঠিক তেমনি সমাদরই পাবে।

পথে কয়েকটি গম্ভীর চেহারার লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তাদের কাছে সে কিছু সাহায্য চাইলো। তাদের মধ্যে সবাই তাকে বলল সে যদি এইভাবে ব্যবসা করতে থাকে তাহলে তারা তাকে 'শুদ্ধিকরণ গৃহে' পাঠিয়ে দেবে। কী ভাবে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় সেইখানে তাকে শিক্ষা দেওয়া হবে।

তারপরে সে আর একটি মানুষের শরণাপন্ন হল। মানুষটি ঘণ্টাখানেক ধরে দানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিরাট একটি জনসমাবেশে একঘণ্টা ধরে বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তাটি চওড়া টুপীর নিচে থেকে তাঁর ক্ষুদে-ক্ষুদে দুটি চোখ বার করে তার দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকালেন; তারপরে বেশ কঠোর ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—কী ব্যাপার হে? কোন ভাল কাজের জন্যে এসেছ?

বেশ বিনীত ভাবেই কাঁদিদ বলল—স্যার, আমার ধারণা, কোন কারণ ছাড়া কোন কাজ সংগঠিত হতে পারে না। সব জিনিসই শিকলের আংটা দিয়ে আঁটা; এবং তা কেবল ভালোর জন্যে নয়, সবচেয়ে ভালোর জন্যে। মিস কুঁনিগুঁর কাছ থেকে যে আমাকে নির্বাসিত হতে হবে তারও প্রয়োজন ছিল। সৈন্যবাহিনীর বেত খাওয়ার জন্য আমাকে যে ঘোড়দৌড় করতে হবে তারও প্রয়োজনীয়তা ছিল। যতদিন না স্বাধীন ভাবে রোজগার করতে পারি ততদিন আমাকে ভিক্ষে করতে হবে, তার পেছনেও প্রয়োজনীয় কোন কারণ রয়েছে। এ সমস্তই ঈশ্বরের বিধান। এসব জিনিস অন্যভাবে ঘটতে পারত না।

বক্তাটি বললেন—বন্ধু, শোন। তুমি কি পোপকে খ্রীস্টবিদ্বেষী বলতে চাও?

কাঁদিদ বলল—সত্যি বলতে কি তেমন কোন সংবাদ আমার কানে আসে নি। কিন্তু তিনি খ্রীস্টবিদ্বেষী হন, বা না হন, বর্তমানে আমার কিছু খাবার চাই।

বক্তাটি বললেন—পান আর ভোজন কোনটা পাওয়ারই যোগ্য তুমি নও। তুমি একটা হতভাগ্য বাউণ্ডুলে! দূর হও! আমার কাছ থেকে সরে যাও। বেঁচে থাকতে আমার কাছে আর তুমি আসবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বক্তাটির স্ত্রী হঠাৎ জানালার ভেতর দিয়ে তাঁর মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন। তারপরে, পোপ খ্রীস্টবিদ্বেষী কিনা এ বিষয়ে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছে সেই লোকটিকে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটা গামলা তার মাথার ওপরে উজাড় করে দিলেন। গামলায় ছিল—। হা ঈশ্বর! ধর্মের বিষয়ে গোড়ামি মহিলাদের কত দূরেই না টেনে নিয়ে যায়।

সেইখানে জেমস নামে একজন অ্যানাব্যাপটিস্ট ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কোন দিনই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন নি। একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, দ্বিপদ, পক্ষহীন তাঁরই স্বগোত্র একটি মানুষের ওপরে এই ঘৃণ্য আর নির্মম অত্যাচার তিনি দেখলেন। দয়াপরবশ হয়ে তিনি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাকে পরিষ্কার করলেন, খেতে দিলেন , সেই সঙ্গে দিলেন দুটি মুদ্রা, সেই সঙ্গে প্রস্তাব দিলেন যে তাকে তিনি তাঁদের নিজের ব্যবসা শেখাবেন। হল্যাণ্ডে তৈরি পারশীয়ান সিল্ক বোনাই ছিল তাঁর ব্যবসা। এই শুনে কাঁদিদ তাঁর পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—গুরু প্যানগ্লস আমাকে যে সত্যি কথাই বলেছেন এখন আমি তা ভালভাবেই বুঝতে পারছি। তিনি বলেছিলেন, এ পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই ভালোর জন্যেই, কারণ, ওই কালো পোশাক-পরা ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রীর হাতে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করে আমি যত কষ্ট পেয়েছি তার চেয়েও অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছি আপনার বদান্যতা দেখে।

পরের দিন কাঁদিদ বাইরে বেড়াচ্ছিল এমন সময় একটা ভিক্ষুককে সে দেখতে পেল। ভিক্ষুকটির গোটা গা খোস-পাঁচড়ায় ভর্তি। তার চোখ দুটি মাথার খুলির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তার নাকের ডগাটা কে যেন খেয়ে ফেলেছে। তার মুখটা গেছে একদিকে বেঁকে। তার দাঁতগুলো কয়লার মত কালো, জোরে জোরে হাঁচছে আর কাশছে লোকটি। থুথু ফেলার যতবারই সে চেষ্টা করছে ততবারই একটা করে দাঁত খুলে পড়ে যাচ্ছে।

পরিচ্ছেদ—৪

পুরানো দার্শনিক শিক্ষককে কাঁদিদ কেমন করে খুঁজে পেল। তাদের কী হল ?

করুণা এবং ভীতিতে দ্বিধাবিভক্ত হল কাঁদিদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করুণাই জয়ী হল তার। সাধু অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমস তাকে যে দুটি মুদ্রা দিয়েছিলেন সে দুটি সে সেই কদাকার লোকটিকে দিয়ে দিল। সেই ছায়া-মূর্তিটি তার দিকে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই তাকিয়ে দেখলো। তারপরে, কাঁদতে-কাঁদতে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার গলাটা। ভয়ে অভিভূত হয়ে গেল কাঁদিদ।

একজন হতভাগ্য আর একজন হতভাগ্যকে বলল—একী কাণ্ড! তোমার প্রিয় প্যানগ্লসকে চিনতে পারছো না ?

কাঁদিদ অবাক হয়ে বলল—কী শুনলাম! আপনিই আমার সেই প্রিয় গুরু! আপনার এই অবস্থা হয়েছে? কী ভয়ানক দুর্ভাগ্য আপনাকে গ্রাস করেছে? সেই অপরূপ আর আনন্দময় দুর্গ পরিত্যাগ করে এখানে এসেছেন কেন? যুবতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মিস কুঁনিগুঁর খবর কী ?

প্যানগ্লস বললেন—হা ঈশ্বর! এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে আমি দাঁড়াতে পারছি নে।

এই শুনে কাঁদিদ তাঁকে তৎক্ষণাৎ অ্যানাব্যাপটিস্টের ঘোড়ার আস্তাবলে নিয়ে গেল। কিছু খাবারও যোগাড় করে দিল তাকে। প্যানগ্লস একটু বিশ্রাম নেওয়ার পরে, মিস কুঁনিগুঁর সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন করল কাঁদিদ।

প্যানগ্লস বলে—সে বেঁচে নেই।

শোনামাত্র মূর্ছা গেল কাঁদিদ। আস্তাবলের মধ্যে হঠাৎ একটু পচা ভিনিগার দেখতে পেলেন প্যানগ্লস। তাই দিয়ে তিনি তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। চোখ মেলে তাকালো কাঁদিদ।

—বেঁচে নেই! মিস কুঁনিগুঁ মারা গিয়েছে? হায় হায়! বিশ্বের সেরা জিনিসটি এখন কোথায়? কিন্তু কী অসুখে মারা গেল? তার বাবা লাথি মেরে আমাকে সেই অপরূপ দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই দুঃখেই কি ?

প্যানগ্লস বললেন—না, একজন যুবতীকে যতবার বলাৎকার করা যায় ততবার বলাৎকার করার পরে বুলগেরিয়ান সেনানীরা তার পেট চিরে নাড়ীভুঁড়ি সব বার করে দেয়। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে গেলে ব্যারনের মাথার ওপরে তারা বন্দুকের পেছন দিয়ে আঘাত করে। লেডীকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আমার হতভাগ্য শিষ্যটির অবস্থাও হয় তার বোনেরই মত। আর দুর্গের কথা যদি বল তাহলে, তারা তার একটা পাথরও আর

আস্ত রাখে নি। দুর্গের মধ্যে যত পশুপাখি আর গাছ ছিল সব তার ধ্বংস করেছে। কিন্তু সেই অত্যাচারের প্রতিহিংসা নিতে আমরাও ছাড়ি নি। আমাদের অ্যাবারেস সেনানীরা পার্শ্ববর্তী ব্যারনীতেও সেই একই কাজ করেছে। জায়গাটা হচ্ছে একটি বুলগেরিয়ান লর্ডের।

এই কথা শুনে, কাঁদিদ আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লো, কিন্তু আপনা থেকেই জ্ঞান ফিরে এল তার। তারপরে তার মনে যা এল তাই বলে গেল। কার্য-কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করল; প্যানগ্লসের ওই রকম ভয়ানক দুরবস্থার পেছনে কী বিশেষ কারণ রয়েছে সে বিষয়েও প্রশ্ন করল সে।

প্যানগ্লস বললেন—বিশেষ কারণটা হচ্ছে প্রেম, ভালবাসা—মনুষ্যজাতির সুখ আর আনন্দ। ভালবাসা—বিশ্বকে যে বাঁচিয়ে রেখেছে, সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যে আত্মা।

কাঁদিদ বলল—হায়, হায়! প্রেম সম্বন্ধে আমারও কিছুটা জ্ঞান রয়েছে। আমি জানি এই প্রেম হচ্ছে হৃদয়ের সম্রাট, আত্মার আত্মা। অথচ, এই ভালবাসার জন্য আমাকে দিতে হয়েছে একটি মাত্র চুম্বন, মাত্র একটি; আর পেছনে খেয়েছি এক কুড়ি লাথি। কিন্তু এই রকম একটি সুন্দর কারণ আপনার ওপরে এমন ভয়ঙ্কর রকমের কার্য সংগঠিত করল কেমন করে?

উত্তর দিলেন প্যানগ্লস—হায় বৎস, কাঁদিদ; প্যাকিটিকে নিশ্চয় তোমার মনে রয়েছে; সেই যে ফুটফুটে মেয়েটা, তরুণীও বলতে পার, ব্যারনেসের পরিচারিকা ছিল সে। তারই বাহুর বন্ধনে নিজেকে সঁপে দিয়ে আমি স্বর্গ-সুখ অনুভব করেছিলাম। আর এই যে নরকযন্ত্রণা আমি ভোগ করছি এটা হচ্ছে তারই ফল। মেয়েটা এই কুৎসিত রোগে ভুগছিল। সম্ভবত, সেই রোগেই সে মারা গিয়েছে। রোগটি সে উপহার হিসাবে পেয়েছিল নীতিবাগীশ একজন ফ্র্যানসিসক্যান ধর্মযাজকের কাছ থেকে। এই রোগটিকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একটি পাহাড়ী ঝর্ণার উৎসমুখ থেকে। এর জন্যে তিনি ঋণী ছিলেন একজন বৃদ্ধা কাউনটেসের কাছে। কাউনটেস এটি পেয়েছিলেন একটি ঘোড়সওয়ারের কাছ থেকে; সে এটা পেয়েছিল একটি মার্কুইসের বিধবার কাছ থেকে। মার্কুইসের বিধবা এই রোগটি সংগ্রহ করেছিল তার একটি চাকরের কাছ থেকে। চাকরটি পেয়েছিল একজন খ্রীস্টীয় যাজকের কাছ থেকে। শিক্ষানবীশ থাকার সময় যাজকটি এই রোগ সংগ্রহ করেছিলেন ক্রিসটোফার কলম্বাসের একজন সহঅভিযাত্রীর কাছ থেকে। অবশ্য আমার কথা যদি ধর তাহলে বলতে হয়, এই রোগটিকে উপহার হিসাবে আমি কাউকে দিয়ে যেতে পারবো না; কারণ, আমি এখন মরতে বসেছি।

কাঁদিদ চিৎকার করে উঠলো—ও প্যানগ্লস! কী অদ্ভুত বংশপরিক্রমা! এর মূলে নিশ্চয় শয়তানের কোন কারসাজি রয়েছে! তাই না?

সেই বিজ্ঞ সবজান্তা ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন—মোটেই না। এটিকে গ্রহণ না করে উপায় ছিল না; অথবা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাদের এই পৃথিবীর গঠনে এটি একটি মৌল এবং প্রয়োজনীয় উপাদান। কারণ, আমেরিকার কোন একটি দ্বীপে, কলম্বাস যদি এই রোগে আক্রান্ত না হতেন তাহলে আমরা চকোলেট পেতাম না; অথবা মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের লাক্ষাজাতীয় কীটেরও কোন সন্ধান পেতাম না, যদিও একথা সত্যি যে এই রোগ মনুষ্যজাতিকে দূষিত করেছে, বাধার সৃষ্টি করেছে মানুষের প্রযজন। লক্ষ্য করলে, এটাও তুমি দেখতে পাবে যে এখনও পর্যন্ত ধর্মীয় বিতর্কের মত এই রোগটি আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তুর্কী, ভারতবাসী, পারশ্যদেশবাসী, চীনদেশের লোক, শ্যামদেশের অধিবাসী, আর জাপানীদের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত এই রোগের কোন পরিচয় হয় নি; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই রোগটির সঙ্গে তারা যে পরিচিত হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বর্তমানে, রোগটি আমাদের মধ্যে বিপুলভাবে পরিক্রমা সুরু করেছে, বিশেষ করে, যে সব বাহিনীতে সুশৃঙ্খল সৈন্য রয়েছে, যারা অন্য দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সঙ্গেই এই রোগের আঁতাত বেশী। কারণ একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যখন ত্রিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী সমসংখ্যক আর একটি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তখন উভয় পক্ষের কুড়ি হাজার সেনানী এই রোগের শিকার হয়।

কাঁদিদ বলল—ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিন্তু আপনাকে তো সেরে উঠতে হবে।

প্যানগ্লস বললেন—কী করে তা সম্ভব? বন্ধু, এ বিশ্বে আমার একটি কপর্দকও নেই। ডাক্তারের ফি না দিলে যে তোমার গায়ে ছুরিটাও বসাবে না তা বোধ হয় তুমি জান।

এই শেষ কথায় কাঁদিদ বেশ দুঃখ পেল। সে ছুটলো উদারহৃদয় অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমসের কাছে; তাঁর পায়ের ওপরে উপুড় হয়ে পড়ে তার বন্ধুর দুর্ভাগ্যের কথা সে এমন মর্মান্তিক ভাষায় ব্যক্ত করল যে তিনি কোন রকম দ্বিধা না করেই ডঃ প্যানগ্লসকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে এবং তাঁর চিকিৎসার জন্যে খরচ করতে রাজি হলেন। অসুখ তাঁর সারলো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা চোখ আর একটা কান তাঁকে জন্মের মত খোয়াতে হল। তাঁর হস্তাক্ষর ভাল ছিল; সেই সঙ্গে হিসাব-নিকাশটাও তিনি ভাল-ভাবেই করতে পারতেন। সেই জন্যে অ্যানাব্যাপটিস্ট তাঁকে তাঁর হিসাব পরীক্ষকের কাজ দিলেন। দু'মাস পরে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাঁকে লিসবনে যেতে হয়েছিল। সেই সময় এই দু'জন দার্শনিককে তিনি জাহাজে চাপিয়ে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে প্যানগ্লস তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রত্যেক জিনিস এমন ভাবে তৈরি হয়েছে যে তার চেয়ে আরও ভাল

করে তাকে তৈরি করা যেত না। এ বিষয়ে জেমস্ তাঁর সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারলেন না।

তিনি বললেন—মানুষ প্রথমে ছিল একেবারে নিরপরাধ। তারপরে, কোন কোন বিষয়ে নিশ্চয় সে সেই পথ থেকে সরে এসেছে। কারণ তারা কেউ নেকড়ে বাঘ হয়ে জন্মগ্রহণ করে নি; তবু তারা পরস্পরের সঙ্গে শিকারী পশুর মতই ব্যবহার করে। ঈশ্বর তাদের কুড়ি পাউণ্ড ওজনের গোলাও দেন নি, সঙ্গীন দিয়েও পৃথিবীতে পাঠান নি; কিন্তু পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্যে তারা এই সব তৈরি করেছে। এগুলির সঙ্গে আমি আর একটা জিনিস যোগ করতে পারি। সেটি কেবল দেউলিয়া হওয়ার কথাই নয়; আইনও। এই আইন দেউলিয়াদের সম্পত্তিই কেবল গ্রাস করে না; পাওনাদারদেরও ঠকায়। সেই আইন তৈরি করেছে মানুষ।

একচক্ষু ডাক্তার বললেন—এসবেরও নিশ্চয় প্রয়োজন রয়েছে; কারণ, যাতে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় সেইটাই সরকারের মুনাফা বৃদ্ধি করে। সেই জন্যে ব্যক্তিগত জীবনে যত দুর্ভাগ্য নেমে আসবে জনসাধারণের সৌভাগ্য সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে।

যখন তিনি এইভাবে আলোচনা করছিলেন সেই সময় আকাশ মেঘে ঢেকে এলো, চারদিক থেকে বইতে লাগলো ঝড়ো হাওয়া। ভয়ঙ্কর একটা ঝড় এসে আক্রমণ করল জাহাজটিকে। জাহাজটি তখন লিসবন বন্দরের কাছাকাছি এসে পড়েছে।

পরিচ্ছেদ—৫

ঝড় উঠলো, জাহাজ ভাঙলো, সুরু হল ভূমিকম্প। ডাক্তার প্যানগ্লস, কাঁ দদ আর জেমসের কপালে কী ঘটলো···

সমুদ্রের ওপরে ভীষণভাবে টালমাটাল খেতে লাগলো জাহাজটি। জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক যাত্রী সেই ঝাঁকুনিতে জাহাজের এপাশ থেকে অন্য পাশে, আবার অন্য পাশ থেকে এপাশে গড়াতে লাগলো। এই গড়ানির দাপটে তাদের স্নায়ুগুলি দুর্বল হয়ে পড়লো, আধমরার মত হয়ে গেল সব। ফলে, তাদের সামনে যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেকথা চিন্তা করার মতও তাদের কোন সম্বিত ছিল না। অন্য যাত্রীরা চিৎকার করে কাঁদতে-কাঁদতে প্রার্থনা করতে সুরু করল। পালগুলি সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল; মাস্তুল ভেঙে পড়লো জাহাজের ওপরে, জাহাজের খোলটা ফুটো হয়ে গেল। সবাই তখন কর্মে ব্যস্ত; কিন্তু সেই প্রচণ্ড হট্টগোলে প্রথমতঃ কারও কথা শোনা যাচ্ছিল না; দ্বিতীয়ত, শোনা গেলেও, কেউ কারও নির্দেশ পালন

করছিল না। অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমস্ তখন ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন; ছিলেন বলেই, অন্য সকলের মত তিনিও জাহাজটাকে বাঁচানোর কাজে অন্য সকলের সঙ্গে সাহায্য করছিলেন; এমন সময় একটা জানোয়ার নাবিক এসে তাঁকে এমন একখানা ঘুষি মারলো যে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজের ঘুষির ধাক্কা সামলাতে না পেরে সেই নাবিক ব্যাটাই হুমড়ি খেয়ে সামনের দিকে লটকে পড়লো; তারপরে, দেহের ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল একটা ভাঙা মাস্তুলের ওপরে; পড়ামাত্র সেইটাকে সে জাপটে ধরে ফেললো। সাধু জেমস্ দৌড়ে গেলেন তাকে সাহায্য করতে; জাপটে ধরলেনও তাকে; কিন্তু সেই চেষ্টায় নিজেই পড়ে গেলেন সমুদ্রের ওপরে, আর সেই নাবিকের সামনেই। কিন্তু নাবিক তাঁকে বাঁচানোর জন্যে কোন চেষ্টাই করল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল কাঁদিদ। সে দেখলো তার উপকারী বন্ধু একবার জলের ওপরে উঠছেন, আর একবার নির্মম তরঙ্গের গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এই দেখে তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে সে জলে ঝাঁপ দিতে যাবে এমন সময় দার্শনিক প্যানগ্লস তাকে বাধা দিয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে অ্যানাব্যাপটিস্ট ওইখানে ডুবে মরবেন বলেই লিসবনের তীরভূমিটিকে তৈরি করা হয়েছে। কার্য আর কারণের মধ্যে সম্বন্ধ কোথায় সেটা যখন তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছিলেন এমন সময় জাহাজটি চুরমার হয়ে ভেঙে গেল; জাহাজের সবাই মারা গেল; বেঁচে রইলো কেবল কাঁদিদ আর প্যানগ্লস। আর বেঁচে রইলো সেই জানোয়ার নাবিকটি। সৎ অ্যানাব্যাপটিস্টের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার কারণ ছিল সে-ই। বদমাইশটা সাঁতারে গিয়ে তীরে উঠলো; কিন্তু ওরা দুজনে তীরে গেল একটা তক্তাকে আশ্রয় করে।

তীরে উঠে একটু বিশ্রাম নিয়ে, তারা লিসবন শহরের দিকে হাঁটতে লাগলো। অর্থ তাদের কাছে যৎসামান্যই ছিল। সমুদ্রে ডুবে মরার হাত থেকে বেঁচে সেই অর্থ দিয়ে অনাহারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করল তারা।

পরম উপকারী বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করারও সময় পায় নি তারা। সবেমাত্র শহরের মাটিতে পা দিয়েছে এমন সময় আর এক বিপত্তি, অগ্নুৎপাত সুরু হল। তাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো। ফুঁশতে লাগলো সমুদ্র। উত্তাল তরঙ্গগুলি ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে তীরের ওপরে নোঙরবাঁধা জাহাজগুলির ওপরে আছড়ে পড়লো; ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল তাদের। বড়-বড় আগুনের শিখা আর পোড়া কাঠ ছড়িয়ে পড়লো পথে-ঘাটে চারধারে। কাঁপতে লাগলো বাড়ি; দুলতে-দুলতে ভিতশুদ্ধ উপড়িয়ে পড়লো মাটির ওপরে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল; সেই সঙ্গে নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ ত্রিশ হাজার বাসিন্দাদের সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে জীবন্ত সমাধি হল।

সেই নাবিকটা শিস দিতে দিতে আর অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে বলল—যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই। এখানে কিছু পাওয়া যাবে।

প্যানগ্লস বললেন—এই ঘটনার অনিবার্য কারণটা কী?

কাঁদিদ বলল—নিশ্চয় আজ শেষ বিচারের দিন।

লুটপাট করার বাসনায় নাবিকটা মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে ধ্বংসস্তূপের দিকে দৌড়ে গেল। সেখানে কিছু টাকা সে কুড়িয়ে পেল। সেই টাকা দিয়ে মদ কিনে সে খেলো। কিছুটা ঘুমানোর পরে প্রকৃতিস্থ হল। তারপরেই সে দেখল একটি কোমল স্বভাবা স্থন্দরী তারই দিকে এগিয়ে আসছে, এইটিই প্রথম জীবন্ত প্রাণী যা তার চোখে পড়লো। ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির ভেতর দিয়ে অর্দ্ধ সমাধিস্থ মানুষের আর্তনাদ আর মৃত ব্যক্তিদের পাশ কাটিয়ে আসছিল মেয়েটি। নাবিকটি তার অনুগ্রহ কিনে নিল টাকা দিয়ে। এমন সময় প্যানগ্লস তার জামার আস্তিনে টান দিলেন। বললেন—বন্ধুবর, এটা ঠিক ন্যায়সঙ্গত কাজ হচ্ছে না। সার্বিক নীতির বিরুদ্ধে যাচ্ছ তুমি। এ সময়ে ওকাজ করাটা তোমার ঠিক হচ্ছে না।

নাবিকটি বলল—গোল্লায় যাও তুমি। আমি একজন নাবিক। ব্যাটাভিয়ায় আমার জন্ম। চারবার জাপানের পথে আমি গিয়েছি। চারবারই মৃত্যুকে আমি কলা দেখিয়েছি। আর তুমি আমাকে দেখাতে এসেছ সার্বিক নীতি! ওদিক থেকে আমি একেবারে ঝানটু মাল।

ভেঙে পড়ার সময় বাড়ি থেকে কয়েকটা পাথরের টুকরো কাঁদিদের গায়ে এসে লেগেছিল। তাতেই বেচারা রাস্তার ওপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। বালি-চূণ-সুরকি এসে প্রায় ঢেকে দিয়েছে তাকে।

সে প্যানগ্লসকে বলল—ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে একটু মদ আর তেল দিন। আমি মরে যাচ্ছি।

প্যানগ্লস বললেন—মাটিতে মাটিতে প্রবল ঘর্ষণ নতুন কিছু নয়। আমেরিকার লিমা শহরেও গত বছর এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। একই কারণ, একই ঘটনা। লিমা থেকে লিসবন পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ সমস্ত পথের ওপরে নিশ্চয় সালফার বোঝাই একটা ট্রেন যাতায়াত করছে।

কাঁদিদ বলল—এর চেয়ে বেশী সম্ভব আর কী হতে পারে? কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তেল আর একটু মদ দিন।

দার্শনিক বললেন—সম্ভব! এটা যে সত্যি তা আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব।

এই শুনেই মূর্ছা গেল কাঁদিদ। পাশাপাশি একটা ঝর্ণা থেকে প্যানগ্লস তাকে একটু জল এনে দিলেন।

পরের দিন, খাদ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত কিছু খাবার পেয়ে তাদের ক্লান্ত শরীরটাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ

করলো। তারপরে, আহত আর বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করার জন্যে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিল। তাদের এই মানবতার জন্যে স্থানীয় লোকেরা পরিবর্তিত অবস্থায় যেটুকু সম্ভব সেই রকম খাবার তাদের খেতে দিল। সে খাবারও বিশেষ একটা খারাপ নয়। এই খাবার স্থানীয় লোকদের কাছে সত্যিই বড় দুঃখজনক। চোখের জলে তাদের নিজেদের খাবারও ভিজে যাচ্ছিল; কিন্তু এ ছাড়া অন্য ঘটনা যে ঘটতে পারত না সেই কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বলে সেই দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে প্যানগ্লস স্থানীয় অধিবাসীদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

তিনি বললেন—কারণ, এই যা ঘটলো তার সবটাই ভালোর জন্যে; মানে, সবচেয়ে ভালোর জন্যে। কারণ, লিসবনে যদি কোন আগ্নেয়গিরি থাকে, তাহলে সেই আগ্নেয়গিরি অন্য কোথাও থাকবে না। কারণ, যা রয়েছে তা না থাকাটা অসম্ভব। এই থেকে বোঝা যায় যে সব জিনিসেরই শেষ পরিণতি হচ্ছে সবচেয়ে ভাল।

কালো পোশাক পরে বেঁটেখাটো একটি লোক তাঁর পাশে বসেছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, রোমান ক্যাথলিক বিচারশালার একজন সরকারী কর্মচারী তিনি। এই মানুষটি তাঁর কথা শুনে, অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁকে বললেন—প্রিয় মহাশয়, আমাদের আদিম পাপে আপনি সম্ভবতঃ বিশ্বাসী নন। সব জিনিসই যদি উৎকৃষ্ট হয় তাহলে মানুষের পতন হতো না, অথবা, মানুষের ওপরে শাস্তিও নেমে আসতো না।

আরও বিনীতভাবে প্যানগ্লস বললেন—ইয়োর একসেলেনসী, অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, মানুষের পতনই বলুন, আর সেই পতনজনিত শাস্তিই বলুন বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে।

সেই কর্মচারিটি বললেন—অর্থাৎ, মানুষের যে একটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রয়েছে তা আপনি বিশ্বাস করেন না।

প্যানগ্লস বললেন—ইয়োর একসেলেনসী, আমার ধৃষ্টতা মাপ করবেন। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে অনিবার্য প্রয়োজনের কোন বিরোধ নেই। কারণ, স্বাধীনতা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমাদের ছিল; কারণ তারই মধ্যে ইচ্ছাশক্তি—

প্যানগ্লস তাঁর বক্তব্যটি বুঝিয়ে বলছিলেন এমন সময় সেই মানুষটি তাঁর একটি চাকরকে ইশারা করলেন। চাকরটি তাঁকে এক গ্লাস পোর্ট মার্কা মদ দিচ্ছিল।

পরিচ্ছেদ—৬

ভবিষ্যৎ ভূমিকম্প বন্ধ করার জন্যে পর্তুগীজরা অধিবাসীদের পুড়িয়ে মারার একটি অপূর্ব আয়োজন করল; কাঁদিদকে কেমন করে বেত্রাঘাত করা হল।

লিসবন শহরেব চার ভাগের তিন ভাগ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেল। তারপরে সেই দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা একটা মজলিসে বসলেন। সমস্যাটা হল দেশটিকে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে কেমন করে বাঁচানো যায়। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভবিষ্যতে ভূমিকম্প বন্ধ করার জন্যে প্রকাশ্যে নাস্তিকদের পুড়িয়ে জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়ার চেয়ে বেশী কার্যকরী পথ আর নেই। কয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বিরাট আড়ম্বর আর অনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকজন লোককে অল্প আগুনে পুড়িয়ে মারাই হচ্ছে ভূমিকম্প বন্ধ করার অকাট্য উপায়।

সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে তারা একটি বিসকার লোককে পাকড়ালো। লোকটি তার পালিতা মাকে বিয়ে করেছিল। সেই সঙ্গে তারা ধরে আনলো দুজন পর্তুগীজকে। তাদের অপরাধ হচ্ছে শূয়োরের চর্বি মাখানো বাচ্চা মুরগীর মাংস খেতে খেতে তারা মুরগীর পিঠের মাংসটা তুলে ফেলে দিয়েছিল। খানাপিনার পরে তারা এসে ডাক্তার প্যানগ্লস আর তাঁর শিষ্য কাঁদিদকে ধরে নিয়ে গেল। প্যানগ্লসকে ধরে নিয়ে গেল খোলাখুলিভাবে তাঁর মনের কথা বলার জন্যে; আর কাঁদিদকে পাকড়ানো হল প্যানগ্লসকে সমর্থন করছে এই সন্দেহে।

তাদের প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরগুলি খুবই ঠাণ্ডা। বাইরে থেকে সূর্য ঢুকে সেই ঘরের শ্লীলতা নষ্ট করতে পারে নি। আটদিন পরে তাদের সকলের গায়ে অপরাধীর পোশাক জড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের মাথার ওপরে বসানো হল কাগজের তৈরি পাদরীদের মুকুট। কাঁদিদের মাথার টুপীতে আর গায়ের পোশাকে অগ্নিশিখা এঁকে দেওয়া হল। শিখার মুখগুলি নিচের দিকে। সেই সঙ্গে এঁকে দেওয়া হল কয়েকটি শয়তানের বাচ্চার মূর্তি। এগুলির লেজ আর নখ কিছুই ছিল না। কিন্তু প্যানগ্লসের পোশাকে যে শয়তানের বাচ্চাদের ছবি আঁকা ছিল তাদের লেজ আর নখ দুটিই ছিল। আর আগুনে শিখাগুলির মুখ ছিল ওপরের দিকে।

এই জাতীয় পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে দলবদ্ধ হয়ে তারা কদম-কদম এগিয়ে গেল। যাওয়ার সময় করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা করা হল তাদের আত্মার সৎগতির উদ্দেশ্যে। সেই শব্দ তাদের কানে গেল। প্রার্থনার পরে শুরু হল সুরেলা কণ্ঠে ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ। সেই সুরের তালে তালে বেত মারা হল কাঁদিদকে। বিসকার লোকটিকে আর যে দুটি লোক শূয়োরের মাংস খেতে রাজি হয়নি তাদের পুড়িয়ে মারা হল। ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল প্যানগ্লসকে;

যদিও এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফাঁসি দেওয়াটা সাধারণ রীতি বলে গণ্য হতো না। সেই দিনেই আর একটি ভূমিকম্প হল ; আগের চেয়ে আরও ভীষণ—যাকে বলা হয় ভীষণতম। ক্ষয় আর ক্ষতিও হল সেই অনুপাতে চরম।

অবাক, বিস্ময়াবিভূত হয়ে গেল কাঁদিদ , শুধু তাই নয় ; ভয়ে হতভম্ব হয়ে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কাঁপতে-কাঁপতে সে নিজেকেই বলল—এই যদি বিশ্বের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন হয় তাহলে, অন্য সব কী অপরাধ করল ? আমাকে যদি কেবলমাত্র বেত্রাঘাতই করা হতো তাহলে বুলগেরিয়ানদের মধ্যে আমি যে রকম সহ্য করেছিলাম এখানেও সেই রকমই সহ্য করতাম। কিন্তু হায়রে প্রিয় প্যানগ্লস, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ! তোমাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলে মৃত্যু বরণ করতে হল, এ-ও দেখার জন্যে আমি বেঁচে রইলাম। আর কেন তোমাকে ওরা হত্যা করলো তাও আমি জানতে পারলাম না ! হায় অ্যানাব্যাপটিস্ট, উদার, শ্রেষ্ঠ মানুষ ! এই বন্দরে তুমিও এইভাবে ডুবে মারা গেলে—তাও আমাকে দেখতে হল ! হায় মিস কুঁনিগুঁ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যুবতী, তোমাকেও শেষ পর্যন্ত এমন সব শত্রুদের হাতে পড়তে হল যারা তোমার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি সব বার করে দিল !

যেখানে তারে ধরে রাখা হয়েছিল, বেত মারা হয়েছিল, মুক্তি দেওয়া হয়েছিল আর আশীর্বাদ করা হয়েছিল সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারলো সে পালিয়ে এল, পথে একটি বৃদ্ধা তার সামনে এসে বলল—বৎস, সাহসী হও : আমার পিছু পিছু এস।

পরিচ্ছেদ—৭

বৃদ্ধার বাড়িতে কাঁদিদের যত্ন আর পরিচর্যা, প্রিয়তমাকে খুঁজে পাওয়া

সাহস সে সংগ্রহ করতে পারেনি বটে ; কিন্তু বৃদ্ধাটিকে সে অনুসরণ করেছিল। এসে হাজির হল একটি জীর্ণ বাড়িতে। সেখানে এসে ক্ষতস্থানে মালিশ করার জন্যে বৃদ্ধাটি তাকে এক বাটি মলম দিল। একটি পরিপাটি বিছানা দেখালো তাকে। বিছানার কাছে একটা কাপড়ের স্যুট ঝুলছিল সেটিও তাকে পরতে বলল। তারপরে, তার সামনে খাদ্য আর পানীয় রেখে গেল।

বৃদ্ধাটি বলল—এখন তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমোও। পুণ্যবতী অ্যাটোকার লেডী, পাদুয়ার মহান সেণ্ট অ্যানথনী, আর কমপোসটেলার মহামান্য সেণ্ট জেমস্ তোমাকে রক্ষা করুন। আমি আবার কাল আসবো।

এ-ক'দিন ধরে সে যা দেখেছিল আর যে যন্ত্রণাভোগ করেছিল তাতে কাঁদিদ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ; বৃদ্ধাটির যে বদান্যতা আর মহানুভবতা সে এখন

দেখলো তাতে সে আরও হতভম্ব হয়ে গেল। একবার মনে হল, বৃদ্ধার হাতে চুম খেয়ে সে তার কৃতজ্ঞতা জানাবে।

বৃদ্ধাটি বল—আমার হাতে চুম খাওয়ার দরকার নেই তোমার। পিঠে মলমটা ভাল করে মালিশ করো। তারপরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

এত বিপর্যয়ের পরেও কাঁদিদ খেলো; এবং তারপরে ঘুমালো। পরের দিন সকালে বৃদ্ধাটি তার প্রাতরাশ নিয়ে এল; পিঠটা পরীক্ষা করে নিজেই আর একটা মলম তার পিঠে ঘষে দিল। যথাসময়ে ফিরে এল বৃদ্ধা; সঙ্গে নিয়ে এল তার দিনের খাবার। রাত্রিতে আবার সে এল; সঙ্গে নিয়ে এল রাত্রির খাবার। পরের দিনও সে একই কাজ করল।

কাঁদিদ তাকে জিজ্ঞাসা করল—কে আপনি? কোন্ দেবতা আপনার হৃদয় এত করুণায় ভরিয়ে দিয়েছেন? এর প্রতিদান আমি আপনাকে কী দেব?

সেই কুরূপা বৃদ্ধাটি চুপ করে রইলো। যাকে বলে একেবারে নিশ্চুপ। সন্ধ্যেবেলা সে ফিরে এল; কিন্তু সঙ্গে কোন খাবার আনলো না।

সে বলল—আমার সঙ্গে এস; কিন্তু কোন কথা বলো না।

সে কাঁদিদের হাত ধরে সিকি মাইল দূরে একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখান থেকে গেল একটি নির্জন বাড়িতে। বাড়ির চারপাশে পরিখা আর বাগান। বৃদ্ধাটি একটি ছোট দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুলে গেল। সে কাঁদিদকে পেছনের দুটি সিঁড়ি পার করে একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটি বেশ ভাল করে সাজানো। দামী দামী আসবাব ছিল সেখানে। বৃদ্ধাটি তাকে একটি সোফার ওপরে বসিয়ে তার মুখের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল। একটা স্বপ্নের ঘোরে অতীতচারণা করতে লাগলো কাঁদিদ। অতীত জীবন তার কাছে মনে হল একটা দুঃস্বপ্নের মত। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে তার জীবন হয়ে উঠেছে সুন্দর, খুবই আরামের।

বৃদ্ধাটি তাড়াতাড়িই ফিরে এল। একটি যুবতীকে অনেক কষ্টে ধরে ধরে নিয়ে এল ভেতরে। যুবতীটির পা টলছিল। সে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার চেহারাটি বেশ অভিজাত, দীর্ঘাঙ্গিনী; পোশাক বেশ দামী; হীরের গয়না চকচক করছে দেহে। মুখে তার একটা ঘোমটা।

বৃদ্ধাটি কাঁদিদকে বলল—ঘোমটা খুলে দাও।

কাঁদিদ তার সামনে এগিয়ে গেল; তারপরে কম্পিত হাতে ঘোমটা খুলে দিল তার। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আশ্চর্য! মনে হল, সে যেন মিস কুঁনিগুঁকেই সামনে দেখছে! তাকেই সে দেখলো; হ্যাঁ, সত্যিই! মিস কুঁনিগুঁই বটে। সে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। একটা কথাও মুখ থেকে বেরোল না তার। সে তার পায়ের ওপরে পড়ে গেল। সোফার ওপরে কুঁনিগুঁ মূর্চ্ছা গেল। বৃদ্ধাটি তাদের নাকের কাছে স্পিরিট দিয়ে ঘষে দিতেই তাদের জ্ঞান আর শক্তি ফিরে এল। তার পরে তারা কথা বলতে শুরু করলো। প্রথমে

তারা ভাঙা-ভাঙা কথায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে লাগলো। তাদের প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি দীর্ঘশ্বাস, চোখের জল আর আবেগের উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়তে লাগলো মাঝে মাঝে। তারা যাতে কম গোলমাল করে তাই চেয়েছিল বৃদ্ধাটি। কিন্তু তাদের সামাল দিতে না পেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঁদিদ চিৎকার করে উঠলো—হায় ঈশ্বর! তুমিই? আমি কি মিস কুঁনিগুঁকে দেখছি আর দেখছি জীবিতা অবস্থায়? পর্তুগালে তোমাকে কি আবার আমি খুঁজে পেলাম? তাহলে, তোমার ওপরে তারা বলাৎকার করে নি? তাহলে, তারা তোমার পেট কেটে ফেলে নি? দার্শনিক প্যানগ্লস তো আমাকে সেই সংবাদই দিয়েছিলেন!

মিস কুঁনিগুঁ বললেন—সত্যিই, তারা তা করেছিল। কিন্তু এই দুজাতীয় দুর্ঘটনায় মানুষ যে মারা যাবেই সেকথা সব সময় সত্যি হয় না।

কিন্তু তোমার বাবা মা নিহত হয়েছেন?

হ্যাঁ। সংবাদটা সত্যি,—এই বলে সে কেঁদে ফেললো।

এবং, তোমার ভাই?

এবং, আমার ভাই-ও নিহত হয়েছে।

তুমি এখানে এলে কী করে? আর আমি যে এখানে রয়েছি তাই বা তুমি কেমন করে জানলে? আর কী অদ্ভুত কৌশলে তুমি আমাকে এই বাড়িতে আনালে?

মিস কুঁনিগুঁ বলল—তোমাকে আমি সব বলবো। তুমি যেদিন আমাকে নিরপরাধ একটি চুম্বন দিয়েছিলে এবং যার ফলে, নির্মম লাথি খেয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে সেদিন থেকে কী কী দুর্ভাগ্যের মধ্যে তুমি পড়েছিলে সে সব কথা আগে তুমি আমাকে বল।

মিস কুঁনিগুঁর নির্দেশ, অথবা, অনুরোধ সে অবনত মস্তকে মেনে নিল। তখনও তার হতভম্ব ভাবটা একেবারে কেটে যায় নি বটে, যদিও তার স্বর নির্জিব হয়ে কাঁপছিল, যদিও তার পিঠে তখনও বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল তবু এই অন্তর্বর্তীকালে তার জীবনে যে সব ঘটনা আর দুর্ঘটনা ঘটেছিল সে-সব কথা আনুপূর্বিক সে তার কাছে বর্ণনা করল যাকে বলে একেবারে বিশ্বস্ত স্মৃতিচারণা। সে যখন সৎ উদার অ্যানাব্যাপটিস্ট জেমসের মৃত্যুর কথা বলল, প্যানগ্লসের ফাঁসির সংবাদ দিল তখন কুঁনিগুঁ স্বর্গের দিকে তার চোখ দুটি তুলে ধরলো। সেই চোখ দুটি তার তখন জলে ভিজে গিয়েছে। তারপরে, কাঁদিদের কাছে সে তার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বলল। কাঁদিদ তার একটি কথাও না শুনে পারে নি; যখন সে কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল কাঁদিদ চোখ দিয়ে গিলছে।

পরিচ্ছেদ—৮

কুঁনিগু'র কাহিনী

বিছানায় শুয়ে আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম এমন সময় ঈশ্বর করুণা করে বুলগেরিয়ানদের আমাদের সুন্দর দুর্গ থানডার-টেন-ট্রনকে পাঠিয়ে দিলেন। তারা আমার বাবা আর ভাইকে হত্যা করল, কুঁচিয়ে ফেললো আমার মাকে। একটি দীর্ঘাঙ্গি বুলগেরিয়ান সেনানী দেখলো যে সেই দৃশ্য দেখে আমি মূর্ছিতা হয়ে পড়েছি। এই দেখে সে আমার ওপরে বলাৎকার করার চেষ্টা করল। বলাৎকার করার সময়েই আমার জ্ঞান ফিরে এল। আমি চিৎকার করলাম, ধস্তাধস্তি করলাম, কামড়ে দিলাম, আঁচড়ে দিলাম। আমি সেই দীর্ঘাঙ্গি সেনানীটির চোখ দুটোও হয়ত উপড়ে ফেলতাম। তখন আমি জানতাম না যে আমার বাবার দুর্গে যা ঘটেছে সেইটাই হচ্ছে চিরাচরিত প্রথা, সেই বর্বর সেনানীটা তার ছোরা দিয়ে আমার কোমরে আঘাত করল। সেই দাগ এখনও আমার কোমরে রয়েছে।

সরল মনে কাঁদিদ বলল—আশা করি সে দাগ আমি দেখবো।

নিশ্চয়। কিন্তু এখন আমাকে বলতে দাও।

হ্যাঁ; বল।

সে বলে গেল—একজন বুলগেবিয়ান ক্যাপ্টেন এসে আমার ঘর্মাক্ত রক্তাক্ত দেহ দেখলো। সেনানীটি তখনও তার কাজে ব্যস্ত ছিল। কেউ যে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না তার। তাকে কোন সম্মান দেখালো না দেখে ক্যাপ্টেন রেগে তরোয়ালের এক কোপে আমার বুকের ওপরে শায়িত সেই সেনানীটিকে কেটে ফেললো। তারপরে আমাকে চিকিৎসা করে সারালো। সেরে ওঠার পরে, যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে আমাকে নিয়ে গেল তার বাসায়। তার যে সব সামান্য জামাকাপড় ছিল সেগুলি আমি কাচতাম, রান্না করে দিতাম তার। সে মনে করত আমি খুবই সুন্দরী—তার কথাটা সত্যি। তার চেহারাটা ভালই ছিল তাও আমি অস্বীকার করছি নে। সাদা নরম দেহের চামড়া; কিন্তু সে খুবই বোকা ছিল; কিন্তু দর্শনের কিছুই সে জানতো না। স্পষ্টই বোঝা গেল, ডক্টর প্যানগ্লসের কাছে সে লেখা পড়া শেখেনি। তিন মাসের মধ্যে তার সমস্ত টাকাই সে উড়িয়ে ফেললো; তারপরে আর আমাকে তার ভাল না লাগায়, সে আমাকে একজন ইহুদীর কাছে বেচে দিল। ইহুদীটির নাম ডন ইশাচার। লোকটির হল্যাণ্ড আর পর্তুগালে ব্যবসা ছিল; মেয়েদের ওপরে তার মোহ ছিল বড় বেশী। এই ইহুদীটি আমার সঙ্গে সত্যিই বেশ ভাল ব্যবহার করেছিল। তার আশা ছিল আমার অনুগ্রহ সে লাভ করতে পারবে। কিন্তু আমার ওপরে সে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। একটি ভদ্র মেয়ের ওপরে একবার অত্যাচার করা যেতে পারে; কিন্তু তার ফলে, তার

নৈতিক উৎকর্ষতা আরও বেড়ে যায়। আমার সম্বন্ধে নিশ্চিৎ হওয়ার জন্যে আমাকে সে এইখানে নিয়ে এসেছে। আগে আমি বিশ্বাস করতাম আমাদের মত স্থন্দর দুর্গ বোধ হয় আর কোথাও নেই; কিন্তু এখন সে ভুল আমার ভেঙেছে।

'ধর্মীয় আদালতের প্রধান বিচারপতি একদিন প্রার্থনাসভায় আমাকে দেখেছিল। তারপরে যতক্ষণ প্রার্থনা চলছিল ততক্ষণই সে আমার দিকে তেরচা চোখে তাকিয়েছিল। প্রার্থনাসভা শেষ হলে, সে আমার কাছে লোক পাঠিয়ে বলেছিল যে বিশেষ কোন গোপন ব্যাপারে সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমাকে তার প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমার পিতৃপরিচয় তাকে আমি দিলাম। অত বড় বংশের মেয়ে হয়ে একজন ইহুদীর রক্ষিতা হয়ে থাকাটা আমার পক্ষে যে কতটা অপমানজনক সেই কথাটা আমাকে সে বলল। লর্ডশিপের হাতে আমাকে দিয়ে দেওয়ার কথা ইশাচারকে সে লোক দিয়ে বলালো। ইশাচার ছিল সরকারের ব্যাঙ্কার, পয়সাওয়ালা মানুষ। তাকে সহজে টোপ গেলানো গেল না। প্রধান বিচারপতি তাকে এই বলে ভয় দেখালো যে তার প্রস্তাবে রাজি না হলে তাকে বিধর্মী বলে পুড়িয়ে মারা হবে। মোট কথা, আমার মনিব ইহুদীটিকে ভয় দেখিয়ে একটা আপোসরফায় আনা হল। দুজনের মধ্যে ঠিক হল যে আমি দুজনেরই হেফাজতে থাকবো। ইহুদী আসবে সোমবার, বুধবার আর স্যাবাথের দিনে, আর প্রধান বিচারপতি আসবে সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে। এই ব্যবস্থাই ছ'মাস চলছে, তবে তাই নিয়ে মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে যে বিবাদ বাঁধে সেকথা সত্যি। শনিবার রাত্রি থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত প্রাচীন ধারার অন্তর্গত, না, নতুন ধারার অন্তর্গত এই নিয়েই বিবাদ। আমার দিক থেকে এতদিন দুজনকেই আমি ঠেকিয়ে রেখেছি। আর সেই কারণেই ওরা দুজনেই এখনও আমাকে ভালবাসে।

'অবশেষে, ভূমিকম্পের প্রকোপ থেকে দেশবাসীদের বাঁচানোর জন্যে এবং ইশাচারকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে, প্রধার বিচারপতি একটি বিধর্মী নিধন যজ্ঞের ব্যবস্থা করে। সেই অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণও করা হয়েছিল। ভাল জায়গাও একটা আমি পেয়েছিলাম। প্রার্থনা আর হত্যার মাঝখানে মহিলাদের জলযোগ করতে দেওয়া হয়েছিল। দুজন ইহুদীকে পুড়িয়ে মারতে দেখে আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম। সৎ বিসকার লোকটি তার পালিতা মাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু প্যানগ্লসের মত দেখতে একটি লোককে অপরাধীর পোশাক আর পাদরীদের মুকুট পরে থাকতে দেখে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, সেই সঙ্গে আতঙ্কিত হলাম; দুর্ভাবনাতেও পড়লাম বেশ। চোখ দুটো রগড়ে বারবার তার দিকে তাকা:ত লাগলাম। চোখের ওপরে দেখলাম তাকে ফাঁসি দেওয়া হল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। জ্ঞান ফিরে আসতে-

না-আসতেই দেখলাম তুমি উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ। তখন যে কী ভয়, দুঃখ আর হতাশায় আমি ভেঙে পড়লাম তা আর আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। সত্যিই আমি স্বীকার করছি যে তোমার গায়ের চামড়া সেই বুলগেরিয়ান ক্যাপ্টেনের চেয়েও অনেক ফর্সা, এবং অনেক বেশী মনোহর। চিৎকার করে উঠলাম আমি। বলতে যাচ্ছিলাম—'বর্বররা, থামো, থামো!' কিন্তু তখন আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। তাছাড়া, তখন চিৎকার করেও কোন লাভ হতো না। তোমাকে প্রচণ্ড প্রহার করার পরে আমি নিজের মনেই বললাম—'সেই সুন্দর কাঁদিদ আর বিজ্ঞ প্যানগ্লস লিসবনে এলেন কেমন করে? তাদের মধ্যে একজন খাবেন একশটা চাবুক, আর একজন প্রাণ হারাবে ফাঁসির দড়িতে। আর সেই শাস্তি দিয়েছেন মহান প্রধান বিচারক; আর আমি হচ্ছি তাঁর প্রিয় রক্ষিতা? বিশ্বে যা ঘটছে তাই ঠিক এবং উত্তম এই কথা বলে প্যানগ্লস নির্মম ভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন।'

এইভাবে কখনও উত্তেজিত, কখনও বা হতভম্ব হয়ে, কখনও বা বিকৃত মস্তিষ্ক, কখনও বা মস্তিষ্ক হারিয়ে, আবার কখনও দুঃখে উন্মাদ হয়ে মনে মনে অনেক কথা আমি ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম বাবা, মা আর ভাইকে হত্যার কথা; ভাবতে লাগলাম সেই বর্বর বুলগেরিয়ান সৈনিকটির কথা, আমার কোমরে সে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল সেই কথা; বুলগেরিয়ান ক্যাপ্টেনের ঘরে আমি বালিকা রাঁধুনীর কাজ করেছিলাম সেই কথা; ভাবছিলাম বদমাইশ ডন ইশাচার, আর নিষ্ঠুর বিচারপতির কাছে আমি যে বাঁদীর জীবন কাটাচ্ছি সেই কথা, ভাবছিলাম ডক্টর প্যানগ্লসের ফাঁসির কথা, ভাবছিলাম তোমার চাবুক খাওয়ার কথা। ভাবছিলাম পর্দার আড়ালে যেদিন তোমাকে আমি শেষ চুম খেয়েছিলাম সেদিনের কথা। এতদিন পরে আমি যেখানে রয়েছি সেইখানে তুমিও যে এসেছ সেই জন্য ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানালাম। আমার ওই বুড়ী দাসীটিকে বলে দিলাম ও যেন যত শীঘ্র পারে তোমাকে নিয়ে আসে। আমার নির্দেশ সে ভালভাবেই পালন করেছে। এখন এখানে তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে, আর তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি যে কী আনন্দ পেয়েছি সে কথা তোমাকে আর কী বলবো? কিন্তু এখন নিশ্চয় তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। আমারও ক্ষিদে কম পায়নি। সুতরাং এখন খাবে চল।

এর পরে কালবিলম্ব না করে এই দুটি প্রেমিক প্রেমিকা খেতে বসলো। খাওয়া-দাওয়ার পরে পূর্ব কথিত সেই অপরূপ সোফার উপরে দুজনে গিয়ে বসলো তারা এমন সময় নেহাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘরে ঢুকলো বাড়ির একজন মালিক ডন ইশাচার। দিনটা ছিল স্যাবাথ, অর্থাৎ ইহুদীদের বিশ্রামের দিন। সে এসেছিল আনন্দ করতে, আর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জানাতে তার ভালবাসা।

পরিচ্ছেদ—৯

কুঁনিগু, কাঁদিদ, প্রধান বিচারপতি আর ইহুদী—এদের কী হল

ব্যাবিলন পরাধীন হওয়ার পরে ইস্রায়েলে যে সব হিব্রু বাস করতো ইশাচার ছিল তাদের মধ্যে সব চেয়ে বদরাগী।

সে রেগে বলল—বলি, ব্যাপারটা কী, গ্যালিলীর কুক্কুরী, লর্ড ইনকুইজিটর [প্রধান বিচারপতি] আসছেন ; তাতেও তোমার আশ মিটছে না ! আবার অংশীদার হিসাবে এই রাসকেলটাকে ঘরে ডেকে এনেছ ?

এই বলেই একটা বেশ বড় গোছের ছোরা সে কোমর থেকে টেনে বার করলো। এই ছোরাটা সে সব সময় সঙ্গে নিয়ে বেরোত। তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে যে কোন অস্ত্র থাকতে পারে সে-কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। তাই বিপুল বিক্রমে সে তাকে আক্রমণ করল। কিন্তু বৃদ্ধাটি তাকে যে সব পরিচ্ছদ দিয়েছিল তার সঙ্গে আমাদের সং ওয়েস্টফালিয়ার যুবকটি সুন্দর একটি তরোয়ালও পেয়েছিল। কাঁদিদ সেই তরোয়ালটি খুলে দাঁড়ালো। তার চরিত্র নম্র খুবই আর যুবক হিসাবে তার মেজাজটিও মিষ্টি ছিল সেকথা সত্যি ; কিন্তু তার মধ্যেও যে বীরত্ব কম ছিল না সেটা প্রমাণ হয়ে গেল। সেই তরোয়াল সোজা সে ইহুদীর ওপরে বিপুল বিক্রমে বসিয়েছিল। ছটফট করতে করতে ইহুদীটি সুন্দরী কুঁনিগুঁর পায়ের কাছে মাটির ওপরে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লো।

চিৎকার করে উঠলো কুঁনিগু—হোলি ভার্জিন ! এবার আমাদের অবস্থা কী হবে ? আমার ঘরে একটা মানুষ খুন হল ! শান্তিরক্ষকরা যদি এসে পড়ে তাহলেই আমাদের দফা রফা।

কাঁদিদ বলল—প্যানগ্লসকে ওরা যদি ফাঁসি দিয়ে মেরে না ফেলতো তাহলে, এই বিপদে তিনি আমাদের যথেষ্ট ভাল উপদেশ দিতে পারতেন, কারণ দার্শনিক হিসাবে তিনি বেশ বিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু যেহেতু বর্তমানে তিনি এখানে নেই, এস আমরা বৃদ্ধা মহিলাটির উপদেশ গ্রহণ করি।

মহিলাটি সত্যিই বেশ বুদ্ধিমতী। সে কুঁনিগুঁকে এ বিষয়ে যথোচিৎ উপদেশও দিচ্ছিলো। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ আর একটা দরজা খুলে গেল। রাত্রি তখন প্রায় একটা। তারই ফলে, পঞ্জিকামতে রবিবার সুরু হওয়ার কথা। চুক্তির বলে, এই সময়টা লর্ড ইনকুইজিটরের। ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন বেত্রাহত কাঁদিদ খোলা তরোয়াল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ; তারই সামনে মেঝের ওপরে একটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে লম্বা হয়ে। ভয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল কুঁনিগু ; বৃদ্ধাটি তখনও তাকে উপদেশ দিচ্ছিলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে, হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল কাঁদিদের মাথায়।

সে ভাবলো—এই সং এবং ধার্মিক মানুষটি যদি বাইরে থেকে কোন সাহায্য

চান, তাহলে, নিঃসন্দেহে তারা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে, আর সম্ভবত, মিস কুঁনিগুঁর অবস্থাও আমার চেয়ে ভাল হবে না। তাছাড়া, আমার এই নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের জন্যে এই লোকটাই দায়ী। এ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার হাত এখন রক্তে লাল হয়েছে। অতএব, আর দ্বিধা করার সময় নেই।

সমস্ত চিন্তাধারাটি তার পরিষ্কার এবং ঝরঝরে। কোন অংশে তার ঝাপসা বলে কিছু ছিল না। ইনকুইজিটরকে তাঁর হতভম্বভাব কাটানোর জন্যে বিন্দুমাত্র সময় না দিয়েই, সে তার তরোয়ালটা তুলে এক কোপ বসিয়ে দিল তাঁর দেহে, ইনকুইজিটরের দেহটা লম্বা হয়ে পড়ে গেল ইহুদীর পাশে।

কুঁনিগুঁ চিৎকার করে উঠলো—হায় ঈশ্বর! আর একটা সুন্দর কাজ! এখন আমাদের আর বাঁচার পথ রইলো না। নাস্তিক বলে, বিধর্মী বলে ওরা আমাকে কোতল করবে। আমাদের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবছি, তোমার মত এমন স্নিগ্ধ মেজাজের মানুষ কেমন করে দু মিনিটের মধ্যে একজন ইহুদী আর একজন প্রধান যাজককে হত্যা করে ফেললো।

কাঁদিদ বলল—সুন্দরি, মানুষ প্রেমে পড়লে হিংসুটে হয়ে ওঠে। তার ওপরে সে যখন ধর্মীয় আদালতে চাবুক খায় তখন সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

বৃদ্ধাটি তখন মুখ ফোটালো।

সে বলল—আস্তাবলে তিনটে বেশ তাজা ঘোড়া রয়েছে। তাদের জিন, আর লাগাম রয়েছে অনেক। আমাদের বীর কাঁদিদ সেগুলিকে তৈরি করুন। মাদামের রয়েছে স্বর্ণমুদ্রা আর হীরে। চলুন, আমরা এখনই তাদের পিঠে গিয়ে চড়ি। আমার তো একটা মাত্র পাছা। আমরা সব কাডিজের দিকে পালিয়ে যাই চলুন। আজকের আবহাওয়াটা বড চমৎকার! ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রাত্রিতে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও যেতে কী ভালই না লাগে!

আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সময় নষ্ট না করে, কাঁদিদ ঘোড়াগুলির পিঠে জিন চড়িয়ে দিল। তারপরে, মিস কুঁনিগুঁ, বৃদ্ধা, আর সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লো। ত্রিশ মাইলের আগে তারা আর কোথাও থামে নি। তারা যখন পথের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে দৌড়ে চলেছে এমন সময় যাজকরা সেই ঘরে এসে ঢুকলো। লর্ড ইনকুইজিটর অর্থাৎ ধর্মীয় আদাতের প্রধান বিচারপতির মৃতদেহটির সৎকার করা হল মহা আড়ম্বরের সঙ্গে আর ইহুদী ইশাচারের দেহটিকে ফেলে দেওয়া হল গোবরের গাদায়।

এরই ভেতরে ওরা তিনজন অ্যারসেনা শহরে গিয়ে পৌচেছে। সিয়েরা মোরেনার পাহাড়ের ওপরে ছোট এই শহরটি। সেইখানে পৌছে একটি সরাইখানার ভেতরে বসে নিম্নলিখিত আলোচনা করল তারা।

পরিচ্ছেদ—১০

কী রকম বিপদাপন্ন অবস্থায়; কুঁনিগুঁ এবং বৃদ্ধাটি কাডিজে হাজির হল

কাডিজে পৌঁছে চোখের জল ফেলতে ফেলতে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো কুঁনিগুঁ; আমার ওই সব স্বর্ণমুদ্রা আর হীরেগুলি চুরি করল কে? আমরা এখন কেমন করে বাঁচবো? আমাকে আরও অর্থ দেবে এমন ইনকুইজিটর আর ইহুদীদের আমি কোথায় পাব?

বৃদ্ধাটি বলল—হায়, হায়! আমার সন্দেহ হচ্ছে একাজ সেই ফ্রানসিসক্যান পাদরী বাবার। বাদাজোস-এ তিনিই তো গত রাত্রিতে আমাদের সঙ্গে একই সরাইখানায় ঘুমিয়েছিলেন। ঈশ্বর না করুন, আমি যেন অন্যায়ভাবে কারও ঘাড়ে দোষ না চাপাই; কিন্তু গত রাত্রিতে পাদরী বাবা তু'বার আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন; এবং সকালে আমাদের আগেই সরাইখানা ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

কাঁদিদ বলল—হায় হায়! প্যানগ্লস আমার কাছে প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে এই বিশ্বের সব জিনিসের ওপর সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। সেই সব জিনিস ভোগ করার অধিকারও রয়েছে প্রত্যেকটি মানুষের। কিন্তু এই নীতি অনুসারে, আমরা যাতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারি সেরকম কিছু জিনিস পাদরীবাবারও আমাদের জন্যে রেখে যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু সুন্দরি কুঁনিগুঁ, সত্যিই কি তোমার কাছে কিছু নেই?

সে বলল—না। একটি কপর্দকও নেই।

তাহলে এখন আমাদের করণীয় কী?—ভেঙ্গে পড়লো কাঁদিদ।

বৃদ্ধাটি বলল—একটা ঘোড়া বেচে দাও। আমার তো একটা মাত্র পাছা, আমি মাদামের পেছনে চেপে বসবো। এইভাবেই আমরা কাডিজে পৌঁছে যাব। নিশ্চিন্ত থাকো।

সেই সরাইখানায় সেন্ট বেনিডিক্টের সম্প্রদায়ভুক্ত একটি সন্ন্যাসী ছিলেন। ঘোড়াটি তিনি বেশ সস্তাতেই কিনে নিলেন। দুটি ঘোড়ার পিঠে তিনজনে তারা বেরিয়ে পড়লো। লুসিনা, কেলাস এবং লেব্রিজার ভেতর দিয়ে অবশেষে তারা এসে পৌঁছলো কাডিজে। তারা গিয়ে দেখলো, শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক, প্যারাগুয়ের যেশুটদের টাইট দেওয়ার জন্যে একটি রণতরী প্রস্তুত হচ্ছে; পদাতিক বাহিনী জড়ো হচ্ছে মার্চ করে। স্পেন আর পর্তুগালের রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্যে যেশুটরা প্যালেস্টাইন শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সব ভারতীয় সম্প্রদায় বাস করতো তাদের নাকি মদৎ দিচ্ছে—এই হচ্ছে তাদের অপরাধ। কাঁদিদ আগেই বুলগেরিয়ান বাহিনীতে কাজ করেছিল। এখন সেই ছোট সেনাবাহিনীর সেনাপতির সামনে সে এমন

দক্ষতার সঙ্গে কুচকাওয়াজ করলো যে সেনাপতি খুশি হয়ে তাকে একটি পদাতিক বাহিনীর ক্যাপটেন করে দিলেন। ক্যাপটেন হয়ে কাঁদিদ মিস কুঁনিগুঁ, বৃদ্ধা পরিচারিকা, দুটি চাকর—আর পর্তুগালের প্রধান ইনকুইজিটরের দুটি আনদালুসিয়ান ঘোড়া নিয়ে জাহাজে চাপলো।

জাহাজে যেতে-যেতে হতভাগ্য প্যানগ্লসের দর্শন নিয়ে গভীর তত্ত্বালোচনা করে বেশ আনন্দেই দিন কাটালো তারা।

কাঁদিদ বলল—এখন আমরা আর একটি জগতে পদার্পণ করছি, এবং নিশ্চয় সেখানকার সব কিছুই সেরা জিনিস। কারণ, এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে শারীরিক আর নৈতিক দিক থেকে আমাদের কপালে যা ঘটে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছু কারণ আমাদের রয়েছে—সে কারণ যত সামান্যই হোক।

মিস কুঁনিগুঁ বলল—তোমার প্রতি আমার আন্তরিক ভালবাসা থাকলেও, আমি যা দেখেছি আর যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সে সব চিন্তা করলেও ভয়ে আমার বুক কেঁপে ওঠে।

কাঁদিদ বলল—সব ভাল হয়ে যাবে। আমাদের ইউরোপের সমুদ্রের চেয়ে এই নতুন জগতের সমুদ্র অনেক ভাল। এ-সমুদ্র অনেক শান্ত, হাওয়াটাও বেশ নিয়মমাফিক বইছে।

কুঁনিগুঁ বলল—ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমার যে ভোগান্তি গিয়েছে তাতে কোন কিছুতেই ভাল আশা করতে আমার আর ভরসা হয় না।

বৃদ্ধা পরিচারিকাটি এই শুনে একটু বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করলো—এত হইচই আর অভিযোগই বা কিসের? আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করেছি তার অর্দ্ধেকও যদি তোমরা ভোগ করতে তাহলে, হ্যাঁ এ সবের না হয় একটা কারণ থাকত।

কাঁদিদ বলল—তাই বটে! তোমার ওপরে তো দু'জন বুলগেরিয়ান বলাৎকার করে নি; তোমার পেটে তো ছোরা দিয়ে কেউ দুটো গভীর ফুটো করেনি; তোমার চোখের সামনে তো তোমার দুটো দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যায় নি; তোমার দুটি বাবা, আর দুটি মাকে তো কেউ তোমার চোখের ওপরে বর্বরের মত হত্যা করে নি; সবার ওপরে, ধর্মীয় বিচারের প্রহসন করে তোমার দুজন প্রেমিককে তো কেউ আগুনে ঝলসিয়ে মেরে ফেলে নি। তাহলে তুমি যে আমার চেয়ে বেশী হতভাগিনী কী করে হলে তা আমি বুঝতে পারছি নে। ওদের সঙ্গে আর একটা জিনিস যোগ কর: ব্যারনের মেয়ে হয়ে আর ব্যারনের স্ত্রী হওয়ার জন্যেই আমার জন্ম হয়েছিল, আমার ছিল বাহাত্তরটি রাজকীয় পোশাক। তা সত্ত্বেও কী ভাবে আমাকে দিন কাটাতে হয়েছে জানো? দিন কাটাতে হয়েছে নোংরা দুঃস্থা একটি পাচিকা হিসাবে। এর পরেও তুমি

বলতে চাও যে আমার চেয়ে তোমার দুঃখ বেশী ?

বৃদ্ধা মহিলাটি উত্তর দিল—মিস, আমার বংশপরিচয় কী তুমি এখনও তা জানো না। আমি যদি তোমাকে আমার পিঠটা দেখাই তাহলে তুমি আর এই ধরনের কথা বলবে না ; কার দুঃখ বেশী তা নিয়ে আর বিচার করতেও যাবে না।

এই কথা শুনে তারা দুজনেই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলো। তাদের কৌতুহল দেখে বৃদ্ধাটি নিজের কাহিনী বলতে লাগলো।

পরিচ্ছেদ—১১

বৃদ্ধা মহিলার ইতিহাস

'সব সময়েই চোখে আমি ঝাপসা দেখতাম না। আমার নাক চিরকালই থুতনি স্পর্শ করতো না। চিরকালই আমি চাকরাণী ছিলাম না। আমি যে দশম পোপ আরব্যানের মেয়ে সেকথা তোমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আর একথাটাও তোমরা জেনে রাখো যে আমি হচ্ছি প্যালেসটিনার রাজকুমারী। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত আমি মানুষ হয়েছি দুর্গের মধ্যে। তার সঙ্গে তুলনা করলে মনে হবে সমস্ত জার্মান ব্যারনদের দুর্গগুলি হচ্ছে ঘোড়ার আস্তাবল। আর আমার একটা পোশাকের দাম কত ছিল জান ? তাই দিয়ে ওয়েস্টফালিয়া প্রদেশের অর্দ্ধেকটা কিনে নেওয়া যেত। আমার সৌন্দর্য ছিল, ছিল বুদ্ধি আর ধীশক্তি ; চারুকলার প্রতিটি বিভাগেই ছিল আমার দক্ষতা ; আমোদ-প্রমোদের মধ্যে, অপরের আনুগত্যের মধ্যে আমি বড় হয়েছি। জীবনে আমার যা আশা ছিল অত আশা আর কোন মেয়েরই ছিল না। সেই বয়সেই পুরুষদের হৃদয়ে আমি প্রেম সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলাম ; আমার কুচযুগল ধীরে ধীরে পুষ্ট হতে লাগলো। আর কী সুন্দর সেই দুটি কুচ। শ্বেতবর্ণ, দৃঢ় ; মেডিসীর ভেনাসের বুকেব মত স্বচ্ছ, সুন্দর, পীনোদ্ধত। আমার ভ্রূদুটি ছিল ঝুলের মত কালো। আর আমার চোখের কথা যদি বল তাহলে বলতে হয় সে-দুটির ভেতর থেকে বিদ্যুৎ ছিটকে পডত ; এবং আমাদেব অঞ্চলের কবিরা আমাকে বলতেন সেই বিদ্যুচ্ছটায় নাকি নক্ষত্রের জ্যোতিও ঢাকা পড়ে যায়। আমাকে সাজানোর সময় আর আমাকে উলঙ্গ করার সময় আমার পরিচারিকারা আমার সামনে আর পেছনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো। আর পুরুষরা যে যার নিজের জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইতো। আমার রূপবহ্নিতে দগ্ধ হতো তারা।

'মাসা কার্‌বারার একটি যুবরাজের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছিল। আর সে কী যে-সে রাজকুমার ! কী সুন্দর তার চেহারা। ঠিক আমারই মত। মিষ্টি স্বভাব, ভদ্র, তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালী। আমার প্রেমে একেবারে হাবুডুবু

আমিও তাকে খুবই ভালবাসতাম। দয়িতকে প্রথম দেখে যুবতীরা যেমন স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে পূজা করে আমিও তাকে সেই রকম মনের মাধুরী দিয়ে পূজা করতাম। বিরাট আয়োজন আর আড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা হল। সেই সঙ্গে বিরাট ভোজ সুরু হল; গান-বাজনা, হইচই—সুরাপান চলল অশ্রান্ত জলকল্লোলের মত। অভিনীত হল প্রহসন। আমার প্রশংসায় মুখর হয়ে ইতালীর সমস্ত কবিরা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করল—যদিও তাদের একটাও পাতে দেওয়ার মত হয় নি। আমার আনন্দ হৃদয়-পেয়ালা উপচিয়ে পড়তে লাগলো; সুখের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে উঠলাম আমি। এমন সময় একটি বৃদ্ধা মার্শিয়নেস তিনি আমার স্বামী রাজকুমারের উপপত্নী ছিলেন—তাঁকে চকোলেট খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। মার্শিয়নেসের বাড়ি থেকে ফিরে আসার দু'ঘণ্টার মধ্যে ভয়ঙ্কর ধরনের কাঁপুনি এল তাঁর; আর তাতেই তিনি মারা গেলেন। কিন্তু এও সামান্য। আমার মত গভীর দুঃখ না পেলেও, মা হতাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আর সেই জন্যই তিনি ঠিক করলেন সেই মারাত্মক জায়গায় আর তিনি থাকবেন না। গেয়িটার পাশাপাশি একটি অঞ্চলে মায়ের একটি বড় সুন্দর জমিদারী ছিল। সেই জন্য বেশ চওড়া একটা পালের জাহাজে চেপে সমুদ্রযাত্রা করলাম আমরা। রোমে সেণ্ট পিটারের যে সিংহাসন রয়েছে তারই মত মসৃণ গতিতে জাহাজটি আমাদের ভেসে চলল। যেতে-যেতে আমাদের জাহাজে একদল জলদস্যু উঠে এল। পোপের বিশ্বস্ত সৈনিকদের মত আমাদের লোকেরাও আত্মরক্ষা করল। তারা জলদস্যুদের কাছে নতজানু হয়ে তাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করল; তারপর তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্যে জলদস্যুপতির কাছে প্রার্থনা জানালো।

'মুর-দস্যুরা সঙ্গে সঙ্গে হনুমানের মত আমাদের গা থেকে সব পোশাক খুলে নিল। আমার মা, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিচারিকা এবং আমার সঙ্গেও তারা একই ব্যবহার করল। সেই সব সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা কত তাড়াতাড়ি আমাদের উলঙ্গ করে ফেললো তা ভাবতেও কেমন অবাক লাগে। এসব বিষয়ে তাদের ক্ষিপ্রতা আর দক্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমার সব চেয়ে অবাক লাগলো তারা যখন আমাদের দেহের যে অংশে কেবল ওষুধ দেওয়ার জন্যই পিচকিরি প্রবেশ করানো হয় সেই জায়গায় তারা আঙুল ঢোকাতে লাগলো। ব্যাপারটা আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত ঠেকলো; কারণ, ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে জানার আগে তাদের বিষয়ে এই ভাবেই আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করে থাকি। পরে কারণটা জানতে পেরেছিলাম। কারণটা হচ্ছে আমাদের শারীরিক সেই গুহাগুলির মধ্যে কোন হীরা লুকানো আছে কিনা সেইটাই দেখার চেষ্টা। অনন্ত কাল ধরে যে সব ভদ্রসন্তানেরা সমুদ্রের ওপরে বিভীষিকার সৃষ্টি করে আসছে এই রীতিটিকেই তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতো। আমি আরও শুনলাম, মালটার ধর্মীয় যোদ্ধারাও একাজ করতে বিরত হতেন না। যখনই তাঁদের হাতে মুরজাতীয়

কোন নারী অথবা পুরুষ ধরা পড়তো তখনই তাঁরা এই প্রক্রিয়ায় অনুসন্ধান চালাতেন। বিশ্বের জাতিপুঞ্জের নিয়মই এই। এই নিয়ম তারা কেউ ভাঙতো না।

'একটি যুবতী রাজকুমারী আর তার মাকে এইভাবে ক্রীতদাসীর বেশে মরক্কোতে নিয়ে যাওয়া হল। এটা যে কত বড় মর্মান্তিক তা বোধ হয় তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে না। সেই জলদস্যুদের জাহাজে আমরা যে কী দুর্ভোগে পড়েছিলাম তা বোধ হয় তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। আমার মা তখনও খুব সুন্দরী ছিলেন; এবং মায়ের পরিচারিকা, এমন কি আমাদের সাধারণ পরিচারিকারাও এত সুন্দরী ছিল যে তামাম আফ্রিকায় অমন সুন্দরী একটা মেয়েকেও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আর আমি তো ছিলাম অপরূপা। একেবারে উর্বশী। তার উপরে আমি ছিলাম অনূঢ়া। কিন্তু হায়রে! সেই কৌমার্যকে আমি বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার যে কৌমার্যকে মাসা-কাব্রারার যুবরাজের জন্যে তুলে রেখেছিলাম সেই কুসুমটিকে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললো সেই মুরিশ জাহাজের ক্যাপটেন। লোকটা ছিল ভীষণদর্শন একটি নিগ্রো। সে মনে করল, আমার ওপরে বলাৎকার করে সে আমাকে সম্মানিতা করছে। সত্যি বলতে কি, প্যালেস-টিনার রাজকুমারী আর আমার সহ্য করার শক্তি ছিল অদ্ভুত। তা না হলে, মরক্কোতে পৌছানোর আগে জাহাজের ওপরে যে শারীরিক কষ্ট আর ধকল আমাদের সহ্য করতে হয়েছিল তা আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু এই সব সাধারণ কথা বলে আমি তোমাদের সময় নষ্ট করবো না। এসব কাহিনী ফলোয়া করে বলার মত নয়।

'মরোক্কোতে নেমে দেখলাম সেখানে রক্তগঙ্গা বইছে। সম্রাট মূলে ইশ-মেইলের পঞ্চাশটি পুত্র। তাদের প্রত্যেকেই এক একটি দলের নেতা হয়ে বসেছে। ফলে গৃহযুদ্ধ বেঁধেছে পঞ্চাশটি। কালোর বিরুদ্ধে কালো, কালোর বিরুদ্ধে পিঙ্গল—বেঁধেছে লড়াই। লড়াই বেঁধেছে পিঙ্গলের সঙ্গে পিঙ্গলের, মুলাটোর সঙ্গে মুলাটোর। এক কথায়, সারা দেশ জুড়ে চলেছে হত্যার তাণ্ডব নৃত্য।

'আমরা তীরে নামার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের ক্যাপটেন যে দলের লোক তার বিরুদ্ধ দলের লোকেরা এসে তার লুণ্ঠিত দ্রব্য কেড়ে নেওয়ার জন্যে আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। টাকা আর হীরা-মুক্তার পরেই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি ছিলাম আমরা। এই সব সম্পত্তি গ্রাস করার জন্য যে তুমুল লড়াই বাঁধলো তা আমি চোখের ওপরে দেখেছি। সেরকম লড়াই ইউরোপের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় তোমরা কোন দিন দেখ নি। আফ্রিকার মানুষদের ভেতরে যে দুটি জিনিস সচরাচর দেখা যায় উত্তরে দেশগুলির মধ্যে সেগুলি দেখা যায় না; অর্থাৎ তাদের ধমনীতে রক্ত তাড়াতাড়ি টগবগ করে ওঠে না; নারীদের

প্রতি তাদের লালসাও ওদের মত অত মারাত্মক নয়। ইউরোপীয়ানদের ধমনীতে মনে হয় শুধু দুধ রয়েছে। কিন্তু মাউন্ট অ্যাটলাশ আর তার আশপাশের অধিবাসীদের শিরায় শিরায় জ্বলছে আগুন আর গন্ধক। কারা আমাদের পাবে সেটা ঠিক করার জন্যে তাদের দেশের সিংহ, বাঘ আর সাপেদের হিংস্রতা নিয়ে তারা লড়াই করতে লাগলো। একটা মুর আমার মায়ের ডান হাতটা ধরে টানলো; আর একটা টান দিল বাঁ হাত ধরে। একটা মুর মায়ের ডান পা ধরে টানলো; আর একটা টান দিল বাঁ পা ধরে। এইভাবে সৈন্যেরা আমাদের দলের প্রত্যেকটি মেয়ের হাত আর পা ধরে টানাটানি সুরু করে দিল। আমার ক্যাপটেন আমাকে তার পেছনে আড়াল করে রেখেছিল। যে তার কাছে আসছিল তাকেই সে তার লম্বা তরোয়াল দিয়ে কেটে কুঁচিয়ে ফেলছিল। অবশেষে দেখলাম, আমার মাকে সেই সব রাক্ষসরা টেনে হিঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। বন্দীরা, আমার সঙ্গীরা, মুরের দল, সেনানীরা মুলাটোরা নাবিকরা, কালো, পিঙ্গল মানুষেরা, এবং অবশেষে আমার ক্যাপটেন সবাই নিহত হল; আমি একা কেবল পড়ে রইলাম সেই শবদেহের স্তূপের ভেতরে। নয়শ মাইল দীর্ঘ এই দেশটিতে প্রতিদিন সেই একই রকমের নৃশংস ঘটনা তখন ঘটছিলো। তবু নবী মহম্মদ প্রতিদিন যে পাঁচবার করে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই নির্দেশের একটাও তারা ভাঙে নি।

'সেই সব জবাই করা মৃতদেহের ওপর থেকে অনেক কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাশের ছোট একটা নদীর পাড়ে যে কমলালেবুর গাছ ছিল হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে তারই নীচে গিয়ে বসলাম। সেইখানে ভয়, আতঙ্ক, হতাশা আর ক্ষিদেতে অবশ হয়ে আমি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়লাম। এইভাবে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আমি পড়ে রইলাম। আমার শরীরে কোন জোর ছিল না, সম্বিতও প্রায় আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এমন সময় মনে হল আমার দেহের উপরে কে যেন নড়াচড়া করছে। তাতেই আমার জ্ঞান ফিরে এল। চোখ খুলে দেখলাম সামনেই একটি লোক। তার মুখটি বড় সুন্দর। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে কী যেন আমাকে বলল।

পরিচ্ছেদ—১২

বৃদ্ধা মহিলার দুঃসাহসিক কাহিনী চলছে

'আমার দেশীয় ভাষায় লোকটিকে কথা বলতে শুনে, আমি যুগপৎ বিস্মিত আর আনন্দিত হলাম। বিশেষ আশ্চর্য হলাম যুবকটির কথায়। তাকে বললাম সে যে সব অভিযোগ করছে তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্ভাগ্য এই দুনিয়াতে ঘটে। এবং আমার মন্তব্যটি যে সত্যি সেটা তাকে বোঝানোর জন্যে আমার জীবনে

যে সব দুর্ভোগ ঘটেছে, যে সব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে পড়তে হয়েছে সেই ইতিহাস ছোট করে তার কাছে আমি বললাম, এবং, তারপরে আবার আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। আমাকে কোলে তুলে নিয়ে সে পাশাপাশি একটি কুটিরে গিয়ে ঢুকলো। সেখানে সে আমাকে বিছানার ওপরে শুইয়ে দিল, আমাকে কিছু খাবার এনে দিল। আমাকে সে খাওয়ালো, সান্ত্বনা দিল, আদর করল; এবং বলল আমার মত অপরূপ সুন্দরী আর কোথাও সে দেখে নি; আর তার যা ক্ষতি হয়েছে সে-ক্ষতি আর কেউ কখনও পূরণ করতে পারবে না। এই কথা বলে সে খুবই দুঃখ করতে লাগলো।

'সে বলল—নেপলসে আমার জন্ম হয়েছিলো। সেই দেশে বছরে দু তিন হাজার শিশুকে খাসি করা হয়। অস্ত্রোপচারে অনেকেই মারা যায়। কারও কারও স্বর এত মিষ্টি হয় যে অনেক কিন্নরকন্ঠীও সেই স্বর শুনে লজ্জা পায়। বাকি সকলকে পাঠানো হয় অঞ্চল আর সাম্রাজ্য শাসন করার জন্যে। বেশ আনন্দের সঙ্গেই এই অস্ত্রোপচার সহ্য করেছিলাম। তারই ফলে, প্যালেসটিনার রাজকুমারীর গির্জাতে আমি চাকরি পেয়েছিলাম গান গাইবার।

'আমি চিৎকার করে উঠলাম—সে কী কথা! আমার মায়ের গির্জাতে?

'ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো যুবকটি; তারপরে বলল—তুমি কী বলতে চাও তুমিই সেই যুবতী রাজকুমারী? সেই তন্বী সুন্দরী? তোমাকেই আমি ছ' বছর পর্যন্ত কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলাম? তোমাকে আজ আমি যে রকম সুন্দরী দেখছি শৈশবেই যার মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি আমি দেখেছিলাম তুমি কি সেই রাজকুমারী? অহো ভাগ্যম!

'আমি উত্তর দিলাম—আমিই সেই রাজকুমারী। একশ' গজের মত দূরে আমার মায়ের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ অসংখ্য মৃতদেহের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে।

'আমার জীবনে যে সব দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল সে-সব কথা আমি তাকে বললাম। সে-ও আমাকে বলল তার জীবনের কাহিনী। চুক্তিপত্রের খসড়া পাকা করার জন্যে কোন একটি খ্রীশ্চান রাজকুমার তাকে মরক্কোর রাজার দরবারে পাঠিয়েছিলেন। সেই শর্ত অনুযায়ী অন্যান্য খ্রীশ্চান সাম্রাজ্যের ব্যবসাপাতি ধ্বংস করার জন্যে সেই খ্রীশ্চান রাজকুমার মরক্কোর রাজার কাছ থেকে সামরিক উপকরণ আর জাহাজ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

'খোজাটি বলল—সেই কাজ আমি শেষ করেছি। আমি এখন দেশে ফিরে যাচ্ছি। সিটাকে গিয়ে আমি জাহাজ ধরবো। সেই সঙ্গে তোমাকেও আমি ইতালীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

'আনন্দে আমার চোখ জলে ভরে উঠলো। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। কিন্তু সে আমাকে ইতালীতে নিয়ে গেল না। নিয়ে গেল অ্যালজিয়ারস-এ। সেখানকার রাজ্যপালের কাছে আমাকে বিক্রী করে দিলে।

ক্রীতদাসী হিসাবে সেখানে আমি সামান্য কিছুদিন বাস করেছিলাম ; এমন সময় আফ্রিকা, এশিয়া আর ইউরোপ পরিভ্রমণ করে হই-হই করতে-করতে প্লেগ সেই দেশে ঢুকে পড়লো। ভূমিকম্প তুমি দেখেছ। কিন্তু মিস, প্লেগ যে কী বস্তু তা কি কোন দিন তোমার চোখে পড়েছে ?'

যুবতী ব্যারনেস বলল—না ; কোন দিন পড়ে নি।

বৃদ্ধাটি বলে গেল—তা যদি দেখতে, তাহলে, তার তুলনায় ভূমিকম্প তোমার কাছে অতি তুচ্ছ বলে মনে হতো। আফ্রিকায় এটা অতি সাধারণ অসুখ। আমিও সেই অসুখে পড়লাম। পোপের মেয়ে আমি। বয়স তখন আমার মাত্র পনের বছর। তিন মাসের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জীবনে কী বিপর্যয় আমার নেমে এল! ভাবতে পার? অর্থাভাবে জর্জরিত হয়েছি আমি; হয়েছি ক্রীতদাসী। প্রায় প্রতিদিন বলাৎকারের অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। মায়ের দেহকে চার টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে আমারই চোখের সামনে। দুর্ভিক্ষ আর যুদ্ধের কবলে পড়েছি। আর এখন অ্যালজিয়ারস-এ ধরলো আমাকে প্লেগে। ব্যাপারটা কী তা কি তুমি অনুধাবন করতে পারছো? সেই রোগে অবশ্য আমি মারা যাই নি ; কিন্তু আমার সেই খোজা, সুলতান, তাঁর পারিষদবর্গ, রাজকর্মচারীর দল, হারেমের সুন্দরীরা—সবাই সেই রোগে খতম হয়ে গেল।

'সেই ভয়ঙ্কর মহামারীর প্রথম ধাক্কা একটু কমার পরেই, সুলতানের যে সব ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী তখন-ও বেঁচেছিল তাদের বেচে দেওয়া হল। একটি বণিক আমাকে কিনে টিউনিশে নিয়ে গেল। সেই লোকটা আমাকে আর একটা বণিকের কাছে বেচে দিল। সে আবার আমাকে বিক্রী করে দিল ত্রিপলীর একটি ব্যবসাদারের কাছে। ত্রিপলী থেকে আমাকে কিনে নিয়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়ার একটি লোক। সেখান থেকে বিক্রী হলাম স্মিরনাতে, স্মিরনা থেকে কনস্তানতিনোপলে। এই ভাবে হাত ফিরতি হতে-হতে শেষ পর্যন্ত আমি সম্পত্তি হলাম একটি তুর্কী সুলতানের প্রধান দেহরক্ষীর। সেই সময় রাশিয়ানরা 'আজব শহরটি অবরোধ করে বসেছিল। আমি দেহরক্ষীর বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই সেই শহরটিকে রক্ষা করার জন্যে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যুদ্ধক্ষেত্রে।

'এই শরীর রক্ষীটির নারীপ্রীতি প্রবল থাকার ফলে, যুদ্ধে যাওয়ার সময় সে তার সব ক্রীতদাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেল। তাদের রাখলো লেক ম্যায়োটিসের ওপরে ছোট একটা দুর্গের মধ্যে। আমাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে রেখে গেল দুটি কালো খোজা আর কুড়িজন সৈন্যকে। আমাদের সেনানীরা রাশিয়ানদের একেবারে কচুকাটা করে ছেড়ে দিল ; কিন্তু অনতিবিলম্বে বদলা নিল তারা। ঝটিকার বেগে 'আজব' শহর তারা দখল করল। তারপরে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে তারা জবাই করতে লাগলো, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ কাউকে বাদ

দিল না। পুড়িয়ে ছাই করে দিল শহরটাকে। আমাদের সেই ছোট দুর্গটাই কেবল সেই মারমুখী অত্যাচারকে কোন মতে প্রতিরোধ করে চলেছিলো। শত্রুরা ঠিক করল, না খেতে দিয়ে আমাদের তারা শুকিয়ে মারবে। সেই কুড়িজন রক্ষী প্রতিজ্ঞা করল বেঁচে থাকতে কিছুতেই তারা শত্রুদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে না। অনাহারের চাপ সহ্য করতে না পেরে দুজন খোজাকে কেটে তারা খেয়ে ফেললো ; তবু তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল না। কিছুদিন পরে তারা ঠিক করল মেয়েদেরও কেটে তারা খেয়ে ফেলবে।

'আমাদের যিনি ইমাম ছিলেন তিনি বড়ই ধার্মিক। দয়ার অবতারও তাঁকে বলা যায়। সেই বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে বললেন তারা যেন সব মেয়েদের একসঙ্গে জবাই না করে।

তিনি বললেন—এখানে যেসব ভদ্রমহিলা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের পাছা থেকে এক তাল করে মাংস কেটে নাও। তাতেই তোমাদের ভাল-ভাবে চলে যাবে। ভবিষ্যতে আবার যদি তোমাদের এই পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে কয়েকদিনের মধ্যেই তোমরা তা আবার পেতে পারবে ; কারণ, কাটা মাংস আবার গজিয়ে উঠবে। আল্লা তোমাদের এই উদার কাজকে সমর্থন এবং তোমাদের উদ্ধার করবেন।

'এই রকম একটি জোরালো বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে অতি সহজেই তিনি তাঁর উপদেশের সারবত্তাটা বুঝিয়ে দিতে পারলেন। আমাদের সকলের ওপরেই যথারীতি অস্ত্রোপচার করা হল। ছুন্নৎ ক্রিয়া সম্পাদন করার পরে ক্ষতস্থানে যে মলম প্রয়োগ করা হয়, আমাদের ক্ষতস্থানে ইমাম সেই মলম প্রয়োগ করলেন। মৃত্যুর জন্যে আমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

'আমাদের পাছার মাংস রান্না করে রক্ষীরা সবেমাত্র ভূরিভোজন শেষে ঢেকুর তুলছে এমন সময় হারে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাশিয়ানরা। সঙ্গে তারা নিয়ে এসেছিলো চওড়া-চওড়া নৌকো। একটা রক্ষীও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো না। আমাদের সেই মর্মান্তিক অবস্থার দিকে রাশিয়ানরা বিন্দু-মাত্র তাকালো না। বিশ্বের সর্বত্র ফরাসী শল্যবিদেরা ছড়িয়ে পড়েছেন। রাশিয়ানদের সঙ্গে সেই রকম দক্ষ একজন শল্যবিদ ছিলেন, তিনি আমাদের চিকিৎসার ভার নিয়ে আমাদের সুস্থ করে তুললেন। আমদের ঘা একদম শুকিয়ে যাওয়ার পরে তিনি আমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিলেন। সেকথা জীবনে আমি ভুলতে পারবো না। আমাদের যা ঘটেছিলো তার জন্যে আমরা যাতে কষ্ট বা দুঃখ না পাই সে-বিষয়েও আমাদের উপদেশ দিতে তিনি দ্বিধা করলেন না। তিনি আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে অনেক অবরোধেই এই রকম ঘটনা ঘটে। এইটাই হচ্ছে যুদ্ধের আইন।

'চলাফেরার মত শক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গিনীদের মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমি পড়লাম একটি সম্রান্ত ভদ্রলোকের হাতে। তিনি

আমাকে তাঁর বাগানে কাজ করাতেন ; আর প্রতিদিন বেত মারতেন কুড়িঘা করে। কিন্তু দু'বছর পরে, রাজসভার চক্রান্তের ফলে, অন্য ত্রিশজনের সঙ্গে সেই ভদ্রলোকটিকে চাকার ওপরে পিষে মেরে ফেলা হয়। এই সুযোগে সেখান থেকে আমি পালিয়ে গেলাম। রাশিয়ার অনেক অঞ্চলে আমি ঘুরে বেড়ালাম। অনেকদিন নানান সরাইখানায় আমি চাকরানীর কাজ করলাম ; প্রথমে রিগাতে ; তারপরে রসটকে, উইসমারে, লিপসিকে, ক্যাসেলে, উট্রেচেতে, লিডেনে, হেগে, আর রটারদামে। দুঃখ আর অপমানের মধ্যে দিয়ে আমি বেড়ে উঠেছি। আমার পাছা আছে মাত্র একটি। কিন্তু আমি যে পোপের মেয়ে সেকথা কোন দিনই আমি ভুলতে পারি নি। নিজেকে হত্যা করার চেষ্টা কতবার যে আমি করেছি তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু পারি নি। এখনও জীবনকে আমি ভালবাসি। এই হাস্যকর দুর্বলতাটি সম্ভবত আমাদের চরিত্রের একটি বিপজ্জনক নীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কারণ যে বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের আমরা মুক্ত করতে চাই সেই বোঝাই দিনের পর দিন বয়ে বেড়ানোর মত হাস্যকর আর কিছু কি আছে? এক কথায় যে সাপ আমাদের গ্রাস করে ফেলবে তাকে আদর করা, আর যে আমাদের বুকে ছোবল মারবে সেই সাপটাকে সোহাগ করা কি বিপজ্জনক নয়? আর সেইটাই কি আমরা দিনরাত করে যাচ্ছি না?

'দুর্ভাগ্যের চাপে পড়ে অনেক দেশেই আমি ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছি ; অনেক সরাইখানাতেই আমি চাকরানীর কাজ করেছি। সেই বিস্তীর্ণ পরিক্রমায় আমি অনেক, অনেক লোক দেখেছি যাদের কাছে জীবনটা হয়ে উঠেছিল বিষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যারা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিল সেরকম মানুষ আমি দেখেছি মাত্র বারো জন ; তার বেশী নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে তিন জন নিগ্রো, চারজন ইংরেজ, চারজন গোঁয়োনিজ, রোবেক নামে একজন জার্মান অধ্যাপক। শেষকালে আমি ছিলাম ডন ইশাচার নামে একজন ইহুদীর বাড়িতে। সুন্দরী যুবতী, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমাকে সেই-খানেই তিনি রেখেছিলেন। তোমাদের ভাগ্যের সঙ্গেই নিজের ভাগ্যকে আমি জড়িয়ে ফেলেছি। আমার জীবনের কাহিনীর চেয়ে তোমাদের কাহিনীই আমাকে আকর্ষণ করেছে বেশী। নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে তোমরা যদি এত হইচই না করতে তাহলে, হয়ত এ-কাহিনী তোমাদের আমি বলতামও না। তাছাড়া, জাহাজে সময় কাটানোর জন্যেও এই ধরনের কাহিনী বলার রীতি একটা রয়েছে। এক কথায়, মিস, এই পৃথিবীর অনেক জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। সেই জন্যেই বলছি, আমার উপদেশ গ্রহণ কর। আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে ফেলো তোমরা। প্রত্যেক যাত্রীকেই তার নিজের নিজের জীবনের কাহিনী বলতে বল। সবাই তারা নিজেদের দুঃখ আর নিষ্ঠুর ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা বলবে। তারা বলবে তাদের মত দুঃখী আর কেউ নেই;

দুর্ভাগ্যের হাতে যে বিড়ম্বনা তারা সহ্য করেছে সে রকম বিড়ম্বনা আর কাউকে সহ্য করতে হয়নি। একথা তারা যদি না বলে তাহলে, তোমরা আমার মাথাটা নিচু করে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো। সে অনুমতি আমি তোমাদের দিচ্ছি।

পরিচ্ছেদ—১৩

সুন্দরী কুঁনিগুঁ আর বৃদ্ধামহিলাটিকে কী করে ছেড়ে যেতে বাধ্য হল কাঁদিদ

বৃদ্ধা মহিলাটির জীবনের কাহিনী আর তাঁর দুঃসাহসিক পরিক্রমার কথা সুন্দরী কুঁনিগুঁ সব শুনলো; শুনে তার পদমর্যাদা আর গুণের ওপরে যেটুকু শ্রদ্ধা দেখানো তার উচিত ছিল সেটুকু শ্রদ্ধা কুঁনিগুঁ বৃদ্ধাকে দেখাতে দ্বিধা করল না। বৃদ্ধার প্রস্তাব সে অতি সহজেই গ্রহণ করল; এবং প্রত্যেক যাত্রীকে তার জীবনের ঘটনা বলতে সে অনুরোধ করল। তাদের কাহিনী শুনে সে আর কাঁদিদ দুজনেই স্বীকার করতে বাধ্য হল যে বৃদ্ধা যা বলেছিল সেকথা সব সত্যি।

কাঁদিদ বলল—খুবই দুঃখের কথা যে ঋষি প্যানগ্লসকে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিতে হল। বিধর্মীদের শাস্তি দেওয়ার রীতি হচ্ছে তাদের পুড়িয়ে মারা। সেই রীতি তাঁর ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় নি। বেঁচে থাকলে, পৃথিবী আর সমুদ্রের ওপরে যে সব নৈতিক আর শারীরিক ব্যাধি ছড়িয়ে রয়েছে তাদের ওপরে তিনি একটি অদ্ভুত সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন। আমার ধারণা, (কাউকে আমি অশ্রদ্ধা করছি না) এ-বিষয়ে কিছু বিপরীত মন্তব্য করার মত সাহস থাকা আমার উচিত ছিল।

সবাই যখন নিজের নিজের জীবনের ঘটনা আর দুর্ঘটনার কথা বর্ণনা করছিল সেই ফাঁকে জাহাজ তার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে জাহাজ থামলো বুয়েনস এয়ারস-এর একটি বন্দরে এসে, কুঁনিগুঁ, ক্যাপটেন কাঁদিদ আর বৃদ্ধা মহিলা—তিনজনে জাহাজ থেকে নেমে এল; তারপরে, দেখা করতে গেল গভর্নরের সঙ্গে। গভর্নরের নাম হচ্ছে ডন ফারনান্দো দ' ইবারা ওয়াই ফিগুয়েরো ওয়াই মাসকারেনা ওয়াই ল্যাম্পোরডস ওয়াই সুজা। এতগুলি নাম যার রয়েছে, সে যেমন উদ্ধত প্রকৃতির হয়, আমাদের এই ভদ্রলোকও সেই-রকম উদ্ধত প্রকৃতির ছিলেন। সকল মানুষের ওপরে তাঁর একটি মহতী ঘৃণা ছিল, নাকটা তিনি সব সময় বিশেষ ভাবে উঁচিয়ে রাখতেন; কথা বলতেন বাজখাঁই গলায়, মেজাজটা ছিল তাঁর খুবই কড়া, আর সেই সঙ্গে চড়া; তিনি যখন হাঁটতেন তখন তাঁর দাম্ভিক পদযুগলের ভারে পৃথিবীটা কেঁপে উঠতো। তাঁর এবম্বিধ আচরণে, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য যার হতো, মহামহিমকে

আচ্ছা করে বেত্রাঘাত করার প্রলোভন তাকে খুব কষ্ট করেই দমন করতে হতো। নারীর প্রতি তাঁর যে প্রীতি ছিল সেটি নিঃসন্দেহে অশালীনতার পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল। তাঁর চোখে কুঁনিগুঁ ছিল স্বর্গের অপ্সরী। তিনি প্রথম কথা বললেন কুঁনিগুঁকে। জিজ্ঞাসা করলেন সে ক্যাপটেনের স্ত্রী কিনা। যে মেজাজে প্রশ্নটি তিনি করলেন তাতে কাঁদিদ দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেল। সত্যি সত্যিই কুঁনিগুঁর সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি। সুতরাং বিয়ে হয়েছে সেকথা কাঁদিদ বলতে সাহস করল না। সে যে তার বোন সেকথাও সে বলতে পারলো না; কারণ কুঁনিগুঁ সত্যি সত্যিই তার বোন নয়। এই জাতীয় মিথ্যা ভাষণ প্রাচীন কালের মানুষদের কাছে যথেষ্ট, এবং আধুনিক কালের মানুষদের কাছে কিছুটা কার্যকরী হলেও কাঁদিদের পবিত্র এবং বিশুদ্ধ হৃদয় তাকে মিথ্যা কথা বলতে দিল না।

সে বলল—মিস. কুনিগুঁ বিয়ে করে আমাকে সম্মানিত করবেন; এবং আমাদের সেই বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়ে শাহানশাহ আপনি আমাদের অনুগৃহীত করবেন আপনার কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

ডন কারনান্‌দো দ' ইবারা ওয়াই ফিগুয়েরো ওয়াই মাসকারেনা ওয়াই ল্যাম্‌পোরডস ওয়াই সুজা কাঁদিদের কথা শুনে গোঁফে মোচড় দিয়ে একটা বিদ্রূপের হাসি হাসলেন; তারপরে সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করার নির্দেশ দিলেন তাকে। সেই নির্দেশ পালন করার জন্যে কাঁদিদ সেখান থেকে চলে গেল। মিস কুঁনিগুঁ রয়ে গেল রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল বেশ আবেগের সঙ্গেই কুঁনিগুঁকে তাঁর প্রেম নিবেদন করলেন; এবং কথা দিলেন যে পরের দিন সকালেই তিনি গির্জায় গিয়ে সকলের সামনে তাঁর হাত তাকে নিবেদন করবেন; অথবা, তার মত অপরূপা সুন্দরী রমণী যা চাইবে তাই তিনি তাকে দেবেন। বিষয়টা নিয়ে বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে সে মিনিট পনেরোর মত সময় চাইলো। সময় নিয়ে সে বৃদ্ধাটির সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হল।

বৃদ্ধা মহিলাটি এই উপদেশ দিল—মিস, রাজবাড়ির চিহ্ন আঁকা তোমার পোশাক রয়েছে বাহাত্তরটি। সেকথা সত্য। কিন্তু বর্তমানে তোমার হাতে একটি কপর্দকও নেই। দক্ষিণ আমেরিকার অপরূপ গোঁফ-ওয়ালা বিশেষ সম্ভ্রান্ত একজন রাজ্যপালের স্ত্রী যদি হতে না পার তাহলে, দোষটা হবে তোমারই। তুমি যে মাত্র একজনকেই ভালবাস এ-গর্ব করে তোমার লাভ কী? একজন বুলগেরিয়ান সেনানী তোমার ওপরে বলাৎকার করেছে। একজন ইহুদী আর একজন ইনকুইজিটর তোমার অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হয় নি। কেউ দুর্ভাগ্যে পড়লে তার কাছ থেকে সুযোগ আদায় করাই হচ্ছে মানুষের ধর্ম। আমি একথা জোর করেই বলছি যে তোমার অবস্থায় আমি পড়লে বিনা দ্বিধায় গর্ভনরকে আমি বিয়ে করতাম। আর বিয়ে করে বীর ক্যাপটেন কাঁদিদের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতাম।

বার্দ্ধক্যের বিজ্ঞতা আর অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃদ্ধাটি যখন কুঁনিগুঁকে বোঝাচ্ছিলো এমন সময় ছোট একটা জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়লো। একজন ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর দলবল নিয়ে সেই জাহাজে ছিলেন। ঘটনাটা হচ্ছে এই রকম।

বৃদ্ধা মহিলাটি ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে লিসবন থেকে দ্রুত পালিয়ে আসার পথে তারা যখন বাদাজোর সরাইখানায় রাত কাটাচ্ছিলো সেই সময় লম্বা জামাপরা একটি ফ্রানসিসকান পাদরীই কুঁনিগুঁর অর্থ আর হীরা-মুক্তাগুলি চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিলো। সেই পাদরীবাবা একটি মণিকারের দোকানে গিয়েছিলো কয়েকটা হীরে বিক্রী করতে। মণিকারটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো যে সেগুলি হচ্ছে গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটরের। সুতরাং তার ফাঁসির হুকুম হল। কিন্তু ফাঁসির দড়িতে গলাটা বাড়িয়ে দেওয়ার আগে সে কবুল করেছিল যে ওইগুলি সে চুরি করেছে। যাদের কাছ থেকে সে জিনিসগুলি চুরি করেছিল তাদের চেহারার একটা বর্ণনা সে দিয়েছিল; কোন্ পথ ধরে তারা এসেছিল সেকথাও সে তাদের বলেছিল। কুঁনিগুঁ আর কাঁদিদের পালিয়ে যাওয়ার সংবাদটা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই দুজনকে ধরার জন্যে কাডিজে লোক পাঠিয়েছিল তারা। যে জাহাজে করে তাদের পাঠানো হয়েছিল সেই জাহাজ এখন বুয়েনোস এয়ারসএ এসে পৌঁছেছে। গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটরের হত্যাকারীদের ধরার জন্যে যে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন সে-সংবাদ সেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেই বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদের কী করতে হবে সেকথা বুঝে নিতে বিজ্ঞ মহিলাটির বিলম্ব হলো না।

সে কুঁনিগুঁকে বলল—তুমি এখন এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারো না; কিন্তু তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। মহামান্য ইনকুইজিটরকে তো তুমি খুন করো নি। তা ছাড়া, গভর্ণর তোমাকে ভালবাসেন। তোমার সঙ্গে কাউকে তিনি খারাপ ব্যবহার করতে দেবেন না। সুতরাং তুমি তোমার ঘাঁটি আঁকড়ে থাকো।

এই বলে সে দৌড়ে কাঁদিদের কাছে গেল; তাকে বলল—পালাও, পালাও। এখান থেকে এখনই পালিয়ে যাও। তা না হলে, তুমি জীবন্ত দগ্ধ হবে।

কাঁদিদ দেখলো অপেক্ষা করার মত যথেষ্ট সময় তার হাতে নেই। কিন্তু কুঁনিগুঁকে ছেড়ে সে যাবে কোথায়? আর যাওয়ার জায়গা-ই বা কোথায় তার রয়েছে।

পরিচ্ছেদ—১৪

প্যারাগুয়েতে জেজিউয়িটদের কাছে কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো কী রকম অভ্যর্থনা পেলো

কাডিজ থেকে আসার পথে কাঁদিদ একটি অনুচর সংগ্রহ করে এনেছিল। এরকম অনুচর সাধারণতঃ স্পেনের উপকূলে অথবা উপনিবেশগুলিতে পাওয়া যায়। এই লোকটির চারভাগের এক ভাগ হচ্ছে স্প্যানিয়ার্ড ; সংকর জাতীয়। জন্ম তার টুকুম্যানে। জীবনে সাফল্যের সঙ্গে সে অনেক কাজই করেছে। গির্জায় গানের জলসায় সাহায্যকারীর কাজ করেছে, গির্জা সংলগ্ন কবরখানায় কাজ করেছে জমাদারের ; জাহাজে খালাসীর কাজ করেছে , মঠধারী সন্ন্যাসী হয়েছে, ফেরিওয়ালা হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় জিনিস ফেরি করেছে ; সৈনিক বৃত্তি করেছে, ফাইফরমাশ খাটার জন্যে লোকের বাড়িতে করেছে চাকরগিরি। এই কৃতিমান মানুষটির নাম হচ্ছে ক্যাকাম্বো। তার মনিব কাঁদিদ ছিল সত্যিকারের উদার হৃদয়বিশিষ্ট একটি মানুষ। সেই জন্যে মনিবকে সে খুবই ভালবাসতো। সে তাড়াতাড়ি দুটি আনদালুসিয়েন জাতের ঘোড়া তৈরি করে ফেললো।

ঘোড়া ঠিক করে সে কাঁদিদকে বলল—আসুন প্রভু। বৃদ্ধা মহিলাটি আমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন সেই মত কাজ করি আসুন। পেছনের দিকে না তাকিয়ে আমরা এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়ি চলুন।

হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললো কাঁদিদ। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল—হায় প্রিয়ে কাঁদিদ! এ কী দুর্দৈব। ঠিক যখন রাজ্যপাল আমাদের বিবাহ উৎসবে পায়ের ধুলো দিয়ে আমাদের সম্মানিত করতে যাচ্ছেন সেই সময় তোমাকে ছেড়ে যেতে আমি বাধ্য হলাম। কুঁনিগুঁ, কতদিন তোমাকে হারিয়েছিলাম। তারপরে তোমাকে ফিরে পেলাম। এখন তোমার কী হবে?

ক্যাকাম্বো সান্ত্বনা দিয়ে বলল—প্রভু! তার যা ইচ্ছে হয় তাই সে করুকগে। মেয়েরা কোন দিনই তলিয়ে যায় না। ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেন। সুতরাং, আর দেরী নয়। আমরা আমাদের পথ দেখি আসুন।

কাঁদিদের মাথাটা তখন গরম হয়ে উঠেছে। সে জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়? কোথায় আমরা যাব? কুঁনিগুঁ ছাড়া আমরা করবোই বা কী?

ক্যাকাম্বো বললো—কমপোসটেলার সেণ্ট জেমসের দিব্যি, আপনি যাচ্ছিলেন প্যারাগুয়ের জেজিউয়িটদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এখন চলুন ; তাদের হয়ে আমরা যুদ্ধ করি গিয়ে। রাস্তাটা আমার মুখস্ত। আপনাকে আমি তাদের রাজত্বে নিয়ে যাব। বুলগেরিয়ান সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেনকে পেলে তারা খুশিই হবে। আপনার সৌভাগ্য নিশ্চয় প্রচুর পরিমাণে ফিরে যাবে। এক জগতে আমরা যদি হিসাব নিকাশ না করে উঠতে পারি, অন্য জগতে

করবো। নতুন জিনিস দেখা আর নতুন বীরত্ব দেখানোর মধ্যে আনন্দ রয়েছে।

কাঁদিদ বলল—তুমি তাহলে প্যারাগুয়েতে ছিলে?

ক্যাকাম্বো বলল—হ্যাঁ; সত্যিই ছিলাম, কলেজ অফ অ্যাসামশনে, আমি ছিলাম একজন স্কাউট। কাডিজের পথঘাট আমি যেমন ভালভাবে চিনি লস প্যাডারস-এর নতুন সরকারের সঙ্গেও আমার তেমনি পরিচয় রয়েছে। ওঃ! নতুন সরকার যে চমৎকার সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। দেশটি এখন ন'শ মাইল লম্বা; দেশটিতে রয়েছে তিরিশটি অঞ্চল। পাদরী-বাবারাই সেখানকার সর্বেসর্বা। সাধারণ মানুষের সেখানে কোন অর্থ নেই। বিচার আর ন্যায়ের চরম পরাকাষ্ঠা! আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি যে এই সব পাদরীবাবাদের মত পবিত্র আত্মা আর কেউ আমার চোখে পড়ছে না। এঁরা বিশ্বের এই অংশে স্পেন আর পর্তুগালের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; আর ঠিক সেই সময়েই তাঁরা এই সব দেশের রাজাদের মরণকালের স্বীকারোক্তি শোনেন। আমেরিকাতে স্পেনের যে-সব নাগরিক রয়েছে তাদের তাঁরা হত্যা করেন; অথচ মাদ্রিদে তাঁরা তাদের আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেন ঈশ্বরের কাছে। ঠিক এই রকম ব্যবহারের জন্যে তাদের ওপরে আমি বেজায় খুশি। চলুন, আমরা এগিয়ে যাই। নশ্বর মানুষদের ভেতরে আপনিই হবেন সবচেয়ে ভাগ্যবান। বুলগেরিয়েন কুজকাওয়াজ জানেন এই রকম একজন ক্যাপটেন তাদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছেন এ শুনলে পাদরীবাবারা আনন্দে দুটো হাত তুলে নাচবেন।

প্যারাগুয়ের প্রথম ফটকের কাছে পৌঁছে ক্যাকাম্বো অগ্রবর্তী বাহিনীর রক্ষীকে ডেকে বলল যে একজন ক্যাপটেন মহামান্য সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে চান। প্রধান বাহিনীর কাছে এই সংবাদটি পাঠানো হলো। সংবাদটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন প্যারাগুয়েন অফিসার ছুটলো সেনাপতির কাছে। তারপর তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ে এই বার্তাটি তাঁকে দিল। কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বোকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করা হলো, এবং তাদের দুটি ঘোড়াকে তারা অস্ত্রহীণ করল। দু ধারে মাস্কেট বন্দুকধারী বাহিনী চলল। তাদের মাঝখানে এই দুটি অপরিচিত লোককে নিয়ে যাওয়া হলো। তিন কোণা একটি টুপি মাথায় দিয়ে সেনাপতি অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটি সুন্দর করে সেলাই করা গাউন তাঁর পরণে; পাশে ঝোলানো একটি তরোয়াল; হাতে ছোট একটা বর্শা। তিনি তাদের দেখেই একটা ইশারা করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চব্বিশটি সৈন্য অপরিচিত লোক দুটির চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। একজন সার্জেন্ট জানালো যে তাদের অপেক্ষা করতে হবে; সেনাপতি এখন তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। কারণ সেই অঞ্চলের সম্মানিত পাদরীবাবা তাঁর সামনে ছাড়া আর কারও সামনে স্পেন দেশের কাউকে কথা বলতে দেবেন না; অথবা, তিন

ঘণ্টার বেশী তাকে তাঁর অঞ্চলে থাকারও অনুমতি দেবেন না তিনি।'

ক্যাকাম্বো জিজ্ঞাসা করল—অঞ্চলের সম্মানিত পাদরীবাবা কোথায়?

সার্জেণ্ট বলল—তিনি এইমাত্র প্রার্থনা সভা থেকে বেরিয়ে প্যারেডে গিয়েছেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে তাঁর পদধূলি নেওয়ার সৌভাগ্য আপনাদের হয়ত হতে পারে।

ক্যাকাম্বো বলল—কিন্তু ক্যাপটেন আর আমি মোটেই স্পেন দেশের মানুষ নই। আমরা হচ্ছি জার্মান। ক্ষিদেতে আমাদের পেট চুঁইচুঁই করছে। আপনি কি বলতে চান মহামান্য পাদরীবাবার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত আমরা না খেয়ে থাকবো?

এই শুনে সার্জেণ্ট তখনই সেনাপতির কাছে সব নিবেদন করল।

মাননীয় সেনাপতি মহাশয় বললে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ওই লোকটি যখন জার্মান তখন ওর কী বলার রয়েছে তা আমি শুনবো। ওকে আমার তাঁবুতে নিয়ে এস।

তৎক্ষণাৎ তারা কাঁদিদকে সেনাপতির সুন্দর তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুটির পাশে লম্বা একটি রাস্তা বেরিয়ে গিয়েছে। তার দুপাশে বৃক্ষ, সবুজ আর সোনালি মার্বেল দিয়ে সেই পথটি সাজানো। পাশেই দ্রাক্ষালতা দিয়ে ঘর করা। সেখানে টিয়াপাখি আছে, গান-করা পাখি আছে, উড়ন্ত পাখি আছে, গিনিপিগ আছে, আর রয়েছে অদ্ভুত রকমের পাখি। সোনার পাত্রে চমৎকার একটি প্রাতরাশ দেওয়া হলো তাঁকে। প্যারাগুইয়ের সৈনিকরা রোদে মাঠের ওপরে বসে কাঠের গামলায় মোটা ভারতীয় শস্য সেদ্ধ করে খাচ্ছে। সম্মানিত পাদরী সেনাপতি তাঁর শীতল তাঁবুর ভেতরে বিশ্রাম করতে গেলেন।

সেনাপতিটি যুবক, এবং চেহারাটি তার বড়ই সুন্দর। গোলগাল মুখ, ফর্সা, ত্বকটি মসৃণ। ভুরু দুটি বঙ্কিম। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। কানের ডগাগুলি লাল, জিবটা সিঁদুর-রঙা; বেশ সাহসী। অপরকে হুকুম করার মতই তাঁর চেহারা। কিন্তু এই রকম সাহস একজন স্প্যানিয়ার্ডের অথবা জেজিউয়িটের মধ্যেও থাকার কথা নয়।

কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বোকে অস্ত্র আর ঘোড়া দুটি ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। ক্যাকাম্বো বেচারা ঘোড়া দুটোকে কিছু গমের দানা খেতে দিল সেইখানে। কিন্তু হঠাৎ যাতে কোন অঘটন না ঘটে এই জন্যে চারপাশে সে সতর্ক দৃষ্টি রাখলো।

সেনাপতির পরিধানের প্রান্তদেশ চুম্বন করে, তাঁর সঙ্গে টেবিলের পাশে গিয়ে বসলো কাঁদিদ।

জেজিউয়িট সেই ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মনে হচ্ছে আপনি জার্মান?

কাঁদিদ বলল—হ্যাঁ, রেভারেণ্ড ফাদার।

কথাগুলি বলার সঙ্গে-সঙ্গে দুজনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো। মনের মধ্যে দুজনেরই যে একটা ভাবাবেগের সৃষ্টি হয়েছে সেটা কেউ আর চেপে রাখতে পারলো না।

জার্মানীর কোন্ অঞ্চলের মানুষ আপনি?

কাঁদিদ বলল—ওয়েস্টফালিয়ার নোংরা অঞ্চলে। আমার জন্ম থানডর-টেন-ট্রনক-এ।

সেনাপতিটি বলল—ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ-ও কি সম্ভব!

চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—কী কাণ্ড!

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করল—তুমি?

এই বলেই দু'জনে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে চোখের জল ফেললো।

রেভারেণ্ড ফাদার! তা হলে, তুমিই? সুন্দরী কুঁনিগুঁর ভাই তুমি? তোমাকেই বুলগেরিয়ানরা হত্যা করেছিল? তুমিই ব্যারনের পুত্র? তুমি এখন প্যারাগুয়ের জেজিউয়িট! সত্যি কী আশ্চর্য এই জগৎ। ও প্যানগ্লস! তোমার যদি ফাঁসি না হতো তাহলে কী আনন্দই না তুমি পেতে!

নিগ্রো ক্রীতদাসদের বিদায় দিল সেনাপতি। যে সব লোকেরা স্ফটিকপাত্রে তাদের খাবার পরিবেশন করছিল তাদেরও সরিয়ে দেওয়া হলো। ঈশ্বর আর সেণ্ট ইগনাটিয়াসকে ধন্যবাদ জানালো সে। কাঁদিদকে দু হাতে সে জড়িয়ে ধরলো। আবার তারা কাঁদতে লাগলো।

কাঁদিদ বলল—তোমার বোন কুঁনিগুঁর কথা বললে তুমি আরও অবাক হবে, ক্ষুব্ধ হবে। তোমার বোনের পেট কেটে দিয়েছিল বলে গুজব রটেছিল। এখন সে বহাল তবিয়তেই রয়েছে।

কোথায়?

তোমারই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, বুয়েনোস আয়ার্সের গভর্নরের কাছে। আমি নিজেই তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম।

দু'জনে যে সব কথা বলছিল সেই সঙ্গে-সঙ্গে নতুন নতুন ভাবাবেগের চাপে পড়ছিল তারা। মনে হচ্ছিল তাদের জিবের ওপরে তাদের আত্মাগুলি পতপত করে উড়ছিলো; চিকচিক করছিল চোখের ভেতরে। সত্যিকার জার্মানদের মতই টেবিলের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে তারা গল্প করল। আঞ্চলিক পাদরী প্রধানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা। সেনাপতি তার প্রিয় কাঁদিদকে এই কথাগুলি বলল:

পরিচ্ছেদ—১৫

প্রিয় কুঁনিগুঁর ভাইকে কাঁদিদ কেমন করে হত্যা করল

'যেদিন আমার চোখের ওপরে আমার বাবা আর মাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, বলাৎকার করা হলো আমার বোনকে, সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি আমি এখনও ভুলি নি ; জীবনে কোন দিন ভুলতেও পারবো না। বুলগেরিয়ানরা চলে যাওয়ার পরে, চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। আমার প্রিয় বোনের কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। আমার বাবার, মার, আমার নিজের, দুটি পরিচারিকার দেহগুলি একটা ঠেলাগাড়ীর ওপরে চাপানো ছিল ; সেই সঙ্গে ছিল তিনটি বাচ্চা বাচ্চা ছেলের। বুলগেরিয়েনরা ছেলেগুলির গলা কেটে দিয়েছিল। আমাদের দুর্গ থেকে মাইল তিনেক দূরে জেজিউয়িটদের একটি গীর্জা ছিল। কবর দেওয়ার জন্যে আমাদের দেহগুলিকে সেইখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। একজন পাদরী আমাদের ওপরে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিলেন। সই জলে মেশানো ছিল নুন, কি জ্বালা ! কী জ্বালা ! কয়েকটা ফোঁটা আমার চোখের ভেতরে ঢুকে গেল। আমার চোখের পাতাগুলি একটু একটু নড়তে লাগলো। পাদরীবাবা তা লক্ষ্য করলেন। তারপরে, আমার বুকের ওপরে একটা হাত রাখলেন তিনি। বুঝতে পারলেন আমার হৃৎপিণ্ডটা তখনও একটু একটু নড়ছে। এই দেখে, তিনি আমার চিকিৎসা করালেন ; সেবা আর যত্নেরও ত্রুটি রাখলেন না। ফলে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। প্রিয় কাঁদিদ, দেখতে যে আমি খুবই সুপুরুষ ছিলাম তা তুমি জানো। এখন আমার চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। এই গীর্জার প্রধান রেভারেণ্ড ফাদার ক্রাউস্ট আমাকে খুব ভাল চোখে দেখতেন। গীর্জায় শিক্ষানবীশের পোশাক আমাকে তিনি দিলেন। কয়েক বছর পরে, গির্জা থেকে আমাকে পাঠানো হলো রোমে। কিছু যুবক জার্মান জেজিউয়িটের দরকার ছিল আমাদের সেনাপতির। প্যারাগুয়ের রাজারা স্পেনীয় জেজিউয়িটদের খুব বেশী পছন্দ করেন না। কারণ, তারা খুব একটা বাধ্য নয়। তাই তাঁরা অন্য দেশের জেজিউটদের বেশী পছন্দ করেন। রেভারেণ্ড ফাদার জেনারেল মনে করলেন ভিনদেশী সৈন্যসংগ্রহের কাজে আমার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। একটি পোল আর তাইরোলিজ বাহিনী নিয়ে আমি রোমের পথে যাত্রা করলাম। সেখানে উপস্থিত হওয়ার পরে সেনাবাহিনীতে লেফটন্যাণ্টের পদ দিয়ে আমাকে তাঁরা সম্মানিত করলেন। এখন আমি কর্ণেল এবং পাদরী। স্পেনের রাজার সৈন্যবাহিনীকে আমরা উষ্ণ আতিথেয়তা জানাবো। তারা যে ধর্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং গোহারান হারবে সেকথা আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি। আমাদের সাহায্য করার জন্যে ঈশ্বরই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমার স্নেহের বোন কুঁনিগুঁ কি সত্যিই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বুয়েনোস আয়ার্সের রাজ্যপালের কাছে রয়েছে?

দিব্যি দিয়ে কাঁদিদ বলল যে কথাটা সত্যি ; এবং সত্যি ছাড়া মিথ্যে নয়। এই শুনে, দুজনের চোখ দিয়েই ফোঁটা-ফোঁটা জল ঝরতে লাগলো। সেই জল গড়িয়ে পড়লো গালের ওপর দিয়ে।

কাঁদিদকে তার নিজের ভাই আর উদ্ধারকর্তা বলে সম্বোধন করে ব্যারন বারবার তাকে আলিঙ্গন করতে লাগলো।

সে বলল—প্রিয় কাঁদিদ, কী সৌভাগ্য আমাদের। খোলা তরোয়াল নিয়ে আমরা সেই শহরে প্রবেশ করে আমার বোনকে উদ্ধার করে আনবো।

কাঁদিদ বলল—সেকথা আর বলতে! তাহলেই আমার আশা সার্থক হবে। কারণ, ঠিক করেছি আমি তাকে বিয়ে করব। আশা করছি, এখনও তা সম্ভব হবে।

ব্যারন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল—তোমার ঔদ্ধত্য তো কম নয়। তুমি! আমার বোনের বাহাত্তরটি রাজবংশতিলক আঁকা রাজবেশ রয়েছে। তাকে তুমি বিয়ে করবে! আমার ধারণা, তোমার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাই তুমি এই কথাটা আমার মুখের ওপরে বলতে পারলে!

তার মুখে এই রকম অপ্রত্যাশিত এবং কিম্ভূতকিমাকার একটা কথা শুনে বজ্রাহত হয়ে গেল কাঁদিদ। সে বলল—রেভারেণ্ড ফাদার, বিশ্বের যত রাজবেশ রয়েছে তাদের আর কোন দাম নেই, একজন ইহুদী আর একজন ইনকুইজিটারের হাত থেকে তোমার বোনকে আমি উদ্ধার করেছি। আমার কাছে সে অনেকভাবে ঋণী ; আমাকে বিয়ে করার জন্যে সেও মনোস্থির করে ফেলেছে। মাষ্টার প্যানগ্লস আমাকে বলেছিলেন, চরিত্রের দিক থেকে সব মানুষই সমান। সুতরাং, তোমার বোনকে আমি যে বিয়ে করবোই সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

থানডার-টেন-ট্রনকের জেজিউয়িট ব্যারন অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বলল—শয়তান, তাই থাকবো। এই বলে তার তরোয়ালের উলটো পিঠ দিয়ে কাঁদিদের মুখে আঘাত করলো সে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কাঁদিদ তার তরোয়ালটা খাপ থেকে খুলে ব্যারনের বুকের মধ্যে সেটা আমূল বসিয়ে দিল। তারপরেই সেই তরোয়ালটা টেনে বার করে নিয়ে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো।

চিৎকার করে সে বলল—হায় ঈশ্বর! এ কী করলাম! এ কী করলাম! আমার পুরানো প্রভু, আমার বন্ধু; আমার শ্যালককে খুন করে ফেললাম! বিশ্বে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ আমি। আর ইতিমধ্যেই তিন-তিন জনকে হত্যা করলাম আমি! আর এই তিন জনের মধ্যে দু জন হচ্ছেন পাদরী!

তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলো ক্যাকাম্বো, দৌড়ে এল সে।

তার প্রভু বলল—আর কিছু বাকি নেই। এবারে আমাদের চরম খেসারৎ দিতে হবে। এরা নিশ্চয় তাঁবুর ভেতরে এসে ঢুকবে। তখন তরোয়াল হাতে

নিয়ে যুদ্ধ করেই আমাদের মরতে হবে।

এরকম দুঃসাহসিক দুর্ঘটনা ক্যাকাম্বো জীবনে অনেক দেখেছে। এই ব্যাপারে সে হতাশ হলো না! সে ব্যারনের গা থেকে তার জেজিউয়িটের পোশাকগুলি খুলে নিল। সে পোশাক পরিয়ে দিল কাঁদিদকে। মৃত লোকটির তিন-কোণা টুপীটিও সে চাপিয়ে দিল কাঁদিদের মাথায়। তাকে ঘোড়ার পিঠে চাপালো। একটার পর একটা এই সব কাজগুলিই খুব তাড়াতাড়ি করে ফেললো সে। তার চিন্তা আর কাজ একই সঙ্গে চললো।

তারপরে সে বললো—এবারে তীর বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিন প্রভু। সবাই ভাববে আপনি একজন জেজিউয়িট। সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়ার জন্যে যাচ্ছেন। তারা আমাদের ধরে ফেলার আগেই আমরা দেশের সীমানা পেরিয়ে যাব।

এই বলেই, সে বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। স্প্যানিশ ভাষায় চিৎকার করে বলতে বলতে ছুটলো—রাস্তা ছাড়ো, রাস্তা ছাড়ো! রেভারেণ্ড ফাদার কর্ণেল আসছেন!

পরিচ্ছেদ—১৬

দুটি মেয়ে, দুটি হনুমান, আর অরিলোন নামধারী বর্বরদের নিয়ে আমাদের ওই দুটি পথিকের কী হল

জার্মান জেজিউয়িট মারা গিয়েছে এই সংবাদ জানাজানি হওয়ার আগেই তারা সেই দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে চলে গেল। ক্যাকাম্বো ছিল খুব সাবধানী। তাই সে আগে থাকতেই তার থলির মধ্যে খাবার ভর্তি করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে ছিল রুটি, চকোলেট, শূয়োরের মাংস, ফল, আর কয়েক বোতল মদ। আনদালুসিয়েন ঘোড়ার পিঠে ছুটতে ছুটতে তারা একটা অদ্ভুত জায়গার মধ্যে ঢুকে গেল। রাস্তা বলতে কোন কিছু সেখানে তাদের চোখে পড়লো না। অবশেষে, একটি সুন্দর মাঠ তাদের চোখে পড়লো। তার পাশ দিয়ে ছোট-ছোট নদীর খাড়ি চলে গিয়েছে। আমাদের সেই দুজন ভ্রমণকারী ঘাস খাওয়ার জন্যে তাদের ঘোড়া দুটিকে সেখানে ছেড়ে দিল, কিছু খাবার মুখে দেওয়ার জন্যে ক্যাকাম্বো তার মনিবকে অনুরোধ করলো ; আর দৃষ্টান্ত হিসাবে, সে নিজেই সুরু করলো খেতে।

কাঁদিদ বলল—আমার প্রভু ব্যারনের পুত্রকে আমি হত্যা করেছি ; সুন্দরী কুঁনিগুঁর সঙ্গে আর কোন দিনই আমার দেখা হবে না। এর পরেও তুমি আমাকে শূয়োরের মাংস খাওয়ার কথা কী করে বলছো? সেই সুন্দরীর কাছ থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে দুঃখ আর হতাশার মধ্যে বেশীদিন এই হতভাগ্য জীবনটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভটা কী? জেজিউয়িটরা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালো-

চনার যে সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে তাতে তারা আমার সম্বন্ধে কী ভীষণ কুৎসা প্রচার করবে সেকথা একবার ভেবে দেখেছ?

এই সব মনোজ্ঞ আত্ম সমালোচনা করতে-করতে সে খেতে থাকে। সূর্য তখন অস্ত যায়-যায়। এমন সময় কয়েকটি চিৎকার এসে আমাদের এই দুটি ভবঘুরের কর্ণপটাহ আক্রমণ করলো। মনে হল, চিৎকারটি একটি মেয়ের। চিৎকারটা দুঃখের না আনন্দের তা তারা বুঝতে পারলো না। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে তারা চমকে উঠলো। অজানা জায়গায় এই ধরনের চিৎকার মানুষের যে অস্বস্তি আর আশংকার সৃষ্টি করে তাদের মনও সেই রকম অজ্ঞাত কোন বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলো। এই চিৎকার আসছিল দুটি মেয়ের কাছ থেকে। তৃণাচ্ছাদিত সামান্য ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ একটি প্রান্তরের ওপরে সেই দুটি মেয়ে উলঙ্গ হচ্ছিলো। আর দুটো বাঁদর তাদের সামনে-সামনে ঘুরে তাদের পাছা কামড়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে কাঁদিদের খুব মায়া হল। বুল-গেরিয়ানদের সঙ্গে থাকার সময় সে বন্দুক ছুঁড়তে শিখেছিলো। ঝোপের মধ্যে কোন পাখি বসে থাকলে কোন পাতা নষ্ট না করেই সে পাখিটাকে গুলি করতে পারতো। সুতরাং সে তার দুমুখো স্প্যানিশ মাস্কেটটা তুলে নিল, ঘোড়া টিপলো, তারপরেই দুটো বাঁদর প্রাণ হারিয়ে মাটির ওপরে পড়ে রইলো।

এই দেখে সে বললো—প্রিয় ক্যাকাম্বো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে মেয়ে দুটিকে আমি উদ্ধার করেছি। একজন ইনকুইজিটর আর একজন জেজিউয়িটকে হত্যা করার ফলে আমি যদি কিছু পাপ করে থাকি তাহলে, এই দুটি মেয়ের জীবন রক্ষা করে তার প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি। কে জানে এরা হয়ত কোন সৎ বংশের মেয়ে। আর এই সাহায্যের জন্যে এদেশে আমাদের হয়ত অনেক কিছু সুবিধে হতে পারে।

আরও কী সব সে বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু বলা হল না। সে হতভম্ব হয়ে দেখলো যে সেই দুটি মেয়ে পরম প্রীতির সঙ্গে মৃত বানর দুটিকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, চোখের জলে মুছিয়ে দিচ্ছে তাদের ক্ষতস্থানগুলিকে, আর সেই সঙ্গে আর্ত চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে ফেলছে।

এই দেখে ক্যাকাম্বোকে সে বলল—এই রকম অদ্ভুত সৎ চরিত্রের মানুষ এখানে যে দেখতে পাব সেকথা আমি ভাবতে পারি নি।

ক্যাকাম্বো বলল—প্রভু, আপনি একটি অদ্ভুত কাজই করেছেন। আপনি কি জানেন, যে বানর দুটিকে আপনি হত্যা করেছেন তারা হচ্ছে ওই মেয়ে দুটির প্রেমিক?

প্রেমিক! তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো, ক্যাকাম্বো। এ হতেই পারে না। এ আমি বিশ্বাস করতে নারাজ—একেবারেই নারাজ।

ক্যাকাম্বো বলল—প্রিয় স্যার, সব কিছুতেই আপনি অবাক হচ্ছেন। বানরেরা মহিলাদের প্রেমময় অনুগ্রহ লাভ করেছে এমন দেশ এ বিশ্বে যে

রয়েছে সেকথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন ? আমি যেমন চারভাগের এক ভাগ স্প্যানিয়ার্ড তারাও তেমনি চার ভাগের এক ভাগ মানুষ।

কাঁদিদ বলল—হায়রে! আমার বেশ মনে রয়েছে গুরুদেব প্যানগ্লস একবার আমাকে বলেছিলেন প্রাচীন যুগে এই রকম দুর্ঘটনা প্রায় ঘটতো। আর জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে মানবজাতির এই সংসর্গের ফলে যাদের জন্ম হতো তাদের কারও-কারও দেহ অর্দ্ধেকটা মানুষ আর অর্দ্ধেকটা ঘোড়ার মত, কারও-কারও ছোট-ছোট শিঙ আর লেজ থাকতো, আবার কেউ-কেউ হতো অর্দ্ধেকটা মানুষ আর অর্দ্ধেকটা ছাগলের মত; এবং প্রাচীন কালের অনেক মানুষ এই জাতীয় দৈত্য দেখেছে। কিন্তু আমার কাছে এই সব জীবের অস্তিত্ব কাল্পনিক বলে মনে হতো।

ক্যাকাম্বো বলল—কিন্তু এসব ঘটনা যে সত্যি তা তো এখন আপনার বিশ্বাস হচ্ছে! উপযুক্ত শিক্ষা না থাকার ফলে, মানুষেরা এই সব জন্তুজানোয়ারদের কী ভাবে ব্যবহার করছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এই সব ভদ্রমহিলারা আমাদের কোন কুৎসিৎ ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবেন।

এই সব বিজ্ঞ মন্তব্য কাঁদিদের ওপরে যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ। কারণ, তারপরেই সে মাঠ পরিত্যাগ করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে সে ক্যাকাম্বোর সঙ্গে রাত্রির আহার শেষ করল; তারপরে, গ্র্যাণ্ড ইনকুইজিটর, বুয়েনোস আয়ার্সের রাজ্যপাল এবং ব্যারনকে প্রাণ ভরে অভিশাপ দিতে-দিতে তারা ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙলে তারা অবাক হয়ে দেখলো যে নড়াচড়ার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ হচ্ছে —সেই অঞ্চলে অরিলোনস নামে একটি মনুষ্য সম্প্রদায় বাস করতো। সেই মেয়ে দুটি ওদের তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে, গাছের ছাল দিয়ে তৈরি বেশ মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে তারা ওদের শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলো। ওদের ঘিরে পঞ্চাশজন উলঙ্গ অরিলোন দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে তীরধনুক, কাঠের মুগুর, আর পাথরের তৈরি হালকা ধরনের কুড়োল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আগুন জালিয়ে তার ওপরে বিরাট একটা কড়াই চাপিয়েছে। আর সবাই গর্ত খুঁড়ছে; কিন্তু চিৎকার করছে সবাই। চিৎকার করে তারা বলছে—জেজিউয়িট, জেজিউয়িট! এবার আমরা বদলা নোব। আনন্দ কর! মজা কর! একে আমরা খাব; রান্না করে সবাই মিলে খাব এস।

ক্যাকাম্বো গভীর দুঃখের সঙ্গে বলল, ওই দুটি বালিকা আমাদের যে ফাঁদে ফেলবে সেকথা আমি আগেই বলেছিলাম স্যার!

সেই ফুটন্ত কড়াই আর গর্ত দেখে, কাঁদিদ কেঁদে ফেলে বলল—মনে হচ্ছে, ওরা আমাদের হয় সেদ্ধ করবে, আর না হয় আগুনে ঝলসে রোস্ট বানাবে। মানুষের পবিত্র চরিত্র তৈরি হওয়ার রীতিটা দেখতে পেলে গুরুদেব প্যানগ্লস কী বলতেন সেইটা ভেবেই আজ আমার দুঃখ হচ্ছে! তিনি বলতেন পৃথিবীতে

যা ঘটে সবই ঠিক। তা হয়ত সত্যি ; কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে মিস কুঁনিগুঁকে হারিয়ে এই সব অরিলোনদের হাতে রোস্ট হওয়াটা সত্যিই বড় বেদনাদায়ক।

গভীর দুঃখ এবং ততোধিক বিপদের মধ্যেও ক্যাকাম্বো কোন দিন তার বুদ্ধি হারায় নি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কাঁদিদকে সে বললো—হতাশ হবেন না। এই লোকগুলোর হতচ্ছাড়া ভাষা আমি কিছু কিছু বুঝি। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলবো।

কাঁদিদ বলল—তাই কর ভাই। তাদের মানুষকে সেদ্ধ আর রোস্ট করাটা যে কী বীভৎস কাজ আর এই ধরনের কাজের মধ্যে খ্রীশ্চান ধর্ম যে বিন্দুমাত্র নেই সেই কথাটা যাতে ওদের মাথায় ঢোকে সেই ব্যবস্থা করো।

ক্যাকাম্বো বলল—ভদ্রমহোদয়গণ, একজন জেজিউয়িটকে তোমরা পুড়িয়ে খাবে এই কথাটাই সম্ভবত তোমরা ভাবছো। তা যদি ভেবে থাকো তাহলে, ভালই করেছ। তোমাদের যারা শত্রু তাদের প্রতি এই রকম ব্যবহার করলে তোমরা কোন অন্যায় করবে না। তাছাড়া, প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে প্রতিবেশীদের খুন করো। আর সেই জন্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের সবাই এই নীতিটি মেনে চলছে। আমরা যে মানুষের মাংস খাই না তার কারণ হচ্ছে মানুষের মাংসের চেয়ে ভাল মাংস খাওয়ার মত সংস্থান আমাদের রয়েছে। কিন্তু আমাদের মত সংস্থান তোমাদের নেই। তোমাদের বিজয়ের ফসল বাতাসের পাখির মুখে তুলে দেওয়ার চেয়ে শত্রুদের ভোজন করা তোমাদের কাছে অনেক বেশী ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের বন্ধুদের ভোজন করতে চাও না। তোমরা ভাবছ একজন জেজিউয়িটকে তোমরা রোস্ট করে খাবে ; কিন্তু এইখানেই তোমরা ভুল করেছো। আমার প্রভু তোমাদের বন্ধু, তোমাদের রক্ষাকর্তা। যে মানুষটি তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করছেন তাঁকেই তোমরা আগুনে ঝলসিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছো ! আর আমার কথা যদি ধর তো বলতে পারি আমি হচ্ছি তোমাদের দেশের মানুষ। এই ভদ্রলোক হচ্ছেন আমার মনিব। তিনি তো জেজিউয়িট ননই ; সম্প্রতি তিনি ওই সম্প্রদায়ের একজনকে হত্যা করে তারই পোশাক নিজের অঙ্গে ধারণ করেছেন। তোমাদের ভুলটা হয়েছে সেই জন্যেই। আমি যে সত্যি কথা বলছি তার প্রমাণ যদি তোমরা চাও, তাহলে, ওঁর এই পোশাকটা খুলে নাও ; সেটা নিয়ে যাও জেজিউয়িট রাজ্যের প্রথম সীমান্তে ; গিয়ে জিজ্ঞাসা করো আমার মনিব তাদের একজন অফিসারকে হত্যা করেছে কি না। এর জন্যে বেশী সময় তোমাদের নষ্ট হবে না, তাছাড়া, আমরা তো রইলামই। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমরা না হয় ফিরে এসে আমাদের রোস্ট করে খেয়ো। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে আমি জানি, সামাজিক নীতি, মনুষ্যত্ব, আর ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায় তা তোমাদের অবশ্যই জানা রয়েছে। আশাকরি, সেই নীতি অনুসারে,

আমার বিশ্বাস, তোমরা আমাদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করবে না।

অরিলোনদের কাছে এই বক্তৃতাটি খুবই ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হলো; এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্যে তারা দুজনকে দ্রুত পাঠিয়ে দিল। সেই দুজন বিজ্ঞের মত তাদের কর্তব্য পালন করলো; এবং তাড়াতাড়ি ফিরে এল শুভ সংবাদ নিয়ে। তারপরে তারা দুজন বন্দীকে মুক্তি দিল; ভব্যতা আর আতিথেয়তা বলতে যা বোঝায় সবই দেখালো তাদের, স্ফূর্তি করার জন্যে যুবতীদের ভাল ভাল খাবার দিল, এবং নিজেদের দেশের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। নিয়ে যেতে যেতে আনন্দে তারা চিৎকার করতে লাগলো—ও জেজিউয়িট নয়। জেজিউয়িট নয়।

তার মুক্তির কারণটা কী বুঝতে পেরে কাঁদিদ প্রশংসা না করে পারলো না।

সে চিৎকার করে বলল—মানুষই বা কী! তাদের রীতি-নীতিই বা কী! আমি যদি মিস কুঁনিগুঁর ভাইয়ের বুকে তরোয়ালটা আমূল বসিয়ে না দিতাম তাহলে নিশ্চয় আজ জীবন্ত অবস্থায় এদের পেটে যেতাম আমি। আসল কথাটা হচ্ছে নির্ভেজাল প্রকৃতি! আহা, কী ধাতু দিয়ে তা গড়া! এবং যেই জানতে পারলো আমি জেজিউয়িট নই, অমনি এরা খেলো তো না-ই; বরং অজস্র ভদ্রতা দেখালো!

পরিচ্ছেদ—১৭

কাঁদিদ আর তার ভৃত্য এল ডোরাডো দেশে হাজির হলো। সেখানে গিয়ে তারা কী দেখলো

তারা অরিলোনস-এর সীমান্ত পেরিয়ে যাওয়ার পর, ক্যাকাম্বো কাঁদিদকে বলল—দেখছেন তো, পৃথিবীর এই অক্ষাংশও অন্য অক্ষাংশের মতই। আমার কথা শুনুন। সোজা রাস্তা দিয়ে আমরা ইউরোপে ফিরে যাই চলুন।

কাঁদিদ বলল—কিন্তু কী করে আমরা যাব? আর যাবই বা কোথায়? আমার নিজের দেশে? বুলগেরিয়ান আর আবারেসরা সেখানে বসে আছে; তরোয়ালের খোঁচায় আর আগুন জেলে দেশটাকে শ্মশান করে দিচ্ছে। আমরা কি পর্তুগালে ফিরে যাব। সেখানে গেলেই আমাকে তারা পুড়িয়ে মারবে। আর আমরা যদি এখানে থাকি তাহলেও, প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু যে অঞ্চলে মিস কুঁনিগুঁ রয়েছে সে-অঞ্চলই বা আমি ছেড়ে যাই কী করে?

ক্যাকাম্বো বলল—চলুন, আমরা কেইন্নিনের দিকে এগিয়ে যাই। সেখানে কয়েকজন ফরাসীদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। কারণ, আপনি

জানেন এই ভদ্রলোকেরা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তারা হয়ত আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে। এই সব বিপর্যয়ের জন্যে ঈশ্বরও আমাদের ওপরে কৃপা করবেন।

কিন্তু কেইয়িনে যাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। জায়গাটা কোথায় সেটা তারা মোটামুটি ভাবে জানতো, কিন্তু পথে ছিল অনেক বাধা। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, উতরাই, ডাকাত, বর্বর জাতি—সব গিজগিজ করছিল সেই পথের ওপরে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘোড়া দুটি মারা গেল। তাদের খাবারও গেল ফুরিয়ে। পুরো একটা মাস ধরে তারা বুনো ফল খেয়ে রইলো। অবশেষে তারা ছোট একটা নদীর ধারে এসে পৌছলো। নদীটির ধারে-ধারে নারকেল গাছের সারি। এদের দেখে তাদের প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার হলো।

সেই বৃদ্ধটির মত ক্যাকাম্বোও সব সময় ভাল-ভাল উপদেশই দিচ্ছিলো। সে কাঁদিদকে বলল—আর এখানে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরা অনেক হেঁটেছি। নদীর ধারে ছোট একটা ছিপ দেখছি। ছিপটা খালি। ওই ছিপে নারকেল বোঝাই করে আমরা ভেসে পড়ি আসুন। নদী সব সময় জনবহুল জায়গার পাশ দিয়ে বয়ে যায়। স্রোতের টানে ভেসে গেলেই কোন বসতির কাছাকাছি আমরা পৌছে যাব। যদি ভাল কিছু দেখতে না পাই, নতুন কিছু তো দেখতে পাব।

কাঁদিদ বলল—রাজি। এখন আমরা ভাগ্যের হাতেই নিজেদের সঁপে দিই এস।

নদীর স্রোতে কয়েক মাইল ভেসে গেল তারা। মাঝে-মাঝে তীরের ওপরে অজস্র ফুল ধরেছিল; কোথাও-কোথাও একেবারে ফাঁকা। কোথাও বা মাটি মসৃণ আর সমতল, কোথাও বা পাহাড়ী, আর খাড়াই আর যতই এগোতে লাগলো ততই নদী চওড়া হতে লাগলো; তারপরে নৌকোটা একটা ভয়ঙ্কর পাহাড়ের সামনে এসে হাজির হলো; এর চূড়াগুলি উঁচু হয়ে মেঘের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এইখানে এসে আমাদের দুজন যাত্রী সাহস করে সেই পাহাড়ের তলা দিয়ে ছিপটা ভাসিয়ে দিল। নদীর জল প্রচণ্ড গর্জনে আর আবর্তে তাদের টেনে নিয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সকাল হলো। আবার তারা সকালের আলো দেখতে পেলো, কিন্তু তাদের ছিপটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। মাইল খানেক তারা এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো; তারপরে, তারা হাজির হল একটা পাহাড়ী চত্বরে। চত্বরটা বেশ বড়, আর ফাঁকা। তার চারপাশে দুরধিগম্য পর্বতমালা। জায়গায় জায়গায় ফুলের চাষও যেমন রয়েছে, ফলের চাষও রয়েছে সেই রকম। যুগপৎ আনন্দ আর প্রয়োজন মেটাচ্ছে জায়গাটা। রাস্তাগুলি বোঝাই, অথবা, শোভিত রয়েছে গাড়ীতে। গাড়ীগুলি তৈরি হয়েছে চকচকে জিনিস দিয়ে। সেগুলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একজাতীয় বড়-বড় মেষ। তাদের গায়ের রঙ লাল। তাতে যে

সব নর-নারী চেপেছে তারা অদ্ভুত রকমের সুন্দর। তীব্র বেগে ছুটে চলেছে গাড়ীগুলি। এত জোরে যে প্রথম শ্রেণীর আন্দালুসিয়া, তেতুয়ান, অথবা মেকিনেজ ঘোড়াও অত জোরে ছুটতে পারে না।

কাঁদিদ বলল—এই দেশটা ওয়েস্টফালিয়ার চেয়ে ভাল বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম যে গ্রামটি তাদের চোখে পড়লো সেইখানেই তারা থামলো। ঢোকার পথে কতগুলি শিশুকে দেখলো তারা। তাদের গায়ে সব চেয়ে দামী ব্রোকেডের ছিন্ন পোশাক, তারা সবাই চাকা নিয়ে খেলছে। বিশ্বের অন্য অক্ষাংশের এই দুটি বাসিন্দা যা দেখলো তাতে বেশ আমোদ পেলো। এই চাকাগুলি গোলাকার, বেগনে, লাল আর সবুজ রঙের। তাদের গা থেকে তীব্র জ্যোতি বেরোচ্ছিলো। আমাদের এই ভ্রমণকারীরা তাদের কয়েকটা তুলে নিল। মনে হলো তারা সব সোনার, এমারেল্ড, রুবি, আর হীরে দিয়ে তৈরি। তাদের মধ্যে সব চেয়ে কম দামী ধাতু দিয়ে আকবর বাদশাহের যদি সিংহাসন তৈরি করা যেতো সেটি হতো বিশ্বের অপূর্ব সিংহাসন।

ক্যাকাম্বো বললো—এই যারা খেলছে তারা নিঃসংশয়ে সব রাজপুত্র।

এই কথা সে যখন বলছে এমন সময় গ্রামের স্কুল মাস্টার ছাত্রদের স্কুলে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এলেন।

কাঁদিদ বলল—উনি হচ্ছেন রাজবংশের শিক্ষক।

সেই ছিন্ন পোশাক পরা ছোকরাগুলি তাদের খেলা ছেড়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় সেই গোল চাকতিগুলি ফেলে রেখে গেলো পেছনে। কাঁদিদ সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে ছুটলো স্কুলের ভেতরে; তারপরে শিক্ষকের কাছে সসম্ভ্রমে মাথাটি নুইয়ে ইঙ্গিতে জানালো যে রাজকুমারেরা সোনা আর মূল্যবান ধাতুগুলি ফেলে চলে গিয়েছে। মুচকি হেসে শিক্ষকটি সেগুলিকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন; তারপরে ভীষণ অবাক হয়ে কাঁদিদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে নিজের কাজে চলে গেলেন।

আমাদের ভ্রমণকারীরা অবশ্য সেই সব সোনা, রুবি আর এমারেল্ডগুলি কুড়িয়ে নিতে ভুললো না।

তারপরেই কাঁদিদ চিৎকার করে উঠলো—আমরা কোথায় এসেছি? রাজার সন্তানেরা নিশ্চয় খুব চমৎকার শিক্ষা পাচ্ছে; কারণ, সোনা আর মূল্যবান জিনিসগুলিকে ঘৃণা করতে তাদের শেখানো হয়েছে।

ব্যাপার দেখে প্রভুর মত ক্যাকাম্বোও অবাক হয়ে গেলো।

সেই গ্রামের যে প্রথম বাড়িটি তাদের চোখে পড়লো সেইখানেই হাজির হল তারা। ইউরোপে প্রাসাদ বলতে যা বোঝা যায় এই বাড়িটি ঠিক সেই রকম। দরজার সামনে এক দল লোক পায়চারি করছিল। ঘরের ভেতরে যারা বসেছিল তাদের সংখ্যা আরও বেশী। ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল খুব মিষ্টি একটা বাজনার স্বর; আর রান্নাঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছিল

খুব মিষ্টি একটা খাবারের গন্ধ। দরজার কাছে এগিয়ে গেলো ক্যাকাম্বো। শুনলো সেখানকার লোকেরা পেরুভিয়ান ভাষায় কথা বলছে। ওইটাই তারও মাতৃভাষা। কারণ সে যে টুকুমানের একটি গ্রামে জন্মেছিল সেকথা সবাই জানে। সেইখানে ওই ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাতে কথা বলা হতো না।

সে কাঁদিদকে বলল—এখানে আমি আপনার দোভাষীর কাজ করবো। আসুন, আমরা ভেতরে যাই। এটা হচ্ছে একটা আহারের স্থান।

ভেতরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে দুজন পরিচারক আর দুজন পরিচারিকা তাদের ডেকে নিয়ে সাধারণ আহারের জায়গায় বসালো। পরিচারিকাদের পরনে সোনার কাপড়, চুলগুলি বাঁধা জরির কাজ করা সুন্দর ফিতে দিয়ে। তাদের ডিনার খেতে দেওয়া হল : চারটি পাত্রের ওপরে বিভিন্ন রকমের 'সুপ' ; প্রত্যেকটি সুপের সঙ্গে সেদ্ধ করা হয়েছে চারটি করে নধর লম্বা লেজওয়ালা টিয়াপাখি জাতীয় এক রকমের পাখি ; একটা বেশ বড়, মানে, বিরাট পাত্র। তার ওপরে রয়েছে দু'হন্দর ওজনের সেদ্ধ মাংস, সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এই রকম দুটি রোস্টকরা বানর, আর একটা পাত্রে রয়েছে তিনশ' ছোট গানকরা পাখি ; একটাতে রয়েছে সেদ্ধ করা ছশ ফ্লাইড বার্ড ; সঙ্গে আছে চমৎকার মাংসের কোর্মা, আর সুস্বাদু চাটনি। এই সব খানা-ই দেওয়া হয়েছে স্ফটিকের পাত্রে। আখ থেকে মাড়াই করা চমৎকার মদ ও পরিচারক আর পরিচারিকার দল তাদের হাতের কাছে এগিয়ে দিল।

সেখানে যারা বসে খাচ্ছিল তাদের অধিকাংশই হচ্ছে ব্যবসাদার আর মালগাড়ীর গাড়োয়ান। বেশ বিবেচনা আর সাবধানতার সঙ্গে তারা ক্যাকাম্বোকে কয়েকটি প্রশ্ন করলো। ক্যাকাম্বো তাদের যে সব প্রশ্ন করলো সেগুলির বেশ ভদ্র আর সন্তোষজনকভাবেই তারা উত্তর দিল।

ডিনার শেষ হওয়ার পরে, কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো ঠিক করলো এই খানার জন্যে তারা বেশ ভাল দামই দেবে। এই ভেবে বেশ ভারি দেখে দুটো সোনার তাল বার করে টেবিলের ওপবে তারা রাখলো। ওইগুলি রাস্তা থেকে তারা কুড়িয়ে এনেছিল। কিন্তু বাড়ির মালিক আর তাঁর স্ত্রী সেই জিনিস দুটিকে দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন। সেই হাসির দাপটে কিছুক্ষণ তাঁরা কোন কথাই বলতে পারলেন না।

হাসি থামলে, মালিক বললেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে বিদেশী তা আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের মত বিদেশীরা এ-অঞ্চলে প্রায় আসেন না। তাই তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এক রকম নেই বললেই হয়। এই সব নুড়িগুলি সাধারণত আমাদের রাস্তার ওপরে পড়ে থাকে। খাওয়ার দাম হিসাবে সেই নুড়িগুলি আপনারা আমাদের দেওয়ার জন্যে আমরা যে হাসছিলাম সেই জন্যে আমাদের আপনারা ক্ষমা করবেন। এদেশের অর্থ নিশ্চয় আপনাদের কাছে নেই। কিন্তু এই বাড়িতে খানাপিনা করার জন্যে কাউকে কোন টাকা

দিতে হয় না। এই দেশে যারা ব্যবসাপাতি করে তাদের জন্তেই সরকার এই সব সরাইখানা খুলেছেন। এখানে আপনাদের সেবা আর যত্নের যথেষ্ট ত্রুটি হয়েছে। হবেই। কারণ, এটি একটি দরিদ্র গ্রাম ; কিন্তু অন্য সব সরাইখানার প্রতিটিতেই আপনাদের যোগ্য আদর যত্নের সুব্যবস্থা রয়েছে।

মালিক যে সব কথা বললেন সেগুলির সবই ক্যাকাম্বো বুঝিয়ে বললো কাঁদিদকে। বলার সময় ক্যাকাম্বোর স্বরে যে-রকম বিস্ময় ফুটে উঠেছিল সেই রকম বিস্ময়ের সঙ্গেই কাঁদিদ তার কথাগুলি শুনলো।

একজন আর একজনকে বললো—এটা কী রকম দেশ! বিশ্বের লোকেরা তো এদেশের কথা শোনে নি। আমাদের অঞ্চলে যে রকম প্রকৃতি আমরা দেখতে পাই, এখানে প্রকৃতি তা নয়। সম্ভবত, বিশ্বের একমাত্র এইখানেই সব জিনিসই খাঁটি রয়েছে। কারণ পৃথিবীতে সে-রকম একটা জায়গা অবশ্যই থাকবে। গুরুদেব প্যানগ্লস যাই বলুন না কেন ওয়েস্টফালিয়াতে সব কিছুই যে খারাপ সেটা আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি।

পরিচ্ছেদ—১৮

এল ডোরাডো দেশে তারা কি দেখলো

মালিককে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলো ক্যাকাম্বো। তাতেই বোঝা গেলো, দেশরীর সম্বন্ধে কৌতূহলের অবধি নেই তার।

এই শুনে সৎ মালিকটি তাকে বললেন—এসব বিষয়ে আমি খুবই অজ্ঞ, স্যার, কিন্তু সেই অজ্ঞতাতেই আমরা খুশি। অবশ্য, আমাদেরই পাশে একটি বৃদ্ধ থাকেন। সম্প্রতি তিনি আদালত থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই দেশে সব চেয়ে বিজ্ঞ মানুষ তিনি ; মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে তাঁর আর জোড়া নেই।

এই বলে, বৃদ্ধ ব্যক্তিটির বাড়ির পথটা তিনি ক্যাকাম্বোকে দেখিয়েছিলেন। কাঁদিদ এখন দ্বিতীয় চরিত্রে পরিণত হয়েছে ; সে সব সময় তার চাকরের পিছু পিছু ঘুরতে লাগলো। তারা যে ঘরে ঢুকলো সেটি অত্যন্ত সাদাসিদে। দরজাটা মাত্র রূপোর ছিল, ভেতরের ছাদটা তৈরি হয়েছিল মাত্র পেটা সোনা দিয়ে। কিন্তু বাড়িটি এমন রুচিসম্মতভাবে তৈরি হয়েছিল যে সব চেয়ে ধনীর প্রাসাদের সঙ্গেও সে স্বচ্ছন্দে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামতে পারতো। পাশের ঘরটিই কেবল রুবি আর পান্না দিয়ে মোড়া, কিন্তু সব কিছুই সেখানে এমন রুচিসম্মত ছিল যে বাড়িটির সব সাধারণত্ব পুষিয়ে গিয়েছিল।

এই বিদেশী এবং অপরিচিত দুটি মানুষকে বৃদ্ধটি অভ্যর্থনা করে সোফার ওপরে বসালেন। সোফাটি তৈরি হয়েছিল ছোট-ছোট গান-করা পাখির পালক

দিলেন। হাতলহীন সোনার পাত্রে তাদের মদ দেওয়ার জন্যে চাকরকে নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপরে তাদের কৌতূহল তিনি এইভাবে মেটালেন :

'আমার বয়স এখন একশ' বাহাত্তর বছর। আমার স্বর্গীয় পিতা ছিলেন রাজার অশ্ব পালক। পেরুতে যে চিত্ত চমৎকারী বিপ্লব ঘটেছিল তা তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে এই বিপ্লবের কাহিনী আমি শুনেছি। এই সাম্রাজ্যটি হচ্ছে ইনকার প্রাচীন পৈতৃক সম্পত্তি। মূর্খের মত তারা এদেশ পরিত্যাগ করে পৃথিবীর একটি অন্য অঞ্চল দখল করতে গিয়েছিলো ; অবশেষে স্প্যানিয়ার্ডদের হাতে গিয়ে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

'তাদের বংশের কিছু রাজকুমার তাঁদের নিজেদের দেশে থেকে বিজ্ঞতার কাজই করেছিলেন। সমস্ত দেশের অনুমতিক্রমে তাঁরা ঘোষণা করে দিলেন যে কোন লোক এই ক্ষুদ্র দেশটি পরিত্যাগ করে যেতে পারবে না। সেই জরুরী আইনের বলেই আমরা আমাদের সুখ আর সারল্য বজায় রাখতে পেরেছি। এদেশের সম্বন্ধে স্প্যানিয়ার্ডদের একটা গোলমেলে ধারণা ছিল। তারা এই দেশটির নাম দিয়েছিলো এল ডোরাডো। প্রায় একশ বছর আগে, স্যার ওয়ালটার র‍্যালে নামে একজন ইংরাজ এ দেশের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু দুর্গম আর খাড়াই পাহাড় আমাদের দেশটিকে চারপাশে ঘিরে রয়েছে। তারই ফলে, ইউরোপের লোভী আর উন্মাদ মানুষদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। আমাদের দেশের পথে-ঘাটে যে সব নুড়ি আর পাথর ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলি কুড়ানোর লোভ তাদের অদম্য। সেই লোভে তারা আমাদের সকলকে নির্বিবাদে হত্যা করতেও সঙ্কোচ বোধ করতো না।'

অনেকক্ষণ ধরেই তাদের আলোচনা চললো। তাদের আলোচনার বিশেষ বিষয় ছিল সরকারের গঠন প্রক্রিয়া, মহিলা, আমোদ প্রমোদ আর চিত্রকলা। দর্শনশাস্ত্রের ওপরে কাঁদিদের একটা ঝোঁক ছিল। দেশের মানুষদের কোন ধর্ম রয়েছে নাকি বৃদ্ধকে সে জিজ্ঞাসা করলো।

প্রশ্নটা শুনে বৃদ্ধটি একটু লালচে হয়ে গেলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সে বিষয়ে আপনার কি কোন সন্দেহ হচ্ছে ? আপনার কি মনে হয় আমরা সব কৃতিম্ন হতভাগ্য ?

এল ডোরোডোর সরকারী ধর্ম কি, অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে ক্যাকাম্বো তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো। এই রকম একটি প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধটির গাল আবার লাল হয়ে

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোন দেশে দুটো ধর্ম থাকে নাকি ? আমার মনে হয়, আমাদের ধর্মই হচ্ছে সারা পৃথিবীর ধর্ম, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের ভজনা করি।

কাঁদিদের সন্দেহটি অনুশীলন করে ক্যাকাম্বো তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো— একটি মাত্র ঈশ্বরকেই কি আপনারা ভজনা করেন ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—নিশ্চয়। ঈশ্বর দুটিও নেই, তিনটিও নেই, চারটিও নেই। আপনারা পৃথিবীর যে-অংশে বাস করেন সেখানকার মানুষেরা যে অদ্ভূত অদ্ভূত প্রশ্ন করেন সেকথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য।

যাই হোক, বৃদ্ধকে কাঁদিদ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও অনেকগুলি প্রশ্ন করলো। এল ডোরাডোর মানুষ কি বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সেটা সে জানতে চাইলো।

সেই মাননীয় ঋষি বললেন—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা আমরা আদৌ করিনে। আমাদের যা প্রয়োজন সবই তিনি আমাদের দিয়েছেন। তাঁর কাছে চাইবার মত আর কিছুই আমাদের নেই। চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

সেই দেশের জন কয়েক পাদরীদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে কাঁদিদের হয়েছিলো। সেই ইচ্ছেটা ক্যাকাম্বোর মুখ দিয়ে বৃদ্ধটির কাছে সে প্রকাশ করলো।

এই শুনে একটু হেসে তিনি বললেন—বন্ধুগণ, আমরা সবাই পাদরী। রাজা এবং প্রতিটি পরিবারের প্রথম পুরুষরা প্রতিদিন সকালে ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানান। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন পাঁচ থেকে ছ' হাজার গাইয়ে-বাজিয়ের দল।

ক্যাকাম্বো বলল—কি বললেন! ঝগড়া বাঁধানোর জন্যে, শাসন করার জন্যে, ষড়যন্ত্র পাকানোর জন্যে, তাঁদের মতের সঙ্গে যাদের মত মেলেনা তাদের পুড়িয়ে মারার জন্যে এখানে কোন পাদরী সম্প্রদায় নেই? তাজ্জব কি বাৎ।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—আপনারা কি আমাদের মূর্খ বলে মনে করেন? এখানে আমাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই, সুতরাং, পাদরী সম্প্রদায় বলতে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন তা আমি বুঝতে পারছি নে।

এই সমস্ত আলোচনার সময়ে কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলো কাঁদিদ। সে নিজের মনে-মনেই বলল—ওয়েস্টফালিয়া আর এই দেশের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য। আমাদের বন্ধু প্যানগ্লস এল ডোরাডো দেশটি দেখলে কিছুতেই বলতে পারতেন না যে থানডার-টেন-ট্রনকের দুর্গটি বিশ্বের সেরা। কথাটা সত্যি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ দেখে বেড়ানোর মত ভাল জিনিস আর নেই।

সমাপ্তি হলো দীর্ঘ আলোচনার। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছটা মেষকে সাজানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন; সঙ্গে দিলেন ছজন সহিস। তাদের সঙ্গে দিলেন বারোটি চাকর। রাজসভায় এই দুটি পর্যটককে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন চাকরদের।

তিনি বললেন—আপনাদের সঙ্গে আমি নিজে যে যেতে পারলাম না সেজন্যে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার এই বয়সটাই সেই সম্মান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। রাজা আপনাদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা জানাবেন।

তাঁর অভ্যর্থনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মত কিছু আপনাদের থাকবে না। আর একটা কথা। আমাদের দেশের রীতিনীতি আপনাদের সম্পূর্ণরূপে খুশি করতে না পারলেও, আশা করি আপনারাও তাদের কুৎসা করবেন না।

কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো দুজনেই গাড়ীর ওপরে উঠে বসলো। ছয় মেষের গাড়ী তাদের নিয়ে তীর বেগে ছুটতে আরম্ভ করলো। শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে রাজপ্রাসাদ। মিনিট পনেরর আগেই তারা সেখানে পৌঁছে গেলো। প্রবেশদ্বারেই দেউড়ী। বারান্দাও বলতে পারেন তাকে। উঁচুতে দুশ' কুড়ি ফুট, চওড়ায় একশ' ফুট। কিন্তু সেই দেউড়ীটা যে কি জাতীয় মশলা দিয়ে তৈরি হয়েছিলো তা ঠিক ভাবে নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব। পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে সব নুড়ি আর পাথরকে আমরা সোনা আর মূল্যবান পাথর বলে সনাক্ত করি, দেউড়ীর মাল-মশলা তাদের চেয়ে অনেক উন্নত শ্রেণীর।

গাড়ী থেকে নামার সময়, কুড়িটি তন্বী, সুন্দরী অনূঢ়া যুবতী তাদের অভ্যর্থনা জানালো, নিয়ে গেলো তাদের স্নানের ঘরে। সেইখানে 'হামিং বার্ড, অর্থাৎ গুনগুনে পাখির পালক দিয়ে তৈরি করা পোশাক তাদের পরালো। তারপরে, রাজার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং তাঁদের মহিষীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে রাজপ্রকোষ্ঠে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো। প্রায় এক হাজার করে গায়ক-শিল্পীর দল দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়ালো। দুটি সারির মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগলো তারা। এইটাই হচ্ছে এখানকার দেশাচার। রাজপ্রকোষ্ঠের কাছাকাছি এসে পড়লো তারা। কী ভাবে মহারাজের কাছে তারা নজরানা দেবে সেই কথাটা ক্যাকাম্বো একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলো। মহারাজের সামনে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোই কি সে দেশের রীতি? না, মাটির ওপরে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়াই সে-দেশের প্রথা? তারা কি মহারাজের সামনে দুটো হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে দেবে? না, হাত দুটিকে পেছনের দিকে বেঁধে রাখবে? তারা কি জিব দিয়ে মাটি চাটবে? এক কথায়, এই সব ক্ষেত্রে সেই দেশে কি ধরনের প্রথা রয়েছে?

সেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীটি বললেন—এসব ক্ষেত্রে এখানকার রীতি হচ্ছে দুহাত দিয়ে মহারাজের গলা জড়িয়ে ধরা, এবং তাঁর দুটি গালে দুটি চুমু খাওয়া।

সেই প্রথা অনুযায়ী রাজসন্নিধানে গিয়ে কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বো মহারাজের গলাটি দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো; মহারাজ অত্যন্ত বিনীতভাবে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন, এবং খুবই সমাদরের সঙ্গে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁদের।

খানা তৈরি হওয়ার আগে, পর্যটক দুটিকে শহর দেখিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন মহারাজা। রাস্তায় বেরিয়ে বিরাট-বিরাট আকাশচুম্বী প্রাসাদ দেখলো তারা; দেখলো হাট আর বাজার। বাজারগুলির সবক'টিই সহস্রস্তম্ভী।

দেখলো ঝরনা ; তা ছাড়া দেখলো গোলাপজলের ঝারি ; আর আখ পিষে সুরা বার করার প্রক্রিয়া। সেই সুরা আর গোলাপজলের ঝারি বড়-বড় মাঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। পার্কগুলি এক রকমের দামী পাথর দিয়ে মোড়া। সেই সব পাথর থেকে লবঙ্গ আর দারুচিনির গন্ধ বেরোচ্ছে। 'হাইকোর্ট অফ জাসটিস,' আর পার্লিয়ামেণ্ট দেখতে চাইলো কাঁদিদ। তারা শুনলো, ওদেশে মামলা-মকোদ্দমা নেই বলে ও দুটি জিনিসও সেখানে নেই। সেখানে কোন কয়েদখানা রয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলো কাঁদিদ। না, নেই। কিন্তু একটা বাড়ি দেখে সে যুগপৎ আনন্দ পেলো আর বিস্মিত হলো। সেটি হচ্ছে বিজ্ঞান-প্রাসাদ। সেখানকার গ্যালারীটি হচ্ছে দুহাজার ফুট লম্বা। অঙ্ক আর প্রকৃতিবিজ্ঞানের অজস্র যন্ত্র সেখানে বোঝাই হয়ে রয়েছে।

শহরে এত জিনিস দেখার ছিল তার কতটুকুই বা দেখার সময় পেলো তারা! সারাটা বৈকাল ধরে যা দেখেছিল তা এক হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। তারপরে, তাদের রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে আনা হলো। চাকর ক্যাকাম্বো, আর রাজসভার কয়েকজন মহিলার সঙ্গে মহারাজের পাশে খেতে বসলো কাঁদিদ। এত সুরুচিসম্পন্ন ভোজের আসর আর কোন দিনই সে দেখে নি। খেতে বসে মহারাজ যে-রকম সরস বাক-চাতুর্য দেখিয়েছিলেন সেরকমটি আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন দেখাতে পারে নি। মহারাজের সরস বাক্যগুলি ক্যাকাম্বো অনুবাদ করে কাঁদিদকে শোনালো। এই দেশে অনেক জিনিস দেখেই কাঁদিদ হতভম্ব হয়েছিলো। রাজার পরিহাসবাক্যের অনুবাদ শুনে সে কম হতভম্ব হয় নি। কারণ, রাজার সরস বাক্যগুলি যদিও সে অনুবাদের মাধ্যমে শুনেছে তবুও সেগুলি সরস বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়। অতিথিবৎসল এই দেশটিতে তারা প্রায় একমাস কাটালো। সেই সময় কাঁদিদ ক্রমাগত ক্যাকাম্বোকে বলে যাচ্ছিল—

'বন্ধু, আমি যেখানে জন্মেছিলাম সে-জায়গাটা যে এর তুলনায় কিছু নয় সেই কথাটা তোমার কাছে আবার আমি স্বীকার করছি ; কিন্তু তবু মিস কুঁনিগুঁ এখানে নেই ; এবং নিঃসন্দেহে, তোমারও কোন প্রেমিকা হয়ত ইউরোপে রয়েছে। এখানে থেকে গেলে আমরা এখানকার মানুষদের মতই হয়ে যাবো। কিন্তু একডজন এল ডোরাডোর মেষের পিঠে চাপিয়ে এখানকার পথের নুড়ি-পাথরগুলি যদি আমরা নিয়ে যেতে পারি তাহলে, ইউরোপে যত রাজা রয়েছেন তাঁদের চেয়ে ধনী হয়ে যাবো আমরা। ইনকুইজিটরের ভয়ে আর আমাদের জীবন কাটাতে হবে না ; আর মিস কুঁনিগুঁকেও হয়ত আমরা উদ্ধার করে আনতে পারবো।

এই বক্তৃতা শুনে খুবই খুশি হলো ক্যাকাম্বো। বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ, নিজেদের দেশের লোকের কাছে নাম কেনার চেষ্টা, আর চারপাশ ঘুরে বেড়ানোর ফলে তারা যা দেখেছে সেই সব কথা গর্ব করে বলে বেড়ানোর দম্ভ,

এই দুটি পর্যটকের মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করলো যে তারা ঠিক করে ফেললো সেখানে আর তারা সুখী হতে পারবে না। দেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তারা তাই মহারাজের অনুমতি চাইলো।

মহারাজ বললেন—দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটা তোমাদের কাছে হবে হঠকারিতা, আর মূর্খামির নামান্তরমাত্র। আমার সাম্রাজ্যে যে অনেক অসুবিধে রয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু মানুষ যদি কোথাও শান্তিতে বাস করতে চায়, তাহলে, সেই জায়গাটা হচ্ছে এই দেশ। অবশ্য, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের, অথবা, কোন বিদেশীকে আটকে রাখার ইচ্ছা নিশ্চয় আমার নেই। সেটা হবে একটা অত্যাচার। আমাদের রীতিনীতি আর অনুশাসন দুটিই সেই বাধ্যবাধকতাকে এ-দেশের সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে মনে করে। সব মানুষই স্বাধীন। যখন খুশি, এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্ণ অধিকার তোমাদের রয়েছে; কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার সময় অনেক বিপদ আপদের মুখে পড়তে হবে তোমাদের। ওই যে উঁচু আর খিলান-দেওয়া পাহাড়গুলি দেখছো ওর নিচে দিয়ে যে খরস্রোতা নদীটি বয়ে যাচ্ছে তার স্রোতের উজানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। ওই স্রোতেই তোমরা ভেসে এসে এখানে উঠেছো বটে, কিন্তু সে একটা অলৌকিক কাজ, যে পর্বতমালা আমার রাজত্বটিকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে তাদের উচ্চতা দশ হাজার ফুট, আর একেবারে খাড়াই। সেখানে ওঠা আর সেখান থেকে নামা একেবারেই দুঃসাধ্য। তবু এদেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যখন তোমরা মনস্থ করেছো তখন এখনই আমি আমার যন্ত্র-মন্দিরের অধিকর্তাকে নির্দেশ পাঠাচ্ছি। তোমাদের নিরাপদে ওপাশে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করবেন। পাহাড়ের ওপাশে পৌঁছে দেওয়ার পরে আর কিন্তু তোমরা তাঁর সাহায্য পাবে না। কারণ, আমার প্রজারা প্রতিজ্ঞা করেছে কোনদিনই তারা দেশের বাইরে যাবে না। সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙার মত অবিদ্যা তাদের নেই। তোমাদের আর কী চাই আমাকে বল।'

ক্যাকাম্বো বললো—মহারাজাধিরাজ, আমরা চাই কয়েকটি মেষ, খাবার, আর আপনার দেশের কিছু নুড়ি-পাথর আর পথের ধূলো।

এই অনুরোধ শুনে রাজাধিরাজ মুচকে একটু হাসলেন। তারপরে বললেন—আমাদের দেশের হলদে মাটিতে তোমরা ইউরোপীয়ানরা যে কী খুঁজে পাও তা আমি কল্পনাও করতে পারি নে। ঠিক আছে; যত পারো নিয়ে যাও। এতে তোমাদের বেশ উপকার হতে পারে।

এই দুটি অনবদ্য প্রকৃতির মানুষকে সাম্রাজ্যের বাইরে পার করে দিয়ে আসার জন্যে যন্ত্রশিল্পীকে নির্দেশ দিলেন তিনি। তিন হাজার গণিত বিশারদ সেই নির্দেশ পেয়ে কাজে বসে গেলেন; পনের দিনের মাথায় শেষ হলো কাজটি। এই কাজটি শেষ করতে সে-দেশের মুদ্রায় কুড়ি মিলিয়ন স্টারলিঙের বেশী খরচ হয় নি। কাঁদিদ আর ক্যাকাম্বোকে বসানো হলো সেই যন্ত্রটির ওপরে। তারা

সঙ্গে নিল দুটো বড় লাল মেষ। তাদের মুখে ছিল লাগাম; পিঠে ছিল জিন। পাহাড়ের অপর পাড়ে গিয়ে তাদের পিঠে চড়ে তারা যাবে। কুড়িটা মেষ তাদের খাবার বয়ে নিয়ে গেলো। দেশের মধ্যে যা কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ছিল সেগুলি বোঝাই করে নিয়ে গেলো তিরিশটি মেষ। পঞ্চাশটি মেষ গেলো সোনা আর অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ নিয়ে। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে মহারাজ এই দুটি ভবঘুরেকে আলিঙ্গন করলেন।

তাদের বেরিয়ে আসার সময় যে-দৃশ্যটির অবতারণা হয়েছিল তা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। যেভাবে তাদের আর মেষগুলিকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হলো তাতে যন্ত্রশিল্পীদের কৃতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নিরাপদ জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েই গণিত-বিশারদেরা, আর যন্ত্রশিল্পীরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন। মিস কুঁনিগুঁকে তার মেষটি উপহার দেওয়ার চিন্তায় মসগুল হয়ে রইলো কাঁদিদ।

সে বললো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। যদি অর্থ দিয়ে মিস কুঁনিগুঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাহলে, বুয়েনোস আয়ার্সের রাজ্যপালকে দেওয়ার মত অনেক অর্থ আমার রয়েছে। চল; তাড়াতাড়ি আমরা কেইনিনের দিকে এগিয়ে যাই। সেখান থেকেই জাহাজ ধরবো আমরা। তারপরে, কোন্ সাম্রাজ্য আমরা কিনবো সে চিন্তা ধীরে-সুস্থে করলেই হবে।

পরিচ্ছেদ—১৯

সুরিনামে তাদের কী হলো; মার্টিনের সঙ্গে কাঁদিদের পরিচয়

আমাদের পর্যটক দুটির প্রথম দিকের যাত্রাটি সুখপ্রদই হয়েছিল। ইউরোপ এশিয়া আর আফ্রিকায় যত ধনরত্ন রয়েছে তার চেয়েও বেশী অর্থ তাদের রয়েছে এই আনন্দে তাদের বুকের ছাতি ফুলে উঠলো। প্রেমে উন্মাদ হয়ে কাঁদিদ গাছে গাছে কুঁনিগুঁর নাম লিখতে লাগলো। দ্বিতীয় দিনে তাদের দুটি মেষ জলা জমিতে পড়ে গেলো; মানুষশুদ্ধ তলিয়ে গেল তার ভেতরে। কয়েক দিন পরে, পথশ্রম সহ্য করতে না পেরে দুটি মেষ মারা গেলো। সাত-আটটি মেষ মরুভূমিতে না খেতে পেয়ে দেহত্যাগ করলো। আর অন্যান্যগুলি বিভিন্ন সময়ে পাহাড়ের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল নীচে। হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল। একশ দিন পথযাত্রার শেষে বেঁচে রয়েছে মাত্র দুটি মেষ।

কাঁদিদ ক্যাকাম্বোকে বলল—এই পৃথিবীর সম্পদ যে কত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, প্রিয়, বন্ধু, তা বোধ হয় তুমি দেখতে পাচ্ছো। এখন মিস কুঁনিগুঁকে আবার চাক্ষুষ দেখার মত আনন্দ আর ধর্ম আর কিছু নেই।

ক্যাকাম্বো বললো—খুবই সত্যি! কিন্তু এখনও আমাদের দুটি মেষ রয়েছে। তাদের পিঠে আমাদের যা সম্পদ আছে তা স্পেনের রাজার চেয়েও বেশী। দূরে একটা শহর দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে ওর নাম স্থরিনাম। ডাচদের শহর ওটা। আমাদের দুঃখ যন্ত্রণার শেষ হয়েছে। এবার আমরা সুখের মুখ দেখতে পাবো।

শহরের কাছে এসেই তারা দেখতে পেলো মাটির ওপরে একটি নিগ্রো টান টান হয়ে শুয়ে রয়েছে। দেহের পোশাকটা তার আধখানা। এই জোড়া নীল রঙের তুলোর ট্রাউজার। কারণ, দরিদ্র লোকটির বাঁ পা আর ডান হাত নেই।

কাঁদিদ ডাচ ভাষায় বললো—হায় ঈশ্বর। এই শোচনীয় অবস্থায় এখানে কী করছো তুমি?

নিগ্রোটি বললো—আমার মনিব, বিখ্যাত ব্যবসাদার মাইনহার ভ্যানদার-দেনদারের জন্য অপেক্ষা করছি।

ওই লোকটাই কি তোমার সঙ্গে এই রকম নির্দয় ব্যবহার করেছে?

নিগ্রোটি বললো—হ্যাঁ, স্যার। এখানে এই রীতিই প্রচলিত রয়েছে। বছরে দুবার তারা আমাদের এক জোড়া করে তুলোর ট্রাউজার দেয়। আমাদের দেহের আবরণ বলতে সম্বল মাত্র ওইটি। আখের ক্ষেতে কাজ করার সময় মিলে আমাদের একটা আঙুল যখন উড়ে যায়; ওরা তখন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা হাত কেটে ফেলে। পালিয়ে-যাওয়ার চেষ্টা করলে, ওরা আমাদের একখানা পা কেটে দেয়। আমার ক্ষেত্রে দুটো কারণই ঘটেছে। ইউরোপকে চিনি খাওয়ানোর জন্যে আমাকে এই খেসারত দিতে হচ্ছে। কিন্তু তবু গায়নার উপকূলে দশটি মুদ্রার বিনিময়ে আমাকে বিক্রি করে দিয়ে মা বলেছিলেন—প্রিয় পুত্র, ওঁদের চিরকাল স্তব করো। তোমাকে ভালভাবেই রাখবেন। প্রভু শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস হওয়ার সম্মান তুমি পেয়েছো। এই সেবা করে তুমি তোমার বাবামার কপাল ফেরাবে। হায়রে! আমি তাঁদের কপাল ফেরাতে পেরেছি কি না জানি নে। কিন্তু তাঁরা আমার কপাল ফেরাতে পারেন নি। কুকুর, বানর, টিয়াপাখি—এদের অবস্থা আমার চেয়ে হাজারগুণ ভালো। ডাচেরা আমাকে খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। প্রতি রবিবার প্রার্থনা সভায় তারা আমাকে বলে যে সাদা আর কালো—সবাই হচ্ছে আমাদের সন্তান। বংশতালিকার সম্বন্ধে আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু এই সব পাদরীবাবা যা বলেন তা যদি সত্য হতো তাহলে আমরা হচ্ছি সব বৈমাত্রেয় ভাই। আপনি আমাকে যদি বলতে অনুমতি দেন তাহলে বলতে পারি সেই বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে যে রকম খারাপ ব্যবহার করে মানুষের ওপরে তার চেয়ে খারাপ ব্যবহার করা অসম্ভব।

এই শুনে চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—ও প্যানগ্লস! এরকম জঘন্য,

নারকীয় কাজ কোন দিনই আমি কল্পনা করতে পারি নি। এখানেই আমার শেষ। নিজের বিচার বিবেচনার ফলে, আশাবাদকে পরিত্যাগ করতে আমি বাধ্য হলাম।

ক্যাকাম্বো জিজ্ঞাসা করলো—কী বললেন স্যার! আশাবাদ! সেটা আবার কী বস্তু?

কাঁদিদ বললো—আশাবাদ হচ্ছে একটা গোয়ার্তুমি! সব চেয়ে খারাপ অবস্থায় যে মানুষ বলে সব কিছুই সব চেয়ে ভালো তখনই তাকে বলা হয় আশাবাদী। এই বলে, হতভাগ্য নিগ্রোটির দিকে সে তাকিয়ে রইলো। টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ দুটো থেকে। সেই রকম কাঁদতে কাঁদতে সে সুরিনাম শহরে প্রবেশ করলো।

বুয়েনোস আয়ার্সে যাওয়ার জন্যে বন্দরে কোন জাহাজ অপেক্ষা করছে কি না, শহরে ঢুকেই আমাদের এই দুটি পর্যটক খোঁজ খবর নিতে লাগলো। যে লোকটির কাছে তারা এই প্রশ্নটি করেছিল সৌভাগ্যক্রমে সেই লোকটিই হচ্ছে একটি স্প্যানিশ জাহাজের মালিক। মোটামুটি একটা ভাড়ায়-সে তাদের নিয়ে যেতে চাইলো, ব্যবস্থাটা পাকা করার জন্যে সে তাদের একটি সরাইখানায়-ডাকলো। সেই কাঁদিদ আর তার বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যাকাম্বো মেষ দুটি নিয়ে যথা-সময়ে সেইখানে হাজির হলো।

কাঁদিদ সরল প্রকৃতির মানুষ। মনের ভেতরে সে কিছু চেপেচুপে রাখতে পারে না। স্প্যানিয়ার্ডটির কাছে তার দুঃসাহসিক অভিযানের সব কথা সে খুলে বললো। মিস কুঁনিগুঁকে নিয়ে পালিয়ে আসতে সে যে বদ্ধপরিকর সেকথা বলতেও সে দ্বিধা করলো না।

জাহাজের মালিক বললো—সে ক্ষেত্রে, বুয়েনোস আয়ার্সে আপনাকে না নিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করবো আমি। কারণ, আপনার পরিকল্পনা মত কাজ করার চেষ্টা করলে, আমাদের সবাইকে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে ঝুলতে হবে। সুন্দরী কুঁনিগুঁ হচ্ছে এখন গভর্ণরের আদরের উপপত্নী।

কেউ যেন কাঁদিদের গালে দুটো বিরাশী শিক্কার চড় বসিয়ে দিল। অনেকক্ষণ ধরে সে খুব কাঁদলো। ক্যাকাম্বোকে একপাশে ডেকে সে বললো—

'প্রিয় বন্ধু, তোমাকে কী করতে হবে বলছি। আমাদের প্রত্যেকের পকেটে পাঁচ থেকে ছ'মিলিয়ন দামের হীরে রয়েছে। এসব বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশী চতুর। তুমি নিজে বুয়েনোস আয়ার্সে গিয়ে কুঁনিগুঁকে নিয়ে পালিয়ে এস। গভর্ণর কোন গোলমাল করলে তাকে এক মিলিয়ন দিয়ো। তাতেও রাজি না হলে, দু' মিলিয়ন দিয়ো। তুমি ইনকুজিটরকে খুন করনি। সুতরাং, তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। আর একটা জাহাজে করে ভেনিসে গিয়ে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো। ভেনিসে হচ্ছে স্বাধীন নগরী।

সেখানে বুলগেরিয়েন, অ্যাবারেস, ইহুদী অথবা ইনকুইজিটরের কোন ভয় নেই।

এই বিজ্ঞ প্রস্তাবে আনন্দে ক্যাকাম্বো হাততালি দিয়ে উঠলো। তবে, এত ভাল প্রভুকে ছেড়ে চলে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো তার। কারণ, কাঁদিদ তাকে চাকরের মত দেখতো না, দেখতো অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। কিন্তু প্রভুর জন্যে কিছু করতে যাচ্ছে এই আনন্দে সে তার দুঃখ ভুলে গেলো। চোখের জলের ভেতর দিয়ে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো। সেই বৃদ্ধা মহিলাকে ভুলে না যাওয়ার কথা ক্যাকাম্বোকে বারবার সে অনুরোধ করলো। সেই দিনই বেরিয়ে গেলো ক্যাকাম্বো। এই ক্যাকাম্বো সত্যিকারের সৎ মানুষ ছিল।

সুরিনামে আরও কয়েকটা দিন রয়ে গেলো কাঁদিদ। তাকে আর তার দুটি মেষকে ইতালীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জাহাজের একটি ক্যাপটেনের জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্যে অনেক কিছু জিনিসপত্র কিনতে লাগলো সে। অবশেষে মাইনহার ভ্যানদারদেনদার, একটি বড ডাচ জাহাজের ক্যাপটেন, তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—আমাকে, আমার চাকরবাকরদের, এই যে দেখছেন দুটি মেষ তাদের, আর আমার জিনিসপত্র সোজাসুজি ভেনিসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কত নেবেন আপনি ?

ক্যাপটেন দশ হাজার ডাচ মুদ্রা চাইলো। বিনা দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলো কাঁদিদ।

চতুর ক্যাপটেন ভাবলো—ও হো! এই লোকটার নিশ্চয় অনেক অর্থ রয়েছে। বিনা দ্বিধায় এক কথায় ও দশ হাজার ডাচ মুদ্রা দিতে রাজি হয়ে গেলো ?

একটু পরে ফিরে এসে সে কাঁদিদকে বললো--দ্বিতীয়বার সে ভেবে দেখলো কুড়ি হাজারের কমে সে তাদের নিয়ে যেতে পারবে না।

কাঁদিদ বললো—বেশ তো, বেশ তো! তাই হবে।

আবার ভাবতে বসলো ক্যাপটেন—গোল্লায় যাও। লোকটা কুড়ি হাজার মুদ্রা এমন ভাবে দিতে রাজি হলো যে মনে হচ্ছে ও যেন দশটা মুদ্রা আমাকে দিচ্ছে।

আবার সে কিছুটা ঘুরে ফিরে এসে কাঁদিদকে বললো—উঁহু! তিরিশ হাজার ডাচ মুদ্রার কমে সে তাকে ভেনিসে নিয়ে যেতে পারবে না।

কাঁদিদ বললো—তিরিশ হাজারই পাবেন।

ডাচম্যানটি আবার ভাবতে লাগলো—কী আশ্চর্য। মনে হচ্ছে তিরিশ হাজার ডাচ মুদ্রা ওর কাছে কিছুই নয়। ওই মেষগুলির পিঠে নিশ্চয় অনেক অর্থ রয়েছে। এখন আর কোন কথা ওকে আমি বলবো না। ও আগে তিরিশ হাজার দিক। তারপরে দেখা যাবে।

কাঁদিদ দুটো ছোট হীরে বিক্রি করলো। তাদের মধ্যে যেটা ছোট তার দামই তিরিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশী। আগেই কাঁদিদ সেই ভাড়াটা ক্যাপটেনকে দিয়ে দিলো। দুটো মেষকে জাহাজে তোলা হলো। কাঁদিদ গেলো একটা ছোট নৌকোতে। ক্যাপটেন এই সুযোগে তার পাল তুলে জাহাজ ছেড়ে দিলে, হাওয়ার বেগে চলতে লাগলো জাহাজটা। হতভম্ব হয়ে কাঁদিদ দেখলো জাহাজটা তার চোখের বাইরে চলে গিয়েছে।

সে চেঁচিয়ে বললো—আমাদের পুরানো পৃথিবীতে মানুষ যেমন চালাকী খেলতো এও সেই রকম একটা চালাকী।

দুঃখে মুহ্যমান হয়ে সে তীরে ফিরে এলো। সত্যি সত্যি কুড়িটা রাজার সম্পদ সে হারিয়ে ফেললো।

তীরে নেমেই সে ডাচ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলো। মানসিক কষ্টে বিপর্যস্ত হয়ে সে আদালতের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলো। দরজাটা খোলা থাকায় সে ভেতরে ঢুকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সমস্ত ফুলে সে নালিশ জানালো। সেই বিশেষ ক্ষেত্রে যত জোরে তার কথা বলা উচিত ছিলো তার চেয়ে একটু জোরেই সে বলে ফেলেছিলো। তার এই ঔদ্ধত্যের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমেই তাকে দশ হাজার ডাচ মুদ্রা জরিমানা করলেন। তারপরে, কাঁদি যা বললে সে সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনে ক্যাপটেন ফিরে এলে ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করবেন বলে তিনি আশ্বাস দিলেন, কিন্তু কোর্ট ফি হিসাবে তিনি তাকে আদালতে দশ হাজর ডাচ মুদ্রা জমা দিতে বললেন।

আদালতের এই ব্যবহারে কাঁদিদের মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে গেলো। কথাটা সত্যি যে এর চেয়ে হাজারগুণ বেশী দুর্বিপাকে সে জীবনে পড়েছে, কিন্তু বিচারকের নিরুত্তাপ ঔদ্ধত্য আর জাহাজের ক্যাপটেনের ডাকাতি তার মনে প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করলো, ফলে, একটা গভীর বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেললো তাকে। মানবজাতি তার সমস্ত জঘন্য আর ক্লেদাক্ত চেহারা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালো; মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সে হতাশ হয়ে পড়লো। কয়েকদিন পরে, সে শুনলো একজন ফরাসী জাহাজের ক্যাপটেন বরদুতে যাবে। আর কোন হীরে তার না থাকায় সে ন্যায্য মূল্যেই জাহাজের একটা কেবিন ভাড়া করলো। সেই সঙ্গে ঘোষণা করে দিল যে এই সমুদ্রযাত্রায় যে তাকে সঙ্গদান করবে তার খাওয়া আর রাস্তা খরচ সে নিজে দেবে। তবে, মানুষটিকে সৎ প্রকৃতির হতে হবে। সেই সঙ্গে তার আরও দুটি গুণ থাকা দরকার। একটি হচ্ছে নিজের অবস্থায় তাকে চরম অসন্তুষ্ট থাকতে হবে; অপরটি হচ্ছে তার দেশে তাকে হতে হবে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। তাহলে, তাকে সে বাড়তি দেবে দশ হাজার ডাচ মুদ্রা।

এই ঘোষণা শোনামাত্র কাতারে-কাতারে লোক আসতে লাগলো তার কাছে। এত লোক যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধের জাহাজেও তাদের স্থান সংকুলান

হতো না। সেই বিরাট জনতা থেকে সম্ভাব্য কুড়িজনকে সে বেছে নিল। সেই কুড়িজনের ভেতর থেকে সবচেয়ে বেশী সামাজিক বোধ যার আছে, মানসিক উৎকর্ষ যার সবচেয়ে বেশী—সেই লোকজনকেই সে বেছে নেবে—এই ছিল তার উদ্দেশ্য। সে তাদের তার সরাইখানায় নিমন্ত্রণ করলো; সেই সঙ্গে জানিয়ে দিল যে রাত্রির ভোজনও সে তাদের দেবে; তবে প্রত্যেককেই তার নিজের নিজের জীবনের কাহিনী বলতে হবে; আর শপথ নিয়ে বলতে হবে যে সে যা বলছে তা সত্য। সেই সঙ্গে সে এও ঘোষণা করে দিল যে অনুগ্রহ করার যাকে সে যোগ্যতম ব্যক্তি বলে মনে করবে এবং জীবনে যে সবচেয়ে বীতস্পৃহ হবে তাকেই সে নির্বাচিত করবে। বাকি সকলকে সে একটা করে উপহার দেবে।

এই অদ্ভুত ধরনের সভাটি চলল ভোর চারটে পর্যন্ত। একে-একে সকলেরই ব্যক্তিগত কাহিনী সে শুনলো। শুনতে-শুনতে বুয়েনোস আয়ার্সে যাওয়ার পথে বৃদ্ধা মহিলাটি তাকে যা বলেছিল, এবং তার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে যে খেসারৎ দিতে সে রাজি হয়েছিলো, সেই কথাটা মনে পড়ে গেলো কাঁদিদের। সে বলেছিল, জাহাজে এমন কেউ নেই যে জীবনে বড রকমের বিপদে পড়ে নি। তাদের প্রত্যেকের কাহিনী শুনে প্যানগ্লসের কথা মনে পড়ে গেল তার।

সে বললো—আমার পুরানো গুরুদেব এখানে আজ থাকলে হতভম্ব হয়ে যেতেন। তাঁর প্রিয় নীতির পক্ষে কিছু বলা কঠিন হয়ে উঠতো তাঁর কাছে। হায়রে! তিনি যদি আজ এখানে থাকতেন? সব জিনিসই যদি ভাল হয় তাহলে, সে-সব জিনিস পাওয়া যায় একমাত্র এল ডোরাডে, বিশ্বের আর কোথাও নয়।

শেষকালে, সে একজন দরিদ্রকে বেছে নিল। আমস্টারডামে এক বই-এর দোকানে সে দশ বছর কাজ করেছে। কাজ করে তার ধারণা হয়েছে, চাকরির মত এমন ঘৃণ্য জিনিস জগতে আর নেই।

এই পণ্ডিতটি যে সত্যিকারের সৎ সে-বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। তার স্ত্রী তার অর্থ চুরি করেছে, ছেলেরা তাকে মারধোর করেছে, তার মেয়ে তাকে পরিত্যাগ করে একজন পর্তুগীজের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। খেয়ে-পরে কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য সে একটা চাকরি করতো। সেই চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সোসিনিয়েন মনে করে পাদরীরা তার ওপরে অত্যাচার করেছে। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাও যে তারই মত হতভাগ্য সেকথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না; কিন্তু কাঁদিদ ভেবেছিল একজন পণ্ডিত মানুষ তার সঙ্গে থাকলে সমুদ্রযাত্রার একঘেয়েমীটা তার নষ্ট হবে। এই নির্বাচনে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলো। তাদের ধারণা, কাঁদিদ তাদের ওপরে ন্যায় বিচার করে নি। কিন্তু প্রত্যেককে একশ' করে ডাচ মুদ্রা দিয়ে সে তাদের মুখ বন্ধ করে দিল।

পরিচ্ছেদ—২০

সমুদ্র যাত্রায় কাঁদিদ আর মার্টিনের কী হলো

বৃদ্ধ পণ্ডিতটির নাম মার্টিন। কাঁদিদের সঙ্গে জাহাজে চড়ে তিনি যাচ্ছিলেন বোর্দ্যতে। দুজনেই তাঁরা পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছিলেন, দুঃখও পেয়েছিলেন যথেষ্ট। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে স্থরিনাম থেকে জাহাজটি যদি জাপানে যেতো তাহলে মানুষের নীতি আর তার স্বভাবজাত দুর্নীতি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করে সারা পথটাই তাঁরা বেশ আনন্দের সঙ্গেই কাটিয়ে দিতে পারতেন।

দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে কাঁদিদের যে সুবিধে ছিল মার্টিনের তা ছিল না। মিস কুঁনিগুঁকে আবার দেখার আশায় আনন্দে সে মসগুল হয়ে থাকতো, কিন্তু বেচারা পণ্ডিতের সেরকম কোন আশা ছিল না। অবশ্য, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রত্নসম্ভার বোঝাই করা থলিগুলি নিয়ে তার যে প্রায় একশটা মেষ নষ্ট হয়েছিল সেকথা সত্যি, এবং ডাচ ক্যাপটেনের কাপট্যে তার ধমনীর রক্ত যে বারবার চঞ্চল হয়ে উঠছিল সেকথাও মিথ্যে নয়, তবু অবশিষ্ট যে অর্থ তার কাছে ছিল তা অনেক, হীরে যা ছিল তাদের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। এই সব ভেবে এবং বিশেষ করে, খাওয়া-দাওয়ার পরে সে যখন মিস কুঁনিগুঁর কথা চিন্তা করতো, তখন তার মনে হতো প্যানগ্লসের বিজ্ঞবাণীটিই হয়ত সত্যি।

কাঁদিদ মার্টিনকে জিজ্ঞাসা করলো—যে নীতিতে বিশ্ব চলছে সে সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কী বলুন তো? মানুষের নীতি আর স্বাভাবিক দুর্নীতি-বোধের সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কী?

মার্টিন বললেন—স্যার, আমাদের পাদরীরা সোসিনিয়ান বলে আমাকে অভিযুক্ত করেছিলো, কিন্তু আসলে আমি ম্যানিকিয়ান।

কাঁদিদ বলল—আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন। বর্তমান জগতে ম্যানিকিয়ান বলে কেউ নেই।

মার্টিন বললেন—অথচ আমি তাই, না হয়ে উপায় নেই আমার। অন্য কিছু হওয়ার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি নে।

কাঁদিদ বলল—তাহলে নিশ্চয় শয়তানই আপনার মাথাটা বিগড়িয়ে দিয়েছে।

মার্টিন বললেন—জগতের সব ব্যাপারেই শয়তান খুব বেশী মাথা ঘামায়। সব জায়গাতেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং, আমার মধ্যেও সে যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী রয়েছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে যখনই আমি এই গোলাকার পদার্থের, অথবা, আর কোন ক্ষুদ্র পদার্থের দিকে তাকিয়ে দেখি তখনই আমার মনে হয় ঈশ্বর এটিকে একটি অনিষ্টকারী শক্তির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা থেকে আমি অবশ্য এল ডোরাডোকে বাদ

দিচ্ছি। প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে চায় না এমন কোন রাষ্ট্রের নাম আমার জানা নেই। অথবা, এমন কোন পরিবার আমার চোখে পড়ে নি যা অন্য কোন পরিবারকে উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর নয়। পৃথিবীর সর্বত্র দরিদ্রেরা ধনীদের কাছে ঘৃণিত জীব বলে পরিগণিত হচ্ছে। অথচ, সেই দরিদ্রেরা ধনীদের কাছে নতজানু হয়ে রয়েছে। ধনীরা দরিদ্রদের ভেড়ার পালের মত মনে করে। তাদের লোম আর মাংস বিক্রী করে তারা অর্থ রোজগার করছে। লাখ-লাখ ঘাতকের দল ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। হত্যা, লুটপাট, রাহাজানির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে তাদের রুজি রোজগার করে যাচ্ছে। কেন করছে? কারণ, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভদ্রপেশা। এমন কি সেই সব দেশেও যেখানে পরিপূর্ণ শান্তি বজায় রয়েছে বলে সবাই মনে করে, যেখানে চারুকলা চর্চা হয়, সেখানকার অধিবাসীরাও পরস্পরকে হিংসা করে, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় জর্জরিত। অবরুদ্ধ নগরের অধিবাসীদের চেয়ে তারাও কম শারীরিক আর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে না, বিদেশী শত্রুর আক্রমণের চেয়ে, ব্যক্তিগত আক্রমণ অনেক বেশী মারাত্মক। দেশের সামগ্রিক বিপদের চেয়ে ব্যক্তিগত বিপদ আরও বেশী মারাত্মক। এক কথায়, আমি এত দেখেছি আর এত কষ্টভোগ করেছি যে আমার মনে হয়েছে শয়তান হচ্ছে ঈশ্বরের মতই ক্ষমতাশালী আব সেই জন্যেই আমি আজ ম্যানিকিয়্যান।

কাঁদিদ বললো—কিন্তু তা সত্ত্বেও, পৃথিবীতে কিছু ভাল জিনিসও রয়েছে।

মার্টিন বললেন—থাকতে পাবে, কিন্তু আমার চোখে সেরকম কিছু পড়ে নি।

তাঁরা যখন এই রকম গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন সেই সময় কামানের গর্জন শোনা গেল। উত্তরোত্তর সেই শব্দ বাড়তে লাগলো। দুজনেই দূরবীণ চোখে লাগালেন। দেখা গেলো প্রায় তিন মাইল দূরে দুটি জাহাজ পরম হৃদ্যতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বাতাসে সেই দুটি জাহাজ ফরাসী জাহাজের কাছাকাছি চলে আসার ফলে তাদের মধ্যে লড়াইটি বেশ ভালভাবেই দেখা গেলো। অবশেষে সেই দুটির মধ্যে একটি জাহাজ অন্যটির ওপরে একটা গোলা ছুঁড়লো। তারই ফলে, দ্বিতীয় জাহাজটি সরাসরি ডুবে গেলো। ডুবন্ত জাহাজের ওপরে শতেকখানেক লোক ছিল। জাহাজ ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তারা আকাশের দিকে হাত তুলে মর্মভেদী আর্তনাদ করতে লাগলো। এক মুহূর্তের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গমালা তাদের গ্রাস করে ফেললো।

এই দেখে মার্টিন বললেন—মানুষ যে মানুষের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, স্যার।

কাঁদিদ বললো—ব্যাপারটা যে সত্যিকার বীভৎস সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এই কথা বলার সময় কাঁদিদ দেখলো চকচকে একটি জিনিস তাদের

জাহাজের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার রঙটা লাল। জিনিসটা কী দেখার জন্যে একটা নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেলো, সেটা আর কিছু নয়, কাঁদিদের একটা মেষ। এল ডোরাডোর হীরা বোঝাই একশটা মেষ হারানোর সময় কাঁদিদের যথেষ্ট দুঃখ হয়েছিলো সন্দেহ নেই; কিন্তু এই মেষটিকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দ হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী।

ফরাসী ক্যাপটেন দেখতে পেলেন যে বিজয়ী জাহাজটি হচ্ছে ফরাসী সম্রাটের; আর যে জাহাজটি ডুবে গেলো সেটি হচ্ছে ডাচ জলদস্যুদের। এর ক্যাপটেনই কাঁদিদের হীরা মুক্তা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। সেই বদমাইশটা যে বিপুল সম্পত্তি সংগ্রহ করেছিলো সে-সবই তার সঙ্গে অতলে তলিয়ে গেলো। বেঁচে গেলে কেবল একটি মেষ।

কাঁদিদ মার্টিনকে বললো—পাপের শাস্তি যে মাঝে-মাঝে হয় তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এই দস্যুট তাব যোগ্য শাস্তিই পেয়েছে।

মার্টিন বললেন—খুবই সত্যি। কিন্তু ওই যাত্রীবা কী অপবাধ করেছিলো? ওরা ধ্বংস হলো কেন? ঈশ্বর শাস্তি দিয়েছেন অপরাধীকে, আর শয়তান ডুবিয়ে দিয়েছে বাকি সকলকে।

ফবাসী আর স্প্যানিশ জাহাজ দুটি তাদের পথে এগিয়ে গেলো। কাঁদিদ এবং মার্টিনেব মধ্যে আলোচনাও চললো এগিয়ে। চৌদ্দ দিন ধরে তাদের মধ্যে তর্ক চললো, চোদ্দ দিন পরেও নিজেদের মধ্যে তাদের একই দূরত্ব বজায় ছিল। এতটুকু এগোতে পাবে নি তাবা। যাই হোক, নিজেদেব মধ্যে তর্ক করে তারা আনন্দ পেয়েছিলো, সন্তুষ্ট হয়েছিলো নিজেদের মধ্যে ভাবধারার আদন প্রদান করে, আব পরস্পরকে সহানুভূতি জানিয়ে। কাঁদিদ তার মেষটিকে জড়িয়ে ধরে বললো—তোমাকে আমি ফিরে পেয়েছি; সেই জন্যে কুঁনিগুঁকেও হয়ত আবার দেখতে পাবো।

পবিচ্ছেদ—২১

এই ভাবে তর্ক আব আলোচনা করতে করতে কাঁদিদ আর মার্টিন ফ্রান্সেব তীরে উপস্থিত হলেন।

অবশেষে ফরাসী উপকূল দৃষ্টিগোচর হলো।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—মিঃ মার্টিন, আপনি কোন দিন ফ্রান্সে ছিলেন?

মার্টিন বললেন—হ্যাঁ, স্যার। ফ্রান্সের অনেক অঞ্চলেই আমি ছিলাম। কয়েকটি অঞ্চলের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসীই উন্মাদ। কয়েকটি অঞ্চলের লোকেরা খুবই ধূর্ত, অন্যান্য অঞ্চলগুলির অধিবাসীরা কোথাও ভদ্র, আর কোথাও বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। আবার কোন-কোন অঞ্চলের লোকেরা বেশ বাকপটু। তাদের সব চেয়ে বড় প্রবৃত্তি হচ্ছে প্রেম, দ্বিতীয় হচ্ছে পরনিন্দা,

আর সব চেয়ে শেষ হচ্ছে বাচালতা।

কিন্তু আপনি কি কোন দিন প্যারিসে ছিলেন, মিঃ মার্টিন ?

হ্যাঁ, স্যার, ছিলাম, যে সব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কথা আমি এইমাত্র বলাম তাদের অনেকেই এই শহরে থাকে। এ একটা হট্টগোলের জায়গা। হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের দল আনন্দ বা আমোদ পাওয়ার আশায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে, কিন্তু কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। এই শহরে আমি অল্প দিনই ছিলাম। সেই সময়ে আর কিছু আমার চোখে পড়ে নি। প্যারিসে পৌছনোর পরে সেন্ট জারমেইনের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেইখানে পকেটমারেরা আমার সব টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে আমাকে একেবারে কপর্দকশূন্য করে ছেড়ে দিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত আমাকেই ডাকাত বলে পাকড়িয়ে এক সপ্তাহ তারা জেলখানায় পুরে রাখলো। তারপরে, প্রেসে আমি ছোট একটা চাকরি যোগাড় করলাম, সামান্য যা কিছু পেয়েছিলাম তাতেই পায়ে হেঁটে হল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার কিছু পাথেয় সংগ্রহ করলাম। যারা লিখতো, যারা অসন্তুষ্ট ছিল, এবং ধর্মের কেচ্ছায় যারা মসগুল হয়ে থাকতো সে-সব লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। শোনা যায়, এখানকার মানুষরা নাকি খুবই নম্র। আমার বিশ্বাস, হয়তো তারা তাই।

কাঁদিদ বললো—আমার কথা যদি বলেন, ফ্রান্স দেখার কোন কৌতূহল আমার নেই। প্রিয় বন্ধু, আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন যে এল ডোরাডোতে এক মাস কাটানোর পরে মিস কুঁনিগুঁকে দেখা ছাড়া বিশ্বের আর কিছুই দেখার সাধ আমার নেই। তার জন্যে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে আমি ভেনিসে যাচ্ছি। ইতালীতে যাওয়ার পথে আমি ফ্রান্সের মধ্যে দিয়ে যেতে চাই। আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন না ?

মার্টিন বললেন—সর্বান্তঃকরণে। লোকে বলে, ভদ্র ভেনিসিয়েন ছাড়া ভেনিস কারও কাছে ভাল লাগে না। তবে, যে সব বিদেশীদের অনেক টাকা পয়সা রয়েছে তাদের তারা বেশ আদরের সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানায়। আমার কোন অর্থ নেই কিন্তু আপনার আছে। সুতরাং, আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানে যাব।

কাঁদিদ বললো—এখন যখন আমরা দেশের সম্বন্ধে কথা বলছি, তখন আপনার কি মনে হয়, এই জাহাজের ক্যাপটেনের বড় বইটায় যে কথা লেখা রয়েছে, এই পৃথিবীটা একদিন সমুদ্র ছিল ?

মার্টিন বললেন—কিছুদিন ধরে যে সব কল্পিত অগ্নিবর্ষী দৈত্যদের গল্প আমরা শুনে আসছি তাদের যেমন আমি বিশ্বাস করি নে; এই কথাও আমার কাছে তেমনি অবিশ্বাস্য।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে, এই পৃথিবীটা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী ?

মার্টিন বললেন—উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উন্মাদ করা।

কাঁদিদ বললো—অরিলোনস দেশে সেই দুটি মেয়ে যে দুটি বানরকে ভালবাসতো তাতে আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন না? আপনাকে আমি সে-গল্প বলেছি।

মার্টিন বললেন—আশ্চর্য! মোটেই নয়। এই প্রবৃত্তিতে আশ্চর্য হওয়ার মত কিছু নেই। আমি অনেক অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি। কোন কিছুতেই আমি আর আশ্চর্য হই নে।

কাঁদিদ বললো—আপনার কি ধারণা, আজকালকার মানুষেব মত চিরকালই মানুষ এই রকম হত্যালীলা চালিয়ে যাচ্ছে? .তাবা কি চিরকালই মিথ্যে কথা বলছে। প্রতারণা করছে, বিশ্বাসঘাতকতা কবছে? তারা কি চিরকালই অকৃতজ্ঞ, চিরকালই কি তারা অব্যবস্থিতচিত্ত? হিংসা, উচ্চাকাংখা, আব নিষ্ঠুরতা—এবাই কি তাদের চি৷ সঙ্গী?

মার্টিন বললেন—পায়রাকে সামনে পেলে বাজপাখি যেমন চিবকাল তাকে খেয়ে ফেলতে অভ্যস্ত—একথা কি আপনি বিশ্বাস কবেন?

অবশ্যই করি।

বেশ কথা। চিরকালই বাজপাখির স্বভাব যদি এক রকম হয় তাহলে মানুষের স্বভাব যে ভিন্ন হবে সেকথা আপনি ভাবছেন কেমন করে?

কাঁদিদ বললো—কিন্তু যাদের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পার্থক্য অনেক বয়েছে।

এইভাবে আলোচনা করতে করতে একসময় তাবা বোর্দ্যতে এসে উপস্থিত হলো।

পরিচ্ছেদ—২২

ফ্রান্সে কাঁদিদ আর মার্টিনের কী হলো

এল ডোরাডো থেকে আনা কয়েকটা নুড়ি বিক্রী করার জন্যে যতটুকু সময় লেগেছিলো তার বেশী সময় কাঁদিদ বোর্দ্যতে ছিল না। সেই সময়ের মধ্যেই সে দুই বা ততোধিক অশ্ব-সংযুক্ত একটি গাড়ী সংগ্রহ করলো; কারণ, দার্শনিক মার্টিনকে ছাড়া এক পা-ও সে কোথাও যেতে রাজি ছিল না। তার একমাত্র অস্বস্তি লাগছিলো মেষটিকে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলো বলে। মেষটিকে সে রেখে গিয়েছিলো বোর্দ্যর অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের তত্ত্বাবধানে। পণ্ডিতরা ঘোষণা করে দিলেন যে মেষটির লোম লাল কেন এটা যিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পারবেন তাঁকে সেই বছরে একটি পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই পুরস্কারটি ছাড়িয়ে নিলেন উত্তরাংশের একজন পণ্ডিত। এ-এর সঙ্গে খ যোগ করে সেই যোগফল থেকে তিনি বাদ দিলেন গ, বিয়োগ ফলকে ভাগ করলেন

ঘ দিয়ে। এই সূত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে মেষটির লোম লাল হ'তে বাধ্য; আর উপসংহার করলেন এই বলে যে মেষটি তার জাতীয় রোগেই অবশ্য মারা যাবে।

ইতিমধ্যে রাস্তায় অথবা সরাইখানাতে যে সব পর্যটকদের সঙ্গে কাঁদিদের দেখা হয়েছিলো তারা সবাই তাকে একবাক্যে বলেছিলো যে তারা প্যারিসে যাচ্ছে। সকলের এই আগ্রহ দেখে রাজধানীতে যাওয়ার একটা আগ্রহ তারও হলো; তা ছাড়া, প্যারিস থেকে ভেনিসের দূরত্ব এমন একটা কিছু বেশীও নয় সুতরাং প্যারিসে যাবে বলে সেও মনস্থ করে ফেললো।

সেণ্ট মার্কু'র ভেতর দিয়ে সে শহরে প্রবেশ করলো। সেই অঞ্চলে প্রবেশ করেই তার মনে হলো ওয়স্টফালিয়াতেও সে এমন নোংরা পল্লী সে দেখে নি।

এই পথযাত্রায় কাঁদিদ বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। ফলে, সরাইখানায় কয়েকটা দিন থাকার পরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। তার আঙুলে বেশ বড় একটা হীরের আংটি ছিল; তার লটবহরের ভেতরে ছিল বেশ ভারি একটা বাক্স। ফলে, তাকে চিকিৎসা করার জন্যে রবাহূত হয়েই দুজন চিকিৎসক এসে হাজির হলেন, এঁদের সে কোন দিন চিনতোও না। হাজির হলেন এমন কয়েকজন অতি পরিচিত বন্ধু যাদের সে কোন দিন চোখেও দেখে নি। হাজির হলো দুটি মহিলা। তারা তার জন্যে 'সুপ' গরম করতে লাগলো।

মার্টিন তাকে বললেন, বেশ মনে রয়েছে, আমি যখন প্রথম প্যারিসে আসি তখনও আমি এই রকমই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। খুবই দরিদ্র থাকার ফলে, আমার কাছে কোন বন্ধু, সেবিকা অথবা চিকিৎসক আসে নি। তা সত্বেও আমি সেরে উঠেছিলাম।

যাই হোক, উগ্র চিকিৎসা আর রক্তক্ষরণের ফলে, কাঁদিদের শরীর আরও খারাপ হয়ে গেলো। স্থানীয় গির্জা থেকে পাদরী ছুটে এলেন। অত্যন্ত বিনীত ভাবে কাঁদিদের কাছে শেষ যাত্রার কিছু পাথেয় চাইলেন তিনি। সেই অর্থ নাকি তার পরলোকে যাওয়ার পারানি। তাঁর অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করলো কাঁদিদ। কিন্তু তার দুটি মহিলা ভক্ত তাকে জানালো যে ওইটিই হচ্ছে ওখানকার নতুন রীতি। কাঁদিদ সেই নতুন রীতিটি মানতে রাজি হলো না। পাদরীটিকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে মার্টিনের হয়েছিলো। কেরাণীটি দিব্যি গেলে বললো যে মরার পরে কাঁদিদের দেহ খ্রীশ্চানসম্মতভাবে কবরস্থ হওয়ার সুযোগ পাবে না। এর উত্তরে মার্টিন ক্ষেপে গিয়ে বললেন যে তাঁদের আর জ্বালাতন করলে তিনি কেরাণীটিকে জীবন্ত কবরস্থ করবেন। ঝগড়াটা বেশ বেঁধে উঠলো। তারপরে, কাঁধে ধাক্কা দিয়ে কেরাণীটিকে মার্টিন দরজার বাইরে বার করে দিলেন। সেই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে; শারীরিক বল প্রয়োগের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাও রুজু হলো।

সুস্থ হয়ে উঠলো কাঁদিদ, কিন্তু বিদেশযাত্রার মত শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত সন্ধ্যাবেলাটা নিজের কামরায় সে কয়েকজন সুধী এবং বিজ্ঞদের সঙ্গে গল্পগুজব করে বেশ আনন্দেই কাটাতে লাগলো। তারা বেশ জমাটি খেলা খেলতে সুরু করলো। একটা খেলাতেও জিততে পারলো না দেখে কাঁদিদ বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলো। কিন্তু এ-ব্যাপারে মার্টিন মোটেই আশ্চর্য হলেন না। যারা এই খেলায় যোগ দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছিলো তাদের মধ্যে ছিল বেশ ফিটফাট কেতাদুরস্ত পিরিগোর্ড-এর পাদরী, ছোটখাটো দেখতে, এ ছিল সেই জাতীয় লোক যারা নবাগত কোন পর্যটকের জন্যে ওৎ পেতে বসে থাকতো, তাকে শহরের নানা রকম কেলেঙ্কারীর গল্প বলতো, আদর আপ্যায়ন করতো, মিষ্টি-মিষ্টি কথায় মাৎ করে দিতো তাদের। এক কথায়, শারীরিক আর মানসিক যত রকমের সুড়সুড়ি রয়েছে কোনটাই দিতে তারা কার্পণ্য করতো না। কোথায় কত খরচ করলে কী ধরনের আনন্দ পাওয়া যায় সেই সংবাদ নতুন কোন অতিথিকে সরবরাহ করতো তারা। এই লোকটি কাঁদিদ আর মার্টিনকে থিয়েটারে নিয়ে গেলো। সেখানে একটি নতুন ট্র্যাজিডি অভিনীত হচ্ছিল। কাঁদিদ দেখলো কয়েকজন সংস্কৃতিবান এবং সংস্কৃতিবতী দর্শকদের মধ্যে সে বসে রয়েছে। এর জন্যে কয়েকটি সু-অভিনীত দৃশ্যে চোখের জল ফেলতে সে অবশ্য দ্বিধা করে নি। দুটি অঙ্কের বিরতির মধ্যে একজন তাকে বললো—

"চোখের জল ফেলাটা আপনার অন্যায় হয়েছে। অভিনেত্রীটি অভিনয় করে জঘন্য, আর অভিনেতাটি অভিনয় করে জঘন্যতর। আর নাটকটা তো একেবারেই অভিনয়ের অযোগ্য। যাকে বলে অখাদ্য। নাট্যকার আরবী ভাষার একটি অক্ষরও বোঝে না, অথচ, আরব দেশের একটি অঞ্চলকে সে তার নাটকের 'দৃশ্য' করেছে। তা ছাড়া, অন্তরঙ্গ ভাব বলতে যা বোঝায় লোকটা তা বিশ্বাস করে না। আগামীকাল আমি আপনাকে এক গোছা প্যামফ্লেট দেখাবো। তাতে এর বিরুদ্ধে অনেক আলোচনা পড়তে পারবেন আপনি।

কাঁদিদ পাদরীকে জিজ্ঞাসা করলো—স্যার, এরকম কত নাটক ফ্রান্সে রয়েছে?

তা পাঁচ ছ' হাজার হবে।

বলেন কী? এত? কিন্তু ভাল নাটক কতগুলি আছে?

পনের-ষোলটার মত।

মার্টিন বললেন—এত!

মাঝে-মাঝে ওখানে একটি বাজে ট্র্যাজিডি অভিনীত হতো। সেই নাটকে যে অভিনেত্রীটি রাণী এলিজাবেথের ভূমিকায় অভিনয় করতো তাকে কাঁদিদের বেশ পছন্দ হয়ে গেলো।

সে মার্টিনকে বললো—এই অভিনেত্রীটিকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। মিস কুনিগুঁর সঙ্গে ওর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে পারলে

আমি খুশি হতাম।

পিরিগোর্ডের পাদরী রাজি হয়ে গেলো। অভিনেত্রীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে সে কাঁদিদের আলাপ করিয়ে দেবে। কাঁদিদ মানুষ হয়েছে জার্মানীতে। এই সব ক্ষেত্রে কী উপঢৌকন নিয়ে যেতে হয় এবং ফ্রান্সে রাণী এলিজাবেথকে কী চোখে সবাই দেখে এই সব বিষয়ে কিছু জানতে চাইলো কাঁদিদ'।

পাদরী বললো—এসব ব্যাপারে কিছু বিশিষ্ট আচরণ দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। মফঃসল শহরে আমরা তাঁদের মদের দোকানে নিয়ে যাই। কিন্তু এই প্যারিসে যতদিন তাঁরা বেঁচে থাকেন ততদিনই তাঁদের আমরা সম্মান দেখাই। অবশ্য, দেখতে তাঁরা যদি সুন্দরী হন। তাঁরা মারা গেলে তাঁদের দেহ আমরা গোবরের গাদায় ছুঁড়ে ফেলি।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—রাণীব দেহ গোবরের গাদায় ছুঁড়ে ফেলবেন—মানে?

মার্টিন বললেন—ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। খাঁটি সত্যি কথা বলেছেন। মিলি মনিমী যখন বিদায় নিলেন, অর্থাৎ, পরলোকের পথে যাত্রা করলেন তখন আমি প্যারিসেই ছিলাম। কববস্থ হওয়ার অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি সে-অধিকার তাঁকে দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ, গির্জা সংলগ্ন কবরখানায় যে সব ভিখারীরা শুয়ে রয়েছে তাদেব পাশে শুয়ে পচে মরার মত একটু স্থানও তাঁকে দেওয়া হয় নি। তাঁকে কবর দেওয়া হলো তাঁর দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কোথায় জানেন? বার্গেনডি স্ট্রীটের একটি কোণে। ভদ্রমহিলার রুচি ছিল খুবই উন্নত ধরনের। তাঁর মৃতদেহের এই দুর্দশা দেখে নিশ্চয় তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন।

কাঁদিদ বললো—কাজটা খুব ভদ্রোচিত হয় নি।

মার্টিন বললেন—কী বললেন! এর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। এ-জাতের স্বভাবই এই। বিশ্বের যত পরস্পরবিরোধী ভাব রয়েছে, অব্যবস্থচিত্ততা রয়েছে যত রকম সব আপনি দেখতে পাবেন এদেশে সরকারী দপ্তরখানায়, আদালতে, গির্জায় আর জনসাধারণের মধ্যে. বড়ই অদ্ভুত, বিচিত্র এই দেশ।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—এ দেশের লোকেরা সব সময় যে হাসে সেকথা কি সত্যি?

বললো—খুব সত্যি, কিন্তু হাসে তারা ক্রোধে, হো-হো করে অট্টহাসি হেসে নিজেদের অভিযোগ প্রকাশ করে তারা। মুখের ওপরে হাসি ফুটিয়ে করে বিশ্বের জঘন্যতম কাজ।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—যে অভিনয় দেখে আমি অতটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আর যাদের অভিনয় আমাকে অতটা মুগ্ধ করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে আমার কাছে যে কুৎসা প্রচার করেছিলো সেই বলিবর্দটি কে?

পাদরী বললো—ও একটা বাজে লোক। নতুন বই আর অভিনয়ের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেই ওরা রুজি-রোজগার করে। ওরা হচ্ছে নপুংসকের দল। এরা ঘৃণা করে তাদের যাদের সেই বিশেষ জিনিসটি আছে এদের যা নেই। তেমনি ওরাও জীবনে কোন দিন সাফল্যের মুখ দেখে নি। তাই কেউ সাফল্য লাভ করুক তা ওরা সহ্য করতে পারে না। ও হচ্ছে সেই ধরনের সাপ যে নিজের বিষ খেয়েই বেঁচে থাকে। ওদের বলা হয় প্যামফ্লেট লেখক।

কাঁদিদ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—সেটা আবার কী বস্তু?

পাদরী বললো—কী বস্তু মানে? সে প্যামফ্লেট লেখে।

সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে তিন জনে তারা এই সব আলোচনা করছিলো। অভিনয় শেষ হওয়ার ফলে দর্শকরা যে যার চলে যাচ্ছিলো।

কাঁদিদ বললো—মিস কুঁনিগুঁকে আবার দেখার জন্যে যদিও আমি খুবই অস্থির হয়ে উঠেছি তবুও মিলি ক্লেরোঁর সঙ্গে নৈশ ভোজ খাওয়ার বেশ আগ্রহ জন্মেছে আমার। কারণ, সত্যিই তাঁকে আমার খুবই ভাল লেগেছে।

এই অভিনেত্রীর বাড়িতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসা-যাওয়া করেন। তাই পাদরীটি সেখানে ঢুকতে চাইছিলেন না।

তাই পাদরী বললো—আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে অন্য লোকের আসার কথা রয়েছে। কিন্তু আমার পরিচিতা একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা আছেন, তাঁর বাড়িতে যাঁরা আসা-যাওয়া করেন প্যারিসে তাঁরাও বেশ মান্যগণ্য। রুচি আর সংস্কৃতি কোন দিক থেকেই তাঁরা কারও চেয়ে কম যান না। তাঁর সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দেবো। সেখানে যে সব আচার আর ব্যবহার আপনি দেখতে পাবেন তাতে আপনার মনে হবে আপনি কম পক্ষে চারটি বছর ধরে প্যারিসে বাস করছেন।

এই সব কথা শুনে স্বভাবতই কাঁদিদের কৌতূহল বেড়ে গেলো। পাদরী তাকে সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিলে সে তাতে কোন আপত্তি জানালো না। ভদ্রমহিলার বাড়িটি ছিল সেন্ট হোনোরো-র একেবারে প্রান্ত সীমায়। ভদ্রমহিলার সঙ্গীরা তখন তাস নিয়ে জুয়া খেলছিলো। বারোটি বিমর্ষ জুয়াড়ীদের প্রত্যেকের হাতে এক গোছা করে তাস। এই জুয়া খেলেই তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। চারপাশ চুপচাপ। কোথাও কোন শব্দ নেই। একটি বিবর্ণ বিষাদ জুয়াড়ীদের মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। যে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে বসে রয়েছে তাদের সারা সত্তায় ছড়িয়ে পড়েছে একটা অস্থির উদ্বেগ। গৃহকর্ত্রী সেই লোকটির পাশে বসে আছেন। খেলোয়াড়রা যে সব সংকেতবাক্য উচ্চারণ করছে, যেভাবে তাস ভেঁজে হাত সাফাই করছে, যে নির্মম ত্রুটিহীন ভাবে ডাক দিচ্ছে সেই সব তিনি বিড়ালীর মত তীক্ষ্ণ অথচ অকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছেন। সেই সঙ্গে খদ্দেররা যাতে ভয় না পায় সেই জন্যে নম্রভাবেই তিনি তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন। এই ভদ্রমহিলা হচ্ছেন প্যারোলি-

লিগন্যাকের মার্শনেশ। তাঁর মেয়ের বয়স পনেরর কাছাকাছি। সেও খেলছিলো তাস। দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্যে কেউ কেউ যখন নিজেদের মধ্যে নিরপরাধ কোন প্রতারণা করার চেষ্টা করছিলো তখনই সে তার মাকে ইঙ্গিৎ করে তা জানিয়ে দিচ্ছিলো। কাঁদিদ, মার্টিন আর পাদরী যখন ঢুকলো তখন সেখানে খেলা চলছিলো পুরোদমে। নিজে.দর কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলে কেউ উঠে তাদের অভিবাদন তো করলোই না, এমন কি তাদের দিকে ফিরেও চাইলো না কেউ।

কাঁদিদ বললো—হায়রে আমরা থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারনেস হলে আমাদের কত ভদ্রভাবেই না অভ্যর্থনা জানাতেন।

যাই হোক, পাদরী গিয়ে মার্শনেশের কানে ফিস ফিস করে কিছু একটা বললো, তিনি অর্দ্ধোত্থিতা হয়ে কাঁদিদকে মিষ্টি হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন, মার্টিনকে অভিবাদন জানালেন সম্ভ্রান্তভাবে মাথাটা একটু নাড়িয়ে। কাঁদিদকে বসার একটা জায়গা দিয়ে তার হাতে এক প্যাকেট তাস ধরিয়ে দিলেন। দু দানেই সে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হারলো। তারপরে, সবাই উন্নত মানের নৈশ-ভোজে অংশগ্রহণ করলে। অত টাকা হেরেও যে কাঁদিদের মনে কোন কিছু হয় নি এটা দেখে সবাই তারা বেশ অবাক হয়ে গেলো। চাকররা নিজেদের ভাষায় বলাবলি করতে লাগলো—ইনি নিশ্চয় কোন ইংরেজ লর্ড।

প্যারিসে যে জাতীয় নৈশ ভোজ হয় এটিও সেই জাতীয়। প্রথমে সব চুপচাপ, তারপরে অনেক অর্থহীন গুঞ্জন, তারপরে রসিকতা, তাদের অধিকাংশই খেলো ধরনের, মিথ্যা কাহিনী প্রচার, মূর্খের মত যুক্তি, সামান্য কিছু রাজনৈতিক আলোচনা, এবং অনেক অনেক কলঙ্ক বা কুৎসা প্রচার। নতুন গ্রন্থ নিয়েও আলোচনা হলো তাদের।

পিরিগোর্ডের পাদরী বললো—ধর্মতত্ত্বের ডক্টর মঁসিয়ে গচা যে প্রেমের উপন্যাসটি লিখেছেন সেটা আপনারা দেখেছেন?

অতিথিদের একজন বললো—দেখেছি কিন্তু পড়ার মত ধৈর্য আমার ছিল না। আমাদের দেশে অনেক উদ্ধত লেখক রয়েছে, কিন্তু গচার ধারে কাছে পৌঁছোতে পারে নি। ধর্মতত্ত্বের পণ্ডিত ডক্টর খেতাবধারী গচা একেবারে চরম উদ্ধত। এই সব নোংরা জিনিস পড়ে-পড়ে আমি এতই পরিতৃপ্ত হয়ে উঠি যে সেই সব হজম করার জন্যে আমি তাসের জুয়াতে আসি।

পাদরী জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু আর্চডিকোন টুবলে-র মিবল্লনীর সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কী?

প্যারোলিগন্যাকের মার্শনেশ চিৎকার করে বললেন—ওঃ, বিশ্রী! বিশ্রী! পড়তে-পড়তে মাথা ধরে যায়। বিশ্বের সবাই যা জানে সেই কথাটা আবার বলার জন্যে কী কষ্টই না তাঁকে করতে হয়েছে। যে যুক্তি দেওয়ার জন্যে তিনি অত কষ্ট করেছেন আসলে সেটা যুক্তিই নয়। অন্য লোকের বাক-চতুর্যকে কী

বিশ্রী ভাবেই না তিনি ব্যবহার করেছেন! অন্য লোকের কাছ থেকে চুরি করা জিনিস নিয়ে কী অখাদ্যই না তিনি পরিবেশন করেছেন! বিরক্তিকর! বিরক্তিকর! কিন্তু আর তিনি আমাকে বিরক্ত করতে পারবেন না। আর্চ ডিকোনের কয়েকটা পাতা পড়াই যথেষ্ট। তার বেশী আর কিছু পড়ার দরকার নেই।

সেই টেবিলে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বসে খাচ্ছিলেন। তিনিও মার্শনেশের মন্তব্যের সঙ্গে একমত। তারপরে তারা ট্র্যাজিক নাটক নিয়ে আলোচনা স্থরু করলেন। মার্শনেশ জানতে চাইলেন অপাঠ্য এমন কয়েকটি ট্র্যাজিডি এখনও অভিনীত হচ্ছে কেন? সেই স্থরুচিসম্পন্ন পণ্ডিতটি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে কোন কোন জিনিস রয়েছে যার মধ্যে গুণ না থাকলেও, মানুষকে আকর্ষণ করার শক্তি থাকে। কয়েকটি কথায় তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে নাটকের মধ্যে কিছু কিছু রোমান্টিক ঘটনা ছিটিয়ে দিলেই নাট্যকারের কাজ শেষ হয় না, দর্শকদের চমক দেওয়াতেই নাট্যকারের শেষ হয় না দায়িত্ব; চিন্তাধারাটা হবে নতুন; অথচ, দূরধিগম্য নয়, তাকে হতে হবে গম্ভীর, কিন্তু সব সময়েই স্বাভাবিক। মানুষের হৃদয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই লেখকের; কথা বলানোর জন্যে তার মুখে দিতে হবে উপযুক্ত ভাষা। লেখককে হতে হবে সম্পূর্ণরূপে কবি, কিন্তু কোন চরিত্রের মুখে তাঁর বিশেষ ঝোঁকটি ফুটে উঠবে না। ভাষায় থাকবে তাঁর দখল; সেই ভাষাকে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে দিতে হবে তাঁকে; কিন্তু কোন জায়গাতেই অর্থটা যেন কাব্যের দাসত্ব স্বীকার না করে।

উপসংহার করলেন তিনি—এই নিয়মগুলি যে মেনে চলবে না সে দু'চারটে মোটামুটি রকমের ভাল ট্র্যাজিডি লিখলেও ভাল লেখকের দলে পড়তে পারবে না। ভাল ট্র্যাজিডি মাত্র গুটি কয়েকই রয়েছে; সুন্দর কাব্যিক ভাষায় লেখা রয়েছে কয়েকটি গীতিকাব্যমূলক উপাখ্যান; অন্য সবগুলি হচ্ছে রাজনৈতিক কচকচি; শুনতে-শুনতে দর্শকরা ঘুমিয়ে পড়ে; অথবা বড় বড় কথার তুবড়ীবাজি। লোকে শুনে বিরক্ত হয়। অন্য কিছু নাটক রয়েছে যেগুলিকে পাগলের প্রলাপ বলা যেতে পারে; যেমন তাদের ভাষা, তেমনি তাদের আঙ্গিক আর ব্যঞ্জনা! মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তা তারা জানে না বলেই দেবতাদের সঙ্গে তারা কথা বলে! তাদের কথার মধ্যে নতুন কিছু নেই; মিথ্যা উপমা ব্যঞ্জনায় পূর্ণ।

এই সব আলোচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো কাঁদিদ; শুনে বক্তাটির ওপরে তার গভীর শ্রদ্ধা হলো। মার্শনেশ যত্ন করে তাঁর পাশে কাঁদিদকে বসতে দিয়েছিলেন। সেই জন্যে সে তাঁর কানে-কানে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলো—যে ভদ্রলোক অমন প্রাঞ্জল ভাষায় এমন মনোজ্ঞ বক্তৃতাটি দিলেন তিনি কে?

মার্শনেশ বললেন—ইনি একজন পণ্ডিত মানুষ। উনি কোনদিনই তাস

খেলেন না। সন্ধ্যেবেলাটা কাটানোর জন্যে পাদরী ওঁকে মাঝে-মাঝে এখানে নিয়ে আসেন। লেখা, বিশেষ করে ট্র্যাজিডি বিচার করার দক্ষতা ওঁর অপূর্ব। উনি নিজে একখানা লিখেছিলেন। সবাই সেটা পড়ে ছি-ছি করেছে। সেই বইটা বই-এর দোকানে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। একখানা বাইরে বেরিয়ে এসেছিলো। সেটা তিনি উৎসর্গ করে আমাকে দিয়েছিলেন।

বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—কী পণ্ডিত মানুষ! একেবারে দ্বিতীয় প্যানগ্লস।

তারপরে, সেই বক্তার দিকে ঘুরে বললেন—স্যার, এই পার্থিব আর নৈতিক জগতে সব কিছুই যে সব চেয়ে ভালোর জন্যে, এবং যে জিনিসটি যে রকম তার চেয়ে যে সে আরও ভালো হতে পারে না, আশা করি, আপনি, নিশ্চয় তা বিশ্বাস করেন।

সেই পণ্ডিত লোকটি বললেন—স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত হোন, ওসব কিছু ভাবিনে আমি। আমি দেখছি, পৃথিবীর যা কিছু সবই খারাপের জন্যে। মানুষ জানে না তার পদবী কী, কাজ কী? সে কী করে, তার কী করা উচিত, সবই তার অজানা। এই সন্ধ্যেটাই কেবল আমরা আনন্দে কাটাই। এই সময়টুকু ছাড়া আমরা সব সময় আমাদের বাজে ঝগড়া আর গোলমালে কেটে যায়। জেনসেনিস্টদের সঙ্গে লড়াই হচ্ছে মলিনিস্টদের, পার্লামেন্টের সঙ্গে চার্চের, পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের, দেশের সঙ্গে দেশের, অর্থশালীদের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়ের লড়াই, বিবাদ চলেছে তো চলেছেই। মোট কথা, এ যুদ্ধের আর শেষ নেই।

কাঁদিদ বললো—সেকথা ঠিক। এর চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা আমি দেখেছি তবু, যে বিজ্ঞ ব্যক্তিটির দুর্ভাগ্যবশত ফাঁসি হলো, তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে এ-বিশ্বের সব জিনিসই ভালোর জন্যে, আর এই যে মাঝে-মাঝে আমরা অমঙ্গল দেখতে পাই সেগুলি হচ্ছে সুন্দর একটি ছবির ওপরে কালো ছায়ার মত।

মার্টিন বললেন—আপনার সেই শনদড়ির মত শুকনো পণ্ডিত আপনাকে ওই সব কথা বলে উপহাস করেছেন। এই যে ছায়ার কথা আপনি বললেন সেগুলি হচ্ছে ভয়ঙ্কর কলঙ্ক।

কাঁদিদ বললো—কিন্তু তার জন্যে দায়ী মানুষ নিজে। তারা ও ছাড়া আর কিছু করতে পারে না।

মার্টিন বললেন—তারা যে অন্যায় করে তার জন্যে তারা দায়ী নয়।

জুয়াড়ীদের বেশীর ভাগই এই আলোচনার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলো না। তারা বসে-বসে মদ খেতে লাগলো। সেই সময় সেই পণ্ডিত লোকটির সঙ্গে মার্টিন আলোচনা করতে লাগলেন; আর গৃহকর্ত্রীর কাছে কাঁদিদ তার দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করলো।

নৈশ ভোজন শেষ হওয়ার পরে, মার্শনেশ কাঁদিদকে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি সোফার ওপরে বসালেন, বললেন—থানডার-টেন-ট্রনকের মিস কুঁনিগুঁকে তুমি এখনও এত ভালবাস?

হ্যাঁ; মাদাম।

একটু মিষ্টি হেসে মার্শনেশ তাকে বললেন—ওয়েস্টফালিয়ার যুবকের মতই তুমি কথা বলছ, কোন ফরাসী যুবক হলে বলতো—মাদাম, মিস কুঁনিগুঁর ওপরে আমার যে গভীর আকর্ষণ ছিল সেকথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আপনাকে দেখার পরে, মনে হচ্ছে, সেরকম ভালো আর তাকে আমি বাসি নে।

কাঁদিদ বললো—হায় মাদাম! যা বললে আপনি খুশি হন তা আমি বলবো।

'মনে হচ্ছে, তাঁর রুমালটা কুড়োতে গিয়েই তাকে তুমি ভালবেসেছিলে, এখন তুমি আমার মোজা-বাঁধা ফিতেটা কুড়োবে।'

কাঁদিদ বললো—সর্বান্তঃকরণে।

মহিলাটি বললেন—মোজাটা বেঁধে দাও।

বাঁধতে চেষ্টা করলো কাঁদিদ।

মহিলাটি বললেন—শোন! তুমি হচ্ছো বিদেশী, এই প্যারিসে আমার যে সব প্রেমিক রয়েছে তাদের আমি পনের দিন যন্ত্রণা ভোগ করাই। কিন্তু তোমার কাছে প্রথম দর্শনেই আমি নিজেকে সমর্পণ করলাম। কারণ, একটি ওয়েস্টফালিয়ার যুবককে আমার দেশের হয়ে আমি সম্মান জানাতে চাই।

কাঁদিদের হাতে যে দুটি বিরাট হীরে ছিল সে দুটির দিকে সুন্দরী মহিলাটি সতৃষ্ণ নয়নে তাকালেন, এবং সে দুটির এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন যে হীরে দুটি তার হাত থেকে মার্শনেশের আঙুলে স্থানান্তরিত হলো।

পাদরীর সঙ্গে বাড়ি যাওয়ার সময় কাঁদিদের বিবেক তাকে দংশন করে উঠলো। তার মনে হলো, মিস কুঁনিগুঁর প্রতি সে অবিশ্বাসের কাজ করেছে। তার মনে যে অস্বস্তি জেগেছিলো তার জন্যে পাদরীও তাকে সহানুভূতি জানালো। কাঁদিদ জুয়ায় যে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ হারিয়েছিলো তার সামান্য একটি সে পাবে। এবং যে দুটি হীরে সে কিছুটা ইচ্ছে করে এবং কিছুটা বাধ্য হয়ে মার্শনেশকে দিয়েছে তার যা দাম হবে তারও সামান্য কিছু তার পাওয়ার কথা। কিন্তু তার আশা ছিল আরও বেশী। কাঁদিদের সঙ্গে আলাপের সুযোগটাকে সে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলো। সে মিস কুঁনিগুঁর কথা ফলোয়া করে কাঁদিদের কাছে বর্ণনা করলো। কাঁদিদ তাকে নিশ্চিন্ত করলো যে সুন্দরী কুঁনিগুঁর কাছে তার এই বিশ্বাসঘাতক প্রবৃত্তির জন্যে সে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাইবে; অবশ্য, ভেনিসে তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়ে।

পাদরী কাঁদিদের কাছে আরও বেশী করে ভদ্রতা দেখাতে লাগলো। কাঁদিদ যা বললো সবেতেই সে বেশ উৎসাহ দেখালো, যা করলো, অথবা, করার

ইচ্ছা প্রকাশ করলো সবটাতেই সে বেশ উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করলো তাকে।

তাহলে স্যার, ভেনিসেই আপনি মিলনবাসরে যাচ্ছেন?

কাঁদিদ বললো—হ্যাঁ, মঁসিয়ে পাদরী! আমাকে যেতেই হবে, খুঁজে বার করতে হবে মিস কুঁনিগুঁকে।

এই ব্যাপারটা নিয়ে কাঁদিদ অনর্গল কথা বলতে ভালবাসতো, সেই রীতি অনুসারে, বিখ্যাত ওয়েস্টফালিয়ার সুন্দরীকে নিয়ে তার যে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা ঘটেছিলো তার কিছুটা সে-পাদরীর কাছে বর্ণনা করলো।

পাদরী বললো—মনে হচ্ছে, মিস কুঁনিগুঁ খুবই বুদ্ধিমতী রমণী, তাঁর চিঠিপত্রও খুবই চিত্তাকর্ষক।

কাঁদিদ বললো—তার কাছ থেকে আমি কোন দিন কোন চিঠি পাই নি, কারণ মনে রাখবেন, তার জন্যে লাথি খেয়ে দুর্গ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পরে তাকে কোন চিঠি আমি লিখতে পারি নি। বিশেষ করে, সেখান থেকে চলে আসার পরে আমি শুনলাম সে মারা গিয়েছে। তাকে আমি ফিরে পেলাম বটে; কিন্তু আবার তাকে আমি হারালাম। এখান থেকে আড়াই হাজার লিগ দূরে তার কাছে আমি একজন দূতকে পাঠিয়েছি; এবং তার কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে আমার দূতটির ওইখানে ফিরে আসার কথা। সেইখানেই তার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো।

খুব মন দিয়ে পাদরী তার কথা শুনলো, মনে হলো, ব্যাপারটা নিয়ে সে খুবই চিন্তা করছে। এই দুটি বিদেশীকে হৃদ্যতার সঙ্গে আলিঙ্গন করে পাদরী বিদায় নিল। পরের দিন ঘুম ভেঙে জাগার পরেই কাঁদিদ নিম্নলিখিত চিঠিটি পেলো—

'আমার প্রিয় প্রেমিক, এই শহরে আমি আট দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছি। তুমি যে এখানে এসেছো সে-সংবাদ আমি পেয়েছি। আমার ওঠার শক্তি যদি থাকতো তাহলে, আমি উড়ে তোমার বুকে গিয়ে আশ্রয় নিতাম, বোর্দ্যতে তুমি যে পরিকল্পনা করেছিলে সে সব কথা আমি শুনেছি। বিশ্বাসী ক্যাকাম্বো আর সেই বৃদ্ধাকে আমি সেখানে ছেড়ে এসেছি। তারা আমার পেছনে আসছে। আমার যা ছিল বুয়েনোস আয়ার্সের গভর্নর সব নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তোমার হৃদয় আমার রয়েছে। এস, তোমার উপস্থিতি হয় আমাকে বাঁচাবে, অথবা আনন্দের মধ্যে আমার মৃত্যুর কারণ হবে।'

প্রিয়তমা কুঁনিগুঁর অসুস্থতা দুঃখে আর শোকে তাকে মুহ্যমান করে তুললেও, এই সুন্দর এবং অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে কাঁদিদ আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলো। এই দুটি উত্তেজনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কাঁদিদ তার সোনা আর হীরে নিয়ে একটি লোকের মাথায় চাপিয়ে মিস কুঁনিগুঁ যেখানে রয়েছে সেইখানে মার্টিনকে যাওয়ার নির্দেশ দিল। ভাবাবেগে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটলো সে, তার বুকটা দুরু দুরু করতে লাগলো; জিব গেলো জড়িয়ে।

একটা ঘরের পর্দা সরানোর চেষ্টা করলো সে ; বিছানার ধারে একটা বাতি আনতে বললো।

মেয়ে চাকরটি বললো—সাবধান। আলো তিনি সহ্য করতে পারছেন না। এই বলে সে পর্দাটা আবার টেনে দিল।

কাঁদতে-কাঁদতে কাঁদিদ বললো—প্রিয়তমে, কেমন আছ তুমি? আমাকে যদি দেখতে না পাও, অন্তত কথা বলো।

মেয়ে চাকরটি বললো—তিনি কথা বলতে পারেন না।

যে মেয়েটি ভেতরে শুয়েছিলো সে তার মোটা হাতটা বাড়িয়ে দিল। সেই হাতটা চোখের জলে ভিজিয়ে দিল কাঁদিদ, তারপরে সোনা আর হীরেতে বোঝাই তার থলিটা সে চেয়ারের ওপরে রাখলো।

ঠিক এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঢুকলো, তার পেছনে পাদরী, আর কিছু বন্দুকধারী সৈন্য।

পাদরী বললো—এই সেই দুজন বিদেশী, এদের ওপরে সন্দেহ হচ্ছে।

সে তাদের ধরিয়ে দিয়ে সৈন্যদের নির্দেশ দিল তাদের ফাটকে নিয়ে যেতে।

কাঁদিদ বললো—এল ডোরাডোতে পর্যটকদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার কেউ করে না।

মার্টিন বললেন—আমি এখন সত্যি সত্যিই ম্যানিকেরিয়্যান। আগের চেয়ে অনেক বেশী।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—আমাদের স্যার, আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

অফিসারটি বললো—ফাটকে।

এতক্ষণে মার্টিন ধাতস্থ হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে মেয়েটি কুঁনিগুঁ সেজেছিল সে হচ্ছে প্রতারক, আর পিরিগোর্ডের পাদরী হচ্ছে প্রবঞ্চক। কাঁদিদের সরলতার সুযোগ সে খুবই তাড়াতাড়ি নিয়েছিলো। আর ওই অফিসারটি হচ্ছে আর একটা বদমাশ, ওদের হাত থেকে তাঁরা সহজেই ছাড়া পেতে পারেন।

কাঁদিদ মার্টিনের উপদেশ মত কাজ করলো। আদালতে যাওয়ার চেয়ে আসল কুঁনিগুঁকে খুঁজে বার করার চেষ্টায় সে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। অফিসারটিকে তিনটে ছোট হীরে, আর বাকি সকলকে তিন হাজার পিসটোল দেওয়ার সে প্রস্তাব করলো।

নিম্ন শ্রেণীর বিচারকটি বললো—চমৎকার! স্যার, আপনি যদি জঘন্য অপরাধও করতেন তাহলে, এর পরে আমার চোখে আপনি শ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতেন। তিনটি হীরের দাম হবে তিন হাজার পিসটোল। আপনাকে হাজতে পাঠানোর চেয়ে, স্যার আপনার সেবা করতে চির জীবন আমি রাজি আছি, নরম্যাণ্ডীতে আমার এক ভাই রয়েছে, আমি নিজে

আপনাকে সেইখানে নিয়ে যাব। আমার ভাইকে দেওয়ার মত আর কোন হীরে যদি আপনার থাকে সেও তাহলে, আমার মতই আপনার যত্ন নেবে।

কাঁদিদ বললো—কিন্তু বিদেশীদের তারা সব গ্রেপ্তার করছে কেন?

পিরিগোর্ডের পাদরী বললো—কারণ আট্রিবেটির একটা হতভাগা কার কাছ থেকে কী যেন সব গাঁজাখোরী গল্প শুনে তার বাবাকে খুন করেছিলো। ১৬১০ সালের মে মাসে যে হত্যা হয়েছিলো সে রকম নয়, ১৫৯৪ সালের ডিসেম্বরে যে রকম হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিলো ঠিক সেই রকম; আর অন্য বছর আর মাসে গাঁজাখোরী গল্প শুনে হতভাগ্য শয়তানরা যে রকম হত্যা করে সেই রকম।

পাদরীর কথাটা ব্যাখ্যা করে তাদের বুঝিয়ে দিল অফিসারটি।

চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—কী বলছেন! যে দেশে মানুষেরা সব সময় হাসছে আর গান করে দিন কাটাচ্ছে সেইখানে এই রকম জঘন্য হত্যাকাণ্ড মানুষে করতে পারে? যেখানে বানররা বাঘকে ক্ষেপিয়ে তোলে সেই ঘৃণ্য দেশ কি তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করার কোন উপায় নেই? আমার দেশে আমি ভালুক দেখেছি; কিন্তু এক এল ডোরাডো ছাড়া অন্য কোথাও মানুষ আমি দেখি নি।

সে অফিসারটিকে বললো—স্যার, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ভেনিসে যাওয়ার পথটা দেখিয়ে দিন। সেখানে মিস কুঁনিগুঁর জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

অফিসারটি বললো—আমি আপনাদের লোয়ার নরম্যাণ্ডী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। তার বেশী নয়।

এই বলে, কাঁদিদের শেকল খুলে দেওয়ার জন্যে সে নির্দেশ দিল; তারপরে, তার অনুচরদের বিদায় দিল। তাদের বিদায় দিয়ে সে কাঁদিদ আর মার্টিনকে নিয়ে লোয়ার নরম্যাণ্ডীর ডিপিতে নিয়ে তার ভাইয়ের হাতে ছেড়ে দিল, তিনটি হীরে পেয়ে সেই নরম্যানটি খু.ই অনুগৃহীত হয়েছিলো। সেই সময় একটি ডাচ জাহাজ সমুদ্রে ভাসার জন্যে তৈরি হয়েছিল। সেই নরম্যান ভদ্রলোক তাদের আর তাদের সঙ্গীদের খুব ভালো ভাবে যত্ন করে সেই জাহাজে তুলে দিল। জাহাজটি যাত্রা করলো ইংলণ্ডের পোর্টসমাউথের দিকে। ভেনিসে যাওয়ার ওটা সোজা পথ নয়। কিন্তু কাঁদিদ ভাবলো আপাতত সে নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার পেয়েছে। এর পরে ভেনিসে যাওয়ার সুযোগ যে সে অনায়াসেই পাবে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না।

পরিচ্ছেদ—২৩

কাঁদিদ আর মার্টিন ইংলণ্ডের তীরে এসে পৌঁছলো। সেখানে তারা কী দেখলো

ডাচ জাহাজে উঠে চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—আ, প্যানগ্লস, প্যানগ্লস! আ, মার্টিন! মার্টিন! আ, প্রিয় মিস কুঁনিগুঁ! কী রকমের জগৎ এটা!

মার্টিন বললেন—কী রকম আবার! মূর্খ আর ঘৃণিত!

কাঁদিদ বললো—ইংলণ্ডের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় রয়েছে। ফরাসীদের মত ওখানকার লোকেরাও কি মূর্খ?

মার্টিন বললেন—হ্যাঁ, তবে অন্য ভাবে। আপনি বোধ হয় জানেন, কানাডার পাশে কয়েক একর বরফের জন্যে এই দুটো দেশ নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। আর এই যুদ্ধে তারা যে খরচ করছে তাই দিয়ে সারা কানাডা দেশটাকেই কেনা যেতো। পাগলা গারদে ঢোকানোর মত লোক ফ্রান্সে বেশী, না, ইংলণ্ডে বেশী সে কথা বলার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমি এইটুকু জানি যে, যেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানকার লোকেরা দেখতে খুবই কৃষ্ণবর্ণ, এবং বিভিন্ন প্রকৃতির।

এইভাবে গল্প করতে-করতে তারা পোর্টসমাউথে এসে পৌঁছলো। দেখা গেলো তীরে, বন্দরের ওপরে দু পাশে সারিবন্দী হয়ে গাদা-গাদা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে একটি লোকের দিকে। লোকটি বেশ বলিষ্ঠ চেহারার। একটি যুদ্ধ জাহাজের ডেকের ওপরে সে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে। তার চোখ দুটি বাঁধা। এই লোকটির সামনে চারটি সৈন্য দাঁড়িয়েছিল। তাদের প্রত্যেকে সেই লোকটির মাথার খুলি লক্ষ্য করে তিনটি করে বুলেট ছুঁড়লো; তারপরে, গভীর আত্মপ্রসাদ নিয়ে সে-স্থান পরিত্যাগ করলো তারা। কাজটি শেষ হয়ে গেলে জনতাও খুব খুশি হয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—এসবের মানেটা কী? জগৎজোড়া শয়তানের কী কাণ্ডই না চলেছে!

অনুষ্ঠান আর অত আড়ম্বরের সঙ্গে যে বলিষ্ঠ লোকটিকে পৃথিবী থেকে পাচার করে দেওয়া হলো সেই লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো কাঁদিদ; শুনলো, সে একজন নৌ-সেনাপতি।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা তোমাদের নিজেদের নৌ-সেনাপতিকে এইভাবে হত্যা করলে কেন?

কারণ, ওঁর অধীনস্থ যথেষ্ট সংখ্যক সেনাবাহিনীকে উনি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেন নি। আপনি নিশ্চয় জানেন ফরাসী নৌবাহিনীর সঙ্গে আমাদের নৌবাহিনীর একটি সংঘর্ষ হয়েছিলো। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে শত্রুর যতটা কাছাকাছি যাওয়া উচিত ছিল ততটা কাছাকাছি তিনি যেতে পারেন নি।

কাঁদিদ বললো—কিন্তু, তাহলে, ফরাসী নৌবাহিনীর সেনাপতিও নিশ্চয় এঁর

কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলেন।

তা অবশ্য ছিলেন। তবে, মাঝে-মাঝে একজন নৌ-সেনাপতিকে হত্যা করার রীতি এদেশে প্রচলিত রয়েছে। তাতে অন্য সব সেনাপতিদের সাহস বাড়ে।

এই দৃশ্য দেখে আর শুনে কাঁদিদ এতই মর্মাহত হলো যে সে কিছুতেই তীরে নামতে চাইলো না। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে ভেনিসে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সে ডাচ ক্যাপটেনের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করলো। সুরিনামের একটি ডাচ ক্যাপটেন কিছুদিন আগে তার যথাসর্বস্ব ডাকাতি করেছিল তা জেনেও, সে তার সঙ্গে একটা রফায় আসতে দ্বিধা করলো না।

দুদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেলো ক্যাপটেন। ফ্রান্সের পাশ দিয়ে তাদের জাহাজ ভেসে গেলো; দেখতে পেলো লিসবন। কাঁদিদের বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো, ধীরে-ধীরে তাদের জাহাজ এসে পৌঁছলো ভূমধ্যসাগরে। তারপরে ভেনিসের কূলে এসে জাহাজ ভিড়লো তাদের।

মার্টিনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদিদ বললো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখানেই প্রিয়তমা কুঁনিগুঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হওয়ার কথা। ক্যাকাম্বোর ওপরে আমার যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। সবই ভালো, সবই ভালো—যতদূর ভালো হতে পারে ততদূর ভালো।

পরিচ্ছেদ—২৪

প্যাকিটি এবং রোমান ক্যাথলিক একটি পাদরী

ভেনিসে নেমে সে ক্যাকাম্বোকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। প্রত্যেকটি সরাইখানায়, প্রতিটি কফি হাউসে এবং সমস্ত আমোদপ্রিয় সৌখিন মহিলাদের মধ্যে সে তাকে খুঁজে বেড়ালো। যে সব জাহাজ আর বোট বন্দরে এসে প্রতিদিন ভিড়ছিল সেখানে সে তার খোঁজ করলো; কিন্তু ক্যাকাম্বোর কোন সংবাদ নেই।

সে মার্টিনকে বললো—বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো! সুরিনাম থেকে বোর্দ্‌তে গেলাম আমি, সেখান থেকে স্থলপথে প্যারিস, প্যারিস থেকে দিপে, সেখান থেকে পোর্টসমাউথ, সেখান থেকে পর্তুগাল আর স্পেনের তীর ঘেঁষে ভূমধ্যসাগর, সেখান থেকে হাজির হলাম ভেনিসে। এখানেও কয়েক মাস আমার কাটলো। তবু এখনও সুন্দরী কুঁনিগুঁ এসে পৌঁছলো না? তার পরিবর্তে আমার সঙ্গে দেখা হলো একটি পার্শিয়ান জোচ্চোর আর পিরিগোর্ডের রাস্কেল পাদরীর সঙ্গে। কুঁনিগুঁ নিশ্চয় আর বেঁচে নেই। এখন তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর আমার উপায় নেই। হায়রে, এই হতচ্ছাড়া ইউরোপে

ফিরে না এসে এল ডোরাডোর স্বর্গীয় উদ্যানে থেকে গেলে আমার কী ভালোই না হতো! প্রিয় মার্টিন, আপনি ঠিকই বলেছেন। সবই এখানে দুঃখ; সবই প্রতারণা।

গভীর দুঃখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো সে। কোন অপেরাতেও গেলো না, কার্নিভ্যালের দিকেও পা বাড়ালো না সে। কোন মহিলাও তাকে প্রলুব্ধ করতে পারলো না।

মার্টিন বললেন— সত্যি বলছি, আপনি খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ। আপনি কী করে ভাবতে পারলেন যে একজন রাসকেল অপদার্থ চাকর পাঁচ থেকে ছ' মিলিয়ন টাকা পকেটে নিয়ে আপনার প্রেমিকাকে খুঁজতে পৃথিবীর অপর প্রান্তে ছুটে যাবে, আর সেইখান থেকে খুঁজে বার করে আপনার কাছে এনে দেবে! তাকে যদি সে খুঁজে পায়-ও, তাহলে, সে নিজেই তাকে ভোগ করবে। যদি না পায়, আর কোন মেয়েকে সে যোগাড় করে নেবে। আমার উপদেশ শুনুন। আপনার ভৃত্য ক্যাকাম্বো, আর প্রেমিকা কুঁনিগুঁকে আপনি ভুলে যান।

বেশ সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মার্টিন কথাগুলি বলেছিলেন; কিন্তু কাঁদিদের দুঃখ তাতে কমলো না; বরং, বেড়ে গেলো। সম্ভবত, এক এল ডোরাডো ছাড়া, যেখানে বাইরের কোন মানুষ প্রবেশ করতে পারে না, বিশ্বে যে কোথাও পুণ্য বা সুখ বলতে কিছু নেই এই কথাটাই মার্টিন বারবার তাকে বোঝাতে লাগলেন।

এই ভাবে এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের খুব জোর আলোচনা চলছিলো। তবু, মিস কুঁনিগুঁর আশা কাঁদিদ কিছুতেই ছাড়তে পারছিলো না। এমন সময় কাঁদিদ একদিন সেণ্ট মার্ক প্লেসে একটি রোমান ক্যাথলিক পাদরীকে দেখতে পেলো। তার বগলের তলায় একটি মেয়ে। পাদরীর দেহটি বেশ মসৃণ, নাদুস-নুদুস এবং বলিষ্ঠ। তার চোখ দুটো চকচক করছিলো; তার চাল-চলন, আদব-কায়দা বেশ সপ্রতিভ, আর সম্ভ্রান্ত। মেয়েটিও দেখতে সুন্দরী। মেয়েটি একটা গান গাইছিলো; মাঝে মাঝে সে পাদরীটির দিকে মদির নয়ন তুলে তাকাচ্ছিল, আর তার লাল গাল দুটিতে প্রেমিকার মত চিমটি কাটছিলো।

কাঁদিদ মার্টিনকে বললো—এই দুটি মানুষ যে সুখী সেটা অন্তত আপনি স্বীকার করবেন। এল ডোরাডো ছাড়া, এই বিরাট বিশ্বের কোথাও ভাগ্যহত মানুষ ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি নি। কিন্তু আমি বাজী রেখে বলতে পারি এরা সুখী।

মার্টিন বললেন—তাই ধরুন। বাজী আপনি হারবেন। আপনি যাই বলুন, ওরা সুখী নয়।

এই শুনে কাঁদিদ তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো; তারপরে খুবই বিনীত ভাবে

তার সরাইখানাতে এসে তাদের সঙ্গে ভোজন করার জন্যে নিমন্ত্রণ করলো। সেই সঙ্গে সে একথাও জানাতে ভুললো না যে সেই ভোজে থাকবে কিছু মার্কনী, লোম্বার্ড প্যাট্রিজের সঙ্গে থাকবে ক্যাভিয়েয়ার; পানীয় হিসাবে দেওয়া হবে মন্টিপুলপিয়ানো, ল্যাক্রিয়া ক্রিষ্টি, সাইপ্রাস আর স্যামোস। এই শুনে মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো পাদরীটি। মেয়েটি তার পিছু পিছু আসতে লাগলো। আশ্চর্য আর অবাক হওয়ার দৃষ্টিতে মেয়েটি কাঁদিদের দিকে বারবার তাকাতে লাগলো। সেই সঙ্গে গাল দুটি বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার। কাঁদিদের ঘরে ঢুকেই সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো:

মিঃ কাঁদিদ, আপনি! হতভাগিনী প্যাকিটিকে আপনি ভুলে গেলেন কেমন করে? আপনি কি এখনও তাকে চিনতে পারছেন না?

কুঁনিগুঁর চিন্তাতেই মসগুল থাকার ফলে, কাঁদিদ তার দিকে এতক্ষণ ভালভাবে তাকানোর সময় পায় নি। এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সে বলে উঠলো—আরে আরে, তুমি! তোমারই জন্যে ডক্টর প্যানগ্লসের ওই রকম সুন্দর চেহারা হয়েছিলো?

প্যাকিটি বললো—হ্যাঁ, স্যার! দুঃখের কথা, তার জন্যে আমিই দায়ী। বুঝতে পারছি আপনি সবই জানেন। লেডী ব্যারনেস এবং তাঁর সুন্দরী কন্যা কুঁনিগুঁর সংসারে কী দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিলো সে সব সংবাদই আমি পেয়েছি। কিন্তু আপনাকে আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে আমার দুর্ভাগ্যও তাদের চেয়ে কম নয়। আমাকে যখন আপনি শেষ দেখেছিলেন তখন আমি ছিলাম নিষ্পাপ। ফ্র্যানসিসক্যান দলের একজন নীতিবাগীশ পাদরীই আমাকে ফুসলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়েছিলো, এবং, খুবই সহজে। তার ফল হলো ভয়ঙ্কর। ব্যারন যেদিন আপনার পাছায় লাথি মারতে-মারতে দুর্গ থেকে বার করে দিলেন তারই কিছুদিন পরে ওই দুর্গ ছেড়ে আমাকে চলে আসতে হয়েছিলো; এবং একজন নামকরা ডাক্তার যদি আমার ওপরে অনুগ্রহ না করতেন তাহলে, আমি এতদিন মরে ভূত হয়ে যেতাম। সেই কৃতজ্ঞতায় কিছুদিন রক্ষিতা হিসাবে তাঁর কাছে আমাকে থাকতে হয়েছিলো। কিন্তু তাঁর স্ত্রীটি যেমন রাক্ষসী তেমনি হিংসুটে। আমাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। ফলে, প্রতিদিন তিনি আমাকে নিষ্ঠুরভাবে মারধোর করতেন। ও বাবা! ভদ্রমহিলা তো নয়; একেবারে সাক্ষাৎ ওলাইচণ্ডী! মানুষের জগতে ডাক্তারের মত কদাকার প্রাণী আমার চোখে আর পড়ে নি। আর কী দুর্ভাগ্য আমার বলুন! যে মানুষটাকে আমি বিন্দুমাত্র ভালবাসতাম না তারই জন্যে আমাকে প্রতিদিন ওই রকম ধোলাই খেতে হতো! স্যার, একজন ডাক্তারকে যদি কোন বদরাগী মেয়েমানুষ বিয়ে করে তাহলে অবস্থাটা কী রকম বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় তা আপনি বুঝতেই পারছেন, স্ত্রীর এই রকম দুর্ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে সামান্য একটু

র্দির জন্যে তিনি স্ত্রীকে এমন একটা ওষুধ দিলেন যে দু'ঘণ্টার আগেই ভদ্রমহিলার সারা দেহে ভয়ঙ্কর রকমের খাঁচ দেখা দিল; আর তাতেই তিনি মারা গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করলেন। ফলে, স্বামীটি পালিয়ে গেলেন; আমাকে জেলে যেতে হলো। আমার নিরপরাধ আমাকে বাঁচাতে পারলো না; তার একমাত্র কারণ, আমি ছিলাম সুন্দরী। জজসাহেব আমাকে মুক্তি দিতে চাইলেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো, ডাক্তারের স্থানটি তাঁকে দিতে হবে। যাই হোক, আমার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী হাজির হলো। ফলে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমি বিতাড়িতা হলাম; এবং এই ঘৃণিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হলাম। আমাদের এই জীবন পুরুষদের কাছে খুবই মুখরোচক অথচ, এই জীবন যাপন করার জন্যে আমাদের মত হতভাগিনীদের কী দুঃখই না ভোগ করতে হয়! অবশেষে ভেনিসে এসে আমি এই ব্যবসা চালাতে লাগলাম। হায়, স্যার, আমাদের কী দুর্ভোগ ভুগতে হয় তা যদি আপনি জানতেন। দিনের পর দিন উদাসভাবে আমাদের শুয়ে থাকতে হয় বুড়ো ব্যবসাদার, আইন সভার সদস্য, পাদরী, আর মাতালদের সঙ্গে। তাদের সমস্ত কিছু ঔদ্ধত্য আর গালাগালি সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। প্রায়ই আমাদের পেটিকোট ধার করে আনতে হয়। সেই পেটিকোট আবার জোর করে নিয়ে নেয় অন্য কোন বেশ্যা। একজন মক্কেল আমাদের যা দিয়ে যায় আর একজন মক্কেল এসে কেড়ে নিয়ে যায় সেটাকে। সিভিল ম্যাজিস্ট্রেটরা জেলে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় করে। তাছাড়া, চোখের ওপরে দেখতে পাই বৃদ্ধ বয়সের করাল ছায়া, হাসপাতাল আর আবর্জনার স্তূপ। এসব থেকে আপনি বুঝতেই পারেন আমার মত হতভাগিনী মেয়ে জগতে খুব কমই রয়েছে।

সেই ঘরে সৎ কাঁদিদের কাছে প্যাকিটি এইভাবে অকপটে তার কাহিনী বললো। কাছেই বসেছিলেন মার্টিন। এই কথা শুনে তিনি বললেন—দেখলেন স্যার, আধখানা বাজী আমি জিতে গেলাম।

ডিনার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পাদরী জিরোফ্লি বাইরের ঘরে বসে মহা আনন্দে দু'এক গ্লাস করে মদ্যপান করে নিজেকে সতেজ করে রাখছিলেন।

কাঁদিদ প্যাকিটিকে বললো—কিন্তু তোমাকে দেখে তো বেশ স্ফূর্তিবাজ বলে মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ সন্তুষ্ট। দেখলাম, গান করতে-করতে পাদরীকে তুমি আদর করছো। সেই দেখে ভেবেছিলাম তুমি খুবই সুখী। এখন দেখছি সেই পরিমাণেই তুমি দুঃখী।

প্যাকিটি বললো—হায় স্যার, আমাদের ব্যবসায় অনেক দুঃখের মধ্যে ওটা একটা। গতকাল, একজন অফিসার এসে উলঙ্গ করে আমাকে মারলো। তবু আজ আমাকে হাসতেই হবে; আনন্দ করতেই হবে পাদরীকে খুশি করার জন্যে।

তার কথা বিশ্বাস করলো কাঁদিদ; মার্টিন যে ঠিকই বলেছেন সে বিষয়ে তার

আর কোন সন্দেহ রইলো না। পাদরী, প্যাকিটি আর মার্টিনের সঙ্গে সে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলো। খাওয়াটা ভালোই হলো। তারপরে কিছুটা স্বাধীনভাবে তারা গল্প করতে লাগলো।

কাঁদিদ বললো—ফাদার, আমার মনে হচ্ছে, আপনি যেরকম সুখী সেরকম সুখ রাজাদেরও নেই। আনন্দ আর স্বাস্থ্যের ছাপ পড়েছে আপনার মুখের ওপরে। আপনার মনোরঞ্জন করার জন্যে একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী আর আপনি যা করছেন, মনে হচ্ছে, তাতেই আপনি বেশ খুশি।

জিরোফ্লি বললো—বিশ্বাস করুন স্যার, থিয়েটিনরা, অর্থাৎ আমার যা পেশা, একেবারে সমুদ্রের অতলে বাস করছে। কতবার যে কনভেণ্টে আগুন লাগিয়ে দিতে আমি প্রলুব্ধ হয়েছিলাম তা আর কী বলব! কতবারই না ভেবেছিলাম ওখান থেকে ছুটে পালিয়ে গিয়ে টার্ক হবো। আমার যখন পনের বছর বয়স সেই সময় আমার বড় ভাইয়ের ভাগ্য ফেরানোর জন্যে আমার বাবা মা এই ঘৃণিত পোশাক পরতে আমাকে বাধ্য করেছিলেন। গোল্লায় যাক আমার দাদা! আমাদের কনভেণ্টে রয়েছে কেবল বাদ-বিসংবাদ, মারামারি, আর হিংসা। কথাটা সত্যি যে কিছু প্রচারের কাজ করে সামান্য কিছু অর্থ আমি রোজগার করেছি। তার অর্দ্ধেকটা চুরি করেছে আমাদের মঠের প্রধান মোহান্ত; বাকিটা খরচ হয়েছে আমার সঙ্গিনীদের পেছনে। কিন্তু সন্ধ্যের সময় আমি যখন কনভেণ্টে আমার ঘরে গিয়ে পৌঁছাই তখন মনে হয় দেওয়ালের গায়ে মাথা ঠুকে আমি ভেঙে ফেলি। আর আমাদের মঠের সব সন্ন্যাসীদেরই এই একই অবস্থা।

কাঁদিদের দিকে তাকিয়ে চিরাচরিত ঔদাসীন্যের সঙ্গে মার্টিন বললেন—এবার কী মনে হচ্ছে আপনার? সব বাজীটাই আমি জিতে নিয়েছি, কী বলেন?

প্যাকিটিকে দু হাজার আর ফ্রায়ার জিরোফ্লিকে এক হাজার পিয়েস্ত্রা দিয়ে সে বললো—আমি নিশ্চিৎ যে এর পরে তোমরা সুখী হবে।

মার্টিন বললেন—আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। আমার ধারণা, এই অর্থ পেয়ে ওরা আরও গোল্লায় যাবে।

কাঁদিদ বললো—সে যাই হোক। একটা জিনিস আমাকে বেশ সান্ত্বনা দিচ্ছে, যাদের সঙ্গে কোন দিনই আমাদের দেখা হবে না বলে মনে করি তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। সেই জন্যেই বোধ হয় আমি লাল মেষ আর প্যাকিটিকে ফিরে পেয়েছি। তাহলে, মিস কুঁনিগুঁকেও ফিরে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হবে।

মার্টিন বললেন—আশা করি একদিন সে আপনাকে সুখী করতে পারবে; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার বেশ সন্দেহ রয়েছে।

আপনাকে বিশ্বাস করানো বড় কঠিন।

কারণ, পৃথিবীটাকে আমি দেখেছি।

কাঁদিদ বললো—ওই সব হালকা নৌকোর মাঝিদের দেখুন। ওরা সব

সময়েই গান করছে, তাই না?

মার্টিন বললেন—বাড়িতে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওরা কী রকম ব্যবহার করে তা আপনি দেখেন নি। ভেনিসের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের যেমন ভয়ানক দুঃখ আর হতাশা রয়েছে, তিমনি রয়েছে ওই জেলেদের। তা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেটের জীবনের চেয়ে নৌকোর মাঝি-মাল্লাদের জীবন আমার কাছে অনেক ভালো বলে মনে হয়। কিন্তু পার্থক্যটা এত সামান্য যে তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ধকল সহ্য না করাই ভাল।

কাঁদিদ বললো—সিনেটর পোকোকুরান্ত-এর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি আমি। ব্রেনতার ওই সুন্দর বাড়িতে তিনি থাকেন। লোকে বলে, বিদেশীদের তিনি বেশ বিনীতভাবেই আদর অভ্যর্থনা জানান। সবাই বলে, এই মানুষটির মধ্যে অস্থিরতা বলে কিছু নেই।

মার্টিন বললেন—এই রকম অত্যাশ্চর্য মানুষটিকে দেখতে পেলে আমি খুব খুশি হতাম।

এই শুনে সিনেটরের কাছে কাঁদিদ একটি দূতকে পাঠালো; বলে দিল, পরের দিন তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

পরিচ্ছেদ—২৫

একজন সম্ভ্রান্ত ভেনিসবাসী সিনেটর পোকোকুরান্তের বাড়িতে তারা গেলো

ছোট একটা হালকা নৌকোয় চেপে কাঁদিদ আর মার্টিন ব্রেনতার সম্ভ্রান্ত সিনেটর পোকোকুরান্তের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোলো। বাগানটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো; মাঝে-মাঝে সুন্দর-সুন্দর মর্মর মূর্তিগুলি সাজানো রয়েছে। ভাস্কর্যের দিক থেকে তাঁর প্রাসাদটি সত্যই বড় চমৎকার। এই প্রাসাদের প্রভু যিনি তাঁর বয়স ষাট; অত্যন্ত ধনী মানুষ। খুবই ভদ্রতার সঙ্গে তিনি এই দুজন পর্যটককে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু সেই অভ্যর্থনার মধ্যে কোন রকম আড়ম্বর ছিল না। এতে কিছুটা আশাভঙ্গ হলো কাঁদিদের; মার্টিনের কিন্তু বেশ ভালই লাগলো।

প্রথমেই এলো দুটি সুবেশা তরুণী। তাদের হাতে চকোলেট; বেশ গরম আর ফেনায়িত সেই চকোলেট। তাদের সৌন্দর্য আর চাল-চলনের লাবণ্যকে তারিফ না করে পারলো না কাঁদিদ।

সিনেটর বললেন—এই মেয়ে দুটি ভালোই। মাঝে-মাঝে ওদের আমি আমার পাশে শোওয়াই; কারণ, শহরের মেয়েদের দেখে-দেখে আন্তরিকভাবেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাদের বাচালতা, বিদ্বেষ, বিবাদ, আর তাদের

অর্বাচীনতা আমাকে বড়ই বিরক্ত করে তুলেছে। তাদের চাপল্য, তাদের কদর্যতা, তাদের দম্ভ আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সনেট লিখে-লিখে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছে; সেই সঙ্গে বিরক্তি ধরেছে তাদের ওপরে কবিতা লেখানোর জন্যে পয়সা দিয়ে। কিন্তু তাছাড়াও বলছি, এই দুটি মেয়েরও আমার ওপরে আজকাল একটু উদাসীন হয়ে পড়ছে।

কিছু জলযোগ সেরে কাঁদিদ বিরাট ছবির গ্যালারীতে গিয়ে ঢুকলো। সেই ঘরে অদ্ভুত সুন্দর অনেক ছবি ছিল। সেই দেখে সে অবাক হয়ে গেলো। প্রথম দুটি ছবি যিনি এঁকেছেন তার নাম জানতে চাইলো কাঁদিদ।

সিনেটর বললেন—ও দুটি হচ্ছে র‍্যাফেলের আঁকা। কয়েক বছর আগে অনেক টাকা খরচ করে ওই দুটি ছবি আমি কিনেছিলাম দম্ভ করে; কারণ, শুনেছিলাম ইতালীতে ও দুটির জোড়া ছবি আর নেই। কিন্তু ওদের দেখে যে আমি আনন্দ পেয়েছি সেকথা আমি বলতে পারবো না। রঙটা হচ্ছে কালো, গভীর কালো। মূর্তিগুলি তেমন ফোটে নি; বেশ পরিস্ফুট হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না আমার। আসল বস্তুটার সঙ্গে ঝালরের কোন সম্পর্ক নেই। যে উচ্চ প্রশংসা এদের করা হয়েছে তা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য যে এদের মধ্যে সত্যিকার প্রকৃতি প্রতিফলিত হয় নি। প্রকৃতিকে যে ছবির মধ্যে আমি দেখতে পাইনে তাকে আমি ছবি বলেই মনে করি না আর সেরকম ছবিও নেই। আমার ছবির সংগ্রহশালাটি খুবই সুন্দর; কিন্তু এতে আমি আনন্দ পাই নে।

ডিনার তৈরি হওয়ার আগে সিনেটর একটি কনসার্ট বাজানোর নির্দেশ দিলেন। কাঁদিদ কনসার্ট শুনে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

সম্ভ্রান্ত সিনেটর বললেন—এই গণ্ডগোল কাউকে-কাউকে সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে আনন্দ দিতে পারে; কিন্তু আধ ঘণ্টার বেশী এই বাজনা চললে মানুষ বিরক্ত হয়ে উঠবে, যদিও সেকথাটা স্বীকার করার মত সাহস তার হবে না। যা কিছু কঠিন তাকে অনুশীলন করাই হচ্ছে সঙ্গীতের ধর্ম। এখন কথাটা হচ্ছে, কঠিন কোন কিছুই মানুষকে বেশীক্ষণ ধরে খুশি করতে পারে না। আমার মনে হয়, অপেরাগুলি যদি ওরকম ভয়ঙ্কর ধরনের না হতো তাহলে সেখানে যাওয়াটা আমার কাছে অনেক বেশী আনন্দদায়ক হতো। লোকে যে এই সব সঙ্গীতমুখর অকথ্য ট্র্যাজিডিগুলিকে কী করে সহ্য করে সেকথা ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। এই সব নাটকে দৃশ্যগুলিকে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের ভেতরে ঢোকানো হয় তিন-চারটে বিশ্রী ধরনের গান—মনে হবে সেগুলিকে কেউ যেন কান ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এসবের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রিয় অভিনেত্রীকে গান গাইবার কিছু সুযোগ দেওয়া। কোন নপুংসককে স্বর কাঁপিয়ে সীজার বা ক্যাটোর গুরুগম্ভীর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখে অথবা মঞ্চের ওপরে হাত-পা ছুঁড়ে নাচানাচি করতে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যে মারা যেতে চায় সে মারা যাক; আমার কথা যদি ধরেন তাহলে বলতে পারি

যে তুচ্ছ আনন্দ আধুনিক ইতালীর গৌরব বলে ঘোষিত হচ্ছে, আর যে অপেরাতে যাওয়ার জন্যে মানুষ হইচই করে চড়া দামে টিকিট কাটছে—সে আনন্দ অনেক দিনই আমি পরিত্যাগ করেছি।

সিনেটরের এই সব অভিব্যক্তির প্রতিবাদ করলো কাঁদিদ; কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র আর রুচিসম্মতভাবে। আর মার্টিন বৃদ্ধ সিনেটরের সঙ্গে একমত হলেন।

ডিনার দেওয়া হতেই সবাই টেবিলে গিয়ে বসলো; তারপরে, পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা সবাই লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হলো। হোমারের বইটি বেশ দামী চামড়ায় বাঁধাই করা হয়েছে দেখে, সিনেটরের উন্নত রুচির খুবই প্রশংসা করলো কাঁদিদ।

সে বললো—জার্মানীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্যানগ্লসের কাছে এই বইটি একদিন সত্যিই সুখকর ছিল।

সিনেটর বেশ নিরুত্তাপের সঙ্গেই বললেন—হোমার আমার প্রিয় কবি নন। তাঁকে পড়ে আমি আনন্দ পাচ্ছি এই কথাটা একদিন আমাকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গ্রন্থটিতে যে অজস্র যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে সেগুলি সবই একই ধরনের। তাঁর দেবতারা কিছু না করেই সব সময় ছোটাছুটি করছে। এই সব যুদ্ধের মূল কারণ হচ্ছে তাঁর হেলেন; এই সুবিস্তৃত গ্রন্থখানির মধ্যে তার কোন ভূমিকা নেই বললেই হয়। তাঁর ট্রয় অত দিন অবরুদ্ধ হয়ে রইলো; কিন্তু প্রতিপক্ষ তাকে অধিকার করতে পারলো না। মোট কথা, এই সব অসঙ্গতির জন্যই গ্রন্থটি আমার কাছে খুবই জলো বলে মনে হয়। এই গ্রন্থখানি পড়ে আমার মত তাঁরাও বিরক্ত হয়েছেন কিনা সেকথা কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি; যাঁরা সত্যভাষী তাঁরা আমাকে নিশ্চিন্ত করেছেন যে এই গ্রন্থটি পড়তে-পড়তে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন। তবু প্রাচীন যুগের একটি সাহিত্যিক মনুমেণ্ট হিসাবে বইটিকে তাঁরা নিজেদের লাইব্রেরীতে স্থান দিয়েছেন; অথবা যাকে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে না এই রকম মরচে-ধরা মেডেলকে মানুষ যে রকমভাবে তাকের ওপরে তুলে রাখে, হোমারকেও তারা সেই রকম ভাবে তুলে রাখে।

কাঁদিদ বললো—ভার্জিলের সম্বন্ধেও আপনার ঠিক এই রকম ধারণা নয়।

সিনেটর বললেন—অবশ্য আমি স্বীকার করছি যে ইনিডের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, আর ষষ্ঠ সর্গগুলি সত্যিই খুব উন্নত মানের। তবে সাধু ইনিস, তাঁর শক্তিমান সহচর ক্লোনথাস, তাঁর বন্ধু অ্যাকেটিস, এবং বালক অ্যাসকানিয়াস, তাঁর মূর্খ রাজা ল্যাটিমাস, আমাতা, আর তাঁর নীরস ল্যাভিনিয়া—আমার ধারণা এদের মত দুর্বল চরিত্র আর কোথাও আমি দেখি নি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ট্যাসোর স্থান আমার কাছে এঁদের সকলের ওপরে, এমন কি, গল্পে অ্যারিয়োস্টোর চেয়েও।

কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো—হোরেস পড়ে আপনি গভীর আনন্দ পান কি না

আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

সিনেটর বললেন—এই লেখকের রচনায় নীতিবাক্য রয়েছে। সেই সব নীতি অনুসরণ করে পার্থিব মানুষেরা অনেক লাভবান হতে পারে। কিন্তু নীতি বচনের চেয়েও মানুষের স্মৃতিতে যা সহজেই বিধৃত হয়ে থাকে তা হচ্ছে ওঁর কবিতায় ছোট ছোট অথচ শক্তিশালী ছন্দ, কিন্তু তাঁর ব্রানডিসিয়াম যাত্রায় এবং নিম্নস্তরের ডিনারের পরিকল্পনায় আমি কোন অদ্ভুত চমক দেখি নে, কিংবা তাঁর একটি রুপিলিয়াসের সঙ্গে আর একটি রুপিলিয়াসের মধ্যে যে নোংরা আর নিম্নস্তরের ঝগড়া বাঁধানো হয়েছে তার মধ্যেও আমি কোন চমক দেখতে পাই নে। একজনের কথাবার্তা যেমন বিষাক্ত আর একজনের তেমনি ভিনিগার মাখানো। বৃদ্ধা মহিলা আর ডাইনীদের বিরুদ্ধে তিনি যে কুরুচিপূর্ণ কবিতা লিখেছেন সেগুলি পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমি বিরক্ত হয়েছি; অথবা তিনি যে তাঁর বন্ধু মেইসিনাসকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেন তাহলে তাঁর মাথা আকাশের মধ্যে উঠে যাবে—এই কথার মধ্যেও আমি কোন গৌরব দেখতে পাচ্ছি নে। যারা অজ্ঞ পাঠক তারা নামকরা লেখকের আবর্জনা স্তূপকেও প্রশংসা করে থাকে। নিজেকে খুশি করার জন্যেই আমি পড়ি, আমার উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয় না এমন কোন বই-ই আমি পড়ি নে।

কাঁদিদ মানুষ হয়েছিল পরস্মৈপদী হিসাবে; অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রেই নিজের বিচার-বিবেচনা সে খাটাতে পারতো না, তাই সিনেটরের কথা শুনে সে রীতিমত আশ্চর্যই হলো, কিন্তু মার্টিন স্বীকার করলেন সিনেটরের যুক্তিতে যথেষ্ট জোর রয়েছে।

কাঁদিদ বললো—ওঃ! এই তো সিসারো। এই বিরাট পণ্ডিতের লেখা পড়ে নিশ্চয় আপনি হতাশ হন নি ?

সিনেটর বললেন—আসল কথাটা কি জানেন? সিসারোকে আমি আদৌ পড়ি নে। র‍্যাবিরিয়াসদের জন্যে তিনি ওকালতি করছেন, না, ক্লুয়েনটিয়াসদের জন্যে তিনি সাফাই গাইছেন তা জেনে আমার কী হবে? আমি নিজেই তো এই সব মামলা করি। এক সময়, তাঁর দার্শনিক লেখাগুলি পড়তে আমার ভাল লাগতো; কিন্তু যখন আমি দেখলাম সব কিছুতেই তিনি সন্দেহ করছেন তখন আমার মনে হয়েছিলো তাঁর মত জ্ঞান আমারও রয়েছে; সুতরাং অজ্ঞতা শেখার জন্যে আমার কোন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হয় নি।

মার্টিন বললেন—এইত দেখছি, অ্যাকাডেমী অফ সায়েন্সের আশীটা খণ্ড আপনার এখানে রয়েছে। এদের মধ্যে নিশ্চয় কোন মূল্যবান জিনিস রয়েছে!

সিনেটর বললেন—তা বটে; এই রাবিশগুলিকে যারা গ্রন্থাকারে সাজিয়েছে তারা যদি আলপিন তৈরি করার বিদ্যেটা আবিষ্কার করতে পারতো! কিন্তু

এই খণ্ডগুলিতে যা আছে সবই উদ্ভট; মানুষের সত্যিকার উপকার হয় এমন একটাও কিছু নেই।

কাঁদিদ বললো—ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, ফরাসী ভাষায় লেখা অজস্র নাটক দেখছি এখানে।

সিনেটার বললেন—হ্যাঁ; হাজার তিনেক; তবে তিন ডজনের বেশী পড়ার মত নেই। আর ওই যে সব মোটা মোটা ধর্মগ্রন্থ আর উপদেশ গাথা দেখছেন ওদের সব জড়িয়ে যা দাম হবে তার চেয়ে সেনেকার এক পাতার দাম অনেক বেশী। ওগুলি যে আমি অথবা অন্য কেউ পড়ে না আশা করি সেকথা আপনারা বিশ্বাস করবেন।

কয়েকটি তাক ইংরিজী গ্রন্থে ভর্তি ছিল। মার্টিন সেগুলি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন—আশা করি আপনার মত একজন রিপাবলিক্যান এই সব গ্রন্থ পড়ে খুশিই হবেন; কারণ এইগুলি স্বাধীনতার মহৎ আবেগে রচিত।

সিনেটর বললেন—দেখুন, আমরা যা ভাবি তাই যদি লিখতে পারি তাহলে সেইটিই হবে মহৎ। মনুষ্যত্বের এই তো সুযোগ, সারা ইতালীতে আমরা যা ভাবি না, চিন্তা করি না সেইগুলিই লিখে যাই। আর সীজার আর আন্তনিয়াসদের বংশধরেরা ডোমিনিকান পাদরীদের অনুমোদন ছাড়া একটা কথাও চিন্তা করতে পারে না। ইংরেজ জাতির ভাবাবেগে অভিভূত হওয়াটা উচিত হলে সেটা দলবিশেষের উচ্ছ্বাস আর আবেগের সুফলকে একেবারে নষ্ট করে দেবে না?

মিলটনের একখানি গ্রন্থ দেখে কাঁদিদ জিজ্ঞাসা করলো মিলটনকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষের পর্যায়ে ফেলেন কি না।

সিনেটর তীক্ষ্ণ ভাবেই বললেন—কে? ওই অসংস্কৃত কবি যিনি ছ্যাকড়া গাড়ীর ছন্দে দশটি সর্গে জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের একটি বিরক্তিকর ভাষ্য রচনা করেছেন? গ্রীকদের সেই অপটু পুচ্ছগ্রাহক? সৃষ্টির পরিকল্পনা করার জন্যে স্বর্গের অস্ত্রাগার থেকে এক জোড়া কম্পাস মেসাইয়ার হাতে তুলে দিয়ে সৃষ্টিকে তিনি বিকৃত করেছেন। কিন্তু মোসেসের ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন একটি নির্দেশে। যিনি ট্যাসোর নরক আর শয়তানকে বিক্রীত করেছেন, আপনার কি ধারণা, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি? যিনি লুসিফারকে একবার করেছেন ব্যাঙ, আর একবার করেছেন বামন—তাঁকে শ্রদ্ধা করবো আমি? যিনি লুসিফারের মুখ দিয়ে একই কথা বারবার বলিয়েছেন, যিনি তাকে কচিকচি শিশুদের পাদরীতে পরিবর্তন করেছেন তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করবো? যিনি অ্যারিয়োস্টোর আগ্নেয়াস্ত্রের হাস্যকর উদ্ভাবনের অসম্ভাব্য গম্ভীর অনুকরণ করে স্বর্গে দেবদূত আর শয়তানদের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ বাঁধিয়েছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? এই সব বিষণ্ণ দিবাস্বপ্নে আনন্দ আমিও পাইনে, অন্য কোন ইতালীর মানুষও পায় না। কিন্তু যে মানুষের 'রুচিজ্ঞান একেবারে

নষ্ট হয়নি সেই মানুষ পাপ আর মৃত্যুর বিবাহ, আর মৃত্যুর গর্ভ থেকে সাপের জন্মকে খুবই বিতৃষ্ণার চোখে দেখবে। তাঁর কুষ্ঠ রোগগ্রস্তদের আশ্রমের বর্ণনা হচ্ছে কবরখনকেরই একমাত্র যোগ্য স্থান। এই অদ্ভুত, অসংস্কৃত এবং অরুচিকর কবিতাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো তখন সবাই তাকে অগ্রাহ্য করেছিলো, কবিকে তাঁর সমকালীন কবিরা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন এখন আমি তাঁকে ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করছি।

এই বক্তৃতা শুনে কাঁদিদ স্পষ্টতই মর্মাহত হলো; হোমার আর মিলটনের ওপরে খুবই শ্রদ্ধা ছিল তার।

সে মার্টিনকে আস্তে আস্তে বললো—হায়রে! ভয় হচ্ছে আমাদের জার্মান কবিদেরও ইনি ঘৃণার চোখে দেখেন।

মার্টিন বললেন—তাতে বিরাট রকমের কোন ক্ষতি হবে না।

কাঁদিদ তবুও নিজের মনে মনে বললো—কী আশ্চর্য মানুষ! এই মানুষটির প্রতিভা কী ভয়ানক! কোন কিছুতেই ভদ্রলোক সন্তুষ্ট নন?

লাইব্রেরী দেখা শেষ করে তাঁরা গেলেন বাগানে; কাঁদিদ বাগানটির প্রশংসা করলে সিনেটর বললেন—একী একটা বাগান। সব ছেলেমানুষী, সব ছেলেমানুষী! কালকেই আমি আরও একটা পরিকল্পনা করবো।

আমাদের দুজন পর্যটক সিনেটরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসা মাত্র কাঁদিদ বললো—এই মানুষটি যে সব চেয়ে সুখী আশা করি এখন তা আপনি স্বীকার করছেন। নিজের সম্পত্তির ওপরেও তাঁর কোন মোহ নেই।

মার্টিন বললেন—কিন্তু উনি যে নিজের সম্পদকে তেমনি অপছন্দ করেন তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? অনেক আগে প্লেটো একবার বলেছিলেন যারা বিচার না করেই সব রকম খাবার খাওয়া পরিত্যাগ করে তাদের পাকস্থলী মোটেই উঁচুদরের নয়।

কাঁদিদ বললো—সত্য। কিন্তু তবু প্রত্যেক জিনিসের মধ্যে খুঁৎ বার করার মধ্যে একটা আনন্দ রয়েছে; অনেকে যেখানে আনন্দ পায় সেখানে দোষ ধরার মধ্যে আমোদ আছে।

মার্টিন বললেন—আনন্দ না পাওয়ার মধ্যেই আনন্দ আছে।

কাঁদিদ বললো—মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমিই সুখী হবো—যখন অবশ্য কুঁনিগুঁকে আমার কাছে পাব।

মার্টিন বললেন—এই রকম আশা করাটা ভালোই।

ইতিমধ্যে দিন কেটে গেলো, কেটে গেলো সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ক্যাকাম্বোর কোন সংবাদ নেই। প্যাকিটি অথবা পাদরী অত টাকা পেয়েও কৃতজ্ঞতা দেখানোর জন্যে একবারও তার কাছে আসে নি। কিন্তু কাঁদিদ দুঃখে এত মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো যে তাদের অকৃতজ্ঞতার কথা ভাবার সময়ও সে পেলো না।

পরিচ্ছেদ—২৬

ছ'টি অপরিচিত লোকের সঙ্গে তারা নৈশ ভোজন করলো। তারা কে?

কাঁদিদ যে সরাইখানাতে ছিল সেখানে আরও কয়েক জন বিদেশী ভদ্রলোক থাকতেন। একদিন অনুচর মার্টিনের সঙ্গে কাঁদিদ নৈশভোজে বসেছিল। সঙ্গে ছিল তার সেই বিদেশী ভদ্রলোকেরা। এমন সময় একটা লোক তার পেছনে এসে দাঁড়ালো। লোকটার মুখ ঝুলের মত কালো। লোকটা কাঁদিদের হাত ধরে বলল—আমাদের সঙ্গে প্রস্তুত হোন; পিছিয়ে আসবেন না যেন।

সে ঘুরেই যাকে দেখতে পেলো সে হচ্ছে ক্যাকাম্বো। এক কুঁনিগুঁ ছাড়া অন্য কাউকে দেখলে সে এত আনন্দ পেতো না, আশ্চর্য ও হতো না এত। আনন্দে সে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলো। প্রিয় বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞাসা করলো: 'কুঁনিগুঁ'-ও নিশ্চয় এখানে আছে? কোথায়, সে কোথায়? আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চল। তার সামনেই আনন্দে আমি মারা যাবো।

ক্যাকাম্বো বললো—কুঁনিগুঁ এখানে নেই। আছে কনস্ট্যানটিনোপলে।

হায় ভগবান! কনস্ট্যানটিনোপলে! কিন্তু চীনদেশে থাকলেও কিছু আসে যায় না। সেখানেই আমি যেতাম। চল; আমরা এগিয়ে যাই।

ক্যাকাম্বো বললো—খাওয়া-দাওয়া সেরেই আমরা যাবো। বর্তমানে আর কিছু আপনাকে বলার জন্যে আমি এখানে অপেক্ষা করবো না। এখন আমি অপরের ক্রীতদাস। আমার প্রভু আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে এবার চলে যেতে হবে; খাওয়ার টেবিলের পাশে প্রভুর জন্যে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কিন্তু একটা কথাও কাউকে বলবেন না। শুধু খাওয়া-দাওয়া সেরে বিদেশ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হোন।

আনন্দ আর দুঃখ—এ দুটি ভাবাবেগে কাঁদিদের হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলো। বিশ্বাসী অনুচরকে আবার ফিরে পেয়ে সে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো। সে যে অপরের ক্রীতদাস এই সংবাদ শুনে বিস্মিত হলো সে। তার বুক দুর দুর করতে লাগলো; তার চিন্তাধারা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেলো; কিন্তু প্রিয়তমাকে সে যে উদ্ধার করতে পারবে সেদিকে কোনরকম সন্দেহ তার ছিল না। এই সব আশা আর নিরাশায় আন্দোলিত হয়ে সে খেতে বসলো। তার সঙ্গে ছিলেন মার্টিন; সব জিনিসটাই তিনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন ছ'জন বিদেশী। ভেনিসে তাঁরা এসেছিলেন কার্নিভ্যাল দেখতে।

এই সব অপরিচিত বিদেশীদের একজনের পাশে ক্যাকাম্বো দাঁড়িয়েছিল। ভোজ শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সে তার মনিবের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস করে তাঁর কানে কানে বললো—মহারাজ, জাহাজ তৈরি। আপনার ইচ্ছে

হলেই তার ওপরে গিয়ে চড়তে পারেন।

এই কথা বলে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। ক্যাকাম্বোর কথা শুনে, অতিথিরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু কেউ কোন কথা বললেন না। এমন সময় আর একটি চাকর তার মনিবের কাছে এসে বলল—মহারাজের অশ্বযান পাডুয়াতে তৈরি হয়ে রয়েছে। জাহাজ-ও তৈরি।

তার মনিব একটা ইঙ্গিত করতেই সে সরে গেলো। সবাই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য ভাবটা আরও বেড়ে উঠলো সকলের। উপস্থিত হলো তৃতীয় ভৃত্য। সে তার মনিবের কাছে গিয়ে বললো—মহারাজ, আমার কথা যদি শোনেন, তাহলে, এখানে আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। আমি গিয়ে সব কিছু ব্যবস্থা করে রাখছি।

এই বলেই সে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।

কাঁদিদ আর মার্টিন ভাবলো এগুলি বোধ হয় কার্নিভ্যালের আমোদ। আর এরাই হচ্ছে সেই অভিনয়ের অভিনেতা। তারপরে এগিয়ে এলো চতুর্থ ভৃত্য। সে চতুর্থ বিদেশীটির কাছে গিয়ে বললো—যখনই ইচ্ছে হবে, মহারাজ যাত্রা করতে পারেন।

এই বলে অন্য চাকরগুলির মত সেও ঝটিতি স্থানত্যাগ করলো।

এগিয়ে এলো পঞ্চম ভৃত্য। সে তার মনিবকে একই কথা বললো। কিন্তু ছ'নম্বর ভৃত্যটি তার প্রভুর কাছে অন্য কথা বললো, প্রভুটি বসেছিলেন কাঁদিদের পাশে।

'সত্যি বলছি, ওরা মহারাজকেও আর বিশ্বাস করে না; আমাকেও করে না। আমাদের দুজনকেই ওরা আজ জেলে পাঠাতে পারে। সুতরাং, আমার ব্যবস্থা আমি করছি। বিদায়।'

চাকররা সব চলে গেলো, কাঁদিদ আর মার্টিনের সঙ্গে সবাই গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। অবশেষে সেই নিস্তব্ধতা ভাঙলো কাঁদিদ: ভদ্রমহোদয়গণ, সত্যি বলছি, এটা হচ্ছে একটা অদ্ভুত রসিকতা। আপনারা সব রাজা হলেন কেমন করে? আমার কথা যদি ধরেন তাহলে, বলতে পারি আমার বা আমার বন্ধুর শরীরে রাজবংশের এক ফোঁটাও রক্ত নেই।

বেশ গম্ভীরভাবেই, ক্যাকাম্বোর প্রভু ইতালীয় ভাষায় বললেন: আমি মোটেই রসিকতা করছি নে। আমার নাম হচ্ছে অ্যাকমেট থ্রী। অনেক বছর ধরে আমি ছিলাম গ্র্যাণ্ড সুলতান। আমার ভাইকে আমি সিংহাসনচ্যুত করেছিলাম। আমাকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলো আমার ভাইপো। আমার মন্ত্রীদের গর্দান গেলো; আমাকে নির্বাসিত করা হলো প্রাচীন সিরাগলিয়ো জেলে। মাঝে-মাঝে স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্যে আমার ভাইপো, গ্র্যাণ্ড সুলতান মামুদ আমাকে বিদেশভ্রমণে যেতে অনুমতি দেন। আর সেই জন্যেই কার্নিভ্যাল দেখার উদ্দেশ্যে আমি ভেনিসে এসেছি।

অ্যাকমেটের পাশে যে যুবকটি বসেছিলেন তিনি বললেন তাঁর পরে—

'আমার নাম হচ্ছে ইভান। এক সময় সমস্ত রাশিয়ার আমি সম্রাট ছিলাম ; কিন্তু খুব শৈশবেই আমি সিংহাসনচ্যুত হই। আমার বাবা মাকে বন্দী করা হয়। জেলখানাতেই আমি মানুষ হয়েছি। তবুও, মাঝে-মাঝে বিদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ আমি পাই। অবশ্য আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে সব সময়েই আমার সঙ্গে লোকজন থাকে। কার্নিভ্যাল দেখার জন্যে ভেনিসে আমি এসেছি।

তৃতীয়টি বললেন—

'আমার নাম চালস এডওয়ার্ড। আমি হচ্ছি ইংলণ্ডের রাজা। আমার পক্ষে আমার বাবা সিংহাসন পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার অধিকার রক্ষা করার জন্যে আমি যুদ্ধ করেছি। আমার আটশ' অনুচরের বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা কেটে বার করে তাদের চোখের ওপরেই শত্রুরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আমি নিজে বন্দী অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছি। আমার সম্রাট পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি রোমে যাচ্ছি। আমি, আর আমার ঠাকুর্দার মতই আমার বাবাও সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। আমি এসেছি ভেনিসে কার্নিভ্যাল দেখতে।

চতুর্থটি বললেন—

'আমি হচ্ছি পোল্যাণ্ডের রাজা। যুদ্ধের ফলে, আমার পৈত্রিক সাম্রাজ্য আমি হারিয়েছি। আমার বাবাও একইভাবে দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েন ; সুলতান অ্যাকমেট, সম্রাট ইভান এবং রাজা চার্লস এডওয়ার্ডের মতই ভাগ্যের হাতে নিজেকে আমি সমর্পণ করেছি। ঈশ্বর তাঁদের দীর্ঘজীবি করুন। আমি ভেনিসে এসেছি কার্নিভ্যাল দেখতে।

পঞ্চমটি বললেন—

'আমিও পোল্যাণ্ডের রাজা। আমি রাজ্য হারিয়েছি দু'বার। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে নতুন সাম্রাজ্য দিয়েছেন। ভিসটুলা নদীর ধারে সমস্ত সারম্যাটিয়েন রাজারা যত ভাল কাজ করতে পেরেছেন, তার চেয়ে আমার সেই সাম্রাজ্যে অনেক ভাল কাজ আমি করেছি। ওঁদের মত আমিও নিজেকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। কার্নিভ্যাল দেখতে আমি এসেছি ভেনিসে।

এবার ষষ্ঠ রাজার বলার সুযোগ হলো। তিনি বললেন : ভদ্রমহোদয়গণ, কথাটা সত্যি যে আপনাদের মত বড় রাজা আমি নই। তবে আমি যে একজন মুকুটধারী সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার নাম থিয়োডোর। আমি হচ্ছি কর্সিকার নির্বাচিত রাজা। আমার খেতাব হচ্ছে ম্যাজেস্টি—মহারাজাধিরাজ। অথচ, এখন আমাকে কেউ সামান্য ভদ্রতাটুকুও দেখায় না। মুদ্রার ওপরে আমি আমার নাম খোদাই করিয়েছি ; কিন্তু এখন আমি নিজে কপর্দকশূন্য। আমার দুজন পররাজ্যমন্ত্রী ছিলেন অথচ, এখন আমার একটাও

চাকর নেই। এক সময় আমি বসে থাকতাম সিংহাসনে। এখন সেই সিংহাসন লণ্ডনের একটা সাধারণ কয়েদখানায় ঘাসের ওপরে পাতা রয়েছে। আমি ভেনিসে এসেছি কার্নিভ্যাল দেখতে। আমার ভয় হচ্ছে, আমাকেও এখানে হয়ত জেলেই পচতে হবে।

অন্য পাঁচটি রাজা তাঁর কথাগুলি খুবই মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। এই কাহিনী শুনে তাঁদের মনে করুণার উদ্রেক হলো, তাঁদের প্রত্যেকেই জামা কাপড় কেনার জন্যে সেই কপর্দকশূন্য মহারাজকে কুড়িটি সিকুইম উপহার দিলেন। কাঁদিদ তাঁকে দিলেন একটি হীরে। তার দাম হচ্ছে এই পাঁচটি রাজার উপহারের একশগুণ।

পাঁচজন রাজা বললেন—এই অতি সাধারণ মানুষটি কে? ওর তো দেখছি অনেক অর্থ রয়েছে; আর ও যা দিল তা আমাদের যে কোন রাজার চেয়ে একশ' গুণ বেশী। স্যার, আপনিও কি একজন রাজা?

না, ভদ্রমহোদয়গণ, রাজা হওয়ার আমার কোন বাসনা নেই।

তাঁরা টেবিল ছেড়ে উঠতে যাবেন এমন সময় চারজন মহামান্য ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন, যুদ্ধে তাঁদের সাম্রাজ্যও অপহৃত হয়েছে। তাঁরা এসেছেন ভেনিসে যে কার্ণিভ্যাল চলছিল তারই শেষ অংশটি দেখতে। কাঁদিদ তাঁদের গ্রাহ্য করলো না, কারণ সে তখন কনস্টানটিনোপল-এ যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো, সেখানে সে যাবে প্রিয়তমা কুঁনিগুঁর উদ্দেশ্যে।

পরিচ্ছেদ—২৭

কাঁদিদের কনস্টানটিনোপল যাত্রা

সুলতান অ্যাকমেটকে কনস্টানটিনোপলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, বিশ্বস্ত ক্যাকাম্বো তুর্কী জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিলো। সেই জাহাজে সে কাঁদিদ আর মার্টিনকেও তুলে নিলো। সেই দুঃস্থ হাইনেসের কাছ থেকে সসম্ভ্রমে বিদায় নিয়ে তারাও তাই জাহাজে উঠে এলো, জাহাজে ওঠার সময়, কাঁদিদ মার্টিনকে বললো:

'আপনি দেখলেন, ছ'টি সিংহাসনচ্যুত রাজার সঙ্গে আমরা নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করলাম; এবং, তাঁদের একজনকে কিছু অর্থও আমি দিলাম। আমার ধারণা, এমন আরও অনেক রাজকুমার রয়েছেন যাঁরা ওঁদের চেয়েও বেশী দুর্ভাগা। আমার কথা যদি ধরেন, তাহলে, বলতে পারি, আমি হারিয়েছি একশটা মেষ। কিন্তু আমি যাচ্ছি কুঁনিগুঁর বাহুর মধ্যে নিজেকে ধরা দিতে। প্রিয় মার্টিন, আমি আবার বলছি, প্যানগ্লসই ঠিক কথা বলেছিলেন, বিশ্বে যা কিছু ঘটে সবই ভালোর জন্য।

মার্টিন বললেন—আশা করি, তাই হোক।

কিন্তু ভেনিসে আমাদের অপ্রত্যাশিত একটি অভিজ্ঞতা হলো। এ রকম ঘটনা আগে কারও জীবনে ঘটেছে একথা আমার মনে হয় না। একটা সাধারণ সরাইখানায় ছ'টি সিংহাসনচ্যুত রাজকুমারদের সঙ্গে আমরা এক টেবিলে বসে খেয়েছি—এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা ছাড়া আর কী হতে পারে?

মার্টিন বললেন—আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটেছে যেগুলির চেয়ে এগুলি মোটেই বিস্ময়কর নয়। সিংহাসনচ্যুত হওয়া রাজাদের কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। আর তাঁদের সঙ্গে নৈশভোজে আমাদের যোগ দেওয়ার কথা যদি বলেন তাহলে, সেটা নেহাৎ একটা আকস্মিক ব্যাপার। ওর মধ্যে নিজেদের সম্মানিত বোধ করার মত কিছু নেই। পকেটে রেস্ত থাকলে কে কার সঙ্গে বসে খেলো তাতে কী যায় আসে?

জাহাজের ওপরে উঠেই সে দৌড়ে গেলো তার পুরানো ভৃত্য তথা বন্ধু ক্যাকাম্বোর কাছে। দুহাতে তাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে। জিজ্ঞাসা করল—এখন কুঁনিগুঁর সংবাদ কী? সে কি এখনও আমাকে ভালবাসে? সে কি এখনও সেই অপরূপ সুন্দরী রয়েছে? কেমন আছে সে? তুমি নিশ্চয় তার জন্যে কনস্টানটিনোপল-এ একটা প্রাসাদ কিনেছ?

ক্যাকাম্বো বললো—প্রিয় প্রভু, কুঁনিগুঁ বর্তমানে প্রোপনটিসের ধারে একটি কপর্দকশূন্য রাজকুমারের বাড়িতে খাবার থালা মাজছে। র‍্যাগোটস্কী নামে একটি প্রাচীন রাজবংশে সে এখন বন্দিনী হয়ে রয়েছে। নির্বাসনে সংসার চালানোর জন্যে গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রতিদিন তাঁকে তিনটি ক্রাউন দেন। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে কুঁনিগুঁর সৌন্দর্য বলে আর কিছু নেই। সে একেবারে কদাকার হয়ে গিয়েছে; যাকে বলে, কিম্ভূতকিমাকার।

কাঁদিদ বললো—সুন্দরী হোক, আর কদাকারই হোক, আমি এক কথার মানুষ। আর সেই জন্যে, তাকে ভালবাসতে আমি বাধ্য। কিন্তু তার এই দুরবস্থা হলো কেমন করে? তোমার হাতে তাকে আমি পাঁচ থেকে ছ'মিলিয়ন টাকা পাঠিয়েছিলাম।

ক্যাকাম্বো বললো—হায়, হায়! এ কী বলছেন! সেনর ডন ফারনানদো দ' ইবারা ওয়াই ফিগুয়েরো ওয়াই মাসকারেনাস ওয়াই ল্যামপোরদস ওয়াই সুজা, অর্থাৎ বুয়েনাস আয়ার্সের রাজ্যপালকে দু'মিলিয়ন টাকা দেওয়ার কথা আমার ছিল না? দেওয়ার কথা ছিল মিস কুঁনিগুঁর মুক্তিপণ হিসাবে, তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যে। তার পরে বাকি যা ছিল সে সব আমাদের কাছ থেকে একজন বীর জলদস্যু কেড়ে নেয় নি? তারপরে সেই জলদস্যু আমাদের সঙ্গে নিয়ে মাতাপান অন্তরীপে নিয়ে যায়নি? সেখান থেকে সে আমাদের মিলোতে, মিলো থেকে নিকারিয়ায়, সেখান থেকে স্যামোসে, স্যামোস থেকে

পেট্রায়, সেখান থেকে দারদানেসিলে, তারপরে মারমোরা, সেখান থেকে স্কুটারিতে নিয়ে যায় নি? যে রাজকুমারের কথা আমি আপনাকে বললাম কুঁনিগুঁ এবং বৃদ্ধাটি এখন তাঁরই ওখানে চাকরাণীর কাজ করছে। আর আমি হয়েছি সিংহাসনচ্যুত সুলতানের ক্রীতদাস।

উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—আরে বাস! বিপদ, বিপদ আর বিপদ। মরুক গে যাক। এখনও কিছু হীরে আমার রয়েছে। তাই দিয়ে সহজেই আমি কুঁনিগুঁকে ছাড়িয়ে আনতে পারবো। খুবই দুঃখের কথা, সে কুৎসিৎ হয়ে গিয়েছে।

তারপরে মার্টিনের দিকে ঘুরে সে বললো—বন্ধু, তুমি কী বল? কে সব চেয়ে কৃপার্হ—সম্রাট অ্যাকমেট, সম্রাট ইভান, রাজা চার্লস এডওয়ার্ড, না, আমি?

মার্টিন বললেন—তোমাদের সকলের অবস্থায় না পড়লে আমার পক্ষে এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

কাঁদিদ কেঁদে ফেলে বললো—হায়রে, প্যানগ্লস আজ এখানে থাকলে, এ সব কথাই তিনি জানতেন, এবং আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারতেন।

মার্টিন বললেন—তোমার প্যানগ্লস কোন্ দাড়িপাল্লায় মনুষ্য জাতির দুর্ভাগ্যকে ওজন করে তাদের দুঃখের প্রকৃত পরিমাপ করতে পারতেন ত আমি জানি নে। আমি কেবল এইটুকু জানি যে পৃথিবীতে এমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের দুঃখ আর কষ্ট তোমাদের ওই রাজা চার্লস্ এডওয়ার্ড, সম্রাট ইভান অথবা সুলতান অ্যাকমেটের দুঃখের চেয়ে শতগুণ বেশী।

কাঁদিদ বললো—তা অবশ্য হতে পারে।

কয়েক দিনের ভেতরে তারা বসফোরাসে পৌছলো। তারপরেই, ক্যাকাম্বোর মুক্তির জন্যে কাঁদিদকে অনেক টাকা দিতে হলো। তারপরে, কোন সময় নষ্ট না করেই ক্যাকাম্বোকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে একটা নৌকোয় চেপে প্রপোনটিসের তীরের দিকে সে এগিয়ে গেলো কুঁনিগুঁকে খুঁজতে,—যদিও কুঁনিগুঁর চেহারা কদাকার হয়ে গিয়েছিলো তবু তার কথার খেলাপ হলো না।

নৌকো যারা বাইছিলো তাদের মধ্যে দুজন ছিল ক্রীতদাস। তারা নৌকো বাইতে পারছিলো না; আর তাদের পিঠের উপরে নৌকোর ক্যাপটেন গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি ছড়িটা সপাং সপাং করে প্রায়ই বসিয়ে দিচ্ছিলো। স্বভাবজাত করুণার জন্যেই কাঁদিদ অন্য মাঝিদের চেয়ে তাদের দিকেই একটু বেশী তাকিয়ে দেখছিলো। তারপরে, সে আর্তহৃদয়ে তাদের দিকে একটু এগিয়ে গেলো। ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও, তাদের দেহের সঙ্গে প্যানগ্লস আর মিস কুঁনিগুঁর ভাই হতভাগ্য ব্যারনের দেহের খুবই সাদৃশ্য ছিল। এই রকম একটা ধারণা হতেই দুঃখ আর অনুকম্পায় তার হৃদয়টা মুচড়ে উঠলো। সে তাদের দিকে আরও একটু ভালোভাবে তাকিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো।

সে মার্টিনের দিকে ঘুরে বললো—সত্যি বলছি, আমার গুরু প্যানগ্লসকে

মোটামুটিভাবে ফাঁসিতে ঝুলতে আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমি নিজেই যদি ব্যারনের দেহের ভেতরে আমার তরোয়ালটি ঢুকিয়ে না দিতাম তাহলে ওই দুটি মাঝি যে তারাই সেকথা আমি অবিশ্বাস করতে পারতাম না।

কাঁদিদের মুখ থেকে ব্যারন আর প্যানগ্লস কথা দুটি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই দু'জন চিৎকার করে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিল, তারপরে, ছেড়ে দিল দাঁড়গুলি। এই দেখে ক্যাপটেন তাদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বেদম পেটাতে লাগলো তাদের।

চিৎকার করে উঠলো কাঁদিদ—থামো, থামো। এ দু'জনের জন্যে তুমি যা চাও তাই আমি দেবো।

তাদের মধ্যে একজন বললো—ঈশ্বর! ঈশ্বর! এ তো কাঁদিদ!

আর একজন বললো—কাঁদিদ!

কাঁদিদ বললো—আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না, জেগে রয়েছি? আমি কি সত্যিই এই নৌকোতে চড়ে যাচ্ছি? এই কি আমার সেই ব্যারন? ওঁকেই কি আমি হত্যা করেছি? আর উনিই কি আমার সেই গুরু প্যানগ্লস? ওঁকেই আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলতে দেখেছি?

তারা দুজনেই চিৎকার করে উঠলো—সেই আমি! সেই আমি!

মার্টিন জিজ্ঞাসা করলেন—কী বললেন! এই মানুষটিই তোমার সেই বিখ্যাত দার্শনিক?

নৌকোর সেই ক্যাপটেনটিকে কাঁদিদ বললো—প্রিয় মশাই, ইনি হচ্ছেন থানডার-টেন-ট্রনকের ব্যারন; অর্থাৎ জার্মান সাম্রাজ্যের প্রথম ব্যারন। আর ইনি হচ্ছেন মিঃ প্যানগ্লস, জার্মানীতে এত বড় পণ্ডিত দার্শনিক আর নেই। এঁদের মুক্তিপণ হিসাবে কত টাকা আপনি চান?

তুর্কী ক্যাপটেন বললো—বটে রে খ্রীশ্চান কুকুর! এ দুটো কুত্তা খ্রীশ্চান ক্রীতদাসের মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যারন, আর একটা হচ্ছে দার্শনিক। নিজেদের দেশে নিশ্চয় এরা খুবই প্রতিপত্তিশালী মানুষ। সুতরাং এদের মুক্তিপণ হিসাবে তোমাকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দিতে হবে।

সে বললো—স্যার, আপনি তাই পাবেন, কনস্টানটিনোপলে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি, মানে, খুব—খুব তাড়াতাড়ি—পৌছিয়ে দিন, সেখানে পৌছে দেওয়া মাত্র ওই পরিমাণ মুদ্রা আপনি পেয়ে যাবেন, না, না! আগে আমাকে আপনি মিস কুঁনিগুঁর কাছে নিয়ে চলুন।

কাঁদিদের প্রথম প্রস্তাবে খুশি হয়ে ক্যাপটেন নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিল, তারপর মাঝিদের এত জোরে দাঁড় ফেলার নির্দেশ দিল যে নৌকোটা পাখির চেয়েও জোরে গতিতে জলের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগলো।

ব্যারন আর প্যানগ্লসকে আলিঙ্গন করে আর আশা মেটে না কাঁদিদের।

তাহলে প্রিয় ব্যারন, আমি তোমাকে খুন করি নি, কেমন? আর প্রিয় প্যানগ্লস, ফাঁসির পরেও তুমি বেঁচে উঠেছো, তাই না? কিন্তু এই তুর্কী জাহাজে তোমরা ক্রীতদাস হলে কেমন করে?

ব্যারন জিজ্ঞাসা করলো—আমার প্রিয় বোন এদেশে রয়েছে একথা কি সত্যি?

ক্যাকাম্বো বললো—সত্যি।

প্যানগ্লস বললেন—এবং আমার প্রিয় কাঁদিদকে কি আমি আবার দেখছি?

তাদের সঙ্গে মার্টিন আর ক্যাকাম্বোর পরিচয় করিয়ে দিল কাঁদিদ। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো তারা; তারপরে, নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে লাগলো। বিদ্যুতের বেগে ছুটতে লাগলো নৌকোটা, তারা বন্দরে এসে পৌঁছলো। কাঁদিদ নেমেই একজন ইহুদীকে ডেকে পাঠালো। ইহুদী এলে তার কাছে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রায় একটা হীরে বিক্রী করলো। তার দাম হচ্ছে একলাখ। কিন্তু ইহুদীটি আব্রাহামের নামে শপথ করে বললো ওর বেশী দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। মুদ্রাগুলি পেয়েই ব্যারন আর প্যানগ্লসের মুক্তিপণ হিসাবে সেগুলি সে ক্যাপটেনকে দিয়ে দিলো। প্যানগ্লস এই মুক্তি পেয়ে মুক্তিদাতার পায়ের ওপরে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ব্যারন তাকে দিল ধন্যবাদ; সেই সঙ্গে কথা দিল সুযোগ পেলেই সেই অর্থ সে তাকে ফিরিয়ে দেবে।

সে জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু আমার বোন টার্কিতে রয়েছে সে কথা কি সত্যি?

ক্যাকাম্বো বললো—থাকার সম্ভাবনাই বেশী, কারণ ট্রানসিলভার একটি রাজকুমারের বাড়িতে সে বাসন মাজে।

আর দুটি ইহুদীর কাছে কয়েকটি হীরে বিক্রী করে সবাইকে নিয়ে আর একটি নৌকোতে চড়ে দাসত্ব থেকে কুঁনিগুঁকে উদ্ধার করার জন্য কাঁদিদ নিজের পথে যাত্রা করলো।

পরিচ্ছেদ—২৮

কাঁদিদ, কুঁনিগুঁ, প্যানগ্লস মার্টিন ইত্যাদির কী হলো

কাঁদিদ ব্যারনকে বললো—আমাকে ক্ষমা কর; রেভারেণ্ড ফাদার, তোমার দেহের ভেতর দিয়ে তরোয়াল চালিয়ে দেওয়ার জন্যে আবার তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ব্যারন বললো—ওকথা আর বলো না। স্বীকার করছি, অত তাড়াতাড়ি

আমারও মেজাজ খারাপ করাটা উচিত হয়নি। কিন্তু এই জাহাজে কী করে আমি ক্রীতদাস হলাম সেটা জানার জন্যে তুমি উদগ্রীব হয়েছো বলে সেই কাহিনীটা তোমাকে আমি বলছি। তুমি আমার দেহে যে ক্ষতর সৃষ্টি করেছিলে কলেজের এক ডাক্তার আমার সেই ক্ষত সারিয়ে দিলেন। তারপরে একদল স্প্যানিশ সৈন্য আমাদের আক্রমণ করে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তারা আমাকে বুয়েনোস আয়ার্সের জেলে বন্দী করে রাখে। ঠিক সেই সময়েই আবার সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো, আমার সেনাপতির কাছে রোমে ফিরে যাওয়ার আমি অনুমতি চাইলাম, পেলামও। সেনাপতি কনস্টান্টিনোপলের ফরাসী রাষ্ট্রদূতের কাছে পুরোহিত নিযুক্ত করে আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দিলেন। নতুন অফিসে আমি এক সপ্তাহও চাকরি করি নি এমন সময় এক সন্ধ্যায় একটি তুর্কী যুবকের সঙ্গে আমার দেখা হলো, যুবকটি খুবই সুন্দর; চেহারাটিও বেশ সুগঠিত। আবহাওয়াটা খুব গরম ছিল। যুবকটির স্নান করার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তার সঙ্গে আমিও স্নান করতে গেলাম। একজন তুর্কী যুবকের সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করাটা কোন খ্রীশ্চানের পক্ষে যে অপরাধ তা আমি জানতাম না। আমাকে তারা ধরে নিয়ে গিয়ে পায়ের তলায় একশটা বেত মারলো; তারপরে আমাকে তারা জাহাজের ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দিল। এর চেয়ে গুরুতর অন্যায় আর যে কিছু রয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি নে। কিন্তু তর্কীদের দেশে নির্বাসিত ট্রানসিলভ্যানিয়ার একটি রাজপুত্রের কাছে আমার বোন কী করে বাসন মাজার চাকরানী হয়ে এলো সেটা জানার বড় আগ্রহ হয়েছে আমার।

কাঁদিদ বললো—কিন্তু প্রিয় প্যানগ্লস, তোমাকে আবার আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কী রকম ব্যাপার হলো?

প্যানগ্লস বললেন—তুমি যে আমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখেছিলে সেটা ঠিক, যদিও নিয়ম মতে, তাদের উচিৎ ছিল আমাকে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু তোমার হয়ত মনে রয়েছে, তারা আমাকে যখন পোড়াতে গিয়েছিলো তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছিলো। এত জোরে ঝড় বইছিলো যে আগুন জ্বালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিলো। আর কোন উপায় না দেখে তারা আমাকে ফাঁসিই দিলো। একজন শল্য চিকিৎসক আমার দেহটা কিনে তাঁর বাড়িতে বয়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমার শব ব্যবচ্ছেদ করবেন বলে প্রস্তুত হলেন। আমার নাভিস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত লম্বালম্বি ফালা করার জন্যে আমার দেহের মধ্যে বেশ মোক্ষমভাবেই তিনি ছুরিটা বসিয়ে দিলেন। আমাকে তারা যেভাবে ফাঁসি দিয়েছিলো অমন অপদার্থ ভাবে আমার আগে কেউ ফাঁসিতে ঝোলে নি। আসল কথাটা হচ্ছে হোলি ইনকুইজিশন থেকে আমাকে ফাঁসি দেওয়ার ভার যার ওপরে দেওয়া হয়েছিলো সে হচ্ছে একজন নিম্নপদস্থ যাজকের অধস্তন কর্মচারী। পোড়ানোর ব্যাপারে সে ছিল পাকা; কিন্তু ফাঁসির ব্যাপারে সে

ছিল একেবারে আনকোরা। এ-ব্যাপারে সে কিছুই জানতো না বললেই হয়। দড়িটা ভিজে গিয়েছিলো; তাই যে রকম ফাঁস লাগা উচিৎ দড়িটা পিছলে যাওয়ায় সে রকম ফাঁস লাগে নি। আসল কথাটা হলো, আমি তখনও নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম। সেই মোক্ষম ছুরিকাঘাতে আমি এত জোরে চিৎকার করে উঠলাম যে শল্য চিকিৎসকটি ভয়ে আঁৎকে উঠে উলটে লম্বা হয়ে মাটির ওপরে পড়ে গেলেন। তারপরে, একটা শয়তানের শব ব্যবচ্ছেদ করছেন ভেবে তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন এবং সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামার ফলে গড়িয়ে পড়লেন নিচে। তাঁর এই চিৎকার আর পতনের শব্দ পেয়ে পাশের ঘর থেকে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তারপরে টেবিলের ওপরে ছুরিকাহত অবস্থায় আমাকে পড়ে থাকতে দেখে স্বামীর চেয়েও তিনি বেশী ভয় পেয়ে গেলেন। তিনিও তরতর করে নিচে নেমে গেলেন; কিন্তু নামতে গিয়ে পড়লেন স্বামীর ওপরে। একটু সামলে নেওয়ার পরে, আমার কানে এলো, স্ত্রী তাঁর স্বামীকে বলছেন—প্রিয়তম, একটা বিধর্মীর দেহ কাটার কথা তুমি কী করে ভাবতে পারলে বলতো? ওদের দেহে সব সময় যে শয়তান বাস করে তা কি তুমি জানো না? আমি এখনই পাদরীর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনছি; তিনি এসেই ভূতটাকে তাড়িয়ে দেবেন। তাঁকে এইভাবে কথা বলতে শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমি কাঁপতে লাগলাম; এবং তখনও পর্যন্ত যেটুকু শক্তি আমার দেহে অবশিষ্ট ছিল তার সবটুকু জড়ো করে ক্ষীণ স্বরে আমি বললাম—'আমার প্রতি দয়া করুন'। অবশেষে পোর্তুগীজ নাপিত সাহস করে আমার পেটটা সেলাই করে দিলো; তার স্ত্রী সেবাশুশ্রূষা করলো আমার। দিন পনেরর ভেতরেই আমি হাঁটাচলা করতে পারলাম। নাপিতটি মালটার একটি নাইটের কাছে আমাকে চাকর হিসাবে পাঠিয়ে দিলো। নাইটটি যাচ্ছিলেন ভেনিসে। কিন্তু আমার ভাড়া দেওয়ার মত কোন অর্থ মনিবের নেই দেখে আমি একটি ভেনিসিয়ান ব্যবসাদারের কাছে চাকরি নিয়ে তার সঙ্গে এলাম কনস্টান্টি-নোপলে।

একদিন আমি একটি মসজিদে ঢুকলাম। সেখানে দেখলাম একজন বৃদ্ধ ইমাম দাঁড়িয়ে রয়েছেন; এবং দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বেশ সুন্দরী যুবতী শিষ্যা। শিষ্যাটি প্রার্থনা করছিলো, তার ঘাড়টা ছিল একেবারে খোলা, তার বুকের ওপরে ছিল নানান সুগন্ধী ফুল দিয়ে তৈরি করা একটা ফুলের তোড়া। তোড়াটা তার বুক থেকে পরে গেল মাটির ওপরে। সেটা কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে তক্ষুনি আমি তার কাছে ছুটে গেলাম; তারপরে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিবাদন করে তোড়াটা তুলে দিলাম তার হাতে। তোড়াটা তুলে দিতে আমার এতটা সময় লেগেছিলো যে ইমাম সাহেব চটে উঠলেন; তারপরে আমি খ্রীশ্চান তা বুঝতে পেরে সাহায্যের জন্যে তিনি চেঁচাতে লাগলেন। কাদির কাছে তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেলো; আমার পায়ের তলায় একশ' ঘা বেত

মারার নির্দেশ দিলেন কাদি। তারপরে, আমাকে তারা পাঠিয়ে দিলেন জাহাজের খোলে। সেখানে আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। দেখলাম সেই একই বেঞ্চের সঙ্গে আমার লর্ড ব্যারনও বাঁধা রয়েছেন। সেই জাহাজে মার্সেলিশ-এর চারটি যুবক ছিলেন, নেপলস-এর পাঁচটি পাদরী, কর্ফুর দুটি মঠধারী সন্ন্যাসী। তাঁরা বললেন এরকম ঘটনা রোজই প্রায় ঘটছে। ব্যারন অভিযোগ করলেন যে আমার চেয়ে কম অপরাধ করে তিনি বেশী শাস্তি পেয়েছেন; আমি বললাম একজন যুবক তুর্কীর সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে স্নান করার চেয়ে তোড়া কুড়িয়ে সেটা কোন যুবতীর বুকে স্থাপন করাটা অনেক কম অপরাধজনক। এই নিয়ে প্রত্যহই আমাদের বিবাদ বাঁধতো, আর তার জন্যে প্রতিদিনই আমরা কুড়ি ঘা করে বেত খেতাম, এমন সময় পার্থিব ঘটনাপ্রবাহের অনিবার্য যোগসূত্রের ফলে তুমি সেই জাহাজে এসে মুক্তিপণ দিয়ে আমাদের মুক্ত করলে।

কাঁদিদ বললো—আচ্ছা প্রিয় প্যানগ্লস, আমাকে একটা কথা বলতো। তোমাকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয়েছিলো, তোমার দেহটাকে যখন কাটা হচ্ছিলো, তোমাকে তারা যখন বেত মারছিলো, তোমাকে যখন দাঁড় টানতে হচ্ছিলো তখনও কি তোমার মনে হতো পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে সবই ভালোর জন্যে?

উত্তর দিলেন প্যানগ্লস—আমি সব সময়েই আমার প্রথম মতবাদে বিশ্বাসী। কারণ, যাই ঘটুক আর নাই ঘটুক, আমি একজন দার্শনিক। আমার অনুভূতিকে, ভাবপ্রবণতাকে অবিশ্বাস বা পরিত্যাগ করাটা আমার শোভা পায় না। বিশেষ করে, লিবনিটজের মতবাদ কখনও ভুল হতে পারে না; আর আগে থেকে যে সংযোগ স্থির করা রয়েছে তার মত সুন্দর জিনিস আর কিছু নেই।

পরিচ্ছেদ—২৯

কী ভাবে কাঁদিদ কুঁনিগুঁ আর বৃদ্ধা মহিলাটিকে আবার খুঁজে পেলো

কাঁদিদ, ব্যারন, প্যানগ্লস, মার্টিন এবং ক্যাকাম্বো নিজেদের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প বলতে-বলতে এবং পৃথিবীর সম্ভাব্য আর অসম্ভাব্য ঘটনার ওপরে তাদের যুক্তি আর অযুক্তি তাই নিয়ে আলোচনা করতে-করতে এগিয়ে যাচ্ছিলো; যাওয়ার পথে কার্য আর কারণের মধ্যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না; নৈতিক আর আধিভৌতিক অমঙ্গল বলতে কী বোঝায়, স্বাধীন ইচ্ছা আর প্রায়োজনিক ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য কী এইগুলিরও চুলচেরা আলোচনা হচ্ছিলো তাদের; কেউ যদি ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে তুর্কী জাহাজের দাঁড়ের

সঙ্গে শেকল বাঁধা হয়ে থাকে তাহলে তার সান্ত্বনা কী থাকতে পারে এই সবও তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, এই সব আলোচনা করতে করতে তারা প্রোপোনটিসের উপকূলে ট্রানসিলভেনিয়ার রাজকুমারদের বাড়িতে এসে হাজির হলো। প্রথম যে দৃশ্যটি তাদের চোখে পড়লো সেটি হচ্ছে মিস কুঁনিগুঁ আর সেই বৃদ্ধাটি একটা দড়ির ওপরে টেবিলের ঢাকনা শুকোচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে ব্যারন বিবর্ণ হয়ে গেলো। এমন কি অমন যে কোমল হৃদয় আর স্নেহশীল প্রেমিক কাঁদিদ সেও দেখলো তার সুন্দরী কুঁনিগুঁর শরীর রোদে ঝলসিয়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে, চোখে পড়েছে ছানি, ঘাড়টা গিয়েছে শুকিয়ে, মুখ আর হাতের ওপরে বলিরেখাতে ছেয়ে গিয়েছে, সারা শরীর খুসকিতে গিজগিজ করছে। এই দেখে সেও ভয়ে পিছিয়ে এলো। কিন্তু সেই ধাক্কা থেকে সামলিয়ে নিয়ে নিছক ভব্যতার খাতিরেই সে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। কুঁনিগুঁ তাকে আর তার ভাইকে আলিঙ্গন করলো। সবাই আলিঙ্গন করলো বৃদ্ধাটিকে, মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিল কাঁদিদ।

পাশেই একটা ছোট খামার ছিল, আরও ভাল কিছু পাওয়ার আগে ওইখানে আপাতত থাকার জন্যে বৃদ্ধা মহিলাটি কাঁদিদকে একটি প্রস্তাব দিল। কুঁনিগুঁ যে কুৎসিৎ হয়ে গিয়েছে সে সংবাদটা তার জানা ছিল না; কারণ, কেউ তাকে সেকথা বলে নি। এমন জোর করে কাঁদিদকে সে তার পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিল যে বেচারা তাকে 'না' বলতে পারলো না। ব্যারনকে সে জানিয়ে দিল যে সে তার বোনকে বিয়ে করবে।

ব্যারন বললো—আমার বোন তোমাকে বিয়ে করে তার জন্ম আর বংশের অমর্যাদা করবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না; সহ্য করবো না তোমার এই ঔদ্ধত্যকে। না, আমার ভাইপো-ভাগনের দল যে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় সম্ভ্রমের যোগ্য নয় এর জন্যে আমি কোনদিনই তিরস্কৃত হবো না। কোন সাম্রাজ্যের ব্যারন নয় এমন কাউকেই আমার বোন বিয়ে করতে পারবে না।

এই শুনে কুঁনিগুঁ তার ভাইয়ের পায়ের ওপরে আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে তাকে মত পরিবর্তন করার জন্যে অনেক আবেদন করলো; কিন্তু ব্যারন অনড়, অটল। কিছুতেই সে তার মত পরিবর্তন করতে রাজি নয়।

কাঁদিদ বললো—মূর্খ কোথাকার! তোমাকে কি আমি মুক্তিপণ দিয়ে জাহাজের খোল থেকে উদ্ধার করি নি? তোমার বোন কি পরের ঘরে চাকরানীবৃত্তি করেনি। তার চেহারা কি কুৎসিৎ কদাকার নয়? তবু তাকে আমি বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। আর সেই বিয়েতে বাধা দিচ্ছো তুমি? আমার মনে যে ক্রোধ হচ্ছে সেই ক্রোধের নির্দেশ যদি আমি পালন করি তাহলে আবার তোমাকে আমার হত্যা করা উচিৎ।

ব্যারন বললো—তুমি আমাকে আবার হত্যা করতে পার; কিন্তু আমি যতদিন বেঁচে রয়েছি ততদিন তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে পারবে না।

পরিচ্ছেদ— ৩০

উপসংহার

সত্যি বলতে কি, কুঁনিগুঁকে বিয়ে করার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না কাঁদিদের। কিন্তু ব্যারনের চরম ঔদ্ধত্য বিয়েটা পাকা করে ফেলতে তাকে বাধ্য করলো। আর কুঁনিগুঁ মোলায়েম করে এমন ভাবে চাপ দিল যে সে আর পিছু হটতে পারলো না। প্যানগ্লস, মার্টিন আর বিশ্বাসী ক্যাকাম্বোর সঙ্গে এ বিষয়ে সে পরামর্শ করলো। প্যানগ্লস এই উপলক্ষে একটি সুন্দর স্মারক পত্র রচনা করলেন। সেই রচনা নিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে বোনের ওপরে কোন অধিকার ব্যারনের নেই, এবং দেশের সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী, কুঁনিগুঁ বাঁ হাত দিয়ে কাঁদিদকে বিয়ে করতে পারে। মার্টিনের অভিমত হচ্ছে ব্যারনকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হোক। ক্যাকাম্বো ঠিক করলো ব্যারনকে তুর্কী জাহাজের ক্যাপটেনের কাজে ফেরৎ পাঠানো উচিৎ। তারপরে, প্রথম যে জাহাজ ছাড়বে সেই জাহাজে করে তাকে ফাদার জেনারেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেই ঠিক হবে। এই উপদেশটাই সবচেয়ে ভাল বলে মনে হলো সবার। বৃদ্ধাটিও এই প্রস্তাব সমর্থন করলো। তার বোনের কাছে এ-বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করা হলো না। সামান্য অর্থ খরচ করেই সমস্যাটার সুরাহা হয়ে গেলো। জেজিউয়িটের সঙ্গে একটু ছলনা করে তারা বেশ আনন্দই পেলো; এইভাবে জার্মান ব্যারনের দর্প চূর্ণ করলো তারা।

এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক যে এত ঝড়-ঝাপটা, ঘটনা-দুর্ঘটনা, বিপদ-আপদ অতিক্রম করার পরে, কাঁদিদ যখন তার প্রিয়তমাকে বিয়ে করে দার্শনিক প্যানগ্লস, মার্টিন আর বিজ্ঞ ক্যাকাম্বোর সঙ্গে এবং প্রাচীন ইনকাদের দেশ থেকে আনা অত হীরে নিয়ে এসে সংসার পাতলো তখন এই পৃথিবীতে সে খুব আনন্দের সঙ্গে জীবন কাটাবে। কিন্তু ইহুদীদের কাছে সে এত ঠকেছিলো যে তার সেই খামারটি ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট ছিল না। তার স্ত্রী প্রতিদিন কুৎসিৎ থেকে কদাকার হতে লাগলো। বৃদ্ধাটি কেবল যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলো তা নয়, সে কুঁনিগুঁর চেয়েও বদমেজাজী হয়ে উঠলো। ক্যাকাম্বো কাজ করতো বাগানে; ফসল কাঁধে করে কনস্টানটি-নোপল-এ নিয়ে যেতো বিক্রী করতে। তার আর খাটার শক্তি ছিল না। নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতে লাগলো সে, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একটা চাকরি যোগাড় করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লেন প্যানগ্লস। মার্টিনের দৃঢ় বিশ্বাস কোন অবস্থাতেই মানুষ নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। সব কিছুকেই তাই তিনি ধৈর্যের সঙ্গে মানিয়ে নিলেন। মাঝে-মাঝে দর্শন আর নীতি নিয়ে প্যানগ্লস তর্ক করতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে খামারের জানালার পাশ দিয়ে নৌকো ভেসে যেতো। সেই নৌকোতে বোঝাই

থাকতো পাশা আর কাদির দল। লেমনস, মিতিলিন, আর এরজেরোমে সেই সব নৌকোতে করে তাদের নির্বাসনে পাঠানো হতো। তাদের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্যে আবার আসতো নতুন পাসা আর কাদির দল। কিছুদিন পরে, তাদেরও আবার পাঠানো হতো নির্বাসনে। কিছু লোকের মাথায় অদ্ভুতভাবে খড় চাপিয়ে উপহার হিসাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো সাব্লাইম পোর্টিতে। তারা তা দেখতে পেতো। এই সব দৃশ্যে মাঝে-মাঝে তাদের একঘেয়ে জীবনে কিছুটা ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করতো। যখন তাদের ঝগড়া-বিবাদ হতো না তখন তাদের বিরক্তিকর জীবনের গুমোট এত বেশী হতো যে তাদের অসহ্য হয়ে উঠতো।

তাদেরই আশেপাশে একজন বিখ্যাত দরবেশ বাস করতেন। দার্শনিক হিসাবে তাঁর নাম ছিল। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে তারা একবার তাঁর বাড়িতে গেলো। প্যানগ্লস ছিলেন এই দলটির মুখপাত্র। তিনি তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—

গুরু, মানুষের মত এই অদ্ভুত জানোয়ারটির সৃষ্টি কেন হয়েছে সেই কথাটাই আপনার কাছে আমরা জানতে এসেছি।

দরবেশটি বললেন—এসব বিষয় নিয়ে আপনারা মাথা খারাপ করছেন কেন? ও নিয়ে কিছু ভাবার অধিকার কি আপনাদের আছে?

কাঁদিদ বলল—কিন্তু রেভাবেণ্ড ফাদার, পৃথিবীটা যে ভীষণ নোংরামিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

দরবেশ বললেন—তাতে কী বোঝায়? অমঙ্গল, না মঙ্গল? তুর্কীর রাজা ইজিপ্টে যখন জাহাজ পাঠান তখন তার ভেতরে ইঁদুরবা সুখে ঘুরে বেড়াতে পারবে কি পারবে না তা নিয়ে কি তিনি মাথা ঘামান?

প্যানগ্লস জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে, আমরা কী করবো?

চুপচাপ বসে থাকুন।

প্যানগ্লস বললেন—ভেবেছিলাম, সম্ভাব্য সমস্ত বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই পৃথিবীতে কার্য আর কারণের মধ্যে কোন সম্পর্ক রয়েছে কি না, অমঙ্গলের উৎস কোথায়, আত্মার প্রকৃতি কী, এবং যে ঐক্য আগে থাকতেই ঠিক করে রাখা হয়েছে তার স্বরূপটি কী—এই সব তত্ত্ব আর তথ্য নিয়ে আপনার সঙ্গে আমরা আলোচনা করবো, আর সেই ভেবেই আমরা বেশ গর্ব অনুভব করছিলাম।

এই কথা শুনে দরবেশ তাঁদের নাকের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁরা যখন এই রকম আলোচনা করছিলেন তখন চারপাশে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো যে কনস্টানটিনোপলে দুজন মন্ত্রী আর একজন মোল্লাকে গলা টিপে মেরে ফেলা হয়েছে; আর শূলে চড়ানো হয়েছে কয়েকজন বন্ধুকে। কিছুক্ষণ ধরে এই দুঃসংবাদে চারপাশ সরগরম হয়ে রইলো। প্যানগ্লস, কাঁদিদ আর

মার্টিনের সঙ্গে তাদের ছোট খামারে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় পথে সুদর্শন একটি বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। কমলালেবুর বনে মাথায় ছাউনি-দেওয়া একটি বেদীর ওপরে সেই ভদ্রলোকটি বসেছিলেন। প্যানগ্লস কেবল তার্কিকই ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন কৌতূহলী। যে মোল্লাটিকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে তার নামটা কী ভদ্রলোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

সেই শান্তশিষ্ট বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন—তা আমি বলতে পারবো না, আমি কোন মোল্লা বা মন্ত্রীর নাম জানি নে। আপনি যে সংবাদ দিলেন সে সংবাদও আমার কানে আসে নি। আমার ধারণা, যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাদের মাঝে-মাঝে এই রকম বিপদে পড়তে হয়; আর পড়াই তাদের উচিৎ। কিন্তু কনসটানটিনোপলে কী ঘটছে সেসব কথা কোনদিনই আমি জানতে চাই নে। বাগানে আমি যা চাষ করি সেই সব ফসল কনস্টানটি-নোপলে পাঠিয়ে দিয়েই আমি খুশি।

এই কথাগুলি বলে, অপরিচিতদের তিনি তাঁর বাড়ির ভেতরে আসার জন্যে অনুরোধ করলেন। তাঁর দুটি মেয়ে আর দুটি ছেলে বাড়ির তৈরি বরফ দেওয়া ঠাণ্ডা সরবৎ তাঁদের খেতে দিল। তাছাড়া, মিষ্টি লেবু, আর লেবুর সরবৎ, আনারস, পেস্তা, বাদাম, ব্যাটাভিয়া বা ওয়েস্ট ইনডিজের কফি নয়, বেশ উৎকৃষ্ট ধরনের কফি তাঁদের খেতে দিল। তারপরে, এই সৎ মুসলমানের দুটি মেয়ে কাঁদিদ, প্যানগ্লস আর মার্টিনের দাড়িগুলিতে আতর মাখিয়ে দিল।

কাঁদিদ তুর্কীটিকে জিজ্ঞাসা করলো—আপনার নিশ্চয় বড় জমিদারী রয়েছে?

তিনি বললেন—আমার জমি কুড়ি একরের বেশী নেই। সেই সমস্ত জমিও নিজের ছেলেদের নিয়ে আমি চাষ করি। আমরা যে জিনিসকে জড়িয়ে চলি সেগুলি হচ্ছে আলস্য, পাপ আর অভাব।

বাড়ি ফেরার পথে তুর্কী বৃদ্ধটির কথাগুলি কাঁদিদের মনে গভীর রেখাপাত করলো।

সে প্যানগ্লস আর মার্টিনকে বললো—যে ছ'টি রাজার সঙ্গে নৈশ ভোজ করার সম্মান আমরা অর্জন করেছিলাম, আমার বিশ্বাস এই সৎ বৃদ্ধটি তাঁদের চেয়ে অনেক ভালো জীবন বেছে নিয়েছেন।

প্যানগ্লস বললেন—মানুষের আভিজাত্য জিনিসটা বড়ই বিপজ্জনক, অবশ্য দার্শনিকদের মতবাদ যদি আমাদের বিশ্বাস করতে হয়। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি সোয়াবাইটদের রাজা এগলোন এহুদের হাতে নিহত হয়েছিলেন, ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হয়েছিলো অ্যাবসালোমকে; বুকে তিনি খেয়েছিলেন বর্শার তিনটে খোঁচা; যেরোবোয়ামের পুত্র রাজা নাদাবকে হত্যা করেছিলেন বা-শা; জিমরি হত্যা করেছিলেন রাজা এলাহ্‌কে' আহাজিয়া নিহত হয়েছিলেন জেহুর হাতে; যেহয়াদা হত্যা করেছিলেন আথালিয়াকে; রাজা

যেহয়াকিম, যেকোনিয়া, এবং জেডেকিয়া বন্দী হয়েছিলেন। ক্রিসাস, অ্যাসটিয়াগাস, ডেরিয়াস, সায়রাকুসের ডায়োনিসাস, পাইরাস, পারসিয়াস, হ্যানিবল, যুগারথা, অ্যারিয়োভিসটাস, পম্পে, নিরো, 'ওথো, ভিটেলিয়াস, ডোমিটিয়ান, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় রিচার্ড, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, ষষ্ঠ হেনরী, তৃতীয় রিচার্ড, মেরী স্টুয়ার্ট, প্রথম চার্লস, ফ্রান্সের তিন জন হেনরী এবং সম্রাট চতুর্থ হেনরী—এঁদের ভাগ্যে কী ঘটেছিলো সে সব কথা আলোচনা করার আর দরকার নেই।

কাঁদিদ বললো—আমাদের বাগানের যে যত্ন নেওয়া উচিৎ সেকথা নিশ্চয় তোমাদেব কারও বলার প্রয়োজন নেই।

মার্টিন বললেন—তর্ক বিবাদ না করে কাজ করাটাই হচ্ছে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়।

এই ছোট দলটির সবাই এই প্রশংসনীয় পরিকল্পনায় মেতে উঠলো, এবং তাদের বিচারবুদ্ধি আর কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করলো এই উদযোগে। সেই ছোট জমিতে প্রচুর ফসল ফললো। কুঁনিগুঁ সত্যি-সত্যিই বড কদাকার হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মাংসের পিঠে গডার ব্যাপারে সে সুন্দর দক্ষতা অর্জন করেছিলো। প্যাকিটি করতো সেলাই-এর কাজ। বৃদ্ধাটির ওপরে ভার ছিল পোশাক পরিচ্ছদের। ব্রাদার জিরোফ্লি পর্যন্ত সবাই কিছু কিছু কাজ করতো। জিরোফ্লি ছিল ভাল ছুতোর মিস্ত্রী, সেই কাজ করে সে সৎভাবে জীবন কাটাতে লাগলো। মাঝে-মাঝে প্যানগ্লস কাঁদিদকে বলতেন—

সম্ভাব্য বিশ্বের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ বিশ্বে সব ঘটনার মধ্যেই একটা বেশ যোগসূত্র রয়েছে। এক কথায়, মিস কুঁনিগুঁর প্রেমে পডার জন্যে পাছায় লাথি খেয়ে সেদিন যদি তুমি সেই সুন্দর দুর্গ থেকে বিতাডিত না হতে, ইনকুইজিশনে যদি শাস্তি না পেতে, পায়ে হেঁটে যদি আমরিকায় না ঘুরতে, ব্যারনের দেহে যদি তরোয়ালের কোপ না বসাতে, সেই ভাল দেশ এল ডোরাডো থেকে যে মেষগুলিকে এনেছিলে সেগুলি যদি সব বিনষ্ট না হতো তাহলে, এখানে বসে-বসে কমলালেবুর রস আর পিসটাচিয়ো বাদাম তোফা আরামে খাওয়ার সুযোগ আজ তুমি পেতে না।

কাঁদিদ বললো—চমৎকার কথা বলেছেন। কিন্তু এখন আমাদের বাগানে কাজ করতে যাওয়াব সময় হয়েছে।

অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।